বঙ্গদর্শন

নির্বাচিত রচনাসংগ্রহ

সম্পাদক

ড. রবীন্দ্র গুপ্ত

অধ্যাপক, রবীন্দ্রভারতী বিশ্ববিদ্যালয়

যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয়ের বাংলা বিভাগের অধ্যক্ষ

ড. দেবীপদ ভট্টাচার্যের

মুখবন্ধ সংবলিত

পশ্চিমবঙ্গ বিদ্যালয় পরিদর্শক সমিতি

প্রথম প্রকাশ : জুলাই ১৯৫৭

প্রকাশক : পরিতোষ মজুমদার
চারুপ্রকাশ। ৭বি কলেজ রো। কলকাতা-৯

মুদ্রক : মলয়কুমার দত্ত
মুদ্রালিপি। ১৮এ রামনাথ বিশ্বাস লেন। কলকাতা-৯

প্রচ্ছদপরিকল্পনা : ও. সি. গাঙ্গুলি

মূল্য কুড়ি টাকা
[গ্রাহকপক্ষে ষোলো টাকা]

পরিবেশন-কেন্দ্র : বিদ্যাসাগর পুস্তক মন্দির। ৭বি কলেজ রো। কলকাতা-৯

সূচী

মূল 'বঙ্গদর্শনে'র ১ম সংখ্যার ৩য় পৃষ্ঠার প্রতিচিত্র এই সংকলনের ৩য় পৃষ্ঠায় মুদ্রিত হয়েছে।

মুখবন্ধ

'বঙ্গদর্শন' পত্রিকা বঙ্কিমচন্দ্র-কর্তৃক সম্পাদিত হয়ে ১২৭৯ সালে বৈশাখ মাসে প্রকাশিত হয়। এই পত্রিকা প্রকাশিত হবার পূর্বে তত্ত্ববোধিনী পত্রিকা, বিবিধার্থসংগ্রহ, এডুকেশন গেজেট প্রভৃতি পত্রিকা শিক্ষিত বাঙালীর প্রিয় পাঠ্য ছিল। কিন্তু উচ্চাঙ্গের যথার্থ সাহিত্য-পত্রিকারূপে আবির্ভূত হল বঙ্কিমের 'বঙ্গদর্শন'। এই পত্রিকার প্রকাশকে 'আবির্ভাব'ই বলা সঙ্গত; শিক্ষিত মননশীল মধ্যবিত্ত বাঙালীর মনীষা ও হৃদয়মন্থনজাত এই 'বঙ্গদর্শন'। 'তত্ত্ব-বোধিনী পত্রিকা' মূলতঃ 'ব্রাহ্মসমাজ' দ্বারা পরিচালিত হলেও এই পত্রিকায় উন্নত ধরনের চিন্তা ও মননের সাক্ষাৎ মেলে, যার সঙ্গে সম্প্রদায়গত ধর্মের সম্পর্ক ক্ষীণ। 'তত্ত্ববোধিনী' ও 'বঙ্গদর্শন' পত্রিকাদ্বয়ের তুলনামূলক বিচার করে বিপিনচন্দ্র পাল তাঁর ইংরেজি ভাষায় লিখিত আত্মজীবনীতে মন্তব্য করেছেন :

> আমার যৌবনপর্বে বাঙালী যুবকেরা 'তত্ত্ববোধিনী'র চেয়ে 'বঙ্গ-দর্শনে'র কাছাকাছি ছিল। 'তত্ত্ববোধিনী' আমাদের মতো যুবকদের কাছে গুরুগম্ভীর বলে মনে হত। 'বঙ্গদর্শনে' প্রকাশিত উপন্যাস, কবিতা, ব্যঙ্গরচনা, ঐতিহাসিক ও সামাজিক রচনা আমাদের হৃদয়কে অধিকতর উদ্দীপিত করত।

বিপিনচন্দ্র পালের এই অভিমত সর্বতোভাবে স্বীকার্য। বঙ্কিমচন্দ্র পর-পর চার বছর ১২৮২ সাল পর্যন্ত 'বঙ্গদর্শন' সম্পাদনা করেন, পরে নিজেই প্রকাশ বন্ধ করে দেন। ১২৮৪ সাল থেকে অগ্রজ সঞ্জীবচন্দ্রের সম্পাদনায় বঙ্গদর্শন পুনঃপ্রকাশিত হয়। কিন্তু কিছুকাল পরেই পত্রিকা অনিয়মিতভাবে প্রকাশিত হতে থাকে এবং ১২৮৮ সালের মাঝামাঝি থেকে তার প্রকাশ বন্ধ হয়ে যায়। পুনরায় ১২৯০ সালে কার্তিক মাসে বঙ্কিমচন্দ্রের অনুমোদনসহ শ্রীশচন্দ্র মজুমদারের সম্পাদনায় 'বঙ্গদর্শন' বার হয়। কিন্তু চন্দ্রনাথ বসু রচিত 'পশুপতিসম্বাদ' নামক সামাজিক তথা বিদ্রূপাত্মক আখ্যায়িকাটি প্রকাশিত হলে বঙ্কিমচন্দ্র অসন্তুষ্ট হয়ে মাঘ সংখ্যার পর পত্রিকার প্রকাশ রহিত করেন। এই হল 'বঙ্গদর্শনের' সংক্ষিপ্ত ইতিবৃত্ত।

বঙ্কিমচন্দ্র স্বয়ং যে চার বছর 'বঙ্গদর্শন' সম্পাদনা করেন সেই পর্বটিই পত্রিকার প্রকৃতপক্ষে সর্বোচ্চ গৌরবের কাল। এই বর্ষচতুষ্টয়ের রচনাবলীর সঙ্গে পরবর্তী কালে 'বঙ্গদর্শনে' প্রকাশিত রচনাগুলিকে ঠিক সমানধর্মা বলা চলে না।

'বঙ্গদর্শন' পত্রিকা প্রকাশের উদ্দেশ্য বঙ্কিমচন্দ্র 'পত্রসূচনা'য় দ্ব্যর্থহীন ভাষায় ব্যক্ত করেন। তিনি বাংলা ভাষা ও সাহিত্যচর্চার প্রতি বীতরাগ 'ইংরাজিপ্রিয় কৃতবিদ্য'দের এবং 'সংস্কৃত পাণ্ডিত্যাভিমানীদিগের' উভয় গোষ্ঠীকেই নিন্দা করেছেন। স্মরণীয় যে বঙ্কিমচন্দ্র সাধারণ সাহিত্যসেবী ছিলেন না, তিনি কায়মনোবাক্যে স্বদেশের, স্বদেশবাসীর মঙ্গলকামী। নিজেদের আত্মসম্মান উজ্জীবিত করা তাঁর লক্ষ্য ছিল। দেশবাসীর 'সামাজিক উন্নতি' ও কল্যাণাকাঙ্ক্ষা তাঁর চিত্তে সদাজাগ্রত ছিল। 'বঙ্গদর্শন' বঙ্গসাহিত্যের ললাটে সেই কল্যাণতিলক। ব্রিটিশ ইণ্ডিয়ান অ্যাসোসিয়েশন (বঙ্গীয় জমিদার শ্রেণীর প্রতিষ্ঠান) লরেন্‌স-প্রস্তাবিত জনশিক্ষার জন্য দেয় 'সেস্'-এর বিরোধী ছিলেন। কিশোরীচাঁদ মিত্র বলেছিলেন, উচ্চবর্গের লোককে প্রথমে শিক্ষিত করা হোক, তাহলে ধীরে ধীরে নিম্নবর্গের জনগণের মধ্যে শিক্ষা নেমে আসবে। এই 'ডাউন ফিলট্রেশন থিওরি'র ঘোর বিরোধী ছিলেন বঙ্কিমচন্দ্র। 'পত্রসূচনা'য় তার সুস্পষ্ট পরিচয় আছে। সমাজে ভিন্ন ভিন্ন বৃত্তি, বর্ণ ও গোষ্ঠীর মধ্যে সামঞ্জস্য না ঘটলে যে একদা অশান্তির বহ্নি জ্বলে ওঠে সেই ঐতিহাসিক ও সমাজতাত্ত্বিক দৃষ্টি বঙ্কিমচন্দ্রের ছিল। এই অসামঞ্জস্য ও অসাম্যের ফল ফরাসী বিপ্লব, যার সম্বন্ধে তিনি বলেছেন : 'যদিও তাহার চরম ফল মঙ্গল বটে, কিন্তু অসাধারণ সমাজপীড়ার পর সে মঙ্গল সিদ্ধ হইতেছে।' লক্ষণীয় বঙ্কিমচন্দ্র 'তাহার চরম ফল মঙ্গল' অভিমত প্রকাশ করলেও 'অসাধারণ সমাজপীড়া'র আশঙ্কা তাঁর কাম্য ছিল না। 'বঙ্গদেশের কৃষক' রচনার পূর্বভূমিকা 'পত্রসূচনা'য় বিদ্যমান।

বঙ্কিমচন্দ্র তাঁর প্রখর ব্যক্তিত্বের জোরে সমকালের উচ্চশিক্ষিত অথচ মাতৃভাষানুরাগী লেখকদের একসূত্রে বাঁধতে পেরেছিলেন। ইতিহাস ছিল বঙ্কিমচন্দ্রের প্রিয় বিষয়। স্বদেশীয় ইতিহাসচর্চার অভাব তাঁর গভীর মনো-বেদনার কারণ ছিল। বঙ্গদর্শনে প্রকাশিত তাঁর ঐতিহাসিক প্রবন্ধগুলি সে অভাব বহুলাংশে দূরীভূত করেছিল। তাঁরই প্রেরণায় রাজকৃষ্ণ মুখোপাধ্যায়, রামদাস সেন, লালমোহন বিদ্যানিধি, দীননাথ বন্দ্যোপাধ্যায় এবং পরবর্তী কালে অক্ষয়কুমার মৈত্রেয়, বিহারীলাল সরকার, নিখিলনাথ রায়, কালীপ্রসন্ন বন্দ্যোপাধ্যায় স্বদেশীয় ইতিহাসচর্চায় আত্মনিয়োগ করেন। ইতিহাসচর্চার সঙ্গেই যুক্ত সাহিত্যালোচনা। বঙ্কিমচন্দ্রই বাংলা সাহিত্যে প্রথম তুলনামূলক সাহিত্যসমালোচনার প্রবর্তন করেন 'শকুন্তলা, মিরন্দা ও দেসদিমোনা' প্রবন্ধে। এই ধারারই রচনা হরপ্রসাদ শাস্ত্রীর 'কালিদাস ও শেক্সপীয়র' ও 'বঙ্গীয় যুবক ও তিন কবি'। অন্যদিকে প্রাচীন সংস্কৃত সাহিত্যালোচনার ক্ষেত্রে

গ্রহণীয় পদ্ধতির অবিস্মরণীয় দৃষ্টান্ত 'উত্তরচরিত' প্রবন্ধ। রামদাস সেন, প্রাণনাথ পণ্ডিত, রাজকৃষ্ণ মুখোপাধ্যায়, চন্দ্রনাথ বসু সেই ধারাকেই বহন করেছেন 'বঙ্গদর্শনে' প্রকাশিত তাঁদের রচিত কয়েকটি প্রবন্ধে।

বঙ্কিমচন্দ্র বেন্থাম্, কোম্ত ও জন স্টুয়ার্ট মিল-এর গুণগ্রাহী ছিলেন। এই তিনজন পাশ্চাত্ত্য মনীষীর দার্শনিক চিন্তাদ্বারা তিনি বিশেষভাবে প্রভাবিত হন। তিনি 'কৃষ্ণচরিত্র' ও 'ধর্মতত্ত্ব' আলোচনাতেও তাঁদের দার্শনিক মতবাদ প্রয়োগ করেছেন। তাঁর বন্ধু যোগেন্দ্রচন্দ্র ঘোষ পজিটিভিস্ট কোম্তের একলব্য শিষ্য ছিলেন। কিন্তু শুধু পাশ্চাত্ত্য দর্শন নয়, স্বভাবতঃই ভারতীয় দর্শনের আলোচনাও 'বঙ্গদর্শনে' স্থান পেয়েছিল। বঙ্কিমচন্দ্রের 'সাংখ্যদর্শন' ও রাজকৃষ্ণ মুখোপাধ্যায়ের 'চার্বাক দর্শন' প্রবন্ধ দুটি এই সূত্রে উল্লেখযোগ্য। তবে এ ধরনের প্রবন্ধ 'বঙ্গদর্শনে' বেশি প্রকাশিত হয় নি।

কিন্তু শুধু মননশীল রচনাই বঙ্গদর্শনের গৌরব নয়। 'কমলাকান্তের দপ্তর'-এর অতুলনীয় রস-প্রবন্ধ বা 'লোকরহস্য'-গ্রন্থভুক্ত ব্যঙ্গবিদ্ধ প্রসঙ্গগুলিও এই পত্রিকার সম্পদ। এই সূত্রে 'জটাধারীর রোজনামচা' রচনাটির প্রতি দৃষ্টি পড়া দরকার। বঙ্কিমচন্দ্র যেমন কমলাকান্তের, চন্দ্রশেখর বন্দ্যোপাধ্যায় তেমনি গঙ্গাধর শর্মা বা জটাধারীর বকলমে লেখনী চালনা করেছেন। কমলাকান্তের অনুকরণে জটাধারীর পদক্ষেপ 'বঙ্গদর্শনে'র প্রাঙ্গণেই ঘটেছিল। কিন্তু অনুকরণ পর্যন্তই।

আমরা স্মরণে রাখি এই বঙ্গদর্শনের উদ্যানে কুন্দ-সূর্যমুখীর প্রস্ফুটন বাংলা কথাসাহিত্যের ইতিহাসে যুগান্তর আনয়ন করেছিল। এ-সম্পর্কে রবীন্দ্রনাথ অনবদ্য ভাষায় লিখেছেন—

> বঙ্গদর্শনে যে জিনিসটা সেদিন বাংলা দেশের ঘরে ঘরে সকলের মনকে নাড়া দিয়েছিল সে হচ্ছে বিষবৃক্ষ।…বিষবৃক্ষে কাহিনী এসে পৌঁছল আখ্যানে। যে-পরিচয় নিয়ে সে এল তা আছে আমাদের অভিজ্ঞতার মধ্যে।

'বিষবৃক্ষ', 'চন্দ্রশেখর', 'কৃষ্ণকান্তের উইল'ও বঙ্গদর্শনে বার হয়েছিল। তার কিছু পরিবর্তন, পরিবর্ধন পরে বঙ্কিম করেছিলেন। কিন্তু 'ইন্দিরা' বা 'রাজসিংহ' প্রথমে কী অবয়বে আত্মপ্রকাশ করেছিল, অধিকাংশ পাঠকের জানা নেই। 'ইন্দিরা'র প্রচলিত সংস্করণ ১৮৯৩ সালে বঙ্কিমচন্দ্রের মৃত্যুর পূর্ব বৎসরে সংশোধিত ও পরিবর্ধিত হয়ে দেখা দেয়। 'রাজসিংহ' প্রথমে বঙ্গদর্শনে ১২৮৪-৮৫ সালে প্রকাশিত হয়। গ্রন্থাকারে বার হয় ১২৮৮ সালে। "পুনঃপ্রণীত" রাজসিংহ বৃহদাকারে ১৮৯৩ সালে নিজেকে তুলে ধরল। ক্ষুদ্রায়তন

রাজসিংহকে দেখতে কি এখনকার পাঠকের কৌতূহল জাগে না ? সে কৌতূহল এই সংকলনগ্রন্থে নিবৃত্ত হবে।

বঙ্গদর্শনের রচনাগুলিতে লেখকের নাম থাকত না। সেজন্য বঙ্গদর্শনগোষ্ঠীর লেখকদের মধ্যে কে কোন্‌টির রচয়িতা এ নিয়ে চূড়ান্ত সিদ্ধান্ত এখনো ঠিক হয়নি। কেননা, কয়েকটি রচনা সম্পর্কে অদ্যাবধি নিঃসংশয় হওয়া যায়নি। এখানে সে-ধরনের কয়েকটি রচনা স্থান পেয়েছে। তাদের যথার্থ লেখক-পরিচয় বার করবার প্রয়াসও অবশ্য করা হয়েছে।

'বঙ্গদর্শনে'র নির্বাচিত প্রবন্ধাবলী প্রকাশ করা খুবই উল্লেখযোগ্য কাজ। এতোদিন এ ধরনের সাধু প্রয়াস চোখে পড়েনি। পাশ্চাত্ত্য সাহিত্যে এ-ধরনের সংকলন প্রকাশের নজির আছে। একসময় স্বনামধন্য সিটন্‌-কার 'ক্যালকাটা রেভিয়্যু' থেকে নির্বাচিত প্রবন্ধাবলী সম্পাদনা করে প্রকাশ করেছিলেন। প্রেসিডেন্সি কলেজে আমার প্রাক্তন ছাত্র শ্রীমান রবীন্দ্র গুপ্ত 'বঙ্গদর্শন' নিয়ে গবেষণা করে যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয় থেকে ডক্টরেট ডিগ্রী লাভ করেছেন। তিনি এই সংকলনগ্রন্থে রচনানির্বাচনে ও সম্পাদনায় দায়িত্বশীল ভূমিকা গ্রহণ করেছেন। আমি আশা রাখি এই নির্বাচিত রচনাসংকলন "আপামর সাধারণের পাঠোপ-যোগিতাসাধনে" অক্ষম হবে না।

শ্রীদেবীপদ ভট্টাচার্য

ভূমিকা

১৮৭২ সালের এপ্রিলে বঙ্গদর্শনের প্রথম প্রকাশ। প্রথম চারবছর বঙ্কিমের সম্পাদনায় এবং একবছর (১২৮৩) বন্ধ থাকার পরে অগ্রজ সঞ্জীবের সম্পাদনায় আরো পাঁচবছর বঙ্গদর্শন চলেছিল। তারপর চন্দ্রনাথ বসুর সহযোগিতায় শ্রীশচন্দ্র মজুমদার মাত্র চার সংখ্যা প্রকাশ করেছিলেন। বঙ্কিমের নির্দেশমত তারপর শ্রীশচন্দ্র পত্রিকা বন্ধ করে দেন। কারণ 'পশুপতি-সম্বাদ'। নবপর্যায়ে বঙ্গদর্শনের সম্পাদনভার গ্রহণ করে রবীন্দ্রনাথ পাঠকের কাছে যে 'নিবেদন' প্রচার করেন, এই সূত্রে তাও আলোচ্য। তিনিও বঙ্কিম-সঞ্জীবপর্বের বঙ্গদর্শনের আদর্শই সর্বতোভাবে অক্ষুণ্ণ রাখতে চেয়েছেন। পুরনো বঙ্গদর্শনের লেখক ও পাঠকগোষ্ঠীর সহযোগিতা ও সমালোচনা আকাঙ্ক্ষা করেছেন। 'সম্পাদকীয় বিবৃতি' অংশে বঙ্কিমের পাশে তাই রবীন্দ্র-নিবেদনও মুদ্রিত হয়েছে ঐতিহাসিক যোগসূত্ররূপে।

১৯৭২ সালে বঙ্গদর্শনের 'শতবর্ষ' উদযাপিত হয়েছে। তিনজন গবেষক বাংলা সাহিত্যে বঙ্গদর্শন-পর্বের স্থায়ী দান সম্পর্কে মূল্যায়ন করেছেন। তবু অনেক কথা এখনো বাকী রয়ে গেছে। আরো গবেষণার প্রয়োজন। কারণ বঙ্গদর্শন নিছক একটি সাহিত্য-সংস্কৃতির মাসিকপত্র নয়, একটি যুগচেতনার ধারক, একটি দৃষ্টিপ্রদীপের আলো। সব সংশয়, সব অন্ধকার ছিন্ন করে তার প্রকাশ। এর পূর্বে বঙ্গদূত বা বেঙ্গল হেরাল্ড, প্রভাকর, তত্ত্ববোধিনী, বিবিধার্থ সংগ্রহ, মাসিকপত্র প্রভৃতি পত্র-পত্রিকায় নতুন যুগের কথা প্রকাশ পেয়েছিল। কিন্তু এগুলির মধ্যে মাসিক প্রভাকর ছাড়া সাহিত্যের প্রাধান্য ছিল না, সমাজ-ধর্ম বিষয়েই ছিল সমধিক মনোযোগ। বঙ্গদর্শনে বঙ্কিম 'আপনার শিক্ষাগর্বে বঙ্গভাষার প্রতি অনুগ্রহ প্রকাশ করিলেন না, একেবারে শ্রদ্ধা প্রকাশ করিলেন। যত কিছু আশা আকাঙ্ক্ষা সৌন্দর্য প্রেম মহত্ত্ব ভক্তি স্বদেশানুরাগ, শিক্ষিত পরিণত বুদ্ধির যত-কিছু শিক্ষালব্ধ চিন্তাজাত ধনরত্ন, সমস্তই অকুণ্ঠিতভাবে বঙ্গ-ভাষার হস্তে অর্পণ করিলেন। পরম সৌভাগ্যগর্বে সেই অনাদরমলিন ভাষার মুখে সহসা অপূর্ব লক্ষ্মীশ্রী প্রস্ফুটিত হইয়া উঠিল।' এখানেই বঙ্গদর্শনের অনন্যতা। 'পশ্চিম-মহাদেশ হতে আহরিত নূতন সাহিত্যরস' পরিবেশন সম্পর্কে রবীন্দ্রনাথ যথার্থ ঐতিহাসিকের মত বলেছেন: "পূর্বে কী ছিল এবং পরে কী পাইলাম তাহা দুই কালের সন্ধিস্থলে দাঁড়াইয়া আমরা এক মুহূর্তেই অনুভব করিতে পারিলাম। কোথায় গেল সেই অন্ধকার, সেই একাকার, সেই সুপ্তি—কোথায় গেল সেই 'বিজয়বসন্ত', সেই 'গোলেবকাওলি', সেই বালকভুলানো

কথা—কোথা হইতে আসিল এত আলোক, এত আশা, এত সঙ্গীত, এত বৈচিত্র্য ।”

'সেই সর্বব্যাপী প্রফুল্লতা এবং আনন্দ-উৎসব' আজ নেই। ইতিহাসের নিয়মেই অন্তর্হিত হয়েছে। রবীন্দ্রনাথ এই উৎসবমুখর সৃষ্টিপ্রাচুর্যের কথা মনে রেখে অন্যত্র বলেছেন, 'এমন সময়ে বঙ্গদর্শন মাসিকপত্র দেখা দিল। তখন থেকে বাঙালির চিত্তে নব্য বাংলা সাহিত্যের অধিকার দেখতে দেখতে অবারিত হল সর্বত্র।' সাধারণী-সম্পাদক এবং বঙ্গদর্শনের অন্যতম লেখক অক্ষয়চন্দ্র সরকার লিখেছেন : 'যেদিন বঙ্কিমবাবু কতিপয় বন্ধু লইয়া বঙ্গদর্শন প্রকাশ করিলেন, সেইদিন বঙ্গভাষা-নদীতে উন্নতির কোটালে বান ডাকিয়া উঠিল ; ক্রমশঃ উন্নতির স্রোত তরতরবেগে ছুটিতে লাগিল।'

দুই

আরম্ভের পূর্বেও আরম্ভ আছে। নতুবা দুর্গেশনন্দিনী কপালকুণ্ডলা মৃণালিনী রচনাকালে কেন বঙ্গদর্শনের পরিকল্পনা হল না ? রমেশচন্দ্র দত্ত, গুরুদাস বন্দ্যোপাধ্যায়, রাজকৃষ্ণ মুখোপাধ্যায়, রামদাস সেন প্রমুখ লেখকেরা বঙ্গদর্শন প্রকাশের পূর্বেই লেখনী ধরেছেন, কেউ ইংরেজিতে, কেউ বাংলায়, এবং রামদাস সেন ছাড়া সকলেই কলকাতার 'কৃতবিদ্য' ব্যক্তি। তবে কেন তাঁরা মিলে কলকাতা থেকেই ইতিপূর্বে বঙ্গদর্শন প্রকাশ করেন নি ?

সৌভাগ্যবশতঃ একই সময়ে গঙ্গাচরণ-অক্ষয়চন্দ্র, গুরুদাস, লালবিহারী, বঙ্কিম, রমেশ, দীনবন্ধু, রাজকৃষ্ণ, তারাপ্রসাদ প্রমুখ বহরমপুরে মিলিত হন। গঙ্গাচরণ ও বৈকুণ্ঠনাথ সেনের নায়কত্বে বহরমপুর কাছারিতে বসত 'নবরত্ন-সভা'। আর ছিল গ্রাণ্ট হল ক্লাব এবং রামদাস সেনের লাইব্রেরি। লোহারাম শিরোমণি, রামগতি ন্যায়রত্ন ও কালীবর বেদান্তবাগীশের মত প্রাচ্যবিদ্যাবিশারদ ব্যক্তিও ছিলেন। কলকাতার শিক্ষিতসমাজ বহরমপুরে গিয়ে অন্তরঙ্গ, একান্ত-নিবিষ্ট হতে পেরেছিলেন। বঙ্গদর্শনের পত্রসূচনায় ব্যক্ত 'উদ্দেশ্য' এবং গ্রাণ্ট হল ক্লাবের উদ্দেশ্য এক ছিল। লালবিহারী ও বঙ্কিমের মধ্যে মতবিরোধ থাকলেও একই উদ্দেশ্য নিয়ে প্রকাশিত হয় বাংলায় বঙ্গদর্শন ও ইংরেজিতে বেঙ্গল ম্যাগাজিন।

বিষয়ের গুরুত্ব ও রচনাগৌরবের দিক থেকে নয় খণ্ড বঙ্গদর্শনই পুনর্মুদ্রিত হতে পারে। এ কালের পাঠকের কাছে তার আবেদন এখনও পুরনো হয়নি। বঙ্গদর্শনের সাহিত্য ইতিহাস দর্শন প্রভৃতি আলোচনা, সমালোচনার আদর্শ এবং সংযম, রুচি ও অতন্দ্র মানসিকতা আমাদের অনুকরণীয়। বঙ্গদর্শনের চেয়ে

উন্নতমানের, সারাদেশে সাড়া-জাগানো কোন সাহিত্যপত্র আজো বাংলা ভাষায় প্রকাশিত হয়নি। তাই ন্যাশনাল লিটারেচার কোম্পানির উদ্যোগে অধ্যাপক মণীন্দ্রমোহন বসু বঙ্গদর্শন পুনর্মুদ্রণ করেন। সে বঙ্গদর্শন-ও আজ দুষ্প্রাপ্য। অথচ মননশীল পাঠকগোষ্ঠীর কাছে এখনো বঙ্গদর্শনের সমান চাহিদা। কিন্তু কাগজের এই দুর্মূল্যতার দিনে সে কাজ করা কঠিন। তাছাড়া, যে বঙ্কিমচন্দ্র বঙ্গদর্শনের প্রাণ—তাঁর রচনাবলীর একাধিক সংস্করণ প্রচলিত। সেগুলির পুনর্মুদ্রণ অপরিহার্য নয়। অন্যপক্ষে, প্রফুল্লচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়ের 'বাল্মীকি ও তৎসাময়িক বৃত্তান্ত', তারাপ্রসাদ চট্টোপাধ্যায়ের 'বঙ্গোন্নয়ন' বা লালমোহন বিদ্যানিধির সামাজিক ইতিহাস-নিবন্ধগুলি আর যথাযথ পুনর্মুদ্রণের প্রয়োজন নেই। কিন্তু তাঁদের রচনাবলী বহুকাল দুষ্প্রাপ্য বলে বিস্মৃতির অন্ধকারে লীন—এ পরিস্থিতিও দুর্ভাগ্যজনক। রাজকৃষ্ণের 'নানা প্রবন্ধ' বা রামদাস সেনের 'ঐতিহাসিক রহস্য', 'ভারতরহস্য' এককালে বহুল প্রচলিত ছিল, এখন সেসব বইও দুর্লভ। অক্ষয়চন্দ্র সরকারের দুই খণ্ড 'রচনা-সম্ভার' বেরিয়েছে। তারাপ্রসাদ চট্টোপাধ্যায়ের কোন লেখাই গ্রন্থাকারে প্রকাশিত হয়নি। পূর্ণচন্দ্র বসু বহু পত্রপত্রিকায় প্রবন্ধ লিখেছেন। একদা তাঁর যথেষ্ট খ্যাতি ছিল। আক্ষেপের বিষয়, সাহিত্যসাধক-চরিতমালায় তিনি আজো স্থান পাননি।

সেইজন্যই সুধী ব্যক্তিরা মাঝে মাঝে ইচ্ছা প্রকাশ করেছেন, বঙ্গদর্শন নয় খণ্ড থেকে একালের বিচারে তাৎপর্যপূর্ণ প্রবন্ধগুলির একটি সংকলন প্রকাশিত হোক। সেদিকে দৃষ্টি রেখে 'বঙ্গদর্শন : নির্বাচিত রচনাসংগ্রহ' গ্রন্থের পরিকল্পনা করা হয়েছে।

কি কি সূত্র অনুসারে বক্ষ্যমান সংগ্রহে রচনাগুলি গৃহীত হয়েছে, বিবৃত করা গেল :

(১) বিষয় অনুসারে কয়েকটি শ্রেণীবিভাজন করা হয়েছে। মোট আটটি প্রসঙ্গে বিভাগগুলি চিহ্নিত—সম্পাদকীয় বিবৃতি, ইতিহাস, সমাজ, সাহিত্য, দর্শন প্রসঙ্গ ইত্যাদি।

(২) অপরিচিত বা অল্পপরিচিত লেখকের ভাল রচনার উপর গুরুত্ব দেওয়া হয়েছে।

সঞ্জীবচন্দ্রের 'যাত্রা সমালোচনা' অসাধারণ রচনা। কিন্তু 'সঞ্জীব-রচনাবলী' এখন দুর্লভ নয়; রচনাটি নানা গ্রন্থে মুদ্রিত হয়েছে বলেও এখানে অন্তর্ভুক্ত হয়নি। এটি বর্জন নয়, প্রয়োজনে স্থানসংকোচন। 'বৈজিক তত্ত্ব' সঞ্জীবের গূঢ় সন্ধিৎসার পরিচায়ক। যেহেতু বিজ্ঞানবিষয়ে কোন লেখাই নেওয়া হয়নি, তাই 'বৈজিক তত্ত্ব' বাদ গেছে। ছোট ইন্দিরা ও রাজসিংহ বঙ্কিমরচনাবলীতে

নেই ; অথচ শিল্পী বঙ্কিমের মনোজীবনের বিবর্তনের দিক থেকে কাহিনী দুটির প্রথম ও পরিণত উভয়রূপের তুলনা কৌতূহলোদ্দীপক। তাই বঙ্গদর্শনে প্রকাশিত রূপে এখানে যথাযথ রাখা হয়েছে।

(৩) যাঁরা মূলতঃ বঙ্গদর্শন-গোষ্ঠীর লেখক নন, কিন্তু দু-একটি ভালো প্রবন্ধ লিখেছেন, তাঁদের কয়েকটি লেখাও স্থান পেয়েছে। যেমন, দীননাথ বন্দ্যোপাধ্যায়ের 'উৎকলের প্রকৃতাবস্থা', যোগেন্দ্রচন্দ্র ঘোষের 'একান্নবর্তী পরিবার', পূর্ণচন্দ্র বসুর 'কুন্দনন্দিনী'।

(৪) একবিষয়ের একাধিক রচনার মধ্যে বিশেষ উল্লেখ্য প্রবন্ধটি স্থান পেয়েছে। রাজকৃষ্ণের 'কোমৎ দর্শন' প্রবন্ধ হিসাবে পূর্ণাঙ্গ ও তথ্যবহুল, কিন্তু প্রথম বর্ষের 'কোম্‌ৎ দর্শন' বঙ্কিমের রচনা বলে অনুমান করি। 'চার্বাক দর্শন' বিষয়ে আলোচনা অল্প, তাই বঙ্কিমের 'সাংখ্যদর্শন' অনবদ্য হলেও 'চার্বাক দর্শন'-ই অন্তর্ভুক্ত।

(৫) দেশাত্মবোধের প্রথম পর্যায়ে স্বভাবতঃ ঐতিহ্যগৌরব প্রাধান্য পায়। তাই 'ইতিহাসপ্রসঙ্গ', 'সমাজপ্রসঙ্গ' ছাড়াও 'সংস্কৃত সাহিত্যপ্রসঙ্গ' আছে। কেননা বেদ ও বেদব্যাখ্যা বা কালিদাস-বাণভট্ট-শ্রীহর্ষচর্চার মূলেও সেই ঐতিহ্য-প্রীতি—মেকলের অপবাদের জবাব দেবার চেষ্টা। বেথুন সোসাইটিতে উইলিয়ম ক্লার্ক প্যাট্রিকের সঙ্গীত সহযোগে আলোচনা শিক্ষিত সমাজে প্রতিক্রিয়া জাগিয়েছিল। সেই প্রতিক্রিয়ার সূত্র মেলে রামদাস সেনের 'হিন্দুদিগের নাট্যাভিনয়' প্রবন্ধে। 'প্রাচীন ভারতের নাট্যশাস্ত্র' তার সম্পূরক।

(৬) কয়েকটি প্রবন্ধ বঙ্কিমের লেখা বলে অনুমান করি। যেমন 'রস', 'অশ্লীলতা', 'রসিকতা', 'জাত-ভিক্ষুক'[১]। তাই এগুলি সমাদরে স্থান পেয়েছে।

তিন

কয়েকটি রচনার বিশেষ পরিচয় দেওয়া যেতে পারে। চন্দ্রনাথ বসুর 'শকুন্তলা-তত্ত্ব' এককালে খুব জনপ্রিয় ছিল। এমনকি এর অংশবিশেষ আবৃত্তির জন্য নির্ধারিত হত। পরে ব্রাহ্মবিদ্বেষী গোঁড়া হিন্দুরূপে তিনি বেশী পরিচিত হন। কঃ পন্থা, হিন্দুত্ব, সাবিত্রীতত্ত্ব এবং পৃথিবীর সুখদুঃখ বইতে সেই হিন্দু-ভাবই প্রবল। রবীন্দ্রনাথের সঙ্গে তাঁর মতভেদের কথাও সুবিদিত। কিন্তু তাঁর রসজ্ঞতা ও বিশ্লেষণী শক্তি প্রথম শ্রেণীর সমালোচকের যোগ্য। তার কিছু নিদর্শন আছে 'অভিজ্ঞান শকুন্তল' ও 'ফুলের ভাষা'-য়। লক্ষণীয় যে,

১। বঙ্কিমচন্দ্রের একটি অজ্ঞাত রচনা। চতুষ্কোণ, মাঘ ১৩৭৮। পৃ ৮৬৯-৭২

রবীন্দ্রনাথের অনবদ্য 'শকুন্তলা' প্রবন্ধে উদ্ধৃত কিছু অংশ এবং যুক্তিক্রম চন্দ্রনাথের রচনাতেও আছে। 'ফুলের ভাষা' কমলাকান্তী স্টাইলের প্রভাবযুক্ত।

এই প্রসঙ্গে অক্ষয়চন্দ্র সরকারের 'দশমহাবিদ্যা' উল্লেখ্য। তিনি পৌরাণিক দশমহাবিদ্যাকে নতুন আলোয় দেখেছেন। বস্তুতঃ 'মা যা ছিলেন', 'যা হইয়াছেন', 'যা হইবেন'—এই তিন পর্যায়ে দেশমাতৃকামূর্তি এখানেই প্রথম পাওয়া গেল। 'তুলনায় সমালোচন', 'গ্রাব্', 'উদ্দীপনা', 'যুক্তিসিদ্ধ সন্দেহবাদ' প্রভৃতি রচনায় তিনি পাঠকচিত্ত জয় করেছিলেন[২]।

বঙ্গদর্শন 'দেশব্যাপী ভাবের আন্দোলন' সৃষ্টি করতে চেয়েছিল। তাই সম্পাদকের সঙ্গে মতৈক্য না হলেও মননশীল প্রবন্ধ ছাপা হয়েছে। যেমন, চন্দ্রশেখর মুখোপাধ্যায়ের 'সতীদাহ' এবং রামদাস সেনের 'শ্রীহর্ষ' বা কালিদাস। বঙ্গদর্শনেরই অন্য দুই লেখক নগেন্দ্রনাথ চট্টোপাধ্যায় (ন. না.) এবং রাজকৃষ্ণ মুখোপাধ্যায় চন্দ্রশেখর ও রামদাসের মত খণ্ডন করেন। 'কালিদাস' প্রবন্ধে প্রাণনাথ পণ্ডিত রামদাসের আলোচনার প্রতিবাদ করেন। দুটি রচনাই বর্তমান গ্রন্থে আছে। তবে প্রাণনাথের প্রবন্ধের প্রথম পর্যায় মাত্র আছে। দ্বিতীয় পর্যায় বেরিয়েছিল দ্বিতীয় বর্ষ (১২৮০) অগ্রহায়ণে। ন'বছরের পূর্ণ সূচীপত্র দেওয়া হল। আগ্রহী পাঠক সুযোগমত কৌতূহল চরিতার্থ করতে পারবেন।

চার

সংস্কৃত অলংকারশাস্ত্রে রসের নিষ্পত্তি নিয়ে মতভেদ প্রবল। 'নিষ্পত্তি' অর্থে 'অনুমিতি', 'উৎপত্তি', 'ভোগীকৃতি' এবং 'অভিব্যক্তি' বোঝানো হয়েছে। অভিব্যক্তিবাদেই রসতত্ত্বের প্রতিষ্ঠা। কিন্তু অলংকারতত্ত্ব বা রসবাদ সাহিত্য-ব্যাখ্যায় যথেষ্ট নয়। 'উত্তরচরিতে' বঙ্কিম স্পষ্টতঃ এ-ধারণা ব্যক্ত করেছেন। 'রস' প্রবন্ধটিরও তাই সার কথা। লেখাটির মুন্সীয়ানা এবং উত্তরচরিতের সঙ্গে আভ্যন্তরীণ সাদৃশ্যে প্রমাণ হয় লেখক বঙ্কিমচন্দ্র।

'অশ্লীলতা' ও 'রসিকতা' একই কলমে লেখা। গ্রন্থসমালোচনায় অযোগ্য লেখকদের প্রতি সম্পাদকের যে-ধরণের কটাক্ষ আছে, 'রসিকতা'য় তার প্রতিধ্বনি শোনা যায় এবং 'দ্রৌপদী' প্রবন্ধের ভাবৈক্য আছে 'অশ্লীলতা'য়। রসিক পাঠকের মতামতের জন্য এই তিনটি প্রবন্ধ সন্নিবেশিত হল।

সতেরজন অশ্বারোহী বঙ্গবিজয় করে, এই ধারণা বঙ্কিমের বাস্তববোধকে তৃপ্ত করেনি। 'মৃণালিনী' উপন্যাসেই তিনি এর প্রতিবাদ জানিয়েছেন। কিন্তু তথ্যপ্রমাণযোগে সেই ধারণাকে পরিস্ফুট করেছেন 'বাঙ্গালার কলঙ্ক' প্রবন্ধে।

২। বঙ্কিমচন্দ্রের মাতৃচিন্তা, শারদীয় বিংশ শতাব্দী, ১৩৭২

একই বক্তব্য রাজকৃষ্ণের 'ঐতিহাসিক ভ্রমে'। মিনহাজউদ্দীনের বক্তব্য ছাড়া আরো দুটি ভ্রম—(ক) বাঙালী কখনো বিদেশ জয় করেনি, (খ) হিন্দুরা মুসলমান আমলে ছিলেন 'করসংগ্রাহক রাজকর্মচারী' মাত্র—তিনি নিরসন করেছেন।

'ভারতবর্ষীয় আর্যজাতির আদিম অবস্থা' ধারাবাহিক প্রকাশিত বিপুলায়তন রচনা। 'উপক্রমণিকা' অংশ মাত্র গৃহীত হয়েছে। কেবল মনুসংহিতা অবলম্বনে লালমোহন আধুনিক যুগোপযোগী পন্থায় ইতিহাস লিখেছেন। 'সম্বন্ধনির্ণয়' গ্রন্থের জাতিতত্ত্বনির্ণয়ে কুলজী গ্রন্থ এবং স্মৃতিকথার প্রাধান্য। সেখানে প্রামাণিকতা ক্ষুণ্ণ। 'হিন্দুদিগের আগ্নেয়াস্ত্র' এর পরিপূরক। রামদাসের ভিত্তি শুক্রনীতি। রাজকৃষ্ণের 'ভারতমহিমা' একই প্রেরণা-উৎসের সৃষ্টি। লক্ষণীয় যে, 'বাঙ্গালার ইতিহাস' (রাজকৃষ্ণ) ছাড়া সেকালের আর কোন গ্রন্থে ধারাবাহিক বাংলার বা ভারতের ইতিহাস রচনার প্রয়াস নেই। যাঁর যেদিকে প্রবণতা, সেই বিষয়ে তিনি অনুসন্ধান, অনুশীলন ও গবেষণা করেছেন। কোন বিশেষ যুগ বা ঐতিহাসিক মত সম্পর্কে আলোচনাকে কেন্দ্রীভূত করাই তাঁদের লক্ষ্য ছিল। তার ফল ভালোই হয়েছে। সমগ্র ইতিহাস রচনার পূর্বে সংশয়নিরসন এবং অভ্রান্ত তথ্যসংগ্রহের প্রয়োজন। বঙ্গদর্শনের লেখকেরা সে কাজ পরম নিষ্ঠার সঙ্গে সম্পন্ন করেছেন।

সাহিত্যপ্রসঙ্গ ॥ 'রস' বিষয়ে পূর্বেই বলা হয়েছে। 'উদ্দীপনা' সমাজ-সমালোচনা নামে আখ্যাত হলেও Art of Oratory বা বাগ্মিতা, ওজোময়ী ভাষণের সাহিত্যমূল্যই বিচার্য। রসের আওতায় আনা যায় না এমন মনোরম রচনা 'উদ্দীপনা'-গুণে উৎকৃষ্ট হতে পারে। 'তুলনায় সমালোচন' সাহিত্যবিচারে নতুন পন্থার সাক্ষ্যবহ। বাংলায় উপন্যাসের শিল্প-মূল্য বিচারের প্রথম প্রয়াস 'নবেল বা কথাগ্রন্থের উদ্দেশ্য'। নাট্যশাস্ত্র অনুযায়ী নাট্যলক্ষণের শ্রেণীভিত্তিক পরিচয় পাই 'হিন্দুদিগের নাট্যাভিনয়' প্রবন্ধে। সংক্ষিপ্ত পরিসরে শাস্ত্রোক্ত নাট্যপরিচয়ের দিক থেকে আজো রচনাটির মূল্য কমে নি। 'বাঙ্গলার সাহিত্যে' সমকালীন সাহিত্য-প্রয়াসের সাধারণ ত্রুটি এবং 'বঙ্গীয় সাহিত্য সমাজে' আছে বেঙ্গল একাডেমি অফ লিটারেচার বা বঙ্গীয় সাহিত্যপরিষদ গঠনের খসড়া-প্রস্তাব।

সমাজপ্রসঙ্গ ॥ প্রত্যক্ষবাদীরা (Positivists) সকলেই একান্নবর্তী পরিবারের পক্ষপাতী'[৩]। কারণ পরিবার সোশ্যাল অর্গানিজমের অংশ। কিন্তু

৩। পজিটিভিস্ট চিন্তা সম্পর্কে বিশদ আলোচনা আছে এই লেখকের প্রকাশমান 'বঙ্গদর্শন ও বাংলা সাহিত্য' গ্রন্থে

যোগেন্দ্রচন্দ্র একান্নবর্তী পরিবার ভেঙে পড়ার যথেষ্ট কারণও দেখিয়েছেন। 'একান্নবর্তী' পরিবারে 'কনিষ্ঠেরা পদে পদে কেবল জ্যেষ্ঠের দোষই দেখেন, কিন্তু গুণের বিষয় কেহই মনে করেন না। সকলেই পরামর্শ দিতে প্রস্তুত, কিন্তু কি জ্যেষ্ঠ কি কনিষ্ঠ, তাহা গ্রহণ করিতে কেহই ব্যগ্র নহেন।' বঙ্কিম-রচনাবলীতে গৃহীত 'বহুবিবাহে'র পাঠ পরিমার্জিত। এখানে কিঞ্চিৎ ঝাঁজ আছে। কারণ বঙ্কিমের মতে, 'যাঁহারা লিপিকার্যের সুসভ্য প্রণালী তাদৃশ অবগত নহেন, বিদ্যাসাগর যে তাঁহাদিগের অনুকরণে প্রবৃত্ত হইয়াছেন'! 'সতীদাহ' সতীদাহের সমর্থনে রচিত। সম্পাদকের নোট : 'স্বাধীন সমালোচনা ভিন্ন উন্নতি নাই। সেজন্যও বটে এবং লেখকের লিপিচাতুর্যে মুগ্ধ হইয়াও বটে আমরা এ প্রবন্ধ পত্রস্থ করিলাম।' এর প্রতিবাদ করেন নগেন্দ্রনাথ চট্টোপাধ্যায় (আষাঢ় ১২৮৪)। রচনাটি 'বিবিধ সন্দর্ভ' গ্রন্থের অন্তর্ভুক্ত (পৃঃ ৯৯-১১৬)। চন্দ্রশেখর 'সারস্বতকুঞ্জে' নগেন্দ্রনাথের প্রতি কৃতজ্ঞতা স্বীকার করেছেন। নগেন্দ্রনাথের রচনাটি মুদ্রিত করা গেলে 'সতীদাহ' বিষয়ে পূর্ণাঙ্গ চিত্র পাওয়া যেত। তারাপ্রসাদের 'বঙ্গোন্নয়ন' ধারাবাহিক প্রবন্ধ। এল. পি. ওয়াইন এবং আরো অনেকে বেথুন সোসাইটিতে আলোচনাক্রমে প্রমাণ করতে চেষ্টা করেন, বাঙালীর স্বাস্থ্য স্বশাসনের উপযুক্ত নয়। তার উত্তরে তারাপ্রসাদ বাঙালীর বৈশিষ্ট্যের ঐতিহাসিক ভৌগোলিক কারণ নির্দেশ করেছেন।

অন্য প্রসঙ্গগুলির স্বতন্ত্র পরিচয় বাহুল্যবোধে পরিত্যক্ত হল। এ বিষয়ে 'লেখক-পরিচিতি' দ্রষ্টব্য।

বঙ্গদর্শন বিষয়ে গবেষণায় অনেকের কাছে আন্তরিক আনুকূল্য ও সহযোগিতা পেয়েছি। তাঁদের মধ্যে আচার্য শশিভূষণ দাশগুপ্ত, আচার্য জনার্দন চক্রবর্তী, ডঃ দেবীপদ ভট্টাচার্য, শ্রীযুক্ত শ্যামাদাস বন্দ্যোপাধ্যায় ও শ্রীযুক্ত গোপীনাথ রায়ের নাম সর্বাগ্রে স্মরণীয়। ডঃ রথীন্দ্রনাথ রায়, ডঃ ক্ষেত্র গুপ্ত, ডঃ অরুণকুমার বসু, ডঃ বিষ্ণু বসু, ভবানী দত্ত ও আশালতা রায় সর্বদা একাজে আমায় উৎসাহিত করেছেন। অধ্যাপক মৃদুলকান্তি বসুর একটি প্রবন্ধ পড়ে উপকৃত হয়েছি। শ্রদ্ধাস্পদ ডঃ দেবীপদ ভট্টাচার্যের তত্ত্বাবধানেই বঙ্গদর্শনবিষয়ক গবেষণা সম্পন্ন হয়েছিল। গুরু-ঋণ পিতৃ-ঋণের মতই অপরিশোধ্য। সর্বোপরি এই রচনাসংগ্রহের একটি মুখবন্ধ লিখে দিয়ে তিনি বইটির গৌরব বাড়িয়েছেন। শ্রীযুক্ত রথীন্দ্রকান্ত ঘটক চৌধুরী তাঁর বঙ্গদর্শনের সমগ্র

সেটটি ব্যবহার করতে দিয়ে আমাদের যথেষ্ট সহায়তা করেছেন, তাঁকে ধন্যবাদ জানাই। চারুপ্রকাশের পক্ষে শ্রীযুক্ত সুকুমার দাস এবং শ্রীযুক্ত অশোক ঘোষ বইটিকে সর্বাঙ্গসুন্দর করার জন্য আন্তরিক প্রযত্ন নিয়েছেন। সেজন্য অকুণ্ঠ সাধুবাদই তাঁদের প্রাপ্য।

রবীন্দ্র গুপ্ত

১/সম্পাদকীয় বিবৃতি

পত্রসূচনা

যাঁহারা বাঙ্গালা ভাষায় গ্রন্থ বা সাময়িক পত্র প্রচারে প্রবৃত্ত হয়েন, তাঁহাদিগের বিশেষ দুরদৃষ্ট। তাঁহারা যত যত্ন করুন না কেন, দেশীয় কৃতবিদ্য সম্প্রদায় প্রায়ই তাঁহাদের রচনাপাঠে বিমুখ। ইংরাজিপ্রিয় কৃতবিদ্যগণের প্রায় স্থির-জ্ঞান আছে যে, তাঁহাদের পাঠের যোগ্য কিছুই বাঙ্গালা ভাষায় লিখিত হইতে পারে না। তাঁহাদের বিবেচনায়, বাঙ্গালা ভাষার লেখকমাত্রেই হয়ত বিদ্যা-বুদ্ধিহীন, লিপিকৌশলশূন্য; নয়ত ইংরাজি গ্রন্থের অনুবাদক। তাঁহাদের বিশ্বাস যে, যাহা কিছু বাঙ্গালা ভাষায় লিপিবদ্ধ হয়, তাহা হয়ত অপাঠ্য, নয়ত কোন ইংরাজি গ্রন্থের ছায়ামাত্র; ইংরাজিতে যাহা আছে, তাহা আর বাঙ্গালায় পড়িয়া আত্মাবমাননার প্রয়োজন কি? সহজে কালো চামড়ার অপরাধে ধরা পড়িয়া আমরা নানারূপ সাফাইয়ের চেষ্টায় বেড়াইতেছি, বাঙ্গালা পড়িয়া কবুল-জবাব কেন দিব!

ইংরাজিভক্তদিগের এই রূপ। সংস্কৃতজ্ঞ পাণ্ডিত্যাভিমানীদিগের "ভাষায়" যেরূপ শ্রদ্ধা, তদ্বিষয়ে লিপিবাহুল্যের আবশ্যকতা নাই। যাঁহারা "বিষয়ী লোক", তাঁহাদিগের পক্ষে সকল ভাষাই সমান। কোন ভাষার বহি পড়িবার তাঁহাদের অবকাশ নাই। ছেলে স্কুলে দিয়াছেন, বহি পড়া আর নিমন্ত্রণ রাখার ভার ছেলের উপর। সুতরাং বাঙ্গালা গ্রন্থাদি এক্ষণে কেবল নর্মাল স্কুলের ছাত্র, গ্রাম্য বিদ্যালয়ের পণ্ডিত, অপ্রাপ্তবয়ঃ পৌরকন্যা, এবং কোন নিষ্কর্মা রসিকতা-ব্যবসায়ী পুরুষের কাছেই আদর পায়। কদাচিৎ দুই-একজন কৃতবিদ্য সদাশয় মহাত্মা বাঙ্গালা গ্রন্থের বিজ্ঞাপন বা ভূমিকা পর্যন্ত পাঠ করিয়া বিদ্যোৎসাহী বলিয়া খ্যাতিলাভ করেন।

লেখাপড়ার কথা দূরে থাক, এখন নব্য সম্প্রদায়ের মধ্যে কোন কাজই বাঙ্গালায় হয় না। বিদ্যালোচনা ইংরাজিতে। সাধারণের কার্য, মিটিং,

লেকচর, এড্রেস, প্রোসিডিংস সমুদায় ইংরাজিতে। যদি উভয় পক্ষ ইংরাজি জানেন, তবে কথোপকথনও ইংরাজিতেই হয়; কখন ষোলো আনা, কখন বারো আনা ইংরাজি। কথোপকথন যাহাই হউক, পত্রলেখা কখনই বাঙ্গালায় হয় না। আমরা কখনও দেখি নাই যে, যেখানে উভয় পক্ষ ইংরাজির কিছু জানেন, সেখানে বাঙ্গালায় পত্র লেখা হইয়াছে। আমাদিগের এমনও ভরসা আছে যে, অগৌণে দুর্গোৎসবের মন্ত্রাদিও ইংরাজিতে পঠিত হইবে।

ইহাতে কিছুই বিস্ময়ের নাই। ইংরাজি একে রাজভাষা, অর্থোপার্জনের ভাষা, তাহাতে আবার বহু বিদ্যার আধার, এক্ষণে আমাদের জ্ঞানোপার্জনের একমাত্র সোপান; এবং বাঙ্গালিরা তাহার আশৈশব অনুশীলন করিয়া দ্বিতীয় মাতৃভাষার স্থলভুক্ত করিয়াছেন। এক্ষণে ইংরাজিতে না বলিলে ইংরাজে বুঝে না; ইংরাজে না বুঝিলে ইংরাজের নিকট মানমর্যাদা হয় না; ইংরাজের কাছে মানমর্যাদা না থাকিলে কোথাও থাকে না, অথবা থাকা না-থাকা সমান। ইংরাজ যাহা না শুনিল, তাহা অরণ্যে রোদন; ইংরাজ যাহা না দেখিল, তাহা ভস্মে ঘৃত।

আমরা ইংরাজি বা ইংরাজের দ্বেষক নহি। ইহা বলিতে পারি যে, ইংরাজ হইতে এদেশের লোকের যত উপকার হইয়াছে, ইংরাজি শিক্ষাই তাহার মধ্যে প্রধান। অনন্তরত্নপ্রসূতা ইংরাজি ভাষার যত অনুশীলন হয়, ততই ভাল। আরও বলি, সমাজের মঙ্গলজন্য কতকগুলি সামাজিক কার্য রাজপুরুষদিগের ভাষাতেই সম্পন্ন হওয়া আবশ্যক। আমাদিগের এমন অনেকগুলিন কথা আছে, যাহা রাজপুরুষদিগকে বুঝাইতে হইলে সেই সকল কথা ইংরাজিতেই বক্তব্য। এমন অনেক কথা আছে যে, তাহা কেবল বাঙ্গালির জন্য নহে, সমস্ত ভারতবর্ষ তাহার শ্রোতা হওয়া উচিত; সে সকল কথা ইংরাজিতে না বলিলে সমগ্র ভারতবর্ষ বুঝিবে কেন? ভারতবর্ষীয় নানা জাতি একমত, একপরামর্শী, একোদ্যোগ না হইলে, ভারতবর্ষের উন্নতি নাই। এই মতৈক্য, এই এক-পরামর্শিত্ব, একোদ্যম কেবল ইংরাজির দ্বারা সাধনীয়, কেননা এখন সংস্কৃত লুপ্ত হইয়াছে। বাঙ্গালি, মহারাষ্ট্রী, তৈলঙ্গী, পঞ্জাবী, ইহাদিগের সাধারণ মিলন-ভূমি ইংরাজি ভাষা। এই রজ্জুতে ভারতীয় ঐক্যের গ্রন্থি বাঁধিতে হইবে। যত দূর ইংরাজি চলা আবশ্যক, তত দূর চলুক। কিন্তু একেবারে ইংরাজ হইয়া বসিলে চলিবে না। বাঙ্গালি কখন ইংরাজ হইতে পারিবে না। বাঙ্গালি অপেক্ষা ইংরাজ অনেক গুণে গুণবান্ এবং অনেক সুখে সুখী; যদি এই তিন কোটি বাঙ্গালি, হঠাৎ তিন কোটি ইংরাজ হইতে পারিত, তবে সে মন্দ ছিল না! কিন্তু তাহার কোন সম্ভাবনা নাই। আমরা যত ইংরাজি পড়ি, যত

হইবে। যত দূর ইংরাজি চলা আবশ্যক, তত দূর চলুক। কিন্তু একেবারে ইংরাজ হইয়া বসিলে চলিবে না। বাঙ্গালি কখন ইংরাজ হইতে পারিবে না। বাঙ্গালি অপেক্ষা ইংরাজ অনেক গুণে গুণবান্ এবং অনেক সুখে সুখী; যদি এই তিন কোটি বাঙ্গালি, হঠাৎ তিন কোটি ইংরাজ হইতে পারিত, তবে সে মন্দ ছিল না! কিন্তু তাহার কোন সম্ভাবনা নাই। আমরা যত ইংরাজি পড়ি, যত ইংরাজি কহি, বা যত ইংরাজি লিখি না কেন, ইংরাজি কেবল আমাদিগের মৃত সিংহের চর্ম্ম স্বরূপ হইবে মাত্র। ডাক ডাকিবার সময়ে ধরা পড়িব। পাঁচ সাত হাজার নকল ইংরাজ ভিন্ন তিন কোটি সাহেব কখনই হইয়া উঠিবে না। গিল্‌টী পিতল হইতে খাঁটী রূপা ভাল। প্রস্তরময়ী সুন্দরী মূর্ত্তি অপেক্ষা, কুৎসিতা বন্যনারী জীবনযাত্রার সুসহায়। নকল ইংরাজ আপেক্ষা খাঁটী বাঙ্গালি স্পৃহনীয়। ইংরাজি লেখক, ইংরাজি বাচক · ায় হইতে নকল ইংরাজ ভিন্ন কখন খাঁটি বাঙ্গালির সমুদ্ভবের সম্ভাবনা নাই। যত দিন না সুশিক্ষিত জ্ঞানবন্ত বাঙ্গালিরা বাঙ্গালা ভাষায় আপন উক্তি সকল বিন্যস্ত করিবেন, তত দিন বাঙ্গালির উন্নতির সম্ভাবনা নাই।

এ কথা কৃতবিদ্য বাঙ্গালিরা কেন যে বুঝেন না, তাহা বলিতে পারি না। যে উক্তি ইংরাজিতে হয়, তাহা কয় জন বাঙ্গালির হৃদয়ঙ্গম হয়? সেই উক্তি বাঙ্গালায় হইলে কে তাহা হৃদয়গত না করিতে পারে? যদি কেহ এমন মনে করেন-যে, সুশিক্ষিতদিগের উক্তি কেবল সুশিক্ষিতদিগেরই বুঝা প্রয়োজন সকলের জন্য সে সকল কথা নয়, তবে তাঁহার বিশেষ ভ্রান্ত। সমগ্র বাঙ্গালির উন্নতি ন হইলে দেশের কোন মঙ্গল নাই। সমং দেশের লোক ইংরাজি বুঝে না, কস্মিন্ কাে বুঝিবে, এমত প্রত্যাশা করা যায় না কস্মিন্ কালে কোন বিদেশীয় রাজা দেশী ভাষার পরিবর্ত্তে আপন ভাষাকে সাধারণে বাচ্য ভাষা করিতে পারেন নাই। সুতরা বাঙ্গালায় যে কথা উক্ত না হইবে, তাহা তি কোটী বাঙ্গালি কখন বুঝিবে না, বা শুনি না। এখনও শুনে না; ভবিষ্যতে কো কালেও শুনিবে না। যে কথা দেশের সক লোকে বুঝে না, বা শুনে না, সে কথ সামাজিক বিশেষ কোন উন্নতির সম্ভাবঃ নাই।

এক্ষণে একটা কথা উঠিয়াছে, এডুকেশ "ফিল্‌টর ডৌন্" করিবে। এ কথার তাৎপ এই যে, কেবল উচ্চশ্রেণীর লোকেরা সুশিক্ষি হইলেই হইল, অধঃশ্রেণীর লোকদিগের পৃথ শিখাইবার প্রয়োজন নাই; তাহারা কা কাজেই বিদ্বান হইয়া উঠিবে। যেমন শোষ পদার্থের উপরি ভাগে জলসেক করিলে নিম্নস্তর পর্য্যন্ত সিক্ত হয়, তেমনি বিদ্যার জল, বাঙ্গালি জাতিরূপ শোষক-মৃত্তিক উপরিস্তরে ঢালিলে নিম্নস্তর অর্থাৎ ইতরলো পর্য্যন্ত ভিজিয়া উঠিবে। জল থাকা কথাটা একটু সরস হইয়াছে বটে, ইংরা শিক্ষার সঙ্গে এরূপ জলযোগ না হই আমাদের দেশের উন্নতির এত ভরসা থাকি না। জলও অগাধ, শোষকও অসংখ

ইংরাজি কহি, বা যত ইংরাজি লিখি না কেন, ইংরাজি কেবল আমাদিগের মৃত সিংহের চর্মস্বরূপ হইবে মাত্র। ডাক ডাকিবার সময় ধরা পড়িব। পাঁচ-সাত হাজার নকল ইংরাজ ভিন্ন তিন কোটি সাহেব কখনই হইয়া উঠিবে না। গিলটি পিতল হইতে খাঁটি রূপা ভাল। প্রস্তরময়ী সুন্দরী মূর্তি অপেক্ষা, কুৎসিতা বন্যনারী জীবনযাত্রার সুসহায়। নকল ইংরাজ অপেক্ষা খাঁটি বাঙ্গালি স্পৃহণীয়। ইংরাজি-লেখক, ইংরাজি-বাচক সম্প্রদায় হইতে নকল ইংরাজ ভিন্ন কখন খাঁটি বাঙ্গালির সমুদ্ভবের সম্ভাবনা নাই। যত দিন না সুশিক্ষিত জ্ঞানবন্ত বাঙ্গালিরা বাঙ্গালা ভাষায় আপন উক্তিসকল বিন্যস্ত করিবেন, তত দিন বাঙ্গালির উন্নতির সম্ভাবনা নাই।

এ কথা কৃতবিদ্য বাঙ্গালিরা কেন যে বুঝেন না, তাহা বলিতে পারি না। যে উক্তি ইংরাজিতে হয়, তাহা কয়জন বাঙ্গালির হৃদয়ঙ্গম হয়? সেই উক্তি বাঙ্গালায় হইলে কে তাহা হৃদয়গত না করিতে পারে? যদি কেহ এমন মনে করেন যে, সুশিক্ষিতদিগের উক্তি কেবল সুশিক্ষিতদিগেরই বুঝা প্রয়োজন, সকলের জন্য সে কথা নয়, তবে তাঁহারা বিশেষ ভ্রান্ত। সমগ্র বাঙ্গালির উন্নতি না হইলে দেশের কোন মঙ্গল নাই। সমস্ত দেশের লোক ইংরাজি বুঝে না, কস্মিন্ কালে বুঝিবে, এমত প্রত্যাশা করা যায় না। কস্মিন্ কালে কোন বিদেশীয় রাজা দেশীয় ভাষার পরিবর্তে আপন ভাষাকে সাধারণের বাচ্য ভাষা করিতে পারেন নাই। সুতরাং বাঙ্গালায় যে কথা উক্ত না হইবে, তাহা তিন কোটি বাঙ্গালি কখন বুঝিবে না, বা শুনিবে না। এখনও শুনে না, ভবিষ্যতে কোন কালেও শুনিবে না। যে কথা দেশের সকল লোকে বুঝে না, বা শুনে না, সে কথায় সামাজিক বিশেষ কোন উন্নতির সম্ভাবনা নাই।

এক্ষণে একটা কথা উঠিয়াছে, এডুকেশন "ফিল্‌টর ডৌন" করিবে। এ কথার তাৎপর্য এই যে, কেবল উচ্চশ্রেণীর লোকেরা সুশিক্ষিত হইলেই হইল, অধঃশ্রেণীর লোকদিগের পৃথক শিখাইবার প্রয়োজন নাই; তাহারা কাজে কাজেই বিদ্বান হইয়া উঠিবে। যেমন শোষক পদার্থের উপরিভাগে জলসেক করিলেই নিম্নস্তর পর্যন্ত সিক্ত হয়, তেমনি বিদ্যারূপ জল, বাঙ্গালি-জাতিরূপ শোষক-মৃত্তিকার উপরিস্তরে ঢালিলে নিম্নস্তর অর্থাৎ ইতরলোক পর্যন্ত ভিজিয়া উঠিবে। জল থাকাতে কথাটা একটু সরস হইয়াছে বটে, ইংরাজি শিক্ষার সঙ্গে এরূপ জলযোগ না হইলে আমাদের দেশের উন্নতির এত ভরসা থাকিত না। জলও অগাধ, শোষকও অসংখ্য! এত কাল শুষ্ক ব্রাহ্মণ পণ্ডিতেরা দেশ উচ্ছন্ন দিতেছিল, এক্ষণে নব্য সম্প্রদায় জলযোগ করিয়া দেশ উদ্ধার করিবেন। কেননা তাঁহাদের ছিদ্রগুণে ইতরলোক পর্যন্ত রসার্দ্র হইয়া উঠিবে। ভরসা করি, বোর্ডের

মনি সাহেব এবারকার আবকারি রিপোর্ট লিখিবার সময়ে এই জলপানা কথাটা মনে রাখিবেন।

সে যাহাই হউক, আমাদিগের দেশের লোকের এই জলময় বিদ্যা জল বা দুগ্ধ নহে যে, উপরে ঢালিলে নীচে শোষিবে। তবে কোন জাতির একাংশ কৃতবিদ্য হইলে তাহাদিগের সংসর্গগুণে অন্যাংশেরও শ্রীবৃদ্ধি হয় বটে, কিন্তু যদি ঐ দুই অংশের ভাষার এরূপ ভেদ থাকে যে, বিদ্বানের ভাষা মূর্খে বুঝিতে পারে না, তবে সংসর্গের ফল ফলিবে কি প্রকারে?

প্রধান কথা এই যে, এক্ষণে আমাদিগের ভিতরে উচ্চশ্রেণী এবং নিম্নশ্রেণীর লোকের মধ্যে পরস্পর সহৃদয়তা কিছুমাত্র নাই। উচ্চশ্রেণীর কৃতবিদ্য লোকেরা, মূর্খ দারিদ্র লোকদিগের কোন দুঃখে দুঃখী নহেন। মূর্খ দরিদ্রেরা, ধনবান্ এবং কৃতবিদ্যদিগের কোন সুখে সুখী নহে। এই সহৃদয়তার অভাবই দেশোন্নতির পক্ষে সম্প্রতি প্রধান প্রতিবন্ধক। ইহার অভাবে উভয় শ্রেণীর মধ্যে দিন দিন অধিক পার্থক্য জন্মিতেছে। উচ্চশ্রেণীর সহিত যদি পার্থক্য জন্মিল, তবে সংসর্গফল জন্মিবে কি প্রকারে? যে পৃথক, তাহার সহিত সংসর্গ কোথায়? যদি শক্তিমন্ত ব্যক্তিরা অশক্তদিগের দুঃখে দুঃখী সুখে সুখী না হইল, তবে কে আর তাহাদিগকে উদ্ধার করিবে? আর যদি আপামর সাধারণ উদ্‌ধৃত না হইল, তবে যাঁহারা শক্তিমন্ত, তাঁহাদিগেরই উন্নতি কোথায়? এরূপ কখন কোন দেশে হয় নাই যে, ইতর লোক চিরকাল এক অবস্থায় রহিল, ভদ্রলোকদিগের অবিরত শ্রীবৃদ্ধি হইল। বরং, যে যে সমাজের বিশেষ উন্নতি হইয়াছে, সেই সেই সমাজের উভয় সম্প্রদায় সমকক্ষ, বিমিশ্রিত এবং সহৃদয়তাসম্পন্ন। যত দিন এই ভাব ঘটে নাই—যত দিন উভয়ে পার্থক্য ছিল, তত দিন উন্নতি ঘটে নাই। যখন উভয় সম্প্রদায়ের সামঞ্জস্য হইল, সেই দিন হইতে শ্রীবৃদ্ধির আরম্ভ। রোম, এথেন্স, ইংলণ্ড এবং আমেরিকা ইহার উদাহরণস্থল। সে সকল কাহিনী সকলেই অবগত আছেন। পক্ষান্তরে সমাজমধ্যে, সম্প্রদায়ে সম্প্রদায়ে পার্থক্য থাকিলে সমাজের যেরূপ অনিষ্ট হয়, তাহার উদাহরণ স্পার্টা, ফ্রান্স, মিশর এবং ভারতবর্ষ। এথেন্স এবং স্পার্টা দুই প্রতিযোগিনী নগরী; এথেন্সে সকলে সমান; স্পার্টায় একজাতি প্রভু, একজাতি দাস ছিল। এথেন্স হইতে পৃথিবীর সভ্যতার সৃষ্টি হইল—যে বিদ্যাপ্রভাবে আধুনিক ইউরোপের এত গৌরব, এথেন্স তাহার প্রসূতা। স্পার্টা কুলক্ষয়ে লোপ পাইল। ফ্রান্সে পার্থক্যহেতু ১৭৮৯ খ্রীষ্টাব্দ হইতে যে মহাবিপ্লব আরম্ভ হয়, অদ্যাপি তাহার শেষ হয় নাই। যদিও তাহার চরম ফল মঙ্গল বটে, কিন্তু অসাধারণ সমাজপীড়ার পর সে মঙ্গল সিদ্ধ হইতেছে। হস্ত-

পদাদি ছেদ করিয়া, যেরূপ রোগীর আরোগ্যসাধন, এ বিপ্লবে সেরূপ সামাজিক মঙ্গলসাধন। সে ভয়ানক ব্যাপার সকলেই অবগত আছেন। মিশরদেশে সাধারণের সহিত ধর্মযাজকদিগের পার্থক্যহেতুক, অকালে সমাজোন্নতি লোপ পায়। প্রাচীন ভারতবর্ষে বর্ণগত পার্থক্য। এই বর্ণগত পার্থক্যের কারণ, উচ্চবর্ণে এবং নীচবর্ণে যেরূপ গুরুতর ভেদ জন্মিয়াছিল, এমত কোন দেশে জন্মে নাই, এবং এত অনিষ্টও কোন দেশে হয় নাই। সে সকল অমঙ্গলের সবিস্তার বর্ণনা এখানে করার আবশ্যকতা নাই। এক্ষণে বর্ণগত পার্থক্যের অনেক লাঘব হইয়াছে। দুর্ভাগ্যক্রমে শিক্ষা এবং সম্পত্তির প্রভেদে অন্যতর বিশেষ পার্থক্য জন্মিতেছে।

সেই পার্থক্যের এক বিশেষ কারণ ভাষাভেদ। সুশিক্ষিত বাঙ্গালিদিগের অভিপ্রায়সকল সাধারণতঃ বাঙ্গালা ভাষায় প্রচারিত না হইলে, সাধারণ বাঙ্গালি তাঁহাদিগের মর্ম বুঝিতে পারে না, তাঁহাদিগকে চিনিতে পারে না, তাঁহাদিগের সংস্রবে আসে না। আর পাঠক বা শ্রোতাদিগের সহিত সহৃদয়তা, লেখকের বা পাঠকের স্বতঃসিদ্ধ গুণ ; লিখিতে গেলে বা কহিতে গেলে, তাহা আপনা হইতে জন্মে। যেখানে লেখক বা বক্তার স্থির জানা থাকে যে, সাধারণ বাঙ্গালি তাঁহার পাঠক বা শ্রোতার মধ্যে নহে, সেখানে কাজে কাজেই তাহাদিগের সহিত তাঁহার সহৃদয়তার অভাব ঘটিয়া থাকে।

যে সকল কারণে সুশিক্ষিত বাঙ্গালির উক্তি বাঙ্গালা ভাষাতেই হওয়া কর্তব্য, তাহা আমরা সবিস্তারে বিবরিত করিলাম। কিন্তু রচনাকালে সুশিক্ষিত বাঙ্গালির বাঙ্গালা ভাষা ব্যবহার করার একটি বিশেষ বিঘ্ন আছে। সুশিক্ষিতে বাঙ্গালা পড়ে না। সুশিক্ষিতে যাহা পড়িবে না, তাহা সুশিক্ষিতে লিখিতে চাহে না।

আপরিতোষাদ্বিদুষাং ন সাধু মন্যে প্রয়োগবিজ্ঞানম্।

আমরা সকলেই স্বার্থাভিলাষী, লেখকমাত্রেই যশের অভিলাষী। যশ সুশিক্ষিতের মুখে। অন্যে সদসদ্বিচারক্ষম নহে ; তাহাদের নিকট যশ হইলে তাহাতে লিপিপরিশ্রমের সার্থকতা বোধ হয় না। সুশিক্ষিতে না পড়িলে সুশিক্ষিত ব্যক্তি লিখিবে না।

এদিকে, কোন সুশিক্ষিত বাঙ্গালিকে যদি জিজ্ঞাসা করা যায়, "মহাশয়, আপনি বাঙ্গালি, বাঙ্গালা গ্রন্থ বা পত্রাদিতে আপনি এত হতাদর কেন ?" তিনি উত্তর করেন, "কোন্ বাঙ্গালা গ্রন্থে বা পত্রে আদর করিব ? পাঠ্য রচনা পাইলে অবশ্য পড়ি।" আমরা মুক্তকণ্ঠে স্বীকার করি যে, এ কথার উত্তর নাই। যে কয়খানি বাঙ্গালা রচনা পাঠযোগ্য, তাহা দুই-তিন দিনের মধ্যে পড়িয়া শেষ করা

যায়। তাহার পর দুই-তিন বৎসর বসিয়া না থাকিলে আর-একখানি পাঠ্য বাঙ্গালা রচনা পাওয়া যায় না।

এইরূপ বাঙ্গালা ভাষার প্রতি বাঙ্গালির অনাদরেই, বাঙ্গালার অনাদর বাড়িতেছে। সুশিক্ষিত বাঙ্গালিরা বাঙ্গালা রচনায় বিমুখ বলিয়া সুশিক্ষিত বাঙ্গালি বাঙ্গালা রচনাপাঠে বিমুখ। সুশিক্ষিত বাঙ্গালিরা বাঙ্গালা পাঠে বিমুখ বলিয়া, সুশিক্ষিত বাঙ্গালিরা বাঙ্গালা রচনায় বিমুখ।

আমরা এই পত্রকে সুশিক্ষিত বাঙ্গালির পাঠোপযোগী করিতে যত্ন করিব। যত্ন করিব, এইমাত্র বলিতে পারি। যত্নের সফলতা ক্ষমতাধীন। এই আমাদিগের প্রথম উদ্দেশ্য।

দ্বিতীয়, এই পত্র আমরা কৃতবিদ্য সম্প্রদায়ের হস্তে, আরও এই কামনায় সমর্পণ করিলাম যে, তাঁহারা ইহাকে আপনাদিগের বার্তাবহস্বরূপ ব্যবহার করুন। বাঙ্গালি সমাজে ইহা তাঁহাদিগের বিদ্যা, কল্পনা, লিপিকৌশল এবং চিত্তোৎকর্ষের পরিচয় দিক। তাঁহাদিগের উক্তি বহন করিয়া ইহা বঙ্গমধ্যে জ্ঞানের প্রচার করুক। অনেক সুশিক্ষিত বাঙ্গালি বিবেচনা করেন যে, এরূপ বার্তাবহের কতক দূর অভাব আছে। সেই অভাব নিবারণ এই পত্রের এক উদ্দেশ্য। আমরা যে কোন বিষয়ে, যে কাহারও রচনা, পাঠোপযোগী হইলে সাদরে গ্রহণ করিব। এই পত্র, কোন বিশেষ পক্ষের সমর্থনজন্য বা কোন সম্প্রদায়বিশেষের মঙ্গলসাধনার্থ সৃষ্ট হয় নাই।

আমরা কৃতবিদ্যদিগের মনোরঞ্জনার্থে যত্ন পাইব বলিয়া, কেহ এরূপ বিবেচনা করিবেন না যে, আমরা আপামর সাধারণের পাঠোপযোগিতাসাধনে মনোযোগ করিব না। যাহাতে এই পত্র সর্বজনপাঠ্য হয়, তাহা আমাদিগের বিশেষ উদ্দেশ্য। যাহাতে সাধারণের উন্নতি নাই, তাহাতে কাহারই উন্নতি সিদ্ধ হইতে পারে না, ইহা বলিয়াছি। যদি এই পত্রের দ্বারা সর্বসাধারণের মনোরঞ্জন সংকল্প না করিতাম, তবে এই পত্রপ্রকাশ বৃথা কার্য বিবেচনা করিতাম।

অনেকে বিবেচনা করেন যে বালকের পাঠোপযোগী অতি সরল কথা ভিন্ন, সাধারণের বোধগম্য বা পাঠ্য হয় না। এই বিশ্বাসের উপর নির্ভর করিয়া যাঁহারা লিখিতে প্রবৃত্ত হয়েন, তাঁহাদিগের রচনা কেহই পড়ে না। যাহা সুশিক্ষিত ব্যক্তির পাঠোপযোগী নহে, তাহা কেহই পড়িবে না। যাহা উত্তম; তাহা সকলেই পড়িতে চাহে; যে না বুঝিতে পারে, সে বুঝিতে যত্ন করে। এই যত্নই সাধারণের শিক্ষার মূল। সে কথা আমরা স্মরণ রাখিব।

তৃতীয়, যাহাতে নব্য সম্প্রদায়ের সহিত আপামর সাধারণের সহৃদয়তা

সংবর্ধিত হয়, আমরা তাহার সাধ্যানুসারে অনুমোদন করিব। আরও অনেক কাজ করিব, বাসনা করি। কিন্তু যত গর্জে তত বর্ষে না। গর্জনকারী মাত্রেরই পক্ষে একথা সত্য। বাঙ্গালা সাময়িক পত্রের পক্ষে বিশেষ। আমরা যে এই কথার সত্যতার একটি নূতন উদাহরণস্বরূপ হইব না, এমত বলি না। আমাদিগের পূর্বতনেরা এইরূপ এক-এক বার অকালগর্জন করিয়া, কালে লয়-প্রাপ্ত হইয়াছেন। আমাদিগের অদৃষ্টে যে সেরূপ নাই, তাহা বলিতে পারি না। যদি তাহাই হয়, তথাপি আমরা ক্ষতি বিবেচনা করিব না। এ জগতে কিছুই নিষ্ফল নহে। একখানি সাময়িক পত্রের ক্ষণিক জীবনও নিষ্ফল হইবে না। যে সকল নিয়মের বলে, আধুনিক সামাজিক উন্নতি সিদ্ধ হইয়া থাকে, এইসকল পত্রের জন্ম, জীবন এবং মৃত্যু তাহারই প্রক্রিয়া। এইসকল সামান্য ক্ষণিক পত্রেরও জন্ম, অলঙ্ঘ্য সামাজিক নিয়মাধীন, মৃত্যু ঐ নিয়মাধীন, জীবনের পরিমাণ ঐ অলঙ্ঘ্য নিয়মের অধীন। কালস্রোতে এ সকল জলবুদ্‌বুদ মাত্র। এই বঙ্গদর্শন কালস্রোতের নিয়মাধীন জলবুদ্‌বুদস্বরূপ ভাসিল; নিয়ম-বলে বিলীন হইবে। অতএব ইহার লয়ে আমরা পরিতাপযুক্ত বা হাস্যাস্পদ হইব না। ইহার জন্ম কখনই নিষ্ফল হইবে না। এ সংসারে জলবুদ্‌বুদও নিষ্কারণ বা নিষ্ফল নহে।

বৈশাখ, ১২৭৯

বঙ্গদর্শনের বিদায়গ্রহণ

চারি বৎসর গত হইল বঙ্গদর্শন-প্রকাশ আরম্ভ হয়। যখন ইহাতে আমি প্রবৃত্ত হই, তখন আমার কতকগুলি বিশেষ উদ্দেশ্য ছিল। পত্রসূচনায় কতক-গুলি ব্যক্ত করিয়াছিলাম, কতকগুলি অব্যক্ত ছিল। যাহা ব্যক্ত হইয়াছিল, এবং যাহা অব্যক্ত ছিল এক্ষণে তাহার অধিকাংশই সিদ্ধ হইয়াছে। এক্ষণে আর বঙ্গদর্শন রাখিবার প্রয়োজন নাই।

যখন বঙ্গদর্শন-প্রকাশারম্ভ হয়, তখন সাধারণের পাঠযোগ্য অথচ উত্তম সাময়িক পত্রের অভাব ছিল। এক্ষণে তাদৃশ সাময়িক পত্রের অভাব নাই। যে অভাব পূর্ণ করিবার ভার বঙ্গদর্শন গ্রহণ করিয়াছিল, এক্ষণে বান্ধব আর্য্য-দর্শন প্রভৃতির দ্বারা তাহা পূরিত হইবে। অতএব বঙ্গদর্শন রাখিবার আর প্রয়োজন নাই। আমার অপেক্ষা দক্ষতর ব্যক্তিগণ এই ভার গ্রহণ করিয়া-ছেন দেখিয়া, আমি অত্যন্ত আহ্লাদিত, এবং বঙ্গদর্শনের জন্য আমি যে

শ্রমস্বীকার করিয়াছিলাম, তাহা সার্থক বিবেচনা করি। তাঁহাদিগকে ধন্যবাদ-পূর্বক, আমি বিদায় গ্রহণ করিতেছি।

* * * *

এ সংবাদে কেহ সন্তুষ্ট, কেহ ক্ষুব্ধ হইতে পারেন। কেহ ক্ষুব্ধ হইতে পারেন, এ কথা বলায় আত্মশ্লাঘার বিষয় কিছুই নাই। কেননা, এমত ব্যক্তি বা এমন বস্তু জগতে নাই, যাহার প্রতি কেহ না কেহ অনুরক্ত নহেন। যদি কেহ বঙ্গদর্শনের এমত বন্ধু থাকেন যে, বঙ্গদর্শনের লোপ তাঁহার কষ্টদায়ক হইবে, তাঁহার প্রতি আমার এই নিবেদন যে, যখন আমি এই বঙ্গদর্শনের ভার গ্রহণ করি, তখন এমত সংকল্প করি নাই যে, যত দিন বাঁচিব এই বঙ্গদর্শনে আবদ্ধ থাকিব। ব্রতবিশেষ গ্রহণ করিয়া কেহই চিরদিন তাহাতে আবদ্ধ থাকিতে পারে না। মনুষ্যজীবন ক্ষণস্থায়ী ; এই অল্পকালমধ্যে সকলকেই অনেকগুলি অভীষ্ট সিদ্ধ করিতে হয় ; এজন্য কোন একটিতে কেহ চিরকাল আবদ্ধ থাকিতে পারে না। ইহসংসারে এমন অনেক গুরুতর ব্যাপার আছে বটে যে তাহাতে এই জীবন মৃত্যুকাল পর্যন্ত নিবদ্ধ রাখাই উচিত। কিন্তু এই বঙ্গদর্শন তাদৃশ গুরুতর ব্যাপার নহে, এবং আমিও তাদৃশ ব্যাপারে নিযুক্ত হইবার যোগ্য পাত্র নহি।

যাঁহারা বঙ্গদর্শনের লোপ দেখিয়া ক্ষুব্ধ হইবেন, তাঁহাদের প্রতিই আমার এই নিবেদন। আর যাঁহারা ইহাতে আহ্লাদিত হইবেন, তাঁহাদিগকে একটি মন্দ সংবাদ শুনাইতে আমি বাধ্য হইলাম। বঙ্গদর্শন আপাততঃ রহিত করিলাম বটে, কিন্তু কখনও যে এই পত্র পুনর্জীবিত হইবে না এমত অঙ্গীকার করিতেছি না। প্রয়োজন দেখিলে স্বতঃ বা অন্যতঃ ইহা পুনর্জীবিত করিব ইচ্ছা রহিল।

* * * *

বঙ্গদর্শন-সম্পাদনকালে আমি অনেকের কাছে কৃতজ্ঞতাপাশে বদ্ধ হইয়াছি। সেই কৃতজ্ঞতাস্বীকার, এই সময়ে আমার প্রধান কার্য।

প্রথমতঃ সাধারণ পাঠকশ্রেণীর নিকট আমি বিশেষ বাধ্য। তাঁহারা যে পরিমাণে বঙ্গদর্শনের প্রতি আদর ও শ্রদ্ধা প্রদর্শন করিয়াছেন, তাহা আমার আশার অতীত। আমি একদিনের তরেও ব্যক্তিবিশেষের আদর ও উৎসাহের কামনা করি নাই, কিন্তু সাধারণ পাঠকের এই উৎসাহ ও যত্ন না দেখিলে আমি এত দিন বঙ্গদর্শন রাখিতাম কিনা সন্দেহ। এ বৎসর বঙ্গদর্শনের প্রতি আমি তাদৃশ যত্ন করি নাই, এবং সন ১২৮২ সনের বঙ্গদর্শন পূর্ব বৎসরের তুল্য হয় নাই, তথাপি পাঠকশ্রেণীর আদরের লাঘব বা অনাস্থা দেখি নাই। ইহার জন্য আমি বঙ্গীয় পাঠকগণের কাছে বিশেষ কৃতজ্ঞ।

তৎপরে, যেসকল কৃতবিদ্য সুলেখকদিগের সহায়তাতেই বঙ্গদর্শন এত আদরণীয় হইয়াছিল, তাঁহাদিগের কাছে আমার অপরিশোধনীয় ঋণ স্বীকার করিতে হইতেছে। বাবু হেমচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়, বাবু যোগেন্দ্রচন্দ্র ঘোষ, বাবু রাজকৃষ্ণ মুখোপাধ্যায়, বাবু অক্ষয়চন্দ্র সরকার, বাবু রামদাস সেন, পণ্ডিত লালমোহন বিদ্যানিধি, বাবু প্রফুল্লচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়* প্রভৃতির লিপিশক্তি, বিদ্যাবত্তা, উৎসাহ, এবং শ্রমশীলতাই বঙ্গদর্শনের উন্নতির মূল কারণ। ঈদৃশ ব্যক্তিগণের সহায়তা লাভ করিয়াছিলাম, ইহা আমার অল্প শ্লাঘার বিষয় নহে।

আর-একজন আমার সহায় ছিলেন—সাহিত্যে আমার সহায়, সংসারে আমার সুখ-দুঃখের ভাগী—তাঁহার নাম উল্লেখ করিব মনে করিয়াও উল্লেখ করিতে পারিতেছি না। এই বঙ্গদর্শনের বয়ঃক্রম অধিক হইতে না হইতেই দীনবন্ধু আমাকে পরিত্যাগ করিয়া গিয়াছিলেন। তাঁহার জন্য তখন বঙ্গসমাজ রোদন করিতেছিল, কিন্তু এই বঙ্গদর্শনে আমি তাঁহার নাম-উল্লেখও করি নাই। কেন, তাহা কেহ বুঝে না। আমার যে দুঃখ, কে তাহার ভাগী হইবে? কাহার কাছে দীনবন্ধুর জন্য কাঁদিলে প্রাণ জুড়াইবে? অন্যের কাছে দীনবন্ধু সুলেখক—আমার কাছে প্রাণতুল্য বন্ধু—আমার সঙ্গে সে শোকে পাঠকের সহৃদয়তা হইতে পারে না বলিয়া, তখনও কিছু বলি নাই, এখনও আর কিছু বলিলাম না।

* * * *

তৃতীয়, যে সকল সহযোগিবর্গ বঙ্গদর্শনকে উৎসাহিত করিয়াছিলেন, তাঁহাদিগকে আমার শত শত ধন্যবাদ। ইহাতেও আমার একটি স্পর্ধার কথা আছে। উচ্চশ্রেণীর দেশী সংবাদপত্রমাত্রই বঙ্গদর্শনের অনুকূল ছিলেন; অধিকতর স্পর্ধার কথা এই যে নিম্নশ্রেণীর সংবাদপত্রমাত্রই ইহার প্রতিকূলতা করিয়াছিলেন। ইংরেজেরা বাংলা সাময়িক পত্রের বড় খবর রাখেন না; কিন্তু এক্ষণে গতাসু ইণ্ডিয়ান অবজর্বর বঙ্গদর্শনের বিশেষ সহায়তা করিতেন। আমি ইণ্ডিয়ান অবজর্বর এবং ইণ্ডিয়ান মিররের নিকট যেরূপ উৎসাহ প্রাপ্ত হইয়াছিলাম, এরূপ আর কোন ইংরেজি পত্রের নিকট প্রাপ্ত হই নাই। অবজর্বর এক্ষণে গত হইয়াছেন, কিন্তু সৌভাগ্যবশতঃ মিরর অদ্যাপি উন্নতভাবে দেশের মঙ্গল সাধন করিতেছেন। এবং ঈশ্বরেচ্ছায় বহুকাল তদ্রূপ মঙ্গল সাধন করিবেন; তাঁহাকে

* বাহুল্যভয়ে সকলের নাম লিখিত হইল না। বিশেষ আমার ভ্রাতৃদ্বয়, বাবু সঞ্জীবচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়, বাবু পূর্ণচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়, অথবা ভ্রাতৃবৎ বন্ধু বাবু জগদীশনাথ রায়ের নিকট প্রকাশ্য কৃতজ্ঞতা স্বীকার করা বাগাড়ম্বর মাত্র। বাবু রঙ্গলাল বন্দ্যোপাধ্যায় ও বাবু শ্রীকৃষ্ণদাসও আমার কৃতজ্ঞতাভাজন।

আমার শত সহস্র ধন্যবাদ। বঙ্গদর্শনের সহিত অনেক গুরুতর বিষয়ে তাঁহার মতভেদ থাকাতেও তিনি যে এইরূপ সহৃদয়তা প্রকাশপূর্বক বল প্রদান করিতেন, ইহা তাঁহার উদারতার সামান্য পরিচয় নহে।

সহৃদয়তা এবং বল আমি কেবল অবজর্বর ও মিররের কাছে প্রাপ্ত হইয়াছি, এমত নহে। দেশী সংবাদপত্রের অগ্রগণ্য হিন্দু পেট্রিয়ট এবং স্থিরবুদ্ধি ও দেশ-বৎসল সহচরের দ্বারা আমি তদ্রূপ উপকৃত, এবং তাঁহাদের কাছে আমি সেইরূপ কৃতজ্ঞ। নিরপেক্ষ সদ্বিদ্বান এবং যথার্থবাদী ভারতসংস্কারক, বিজ্ঞ এডুকেশন গেজেট, ও তেজস্বিনী তীক্ষ্ণবুদ্ধিশালিনী সাধারণী এবং সত্যপ্রিয় সাপ্তাহিক সমাচার প্রভৃতি পত্রকে বহুবিধ আনুকূল্যের জন্য, আমি শত শত ধন্যবাদ করি।

চারি বৎসর হইল বঙ্গদর্শনের পত্রসূচনায় বঙ্গদর্শনকে কালস্রোতে জলবুদ্‌বুদ বলিয়াছিলাম। আজি সেই জলবুদ্‌বুদ জলে মিশাইল।

শ্রীবঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়

চৈত্র ১২৮২

বঙ্গদর্শন

যখন বঙ্গদর্শনের চতুর্থ খণ্ড সমাপ্ত করিয়া আমি পাঠকদিগের নিকট বিদায় গ্রহণ করি, তখন স্বীকার করিয়াছিলাম যে, প্রয়োজন দেখিলে স্বতঃ হউক অন্যতঃ হউক, বঙ্গদর্শন পুনর্জীবিত করিব।

বঙ্গদর্শনের লোপজন্য আমি অনেকের নিকট তিরস্কৃত হইয়াছি। সেই তিরস্কারের প্রাচুর্যে আমার এমত প্রতীতি জন্মিয়াছে যে, বঙ্গদর্শনে দেশের প্রয়োজন আছে। প্রয়োজন আছে বলিয়া, ইহা পুনর্জীবিত হইল।

যাহা একজনের উপর নির্ভর করে, তাহার স্থায়িত্ব অনিশ্চিত। বঙ্গদর্শন যত দিন আমার ইচ্ছা, প্রবৃত্তি, স্বাস্থ্য বা জীবনের উপর নির্ভর করিবে, তত দিন বঙ্গদর্শনের স্থায়িত্ব অসম্ভব। এজন্য আমি বঙ্গদর্শনের সম্পাদকীয় কার্য পরিত্যাগ করিলাম। বঙ্গদর্শনের স্থায়িত্ববিধান করাই আমার উদ্দেশ্য।

যাঁহার হস্তে বঙ্গদর্শন সমর্পণ করিলাম; তাঁহার দ্বারা ইহা পূর্বাপেক্ষা শ্রীবৃদ্ধিলাভ করিবে, ইহা আমার সম্পূর্ণ ভরসা আছে। তাঁহার সংকল্পসকল আমি অবগত আছি। তিনি নিজের উপর নির্ভর যত করুন বা না করুন, দেশীয় সুলেখকমাত্রেরই উপর অধিকতর নির্ভর করিবেন। তাঁহার ইচ্ছা বঙ্গ-

দর্শনকে সুশিক্ষিতমণ্ডলীর উক্তিপত্ররূপে পরিণত করেন। তাহা হইলেই বঙ্গদর্শন স্থায়ী এবং মঙ্গলপ্রদ হইবে।

ইউরোপীয় সাময়িক পত্র এবং এতদ্দেশীয় সাময়িক পত্রে বিশেষ প্রভেদ এই যে, এখানে যিনি সম্পাদক তিনিই প্রধান লেখক; ইউরোপীয় সম্পাদক, সম্পাদক মাত্র—কদাচিৎ লেখক। পত্র এবং প্রবন্ধের উদ্বাহে তিনি ঘটক মাত্র—স্বয়ং বরকর্তা হইয়া সচরাচর উপস্থিত হয়েন না। এবার বঙ্গদর্শন সেই প্রণালী অবলম্বন করিল।

যাহা সকলের মনোনীত, তাহার সহিত সম্বন্ধ গৌরবের বিষয়। বঙ্গদর্শনের সম্পাদকীয় কার্য পরিত্যাগ করিলাম বটে, কিন্তু ইহার সহিত আমার সম্বন্ধবিচ্ছেদ হইল না। যত দিন বঙ্গদর্শন থাকিবে, আমি ইহার মঙ্গলাকাঙ্ক্ষা করিব এবং যদি পাঠকেরা বিরক্ত না হয়েন, তবে ইহার স্তম্ভে তাঁহাদিগের সম্মুখে মধ্যে মধ্যে উপস্থিত হইয়া বঙ্গদর্শনের গৌরবে গৌরব লাভ করিবার স্পর্ধা করিব।

এক্ষণে বঙ্গদর্শনকে অভিনব সম্পাদকের হস্তে সমর্পণ করিয়া, আশীর্বাদ করিতেছি যে ইহার সুশীতল ছায়ায় এই তপ্ত ভারতবর্ষ পরিব্যাপ্ত হউক। আমি ক্ষুদ্রবুদ্ধি, ক্ষুদ্রশক্তি—সেই মহতীছায়াতলে অলক্ষিত থাকিয়া, বাঙ্গালা সাহিত্যের দৈনন্দিন শ্রীবৃদ্ধি দর্শন করি, ইহাই আমার বাসনা।*

শ্রীবঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়

বৈশাখ ১২৮৩

* গত বৎসর বঙ্গদর্শনের বিদায়গ্রহণকালে আমি অনবধানতাবশতঃ একটি গুরুতর অপরাধে অপরাধী হইয়াছিলাম। যাঁহাদিগের বলে এবং সাহায্যে আমি চারি বৎসর বঙ্গদর্শন সম্পাদনে কৃতকার্য হইয়াছিলাম, কবিবর বাবু নবীনচন্দ্র সেন তাঁহাদিগের মধ্যে একজন অগ্রগণ্য। সে উপকার ভুলিবার নহে—আমিও ভুলি নাই। তবে, বিখ্যাত মুদ্রাকরের প্রেতগণ আমাকে চারি বৎসর জ্বালাইয়া তৃপ্তিলাভ করে নাই; শেষ দিন, আমার কৃতজ্ঞতা স্বীকারকালে নবীনবাবুর নামটি উঠাইয়া দিয়াছিল। বঙ্গদর্শনের পুনর্জীবনকালে আমি নবীনবাবুর কাছে বিনীতভাবে এই দোষের জন্য ক্ষমাপ্রার্থনা করিতেছি।

নিবেদন

১২৯০ সালের কার্তিক মাসে বঙ্কিমবাবুর যত্নে সঞ্জীববাবুর হস্ত হইতে বঙ্গদর্শন যখন আমি গ্রহণ করি, শ্রীযুক্ত চন্দ্রনাথ বসু মহাশয় তখন ইহার সম্পাদনকার্যে প্রধান সহায় ছিলেন। ইহা সাধারণতঃ সকলের জানা নাই; কিন্তু দীর্ঘ কাল পরে বঙ্গদর্শনের পুনঃপ্রতিষ্ঠার দিনে সে কথা স্বীকার করিয়া চন্দ্রনাথবাবুর কাছে কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করা আমি আমার প্রধান কর্তব্য মনে করি। বঙ্গদর্শন স্থায়ী হইলে তিনিই তখন প্রকাশ্যে সম্পাদকতা গ্রহণ করিতেন এবং সেজন্য বঙ্কিম-বাবুর সহিত পরামর্শ করিয়া গবর্ণমেণ্টের অনুমতিও লইয়াছিলাম। দুর্ভাগ্য-বশতঃ অকালে আমি বঙ্গদর্শন বন্ধ করিতে বাধ্য হওয়ায় তাহা কার্যে পরিণত হয় নাই।

বঙ্গদর্শন পুনর্জীবিত হওয়ায় আমার চিরন্তন ক্ষোভ দূর হইল। বঙ্গের প্রধান সাময়িকপত্র যে আমার হস্তে লোপ পাইয়াছিল, ইহাতে আমি বড় লজ্জিত ছিলাম। ইহার পুনঃপ্রতিষ্ঠায় এতদিনে আমি সাহিত্যসংসারে একটি ঋণমুক্ত হইলাম। সুহৃত্তম শ্রীযুক্ত রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর মহাশয় বঙ্গদর্শনের সম্পাদনভার গ্রহণ করিতে স্বীকৃত হওয়ায় আমি নিশ্চিন্ত হইয়াছি। তিনি যে উপকার করিলেন, তাহা ভাষায় প্রকাশ করা যায় না।

সঞ্জীববাবুর একমাত্র পুত্র আমার প্রিয় সুহৃৎ বাবু জ্যোতিশ্চন্দ্রকেও এই উপলক্ষ্যে ধন্যবাদ দিতেছি। তিনি বঙ্গদর্শনের সেবায় সর্বদা সহায়তা করিতে প্রতিশ্রুত হইয়া উৎসাহ বৃদ্ধি করিয়াছেন। তাঁহার পিতার সময় বঙ্গদর্শনের তিনি একজন প্রধান সহকারী ছিলেন।

এক্ষণে রাজকার্যোপলক্ষ্যে আমি কলিকাতা হইতে বহুদূরে অবস্থিতি করি-তেছি, পূর্ববৎ স্বয়ং ইহার তত্ত্বাবধান করিতে পারিব না। সেইজন্য অনুজ শ্রীমান শৈলেশচন্দ্র মজুমদারের হস্তে বঙ্গদর্শন সমর্পণ করিলাম।

ডালটনগঞ্জ; পালামৌ
১লা বৈশাখ
সন ১৩০৮

শ্রীশ্রীশচন্দ্র মজুমদার

সূচনা

১২৭৯ বঙ্গাব্দে বঙ্গদর্শনের পত্রসূচনায় বঙ্কিমচন্দ্র লিখিয়াছিলেন—'এই বঙ্গদর্শন কালস্রোতের নিয়মাধীন জলবুদ্‌বুদস্বরূপ ভাসিল; নিয়মবলে বিলীন হইবে।' চারি বৎসর পরে বঙ্গদর্শনের বিদায়গ্রহণকালে লিখিয়াছিলেন—'বঙ্গদর্শনকে কালস্রোতে জলবুদ্‌বুদ বলিয়াছিলাম। আজি সেই জলবুদ্‌বুদ জলে মিশাইল।' এই নশ্বর জগতে জলবুদ্‌বুদের সহিত কাহার তুলনা না হয়? ক্ষুদ্র সাময়িক-পত্রের তো কথাই নাই, অতুলপ্রতাপান্বিত রোম সাম্রাজ্য, বিপুলবৈভবশালী মোগলসাম্রাজ্য কালস্রোতে জলবুদ্‌বুদের ন্যায় উদয় হইয়াছিল, বুদ্‌বুদের ন্যায় লীন হইয়াছে। কিন্তু জলবুদ্‌বুদ উঠে, মিলায়; আবার উঠে, আবার মিলায়, আবার উঠে। আবির্ভাব, তিরোভাব, পুনরায় আবির্ভাব, ইহাই বিশ্বের নিয়ম, বিনাশ কিছুরই নাই।

চারি বৎসর পরে বঙ্গদর্শন-জলবুদ্‌বুদ জলে মিশাইল বলিয়া যে আর কখনো পুনরুদিত হইবে না, এমন কথা বঙ্কিমচন্দ্র বলেন নাই। সেই সময় বঙ্গদর্শন প্রচার-রহিত হওয়াতে যাঁহারা আহ্লাদিত হইয়াছিলেন অথবা যাঁহাদিগের আহ্লাদিত হইবার সম্ভাবনা ছিল, তাঁহাদিগকে লক্ষ্য করিয়া তিনি লিখিয়াছিলেন—'তাঁহাদিগকে একটি মন্দ সংবাদ শুনাইতে আমি বাধ্য হইলাম। বঙ্গদর্শন আপাতত রহিত করিলাম বটে, কিন্তু কখনো যে এই পত্র পুনরুজ্জীবিত হইবে না এমত অঙ্গীকার করিতেছি না। প্রয়োজন দেখিলে স্বতঃ বা অন্যতঃ ইহা পুনর্জীবিত করিবার ইচ্ছা রহিল'। ফলেও ঘটিয়াছিল তাহাই। বঙ্কিম-চন্দ্রের বিশেষ সাহায্যে সঞ্জীবচন্দ্রের সম্পাদকতায় বঙ্গদর্শন পুনর্জীবিত হইয়াছিল। পরে সঞ্জীবচন্দ্র ও বঙ্কিমচন্দ্র দুইজনেই বঙ্গদর্শন শ্রীশবাবুকে দিয়া যান।* ৫ম বর্ষে বঙ্গদর্শন পুনঃপ্রচারসময়ে ভূমিকায় বঙ্কিমচন্দ্র লিখিয়াছিলেন—'বঙ্গদর্শনের লোপজন্য আমি অনেকের কাছে তিরস্কৃত হইয়াছি। সেই তিরস্কারের প্রাচুর্যে আমার এমত প্রতীতি জন্মিয়াছে যে, বঙ্গদর্শনে দেশের প্রয়োজন আছে। প্রয়োজন আছে বলিয়া, ইহা পুনর্জীবিত হইল।

* বঙ্গদর্শন প্রচারের সংকল্প সময়ে শ্রীযুক্ত শ্রীশচন্দ্র মজুমদার মহাশয়ই ইহার সম্পাদক হইবেন কথা ছিল। কিন্তু তিনি এক্ষণে সম্পাদকীয় ভার গ্রহণ করিতে পারিলেন না। বর্তমান সম্পাদক মহাশয় আমাদের সানুনয় অনুরোধে অনুগ্রহপূর্বক এই ভার গ্রহণ না করিলে, সে সংকল্প এত সত্বর কার্যে পরিণত হইত কি না সন্দেহ। তাঁহাকে সম্পাদকরূপে পাইয়া আমরা অধিকতর উৎসাহে কার্যক্ষেত্রে অবতীর্ণ হইলাম।

শ্রীশৈলেশচন্দ্র মজুমদার

'যাহা একজনের উপর নির্ভর করে, তাহার স্থায়িত্ব অনিশ্চিত। বঙ্গদর্শন যত দিন আমার ইচ্ছা, প্রবৃত্তি, স্বাস্থ্য বা জীবনের উপর নির্ভর করিবে তত দিন বঙ্গদর্শনের স্থায়িত্ব অসম্ভব। এজন্য আমি বঙ্গদর্শনের সম্পাদকীয় কার্য পরিত্যাগ করিলাম। বঙ্গদর্শনের স্থায়িত্ববিধান করাই আমার উদ্দেশ্য।' বঙ্কিমের এ উদ্দেশ্য কি সফল হইবে না? বঙ্কিমের বঙ্গদর্শন বাঙালীর হইবে না?

গ্রন্থরচনায় ও সাময়িকপত্রসম্পাদনে প্রভেদ আছে। গ্রন্থ ব্যক্তিবিশেষের প্রতিভা ও অধ্যবসায়ের ফল। কিন্তু সাময়িক পত্র বহুলোকের সমবেত উদ্যমে জীবিত থাকে। ইংরাজী বা ইউরোপীয় অনেক সংবাদপত্রের বয়ঃক্রম শতাধিক বর্ষ হইয়া গিয়াছে। টাইম্‌স্‌-পত্রের যে কখনও আয়ুক্ষয় হইবে, তাহা মনে হয় না। যতদিন ইংরাজ জাতি থাকিবে, ততদিন ইংরাজ জাতির প্রধান সংবাদপত্র থাকিবে। এই দীর্ঘজীবনের মূলে পারম্পর্যের নিয়ম। রাজার অভাবে রাজকার্য যেমন স্থগিত বা রহিত হয় না, সেইরূপ প্রসিদ্ধ পত্রের প্রচার কখনও বিলুপ্ত হয় না; কালের অলঙ্ঘ্য নিয়মে লেখক, পাঠক ও গ্রাহকের পরিবর্তন হইতে থাকে, এইমাত্র। কেবল কি এই হতভাগ্য বঙ্গদেশ জাতীয় গৌরবের নিদর্শন-পরম্পরা রক্ষা করিবে না?

একথা কেহ কেহ বলিবেন, এখন তো বঙ্গদর্শন একটা নাম মাত্র। যিনি বঙ্গদর্শনের প্রাণ ছিলেন, তিনিই যখন বর্তমান নাই, তখন কোন মাসিকপত্রের পক্ষে বঙ্গদর্শন নামও যাহা, অন্য নামও তাহাই। কিন্তু আমরা নামকে নামমাত্র মনে করি না। যে-নামকে বঙ্কিমচন্দ্র গৌরবান্বিত করিয়া গিয়াছেন, সে নামের মধ্যে সেই স্বর্গীয় প্রতিভার একটি শক্তি রহিয়া গিয়াছে। সেই শক্তি এখনও বঙ্গদেশ ও বঙ্গসাহিত্যের ব্যবহারে লাগিবে, সেই শক্তিকে আমরা বিনাশ হইতে দিতে পারি না।

বর্তমানে ও ভবিষ্যতে এ-পত্রের সম্পাদক যিনিই হউন না কেন, বঙ্গদর্শন নামের মধ্যে বঙ্কিম স্বয়ং বিরাজ করিতেছেন। বঙ্গদর্শনের যে সকল প্রাচীন মহারথী এখনও ইহলোকে আছেন, তাঁহারা এই নামের পতাকা উড্ডীন দেখিলে ইহার তলে সমবেত না হইয়া থাকিতে পারিবেন না। এবং যে-সকল আধুনিক লেখক বঙ্গদর্শনের গৌরবকালের ইতিহাস শৈশব হইতে শুনিয়া আসিতেছেন, বঙ্গদর্শন নামে তাঁহারা নিজের রচনার আদর্শকে যথাসাধ্য চেষ্টায় উন্নত রাখিবার প্রয়াস পাইবেন। পাঠকের দাবি যত কঠিন হয়, সম্পাদকের চেষ্টাও তত একান্ত হইয়া থাকে। বঙ্গদর্শন নামে পাঠকের প্রত্যাশা বাড়িয়া উঠিবে, সন্দেহ নাই; এবং সেই প্রত্যাশার বেগে সম্পাদককেও সর্বদা সচেষ্ট থাকিতে হইবে। সম্পাদক একথা ভুলিতে পারিবেন না যে, বঙ্গদর্শন নামের মধ্যে বঙ্কিমচন্দ্র স্বয়ং

উপস্থিত থাকিয়া তাঁহার প্রতি দৃষ্টিপাত করিয়া আছেন—সেই বঙ্কিমচন্দ্রের কঠিন আদর্শ ও কঠোর বিচার তাহাকে সর্বপ্রকার শৈথিল্য হইতে রক্ষা করিবে।

অধুনা বঙ্গদেশে যে-কেহ সুলেখক আছেন, বঙ্গদর্শন তাঁহাকে আকর্ষণ করিয়া তাঁহাকে ঐতিহাসিক সূত্রে বঙ্কিমের কালের সহিত গ্রথিত করিয়া লইবে, ইহা বঙ্গসাহিত্য ও বাঙালী লেখকদিগের পক্ষে প্রার্থনীয় বলিয়া আমরা মনে করি। কালের সহিত কালান্তরের যোগসূত্র যতই দৃঢ় হইবে, ভাবের পথ ততই সুদূরবিস্তৃত এবং সাহিত্যের আদর্শ ততই প্রশস্ত হইতে থাকিবে। বঙ্কিমের বঙ্গদর্শন যদি কেবল বঙ্কিমের কালের মধ্যেই স্বতন্ত্র হইয়া থাকে, জীবিতকালের সহিত তাহার প্রত্যক্ষ বন্ধন ছিন্ন হইয়া যায়, তবে স্বভাবের নিয়মে তাহা কালক্রমে ধূলিসমাচ্ছন্ন ইতিহাসের বিবরমধ্যে অদৃশ্যপ্রায় হইয়া আমাদের নিত্যব্যবহারের অতীত হইয়া যাইবে। মহাপুরুষদিগের কীর্তি এক কালকে অন্য কালের সহিত বাঁধিবার জন্য যোগসূত্রের কাজ করে। যাঁহারা জাতিগত মাহাত্ম্যের প্রার্থী, তাঁহারা সেইরূপ কোন যোগসূত্রকেই নষ্ট হইতে দিতে চাহেন না। তাঁহারা অতীতকে ভবিষ্যতের সহিত আবদ্ধ করিয়া জাতীয় জীবনের লীলাভূমিকে সুবিস্তীর্ণ করিবার জন্য সকল প্রকার উপায়ই অবলম্বন করেন। বঙ্গদর্শন বহন করিয়া চলাও বঙ্গসাহিত্যকে অপরিচ্ছিন্ন ও প্রশস্ত রাখিবার একটি উপায়। এই সূত্রযোগে বঙ্গসাহিত্যের যদি একটি মালা গাঁথা যায়, তবে তাহা ছিন্ন হইয়া ইতস্ততঃ বিকীর্ণ হইবে না, বঙ্গলক্ষ্মীর কণ্ঠে চির-ভূষণ হইয়া বিরাজ করিতে থাকিবে। অবশ্য একথা মনে রাখিতে হইবে, এক কালের সহিত অন্য কালের প্রভেদ অনিবার্য। যদিও দীর্ঘকালের ব্যবধান নহে, তথাপি প্রথমে বঙ্গদর্শনের কালের সহিত বর্তমান কালের অনেক প্রভেদ হই-য়াছে। সে প্রভেদ উন্নতির দিকে কি অবনতির দিকে, তাহা নিশ্চয় করিয়া বলা কঠিন ; কিন্তু সে প্রভেদ যে ব্যাপকতার দিকে, তাহা অসংকোচে বলিতে পারি। তখন ইংরাজী রচনার দুরাকাঙ্ক্ষা শিক্ষিত বাঙালীর মধ্যে প্রবল ছিল। শিক্ষিত সম্প্রদায়ের মধ্যে বাঙালী লেখক এবং পাঠক অল্পই ছিল। সেই সংকীর্ণ খাতের মধ্যে বঙ্কিম আপন প্রবল প্রতিভা প্রবাহিত করিয়া সাহিত্যের স্রোতঃপথকে গভীর ও ক্রমশঃ প্রশস্ত করিয়া তুলিয়াছিলেন। তখনকার সেই নির্ঝরধারাটি বঙ্কিমের ব্যক্তিগত প্রবাহের দ্বারা পরিপূর্ণ ছিল। তিনি তাহাকে গতি দিয়াছিলেন এবং তিনি তাহার দিক্‌নির্দেশ করিয়াছিলেন। সেই ধারাটির মধ্যে সর্বত্রই যেন তিনি দৃশ্যমান ও বহমান ছিলেন ; সংকীর্ণ ধারার মধ্যে ব্যক্তি-গত প্রভাবের বেগ ও সৌন্দর্য সুস্পষ্টরূপে প্রত্যক্ষ হয়। আধুনিক সাহিত্যে

আমরা প্রতিভার সেই ব্যক্তিগত প্রভাবের প্রবল স্বাদ উপভোগ করিবার প্রত্যাশা আর করিতে পারিব না। এখন লেখক ও পাঠকের সংখ্যা গণিয়া ওঠা কঠিন; এখন রচনা বিচিত্র; রুচি বিচিত্র। এখন লেখক-পাঠকের মধ্যে নানাপ্রকার শ্রেণীর বিভাগ ঘটিয়াছে। এখন সুলভ সংবাদপত্র প্রকাণ্ড জাল নিক্ষেপ করিয়া দূরদূরান্তর হইতে অগণ্য পাঠক সংগ্রহ করিয়া আনিতেছে এবং নবনব রঙ্গশালা নানা উপায়ে দর্শকদের মনোরঞ্জন করিয়া সাহিত্যপণ্যকে নানা দলের চিত্তাকর্ষক করিবার চেষ্টা করিতেছে।

অতএব এখনকার বঙ্গদর্শন কোন উপায়েই তখনকার বঙ্গদর্শনের স্থান লইতে পারিবে না। এমনকি এই বঙ্গদর্শন সমস্ত শিক্ষিত সম্প্রদায়ের একমাত্র মুখপত্র হইবার আশাও করিতে পারে না। এই বঙ্গদর্শন-সম্পাদক, বঙ্গদর্শনের আদি সম্পাদকের ন্যায় সমস্ত পত্রটিকে নিজের অপ্রতিহত প্রভাবের দ্বারা ব্যাপ্ত করিয়া লেখকদিগকে নিজের প্রতিভাবন্ধনে বাঁধিবার স্পর্ধা রাখেন না। একমাত্র চেষ্টা হইবে, বর্তমান বঙ্গচিত্তের শ্রেষ্ঠ আদর্শকে উপযুক্তভাবে এই পত্রে প্রতিফলিত করা। কাজটা কঠিন। কারণ ক্ষেত্র বিস্তীর্ণ হওয়াতে চিরস্থায়ী সত্যের সহিত বিচিত্র মৃগতৃষ্ণিকার প্রভেদ নির্ণয় করা দুরূহ হইয়াছে। এক্ষণ শিক্ষিত ব্যক্তিগণও স্বভাবতই নানা শক্তির দ্বারা নানা পথে আকৃষ্ট হইতেছেন। কালের বিরাট কণ্ঠস্বর নানা ক্ষুদ্র কোলাহলের দ্বারা বিক্ষিপ্ত। কিন্তু আমরা একান্ত মনে আশা করি, বঙ্গদর্শন এই সকল সামাজিক কলকোলাহল হইতে নিজেকে সুদূরে রক্ষা করিয়া সাহিত্যের আদর্শকে নিত্যকালের অচল শিখরের উপরে প্রতিষ্ঠিত করিবে। এ প্রতিজ্ঞা আমরা বিনয়ের সহিত এবং আশঙ্কার সহিত করিতেছি। সাময়িক অনিত্য আকর্ষণগুলি অত্যন্ত প্রবল; এবং অধিকাংশের রুচি তুমুল কলহ চীৎকারের সহিত যাহা চাহে, তাহা পূর্ণ না করা অত্যন্ত সাহস ও বলের কাজ। অতএব এই মহাজনতার সংঘর্ষে সম্পাদকের ব্রতদণ্ড মাঝে মাঝে স্খলিত হইয়া পড়িবে না, একথা কে বলপূর্বক বলিতে পারে? কিন্তু সেরূপ ব্রতভঙ্গের জন্যও আমরা ক্ষমা চাহি না। আমরা যখন বঙ্গদর্শন আশ্রয় করিয়া সাহিত্যক্ষেত্রে উপস্থিত হইয়াছি তখন আমরা কঠিন বিচার প্রার্থনা করি। ভীরুতা, রুচিভ্রংশ, সত্যের অপলাপ এবং সর্বপ্রকার সাহিত্যনীতির শৈথিল্য আমাদের পক্ষে অমার্জনীয়। আশা করি, সতর্ক পাঠকগণ আমাদিগকে চালনা করিবেন।

লোকমনোমোহিনী বহুমুখী প্রতিভার বলে বঙ্গদর্শন প্রতিষ্ঠিত; মঙ্গলময়ের মঙ্গলাশীর্বাদে সে প্রতিষ্ঠা রক্ষিত হউক।

বৈশাখ ১৩০৮

২/ বড় গল্প বা ছোট উপন্যাস

ইন্দিরা

অনেক দিনের পর আমি শ্বশুরবাড়ি যাইতেছিলাম। আমি উনিশ বৎসরে পড়িয়াছিলাম, তথাপি এ পর্যন্ত শ্বশুরের ঘর করি নাই। তাহার কারণ, আমার পিতা ধনী, শ্বশুর দরিদ্র, বিবাহের কিছু দিন পরেই শ্বশুর আমাকে লইতে লোক পাঠাইয়াছিলেন, কিন্তু পিতা পাঠাইলেন না। বলিলেন, "বিহাইকে বলিও যে, আগে আমার জামাতা উপার্জন করিতে শিখুক—তার পর বধূ লইয়া যাইবেন—এখন আমার মেয়ে লইয়া খাওয়াইবেন কি?" শুনিয়া আমার স্বামীর মনে বড় ঘৃণা জন্মিল—তাঁহার বয়স তখন ২০ বৎসর, তিনি প্রতিজ্ঞা করিলেন যে, স্বয়ং অর্থোপার্জন করিয়া পরিবার প্রতিপালন করিবেন। এই ভাবিয়া তিনি পশ্চিমাঞ্চলে যাত্রা করিলেন। তখন রেইল হয় নাই—পশ্চিমের পথ অতি দুর্গম ছিল। তিনি পদব্রজে, বিনা অর্থে, বিনা সহায়ে, সেই পথ অতিবাহিত করিয়া, পঞ্জাবে গিয়া উপস্থিত হইলেন। যে ইহা পারে, সে অর্থ উপার্জন করিতেও পারে। স্বামী অর্থোপার্জন করিতে লাগিলেন—বাড়িতে টাকা পাঠাইতে লাগিলেন—কিন্তু সাত-আট বৎসর বাড়ি আসিলেন না, বা আমার কোন সংবাদ লইলেন না। যে সময়ে আমার ইতিহাস আরম্ভ করিতেছি, তাহার কিছু পূর্বে তিনি বাড়ি আসিলেন। রব উঠিল যে, তিনি কমিসেরিয়েটের (কমিসেরিয়েট বটে ত?) কর্ম করিয়া অতুল ঐশ্বর্যের অধিপতি হইয়া আসিয়াছেন। আমার শ্বশুর আমার পিতাকে লিখিয়া পাঠাইলেন, "আপনার আশীর্বাদে উপেন্দ্র (আমার স্বামীর নাম উপেন্দ্র—নাম ধরিলাম, প্রাচীনারা মার্জনা করিবেন; হাল আইনে তাঁহাকে "আমার উপেন্দ্র" বলিয়া ডাকাই সম্ভব)—বধূমাতাকে প্রতিপালন করিতে সক্ষম। পালকি-বেহারা পাঠাইলাম, বধূমাতাকে এ বাটীতে পাঠাইয়া দিবেন। নচেৎ আজ্ঞা করিলে পুত্রের বিবাহের আবার সম্বন্ধ করিব।"

পিতা দেখিলেন, নূতন বড়মানুষ বটে। পালকিখানার ভিতরে কিংখাপ মোড়া, উপরে রূপার বিট, বাঁটে রূপার হাঙ্গরের মুখ। দাসী মাগী যে আসিয়া-

ছিল, সে গরদ পরিয়া আসিয়াছে, গলায় বড় মোটা সোনার দানা। চারিজন, কালোদাড়িওয়ালা ভোজপুরে পাল্কির সঙ্গে আসিয়াছিল।

আমার পিতা হরমোহন দত্ত বুনিয়াদি বড়মানুষ। হাসিয়া বলিলেন, "মা ইন্দিরে! আর তোমাকে রাখিতে পারি না। এখন যাও, আবার শীঘ্র তোমাকে লইয়া আসিব। দেখ, আঙ্গুল ফুলে কলাগাছ দেখিয়া হাসিও না।"

তাই আমি শ্বশুরবাড়ি যাইতেছিলাম। আমার শ্বশুরবাড়ি মনোহরপুর। আমার পিত্রালয় মহেশপুর; উভয় গ্রামের মধ্যে দশ ক্রোশ পথ। সুতরাং প্রাতে আহার করিয়া যাত্রা করিয়াছিলাম, পৌঁছিতে পাঁচ দণ্ড হইবে জানিতাম।

পথে কালাদীঘি নামে এক বৃহৎ দীর্ঘিকা আছে, তাহার জল প্রায় অর্ধ ক্রোশ। পাড় পর্বতের ন্যায় উচ্চ। তাহার ভিতর দিয়া পথ। চারিপার্শ্বে বটগাছ। তাহার ছায়া শীতল, জল নীল মেঘের মত, দৃশ্য অতি মনোহর। তথায় মনুষ্যের সমাগম বিরল। ঘাটের উপরে একখানি দোকান আছে মাত্র। নিকটে যে গ্রাম আছে, তাহারও নাম কালাদীঘি।

এই দীঘিতে একা লোকজন আসিতে ভয় করিত। দস্যুতার ভয়ে এখানে দলবদ্ধ না হইয়া লোক আসিত না। এইজন্য লোকে 'ডাকাতে কালাদীঘি' বলিত। দোকানদারকে লোকে দস্যুতার সহায় বলিত। আমার সে সকল ভয় ছিল না। আমার সঙ্গে অনেক লোক—ষোলজন বাহক, চারিজন দ্বারবান, এবং অন্যান্য লোক ছিল।

যখন আমরা এইখানে পহুঁছিলাম, তখন বেলা আড়াই প্রহর। বাহকেরা বলিল যে, আমরা কিছু জলটল না খাইলে আর যাইতে পারি না। দ্বারবানেরা বারণ করিল—বলিল এ স্থান ভাল নয়। বাহকেরা উত্তর করিল, আমরা এত লোক আছি—আমাদিগের ভয় কি? আমার সঙ্গের লোকজন ততক্ষণ কেহই কিছুই খায় নাই। শেষে সকলেই বাহকদিগের মতে মত করিল। দীঘির ঘাটে—বটতলায়—আমার পাল্কি নামাইল। আমি ক্ষণেক পরে অনুভবে বুঝিলাম যে লোকজন তফাতে গিয়াছে। আমি তখন সাহস পাইয়া অল্প দ্বার খুলিয়া দীঘি দেখিতে লাগিলাম। দেখিলাম, বাহকেরা সকলে দোকানের সম্মুখে, এক বটবৃক্ষতলে বসিয়া জলপান খাইতেছে। সে স্থান আমার নিকট হইতে প্রায় দেড় বিঘা। দেখিলাম যে সম্মুখে অতি নিবিড় মেঘের ন্যায় বিশাল দীর্ঘিকা বিস্তৃত রহিয়াছে, চারিপার্শ্বে পর্বতশ্রেণীবৎ উচ্চ, অথচ সুকোমল শ্যামল তৃণাবরণশোভিত 'পাহাড়'; —পাহাড় এবং জলের মধ্যে বিস্তৃত ভূমিতে দীর্ঘ বৃক্ষশ্রেণী; পাহাড়ে অনেক গোবৎস চরিতেছে—জলের উপরে জলচর পক্ষিগণ ক্রীড়া করিতেছে—মৃদু পবনের তরঙ্গহিল্লোলে স্ফটিকভঙ্গ হইতেছে

—ক্ষুদ্রোর্মিপ্রতিঘাতে কদাচিৎ জলজ পুষ্পপত্র এবং শৈবলি দুলিতেছে। দেখিতে পাইলাম যে আমার দ্বারবানেরা জলে নামিয়া স্নান করিতেছে—তাহাদের অঙ্গচালনে তাড়িত হইয়া শ্যামসলিলে শ্বেত মুক্তাহার বিক্ষিপ্ত হইতেছে। দেখিলাম যে বাহকেরা ভিন্ন আমার সঙ্গের লোক সকলেই এককালে স্নানে নামিয়াছে। সঙ্গে দুইজন স্ত্রীলোক—একজন শ্বশুরবাড়ির, একজন বাপের বাড়ির, উভয়েই জলে। আমার মনে একটু ভয় হইল—কেহ নিকটে নাই। স্থান মন্দ, ভাল করে নাই। কি করি, আমি কুলবধূ, মুখ ফুটিয়া কাহাকে ডাকিতে পারিলাম না।

এমত সময়ে পালকির অপর পার্শ্বে কি একটা শব্দ হইল। যেন উপরিস্থ বটবৃক্ষের শাখা হইতে কিছু গুরু পদার্থ পড়িল। আমি সোঁদিগের কপাট অল্প খুলিয়া দেখিলাম। দেখিলাম যে একজন কৃষ্ণবর্ণ বিকটাকার মনুষ্য।

দেখিতে দেখিতে আর-এক মানুষ গাছের উপর হইতে লাফাইয়া পড়িল। দেখিতে দেখিতে আর-একজন, আবার একজন! এইরূপ প্রায় চারিজন এককালীনই গাছ হইতে লাফাইয়া পড়িয়াই—পালকি স্কন্ধে করিয়া উঠাইল। উঠাইয়া ঊর্ধ্বশ্বাসে ছুটিল।

দেখিতে পাইয়া আমার দ্বারবানেরা 'কোন্ হ্যায় রে। কোন্ হ্যায় রে!' রব তুলিয়া জল হইতে দৌড়াইল।

তখন বুঝিলাম যে, আমি দস্যুহস্তে পড়িয়াছি। তখন আর লজ্জায় কি করে! পালকির উভয় দ্বার মুক্ত করিলাম। দেখিলাম যে, আমার সঙ্গের সকল লোকে অত্যন্ত কোলাহল করিয়া পশ্চাদ্ধাবিত হইয়াছে। প্রথমে ভরসা হইল। কিন্তু শীঘ্রই সে ভরসা দূর হইল। তখন নিকটস্থ অন্যান্য বৃক্ষ হইতে লাফাইয়া পড়িয়া বহুসংখ্যক দস্যু দেখা দিতে লাগিল। আমি বলিয়াছি, জলের ধারে বটবৃক্ষের শ্রেণী। সেই সকল বৃক্ষের নীচে দিয়া দস্যুরা পালকি লইয়া যাইতেছিল। সেইসকল বৃক্ষ হইতে মনুষ্য লাফাইয়া পড়িতে লাগিল। তাহাদের কাহারও হাতে বাঁশের লাঠি, কাহারও হাতে বটের ডাল।

লোকসংখ্যা অধিক দেখিয়া আমার সঙ্গের লোকেরা পিছাইয়া পড়িতে লাগিল। তখন আমি নিতান্ত হতাশ্বাস হইয়া মনে করিলাম, লাফাইয়া পড়ি। কিন্তু বাহকেরা যেরূপ দ্রুতবেগে যাইতেছিল—তাহাতে পালকি হইতে নামিলে আঘাতপ্রাপ্তির সম্ভাবনা। বিশেষতঃ একজন দস্যু আমাকে লাঠি দেখাইয়া কহিল যে, "নামিবি ত মাথা ভাঙ্গিয়া দিব।" সুতরাং আমি নিরস্ত হইলাম।

আমি দেখিতে লাগিলাম যে, একজন দ্বারবান অগ্রসর হইয়া আসিয়া পালকি ধরিল, তখন একজন দস্যু তাহাকে লাঠির আঘাত করিল। সে অচেতন

হইয়া মৃত্তিকাতে পড়িল। তাহাকে আর উঠিতে দেখিলাম না। বোধ হয়, সে আর উঠিল না।

ইহা দেখিয়া অবশিষ্ট রক্ষিগণ নিরস্ত হইল। বাহকেরা আমাকে নির্বিঘ্নে লইয়া গেল। রাত্রি এক প্রহর পর্যন্ত তাহারা এইরূপ বহন করিয়া পরিশেষে পালকি নামাইল। দেখিলাম সে স্থান নিবিড় বন—অন্ধকার। দস্যুরা একটা মশাল জ্বালিল। তখন আমাকে কহিল, "তোমার যাহা কিছু আছে দাও—নহিলে প্রাণে মারিব।" আমার অলঙ্কারবস্ত্রাদি সকল দিলাম—অঙ্গের অলঙ্কারও খুলিয়া দিলাম। তাহারা একখানি মলিন, জীর্ণ বস্ত্র দিল, তাহা পরিয়া পরিধানের বহুমূল্য বস্ত্র ছাড়িয়া দিলাম। দস্যুরা আমার সর্বস্ব লইয়া, পালকি ভাঙ্গিয়া রূপা খুলিয়া লইল। পরিশেষে অগ্নি জ্বালিয়া ভগ্ন শিবিকা দাহ করিয়া দস্যুতার চিহ্নমাত্র লোপ করিল।

তখন তাহারাও চলিয়া যায়। সেই নিবিড় অরণ্যে, অন্ধকার রাত্রে, আমাকে বন্য পশুদিগের মুখে সমর্পণ করিয়া যায় দেখিয়া, আমি কাঁদিয়া উঠিলাম। আমি কহিলাম, "তোমাদিগের পায়ে পড়ি, আমাকে সঙ্গে লইয়া চল।" দস্যুর সংসর্গও আমার স্পৃহণীয় হইল।

এক প্রাচীন দস্যু সকরুণভাবে বলিল, "বাছা! অমন রাঙ্গা মেয়ে আমরা কোথায় লইয়া যাইব? এ ডাকাতির এখনই সোহরত হইবে—তোমার মত রাঙ্গা মেয়ে আমাদের সঙ্গে দেখিলেই আমাদের ধরিবে।"

একজন যুবা দস্যু কহিল, "আমি ইহাকে লইয়া ফাটকে যাই সেও ভাল, তবু ইহাকে ছাড়িতে পারি না।" সে আর যাহা বলিল, তাহা আর লিখিতে পারি না—এখন মনে আনিতেও পারি না। সেই প্রাচীন দস্যু ঐ দলের সর্দার। সে যুবাকে লাঠি দেখাইয়া কহিল, "এই লাঠির বাড়িতে এইখানে তোর মাথা ভাঙ্গিয়া রাখিয়া যাইব। ও সকল পাপ কি আমাদের সয়?" তাহারা চলিয়া গেল। যতক্ষণ তাহাদিগের কথাবার্তা শুনা গেল—ততক্ষণ আমার জ্ঞান ছিল। তারপর সেইখানে আমি অজ্ঞান হইয়া পড়িলাম।

দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ

যখন আমার চৈতন্য হইল, তখন কাক কোকিল ডাকিতেছে। বংশপত্রাবচ্ছেদে বালারুণকিরণ ভূমে পতিত হইয়াছে। আমি গাত্রোত্থান করিয়া গ্রামানুসন্ধানে গেলাম। কিছুদূরে গিয়া একখানি গ্রাম পাইলাম। আমার পিত্রালয় যেই গ্রামে, সেই গ্রামের সন্ধান করিলাম; আমার শ্বশুরালয় যে গ্রামে, তাহারও সন্ধান করিলাম। কোন সন্ধান পাইলাম না। দেখিলাম, আমি ইহার অপেক্ষা বনে

ছিলাম ভাল। একে লজ্জায় মুখ ফুটিয়া পুরুষের সঙ্গে কথা কহিতে পারি না, যদি কই, তবে সকলেই আমাকে যুবতী দেখিয়া আমার প্রতি সতৃষ্ণ কটাক্ষ করিতে থাকে। কেহ ব্যঙ্গ করে—কেহ অপমানসূচক কথা বলে। আমি মনে মনে প্রতিজ্ঞা করিলাম, এইখানে মরি, সেও ভাল; তবু আর পুরুষের নিকট কোন কথা জিজ্ঞাসা করিব না। স্ত্রীলোকেরা কেহ কিছু বলিতে পারিল না—তাহারাও আমাকে জন্তু মনে করিতে লাগিল বোধ হয়, কেননা তাহারাও বিস্ময়ের মত চাহিয়া রহিল। কেবল একজন প্রাচীনা বলিল, "মা, তুমি কে? অমন সুন্দর মেয়ে কি পথে ঘাটে একা বেরুতে আছে? আহা মরি, মরি, কি রূপ গা? তুমি আমার ঘরে আইস।" তাহার ঘরে গেলাম। সে আমাকে ক্ষুধাতুরা দেখিয়া খাইতে দিল। সে মহেশপুর চিনিত। তাহাকে আমি বলিলাম যে, তোমাকে টাকা দেওয়াইব—তুমি আমাকে রাখিয়া আইস। তাহাতে সে কহিল যে, আমার ঘর সংসার ফেলিয়া যাইব কি প্রকারে? তখন সে যে পথ বলিয়া দিল, আমি সেই পথে গেলাম। সন্ধ্যা পর্যন্ত পথ হাঁটিলাম —তাহাতে অত্যন্ত শ্রান্তি বোধ হইল। একজন পথিককে জিজ্ঞাসা করিলাম, "হাঁ গা, মহেশপুর এখান হইতে কতদূর?" সে আমাকে দেখিয়া স্তম্ভিতের মত রহিল। অনেকক্ষণ চিন্তা করিয়া কহিল, "তুমি কোথা হইতে আসিতেছ?" যে গ্রামে প্রাচীনা আমাকে পথ বলিয়া দিয়াছিল, আমি সে গ্রামের নাম করিলাম। তাহাতে পথিক কহিল যে, "তুমি পথ ভুলিয়াছ। বরাবর উল্টা আসিয়াছ। মহেশপুর এখান হইতে দুই দিনের পথ।"

আমার মাথা ঘুরিয়া গেল। আমি তাহাকে জিজ্ঞাসা করিলাম, "তুমি কোথায় যাইবে?" সে বলিল, "আমি এই নিকটে গৌরীগ্রামে যাইব।" আমি অগত্যা তাহার পশ্চাৎ পশ্চাৎ চলিলাম।

গ্রামমধ্যে প্রবেশ করিয়া সে আমাকে জিজ্ঞাসা করিল, "তুমি এখানে কাহার বাড়ি যাইবে?" আমি কহিলাম, "আমি এখানে কাহাকেও চিনি না। একটা গাছতলায় শয়ন করিয়া থাকিব।"

পথিক কহিল, "তুমি কি জাতি?"

আমি কহিলাম, "আমি কায়স্থ।"

সে কহিল, "আমি ব্রাহ্মণ। তুমি আমার সঙ্গে আইস। তোমার ময়লা মোটা কাপড় বটে, কিন্তু তুমি বড় ঘরের মেয়ে। ছোট ঘরে এমন রূপ হয় না।"

ছাই রূপ! 'রূপ, রূপ' শুনিয়া আমি জ্বালাতন হইয়া উঠিয়াছিলাম। কিন্তু এ ব্রাহ্মণ প্রাচীন, আমি তাঁহার সঙ্গে গেলাম।

আমি সে রাত্রে ব্রাহ্মণের গৃহে, দুই দিনের পর একটু বিশ্রাম লাভ করিলাম। পর দিন প্রাতে উঠিয়া দেখিলাম যে আমার অত্যন্ত গাত্রবেদনা হইয়াছে। পা ফুলিয়া উঠিয়াছে ; বসিবার শক্তি নাই।

যতদিন না গাত্রের বেদনা আরাম হইল, ততদিন আমাকে কাজে কাজেই ব্রাহ্মণের গৃহে থাকিতে হইল। ব্রাহ্মণ ও তাঁহার গৃহিণী আমাকে যত্ন করিয়া রাখিল। কিন্তু মহেশপুর যাইবার কোন উপায় দেখিলাম না। কোন স্ত্রীলোকই পথ চিনিত না, অথবা যাইতে স্বীকার করিল না। পুরুষে অনেকেই স্বীকৃত হইল—কিন্তু তাহাদিগের সঙ্গে একাকিনী যাইতে ভয় করিতে লাগিল। ব্রাহ্মণও যাইতে নিষেধ করিলেন। বলিলেন, উহাদিগের চরিত্র ভাল নহে, উহাদিগের সঙ্গে যাইও না! উহাদের কি মতলব বলা যায় না। আমি ভদ্রসন্তান হইয়া তোমার ন্যায় সুন্দরীকে পুরুষের সঙ্গে কোথায়ও পাঠাইতে পারি না।” সুতরাং আমি নিরস্ত হইলাম।

একদিন শুনিলাম যে ঐ গ্রামের কৃষ্ণদাস বসু নামক একজন ভদ্রলোক সপরিবারে কলিকাতায় যাইবেন। শুনিয়া আমি ইহা উত্তম সুযোগ বিবেচনা করিলাম। কলিকাতা হইতে আমার পিত্রালয় ও শ্বশুরালয় অনেক দূর বটে, কিন্তু সেখানে আমার জ্ঞাতি খুল্লতাত বিষয়কর্মোপলক্ষে বাস করিতেন। আমি ভাবিলাম যে কলিকাতায় গেলে অবশ্য আমার খুল্লতাতের সন্ধান পাইব। তিনি অবশ্য আমাকে পিত্রালয়ে পাঠাইয়া দিবেন। না হয়, আমার পিতাকে সংবাদ দিবেন।

আমি এই কথা ব্রাহ্মণকে জানাইলাম। ব্রাহ্মণ বলিলেন, “এ উত্তম বিবেচনা করিয়াছ। কৃষ্ণদাসবাবুর সঙ্গে আমার জানাশুনা আছে। আমি তোমাকে সঙ্গে করিয়া লইয়া বলিয়া দিয়া আসিব। তিনি প্রাচীন, আর বড় ভাল মানুষ।”

ব্রাহ্মণ আমাকে কৃষ্ণদাস বাবুর কাছে লইয়া গেলেন। ব্রাহ্মণ কহিলেন, “এটি ভদ্রলোকের কন্যা। বিপাকে পড়িয়া পথ হারাইয়া এদেশে আসিয়া পড়িয়াছেন। আপনি যদি ইহাকে সঙ্গে করিয়া কলিকাতায় লইয়া যান, তবে এ অনাথিনী আপন পিত্রালয়ে পঁহুছিতে পারে।” কৃষ্ণদাসবাবু সম্মত হইলেন। আমি তাঁহার অন্তঃপুরে গেলাম। পরদিন তাঁহার পরিবারস্থ স্ত্রীলোকদিগের সঙ্গে কলিকাতা যাত্রা করিলাম। প্রথম দিন চারিপাঁচ ক্রোশ হাঁটিয়া গঙ্গাতীরে আসিতে হইল। পরদিন নৌকায় উঠিলাম।

কলিকাতায় পঁহুছিলাম। কৃষ্ণদাসবাবু কালীঘাটে পূজা দিতে আসিয়াছিলেন। ভবানীপুরে বাসা করিলেন, আমাকে জিজ্ঞাসা করিলেন,

"তোমার খুড়ার বাড়ি কোথায় ? কলিকাতায় না ভবানীপুরে ?"

তাহা আমি জানিতাম না।

জিজ্ঞাসা করিলেন, "কলিকাতায় কোন্ জায়গায় তাঁহার বাসা ?"

তাহা আমি কিছুই জানিতাম না। আমি জানিতাম, মহেশপুর যেমন একখানি গণ্ডগ্রাম, কলিকাতা তেমনি একখানি গণ্ডগ্রাম মাত্র। একজন ভদ্রলোকের নাম করিলেই লোকে বলিয়া দিবে। এখন দেখিলাম যে, কলিকাতা অনন্ত অট্টালিকার সমুদ্রবিশেষ। আমার জ্ঞাতি খুড়াকে সন্ধান করিবার কোন উপায় দেখিলাম না। কৃষ্ণদাসবাবু আমার হইয়া অনেক সন্ধান করিলেন, কিন্তু কলিকাতায় একজন সামান্য গ্রাম্য লোকের ওরূপ সন্ধান করিলে কি হইবে ?

কৃষ্ণদাসবাবু কালীর পূজা দিয়া কাশী যাইবেন কল্পনা ছিল। পূজা দেওয়া হইল, এক্ষণে সপরিবারে কাশী যাইবার উদ্যোগ করিতে লাগিলেন। আমি কাঁদিতে লাগিলাম। তিনি কহিলেন, "তুমি আমার কথা শুন। রামরাম দত্ত নামে আমার একজন আত্মীয় লোক ঠনঠনিয়ায় বাস করেন। কল্য তাঁহার সঙ্গে আমার সাক্ষাৎ হইয়াছিল। তিনি বলিলেন যে, 'মহাশয়, আমার পাচিকার অভাবে বড় কষ্ট হইয়াছে। আপনাদিগের দেশের অনেক ভদ্রলোকের মেয়ে পরের বাড়ি রাঁধিয়া খায়। আমাকে একটি দিতে পারেন ?' আমি বলিয়াছি, 'চেষ্টা দেখিব।' তুমি এ কার্য স্বীকার কর—নহিলে তোমার উপায় দেখি না। আমার এমত শক্তি নাই যে তোমায় আবার খরচপত্র করিয়া কাশী লইয়া যাই। আর সেখানে গিয়াই বা কি করিবে ? বরং এখানে থাকিলে তোমার খুড়ার সন্ধান করিতে পারিবে।"

অগত্যা স্বীকৃত হইতে হইল, কিন্তু রাত্রিদিন রূপ! রূপ! শুনিয়া আমার কিছু ভয় হইয়াছিল। পুরুষজাতি মাত্র আমার শত্রু বলিয়া বোধ হইয়াছিল। আমি জিজ্ঞাসা করিলাম,

"রামরাম বাবুর বয়স কত ?"

উ। "তিনি আমার মত প্রাচীন।"

"তাহার স্ত্রী বর্তমান কি না ?"

উ। "দুইটি।"

"অন্য পুরুষ তাঁহার বাড়িতে কে থাকে ?"

উ। "তাঁহার দ্বিতীয় পক্ষের পুত্র অবিনাশ, বয়স দশ বৎসর। আর একটি অন্ধ ভাগিনেয়।"

আমি সম্মত হইলাম। পর দিন কৃষ্ণদাসবাবু আমাকে রামরাম দত্তের বাড়ি পাঠাইয়া দিলেন। আমি তাঁহার বাড়ি পাচিকা হইয়া রহিলাম। শেষে কপালে এই ছিল! রাঁধিয়া খাইতে হইল!

তৃতীয় পরিচ্ছেদ

প্রথমে মনে করিলাম যে, আমার বেতনের টাকাগুলি সংগ্রহ করিয়া শীঘ্রই পিত্রালয়ে যাইতে পারিব। কিন্তু মহেশপুর কোথায়, কেহ চিনে না—এমন লোক পাইলাম না যে কোন সুযোগ করিয়া দেয়। মহেশপুর কোন্ জেলা, কোন্ দিকে যাইতে হয়, আমি কুলবধূ, এসকলের কিছুই জানিতাম না, সুতরাং কেহ কিছু বলিতে পারিল না। এইরূপে এক বৎসর রামরাম বাবুর বাড়িতে কাটিল। তাহার পর এক দিন এ অন্ধকার পথে আলো পড়িল, মনে হইল। শ্রাবণের রাত্রে নক্ষত্র দেখিলাম, মনে হইল।

এই সময়ে রামরাম দত্ত একদিন আমাকে ডাকিয়া বলিলেন, "আজ একটি বিশিষ্ট লোককে নিমন্ত্রণ করিয়াছি—তিনি আমার মহাজন, আমি খাদক,—আজিকার পাকশাক যেন পরিপাটি হয়। নহিলে বড় প্রমাদ হইবে।"

আমি যত্ন করিয়া পাক করিলাম। আহারের স্থান অন্তঃপুরেই হইল—সুতরাং আমিই পরিবেশন করিতে প্রবৃত্তা হইলাম। কেবল নিমন্ত্রিত ব্যক্তি এবং রামরামবাবু আহারে বসিলেন।

আমি অগ্রে অন্নব্যঞ্জন দিয়া আসিলাম—পরে তাঁহারা আসিলেন। তাহার পর মাংস দিতে গেলাম। আমি অবগুণ্ঠনবতী, কিন্তু ঘোমটায় স্ত্রীলোকের স্বভাব ঢাকা পড়ে না। ঘোমটার ভিতর হইতে একবার নিমন্ত্রিত বাবুটিকে দেখিয়া লইলাম।

দেখিলাম, তাঁহার বয়স ত্রিশ বৎসর বোধ হয়; তিনি গৌরবর্ণ এবং অত্যন্ত সুপুরুষ; তাঁহাকে দেখিয়াই রমণীমনোহর বলিয়া বোধ হইল। বলিতে কি, আমি মাংসের পাত্র লইয়া একটু দাঁড়াইয়া রহিলাম, আর-একবার তাঁহাকে ভাল করিয়া দেখিলাম। আমি ঘোমটার ভিতর হইতে তাঁহাকে খর দৃষ্টিতে দেখিতে-ছিলাম, এমত সময়ে তিনি মুখ তুলিলেন—দেখিতে পাইলেন যে আমি ঘোমটার ভিতর হইতে তাঁহার প্রতি তীব্র দৃষ্টিতে চাহিয়া আছি। পুরুষে বলিয়া থাকেন যে, অন্ধকারে প্রদীপের মত, অবগুণ্ঠনমধ্যে রমণীর কটাক্ষ অধিকতর তীব্র দেখায়। বোধ হয়, ইনিও সেইরূপ দেখিয়া থাকিবেন। তিনি একটুমাত্র মৃদু হাসিয়া, মুখ নত করিলেন। সে হাসি কেবল আমিই দেখিতে পাইলাম। আমি সমুদায় মাংস তাঁহার পাতে ফেলিয়া দিয়া চলিয়া আসিলাম।

আমি একটু লজ্জিতা, একটু সুখী হইয়া আসিলাম। লজ্জার মাথা খেয়ে বলিতে হইল—আমি নিতান্ত একটুকু সুখী হইয়া আসিলাম না। আমার নারীজন্মে এই প্রথম হাসি—আর কখন কেহ আমাকে দেখিয়া মধুর হাসে নাই। আর সকলের হাসি বিষ লাগিয়াছিল।

এতক্ষণ বোধ হয়, পতিব্রতামণ্ডলী আমার উপর ভ্রূভঙ্গী করিতেছেন এবং বলিতেছেন, "পাপিষ্ঠে, এ যে অনুরাগ।" আমি স্বীকার করিতেছি, এ অনুরাগ। কিন্তু আমি সধবা হইয়াও জন্মবিধবা। বিবাহের সময়ে একবার মাত্র স্বামী-সন্দর্শন হইয়াছিল—সুতরাং যৌবনের প্রবৃত্তিসকল অপরিতৃপ্ত ছিল। এমন গভীর জলে ক্ষেপণীনিক্ষেপেই যে তরঙ্গ উঠিবে, তাহাতে বিচিত্র কি?

আমি স্বীকার করিতেছি যে এ কথা বলিয়া আমি দোষশূন্য হইতে পারিতেছি না। সকারণে হউক, আর নিষ্কারণেই হউক, পাপ সকল অবস্থাতেই পাপ। পাপের নৈমিত্তিকতা নাই। কিন্তু আমার জন্মের মধ্যে এই প্রথম পাপ ও এই শেষ পাপ।

পাকশালায় ফিরিয়া আসিয়া, আমার মনে হইল, আমি ইহাকে পূর্বে কোথাও দেখিয়াছি। সন্দেহভঞ্জনার্থ, আবার অন্তরাল হইতে ইহাকে দেখিতে গেলাম। বিশেষ করিয়া দেখিলাম। দেখিয়া মনে মনে বলিলাম, "চিনিয়াছি।"

এমত সময়ে রামরামবাবু, আবার অন্যান্য খাদ্য লইয়া যাইতে ডাকিয়া বলিলেন। অনেক প্রকার মাংস পাক করিয়াছিলাম—লইয়া গেলাম। দেখিলাম ইনি সেই কটাক্ষটি মনে করিয়া রাখিয়াছেন। রামরাম দত্তকে বলিলেন, "রামরামবাবু, আপনার পাচিকাকে বলুন যে, পাক অতি পরিপাটি হইয়াছে।"

রামরাম ভিতরের কথা কিছু বুঝিলেন না, বলিলেন, "হাঁ উনি রাঁধেন ভাল।"

আমি মনে মনে বলিলাম, "তোমার মাথা ও মুণ্ড রাঁধি।"

নিমন্ত্রিত বাবু কহিলেন, "কিন্তু এ বড় আশ্চর্য যে আপনার বাড়িতে দুই-একখানা ব্যঞ্জন আমাদের দেশের মত পাক হইয়াছে।"

আমি মনে মনে ভাবিলাম, "চিনিয়াছি।" বস্তুতঃ দুই-একখানা ব্যঞ্জন আমাদের নিজ দেশের প্রথামত পাক করিয়াছিলাম।

রামরাম বলিলেন, "তা হবে; ওঁর বাড়ি এ দেশে নয়।"

ইনি এবার বো পাইলেন, একেবারে আমার মুখপানে চাহিয়া জিজ্ঞাসা করিয়া বসিলেন, "তোমাদের বাড়ি কোথা গা?"

আমার প্রথম সমস্যা; কথা কই কি না কই। স্থির করিলাম, কথা কহিব।

দ্বিতীয় সমস্যা, সত্য বলিব না মিথ্যা বলিব। কেন এরূপ স্থির করিলাম, তাহা যিনি স্ত্রীলোকের হৃদয়কে চাতুর্যপ্রিয়, বক্রপথগামী করিয়াছেন, তিনিই জানেন। আমি ভাবিলাম, "আবশ্যক হয়, সত্য কথা বলা আমার হাতেই রহিল। এখন আর-একটা বলিয়া দেখি।" এই ভাবিয়া আমি উত্তর করিলাম,

"আমাদের বাড়ি কালাদীঘি।"

তিনি চমকিয়া উঠিলেন। ক্ষনেক পরে মৃদুস্বরে কহিলেন,

"কোন্ কালাদীঘি, ডাকাতে কালাদীঘি?"

আমি বলিলাম, "হাঁ।"

তিনি আর কিছু বলিলেন না।

আমি মাংসপাত্র হাতে করিয়া দাঁড়াইয়া রহিলাম। দাঁড়াইয়া থাকা আমার যে অকর্তব্য, তাহা আমি ভুলিয়াই গিয়াছিলাম। দেখিলাম যে তিনি আর ভাল করিয়া আহার করিতেছেন না। তাহা দেখিয়া রামরাম দত্ত বলিলেন,

"উপেন্দ্রবাবু, আহার করুন না।" ঐটি শুনিবার আমার বাকি ছিল। উপেন্দ্র বাবু! আমি নাম শুনিবার আগেই চিনিয়াছিলাম, ইনি আমার স্বামী।

আমি পাকশালায় পাত্র ফেলিয়া একবার অনেক কালের পর আহ্লাদ করিতে বসিলাম। রামরাম দত্ত বলিলেন, "কি পড়িল?" আমি মাংসের পাত্রখানা ছুঁড়িয়া ফেলিয়া দিয়াছিলাম।

চতুর্থ পরিচ্ছেদ

এখন হইতে এই ইতিবৃত্তমধ্যে একশত বার আমার স্বামীর উল্লেখ করিবার আবশ্যক হইবে। এখন তোমরা পাঁচজন রসিকা মেয়ে একত্র কমিটিতে বসিয়া পরামর্শ করিয়া বলিয়া দাও, আমি কোন্ শব্দ ব্যবহার করিয়া তাঁহার উল্লেখ করিব? একশত বার 'স্বামী স্বামী' করিয়া কান জ্বালাইয়া দিব? না জামাই বারিকের দৃষ্টান্তানুসারে, স্বামীকে 'উপেন্দ্র' বলিতে আরম্ভ করিব? না, 'প্রাণনাথ', 'প্রাণকান্ত', 'প্রাণেশ্বর', 'প্রাণপতি' এবং 'প্রাণাধিকে'র ছড়াছড়ি করিব? যিনি আমাদিগের সর্বাপ্রিয় সম্বোধনের পাত্র, যাঁহাকে পলকে পলকে ডাকিতে ইচ্ছা করে, তাঁহাকে যে কি বলিয়া ডাকিব, এমন কথা পোড়া দেশের ভাষায় নাই। আমার এক সখী, (সে একটু শহরঘেঁসা মেয়ে) স্বামীকে 'বাবু' বলিয়া ডাকিত—কিন্তু শুধু বাবু বলিতে তাহার মিষ্ট লাগিল না—সে মনোদুঃখে স্বামীকে শেষে 'বাবুরাম' বলিয়া ডাকিতে আরম্ভ করিল। আমারও ইচ্ছা করিতেছে, আমি তাই করি।

মাংসপাত্র ছুড়িয়া ফেলিয়া দিয়া মনে মনে স্থির করিলাম, "যদি বিধাতা

হারাধন মিলাইয়াছে—তবে ছাড়া হইবে না। বালিকার মত লজ্জা করিয়া সব নষ্ট না করি।

এই মনে করিয়া আমি এমত স্থানে দাঁড়াইলাম যে, ভোজনস্থান হইতে বহির্বাটীতে গমনকালে যে এদিক ওদিক চাহিতে চাহিতে যাইবে, সে দেখিতে পাইবে। আমি মনে মনে বলিলাম যে, যদি ইনি এদিক ওদিক চাহিতে চাহিতে না যান, তবে আমি এ কুড়ি বৎসর বয়স পর্যন্ত পুরুষের চরিত্র কিছুই বুঝি নাই। আমি স্পষ্ট কথা বলি, তোমরা আমাকে মার্জনা করিও—আমি মাথার কাপড় ফেলিয়া দিয়া দাঁড়াইয়াছিলাম। এখন লিখিতে লজ্জা করিতেছে, কিন্তু তখন আমার কি দায়, তাহা মনে করিয়া দেখ।

অগ্রে অগ্রে রামরাম দত্ত গেলেন—তিনি কোন দিকে চাহিলেন না। তারপর স্বামী গেলেন—তাঁহার চক্ষু যেন চারিদিকে কাহার অনুসন্ধান করিতেছিল। আমি তাঁহার নয়নপথে পড়িলাম। তাঁহার চক্ষু আমারই অনুসন্ধান করিতেছিল, তাহা বিলক্ষণ জানিতাম। তিনি আমার প্রতি চাহিবামাত্র আমি ইচ্ছাপূর্বক,—কি বলিব, বলিতে লজ্জা করিতেছে—সর্পের যেমন চক্রবিস্তার স্বভাবসিদ্ধ, কটাক্ষও আমাদিগের তাই। যাঁহাকে আপনার স্বামী বলিয়া জানিয়াছিলাম, তাঁহার উপর একটু অধিক করিয়া বিষ ঢালিয়া না দিব কেন? বোধ হয় 'প্রাণনাথ' আহত হইয়া বাহিরে গেলেন।

হারানী নামে, রামরাম দত্তের একজন পরিচারিকা ছিল। আমার সঙ্গে তাহার বড় ভাব—সেও দাসী, আমিও দাসী,—না হইবে কেন? আমি তাহাকে বলিলাম, "ঝি, আমার জন্মের শোধ একবার উপকার কর্। ঐ বাবুটি কখন যাইবেন, আমাকে শীঘ্র খবর আনিয়া দে।"

হারানী মৃদু হাসিল। বলিল, "ছি! দিদিঠাকরুন! তোমার এ রোগ আছে, তা জানিতাম না।"

আমিও হাসিলাম। বলিলাম, "মানুষের সকল দিন সমান যায় না। এখন তুই গুরুমহাশয়গিরি রাখ্—আমার এ উপকার করবি কিনা, বল্।"

হারানী বলিল, "তোমার জন্য এ কাজ আমি করিব। কিন্তু আর কারও জন্য হইলে করিতাম না।"

হারানীর নীতিশিক্ষা এইরূপ।

হারানী স্বীকৃতা হইয়া গেল, কিন্তু ফিরিয়া আসিতে বিলম্ব হইতে লাগিল। ততক্ষণ আমি কাটা মাছের মত ছটফট্ করিতে লাগিলাম। চারিদণ্ড পরে হারানী ফিরিয়া আসিয়া হাসিতে হাসিতে কহিল, "বাবুর অসুখ করিয়াছে—বাবু এ বেলা যাইতে পারিলেন না—আমি তাঁহার বিছানা করিতে আসিয়াছি।"

আমি বলিলাম, "কি জানি, যদি অপরাহ্নে চলিয়া যান—তুই একটু নির্জন পাইলেই তাঁহাকে বলিস্ যে আমাদের রাঁধুনী ঠাকুরানী বলিয়া পাঠাইলেন যে, এ বেলা আপনার খাওয়া ভাল হয় নাই, রাত্রি থাকিয়া খাইয়া যাইবেন। কিন্তু রাঁধুনীর নিমন্ত্রণ, কাহারও সাক্ষাতে প্রকাশ করিবেন না। কোন ছল করিয়া থাকিবেন।" হারানী আবার হাসিয়া বলিল "ছি!" কিন্তু দৌত্যে স্বীকৃতা হইয়া গেল। হারানী অপরাহ্নে আসিয়া আমাকে বলিল, "তুমি যাহা বলিয়াছিলে, তাহা বলিয়াছি। বাবুটি ভাল মানুষ নহেন—রাজি হইয়াছেন।"

শুনিয়া আহ্লাদিত হইলাম, কিন্তু মনে মনে তাঁহাকে একটু নিন্দা করিলাম। আমি চিনিয়াছিলাম যে তিনি আমার স্বামী, এইজন্য যাহা করিতেছিলাম, তাহাতে আমার বিবেচনায় দোষ ছিল না। কিন্তু তিনি যে আমাকে চিনিতে পারিয়াছিলেন, এমত কোনমতেই সম্ভবে না। আমি তাঁহাকে বয়ঃপ্রাপ্ত অবস্থায় দেখিয়াছিলাম—এজন্য আমার প্রথমেই সন্দেহ হইয়াছিল। তিনি আমাকে একাদশ বৎসরের বালিকা দেখিয়াছিলেন মাত্র। তিনি আমাকে চিনিতে পারিয়াছিলেন এমত কোন লক্ষণও দেখান নাই। অতএব তিনি আমাকে পরস্ত্রী জানিয়া যে আমার প্রণয়াশায় লুব্ধ হইলেন, শুনিয়া মনে মনে নিন্দা করিলাম। কিন্তু তিনি স্বামী, আমি স্ত্রী—তাঁহার মন্দ ভাবা আমার অকর্তব্য বলিয়া সে কথার আর আলোচনা করিলাম না। মনে মনে সঙ্কল্প করিলাম যদি কখন দিন পাই, তবে এ স্বভাব ত্যাগ করাইব।

অবস্থিতি করিবার জন্য তাঁহাকে ছল খুঁজিয়া বেড়াইতে হইল না। তিনি কলিকাতায় কারবার আরম্ভ করিয়াছিলেন, সেইজন্য মধ্যে মধ্যে কলিকাতায় আসিতেন। রামরাম দত্তের সঙ্গে তাঁহার দেনাপাওনা ছিল। সেই সূত্রেই তাঁহার সঙ্গে নূতন আত্মীয়তা। অপরাহ্নে তিনি হারানীর কথায় স্বীকৃত হইয়া রামরামের সঙ্গে পুনশ্চ সাক্ষাৎ হইলে বলিলেন, "যদি আসিয়াছি, তবে একবার হিসাবটা দেখিয়া গেলে ভাল হইত।" রামরামবাবু বলিলেন, "ক্ষতি কি? কিন্তু কাগজপত্র সব আড়তে আছে, আনিতে পাঠাই। আসিতে রাত্র হইবে। যদি অনুগ্রহ করিয়া কাল প্রাতে একবার পদার্পণ করেন—কিম্বা অদ্য অবস্থিতি করেন, তবেই হইতে পারে।" তিনি উত্তর করিলেন, "তাহার বিচিত্র কি? এ আমারই ঘর। একবারে কাল প্রাতে যাইব।"

পঞ্চম পরিচ্ছেদ

গভীর রাত্রে সকলে আহারান্তে শয়ন করিলে পর, আমি নিঃশব্দে রামরাম দত্তের বৈঠকখানায় গেলাম। তখন আমার স্বামী একাকী শয়ন করিয়া ছিলেন।

যৌবনপ্রাপ্তির পর আমার এই প্রথম স্বামিসম্ভাষণ। সে যে কি সুখ, তাহা কেমন করিয়া বলিব? আমি অত্যন্ত মুখরা—কিন্তু যখন প্রথম তাঁহার সঙ্গে কথা কহিতে গেলাম, কিছুতেই কথা ফুটিল না। কণ্ঠরোধ হইয়া আসিতে লাগিল। সর্বাঙ্গ কাঁপিতে লাগিল। হৃদয়মধ্যে গুরুতর শব্দ হইতে লাগিল। রসনা শুকাইতে লাগিল। কথা আসিল না বলিয়া আমি কাঁদিয়া ফেলিলাম।

সে অশ্রুজল তিনি বুঝিতে পারিলেন না। তিনি বলিলেন, "কাঁদিলে কেন? আমি ত তোমাকে ডাকি নাই—তুমি আপনি আসিয়াছ,—তবে কাঁদ কেন?"

এই নিদারুণ বাক্যে বড় মর্মপীড়া হইল, তিনি যে আমাকে কুলটা মনে করিতেছেন—ইহাতে চক্ষের প্রবাহ আরও বাড়িল। মনে করিলাম, এখন পরিচয় দিই—এ যন্ত্রণা আর সহ্য হয় না। কিন্তু তখনই মনে হইল যে, পরিচয় দিলে যদি ইনি না বিশ্বাস করেন, যদি মনে করেন যে, ইহার বাড়ি কালাদীঘি, অবশ্য আমার স্ত্রীহরণের বৃত্তান্ত শুনিয়াছে, এক্ষণে ঐশ্বর্যলোভে আমার স্ত্রী বলিয়া মিথ্যা পরিচয় দিতেছে—তাহা হইলে কি প্রকারে ইঁহার বিশ্বাস জন্মাইব? সুতরাং পরিচয় দিলাম না। দীর্ঘনিশ্বাস ত্যাগ করিয়া, চক্ষের জল মুছিয়া, তাঁহার সঙ্গে কথোপকথনে প্রবৃত্ত হইলাম। অন্যান্য কথার পরে তিনি বলিলেন, "কালাদীঘি তোমার বাড়ি শুনিয়া আমি আশ্চর্য হইয়াছি। কালাদীঘিতে যে এমন সুন্দরী জন্মিয়াছে, তাহা আমি স্বপ্নেও জানিতাম না। আমাদিগের দেশে যে এমন সুন্দরী জন্মিয়াছে, তাহা এখন আমার বিশ্বাস হইতেছে না।"

আমি নেকী সাজিয়া বলিলাম, "আমি সুন্দরী না বান্দরী। আমাদের দেশের মধ্যে আপনার স্ত্রীরই সৌন্দর্যের গৌরব।" এই ছলক্রমে তাঁহার স্ত্রীর কথা পাড়িয়াই জিজ্ঞাসা করিলাম, "তাঁহার কি কোন সন্ধান পাওয়া গিয়াছে?"

উত্তর। "না।—তুমি কত দিন দেশ হইতে আসিয়াছ?"

আমি বলিলাম, "আমি সে সকল ব্যাপারের পরেই দেশ হইতে আসিয়াছি। তবে বোধ হয়, আপনি আবার বিবাহ করিয়াছেন।"

উত্তর। "না।"

সপত্নী হয় নাই, শুনিয়া বড় আহ্লাদ হইল। বলিলাম, "আপনারা যেমন বড়লোক, এটি তেমনি বিবেচনার কাজ হইয়াছে। নহিলে যদি এর পরে আপনার স্ত্রীকে পাওয়া যায়, তবে দুই সতীনে ঠেঙ্গাঠেঙ্গি বাধিবে।"

তিনি মৃদু হাসিয়া বলিলেন, "সে ভয় নাই। সে স্ত্রীকে পাইলেও আর

আমি গ্রহণ করিব, এমত বোধ হয় না। তাঁহার আর জাতি নাই, বিবেচনা করিতে হইবে।"

আমার মাথায় বজ্রাঘাত হইল। এত আশা ভরসা সব নষ্ট হইল। তবে আমার পরিচয় পাইলেও, আমাকে আপন স্ত্রী বলিয়া চিনিলেও, আমাকে গ্রহণ করিবেন না! আমার এবারকার নারীজন্ম বৃথায় হইল।

সাহস করিয়া জিজ্ঞাসা করিলাম, "যদি এখন তাঁহার দেখা পান, তবে কি করিবেন?"

তিনি অম্লান বদনে বলিলেন, "তাকে ত্যাগ করিব।"

কি নির্দয়! আমি স্তম্ভিতা হইয়া রহিলাম। পৃথিবী আমার চক্ষে ঘুরিতে লাগিল।

সেই রাত্রে আমি স্বামী-শয্যায় বসিয়া তাঁহার আনন্দিত মোহন মূর্তি দেখিতে দেখিতে প্রতিজ্ঞা করিলাম, "ইনি আমায় স্ত্রী বলিয়া গ্রহণ করিবেন, নচেৎ আমি প্রাণত্যাগ করিব।"

ষষ্ঠ পরিচ্ছেদ

তখন সে চিন্তিত ভাব আমার দূর হইল। ইতিপূর্বেই বুঝিতে পারিয়াছিলাম যে তিনি আমার হাস্যকটাক্ষের বশীভূত হইয়াছিলেন। মনে করিলাম, যদি গণ্ডারের খড়্গপ্রয়োগে পাপ না থাকে, যদি হস্তীর শুণ্ডপ্রয়োগে পাপ না থাকে, যদি ব্যাঘ্রের নখব্যবহারে পাপ না থাকে, যদি মহিষের শৃঙ্গাঘাতে পাপ না থাকে, তবে আমারও পাপ হইবে না। জগদীশ্বর আমাদিগকে যে সকল আয়ুধ দিয়াছেন, উভয়ের মঙ্গলার্থে তাহা প্রয়োগ করিব। আমি তাঁহার নিকট হইতে দূরে আসিয়া বসিলাম। তাঁহার সঙ্গে প্রফুল্ল হইয়া কথা কহিতে লাগিলাম। তিনি নিকটে আসিলেন, আমি তাঁহাকে কহিলাম, "আমার নিকটে আসিবেন না। আপনার একটি ভ্রম জন্মিয়াছে দেখিতেছি", হাসিতে হাসিতে আমি এই কথা বলিলাম এবং বলিতে বলিতে কবরীমোচনপূর্বক (সত্য কথা না বলিলে কে এ ইতিহাস বুঝিতে পারিবে?) আবার বাঁধিতে বসিলাম, "আপনার একটি ভ্রম জন্মিয়াছে। আমি কুলটা নহি। আপনার নিকটে দেশের সংবাদ শুনিব বলিয়াই আসিয়াছি, অসৎ অভিপ্রায় কিছুই নাই।"

বোধ হয় একথা তিনি বিশ্বাস করিলেন না। অগ্রসর হইয়া বসিলেন। আমি তখন হাসিতে হাসিতে বলিলাম, "তুমি কথা শুনিলে না, তবে আমি চলিলাম। তোমার সঙ্গে এই শেষ সাক্ষাৎ", এই বলিয়া আমি গাত্রোত্থান করিলাম।

আমি সত্য সত্যই গাত্রোত্থান করিলাম দেখিয়া তিনি ক্ষুণ্ণ হইলেন; আসিয়া আমার হস্ত ধরিলেন। আমি রাগ করিয়া হস্ত ছুঁড়িয়া ফেলিয়া দিলাম, কিন্তু হাসিলাম, বলিলাম, "তুমি ভালমানুষ নও। আমাকে ছুঁইও না। আমাকে দুশ্চরিত্রা মনে করিও না।"

এই বলিয়া আমি দ্বারের দিকে অগ্রসর হইলাম। স্বামী—অদ্যাপি সে কথা মনে পড়িলে দুঃখ হয়—তিনি হাত যোড় করিয়া ডাকিলেন, "আমাকে রক্ষা কর, রক্ষা কর, যাইও না। আমি তোমার রূপ দেখিয়া পাগল হইয়াছি। এমন রূপ কখন দেখি নাই।" আমি আবার ফিরিলাম—কিন্তু বসিলাম না—বলিলাম, "প্রাণাধিক! আমি কোন্ ছার, আমি যে তোমা হেন রত্ন ত্যাগ করিয়াছি, ইহাতেই আমার মনের দুঃখ বুঝিও। কিন্তু কি করিব? ধর্মই আমাদিগের একমাত্র প্রধান উপায়—একদিনের সুখের জন্য আমি ধর্মত্যাগ করিব না। আমি চলিলাম।"

তিনি বলিলেন, "আমি শপথ করিয়াছি, তুমি চিরকাল আমার হৃদয়েশ্বরী হইয়া থাকিবে। একদিনের জন্য কেন?"

আমি হাসিয়া বলিলাম, "পুরুষের শপথে বিশ্বাস নাই।" এই বলিয়া আবার চলিলাম। দ্বার পর্যন্ত আসিলাম। তখন আর ধৈর্য্যাবলম্বন করিতে না পারিয়া তিনি দুই হস্তে আমার দুই চরণ ধরিয়া পথ রোধ করিলেন।

তাঁহার দশা দেখিয়া আমার দুঃখ হইল। বলিলাম, "তবে তোমার বাসায় চল—এখানে থাকিলে তুমি আমায় ত্যাগ করিয়া যাইবে।"

তিনি তৎক্ষণাৎ সম্মত হইলেন। তাঁহার বাসা সিমলায়, অল্প দূর, সেই রাত্রেই আমাকে সঙ্গে করিয়া লইয়া গেলেন। সেখানে গিয়া দেখিলাম, দুই-মহল বাড়ি। একটি ঘরে আমি অগ্রে প্রবেশ করিলাম। প্রবেশ করিয়াই ভিতর হইতে দ্বার রুদ্ধ করিলাম। স্বামী বাহিরে পড়িয়া রহিলেন।

তিনি বাহির হইতে কাতরোক্তি করিতে লাগিলেন, আমি হাসিতে হাসিতে বলিলাম, "আমি এখন তোমারই দাসী হইলাম, কিন্তু দেখি তোমার প্রণয়ের বেগ কাল প্রাতঃকাল পর্যন্ত থাকে না থাকে। যদি কালও এমনই ভালবাসা দেখিতে পাই, তখন তোমার সঙ্গে আবার আলাপ করিব। আজ এই পর্যন্ত।"

আমি দ্বার খুলিলাম না। অগত্যা তিনি অন্যত্র গিয়া বিশ্রাম করিলেন। অনেক বেলা হইলে দ্বার খুলিলাম। দেখিলাম, স্বামী দ্বারে আসিয়া দাঁড়াইয়া আছেন। আমি আপনার করে তাঁহার কর গ্রহণ করিয়া বলিলাম, "প্রাণনাথ, হয় আমাকে রামরাম দত্তের বাড়ি পাঠাইয়া দাও, নচেৎ অষ্টাহ আমার সঙ্গে

আলাপ করিও না। এই অষ্টাহ তোমার পরীক্ষা।" তিনি অষ্টাহ পরীক্ষা স্বীকার করিলেন।

সপ্তম পরিচ্ছেদ

পুরুষকে দগ্ধ করিবার যে কোন উপায় বিধাতা স্ত্রীলোককে দিয়াছেন সেই সকল উপায় অবলম্বন করিয়া আমি অষ্টাহ স্বামীকে জ্বালাতন করিলাম। আমি স্ত্রীলোক—কেমন করিয়া সে সকল কথা মুখ ফুটিয়া বলিব। আমি যদি আগুন জ্বালিতে না জানিতাম, তবে গত রাত্রে এত আগুন জ্বালিলাম—কি প্রকারে ফুৎকার দিলাম—কি প্রকারে স্বামীর হৃদয় দগ্ধ করিলাম, লজ্জায় তাহার কিছুই বলিতে পারি নাই। যদি আমার কোন পাঠিকা নরহত্যার ব্রত গ্রহণ করিয়া থাকেন, এবং সফল হইয়া থাকেন তবে তিনিই বুঝিবেন। যদি কোন পাঠক কখন এইরূপ নরঘাতিনীর হস্তে পড়িয়া থাকেন, তিনিই বুঝিবেন। বলিতে কি, স্ত্রীলোকেই পৃথিবীর কণ্টক। আমাদের জাতি হইতে পৃথিবীর যত অনিষ্ট ঘটে, পুরুষ হইতে তত ঘটে না। সৌভাগ্য এই যে, এই নরঘাতিনী বিদ্যা সকল স্ত্রীলোকই জানে না, তাহা হইলে এত দিনে পৃথিবীতে আগুন লাগিত।

এই অষ্টাহ আমি সর্বদা স্বামীর কাছে থাকিতাম—আদর করিয়া কথা কহিতাম—নীরস কথা একটি কহিতাম না। হাসি, চাহনি, অঙ্গভঙ্গী,—সে সকল ত ইতর স্ত্রীলোকের অস্ত্র। আমি প্রথম দিনে আদর করিয়া কথা কহিলাম—দ্বিতীয় দিনে অনুরাগলক্ষণ দেখাইলাম—তৃতীয় দিনে তাঁহার ঘরকরনার কাজ করিতে আরম্ভ করিলাম; যাহাতে তাঁহার আহারের পারিপাট্য, শয়নের পারিপাট্য, স্নানের পারিপাট্য হয়, সর্বাংশে যাহাতে ভাল থাকেন, তাহাই করিতে আরম্ভ করিলাম—স্বহস্তে পাক করিতাম; খড়িকাটি পর্যন্ত নিজে প্রস্তুত করিয়া রাখিতাম। লজ্জার কথা কহিব কি?—একদিন একটু কাঁদিলাম; কেন কাঁদিলাম তাহা স্পষ্ট তাঁহাকে জানিতে দিলাম না—অথচ একটু একটু বুঝিতে দিলাম যে অষ্টাহ পরে পাছে বিচ্ছেদ হয়—পাছে তাঁহার অনুরাগ স্থায়ী না হয়, এই আশঙ্কায় কাঁদিতেছি। একদিন তাঁহার একটু অসুখ হইয়াছিল, সমস্ত রাত্রি জাগরণ করিয়া তাঁহার শুশ্রূষা করিলাম। এ সকল পাপাচরণ শুনিয়া আমাকে ঘৃণা করিও না—আমি মুক্তকণ্ঠে বলিতে পারি যে সকলই কৃত্রিম নহে—আমি তাঁহাকে আন্তরিক ভালবাসিতে আরম্ভ করিয়াছিলাম। তিনি যে পরিমাণে আমার প্রতি অনুরাগী, তাহার অধিক আমি তাঁহার প্রতি অনুরাগিণী হইয়াছিলাম। বলা বাহুল্য যে তিনি অষ্টাহ পরে আমাকে মারিয়া তাড়াইয়া দিলেও আমি যাইতাম না।

ইহাও বলা বাহুল্য যে তাঁহার অনুরাগানলে অপরিমিত ঘৃতাহুতি পড়িতেছিল। তিনি এখন অনন্যকর্ম হইয়া কেবল আমার মুখপানে চাহিয়া থাকিতেন। আমি গৃহকর্ম করিতাম—তিনি বালকের মত আমার সঙ্গে সঙ্গে বেড়াইতেন। তাঁহার চিত্তের দুর্দমনীয় বেগ প্রতিপদে দেখিতে পাইতাম, অথচ আমার ইঙ্গিতমাত্রেই স্থির হইতেন। কখন কখন আমার চরণ স্পর্শ করিয়া রোদন করিতেন, বলিতেন, "আমি এ অষ্টাহ তোমার কথা পালন করিব—তুমি আমায় ত্যাগ করিয়া যাইও না।" ফলে আমি দেখিলাম যে আমি তাঁহাকে ত্যাগ করিলে তাঁহার উন্মাদগ্রস্ত হওয়া অসম্ভব নহে।

পরীক্ষার শেষ দিন আমিও তাঁহার সঙ্গে কাঁদিলাম। বলিলাম, "প্রাণাধিক! আমি তোমার সঙ্গে আসিয়া ভাল করি নাই। তোমাকে বৃথা কষ্ট দিলাম। এখন আমার বিবেচনা হইতেছে, পরীক্ষা মিথ্যা ভ্রম মাত্র। মানুষের মন স্থির নয়। তুমি আটদিন আমাকে ভালবাসিলে—কিন্তু আটমাস পরে তোমার এ ভালবাসা থাকিবে কি না, তাহা তুমিও বলিতে পার না। তুমি আমায় ত্যাগ করিলে আমার কি দশা হইবে?"

তিনি হাসিয়া উঠিলেন, বলিলেন, "তোমার যদি এ ভাবনা হয়, তবে আমি তোমাকে এখনই যাবজ্জীবনের উপায় করিয়া দিতেছি। পূর্বেই আমি মনে করিয়াছি, তোমার যাবজ্জীবনের সংস্থান করিয়া দিব।"

আমিও ঐ কথাই পাড়িবার উদ্যোগ করিতেছিলাম; তিনি আপনি পাড়ায় আরও ভাল হইল। আমি তখন বলিলাম, "ছি! তুমি যদি ত্যাগ করিলে তবে আমি টাকা লইয়া কি করিব? ভিক্ষা করিয়া খাইলেও জীবনরক্ষা হয়, কিন্তু তুমি ত্যাগ করিলে জীবনরক্ষা হইবে না। তুমি এমন কোন কাজ কর, যাহাতে আমার বিশ্বাস হয় যে তুমি এ জন্মে আমায় ত্যাগ করিবে না। আজ শেষ পরীক্ষার দিন।"

তিনি বলিলেন, "কি করিব বল। তুমি যাহা বলিবে তাহাই করিব।"

আমি বলিলাম "আমি স্ত্রীলোক, কি বলিব? তুমি আপনি বুঝিয়া কর।" পরে অন্য কথা পাড়িলাম। কথায় কথায় একটা মিথ্যা গল্প করিলাম। তাহাতে কোন ব্যক্তি আপন উপপত্নীকে সমুদায় সম্পত্তি লিখিয়া দিয়াছিল—এই প্রসঙ্গ ছিল।

তিনি গাড়ি প্রস্তুত করিতে বলিলেন। গাড়ি প্রস্তুত হইলে তিনি কোথায় গেলেন। আট দিনের মধ্যে এই তিনি প্রথমে আমার কাছছাড়া হইলেন। ক্ষণেক পরে ফিরিয়া আসিলেন। কোথায় গিয়াছিলেন, তাহা আমাকে কিছু বলিলেন না। আমিও কিছু জিজ্ঞাসা করিলাম না। অপরাহ্নে আবার গেলেন।

এবার একখানি কাগজ হাতে করিয়া আসিলেন। বলিলেন, "ইহা লও। তোমাকে আমার সমস্ত সম্পত্তি লিখিয়া দিলাম। উকীলের বাড়ি হইতে এই দানপত্র লেখাইয়া আনিয়াছি। যদি তোমাকে আমি কখন ত্যাগ করি, তবে আমাকে ভিক্ষা করিয়া খাইতে হইবে।"

এবার আমার অকৃত্রিম অশ্রুজল পড়িল—তিনি আমাকে এত ভালবাসেন! আমি তাঁহার চরণস্পর্শ করিয়া বলিলাম, "আজি হইতে আমি তোমার চির কালের দাসী হইলাম। পরীক্ষা শেষ হইয়াছে।"

অষ্টম পরিচ্ছেদ

তার পরই মনে বলিলাম, "এই বার সোনার চাঁদ, আর কোথা যাইবে? তবে আমাকে নাকি গ্রহণ করিবে না?" যে অভিপ্রায়ে, আমার এত জাল পাতা, তাহা সিদ্ধ হইল। এখন আমি তাঁহার স্ত্রী বলিয়া পরিচয় দিলে, তিনি যদি গ্রহণ না করেন, তবে তাঁহাকে সর্বত্যাগী হইতে হইবে।

আমার পিতা নাম রাখিয়াছিলেন "ইন্দিরা"—মাতা নাম রাখিয়াছিলেন "কুমুদিনী"। শ্বশুরবাড়ি ইন্দিরা নামই জানিত, কিন্তু পিত্রালয়ে অনেকেই কুমুদিনী বলিত। রামরাম দত্তের বাড়িতে আমি কুমুদিনী ভিন্ন ইন্দিরা নাম বলি নাই। ইঁহার কাছে আমি কুমুদিনী ভিন্ন ইন্দিরা নাম প্রকাশ করি নাই। কুমুদিনী নামেই লেখাপড়া হইয়াছিল।

কিছু দিন আমরা কলিকাতায় সুখে স্বচ্ছন্দে রহিলাম। আমি এ পর্যন্ত পরিচয় দিলাম না। ইচ্ছা ছিল, একেবারে মহেশপুরে গিয়া পরিচয় দিব। ছলে কৌশলে স্বামীর নিকট হইতে মহেশপুরের সংবাদ সকল জানিয়াছিলাম—সকলে কুশলে ছিলেন, কিন্তু তাঁহাদের দেখিবার জন্য বড় মন ব্যস্ত হইয়াছিল।

আমি স্বামীকে বলিলাম, "আমি একবার কালাদীঘি যাইয়া পিতামাতাকে দেখিয়া আসিব, আমাকে পাঠাইয়া দাও।"

স্বামী ইহাতে নিতান্ত অনিচ্ছুক। আমাকে ছাড়িয়া দিয়া কি প্রকারে থাকিবেন? কিন্তু এদিকে আমার আজ্ঞাকারী, 'না' বলিতে পারিলেন না। বলিলেন, "কালাদীঘি যাইতে আসিতে এখান হইতে পনের দিনের পথ; এত-দিন তোমাকে না দেখিতে পাইলে আমি মরিয়া যাইব। আমি তোমার সঙ্গে যাইব।"

আমি বলিলাম, "আমিও তাই চাই। কিন্তু তুমি কালাদীঘি গিয়া কোথায় থাকিবে?"

তিনি চিন্তা করিয়া জিজ্ঞাসা করিলেন, "তুমি কালাদীঘিতে কতদিন থাকিবে?"

আমি বলিলাম, "তোমাকে যদি না দেখিতে পাই, তবে পাঁচদিনের বেশী থাকিব না।"

তিনি বলিলেন, "সেই পাঁচদিন আমি বাড়িতে থাকিব, পাঁচদিনের পর তোমাকে কালাদীঘি হইতে লইয়া আসিব।"

এইরূপ কথাবার্তা হইলে পর আমরা যথাকালে শিবিকারোহণে কলিকাতা হইতে যাত্রা করিলাম। তিনি আমাকে কালাদীঘি নামক সেই হতভাগ্য দীঘি পার করিয়া গ্রামের মধ্যে পর্যন্ত পঁহুছিয়া দিয়া নিজালয় অভিমুখে যাত্রা করিলেন।

তিনি পশ্চাৎ ফিরিলে, আমি বাহকদিগকে বলিলাম, "আমি আগে মহেশ-পুর যাইব—তারপর কালাদীঘি আসিব। তোমরা আমাকে মহেশপুর লইয়া চল। যথেষ্ট পুরস্কার দিব।"

তাহারা আমাকে মহেশপুর লইয়া গেল। গ্রামের বাহিরে বাহক ও রক্ষক-দিগকে অবস্থিতি করিতে বলিয়া দিয়া আমি পদব্রজে গ্রামের মধ্যে প্রবেশ করিলাম। পিতার গৃহ সম্মুখে দেখিয়া, এক নির্জন স্থানে বসিয়া অনেক রোদন করিলাম। তাহার পর গৃহমধ্যে প্রবেশ করিলাম। সম্মুখেই পিতাকে দেখিয়া প্রণাম করিলাম। তিনি আমাকে চিনিতে পারিয়া আহ্লাদে বিবশ হইলেন। সে সকল কথা এখানে বলিবার অবসর নাই।

আমি এতদিন কোথায় ছিলাম, কি প্রকারে আসিলাম—তাহা কিছুই বলিলাম না। পিতা মাতা জিজ্ঞাসা করিলে বলিলাম, "এর পরে বলিব।"

পরদিন পিতা আমার শ্বশুরবাড়ি লোক পাঠাইলেন। পত্রবাহককে বলিলেন, "জামাতা যদি বাড়ি না থাকেন, তবে যেখানে থাকেন, সেখানে গিয়া এই পত্র দিয়া আসিবি।"

আমি মাতাকে বলিলাম, "আমি আসিয়াছি, একথা তাঁহাকে জানাইও না। আমি এতদিন ঘরে ছিলাম না, কি জানি, তিনি যদি গ্রহণ করিতে অনিচ্ছুক হন, তবে আসিবেন না। অন্য কোন ছলে এখানে তাঁহাকে আনাও। তিনি এখানে আসিলে আমি সন্দেহ মিটাইব।"

মাতা এ কথা পিতাকে বলিলে তিনি সম্মত হইলেন। পত্রে লিখিলেন, 'আমি উইল করিব। তুমি আমার জামাতা, এবং পরমাত্মীয়, আর সদ্বিবেচক, অতএব তোমার সঙ্গে পরামর্শ করিয়া উইল করিব। তুমি পত্রপাঠ এখানে আসিবে।" তিনি পত্রপাঠ আসিলেন। তিনি এখানে আসিলে পিতা তাঁহাকে যথার্থ কথা জানাইলেন।

শুনিয়া স্বামী মৌনাবলম্বন করিলেন। পরে বলিলেন, "আপনি পূজ্য

ব্যক্তি। যে ছলেই হউক, এখানে আসিয়া যে আপনার দর্শনলাভ করিলাম, ইহাই যথেষ্ট। কিন্তু আপনার কন্যা এতদিন গৃহে ছিলেন না—কোথায় কি চরিত্রে কাহার গৃহে ছিলেন, তাহা কেহ জানে না। অতএব তাঁহাকে আমি গ্রহণ করিব না।"

পিতা মর্মান্তিক পীড়িত হইলেন। একথা মাতাকে বলিলেন, মা আমাকে বলিলেন। আমি সমবয়স্কাদিগের বলিলাম, "তোমরা উঁহাদিগকে চিন্তা করিতে মানা কর। তাঁকে একবার অন্তঃপুরে আন—তাহা হইলেই আমি উঁহাকে গ্রহণ করাইব।"

কিন্তু অন্তঃপুরে আসিতে কোন মতেই স্বীকৃত হইলেন না। বলিলেন, "আমি যে স্ত্রীকে গ্রহণ করিব না, তাহাকে সম্ভাষণও করিব না।" শেষে মাতার রোদন ও সমবয়স্কাদিগের ব্যঙ্গের জ্বালায় সন্ধ্যার পর অন্তঃপুরে জল খাইতে আসিলেন।

তিনি জলযোগ করিতে আসনে বসিলেন। কেহ তাঁহার নিকট দাঁড়াইল না—সকলেই সরিয়া গেল। তিনি অন্যমনে, মুখ নত করিয়া, আহার করিতেছিলেন, এমত সময়ে আমি নিঃশব্দে তাঁহার পশ্চাতে আসিয়া দাঁড়াইয়া তাঁহার চক্ষু টিপিয়া ধরিলাম। তিনি হাসিতে হাসিতে বলিলেন,

"হাঁ দেখ্, কামিনি, তুই আজও কি কচি খুকী যে আমার ঘাড়ের উপর পড়িস্?"

কামিনী আমার কনিষ্ঠা ভগিনীর নাম।

আমি বলিলাম, "আমি কামিনী নই, কে বল, তবে ছাড়িব।"

আমার কণ্ঠস্বর শুনিয়া তিনি চমকিয়া উঠিলেন, বলিলেন, "এ কি এ?"

আমি তাঁহার চক্ষু ছাড়িয়া সম্মুখে দাঁড়াইলাম, বলিলাম, "চতুরচূড়ামণি! আমার নাম ইন্দিরা—আমি হরমোহন দত্তের কন্যা, এই বাড়িতে থাকি। আপনাকে প্রাতঃপ্রণাম—আপনার কুমুদিনীর মঙ্গল ত?"

তিনি অবাক্ হইলেন। আমাকে দেখিয়াই যে তাঁহার আহ্লাদ হইল, তাহা বুঝিতে পারিলাম। বলিলেন, "এ আবার কোন্ রঙ্গ কুমুদিনী? তুমি এখানে কোথা হইতে?"

আমি বলিলাম, "কুমুদিনী আমার আর-একটি নাম। তুমি বড় গোবরগণেশ, তাই এতদিন আমাকে চিনিতে পার নাই। কিন্তু তোমাকে যখন রামরাম দত্তের বাড়ি ভোজন করিতে দেখিয়াছিলাম, আমি তখনই তোমাকে চিনিয়াছিলাম। নচেৎ সে দিন তোমার সঙ্গে সাক্ষাৎ করিতাম না। প্রাণাধিক—আমি কুলটা নহি।"

তিনি একটু আত্মবিস্মৃতের মত হইলেন। পরে জিজ্ঞাসা করিলেন, "তবে এতদিন এত ছলনা করিয়াছিলে কেন?"

আমি বলিলাম, "তুমি প্রথম সাক্ষাতের দিনে বলিয়াছিলে যে তোমার স্ত্রীকে পাইলেও গ্রহণ করিবে না। নচেৎ সেই দিনেই পরিচয় দিতাম।" দানপত্রখানি আমার অঞ্চলে বাঁধিয়া আনিয়াছিলাম। তাহা খুলিয়া দেখাইয়া বলিলাম, "সেই রাত্রেই আমি প্রতিজ্ঞা করিয়াছিলাম যে হয় তুমি আমায় গ্রহণ করিবে, নচেৎ আমি প্রাণত্যাগ করিব।" সেই প্রতিজ্ঞা রক্ষার জন্যই এইখানি লেখাইয়া লইয়াছি। কিন্তু ইহা আমি ভাল করি নাই। তোমার সঙ্গে শঠতা করিয়াছি। তোমার অভিরুচি হয়, আমায় গ্রহণ কর; না অভিরুচি হয়, আমি তোমার উঠান ঝাঁট দিয়া খাইব—তাহা হইলেও তোমাকে দেখিতে পাইব, দানপত্র আমি এই নষ্ট করিলাম।"

এই বলিয়া সেই দানপত্র তাঁহার সম্মুখে খণ্ড খণ্ড করিয়া ছিন্ন করিলাম।

তিনি গাত্রোত্থান করিয়া—আমাকে আলিঙ্গন করিলেন। বলিলেন, "তুমি আমার সর্বস্ব। তোমায় ত্যাগ করিলে আমি প্রাণে মরিব। তুমি আমার গৃহে গৃহিণী হইবে, চল।"

চৈত্র ১২৭৯

রাজসিংহ

প্রথম খণ্ড

প্রথম পরিচ্ছেদ

রাজস্থানের পার্বত্যপ্রদেশে রূপনগর নামে একটি ক্ষুদ্র রাজ্য ছিল। রাজ্য ক্ষুদ্র হউক, বৃহৎ হউক, তার একটা রাজা থাকিবে। রূপনগরেরও রাজা ছিল। কিন্তু রাজ্য ক্ষুদ্র হইলে রাজার নামটি বৃহৎ হওয়ার আপত্তি নাই—রূপনগরের রাজার নাম বিক্রমসিংহ। বিক্রমসিংহের সবিশেষ পরিচয় যদি কেহ জিজ্ঞাসা করেন তবে আমরা বলিতে পারি, শ্রুত আছে যে তিনি স্নানাহার করিতেন, এবং রজনীযোগে নিদ্রা দিতেন, ইহার অধিক পরিচয় আমরা এক্ষণে দিতে ইচ্ছুক নহি।

কিন্তু সম্প্রতি তাঁহার অন্তঃপুরমধ্যে প্রবেশ করিতে আমাদিগের ইচ্ছা। ক্ষুদ্র রাজ্য ; ক্ষুদ্র রাজধানী ; ক্ষুদ্র পুরী। তন্মধ্যে একটি ঘর বড় সুশোভিত। শ্বেত প্রস্তরের মেঝ্যা ; শ্বেত প্রস্তরের প্রাচীর ; তাহাতে বহুবিধ লতা পাতা, পশু পক্ষী এবং মনুষ্যমূর্তি খোদিত। বড় পুরু গালিচা পাতা, তাহার উপর একপাল স্ত্রীলোক, দশজন কি পনরজন, নানা রঙ্গের বস্ত্রের বাহার দিয়া বসিয়া, কেহ তাম্বুল চর্বণ করিতেছে, কেহ আলবোলাতে তামাকু টানিতেছে—কাহারও নাকে বড় বড় মতিদার নথ দুলিতেছে, কাহারও কানে হীরকজড়িত কর্ণভূষা দুলিতেছে। অধিকাংশই যুবতী, হাসি-টিটকারির কিছু ঘটা পড়িয়া গিয়াছে—বলিতে কি একটু রঙ্গ জমিয়া গিয়াছে। কেহ ইহাতে এই অবলাগণকে দূষিও না—যতদিন হাসিবার বয়স আছে—ততদিন ইহারা হাসিয়া লইবে—হাসির অপেক্ষা আর সুখ কি ? চিত্ত যদি নির্মল হয়, আনন্দ যদি পাপশূন্য হয়, তবে এই যৌবনের আনন্দের চেয়ে, যৌবনের হাসির অপেক্ষা সুন্দর আর কিছুই নাই। কাঁদিবার দিন সকলেরই আসিবে, শীঘ্রই আসিবে। যে যত পারে হাসুক, তোমার আমার চোখ রাঙ্গাইয়া কাজ নাই।

যুবতীগণের হাসিবার কারণ, এক প্রাচীনা, কতকগুলি চিত্র বেচিতে আসিয়া তাঁহাদিগের হাতে পড়িয়াছিল। হস্তিদন্তনির্মিত ফলকে লিখিত ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র অপূর্ব চিত্রগুলি ; মহামূল্য। প্রাচীনা বিক্রয়াভিলাষে এক-একখানি চিত্র বস্ত্রাবরণমধ্য হইতে বাহির করিতেছিল ; যুবতীগণ চিত্রিত ব্যক্তির পরিচয় জিজ্ঞাসা করিতেছিল।

প্রাচীনা প্রথম চিত্রখানি বাহির করিলে, এক কামিনী জিজ্ঞাসা করিল, "এ কাহার তসবীর আয়ি ?"

প্রাচীনা বলিল, "এ আক্‌বর বাদশাহের তসবীর।"

যুবতী বলিল, "দূর মাগি, এ দাড়ি যে আমি চিনি। এ আমার ঠাকুরদাদার দাড়ি।"

আর-একজন বলিল, "সে কি লো ? ঠাকুরদাদার নাম দিয়া ঢাকিস কেন ? ও যে তোর বরের দাড়ি।" পরে আর সকলের দিকে ফিরিয়া রসবতী বলিল "ঐ দাড়িতে একদিন একটা বিছা লুকাইয়া ছিল- সই আমার ঝাড়ু দিয়া সেই বিছাটা মারিল।"

তখন হাসির বড় একটা গোল পড়িয়া গেল। চিত্রবিক্রেত্রী তখন আর একখানা ছবি দেখাইল। বলিল, "এখানা জাহাঙ্গীর বাদশাহের ছবি।"

দেখিয়া রসিকা যুবতী বলিল "ইহার দাম কত ?"

প্রাচীনা বড় দাম হাঁকিল, রসিকা পুনরপি জিজ্ঞাসা করিল, "এ ত গেল ছবির দাম। আসল মানুষটা নূরজাঁহা বেগম কততে কিনিয়াছিল ?"

তখন প্রাচীনাও একটু রসিকতা করিল ; বলিল—"বিনামূল্যে।"

রসিকা বলিল, "যদি আসলটার এই দশা, তবে নকলটা ঘরের কড়ি কিছু দিয়া আমাদিগকে দিয়া যাও।"

আবার একটা হাসির গোল পড়িয়া গেল। প্রাচীনা বিরক্ত হইয়া চিত্রগুলি ঢাকিল। বলিল, "হাসিতে মা তসবীর কেনা যায় না। রাজকুমারী আসুন তবে আমি তসবীর দেখাইব। আজ তাঁরই জন্য এ সকল আনিয়াছি।"

তখন সাতজন সাতদিক হইতে বলিল, "ওগো, আমি রাজকুমারী! ও আয়ি বুড়ি, আমি রাজকুমারী।" বৃদ্ধা ফাঁপরে পড়িয়া চারিদিকে চাহিতে লাগিল, আবার আর-একটা হাসির গোল পড়িয়া গেল।

অকস্মাৎ হাসির ধূম কম পড়িয়া গেল—গোলমাল প্রায় থামিল—কেবল তাকাতাকি আঁচাআঁচি, এবং বৃষ্টির পর মন্দ বিদ্যুতের মত ওষ্ঠপ্রান্তে একটু ভাঙ্গা হাসি। চিত্রস্বামিনী কারণ সন্ধান করিবার জন্য পশ্চাৎ ফিরিয়া দেখিলেন, তাঁহার পিছনে কে একখানি দেবীপ্রতিমা দাঁড় করাইয়া গিয়াছে।

বৃদ্ধা অনিমিখ লোচনে সেই সর্বশোভাময়ী ধবলপ্রস্তরনির্মিতা প্রতিমা-পানে চাহিয়া রহিল—কি সুন্দর! বুড়ী বয়সদোষে একটু চোখে খাট, তত পরিষ্কার দেখিতে পায় না—তাহা না হইলে দেখিতে পাইত যে, এ শ্বেত প্রস্তরের বর্ণ নহে ; শাদা পাথর এত গোলাবি আভা মারে না। পাথর দূরে থাকুক, কুসুমেও এ চারু বর্ণ পাওয়া যায় না। দেখিতে দেখিতে বৃদ্ধা দেখিল যে, প্রতিমা মৃদু মৃদু হাসিতেছে। ও মা—পুতুল কি হাসে! বুড়ী তখন মনে মনে ভাবিতে লাগিল এ বুঝি পুতুল নয়—ঐ অতি দীর্ঘ, কৃষ্ণতার, চঞ্চল, সজল, বৃহচ্চক্ষুর্দ্বয় তাহার দিকে চাহিয়া হাসিতেছে।

বুড়ী অবাক্ হইল—এর ওর তার মুখপানে চাহিতে লাগিল—কিন্তু ভাবিয়া ঠিক পাইল না। বিকলচিত্ত রসিকা রমণীমণ্ডলীর মুখপানে চাহিয়া, বৃদ্ধা হাঁপাইতে হাঁপাইতে বলিল, "হাঁ গা, তোমরা বল না গা ?"

এক সুন্দরী হাসি রাখিতে পারিল না—রসের উৎস উছলিয়া উঠিল—হাসির ফোয়ারার মুখ আপনি ছুটিয়া গেল—যুবতী হাসিতে হাসিতে লুটাইয়া পড়িল। সে হাসি দেখিয়া বিস্ময়বিহ্বলা বুড়ী কাঁদিয়া ফেলিল।

তখন সেই প্রতিমা কথা কহিল। অতি মধুর স্বরে জিজ্ঞাসা করিল, "আয়ি, কাঁদিস্ কেন গো ?"

তখন বুড়ী বুঝিল যে, এটা গড়া পুতুল নহে—আদত মানুষ—রাজমহিষী

বা রাজকুমারী হইবে। বুড়ী তখন সাষ্টাঙ্গে প্রণিপাত করিল। এ প্রণাম রাজকুলকে নহে—এ প্রণাম সৌন্দর্যকে। বুড়ী যে সৌন্দর্য দেখিল তাহা দেখিয়া প্রণত হইতে হয়।

আমি জানি রূপের গৌরব ঘরে ঘরে আছে। ইহাও জানি অনেকে সেই রূপসীগণপদতলে গড়াগড়ি দিয়া থাকেন। কিন্তু সে প্রণাম রূপের পায়ে নহে। সে প্রণাম সম্বন্ধের পায়ে। "তুমি আমার গৃহিণী—অতএব তোমাকে আমি প্রণাম করি। তোমার হাতে অন্ন জল—অতএব তোমাকে প্রণাম করি—আমাকে একমুঠা খাইতে দিও"—সে প্রণামের এই মন্ত্র। কিন্তু বুড়ীর প্রণাম সে দরের নহে। বুড়ী বুঝি অনন্ত সুন্দরের অনন্ত সৌন্দর্যের ছায়া দেখিল। **তিনিই** রূপ; **তিনিই** গুণ। যেখানে সে অনন্ত রূপের বা অনন্ত গুণের ছায়া দেখা যায়, সেইখানেই মনুষ্যমস্তক আপনি প্রণত হয়। অতএব বুড়ী সাষ্টাঙ্গ প্রণাম করিল।

দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ

এই ভুবনমোহিনী সুন্দরী, যাকে দেখিয়া চিত্রবিক্রেত্রী প্রণাম করিল, রূপনগরের রাজার কন্যা চঞ্চলকুমারী। যাহারা এতক্ষণ বৃদ্ধাকে লইয়া রঙ্গ করিতেছিল, তাহারা তাঁহার সখীজন এবং দাসী। চঞ্চলকুমারী সেই ঘরে প্রবেশ করিয়া সেই দেখিয়া নীরবে হাস্য করিতেছিলেন। এক্ষণে প্রাচীনাকে মধুর স্বরে জিজ্ঞাসা করিলেন, "তুমি কে গা?"

সখীগণ পরিচয় দিতে ব্যস্ত হইল। "উনি তসবীর বেচিতে আসিয়াছেন?"

চঞ্চলকুমারী বলিল, "তা তোমরা এত হাসিতেছিলে কেন?"

কেহ কেহ কিছু কিছু অপ্রতিভ হইল। যিনি সহচরীকে ঝাড়ুদারি রসিকতাটা করিয়াছিলেন তিনি বলিলেন, "আমাদের দোষ কি? আয়ি বুড়ী যত সেকেলে বাদশাহের তসবীর আনিয়া দেখাইতেছিল—তাই আমরা হাসিতেছিলাম—আমাদের রাজারাজড়ার ঘরে আকবর বাদশাহ কি জাঁহাগীর বাদশাহের তসবীর কি নাই?"

বৃদ্ধা কহিল, "থাকবে না কেন মা? একখানা থাকিলে কি আর-একখানা লইতে নাই? আপনারা লইবেন না, তবে আমরা কাঙ্গাল গরিব প্রতিপালন হইব কি প্রকারে?"

রাজকুমারী তখন প্রাচীনার তসবীর সকলে দেখিতে চাহিলেন। প্রাচীনা একে একে তসবীরগুলি রাজকুমারীকে দেখাইতে লাগিল। আকবর বাদশাহ,

জাঁহাগীর, শাহা জাঁহা, নূরজাঁহা, নূরমহালের চিত্র দেখাইল। রাজকুমারী হাসিয়া হাসিয়া সকলগুলি ফিরাইয়া দিলেন—বলিলেন, "ইহারা আমাদের কুটুম্ব, ঘরে ঢের তসবীর আছে। হিন্দু রাজার তসবীর আছে?"

"অভাব কি?" বলিয়া প্রাচীনা, রাজা মানসিংহ, রাজা বীরবল, রাজা জয়সিংহ প্রভৃতির চিত্র দেখাইল। রাজপুত্রী তাহাও ফিরাইয়া দিলেন, বলিলেন, "এও লইব না। এ সকল হিন্দু নয়, ইহারা মুসলমানের চাকর।"

প্রাচীনা তখন হাসিয়া বলিল, "মা, কে কার চাকর, তা আমি ত জানি না। আমার যা আছে, দেখাই, পসন্দ করিয়া লও।"

প্রাচীনা চিত্র দেখাইতে লাগিল। রাজকুমারী পছন্দ করিয়া রাণা প্রতাপ, রাণা অমরসিংহ, রাণা কর্ণ, যশোবন্ত সিংহ প্রভৃতি কয়খানি চিত্র ক্রয় করিলেন। একখানি বৃদ্ধা ঢাকিয়া রাখিল—দেখাইল না।

রাজকুমারী জিজ্ঞাসা করিলেন, "ওখানি ঢাকিয়া রাখিলে যে?" বৃদ্ধা কথা কহে না। রাজকুমারী পুনরপি জিজ্ঞাসা করিলেন।

বৃদ্ধা ভীতা হইয়া করযোড়ে কহিল, "আমার অপরাধ লইবেন না—অসাবধানে ঘটিয়াছে—অন্য তসবীরের সঙ্গে আসিয়াছে।"

রাজকুমারী বলিলেন, "অত ভয় পাইতেছ কেন? এমন কাহার তসবীর যে দেখাইতে ভয় পাইতেছ?"

বুড়ী। দেখিয়া কাজ নাই। আপনার ঘরের দুষমনের ছবি।

রাজকুমারী। কার তসবীর?

বুড়ী। (সভয়ে)। রাণা রাজসিংহের।

রাজকুমারী হাসিয়া বলিলেন, "বীরপুরুষ স্ত্রীজাতির কখনও শত্রু নহে। আমি ও তসবীর লইব।"

তখন বৃদ্ধা রাজসিংহের চিত্র তাঁহার হস্তে দিল। চিত্র হাতে লইয়া রাজকুমারী অনেকক্ষণ ধরিয়া তাহা নিরীক্ষণ করিতে লাগিলেন; দেখিতে দেখিতে তাঁহার মুখ প্রফুল্ল হইল; লোচন বিস্ফারিত হইল। একজন সখী, তাঁহার ভাব দেখিয়া চিত্র দেখিতে চাহিল—রাজকুমারী তাহার হস্তে চিত্র দিয়া বলিলেন, "দেখ। দেখিবার যোগ্য বটে। বীরপুরুষের চেহারা।"

সখীগণের হাতে হাতে সে চিত্র ফিরিতে লাগিল। রাজসিংহ যুবা পুরুষ নহেন—তথাপি তাঁহার চিত্র দেখিয়া সকলে প্রশংসা করিতে লাগিল।

বৃদ্ধা সুযোগ পাইয়া এই চিত্রখানিতে দ্বিগুণ মুনফা করিল। তারপর লোভ পাইয়া বলিল, "ঠাকুরাণি, যদি বীরের তসবীর লইতে হয়, তবে আরএকখানি দিতেছি। ইহার মত পৃথিবীতে বীর কে?"

এই বলিয়া বৃদ্ধা আর একখানি চিত্র বাহির করিয়া রাজপুত্রীর হাতে দিল।

রাজকুমারী জিজ্ঞাসা করিলেন, "এ কাহার চেহারা ?"

বৃদ্ধা। বাদশাহ আলমগীরের।

রাজকুমারী। কিনিব।

এই বলিয়া একজন পরিচারিকাকে রাজপুত্রী ক্রীত চিত্রগুলির মূল্য আনিয়া বৃদ্ধাকে বিদায় করিয়া দিতে বলিলেন। পরিচারিকা মূল্য আনিতে গেল, ইত্যবসরে রাজপুত্রী সখীগণকে বলিলেন, "এসো একটু আমোদ করা যাক্।"

রঙ্গপ্রিয়া বয়স্যাগণ বলিল, "কি আমোদ বল ! বল !"

রাজপুত্রী বলিলেন, "আমি এই আলমগীর বাদশাহের চিত্রখানি মাটীতে রাখিতেছি। সবাই উহার মুখে এক-একটি বা পায়ের নাতি মার। কার নাতিতে উহার নাক ভাঙ্গে দেখি।"

ভয়ে সখীগণের মুখ শুকাইয়া গেল। একজন বলিল, "অমন কথা মুখে আনিও না, কুমারীজী। কাকপক্ষীতে শুনিলেও রূপনগরের গড়ের একখানি প্রস্তর থাকিবে না।"

হাসিয়া রাজপুত্রী চিত্রখানি মাটীতে রাখিলেন, "কে নাতি মারিবি মার্।"

কেহ অগ্রসর হইল না। নির্মল নাম্নী এক বয়স্যা আসিয়া রাজকুমারীর মুখ টিপিয়া ধরিল। বলিল, "অমন কথা আর বলিও না।"

চঞ্চলকুমারী ধীরে ধীরে অলঙ্কারশোভিত বামচরণখানি ঔরঙ্গজেবের চিত্রের উপরে সংস্থাপিত করিলেন—চিত্রের শোভা বুঝি বাড়িয়া গেল। চঞ্চলকুমারী একটু হেলিলেন—মড় মড় শব্দ হইল—ঔরঙ্গজেব বাদশাহের প্রতিমূর্ত্তি রাজপুত-কুমারীর চরণতলে ভাঙ্গিয়া গেল।

"কি সর্বনাশ ! কি করিলে !" বলিয়া সখীগণ শিহরিল।

রাজপুত-কুমারী হাসিয়া বলিলেন, "যেমন ছেলেরা পুতুল খেলিয়া সংসারের সাধ মিটায়, আমি তেমনি মোগল বাদশাহের মুখে নাতি মারার সাধ মিটাইলাম।" তার পর নির্মলের মুখপ্রতি চাহিয়া বলিলেন, "সখি নির্মল ! ছেলেদের সাধ মিটে ; সময়ে তাহাদের সত্যের ঘর-সংসার হয়। আমার কি সাধ মিটিবে না ? আমি কি কখন জীবন্ত ঔরঙ্গজেবের মুখে এইরূপ—"

নির্মল, রাজকুমারীর মুখ চাপিয়া ধরিলেন। কথাটা সমাপ্ত হইল না—কিন্তু সকলেই তাহার অর্থ বুঝিল। প্রাচীনার হৃদয় কম্পিত হইতে লাগিল—এমন প্রাণসংহারক কথাবার্তা যেখানে হয়, সেখান হইতে কতক্ষণে নিষ্কৃতি পাইবে ?

এই সময়ে তাহার বিক্রীত তসবীরের মূল্য আসিয়া পৌঁছিল। প্রাপ্তিমাত্র প্রাচীনা উর্দ্ধশ্বাসে পলায়ন করিল।

সে ঘরের বাহিরে আসিলে, নির্ম্মল তাহার পশ্চাৎ পশ্চাৎ ছুটিয়া আসিল। আসিয়া, তাহার হাতে একটি মোহর দিয়া বলিল, "আয়িবুড়ি, দেখিও, যাহা শুনিলে কাহারও সাক্ষাতে মুখে আনিও না। রাজকুমারীর মুখের আটক নাই—এখনও উঁহার ছেলে বয়স।"

বুড়ী মোহরটি লইয়া বলিল, "তা এ কি আর বলতে হয় মা। আমি তোমাদের দাসী—আমি কি আর এ সকল কথা মুখে আনি।"

নির্ম্মল সন্তুষ্ট হইয়া ফিরিয়া গেল।

তৃতীয় পরিচ্ছেদ

বুড়ী আসিল। তাহার বাড়ি বুঁদি। সে চিত্রগুলি দেশে দেশে বিক্রয় করে। বুড়ী রূপনগর হইতে বুঁদি গেল। সেখানে গিয়া দেখিল তাহার পুত্র আসিয়াছে। তাহার পুত্র দিল্লীতে দোকান করে।

কুক্ষণে বুড়ী রূপনগরে চিত্র বিক্রয় করিতে গিয়াছিল। চঞ্চলকুমারীর সাহসের কাণ্ড যাহা দেখিয়া আসিয়াছিল, তাহা কাহারও কাছে বলিতে না পাইয়া, বুড়ীর মন অস্থির হইয়া উঠিয়াছিল। যদি নির্ম্মলকুমারী তাহাকে পুরস্কার দিয়া কথা প্রকাশ করিতে নিষেধ করিয়া না দিত, তবে বোধ হয় বুড়ীর মন এত ব্যস্ত না হইলেও হইতে পারিত। কিন্তু যখন সে কথা প্রকাশ করিবার জন্য বিশেষ নিষেধ হইয়াছে তখন বুড়ীর মন, কাজে কাজেই কথাটি বলিবার জন্য বড়ই আকুল হইয়া উঠিল। বুড়ী কি করে, একে সত্য করিয়া আসিয়াছে, তাহাতে হাত পাতিয়া মোহর লইয়া নিমক্ খাইয়াছে, কথা প্রকাশ পাইলেও দুরন্ত বাদশাহের হস্তে চঞ্চলকুমারীর বিশেষ অনিষ্ট ঘটিবার সম্ভাবনা তাহাও বুঝিতেছে। হঠাৎ কথা কাহারও সাক্ষাতে বলিতে পারিল না। কিন্তু বুড়ীর আর দিবসে আহার হয় না—রাত্রে নিদ্রা হয় না। শেষ আপনা আপনি শপথ করিল যে এ কথা কাহারও সাক্ষাতে বলিব না। তাহার পরেই তাহার পুত্র আহার করিতে বসিল—বুড়ী আর থাকিতে পারিল না—শপথ ভঙ্গ করিয়া পুত্রের সাক্ষাতে সবিস্তারে চঞ্চলকুমারীর দুঃসাহসের কথা বিবৃত করিল। মনে করিল, আপনার পুত্রের সাক্ষাতে বলিলাম, তাহাতে ক্ষতি কি? পুত্রকে বিশেষ করিয়া বলিয়া দিল—আমার দিব্য, এ কথা কাহার কাছে বলিও না।

পুত্র স্বীকার করিল, কিন্তু দিল্লী ফিরিয়া গিয়াই, আপনার উপপত্নীর কাছে গল্প করিল। বলিয়া দিল, জান! কাহারও সাক্ষাতে বলিও না। জান,

তখনই আপনার প্রিয় সখীর কাছে গিয়া বলিল। তাহার প্রিয়সখী দুই চারি দিন বাদশাহের অন্তঃপুরে গিয়া বাঁদী স্বরূপ নিযুক্ত হইল। সে অন্তঃপুরে পরিচারিকাগণের নিকট এই রহস্যের গল্প করিল। ক্রমে বাদশাহের বেগমেরা শুনিল। যোধপুরী বেগম বাদশাহের কাছে গল্প করিল।

ঔরঙ্গজেব সসাগরা ভারতের অধীশ্বর। ঈদৃশ ঐশ্বর্য্যশালী রাজাধিরাজ এক চঞ্চলা বালিকার কথায় রাগ করিবেন ইহা কোন প্রকারে সম্ভব নহে। কিন্তু ক্রূরমনা ঔরঙ্গজেব সে প্রকৃতির বাদশাহ ছিলেন না। যে যত ক্ষুদ্র হৌক, যে যেমন মহৎ হউক, কেহ তাঁহার প্রতিহিংসার অতীত নহে। অমনি স্থির করিলেন যে, সেই অপরিপক্কবুদ্ধি বালিকাকে ইহার গুরুতর প্রতিফল দিবেন। বেগমকে বলিলেন, "রূপনগরের রাজকুমারী দিল্লীর রাজপুরে আসিয়া বাঁদীদিগের তামাকু সাজিবে।"

যোধপুরেশ্বরকুমারী শিহরিয়া উঠিল—বলিল "সে কি জাঁহাপনা! যাঁহার আজ্ঞায় প্রতিদিন রাজরাজেশ্বরগণ রাজ্যচ্যুত হইতেছে—এক সামান্যা বালিকা কি তাঁহার ক্রোধের যোগ্য!"

রাজেন্দ্র হাসিলেন—কিছু বলিলেন না, কিন্তু সেই দিনেই চঞ্চলকুমারীর সর্বনাশের উদ্যোগ হইল। রূপনগরের ক্ষুদ্র রাজার উপর এক আদেশপত্র জারি হইল। যে অদ্বিতীয় কুটিলতা-ভয়ে জয়সিংহ ও যশোবন্তসিংহ প্রভৃতি সেনাপতিগণ ও আজিমশাহ প্রভৃতি শাহজাদাগণ সর্বদা শশব্যস্ত—যে অভেদ্য কুটিলতাজালে বদ্ধ হইয়া চতুরাগ্রগণ্য শিবজীও দিল্লীতে কারাবদ্ধ হইয়াছিলেন—এই আজ্ঞাপত্র সেই কুটিলতাপ্রসূত। তাহাতে লিখিত হইল যে, "বাদশাহ রূপনগরের রাজকুমারীর অপূর্ব রূপলাবণ্য শ্রবণে মুগ্ধ হইয়াছেন। আর রূপনগরের রাজার সৎস্বভাব ও রাজভক্তিতে বাদশাহ প্রীত হইয়াছেন। অতএব বাদশাহ রাজকুমারীর পাণিগ্রহণ করিয়া তাঁহার সেই রাজভক্তি পুরস্কৃত করিতে ইচ্ছা করেন। রাজা কন্যাকে দিল্লীতে পাঠাইবার উদ্যোগ করিতে থাকুন; শীঘ্র রাজসৈন্য আসিয়া কন্যাকে দিল্লীতে লইয়া যাইবে।"

এই সংবাদ রূপনগরে আসিবামাত্র মহা হুলস্থুল পড়িয়া গেল। রূপনগরে আর আনন্দের সীমা রহিল না। যোধপুর, অম্বর প্রভৃতি বড় বড় রাজপুত রাজগণ মোগল বাদশাহকে কন্যা দান করা অতি গুরুতর সৌভাগ্যের বিষয় বলিয়া বিবেচনা করেন। সে স্থলে রূপনগরের ক্ষুদ্রজীবী রাজার অদৃষ্টে এই শুভফল বড়ই আনন্দের বিষয় বলিয়া সিদ্ধ হইল। বাদশাহের বাদশাহ—যাঁহার সমকক্ষ মনুষ্যলোকে কেহ নাই—তিনি জামাতা হইবেন—চঞ্চলকুমারী পৃথিবীশ্বরী হইবেন—ইহার অপেক্ষা আর সৌভাগ্যের বিষয় কি আছে?

রাজা, রাজরাণী, পৌরজন, রূপনগরের প্রজাবর্গ আনন্দে মাতিয়া উঠিল। রাণী একলিঙ্গের পূজা পাঠাইয়া দিলেন; রাজা এই সুযোগে কোন্ ভূম্যধিকারীর কোন্ কোন্ গ্রাম কাড়িয়া লইবেন তাহার ফর্দ করিতে লাগিলেন।

কেবল চঞ্চলকুমারীর সখীগণ নিরানন্দ। তাহারা জানিত যে এ সম্বন্ধে মোগলদ্বেষিণী চঞ্চলকুমারীর সুখ নাই।

চতুর্থ পরিচ্ছেদ

নির্মল, ধীরে ধীরে রাজকুমারীর কাছে গিয়া বসিল। দেখিল, রাজকুমারী একা বসিয়া কাঁদিতেছেন। সে দিন যে চিত্রগুলি ক্রীত হইয়াছিল, তাহার একখানি রাজকুমারীর হাতে দেখিল। নির্মলকে দেখিয়া চঞ্চল চিত্রখানি উল্টাইয়া রাখিলেন—কাহার চিত্র নির্মল তাহা দেখিতে পাইল না। নির্মল কাছে গিয়া বসিয়া বলিল--"এখন উপায় ?"

চঞ্চল। উপায় যাই হউক---আমি মোগলের দাসী কখনই হইব না।

নির্মল। তোমার অমত তা ত জানি, কিন্তু আলমগীর বাদশাহের হুকুম, রাজার কি সাধ্য যে অন্যথা করেন? উপায় নাই, সখি!—সুতরাং তোমাকে ইহা অবশ্য স্বীকার করিতে হইবে। আর স্বীকার করা ত সৌভাগ্যের বিষয়। যোধপুর বল, অম্বর বল, রাজা, বাদশাহ, ওমরাহ, নবাব, সুবা, যাহা বল, পৃথিবীতে এত বড় লোক কে আছে যে, তাহার কন্যা দিল্লীর তক্তে বসিতে বাসনা করে না? পৃথিবীশ্বরী হইতে তোমার এত অসাধ কেন?

চঞ্চল রাগ করিয়া বলিল, "তুই এখান হইতে উঠিয়া যা।"

নির্মল দেখিল, ওপথে কিছু হইবে না। তবে আর কোন্ পথে রাজকুমারীর কিছু উপকার করিতে পারে তাহার সন্ধান করিতে লাগিল। বলিল, "আমি যেন উঠিয়া গেলাম—কিন্তু যাঁহার দ্বারা প্রতিপালন হইতেছি, আমাকে তাঁহার হিত খুঁজিতে হয়। তুমি যদি দিল্লী না যাও, তবে তোমার বাপের দশা কি হইবে তাহা কি একবার ভাবিয়াছ?"

চ। ভাবিয়াছি। আমি যদি না যাই, তবে আমার পিতার কাঁধে মাথা থাকিবে না—রূপনগরের গড়ের একখানি পাথর থাকিবে না। তা ভাবিয়াছি —আমি পিতৃহত্যা করিব না। বাদশাহের ফৌজ আসিলেই আমি তাহাদিগের সঙ্গে দিল্লীযাত্রা করিব। ইহা স্থির করিয়াছি।

নির্মল প্রসন্ন হইল। বলিল, "আমিও সেই পরামর্শই দিতেছিলাম।"

রাজকুমারী আবার ভ্রূভঙ্গী করিলেন—বলিলেন, "তুই কি মনে করেছিস্ যে আমি দিল্লীতে গিয়া মুসলমান বানরের শয্যায় শয়ন করিব? হংসী কি বকের সেবা করে?"

নির্মল কিছুই বুঝিতে না পারিয়া জিজ্ঞাসা করিল, "তবে কি করিবে ?"

চঞ্চলকুমারী হস্তের একটি অঙ্গুরীয় নির্মলকে দেখাইল। বলিল, "দিল্লীর পথে বিষ খাইব।" নির্মল জানিত ঐ অঙ্গুরীয়তে বিষ আছে।

নির্মল শিহরিয়া উঠিল ; কাঁদিতে কাঁদিতে বলিল, "আর কি কোন উপায় নাই ?"

চঞ্চল বলিল, "আর উপায় কি সখি ? কে এমন বীর পৃথিবীতে আছে যে আমায় উদ্ধার করিয়া দিল্লীশ্বরের সহিত শত্রুতা করিবে ? রাজপুতানার কুলাঙ্গার সকলি মোগলের দাস—আর কি সংগ্রাম আছে না প্রতাপ আছে ?"

নির্মল। কি বল রাজকুমারি ! সংগ্রাম কি প্রতাপ যদি থাকিত, তবে তাহারাই বা তোমার জন্য সর্ব্বস্ব পণ করিয়া দিল্লীর বাদশাহের সঙ্গে বিবাদ করিবে কেন ? পরের জন্য কেহ সহজে সর্বস্ব পণ করে না। প্রতাপ নাই, কিন্তু রাজসিংহ আছে—কিন্তু তোমার জন্য রাজসিংহ সর্বস্ব পণ করিবে কেন ? বিশেষ তুমি মাড়বারের ঘরানা।

চঞ্চল। সে কি ? বাহুতে বল থাকিতে কোন্ রাজপুত শরণাগতকে রক্ষা করে নাই ? আমি তাই ভাবিতেছিলাম নির্মল—আমি এ বিপদে সেই সংগ্রাম-প্রতাপের বংশতিলকেরই শরণ লইব—তিনি কি আমায় রক্ষা করিবেন না ?

বলিতে বলিতে চঞ্চলদেবী ঢাকা ছবিখানি উল্টাইলেন—নির্মল দেখিল সে রাজসিংহের মূর্তি। চিত্র দেখাইয়া রাজকুমারী বলিতে লাগিলেন, "দেখ সখি, এ রাজকান্তি দেখিয়া তোমার কি বিশ্বাস হয় না যে ইনি অগতির গতি, অনাথার রক্ষক ? আমি যদি ইঁহার শরণ লই ইঁনি কি রক্ষা করিবেন না ?"

নির্মলকুমারী অতি স্থিরবুদ্ধিশালিনী—চঞ্চলের সহোদরাধিকা। নির্মল অনেক ভাবিল। শেষে চঞ্চলের প্রতি স্থির দৃষ্টি করিয়া জিজ্ঞাসা করিল, "রাজকুমারী—যে বীর তোমাকে এ বিপদ হইতে রক্ষা করিবে, তাহাকে তুমি কি দিবে ?"

রাজকুমারী বুঝিলেন। স্থির কাতর অথচ অবিকম্পিত কণ্ঠে বলিলেন, "যে রাজপুত হইয়া, আমাকে এই বিপদ হইতে উদ্ধার করিবে—সে রাজা হউক ভিক্ষুক হউক রূপবান্ হউক কুরূপ হউক যুবা হউক বৃদ্ধ হউক—যেই হউক—সে যদি আমায় যথাশাস্ত্র গ্রহণ করে তবে আমি চিরকাল তাহার দাসী হইব।"

নির্মল কিছু প্রসন্ন হইল। বলিল, "রাজসিংহের বাহুতে শুনিয়াছি বল আছে ; তাঁর কাছে কি দূত পাঠান যায় না। গোপনে—কেহ জানিতে না পারে এরূপ দূত কি তাঁহার কাছে যায় না ?"

চঞ্চল ভাবিল। বলিল, "তুমি আমার গুরুদেবকে ডাকিতে পাঠাও।

আমায় আর কে তেমন ভালবাসে ? কিন্তু তাঁহাকে সকল কথা বুঝাইয়া বলিয়া আমার কাছে আনিও। সকল কথা বলিতে আমার লজ্জা করিবে।”

নির্মলা উঠিয়া গেল। কিন্তু তাহার মনে কিছুমাত্র ভরসা হইল না। সে কাঁদিতে কাঁদিতে গেল।

পঞ্চম পরিচ্ছেদ

অনন্ত মিশ্র, চঞ্চলকুমারীর পিতৃকুল-পুরোহিত। কন্যানির্বিশেষে, চঞ্চলকুমারীকে ভালবাসিতেন। তিনি মহামহোপাধ্যায় পণ্ডিত। সকলে তাঁহাকে ভক্তি করিত। চঞ্চলের নাম করিয়া তাঁহাকে ডাকিয়া পাঠাইবামাত্র তিনি অন্তঃপুরে আসিলেন—কুলপুরোহিতের অবারিত দ্বার। পথিমধ্যে নির্মল তাঁহাকে গ্রেপ্তার করিল।—এবং সকল কথা বুঝাইয়া দিয়া ছাড়িয়া দিল।

বিভূতিচন্দনবিভূষিত, প্রশস্তললাট, দীর্ঘকায়, রুদ্রাক্ষশোভিত, হাস্যবদন সেই ব্রাহ্মণ চঞ্চলকুমারীর কাছে আসিয়া দাঁড়াইলেন। নির্মল দেখিয়াছিল যে, চঞ্চল কাঁদিতেছে কিন্তু আর কাহারও কাছে চঞ্চল কাঁদিবার মেয়ে নহে। গুরুদেব দেখিলেন, চঞ্চল স্থিরমূর্তি। বলিলেন, “মা লক্ষ্মী,—আমাকে স্মরণ করিয়াছ কেন ?”

চ। আমাকে বাঁচাইবার জন্য। আর কেহ নাই যে আমায় বাঁচায়।

অনন্ত মিশ্র হাসিয়া বলিলেন, “বুঝেছি রুক্মিণীর বিয়ে, সেই পুরোহিত বুড়াকেই দ্বারকায় যেতে হবে। তা দেখ দেখি মা, লক্ষ্মীর ভাণ্ডার কিছু আছে কিনা—পথখরচা জুটিলেই আমি উদয়পুরে যাত্রা করিব।”

চঞ্চল, একটি জরির থলি বাহির করিয়া দিল। তাহাতে আশরফি ভরা। পুরোহিত দুইটা আশরফি লইয়া অবশিষ্ট ফিরাইয়া দিলেন—বলিলেন, “পথে অন্নই খাইতে হইবে—আশরফি খাইতে পারিব না। একটি কথা বলি, পারিবে কি ?”

চঞ্চল বলিল, “আমাকে আগুনে ঝাঁপ দিতে বলিলেও, আমি এ বিপদ হইতে উদ্ধার হইবার জন্য তাও পারি। কি আজ্ঞা করুন।”

মিশ্র। রাণা রাজসিংহকে একখানি পত্র লিখিয়া দিতে পারিবে ?

চঞ্চল ভাবিল। বলিল, “আমি বালিকা—পুরস্ত্রী; তাঁহার কাছে অপরিচিতা—কি প্রকারে পত্র লিখি ? কিন্তু আমি তাঁহার কাছে যে ভিক্ষা চাহিতেছি, তাহাতে লজ্জারই বা স্থান কই ? লিখিব।”

মিশ্র। আমি লিখাইয়া দিব, না আপনি লিখিবে ?

চ। আপনি বলিয়া দিন।

নির্মল সেখানে দাঁড়াইয়াছিল। সে বলিল, "তা হইবে না। এ বামুনে-বুদ্ধির কাজ নয়—এ মেয়েলী বুদ্ধির কাজ। আমরা পত্র লিখিব। আপনি প্রস্তুত হইয়া আসুন।"

মিশ্রঠাকুর চলিয়া গেলেন, কিন্তু গৃহে গেলেন না। রাজা বিক্রমসিংহের নিকট দর্শন দিলেন। বলিলেন, "আমি দেশ পর্যটনে গমন করিব, মহারাজকে আশীর্বাদ করিতে আসিয়াছি।" কি জন্য কোথায় যাইবেন, রাজা তাহা জানিবার ইচ্ছা প্রকাশ করিলেন, কিন্তু ব্রাহ্মণ তাহা কিছুই প্রকাশ করিয়া বলিলেন না। তথাপি তিনি যে উদয়পুর পর্যন্ত যাইবেন তাহা স্বীকার করিলেন, এবং রাণার নিকট পরিচিত হইবার জন্য একখানি লিপির জন্য প্রার্থিত হইলেন। রাজাও পত্র দিলেন।

অনন্ত মিশ্র রাজার নিকট হইতে পত্র সংগ্রহ করিয়া চঞ্চলকুমারীর নিকট পুনরাগমন করিলেন। ততক্ষণ চঞ্চল ও নির্মল দুইজনে দুই বুদ্ধি একত্র করিয়া একখানি পত্র সমাপন করিয়াছিল। পত্র শেষ করিয়া রাজনন্দিনী, একটি কৌটা হইতে অপূর্ব মুকুতাবলয় বাহির করিয়া ব্রাহ্মণের হস্তে দিয়া বলিলেন, "রাণা পত্র পড়িলে, আমার প্রতিনিধি স্বরূপ এই রাখি বাঁধিয়া দিবেন। রাজপুতকুলের যিনি চূড়া তিনি কখন রাজপুতকন্যার প্রেরিত রাখি অগ্রাহ্য করিবেন না।"

মিশ্রঠাকুর স্বীকৃত হইলেন। রাজকুমারী তাঁহাকে প্রণাম করিয়া বিদায় করিলেন।

ষষ্ঠ পবিচ্ছেদ

পরিধেয় বস্ত্র, ছত্র, যষ্টি, চন্দনকাষ্ঠ প্রভৃতি নিতান্ত প্রয়োজনীয় দ্রব্য সঙ্গে লইয়া অনন্ত মিশ্র গৃহিণীর নিকট হইতে বিদায় লইয়া উদয়পুর যাত্রা করিলেন। গৃহিণী বড় পীড়াপীড়ি করিয়া ধরিল, "কেন যাইবে?" মিশ্রঠাকুর বলিলেন, "রাণার কাছে কিছু বৃত্তি পাইব।" গৃহিণী তৎক্ষণাৎ শান্ত হইলেন; বিরহযন্ত্রণা আর তাঁহাকে দাহ করিতে পারিল না, অর্থলাভের আশাস্বরূপ শীতলবারি-প্রবাহে সে প্রচণ্ড বিচ্ছেদবহ্নি বার কত ফোঁস ফোঁস করিয়া নিবিয়া গেল। মিশ্রঠাকুর একাকী যাত্রা করিলেন।

পথ অতি দুর্গম—বিশেষ পার্বত্য পথ বন্ধুর, এবং অনেক স্থানে আশ্রয়-শূন্য। একাহারী ব্রাহ্মণ যেদিন যেখানে আশ্রয় পাইতেন, সেদিন সেখানে আতিথ্য স্বীকার করিতেন; দিনমানে পথ অতিবাহন করিতেন। পথে কিছু দস্যুভয় ছিল—ব্রাহ্মণের নিকট রত্নবলয় আছে বলিয়া ব্রাহ্মণ কদাপি একাকী পথ চলিতেন না। সঙ্গী জুটিলে চলিতেন। সঙ্গীছাড়া হইলেই আশ্রয়

খুঁজিতেন। একদিন রাত্রে এক দেবালয়ে আতিথ্য স্বীকার করিয়া, পরদিন প্রভাতে গমনকালে তাঁহাকে সঙ্গী খুঁজিতে হইল না। চারিজন বণিক্ ঐ দেবালয়ের অতিথিশালায় শয়ন করিয়াছিল, প্রভাতে উঠিয়া তাহারাও পার্বত্য পথে আরোহণ করিল। ব্রাহ্মণ দেখিয়া উহারা জিজ্ঞাসা করিল, "তুমি কোথা যাইবে ?" ব্রাহ্মণ বলিলেন, "আমি উদয়পুর যাইব।" বণিকেরা বলিল, "আমরাও উদয়পুর যাইব। ভাল হইয়াছে, একত্রে যাই চলুন।" ব্রাহ্মণ আনন্দিত হইয়া তাহাদিগের সঙ্গী হইলেন। জিজ্ঞাসা করিলেন, "উদয়পুর আর কত দূর ?" বণিকেরা বলিল, "নিকট। আজি সন্ধ্যার মধ্যে উদয়পুর পৌঁছিতে পারিব। এ সকল স্থান রাণার রাজ্য।"

এইরূপ কথোপকথন করিতে করিতে তাহারা চলিতেছিল। পার্বত্য পথ অতিশয় দুরারোহণীয়, এবং দুরবরোহণীয় এবং সচরাচর বসতিশূন্য। কিন্তু এই দুর্গম পথ প্রায় শেষ হইয়া আসিয়াছিল—এখন সমতল ভূমিতে অবরোহণ করিতে হইবে। পথিকেরা এক অনির্বচনীয় শোভাময় অধিত্যকায় প্রবেশ করিল। দুইপার্শ্বে অনতিউচ্চ পর্বতদ্বয়, হরিৎ বৃক্ষাদি শোভিত হইয়া আকাশে মাথা তুলিয়াছে; উভয়ের মধ্যে কলনাদিনী ক্ষুদ্রা প্রবাহিণী নীলকাচপ্রতিম সফেন জলপ্রবাহে উপলদল ধৌত করিয়া বনাসের অভিমুখে চলিতেছে। তটিনীর ধার দিয়া মনুষ্যগম্য পথের রেখা পড়িয়াছে। সেখানে নামিলে, আর কোন দিক্ হইতে কেহ পথিককে দেখিতে পায় না; কেবল পর্বতদ্বয়ের উপর হইতে দেখা যায়।

সেই নিভৃত স্থানে অবরোহণ করিয়া, একজন বণিক ব্রাহ্মণকে জিজ্ঞাসা করিল, "তোমার ঠাঁই টাকাকড়ি কি আছে ?"

ব্রাহ্মণ প্রশ্ন শুনিয়া চমকিত ও ভীত হইলেন। ভাবিলেন বুঝি এখানে দস্যুর বিশেষ ভয়, তাই সতর্ক করিবার জন্য বণিকেরা জিজ্ঞাসা করিতেছে। দুর্বলের অবলম্বন মিথ্যা কথা। ব্রাহ্মণ বলিলেন, "আমি ভিক্ষুক ব্রাহ্মণ, আমার কাছে কি থাকিবে ?"

বণিক্ বলিল, "যাহা কিছু থাকে আমাদের নিকট দাও। নহিলে এখানে রাখিতে পারিবে না।"

ব্রাহ্মণ ইতস্ততঃ করিতে লাগিলেন। একবার মনে করিলেন "রত্নবলয় রক্ষার্থ বণিক্‌দিগকে দিই।" আবার ভাবিলেন, "ইহারা অপরিচিত, ইহা-দিগকেই বা বিশ্বাস কি ?" এই ভাবিয়া ইতস্ততঃ করিয়া ব্রাহ্মণ পূর্ববৎ বলিলেন, "আমি ভিক্ষুক, আমার কাছে কি থাকিবে ?"

বিপদকালে যে ইতস্ততঃ করে সেই মারা যায়। ব্রাহ্মণকে ইতস্ততঃ করিতে

দেখিয়া ছদ্মবেশী বণিকেরা বুঝিল যে অবশ্য ব্রাহ্মণের কাছে বিশেষ কিছু আছে। একজন তৎক্ষণাৎ ব্রাহ্মণের ঘাড় ধরিয়া ফেলিয়া দিয়া তাঁহার বুকে হাঁটু দিয়া বসিল—এবং তাঁহার মুখে হাত দিয়া চাপিয়া ধরিল। ব্রাহ্মণ বাঙ্‌নিষ্পত্তি করিতে না পারিয়া নারায়ণ স্মরণ করিতে লাগিলেন। আর-একজন, তাঁহার গাঁটরি কাড়িয়া লইয়া খুলিয়া দেখিতে লাগিল। তাহার ভিতর হইতে চঞ্চল-কুমারী-প্রেরিত বলয়, দুইখানি পত্র, এবং দুই আশরফি পাওয়া গেল। দস্যু তাহা হস্তগত করিয়া সঙ্গীকে বলিল, "আর ব্রহ্মহত্যা করিয়া কাজ নাই। উহার যাহা ছিল তাহা পাইয়াছি। এখন উহাকে ছাড়িয়া দে।"

আর-একজন দস্যু বলিল, "ছাড়িয়া দেওয়া হইবে না। ব্রাহ্মণ তাহা হইলে এখনই একটা গোলযোগ করিবে। আজকাল রাণা রাজসিংহের বড় দৌরাত্ম্য—বীর পুরুষে তাঁহার শাসন আর বাহুবলে অন্ন করিয়া খাইতে পারে না। উহাকে এই গাছে বাঁধিয়া রাখিয়া যাই।"

এই বলিয়া দস্যুগণ মিশ্রঠাকুরের হস্ত পদ এবং মুখ তাঁহার পরিধেয় বস্ত্রে দৃঢ়তর বাঁধিয়া পর্বতের সানুদেশস্থিত একটি ক্ষুদ্রবৃক্ষের কাণ্ডের সহিত বাঁধিল। পরে চঞ্চলকুমারীদত্ত রত্নবলয় ও পত্র প্রভৃতি লইয়া ক্ষুদ্রনদীর তীরবর্তী পথ অবলম্বন করিয়া পর্বতান্তরালে অদৃশ্য হইল। সেই সময়ে পর্বতের উপরে দাঁড়াইয়া একজন অশ্বারোহী তাহাদিগকে দেখিল। তাহারা অশ্বারোহীকে দেখিতে পাইল না ; পলায়নে ব্যস্ত।

দস্যুগণ পার্বতীয়া প্রবাহিণীর তটবর্তী বনমধ্যে প্রবেশ করিয়া অতি দুর্গম ও মনুষ্যসমাগমশূন্য পথে চলিল। এইরূপ কিছুদূর গিয়া এক নিভৃত গুহামধ্যে প্রবেশ করিল।

গুহার ভিতর খাদ্যদ্রব্য, শয্যা, পাকের প্রয়োজনীয় দ্রব্যসকল প্রস্তুত ছিল। দেখিয়া বোধ হয়, দস্যুগণ কখন কখন এই গুহামধ্যে লুকাইয়া বাস করে। এমন কি কলসীপূর্ণ জল পর্যন্ত ছিল। দস্যুগণ সেইখানে উপস্থিত হইয়া তামাকু সাজিয়া খাইতে লাগিল। এবং একজন পাকের উদ্যোগ করিতে লাগিল। একজন বলিল, "মাণিকলাল, রসুই পরে হইবে। প্রথমে মালের কি ব্যবস্থা হইবে, তাহার মীমাংসা করা যাউক।"

মাণিকলাল বলিল, "মালের কথাই আগে হউক।"

তখন আশরফি দুইটি কাটিয়া চারিখণ্ড হইল। এক-এক জন এক-এক খণ্ড লইল। রত্নবলয় বিক্রয় না হইলে ভাগ হইতে পারে না—তাহা সম্প্রতি অবিভক্ত রহিল। পত্র দুইখানি কি করা যাইবে, তাহার মীমাংসা হইতে লাগিল। দলপতি বলিলেন, কাগজে আর কি হইবে—উহা পোড়াইয়া ফেল।

এই বলিয়া পত্র দুইখানি সে মাণিকলালকে অগ্নিদেবকে সমর্পণ করিবার জন্য দিল।

মাণিকলাল কিছু কিছু লিখিতে পড়িতে জানিত। সে পত্রদুইখানি আদ্যোপান্ত পড়িয়া আনন্দিত হইল। বলিল, "এ পত্র নষ্ট করা হইবে না। ইহাতে রোজগার হইতে পারে।"

"কি ? কি ?" বলিয়া আর তিনজন গোলযোগ করিয়া উঠিল। মাণিকলাল তখন চঞ্চলকুমারীর পত্রের বৃত্তান্ত তাহাদিগকে সবিস্তারে বুঝাইয়া দিল। শুনিয়া চোরেরা বড় আনন্দিত হইল।

মাণিকলাল বলিল, "দেখ, এই পত্র রাণাকে দিলে কিছু পুরস্কার পাইব।"

দলপতি বলিল, "নির্বোধ! রাণা যখন জিজ্ঞাসা করিবে তোমরা এ পত্র কোথা পাইলে তখন কি উত্তর দিবে ? তখন কি বলিবে যে আমরা রাহাজানি করিয়া পাইয়াছি ? রাণার কাছে পুরস্কারের মধ্যে প্রাণদণ্ড হইবে। তাহা নহে। এ পত্র লইয়া গিয়া বাদশাহাকে দিব—বাদশাহের কাছে এরূপ সন্ধান দিতে পারিলে অনেক পুরস্কার পাওয়া যায় আমি জানি। আর ইহাতে—"

দলপতি কথা সমাপ্ত করিতে অবকাশ পাইল না। কথা মুখে থাকিতে থাকিতে তাহার মস্তক স্কন্ধ হইতে বিচ্যুত হইয়া ভূতলে পড়িল।

সপ্তম পরিচ্ছেদ

অশ্বারোহী পর্বতের উপর হইতে দেখিল, চারিজনে একজনকে বাঁধিয়া রাখিয়া চলিয়া গেল। আগে কি হইয়াছে, তাহা সে দেখে নাই, তখন সে পৌঁছে নাই। অশ্বারোহী নিঃশব্দে লক্ষ্য করিতে লাগিল উহারা কোন্ পথে যায়। তাহারা যখন নদীর বাঁক ফিরিয়া পর্বতান্তরালে অদৃশ্য হইল, তখন অশ্বারোহী অশ্ব হইতে নামিল। পরে অশ্বের গায়ে হাত বুলাইয়া বলিল, "বিজয়! এখানে থাকিও—আমি আসিতেছি—কোন শব্দ করিও না।" অশ্ব স্থির হইয়া দাঁড়াইয়া রহিল; তাহার আরোহী পাদচারে অতি দ্রুতবেগে পর্বত হইতে অবতরণ করিলেন। পর্বত যে বড় উচ্চ নহে, তাহা পূর্বেই বলা হইয়াছে।

অশ্বারোহী পদব্রজে মিশ্রঠাকুরের কাছে আসিয়া তাঁহাকে বন্ধন হইতে মুক্ত করিয়া জিজ্ঞাসা করিলেন, "কি হইয়াছে, অল্প কথায় বলুন।"

মিশ্র বলিলেন, "চারিজনের সঙ্গে আমি একত্রে আসিতেছিলাম। তাহাদের চিনি না—পথের আলাপ; তাহারা বলে আমরা বণিক্। এইখানে আসিয়া তাহারা মারিয়া ধরিয়া আমার যাহা কিছু ছিল কাড়িয়া লইয়া গিয়াছে।"

প্রশ্নকর্তা জিজ্ঞাসা করিলেন, "কি কি লইয়া গিয়াছে ?"

ব্রাহ্মণ বলিলেন, "একগাছি মুক্তার বালা, দুইটি আশরফি, দুইখানি পত্র।"

প্রশ্নকর্তা বলিলেন, "আপনি এইখানে থাকুন। উহারা কোন্‌দিকে গেল, আমি দেখিয়া আসি।"

ব্রাহ্মণ বলিলেন, "আপনি যাইবেন কি প্রকারে? তাহারা চারিজন, আপনি একা।"

আগন্তুক বলিলেন, "দেখিতেছেন না, আমি রাজপুত সৈনিক!"

অনন্ত মিশ্র দেখিলেন, এই ব্যক্তি যুদ্ধব্যবসায়ী বটে। তাহার কোমরে তরবারি এবং পিস্তল, এবং হস্তে বর্শা। তিনি ভয়ে আর কথা কহিলেন না।

রাজপুত, যে পথে দস্যুগণকে যাইতে দেখিয়াছিলেন, সেই পথে অতি সাবধানে তাহাদিগকে অনুসরণ করিতে লাগিলেন। কিন্তু বনমধ্যে আসিয়া আর পথ পাইলেন না, অথবা দস্যুদিগের কোন নিদর্শন পাইলেন না।

তখন রাজপুত আবার পর্বতের শিখরদেশে আরোহণ করিতে লাগিলেন। কিয়ৎক্ষণ ইতস্ততঃ দৃষ্টি করিতে করিতে দেখিলেন যে, দূরে বনের ভিতর প্রচ্ছন্ন থাকিয়া, চারিজনে যাইতেছে। সেইখানে কিছুক্ষণ অবস্থিতি করিয়া দেখিতে লাগিলেন, ইহারা কোথায় যায়। দেখিলেন কিছু পরে উহারা একটা পাহাড়ের তলদেশে গেল, তাহার পর উহাদের আর দেখা গেল না। তখন রাজপুত সিদ্ধান্ত করিলেন যে উহারা হয় ঐখানে বসিয়া বিশ্রাম করিতেছে, বৃক্ষাদির জন্য দেখা যাইতেছে না; নয় ঐ পর্বততলে গুহা আছে, দস্যুরা তাহার মধ্যে প্রবেশ করিয়াছে।

রাজপুত, বৃক্ষাদি চিহ্ন দ্বারা সেই স্থানে যাইবার পথ বিলক্ষণ করিয়া নিরূপণ করিলেন। পরে অবতরণ করিয়া বন্যপথে প্রবেশপূর্বক, সেই সকল চিহ্নলক্ষিত পথে চলিলেন। এইরূপে, বিবিধ কৌশলে তিনি পূর্বলক্ষিত স্থানে আসিয়া দেখিলেন, পর্বততলে একটি গুহা আছে। গুহামধ্যে মনুষ্যের কথাবার্তা শুনিতে পাইলেন।

এই পর্যন্ত আসিয়া রাজপুত কিছু ইতস্ততঃ করিতে লাগিলেন। উহারা চারি জন—তিনি একা; এক্ষণে গুহামধ্যে প্রবেশ করা উচিত কি না। যদি গুহাদ্বার রোধ করিয়া উহারা চারিজনে সংগ্রাম করে, তবে তাঁহার বাঁচিবার সম্ভাবনা নাই। কিন্তু এ কথা রাজপুতের মনে বড় অধিকক্ষণ স্থান পাইল না—মৃত্যুভয় আবার ভয় কি? মৃত্যুভয়ে রাজপুত কোন কার্য হইতে বিরত হয় না! কিন্তু দ্বিতীয় কথা এই যে, তিনি গুহামধ্যে প্রবেশ করিলেই তাঁহার হস্তে দুই-একজন অবশ্য মরিবে। যদি উহারা সে দস্যুদল না হয়? তবে নিরপরাধীর হত্যা হইবে।

এই ভাবিয়া রাজপুত সন্দেহভঞ্জনার্থ অতি ধীরে ধীরে গুহাদ্বারের নিকট আসিয়া দাঁড়াইয়া অভ্যন্তরস্থ ব্যক্তিগণের কথাবার্তা কর্ণপাত করিয়া শুনিতে লাগিলেন। দস্যুরা তখন অপহৃত সম্পত্তির বিভাগের কথা কহিতেছিল। শুনিয়া রাজপুতের নিশ্চয় প্রতীতি হইল যে, ইহারা দস্যু বটে। রাজপুত তখন গুহামধ্যে প্রবেশ করাই স্থির করিলেন।

ধীরে ধীরে বর্শা বনমধ্যে লুকাইলেন। পরে অসি নিষ্কোষিত করিয়া দক্ষিণ হস্তে দৃঢ় মুষ্টিতে ধারণ করিলেন। বাম হস্তে পিস্তল লইলেন। দস্যুরা যখন চঞ্চলকুমারীর পত্র পাইয়া অর্থলাভের আকাঙ্ক্ষায় বিমুগ্ধ হইয়া অন্যমনস্ক ছিল—সেই সময়ে রাজপুত অতি সাবধানে পাদবিক্ষেপ করিতে করিতে গুহামধ্যে প্রবেশ করিলেন। দলপতি গুহাদ্বারের দিকে পশ্চাৎ ফিরিয়া বসিয়াছিল। প্রবেশ করিয়া রাজপুত দৃঢ়মুষ্টিধৃত তরবারিতে দলপতির মস্তকে আঘাত করিলেন। তাঁহার হস্তে এত বল যে এক আঘাতেই মস্তক দ্বিখণ্ড হইয়া ভূতলে পড়িয়া গেল।

সেই মুহূর্তেই, দ্বিতীয় একজন দস্যু যে দলপতির কাছে বসিয়াছিল, তাহার দিকে ফিরিয়া রাজপুত তাহার মস্তকে এরূপ কঠিন পদাঘাত করিলেন যে, সে মূর্ছিত হইয়া ভূতলে পড়িল। রাজপুত, অন্য দুইজনের নিকট দৃষ্টি করিয়া দেখিলেন যে, একজন গুহাপ্রান্তে থাকিয়া তাঁহাকে প্রহার করিবার জন্য একখণ্ড বৃহৎ প্রস্তর তুলিতেছে। রাজপুত তাহাকে লক্ষ্য করিয়া পিস্তল উঠাইলেন; সে আহত হইয়া ভূতলে পড়িয়া তৎক্ষণাৎ প্রাণত্যাগ করিল। অবশিষ্ট মাণিকলাল বেগতিক দেখিয়া, গুহাদ্বারপথে বেগে নিষ্ক্রান্ত হইয়া ঊর্ধ্বশ্বাসে পলায়ন করিল। এই সময়ে রাজপুত যে বর্শা বনমধ্যে লুকাইয়া রাখিয়াছিলেন, তাহা মাণিকলালের পায়ে ঠেকিল। মাণিকলাল, তৎক্ষণাৎ তাহা তুলিয়া লইয়া দক্ষিণ হস্তে ধারণ করিয়া রাজপুতের দিকে ফিরিয়া দাঁড়াইল। তাঁহাকে লক্ষ্য করিয়া বলিল, "মহারাজ! আমি আপনাকে চিনি। ক্ষান্ত হউন, নইলে এই বর্শায় বিদ্ধ করিব।"

রাজপুত হাসিয়া বলিলেন, "তুমি যদি আমাকে বর্শা মারিতে পারিতে তাহা হইলে আমি উহা বাম হস্তে ধরিতাম। কিন্তু তুমি উহা মারিতে পারিবে না—এই দেখ।" এই কথা বলিতে না বলিতে রাজপুত তাঁহার হাতের খালি পিস্তল দস্যুর দক্ষিণ হস্তের মুষ্টি লক্ষ্য করিয়া ছুঁড়িয়া মারিলেন; দারুণ প্রহারে বর্শা খসিয়া পড়িল। রাজপুত তাহা তুলিয়া লইল, মাণিকলালের চুল ধরিলেন। এবং অসি উত্তোলন করিয়া তাহার মস্তক ছেদনে উদ্যত হইলেন।

মাণিকলাল তখন কাতরস্বরে বলিল, "মহারাজাধিরাজ! আমার জীবন-দান করুন—রক্ষা করুন—আমি শরণাগত!"

রাজপুত তাহার কেশ ত্যাগ করিলেন, তরবারি নামাইলেন। বলিলেন "তুই মরিতে এত ভীত কেন?"

রাজপুত বলিল, "আমি মরিতে ভীত নহি। কিন্তু আমার একটি সাত বৎসরের কন্যা আছে; সে মাতৃহীন, তাহার আর কেহ নাই—কেবল আমি। আমি প্রাতে তাহাকে আহার করাইয়া বাহির হইয়াছি, আবার সন্ধ্যাকালে গিয়া আহার দিব, তবে সে খাইবে, আমি তাহাকে রাখিয়া মরিতে পারিতেছি না। আমি মরিলে সে মরিবে। আমাকে মারিতে হয়, আগে তাহাকে মারুন।"

দস্যু কাঁদিতে লাগিল, পরে চক্ষের জল মুছিয়া বলিতে লাগিল, "মহা-রাজাধিরাজ! আমি আপনার পাদস্পর্শ করিয়া শপথ করিতেছি, আর কখন দস্যুতা করিব না। চিরকাল আপনার দাসত্ব করিব। আর যদি জীবন থাকে একদিন না একদিন এ ক্ষুদ্র ভৃত্য হইতে উপকার হইবে।"

রাজপুত বলিলেন, "তুমি আমাকে চেন?"

দস্যু বলিল, "মহারাণা রাজসিংহকে কে না চিনে?"

তখন রাজসিংহ বলিলেন, "আমি তোমার জীবনদান করিলাম। কিন্তু তুমি ব্রাহ্মণের ব্রহ্মস্ব হরণ করিয়াছ, আমি যদি তোমাকে কোন প্রকার দণ্ড না দিই তবে আমি রাজধর্মে পতিত হইব।"

মাণিকলাল বিনীতভাবে বলিল, "মহারাজাধিরাজ! এ পাপে আমি নূতন ব্রতী। অনুগ্রহ করিয়া আমার প্রতি লঘুদণ্ডেরই বিধান করুন। আমি আপনার সম্মুখেই শাস্তি লইতেছি।"

এই বলিয়া দস্যু কটিদেশ হইতে ক্ষুদ্র ছুরিকা নির্গত করিয়া, অবলীলাক্রমে, আপনার তর্জনী অঙ্গুলি ছেদন করিতে উদ্যত হইল। ছুরিতে মাংস কাটিয়া, অস্থি কাটিল না। তখন মাণিকলাল ঐ শিলাখণ্ডের উপর হস্ত রাখিয়া ঐ অঙ্গুলির উপর ছুরিকা বসাইয়া, আর একখণ্ড প্রস্তরের দ্বারা তাহাতে ঘা মারিল। আঙ্গুল কাটিয়া মাটিতে পড়িল। দস্যু বলিল, "মহারাজ, এই দণ্ড মঞ্জুর করুন।"

রাজসিংহ দেখিয়া বিস্মিত হইলেন, দস্যু ভ্রূক্ষেপও করিতেছে না। বলিলেন, "ইহাই যথেষ্ট। তোমার নাম কি?"

দস্যু বলিল, "এ অধমের নাম মাণিকলাল সিংহ। আমি রাজপুতকুলের কলঙ্ক।"

রাজসিংহ বলিলেন, "মাণিকলাল, আজি হইতে তুমি আমার কার্যে নিযুক্ত

হইলে। এক্ষণে তুমি অশ্বারোহী সৈন্যভুক্ত হইলে—তোমার কন্যা লইয়া উদয়পুরে যাও ; তোমাকে ভূমি দিব, বাস করিও।"

মাণিকলাল তখন রাণার পদধূলি গ্রহণ করিল। এবং রাণাকে ক্ষণকাল অবস্থিতি করাইয়া গুহামধ্যে প্রবেশ করিয়া তথা হইতে অপহৃত মুক্তাবলয়, পত্র দুইখানি, .এবং আশরফি চারিখণ্ড আনিয়া দিল। বলিল, "ব্রাহ্মণের যাহা আমরা কাড়িয়া লইয়াছিলাম, তাহা শ্রীচরণে অর্পণ করিতেছি। পত্র দুইখানি আপনারই জন্য। দাস যে উহা পাঠ করিয়াছে, সে অপরাধ মার্জনা করিবেন।"

রাণা পত্র হস্তে লইয়া দেখিলেন, তাঁহারই নামাঙ্কিত শিরোনামা। বলিলেন "মাণিকলাল—পত্র পড়িবার এ স্থান নহে। আমার সঙ্গে আইস—তোমরা পথ জান, পথ দেখাও।"

মাণিকলাল পথ দেখাইয়া চলিল। রাণা দেখিলেন যে দস্যু একবার তাহার ক্ষত ও আহত হস্তের প্রতি দৃষ্টিপাত করিতেছে না, বা তৎসম্বন্ধে একটি কথাও বলিতেছে না—বা একবার মুখ বিকৃত করিতেছে না। রাণা শীঘ্রই বন হইতে বেগবতী ক্ষীণাতটিনীতীরে এক সুরম্য নিভৃত স্থানে আসিয়া উপস্থিত হইলেন।

অষ্টম পবিচ্ছেদ

তথায়, উপলঘাতিনী কলনাদিনী তটিনীরব সঙ্গে সুমন্দ-মধুর-বায়ু, এবং স্বর-লহরী বিকীর্ণকারী কুঞ্জবিহঙ্গমগণ ধ্বনি মিশাইতেছে। তথায় স্তবকে স্তবকে বন্যকুসুম সকল প্রস্ফুটিত হইয়া, পার্বতীয় বৃক্ষরাজি আলোকময় করিতেছে। তথায়, রূপ উছলিতেছে, শব্দ তরঙ্গায়িত হইতেছে, গন্ধ মাতিয়া উঠিতেছে, এবং মন প্রকৃতির বশীভূত হইতেছে। সেইখানে রাজসিংহ এক বৃহৎ প্রস্তরখণ্ডের উপর উপবেশন করিয়া, পত্র দুইখানি পড়িতে প্রবৃত্ত হইলেন।

প্রথম রাজা বিক্রমসিংহের পত্র পড়িলেন। পড়িয়া ছিঁড়িয়া ফেলিলেন—মনে করিলেন, ব্রাহ্মণকে কিছু দিলেই পত্রের উদ্দেশ্য সফল হইবে। তারপর চঞ্চলকুমারীর পত্র পড়িতে লাগিলেন। পত্র এইরূপ ;—

"রাজন্—আপনি রাজপুত-কুলের চুড়া—হিন্দুর শিরোভূষণ। আমি অপরিচিতা হীনমতি বালিকা—নিতান্ত বিপন্না না হইলে কখনই আপনাকে পত্র লিখিতে সাহস করিতাম না। নিতান্ত বিপন্না বুঝিয়াই আমার এ দুঃসাহস মার্জনা করিবেন।

যিনি এই পত্র লইয়া যাইতেছেন, তিনি আমার গুরুদেব। তাঁহাকে জিজ্ঞাসা করিলে জানিতে পারিবেন—আমি রাজপুত কন্যা। রূপনগর অতি ক্ষুদ্র রাজ্য—তথাপি বিক্রমসিংহ সোলাঙ্কি রাজপুত—রাজকন্যা বলিয়া আমি

মধ্যদেশাধিপতির কাছে গণ্যা না হই,—রাজপুতকন্যা বলিয়া দয়ার পাত্রী। কেন না আপনি রাজপুতপতি—রাজপুত-কুলতিলক।

অনুগ্রহ করিয়া আমার বিপদ শ্রবণ করুন। আমার দুরদৃষ্টক্রমে, দিল্লীর বাদশাহ আমার পাণিগ্রহণ করিতে মানস করিয়াছেন। অনতিবিলম্বে তাঁহার সৈন্য, আমাকে দিল্লী লইয়া যাইবার জন্য আসিবে। আমি রাজপুতকন্যা, ক্ষত্রিয়কুলোদ্ভবা—কি প্রকারে তাতারের দাসী হইব? রাজহংসী হইয়া কেমন করিয়া বকসহচরী হইব? হিমালয়নন্দিনী হইয়া কি প্রকারে পঙ্কিল তড়াগে মিশাইব? রাজপুতকুমারী হইয়া কি প্রকারে তুরকী বর্বরের আজ্ঞাকারিণী হইব? আমি স্থির করিয়াছি, এ বিবাহের অগ্রে বিষভোজনে প্রাণত্যাগ করিব।

মহারাজাধিরাজ! আমাকে অহঙ্কৃতা মনে করিবেন না। আমি জানি যে আমি ক্ষুদ্র ভূম্যধিকারীর কন্যা—যোধপুর, অম্বর প্রভৃতি দোর্দণ্ডপ্রতাপশালী রাজাধিরাজগণও দিল্লীর বাদশাহকে কন্যাদান করা কলঙ্ক মনে করেন না—কলঙ্ক মনে করা দূরে থাক, বরং গৌরব মনে করেন। আমি সেসব ঘরের কাছে কোন্ ছার? আমার এ অহঙ্কার কেন? এ কথা আপনি জিজ্ঞাসা করিতে পারেন। কিন্তু মহারাজ! সূর্যদেব অস্তে গেলে খদ্যোত কি জ্বলে না? শিশিরভরে নলিনী মুদিত হইলে, ক্ষুদ্র কুন্দ কুসুম বিকশিত হয় না? যোধপুর অম্বর কুলধ্বংস করিলে রূপনগরে কি কুলরক্ষা হইতে পারে না? মহারাজ, ভাটমুখে শুনিয়াছি যে, বনবাসী রাণা প্রতাপের সহিত মহারাজা মানসিংহ ভোজন করিতে আসিলে, মহারাণা ভোজন করেন নাই, বলিয়াছিলেন যে তুর্ককে ভগিনী দিয়াছে তাহার সহিত ভোজন করিব না। সেই মহাবীরের বংশধরকে কি আমায় বুঝাইতে হইবে যে এই সম্বন্ধ রাজপুতকুলকামিনীর পক্ষে ইহলোকে পরলোকে ঘৃণাস্পদ? মহারাজ! আজিও আপনার বংশে তুর্ক বিবাহ করিতে পারিল না কেন? আপনারা বীর্য্যবান্ মহাবলাক্রান্ত বংশ বটে, কিন্তু তাই বলিয়া নহে। মহাবল পরাক্রান্ত রুমের বাদশাহ কিংবা পারস্যের শাহ দিল্লীর বাদশাহকে কন্যাদান গৌরব মনে করেন। তবে উদয়পুরেশ্বর কেবল তাহাকে কন্যাদান করেন না কেন? তিনি রাজপুত বলিয়া। আমিও সেই রাজপুত। মহারাজ! প্রাণত্যাগ করিব তবু কুল রাখিব, প্রতিজ্ঞা করিয়াছি।

প্রয়োজন হইলে প্রাণবিসর্জন করিব, প্রতিজ্ঞা করিয়াছি, কিন্তু তথাপি এই অষ্টাদশ বৎসর বয়সে, এ অভিনব জীবন রাখিতে বাসনা হয়। কিন্তু কে এ বিপদে এ জীবন রক্ষা করিবে? আমার পিতার ত কথাই নাই, তাঁহার এমন কি সাধ্য যে আলমগীরের সঙ্গে বিবাদ করেন। আর যত রাজপুতরাজা, ছোট হউন বড় হউন, সকলেই বাদশাহের ভৃত্য—সকলেই বাদশাহের ভয়ে কম্পিত-

কলেবর। কেবল আপনি—রাজপুতকুলের একা প্রদীপ—কেবল আপনিই স্বাধীন—কেবল উদয়পুরেশ্বরই বাদশাহের সমকক্ষ। হিন্দুকুলে আর কেহ নাই —যে এই বিপন্না বালিকাকে রক্ষা করে—আমি আপনার শরণ লইলাম —আপনি কি আমাকে রক্ষা করিবেন না ?

কত বড় গুরুতর কার্যে আমি আপনাকে অনুরোধ করিতেছি, তাহা আমি না জানি, এমত নহে। আমি কেবল বালিকাবুদ্ধির বশীভূতা হইয়া লিখিতেছি, এমত নহে। দিল্লীশ্বরের সহিত বিবাদ সহজ নহে জানি। এ পৃথিবীতে আর কেহই নাই যে তাহার সঙ্গে বিবাদ করিয়া তিষ্ঠিতে পারে। কিন্তু মহারাজ! মনে করিয়া দেখুন, মহারাণা সংগ্রামসিংহ বাবরশাহকে প্রায় রাজ্যচ্যুত করিয়াছিলেন। মহারাণা প্রতাপসিংহ আকবরশাহকেও মধ্যদেশ হইতে বহিষ্কৃত করিয়া দিয়াছিলেন। আপনি সেই সিংহাসনে আসীন—আপনি সেই সংগ্রামের, সেই প্রতাপের বংশধর—আপনি কি তাঁহাদের অপেক্ষা হীনবল ? শুনিয়াছি নাকি মহারাষ্ট্রে এক পার্বতীয় দস্যু আলমগীরকে পরাভূত করিয়াছে—সে আলমগীর কি রাজস্থানের রাজেন্দ্রের কাছে গণ্য ?

আপনি বলিতে পারেন, "আমার বাহুতে বল আছে—কিন্তু থাকিলেও আমি তোমার জন্য এত কষ্ট কেন করিব ? আমি কেন অপরিচিতা মুখরা কামিনীর জন্য প্রাণিহত্যা করিব ?—ভীষণ সমরে অবতীর্ণ হইব ? মহারাজ! সর্বস্ব পণ করিয়া শরণাগতকে রক্ষা করা কি রাজধর্ম নহে ? সর্বস্ব পণ করিয়া কুলকামিনীর রক্ষা কি রাজপুতের ধর্ম নহে ?

মহারাজ! আর একটি কথা বলিতে লজ্জা করে, কিন্তু না বলিলেও নহে। আমি এই বিপদে পড়িয়া পণ করিয়াছি যে, যে বীর আমাকে মোগল হস্ত হইতে রক্ষা করিবেন, তিনি যদি রাজপুত হয়েন, আর যদি আমাকে যথাশাস্ত্র গ্রহণ করেন, তবে আমি তাঁহার দাসী হইব। হে বীরশ্রেষ্ঠ! যুদ্ধে স্ত্রীলাভ বীরের ধর্ম। সমগ্র ক্ষত্রকুলের সহিত যুদ্ধ করিয়া, পাণ্ডব দ্রৌপদীলাভ করিয়াছিলেন। যাদবীসেনাকে যুদ্ধে পরাজিত করিয়া অর্জুন সুভদ্রাকে পাইয়াছিলেন। কাশীরাজ্যে সমবেত রাজমণ্ডলসমক্ষে আপন বীর্য প্রকাশ করিয়া ভীষ্মদেব রাজকন্যাগণকে লইয়া আসিয়াছিলেন। হে রাজন্! রুক্মিণীর বিবাহ কি মনে পড়ে না ? আপনি এই পৃথিবীতে আজিও অদ্বিতীয় বীর—আপনি কি বীরধর্মে পরাঙ্মুখ হইবেন ? আমি মুখরা, কতই বলিতেছি—পাছে বাক্যে আপনাকে না বাঁধিতে পারি—এজন্য গুরুদেবহস্তে রাখির বন্ধন পাঠাইলাম। তিনি রাখি বাঁধিয়া দিবেন—তার পর আপনার রাজধর্ম আপনার

হাতে। আমার প্রাণ আমার হাতে। যদি দিল্লী যাইতে হয়, দিল্লীর পথে বিষভোজন করিব।"

পত্র পাঠ করিয়া রাজসিংহ কিছুক্ষণ চিন্তামগ্ন হইলেন ; পরে মাথা তুলিয়া মাণিকলালকে বলিলেন, "মাণিকলাল, এ পত্রের কথা তুমি ছাড়া আর কে জানে ?"

মাণিক। যাহারা জানিত মহারাজ গুহামধ্যে তাহাদিগকে বধ করিয়া আসিয়াছেন।

রাজা। উত্তম। তুমি গৃহে যাও। উদয়পুরে আসিয়া আমার সঙ্গে সাক্ষাৎ করিও। এ পত্রের কথা কাহারও সাক্ষাতে প্রকাশ করিও না।

এই বলিয়া রাজসিংহ, নিকটে যে কয়টি স্বর্ণমুদ্রা ছিল, তাহা মাণিকলালকে দিলেন। মাণিকলাল প্রণাম করিয়া বিদায় হইলেন।

নবম পরিচ্ছেদ

রাণা অনন্ত মিশ্রকে তাঁহার প্রতীক্ষা করিতে বলিয়া গিয়াছিলেন, অনন্ত মিশ্রও তাঁহার অপেক্ষা করিতেছিলেন—কিন্তু তাঁহার চিত্ত স্থির ছিল না। অশ্বারোহীর যোদ্ধবেশ এবং তীব্র দৃষ্টিতে তিনি কিছু কাতর হইয়াছিলেন। একবার ঘোরতর বিপদ্‌গ্রস্ত হইয়া, ভাগ্যক্রমে প্রাণে রক্ষা পাইয়াছেন—কিন্তু আর সব হারাইয়াছেন—চঞ্চলকুমারীর আশা ভরসা হারাইয়াছেন—আর কি বলিয়া তাঁহার কাছে মুখ দেখাইবেন ? ব্রাহ্মণ এইরূপ ভাবিতেছিলেন, এমত সময়ে দেখিলেন পর্বতের উপরে দুই-তিন জন লোক দাঁড়াইয়া কি পরামর্শ করিতেছে। ব্রাহ্মণ ভীত হইলেন ; মনে করিলেন আবার নূতন দস্যুসম্প্রদায় আসিয়া উপস্থিত হইল না কি ? সেবার নিকটে যাহা হয় কিছু ছিল, তাহা পাইয়া দস্যুরা তাঁহার প্রাণবধে বিরত হইয়াছিল—এবার যদি ইহারা তাঁহাকে ধরে তবে কি দিয়া প্রাণ রাখিব ? এইরূপ ভাবিতেছিলেন, এমত সময়ে দেখিলেন যে, পর্বতারূঢ় ব্যক্তিরা হস্তপ্রসারণ করিয়া তাঁহাকে দেখাইতেছে এবং পরস্পর কি বলিতেছে। ইহা দেখিবামাত্র, ব্রাহ্মণের যা কিছু সাহস ছিল, তাহা গেল—ব্রাহ্মণ পলায়নের উদ্যোগে উঠিয়া দাঁড়াইলেন। সেই সময়ে পর্বতবিহারীদিগের মধ্যে একজন পর্বত অবতরণ করিতে আরম্ভ করিল—দেখিয়া ব্রাহ্মণ ঊর্ধ্বশ্বাসে পলায়ন করিলেন।

তখন ধর ধর করিয়া তিন-চারি জন তাঁহার পশ্চাৎ পশ্চাৎ ছুটিল। ব্রাহ্মণও ছুটিলেন—অজ্ঞান, মুক্তকচ্ছ, তথাপি নারায়ণ নারায়ণ স্মরণ করিতে করিতে ব্রাহ্মণ তীরবৎ বেগে পলাইলেন। যাহারা তাঁহার পশ্চাদ্ধাবিত হইয়াছিল, তাহারা তাঁহাকে শেষে আর না দেখিতে পাইয়া প্রতিনিবৃত্ত হইল।

তাহারা অপর কেহই নহে—মহারাণার ভৃত্যবর্গ। মহারাণার সহিত এস্থলে কি প্রকারে আমাদিগের সাক্ষাৎ হইল, তাহা এক্ষণে বুঝাইতে হইতেছে। রাজপুতগণের শিকারে বড় আনন্দ, অদ্য মহারাণা শত অশ্বারোহী এবং ভৃত্যগণ সমভিব্যাহারে মৃগয়ায় বাহির হইয়াছিলেন। এক্ষণে তাহারা শিকারে প্রতিনিবৃত্ত হইয়া উদয়পুরাভিমুখে যাইতেছিলেন। রাজসিংহ, সর্বদা প্রহরিগণ কর্তৃক পরিবেষ্টিত হইয়া, রাজা হইয়া থাকিতে ভালবাসিতেন না। কখন কখন অনুচরবর্গকে দূরে রাখিয়া একাকী অশ্বারোহণ করিয়া ছদ্মবেশে প্রজাদিগের অবস্থা দেখিয়া শুনিয়া বেড়াইতেন। সেইজন্য তাঁহার রাজ্যে প্রজা অত্যন্ত সুখী হইয়া উঠিয়াছিল ; স্বচক্ষে সকল দেখিতেন, স্বহস্তে সকল দুঃখ নিবারণ করিতেন।

অদ্য মৃগয়া হইতে প্রত্যাবর্তনকালে তিনি অনুচরবর্গকে পশ্চাতে আসিতে বলিয়া দিয়া, বিজয়নামা দ্রুতগামী অশ্বপৃষ্ঠে আরোহণ করিয়া একাকী অগ্রসর হইয়াছিলেন। এই অবস্থায় অনন্ত মিশ্রের সহিত সাক্ষাৎ হইলে যাহা যাহা ঘটিয়াছিল, তাহা কথিত হইয়াছে। রাজা দস্যুর কৃত অত্যাচার শুনিয়া স্বহস্তে ব্রহ্মস্ব উদ্ধারের জন্য ছুটিয়াছিলেন। যাহা দুঃসাধ্য এবং বিপদপূর্ণ তাহাতেই তাঁহার আমোদ ছিল।

এদিকে বেলা হইল দেখিয়া কতিপয় রাজভৃত্য দ্রুতপদে তাঁহার অনুসন্ধানে চলিল। নীচে অবতরণকালে দেখিল রাণার অশ্ব দাঁড়াইয়া রহিয়াছে—ইহাতে তাহারা বিস্মিত এবং চিন্তিত হইল। আশঙ্কা করিল যে রাণার কোন বিপদ্ ঘটিয়াছে। নিম্নে শিলাখণ্ডোপরি অনন্ত ঠাকুর বসিয়া আছেন দেখিয়া তাহারা বিবেচনা করিল যে এই ব্যক্তি অবশ্য কিছু জানিবে। সেই জন্য তাহারা হস্তপ্রসারণ করিয়া সে দিকে দেখাইয়া দিতেছিল। তাঁহাকে জিজ্ঞাসাবাদ করিবার জন্য তাহারা নামিতেছিল, এমত সময়ে ঠাকুরজি নারায়ণ স্মরণ পূর্বক প্রস্থান করিলেন। তখন তাহারা ভাবিল, তবে এই ব্যক্তি অপরাধী। এই ভাবিয়া তাহার পশ্চাৎ ধাবিত হইল। ব্রাহ্মণ এক গহ্বরমধ্যে লুকাইয়া প্রাণরক্ষা করিল।

এদিকে মহারাণা চঞ্চলকুমারীর পত্রপাঠ সমাপ্ত ও মাণিকলালকে বিদায় করিয়া অনন্ত মিশ্রের তল্লাসে গেলেন। দেখিলেন সেখানে ব্রাহ্মণ নাই—তৎ-পরিবর্তে তাঁহার ভৃত্যবর্গ, এবং তাঁহার সমভিব্যাহারী অশ্বারোহিগণ আসিয়া অধিত্যকার তলদেশ ব্যাপিত করিয়াছে। রাণাকে দেখিতে পাইয়া সকলে জয়ধ্বনি করিয়া উঠিল। বিজয়, প্রভুকে দেখিতে পাইয়া, তিন লম্ফে অবতরণ করিয়া তাঁহার কাছে দাঁড়াইল। রাণা তাহার পৃষ্ঠে আরোহণ করিলেন।

তাঁহার বস্ত্র রুধিরাক্ত দেখিয়া সকলেই বুঝিল, যে একটা কিছু ক্ষুদ্র ব্যাপার হইয়া গিয়াছে। কিন্তু রাজপুতগণের ইহা নিত্য নৈমিত্তিক ব্যাপার—কিছু কেহ জিজ্ঞাসা করিল না।

রাণা কহিলেন, "এইখানে এক ব্রাহ্মণ বসিয়াছিল ; সে কোথায় গেল—কেহ দেখিয়াছ ?"

যাহারা উহার পশ্চাদ্ধাবিত হইয়াছিল তাহারা বলিল, "মহারাজ, সে ব্যক্তি পলাইয়াছে।"

রাণা। শীঘ্র তাহার সন্ধান করিয়া লইয়া আইস।

ভৃত্যগণ তখন সবিশেষ কথা বুঝাইয়া নিবেদন করিল যে, আমরা অনেক সন্ধান করিয়াছি, কিন্তু পাই নাই।

অশ্বারোহিগণ-মধ্যে রাণার পুত্রদ্বয়, তাঁহার জ্ঞাতি ও অমাত্যবর্গ প্রভৃতি ছিল। রাজা পুত্রদ্বয় ও অমাত্যবর্গকে নির্জনে লইয়া গিয়া কথাবার্তা বলিলেন, "প্রিয়জনবর্গ! আজি অধিক বেলা হইয়াছে ; তোমাদিগের সকলের ক্ষুধা-তৃষ্ণা পাইয়াছে সন্দেহ নাই। কিন্তু আজ উদয়পুরে গিয়া ক্ষুধাতৃষ্ণা নিবারণ করা আমাদিগের অদৃষ্টে নাই। এই পার্বত্য পথে আবার আমাদিগকে ফিরিয়া যাইতে হইবে। একটু ক্ষুদ্র লড়াই জুটিয়াছে—লড়াইয়ে যাহার সাধ থাকে আমার সঙ্গে আইস—আমি এই পর্বত পুনরারোহণ করিব। যাহার সাধ না থাকে, উদয়পুরে ফিরিয়া যাও।"

এই বলিয়া রাণা পর্বত আরোহণে প্রবৃত্ত হইলেন, অমনি "জয় মহারাণা কি জয়! জয় মাতা জী কি জয়!" বলিয়া সেই শত অশ্বারোহী তাঁহার পশ্চাতে পর্বত আরোহণে প্রবৃত্ত হইল। উপরে উঠিয়া হর! হর! হর! শব্দে রূপ-নগরের পথে ধাবিত হইল। অশ্বক্ষুরের আঘাতে অধিত্যকায় ঘোরতর প্রতিধ্বনি হইতে লাগিল।

দশম পরিচ্ছেদ

এদিকে অনন্ত মিশ্র রূপনগর হইতে যাত্রা করার তিন-চারি দিন পরে রূপনগরে মহাধূম পড়িয়াছিল। মোগল বাদশাহের দুই সহস্র অশ্বারোহী সেনা রূপ-নগরের গড়ে আসিয়া উপস্থিত হইল। তাহারা চঞ্চলকুমারীকে লইতে আসিয়াছে।

নির্মলের মুখ শুকাইল ; দ্রুতবেগে সে চঞ্চলকুমারীর কাছে গিয়া বলিল, "কি হইবে সখি ?"

চঞ্চলকুমারী মৃদু হাসিয়া বলিলেন, "কিসের কি হইবে ?"

নির্মল। তোমাকে ত লইতে আসিয়াছে। কিন্তু এই ত সেদিন ঠাকুরজি

উদয়পুরে গিয়াছেন—এখনও তিনি পোঁছিতে পারেন নাই। রাজসিংহের উত্তর আসিতে না আসিতেই তোমায় লইয়া যাইবে—কি হইবে সখি ?

চঞ্চল। তার উপায় নাই—কেবল আমার সেই শেষ উপায় আছে। দিল্লীর পথে বিষভোজনে প্রাণত্যাগ—সে বিষয়ে আমি চিত্ত স্থির করিয়াছি। সুতরাং আমার আর উদ্বেগ নাই। একবার আমি কেবল পিতাকে অনুরোধ করিব—যদি মোগল সেনাপতি সাত দিনের অবসর দেন।

চঞ্চলকুমারী সময়মত পিতৃপদে নিবেদন করিল যে, "আমি জন্মের মত রূপনগর হইতে চলিলাম। আমি আর কখন যে আপনাদিগের শ্রীচরণ দর্শন করিতে পাইব, আর কখন যে বাল্যসখীগণের সঙ্গে আমোদ করিতে পাইব, এমত সম্ভাবনা নাই। আমি আর সাতদিনের অবসর ভিক্ষা করি—সাতদিন মোগল সেনা এইখানে অবস্থান করুক। আর সাত দিন আমি আপনাকে দেখিয়া শুনিয়া জন্মের মত বিদায় হইব।"

রাজা একটু কাঁদিলেন। বলিলেন, "সেনাপতিকে অনুরোধ করিব কিন্তু তিনি অপেক্ষা করিবেন কি না বলিতে পারি না।"

রাজা অঙ্গীকারমত মোগল সেনাপতির কাছে নিবেদন জানাইলেন। সেনাপতি ভাবিয়া দেখিলেন, বাদশাহ কোন সময় নিরূপিত করিয়া দেন নাই—বলিয়া দেন নাই যে এতদিনের মধ্যে ফিরিয়া আসিবে। কিন্তু সাত দিন বিলম্ব করিতে তাঁহার সাহস হইল না ; ভবিষ্যৎ বেগমের অনুরোধ একেবারে অগ্রাহ্য করিতেও পারিলেন না। আর তিন দিন অবস্থিতি করিতে স্বীকৃত হইলেন। চঞ্চলকুমারীর বড় একটা ভরসা জন্মিল না।

নিশীথকালে নিদ্রার ঘোরে চঞ্চলকুমারী স্বপ্ন দেখিলেন যে, রজতগিরি-সন্নিভ মহাকায়, বৃষভারূঢ়, স্নিগ্ধমূর্তি, জটাজুটসমন্বিত, দেবাদিদেব মহাদেব তাহার সম্মুখে মূর্তিমান্। তিনি আজ্ঞা করিয়াছেন, "তুমি কালি হইতে ভক্তি-ভাবে আমার পূজা করিবে। সেই বৎসর মধ্যে তোমার বিবাহ হইবে না। তাহার পর, উপযুক্ত সময়ে তোমার বিবাহ হইবে। যদি একবৎসর ভক্তিভাবে পূজা কর, তবে অভীপ্সিত স্বামী পাইবে, ভক্তির ত্রুটি হইলে অনভিমত স্বামীর হস্তে পড়িবে।" এই বলিয়া মহাদেব অন্তর্হিত হইলেন।

প্রভাতে উঠিয়া, স্নান করিয়া, চঞ্চলকুমারী যত্নসঞ্চিত গঙ্গাজল লইয়া মহাদেবের মন্দিরে প্রবেশ করিলেন। এবং প্রণাম করত ভক্তিভাবে দেবাদি-দেবের পূজা করিলেন। স্বপ্নের কথা কাহাকে বলিলেন না।

যে তিনদিন রাজকুমারী রূপনগরে অবস্থিতি করিলেন, সে তিন দিন তিনি ঐরূপে শিবপূজা করিলেন। কিন্তু উদয়পুর হইতে কোন সম্বাদ আসিল না—

মিশ্রঠাকুর ফিরিলেন না। তখন চঞ্চলকুমারী ঊর্ধ্বমুখে, যুক্ত করে বলিল, "হে অনাথনাথ দেবাদিদেব! অবলাকে কি প্রবঞ্চনা করিলে?"

তৃতীয় রজনীতে নির্মল আসিয়া তাঁহার কাছে শয়ন করিল। সমস্ত রাত্রি দুইজনে দুইজনকে বক্ষে রাখিয়া রোদন করিয়া রাত্রি কাটাইল। নির্মল বলিল, "আমি তোমার সঙ্গে যাইব।" কয়দিন ধরিয়া সে এই কথাই বলিতেছিল। চঞ্চল বলিল, "তুমি আমার সঙ্গে কোথায় যাইবে? আমি মরিতে যাইতেছি।" নির্মল বলিল, "আমিও মরিব। তুমি আমায় ফেলিয়া গেলেই আমি কি বাঁচিব?" চঞ্চল বলিল, "ছি! অমন কথা বলিও না—আমার দুঃখের উপর কেন দুঃখ বাড়াও?" নির্মল বলিল "তুমি আমাকে নিয়ে যাও বা না যাও, আমি নিশ্চয় তোমার সঙ্গে যাইব—কেহ রাখিতে পারিবে না।" দুইজনে কাঁদিয়া রাত্রি কাটাইল।

এদিকে, সৈয়দ হাসান আলি খাঁ, মন্‌সবদার মোগল সৈন্যের সেনাপতি, রাত্রিপ্রভাতে রাজকুমারীকে লইয়া যাইবার সকল উদ্যোগ করিয়া রাখিলেন।

একাদশ পরিচ্ছেদ

এই সময়ে একবার মাণিকলালের কথা পাড়িতে হইল।

মাণিকলাল রাণার নিকট হইতে বিদায় হইয়া, প্রথমে আবার সেই পর্বত-গুহায় ফিরিয়া গেল। আর সে দস্যুতা করিবে, এমত বাসনা ছিল না, কিন্তু পূর্ববন্ধুগণ মরিল কি বাঁচিল তাহা দেখিবে না কেন? যদি কেহ একেবারে না মরিয়া থাকে তবে তাহার শুশ্রূষা করিয়া বাঁচাইতে হইবে। এই সকল ভাবিতে ভাবিতে মাণিকলাল গুহায় প্রবেশ করিল।

দেখিল, দুইজন মরিয়া পড়িয়া রহিয়াছে। যে কেবল মূর্ছিত হইয়াছিল, সে সংজ্ঞালাভ করিয়া উঠিয়া কোথায় চলিয়া গিয়াছে। মাণিকলাল তখন বিষণ্ণচিত্তে বন হইতে একরাশি কাট ভাঙ্গিয়া আনিল—তদ্দ্বারা দুইটি চিতা রচনা করিয়া দুইটি মৃতদেহ তদুপরি স্থাপন করিল। গুহা হইতে প্রস্তর ও লৌহ বাহির করিয়া অগ্ন্যুৎপাদনপূর্বক চিতায় আগুন দিল। এইরূপ সঙ্গী-দিগের অন্তিম কার্য করিয়া সেস্থান হইতে চলিয়া গেল। পরে মনে করিল যে, যে ব্রাহ্মণকে পীড়ন করিয়াছিলাম, তাহার কি অবস্থা হইয়াছে, দেখিয়া আসি। যেখানে অনন্ত মিশ্রকে বাঁধিয়া রাখিয়াছিল, সেখানে আসিয়া দেখিল যে, সেখানে ব্রাহ্মণ নাই। দেখিল স্বচ্ছসলিলা পার্বত্য নদীর জল একটু ময়লা হইয়াছে—এবং অনেক স্থানে বৃক্ষশাখা, লতা গুল্ম তৃণাদি ছিন্নভিন্ন হইয়াছে। এই সকল চিহ্নে মাণিকলাল মনে করিল যে, এখানে বোধ হয় অনেক লোক আসিয়াছিল। তারপর দেখিল, পাহাড়ের প্রস্তরময় অঙ্গেও কতকগুলি অশ্বের

পদচিহ্ন লক্ষ্য করা যায়—বিশেষ অশ্বের ক্ষুরে যেখানে লতা গুল্ম কাটিয়া গিয়াছে, অর্ধগোলাকৃতি চিহ্নসকল স্পষ্ট। মাণিকলাল মনোযোগপূর্বক বহুক্ষণ ধরিয়া নিরীক্ষণ করিয়া বুঝিল যে এখানে অনেকগুলি অশ্বারোহী আসিয়াছিল।

চতুর মাণিকলাল তাহার পর দেখিতে লাগিল অশ্বারোহিগণ কোন্‌দিক্‌ হইতে আসিয়াছে—কোন্‌দিকে গিয়াছে। দেখিল কতকগুলি চিহ্নের সম্মুখ দক্ষিণে—কতকগুলির সম্মুখ উত্তরে। কতকদূর মাত্র দক্ষিণে গিয়া চিহ্নসকল আবার উত্তরমুখ হইয়াছে। ইহাতে বুঝিল অশ্বারোহিগণ উত্তর হইতে এই পর্যন্ত আসিয়া আবার উত্তরাংশে প্রত্যাবর্তন করিয়াছে।

এই সকল সিদ্ধান্ত করিয়া মাণিকলাল গৃহে গেল। সে স্থান হইতে মাণিকলালের গৃহ দুই-তিন ক্রোশ। তথায় রন্ধন করিয়া আহারাদি সমাপনান্তে, কন্যাটিকে ক্রোড়ে লইল। তখন মাণিকলাল ঘরে চাবি দিয়া কন্যাক্রোড়ে নিষ্ক্রান্ত হইল।

মাণিকলালের কেহ ছিল না—কেবল এক পিসীর ননদের যায়ের খুল্লতাত পুত্রী ছিল। সম্বন্ধ বড় নিকট—"সইয়ের বউয়ের বকুল ফুলের বনপো বউয়ের বনঝি জামাই" প্রায়। সৌজন্যবশতই হউক আর আত্মীয়তার সাধ মিটাইবার জন্যই হউক—মাণিকলাল তাহাকে পিসী বলিয়া ডাকিত।

মাণিকলাল কন্যা লইয়া সেই পিসীর বাড়ি গেল। ডাকিল, "পিসি গা ?"

পিসী বলিল, "কি বাছা মাণিকলাল! কি মনে করিয়া ?"

মাণিকলাল বলিল, "আমার এই মেয়েটি রাখিতে পার পিসি ?"

পিসী। কতকক্ষণের জন্য ?

মাণিক। এই দুমাস ছয়মাসের জন্য ?

পিসী। সে কি বাছা! আমি গরীব মানুষ—মেয়েকে খাওয়াব কোথা হইতে ?

মাণিক। কেন পিসী মা, তুমি কিসের গরীব ? তুমি কি নাতিনীকে দুমাস খাওয়াতে পারবে না ?

পিসী। সে কি কথা ? দুমাস একটা মেয়ে পোষিতে যে এক মোহর পড়ে।

মাণিক। আমি সে এক মোহর দিতেছি—তুমি মেয়েটিকে দুমাস রাখ। আমি উদয়পুরে যাইব—সেখানে আমি রাজসরকারে বড় চাকরি পাইয়াছি। এই বলিয়া মাণিকলাল, রাণার প্রদত্ত আশরফির মধ্যে একটা পিসীর সম্মুখে ফেলিয়া দিল; এবং কন্যাকে তাহার কাছে ছাড়িয়া দিয়া বলিল, "যা, তোর দিদির কোলে গিয়া বস্‌।"

পিসীঠাকুরাণী কিছু লোভে পড়িল। মনে মনে বিলক্ষণ জানিত যে এক মোহরে ঐ শিশুর একবৎসর গ্রাসাচ্ছাদন চলিতে পারে—মাণিকলাল কেবল দুইমাসের করার করিতেছে। অতএব কিছু লাভের সম্ভাবনা। তার পর মাণিক রাজদরবারে চাকরি স্বীকার করিয়াছে—চাহি কি বড়মানুষ হইতে পারে—তা হইলে কি পিসীকে কখন কিছু দিবে না? মানুষটা হাতে থাকা ভাল!

পিসী তখন মোহরটি কুড়াইয়া লইয়া বলিল, "তার আশ্চর্য কি বাছা—তোমার মেয়ে মানুষ করিব সে কি বড় ভারি কাজ? তুমি নিশ্চিন্ত থাক। আয় রে জান্ আয়!" বলিয়া পিসী কন্যাকে কোলে তুলিয়া লইল।

কন্যা সম্বন্ধে এইরূপ বন্দোবস্ত হইলে মাণিকলাল নিশ্চিন্ত চিত্তে গ্রাম হইতে নির্গত হইল। কাহাকে কিছু না বলিয়া রূপনগরে যাইবার পার্বত্যপথে আরোহণ করিল

মাণিকলাল এইরূপ বিচার করিতেছিল। ঐ অধিত্যকায় অনেকগুলি অশ্বারোহী আসিয়াছিল কেন? ঐখানে রাণাও একাকী ভ্রমিতে ছিলেন—কিন্তু উদয়পুর হইতে এতদূর রাণা একাকী আসিবার সম্ভাবনা নাই। অতএব উহারা রাণার সমভিব্যাহারী অশ্বারোহী। তারপর, দেখা গেল উহারা উত্তর হইতে আসিয়াছে—উদয়পুর অভিমুখে যাইতেছিল—বোধ হয় রাণা মৃগয়া বা বন-বিহারে গিয়া থাকিবেন—উদয়পুর ফিরিয়া যাইতেছিলেন। তার পর দেখিলাম, উহারা উদয়পুর যায় নাই। উত্তরমুখেই ফিরিয়াছে—কেন? উত্তরে ত রূপনগর বটে। বোধ হয় চঞ্চলকুমারীর পত্র পাইয়া রাণা অশ্বারোহী সৈন্য সমভিব্যাহারে তাঁহার নিমন্ত্রণ রাখিতে গিয়াছেন। তাহা যদি না গিয়া থাকেন তবে তাঁহার রাজপুতপতি নাম মিথ্যা। আমি তাঁহার ভৃত্য—আমি তাঁহার কাছে যাইব।

কিন্তু তাঁহারা অশ্বারোহণে গিয়াছেন—আমার পদব্রজে যাইতে অনেক বিলম্ব হইবে। তবে এক ভরসা, পার্বত্যপথে অশ্ব তত দ্রুত যায় না। এবং মাণিকলাল পদব্রজে বড় দ্রুতগামী। মাণিকলাল দিবা রাত্রি পথ চলিতে লাগিল। যথাকালে সে রূপনগরে পৌঁছিল। পৌঁছিয়া দেখিল যে রূপনগরে দুই সহস্র মোগল অশ্বারোহী আসিয়া শিবির করিয়াছে কিন্তু রাজপুত সেনার কোন চিহ্ন দেখা যায় না। আরও শুনিল পরদিন প্রভাতে মোগলেরা রাজকুমারীকে লইয়া যাইবে।

মাণিকলাল বুদ্ধিতে একটি ক্ষুদ্রতর সেনাপতি। রাজপুতগণের কোন সন্ধান না পাইয়া, কিছুই দুঃখিত হইল না। মনে মনে বলিল মোগল পারিবে না—কিন্তু আমি প্রভুর সন্ধান করিয়া লইব।

একব্যক্তি নাগরিককে বলিল, "আমাকে দিল্লী যাইবার পথ দেখাইয়া দিতে

পার ? আমি কিছু বখশিস দিব।" নাগরিক সম্মত হইয়া কিছুদূর অগ্রসর হইয়া তাহাকে পথ দেখাইয়া দিল। মাণিকলাল তাহাকে পুরস্কৃত করিয়া বিদায় করিল, পরে দিল্লীর পথে, চারিদিক্ ভাল করিয়া দেখিতে দেখিতে চলিল। মাণিকলাল স্থির করিয়াছিল যে, রাজপুত অশ্বারোহিগণ অবশ্য দিল্লীর পথে কোথাও লুকাইয়া আছে। প্রথমতঃ কিছুদূর পর্যন্ত মাণিকলাল রাজপুত সেনার কোন চিহ্ন পাইল না। পরে একস্থানে দেখিল, পথ অতি সঙ্কীর্ণ হইয়া আসিল। দুই পার্শ্বে দুইটি পাহাড় উঠিয়া, প্রায় অর্ধ ক্রোশ সমান্তরাল হইয়া চলিয়াছে—মধ্যে কেবল সঙ্কীর্ণ পথ। দক্ষিণদিকে পর্বত অতি উচ্চ—এবং দুরারোহণীয়—তাহার শিখরদেশ প্রায় পথের উপর ঝুলিয়া পড়িয়াছে। বামদিকে পর্বত, অতি ধীরে ধীরে উঠিয়াছে। আরোহণের সুবিধা, এবং পর্বতও অনুচ্চ। একস্থানে ঐ বামদিকে, একটি রন্ধ্র বাহির হইয়াছে, তাহা দিয়া একটু সূক্ষ্ম পথ আছে।

নাপোলেয়ন্ প্রভৃতি অনেক দস্যু সুদক্ষ সেনাপতি ছিলেন। রাজা হইলে লোকে আর দস্যু বলে না। মাণিকলাল রাজা নহে, সুতরাং আমরা তাহাকে দস্যু বলিতে বাধ্য, কিন্তু রাজদস্যুদিগের ন্যায় এই ক্ষুদ্র দস্যুরও সেনাপতির চক্ষু ছিল। পর্বতনিরুদ্ধ সঙ্কীর্ণ পথ দেখিয়া সে মনে করিল, রাণা যদি আসিয়া থাকেন তবে এইখানেই আছেন। যখন মোগল সৈন্য এই সঙ্কীর্ণ পথ দিয়া যাইবে—এই পর্বতশিখর হইতে রাজপুত অশ্ব বজ্রের ন্যায় তাহাদিগের মস্তকে পড়িতে পারিবে। দক্ষিণদিকের পর্বত দুরারোহণীয় ; অশ্বারোহিগণের আরোহণ ও অবতরণের অনুপযুক্ত, অতএব সেখানে রাজপুত সেনা থাকিবে না—কিন্তু বামের পর্বত হইতে তাহাদিগের অবতরণের বড় সুখ। মাণিকলাল তদুপরি আরোহণ করিল। তখন সন্ধ্যা হইয়াছে।

উঠিয়া কোথাও কাহাকে দেখিতে পাইল না। মনে করিল, খুঁজিয়া দেখি, কিন্তু আবার ভাবিল, রাজা ভিন্ন আর কোন রাজপুত আমাকে চেনে না ; আমাকে মোগলের চর বলিয়া হঠাৎ কোন অদৃশ্য রাজপুত আমাকে মারিয়া ফেলিতে পারে। এই ভাবিয়া সে আর অগ্রসর না হইয়া, সেইস্থানে দাঁড়াইয়া বলিল, "মহারাণার জয় হউক !"

এই শব্দ উচ্চারিত হইবামাত্র চারি-পাঁচজন শস্ত্রধারী রাজপুত অদৃশ্য স্থান হইতে গাত্রোত্থান করিয়া দাঁড়াইল, এবং তরবারি হস্তে মাণিকলালকে কাটিতে আসিতে উদ্যত হইল।

একজন বলিল, "মারিও না।" মাণিকলাল দেখিল, স্বয়ং রাণা।

রাণা বলিলেন, "মারিও না। এ আমাদিগের স্বজন।" যোদ্ধৃগণ তখনই আবার লুক্কায়িত হইল।

রাণা মাণিককে নিকটে আসিতে বলিলেন, সে নিকটে আসিল। এক নিভৃত স্থলে তাহাকে বসিতে বলিয়া, স্বয়ং সেইখানে বসিলেন। রাণা তখন তাহাকে জিজ্ঞাসা করিলেন, "তুমি এখানে কেন আসিয়াছ ?"

মাণিকলাল বলিল, "প্রভু যেখানে, ভৃত্য সেইখানে যাইবে। বিশেষ যখন আপনি এরূপ বিপদজনক কার্যে প্রবৃত্ত হইয়াছেন, তখন যদি ভৃত্য কোনও কার্যে লাগে, এই ভরসায় আসিয়াছে। মোগলেরা দুই সহস্র—মহারাজেরর সঙ্গে এক শত। আমি কি প্রকারে নিশ্চিন্ত থাকিব ? আপনি আমাকে জীবন দান করিয়াছেন—একদিনেই কি তাহা ভুলিব ?"

রাণা জিজ্ঞাসা করিলেন, "আমি যে এখানে আসিয়াছি তুমি কি প্রকারে জানিলে ?"

মাণিকলাল তখন আদ্যোপান্ত সকল বলিল। শুনিয়া রাণা সন্তুষ্ট হইলেন। বলিলেন, "আসিয়াছ ভালই করিয়াছ—আমি তোমার মত সুচতুর লোক একজন খুঁজিতেছিলাম। আমি যাহা বলি পারিবে ?"

মাণিকলাল বলিল, "মনুষ্যের যাহা সাধ্য তাহা করিব।"

রাজা বলিলেন, "আমরা একশত যোদ্ধামাত্র; মোগলের সঙ্গে দুই হাজার—আমরা রণ করিয়া প্রাণত্যাগ করিতে পারি, কিন্তু জয়ী হইতে পারিব না। যুদ্ধ করিয়া রাজকন্যার উদ্ধার করিতে পারিব না। রাজকন্যাকে আগে বাঁচাইয়া পরে যুদ্ধ করিতে হইবে। রাজকন্যা যুদ্ধক্ষেত্রে থাকিলে তিনি আহত হইতে পারেন। তাঁহার রক্ষা প্রথমে চাই।"

মাণিকলাল বলিল, "আমি ক্ষুদ্রজীব, আমি সে সকল কি প্রকারে বুঝিব, আমাকে কি করিতে হইবে তাহাই আজ্ঞা করুন।"

রাজা বলিলেন, "তোমাকে মোগল অশ্বারোহীর বেশ ধরিয়া কল্য মোগল সেনার সঙ্গে আসিতে হইবে। রাজকুমারীর শিবিকার সঙ্গে সঙ্গে তোমাকে থাকিতে হইবে। এবং যাহা যাহা বলিতেছি তাহা করিতে হইবে।" রাণা তাহাকে সবিস্তারিত উপদেশ দিলেন।

মাণিকলাল শুনিয়া বলিলেন, "মহারাজের জয় হউক ! আমি কার্য সিদ্ধ করিব। আমাকে অনুগ্রহ করিয়া একটি ঘোড়া বক্সিস করুন।"

রাণা। আমরা একশত যোদ্ধা একশত ঘোড়া। আর ঘোড়া নাই যে তোমায় দিই। অন্য কাহারও ঘোড়া দিতে পারিব না—আমার ঘোড়া লইতে পার।

মাণিক। তাহা প্রাণ থাকিতে লইব না। আমাকে প্রয়োজনীয় হাতিয়ার দিন।

রাণা। কোথা পাইব? যাহা আছে তাহাতে আমাদের নিকট কুলায় না। কাহাকে নিরস্ত্র করিয়া তোমাকে হাতিয়ার দিব? আমার হাতিয়ার লইতে পার।

মাণিক। তাহা হইতে পারে না। আমাকে পোশাক দিতে আজ্ঞা হউক।

রাণা। এখানে যাহা পরিয়া আসিয়াছি, তাহা ভিন্ন আর পোশাক নাই। আমি কিছুই দিব না।

মাণিক। মহারাজ! তবে অনুমতি দিউন আমি যে প্রকারে হউক এসকল সংগ্রহ করিয়া লই।

রাণা হাসিলেন। বলিলেন, "চুরি করিবে?"

মাণিকলাল জিহ্বা কাটিল। "আমি শপথ করিয়াছি যে, আর সে কার্য করিব না।"

রাণা। তবে কি করিবে?

মাণিক। ঠকাইয়া লইব।

রাণা হাসিলেন। বলিলেন, "যুদ্ধকালে সকলেই চোর—সকলেই বঞ্চক। দেখ আমিও বাদশাহের বেগম চুরি করিতে আসিয়াছি—চোরের মত লুকাইয়া আছি। তুমি যে প্রকারে পার এ সংগ্রহ করিও।"

মাণিকলাল প্রফুল্লচিত্তে প্রণাম করিয়া বিদায় হইল।

পঞ্চদশ পরিচ্ছেদ

বৃহৎ অজগর সর্পের ন্যায় ফিরিতে ফিরিতে ঘুরিতে ঘুরিতে সেই অশ্বারোহী সেনা পার্বত্য পথে চলিল। যে রন্ধ্রপথের পার্শ্বস্থ পর্বতের উপর আরোহণ করিয়া মাণিকলাল রাজসিংহের সঙ্গে দেখা করিয়া আসিয়াছিল, বিবরে প্রবিশ্যমান মহোরগের ন্যায় সেই অশ্বারোহিশ্রেণী সেই রন্ধ্রপথে প্রবেশ করিল। অশ্বসকলের অসংখ্য পদবিক্ষেপধ্বনি পর্বতের গায়ে প্রতিধ্বনিত হইতে লাগিল—এমন কি, সেই স্থির শব্দহীন বিজন প্রদেশে আরোহীদিগের অস্ত্রের মৃদু শব্দ একত্রে সমুত্থিত হইয়া রোমহর্ষণ প্রতিধ্বনির উৎপত্তির কারণ হইতে লাগিল। মাঝে মাঝে অশ্বগণের হ্রেষারব—আর সৈনিকের ডাক হাঁক! পর্বততলে যেসকল লতাগুল্ম ছিল—শব্দাঘাতে তাহার পাতাসকল কাঁপিতে লাগিল। ক্ষুদ্র বন্য পশু পক্ষী কীট যাহারা সে বিজন প্রদেশে নির্ভয়ে বাস করিত, তাহারা সকলে দ্রুত পলায়ন করিল। এইরূপ সমুদায় অশ্বারোহীর সারি সেই রন্ধ্রপথে প্রবেশ করিল। তখন হঠাৎ গুম করিয়া একটা বিকট শব্দ হইল। যেখানে শব্দ হইল, সে প্রদেশের অশ্বারোহীরা ক্ষণকাল স্তম্ভিত হইয়া দাঁড়াইল। দেখিল, পর্বত-

শিখরদেশ হইতে বৃহৎ শিলাখণ্ড পর্বতচ্যুত হইয়া সৈন্যমধ্যে পড়িয়াছে। চাপে একজন অশ্বারোহী মরিয়াছে, আর একজন আহত হইয়াছে।

দেখিতে দেখিতে, ব্যাপার কি তাহা কেহ বুঝিতে না বুঝিতে, আবার সৈন্য-মধ্যে শিলাখণ্ড পড়িল—এক, দুই, তিন, চারি, ক্রমে দশ পঁচিশ—তখনই একেবারে শত শত ছোটবড় শিলাবৃষ্টি হইতে লাগিল—বহুসংখ্যক অশ্ব ও অশ্বারোহী কেহ হত কেহ আহত হইয়া, পথের উপর পড়িয়া সঙ্কীর্ণ পথ একেবারে রুদ্ধ করিয়া ফেলিল। অশ্বসকল আরোহী লইয়া পলায়নের জন্য বেগবান্ হইল—কিন্তু অগ্রে পশ্চাতে পথ সৈনিকের ঠেলাঠেলিতে অবরুদ্ধ—অশ্বের উপর অশ্ব, আরোহীর উপর আরোহী চাপিয়া পড়িতে লাগিল—সৈনিকেরা পরস্পর অস্ত্রাঘাত করিয়া পথ করিতে লাগিল—শৃঙ্খলা একেবারে ভগ্ন হইয়া গেল, সৈন্য-মধ্যে মহাকোলাহল পড়িয়া গেল।

"কাহার লোক হুঁশিয়ার! বাঁয়ে রাস্তা!" মাণিকলাল হাঁকিল। যেখানে রাজকুমারী শিবিকায়, এবং পশ্চাতে মাণিকলাল, তাহার সম্মুখেই এই গোলযোগ উপস্থিত। বাহকেরা আপনাদের প্রাণ লইয়া ব্যতিব্যস্ত—অশ্বসকল পাছু হঠিয়া তাহাদের উপর চাপিয়া পড়িতেছে। পাঠকের স্মরণ থাকিতে পারে, এই পার্বত্য পথের বাম দিক দিয়া একটি অতি সঙ্কীর্ণ রন্ধ্রপথ বাহির হইয়া গিয়াছে। তাহাতে একবারে একটিমাত্র অশ্বারোহী প্রবেশ করিতে পারে। তাহারই কাছে যখন সেনামধ্যস্থিত শিবিকা পৌঁছিয়াছিল, তখনই এই হুলস্থুল উপস্থিত হইয়াছিল। ইহাই রাজসিংহের বন্দোবস্ত। সুশিক্ষিত মাণিকলাল প্রাণভয়ে ভীত বাহকদিগকে ঐ পথ দেখাইয়া দিল। মাণিকলালের কথা শুনিবামাত্র বাহকেরা আপনাদিগের ও রাজকুমারীর প্রাণরক্ষার্থ ঝটিতি শিবিকা সেই পথে প্রবেশ করিল।

সঙ্গে সঙ্গে অশ্ব লইয়া মাণিকলালও তন্মধ্যে প্রবেশ করিল। নিকটস্থ সৈনিকেরা দেখিল যে প্রাণ বাঁচাইবার এই এক পথ, তখন আর-একজন অশ্বারোহী মাণিকলালের পশ্চাৎ পশ্চাৎ সেই পথে প্রবেশ করিতে গেল। সেই সময়ে উপর হইতে একটা অতি বৃহৎ শিলাখণ্ড গড়াইতে গড়াইতে শব্দে পার্বত্য প্রদেশ কাঁপাইতে কাঁপাইতে আসিয়া সেই রন্ধ্রমুখে পড়িয়া স্থিতিলাভ করিল। তাহার চাপে অশ্বারোহী অশ্বসমেত চূর্ণ হইয়া গেল। রন্ধ্রমুখ একেবারে বন্ধ হইয়া গেল। আর কেহ সে পথে প্রবেশ করিতে পরিল না। একা মাণিকলাল শিবিকাসঙ্গে যথেপ্সিত পথে চলিল।

সেনাপতি হাসেন আলি খাঁ মনসবদার, তখন সৈন্যের সর্বপশ্চাতে ছিলেন। প্রবেশপথমুখে স্বয়ং দাঁড়াইয়া সঙ্কীর্ণ দ্বারে সেনার প্রবেশের তত্ত্বাবধারণ করিতে-

ছিলেন। পরে সমুদায় সেনা প্রবিষ্ট হইলে স্বয়ং ধীরে ধীরে সর্বপশ্চাতে আসিতেছিলেন। দেখিলেন, সহসা সৈনিকশ্রেণী মহা গোলযোগ করিয়া পাছু হঠিতেছে। কারণ জিজ্ঞাসা করিলে কেহ কিছু ভাল বুঝাইয়া বলিতে পারে না। তখন সৈনিকগণকে ভৎ'সনা করিয়া ফিরাইতে লাগিলেন—এবং স্বয়ং সর্বাগ্রগামী হইয়া ব্যাপার কি দেখিতে চলিলেন।

কিন্তু ততক্ষণ সেনা থাকে না। পূর্বেই কথিত হইয়াছে যে এই পর্বতের দক্ষিণপার্শ্বস্থ পর্বত অতি উচ্চ এবং দুরারোহণীয়—তাহার শিখরদেশ প্রায় পথের উপর ঝুলিয়া পড়িয়া পথ অন্ধকার করিয়াছে। রাজপুতেরা তাহার প্রদেশান্তরে অনুসন্ধান করিয়া পথ বাহির করিয়া, পঞ্চাশজন তাহার উপর উঠিয়া অদৃশ্যভাবে অবস্থান করিতেছিল। এক-একজন অপরের চল্লিশ-পঞ্চাশ হাত দূরে স্থান গ্রহণ করিয়া, সমস্ত রাত্রি ধরিয়া শিলাখণ্ড সংগ্রহ করিয়া আপন আপন সম্মুখে একটি একটি ঢিপি সাজাইয়া রাখিয়াছিল। এক্ষণে পলকে পঞ্চাশ জন পঞ্চাশ খণ্ড শিলা নিম্নস্থ অশ্বারোহীদিগের উপর বৃষ্টি করিতেছিল। এক-একবারে পঞ্চাশটি অশ্ব বা আরোহী আহত বা নিহত হইতেছিল। কে মারিতেছিল, তাহা তাহারা দেখিতে পায় না। দেখিতে পাইলে, দুরারোহণীয় পর্বতশিখরস্থ শত্রুগণের প্রতি কোনরূপেই আঘাত সম্ভব নহে—অতএব তাহারা পলায়ন ভিন্ন অন্য কোন চেষ্টাই করিতেছিল না। যে সহস্রসংখ্যক অশ্বারোহী শিবিকার অগ্রভাগে ছিল, তাহার মধ্যে হত ও আহতের অবশিষ্ট পলায়নপূর্বক রন্ধ্রমুখে নির্গত হইয়া প্রাণরক্ষা করিল।

পঞ্চাশজন রাজপুত দক্ষিণপার্শ্বের উচ্চ পর্বত হইতে শিলাবৃষ্টি করিতেছিল —আর পঞ্চাশজন স্বয়ং রাজসিংহের সহিত বামদিকের অনুচ্চ পর্বতশিরে লুক্কায়িত ছিল, তাহারা এতক্ষণ কিছুই করিতেছিল না। কিন্তু এক্ষণে তাহাদের কার্য করিবার সময় উপস্থিত হইল। যেখানে শিলাবৃষ্টি নিবন্ধন ঘোরতর বিপত্তি সেখানে মিরজা মবারক আলিনামা একজন যুবা মোগল—অর্থাৎ আহেলে বিলায়ত তুর্কস্থানী এবং দুইশতী মনসবদার, অবস্থিতি করিতেছিলেন। তিনি প্রথমে সৈন্যগণকে সুশৃঙ্খলের সহিত পার্বত্য পথ হইতে বহিষ্কৃত করিবার যত্ন করিয়াছিলেন, কিন্তু যখন দেখিলেন ক্ষুদ্রতর রন্ধ্রপথে রাজকুমারীর শিবিকা চলিয়া গেল, একজন মাত্র অশ্বারোহী তাহার সঙ্গে গেল, অমনি অর্গলের ন্যায় বৃহৎ শিলাখণ্ড সে পথ বন্ধ করিল—তখন তাঁহার মনে সন্দেহ উপস্থিত হইল যে এ ব্যাপার আর কিছুই নহে—কোন দুরাত্মা রাজকুমারীকে অপহরণ করিবার মানসে এই উদ্যম করিয়াছে। তখন তিনি ডাকিয়া নিকটস্থ সৈনিকদিগকে বলিলেন—"প্রাণ যায় সেও স্বীকার! শত শিপাহী দোলার পিছু পিছু যাও।

ঘোড়া ছাড়িয়া পাঁওদলে, এই পাথর টপকাইয়া যাও—চল আমি যাইতেছি।" মবারক অগ্রে ঘোড়া হইতে লাফাইয়া পড়িয়া পথরোধক শিলাখণ্ডের উপর উঠিলেন। এবং তাহার উপর হইতে লাফাইয়া নীচে পড়িলেন। তাঁহার দৃষ্টান্তের অনুবর্তী হইয়া শত শিপাহী তাঁহার সঙ্গে সঙ্গে সেই রন্ধ্রপথে প্রবেশ করিল।

রাজসিংহ পর্বতশিখর হইতে এ সকল দেখিতে লাগিলেন। যতক্ষণ মোগলেরা ক্ষুদ্র পথে একে একে প্রবেশ করিতেছিল ততক্ষণ কাহাকেও কিছু বলিলেন না। পরে রন্ধ্রপথমধ্যে নিবদ্ধ হইলে, পঞ্চাশৎ অশ্বারোহী রাজপুত লইয়া বজ্রের ন্যায় ঊর্ধ্ব হইতে তাহাদের উপর পড়িয়া, তাহাদের নিহত করিতে লাগিলেন। সহসা উপর হইতে আক্রান্ত হইয়া মোগলেরা বিশৃঙ্খল হইয়া গেল। তাহাদের মধ্যে অধিকাংশ এই ভয়ঙ্কর রণে প্রাণত্যাগ করিল। উপর হইতে ছুটিয়া আসিয়া ঘোড়া ঘোড়ার উপর, শিপাহী শিপাহীর উপর পড়িল—নীচে যাহারা ছিল তাহারা চাপেই মরিল। পাঁচ-সাত-দশজন মাত্র এড়াইল। মবারক তাহাদের লইয়া ফিরিলেন। রাজপুতেরা তাহাদের পশ্চাদ্বর্তী হইল না।

মবারকের সঙ্গে মোগল শিপাহীর বেশধারী মাণিকলালও বাহির হইয়া আসিল। আসিয়াই একজন মৃত সোওয়ারের অশ্বে আরোহণ করিয়া সেই শৃঙ্খলাশূন্য মোগলসেনার মধ্যে কোথায় লুকাইল মবারক তাহা দেখিতে পাইলেন না।

মাণিকলাল, যে মুখে মোগলেরা সেই পার্বত্য পথে প্রবেশ করিয়াছিল, সেই পথে নির্গত হইল। যাহারা তাহাকে দেখিল, তাহারা ভাবিল সে পলাইতেছে। মাণিকলাল গলি হইতে বাহির হইয়া তীরবেগে ঘোড়া ছুটাইয়া রূপনগরের গড়ের দিকে চলিল।

মবারক প্রস্তরখণ্ড পুনরুল্লঙ্ঘন করিয়া ফিরিয়া আসিয়া, আজ্ঞা দিলেন, 'এই পাহাড়ে চড়িতে কষ্ট নাই ; সকলেই ঘোড়া লইয়া এই পাহাড়ের উপরে উঠ! দস্যু অল্পসংখ্যক। তাহাদের সমূলে নিপাত করিব।" তখন পাঁচশত মোগল সেনা, "দীন! দীন!" শব্দ করিয়া অশ্বসহিত বামদিকের সেই পর্বতশিখরে আরোহণ করিতে লাগিল। মবারক অধিনায়ক। মোগলদিগের সঙ্গে দুইটা তোপ ছিল। একটা ঠেলিয়া তুলিয়া পাহাড়ে উঠাইতে লাগিল। আর একটা লইয়া মোগলেরা টানিয়া, যে বৃহৎ শিলাখণ্ডের দ্বারা পার্বত্য রন্ধ্র বন্ধ হইয়াছিল, তাহার উপর উঠাইয়া স্থাপিত করিল।

ষোড়শ পরিচ্ছেদ

তখন দীন দীন শব্দে পঞ্চাশৎ অশ্বারোহী কালান্তক যমের ন্যায় পর্বতে আরোহণ

করিল। পর্বত অনুচ্চ ইহা পূর্বেই কথিত হইয়াছে—শিখরদেশে উঠিতে তাহাদের অনেক কালবিলম্ব হইল না। কিন্তু পর্বতশিখরে উঠিয়া দেখিল যে, কেহ ত পর্বতোপরে নাই। যে রন্ধ্রপথমধ্যে প্রবেশ করিয়া তিনি নিজে পরাভূত হইয়া ফিরিয়া আসিয়াছিলেন, এখন মবারক বুঝিলেন যে, সমুদয় দস্যু—মবারকের বিবেচনায় তাহারা রাজপুত দস্যু ভিন্ন আর কিছুই নহে—সমুদায় দস্যু সেই রন্ধ্রপথে আছে। তাহার দ্বিতীয় মুখ রোধ করিয়া তাহাদিগের বিনাশসাধন করিবেন, মবারক এইরূপ মনে মনে স্থির করিলেন। হাসান আলি আর মুখে কামান পাতিয়া বসিয়া আছেন। এই ভাবিয়া, তিনি সেই রন্ধ্রের ধারে ধারে লইয়া চলিলেন। ক্রমে পথ প্রশস্ত হইয়া আসিল; তখন মবারক পাহাড়ের ধারে আসিয়া দেখিলেন চল্লিশ জনের অনধিক রাজপুত শিবিকাসঙ্গে রুধিরাক্ত কলেবরে সেই পথে চলিতেছে। মবারক বুঝিলেন যে অবশ্য ইহারা নির্গমপথ জানে; ইহাদের উপর দৃষ্টি রাখিয়া ধীরে ধীরে চলিলে, রন্ধ্রদ্বারে উপস্থিত হইব। তাহা হইলে যেরূপ পথে রাজপুতেরা পর্বত হইতে নামিয়াছিল সেইরূপ অন্যপথ দেখিতে পাইব। রাজপুতেরা যে আগে উপরে ছিল পরে নামিয়াছে তাহার সহস্র চিহ্ন দেখা যাইতেছিল। মবারক সেইরূপ করিতে লাগিলেন। কিছু পরে দেখিলেন, পাহাড় ঢালু হইয়া আসিতেছে, সম্মুখে নির্গমের পথ। মবারক অশ্বসকল তীরবেগে চালাইয়া পর্বততলে নামিয়া রন্ধ্রমুখ বন্ধ করিলেন। রাজপুতেরা রন্ধ্রের বাঁক ফিরিয়া যাইতেছিল—সুতরাং তাহার আগে রন্ধ্রমুখে পৌঁছিতে পারিল না। মোগলেরা পথরোধ করিয়া রন্ধ্র-মুখে কামান বসাইল; এবং আগতপ্রায় রাজপুতগণকে উপহাস করিবার জন্য তাহার বজ্রনাদ একবার শুনাইল—দীন! দীন! শব্দের সঙ্গে পর্বতে পর্বতে সেই ধ্বনি ধ্বনিত হইল। শুনিয়া উত্তরস্বরূপ রন্ধ্রের অপর মুখে হাসান আলিও কামানের আওয়াজ করিলেন; আবার পর্বতে পর্বতে প্রতিধ্বনি বিকট ডাক ডাকিল। রাজপুতগণ শিহরিল—তাহাদিগের কামান ছিল না।

রাজসিংহ দেখিলেন, আর কোনমতেই রক্ষা নাই। তাঁহার সৈন্যের বিশ-গুণ সেনা, পথের দুই মুখ বন্ধ করিয়াছে—পথান্তর নাই—কেবল যমমন্দিরের পথ খোলা। রাজসিংহ স্থির করিলেন সেই পথেই যাইবেন। তখন সৈন্য-গণকে একত্রিত করিয়া বলিতে লাগিলেন,

"ভাই বন্ধু, যে কেহ সঙ্গে থাক, আজি সরলান্তঃকরণে আমি তোমাদের কাছে ক্ষমা চাহিতেছি। আমারই দোষে এ বিপদ ঘটিয়াছে—পর্বত হইতে নামিয়াই এ দোষ করিয়াছি। এখন এ গলির দুই মুখ বন্ধ—দুই মুখেই কামান শুনিতেছ? দুই মুখে আমাদের বিশগুণ মোগল দাঁড়াইয়া আছে—সন্দেহ নাই।

অতএব আমাদিগের বাঁচিবার ভরসা নাই। নাই—তাহাতেই বা ক্ষতি কি ? রাজপুত হইয়া কে মরিতে কাতর ? সকলেই মরিব—একজনও বাঁচিব না—কিন্তু মারিয়া মরিব। যে মরিবার আগে দুইজন মোগল না মারিয়া মরিবে—সে রাজপুত নহে—বিজাতক। রাজপুতেরা শুন। এ পথে ঘোড়া ছুটে না—সবাই ঘোড়া ছাড়িয়া দাও। এসো আমরা তরবাল হাতে লাফাইয়া গিয়া তোপের উপর পড়ি। তোপ ত আমাদেরই হইবে—তার পর দেখা যাইবে কত মোগল মারিয়া মরিতে পারি।"

তখন রাজপুতগণ, অশ্ব হইতে লাফাইয়া পড়িয়া একত্রে অসি নিষ্কোষিত করিয়া "রাণাজি কি জয়!" বলিয়া দাঁড়াইল। তাহাদের দৃঢ়প্রতিজ্ঞ মুখকান্তি দেখিয়া রাজসিংহ বুঝিলেন যে, প্রাণরক্ষা না হউক—একটি রাজপুতও হঠিবে না। সন্তুষ্ট চিত্তে রাণা আজ্ঞা দিলেন, "দুই দুই করিয়া সারি দাও।" অশ্বপৃষ্ঠে সবে একে একে যাইতেছিল—পদব্রজে দুইয়ে দুইয়ে রাজপুত চলিল—রাণা সর্বাগ্রে চলিলেন। আজ আসন্ন মৃত্যু দেখিয়া তিনি প্রফুল্লচিত্ত।

এমত সময়ে সহসা পর্বতরন্ধ্র কম্পিত করিয়া, পর্বতে প্রতিধ্বনি তুলিয়া, রাজপুত সেনা শব্দ করিল, "মাতা জি কি জয়! কালীমায়ি কি জয়!"

অত্যন্ত হর্ষসূচক ঘোর রব শুনিয়া রাজসিংহ পশ্চাৎ ফিরিয়া দেখিলেন ব্যাপার কি ? দেখিলেন, দুইপার্শ্বে রাজপুতসেনা সারি দিয়াছে—মধ্যে বিশাললোচনা, সহাস্যবদনা, কোন্ দেবী আসিতেছে। হয় কোন দেবী মনুষ্যমূর্তি ধারণ করিয়াছে—নয় কোন মানবীকে বিধাতা দেবীর মূর্তিতে গঠিয়াছেন। রাজপুতেরা মনে করিল, চিতোরাধিষ্ঠাত্রী রাজপুতকুলরূপিণী ভগবতী এ সঙ্কটে রাজপুতকে রক্ষা করিতে স্বয়ং রণে অবতীর্ণা হইয়াছেন। তাই তাহারা জয়ধ্বনি করিতেছিল।

রাজসিংহ দেখিলেন—এ ত মানবী, কিন্তু সামান্য মানবী নহে। ডাকিয়া বলিলেন, "দেখ, দোলা কোথায় ?"

একজন পিছু হইতে বলিল, "দোলা এই দিকে আছে।"

রাণা বলিলেন, "দেখ, দোলা খালি কি না ?"

সৈনিক বলিল, "দোলা খালি, কুমারী জী মহারাজের সামনে।"

চঞ্চলকুমারী তখন রাজসিংহকে প্রণাম করিলেন। রাণা জিজ্ঞাসা করিলেন, "রাজকুমারী—আপনি এখানে কেন ?"

চঞ্চল বলিলেন, "মহারাজ! আপনাকে প্রণাম করিতে আসিয়াছি। প্রণাম করিয়াছি—এখন একটি ভিক্ষা চাহি! আমি মুখরা—স্ত্রীলোকের শোভা যে লজ্জা তাহা আমাতে নাই, ক্ষমা করিবেন। ভিক্ষা যাহা চাহি—তাহাতে নৈরাশ

করিবেন না।” চঞ্চলকুমারী হাস্য ত্যাগ করিয়া, যোড় হাত করিয়া কাতর স্বরে এই কথা বলিলেন।

রাজসিংহ বলিলেন, “তোমারই জন্য এতদূর আসিয়াছি—তোমাকে অদেয় কিছুই নাই—কি চাও, রূপনগরের কন্যে ?”

চঞ্চলকুমারী আবার যোড় হাত করিয়া বলিল, “আমি চঞ্চলমতি বালিকা বলিয়া আপনাকে আসিতে লিখিয়াছিলাম ; কিন্তু আপনার মন আপনি বুঝিতে পারি নাই। আমি এখন মোগলসম্রাটের ঐশ্বর্যের কথা শুনিয়া, বড় মুগ্ধ হইয়াছি। আপনি অনুমতি করুন—আমি দিল্লী যাইব।”

রাজসিংহ বিস্মিত ও বিরক্ত হইলেন। বলিলেন, “তোমার দিল্লী যাইতে হয় যাও—আমার আপত্তি নাই—স্ত্রীলোক চিরকাল অস্থিরচিত্ত। কিন্তু আপাততঃ তুমি যাইতে পাইবে না। যদি এখন তোমাকে ছাড়িয়া দিই, মোগল মনে করিবে যে প্রাণভয়ে ভীত হইয়া তোমাকে ছাড়িয়া দিলাম। আগে যুদ্ধ শেষ হউক—তার পর তুমি যাইও। যওয়ান্ সব—আগে চল।”

তখন চঞ্চলকুমারী মৃদু হাসিয়া, মর্মভেদী মৃদুল কটাক্ষ করিয়া, দক্ষিণ হস্তের কনিষ্ঠাঙ্গুলিস্থিত হীরকাঙ্গুরীয় বামহস্তের অঙ্গুলিদ্বয়ের দ্বারা ফিরাইয়া রাজসিংহকে দেখাইতে দেখাইতে বলিলেন, “মহারাজ ! এই আঙ্গটিতে বিষ আছে। দিল্লীতে না যাইতে দিলে, আমি বিষ খাইব।”

রাজসিংহ তখন হাসিলেন—বলিলেন, “বুঝিয়াছি রাজকুমারি—রমণীকুলে তুমি ধন্যা। কিন্তু তুমি যাহা ভাবিতেছ তাহা হইবে না। আজ রাজপুতের বাঁচা হইবে না ; আজ রাজপুতকে মরিতেই হইবে—নহিলে রাজপুত নামে বড় কলঙ্ক হইবে।—আমরা যতক্ষণ না মরি—ততক্ষণ তুমি বন্দী। আমরা মরিলে তুমি যেখানে ইচ্ছা সেখানে যাইও।”

চঞ্চলকুমারী হাসিল—অতিশয় প্রণয়প্রফুল্ল ভক্তিপ্রমোদিত, সাক্ষাৎ মহাদেবের অনিবার্য এক কটাক্ষবাণ রাজসিংহের উপর ত্যাগ করিল। মনে মনে বলিতে লাগিল, “বীরচূড়ামণি ! আজি হইতে আমি তোমার মহিষী হইলাম ! যদি তোমার মহিষী না হই—তবে চঞ্চল কখনই প্রাণ রাখিবে না।” প্রকাশ্যে বলিল, “মহারাজ ! দিল্লীশ্বর যাহাকে মহিষী করিতে অভিলাষ করিয়াছেন, সে কাহারও বন্দী নহে। এই আমি মোগলসৈন্য-সম্মুখে চলিলাম—কাহার সাধ্য রাখে দেখি ?”

এই বলিয়া চঞ্চলকুমারী—জীবন্ত দেবীমূর্তি, রাজসিংহকে পাশ করিয়া রক্তমুখে চলিল। তাঁহাকে স্পর্শ করে কাহার সাধ্য ? এজন্য কেহ তাঁহার

গতি রোধ করিতে পারিল না। হাসিতে হাসিতে, হেলিতে দুলিতে, সেই স্বর্ণমুক্তাময়ী প্রতিমা রন্ধ্রমুখে চলিয়া গেল।

একাকিনী, চঞ্চলকুমারী সেই প্রজ্বলিত বহ্নিতুল্য বুষ্ট, সশস্ত্র পঞ্চশত মোগল অশ্বারোহীর সম্মুখে গিয়া দাঁড়াইলেন। যেখানে সেই পথরোধকারী কামান—মনুষ্যনির্মিত বজ্র, অগ্নি উদ্গীর্ণ করিবার জন্য হাঁ করিয়া আছে—গোলন্দাজের হাতে অগ্নি জ্বলিতেছে—সেইখানে, সেই কামানের সম্মুখে রত্ন-মণ্ডিতা লোকাতীত সুন্দরী দাঁড়াইল। দেখিয়া বিস্মিত মোগলসেনা মনে করিল—পর্বতনিবাসিনী পরী আসিয়াছে।

মনুষ্যভাষায় কথা কহিয়া চঞ্চলকুমারী সে ভ্রম ভাঙ্গিল।—বলিল "এ সেনার সেনাপতি কে?"

মবারক স্বয়ং রন্ধ্রমুখে রাজতপুগণের প্রতীক্ষা করিতেছিলেন—তিনি বলিলেন, "ইহারা এখন অধমের অধীনে। আপনি কে?"

চঞ্চলকুমারী বলিলেন, 'আমি সামান্যা স্ত্রী। আপনার কাছে কিছু ভিক্ষা আছে—যদি অন্তরালে শুনেন, তবেই বলিতে পারি।"

মবারক বলিলেন, "তবে রন্ধ্রমধ্যে আগু হউন।" চঞ্চলকুমারী রন্ধ্রমধ্যে অগ্রসর হইলেন—মবারক পশ্চাৎ পশ্চাৎ গেলেন।

যেখানে কথা অন্যে শুনিতে পায় না এমত স্থানে আসিয়া চঞ্চলকুমারী বলিতে লাগিলেন, "আমি রূপনগরের রাজকন্যা। বাদশাহ আমাকে বিবাহ করিবার অভিলাষে আমাকে লইতে এই সেনা পাঠাইয়াছেন—এ কথা বিশ্বাস করেন কি?"

মবারক। আপনাকে দেখিয়াই সে বিশ্বাস হয়।

চঞ্চল। আমি মোগলকে বিবাহ করিতে অনিচ্ছুক—ধর্মে পতিত হইব মনে করি। কিন্তু পিতা ক্ষীণবল—তিনি আমাকে আপনাদিগের সঙ্গে পাঠাইয়াছেন।—তাঁহা হইতে কোন ভরসা নাই বলিয়া আমি রাজসিংহের কাছে দূত প্রেরণ করিয়াছিলাম—আমার কপালক্রমে তিনি পঞ্চাশজন মাত্র শিপাহী লইয়া আসিয়াছেন—তাঁহাদের বলবীর্য ত দেখিলেন?

মবারক চমকিয়া উঠিয়া বলিলেন, "সে কি—পঞ্চাশ জন শিপাহী এক সহস্র মোগল মারিল?"

চঞ্চল। বিচিত্র নহে—হলদীঘাটে ঐ রকম কি একটা হইয়াছি শুনিয়াছি। কিন্তু সে যাই হউক—রাজসিংহ এক্ষণে আপনার নিকট পরাস্ত। তাঁহাকে পরাস্ত দেখিয়াই আমি আসিয়া ধরা দিতেছি! আমাকে দিল্লী লইয়া চলুন—যুদ্ধে আর প্রয়োজন নাই।

মবারক বলিলেন, “বুঝিয়াছি, নিজের সুখ বলি দিয়া আপনি রাজপুতের প্রাণরক্ষা করিতে চাহেন। তাঁহাদেরও কি সেই ইচ্ছা ?”

চ। সেও কি সম্ভবে ? আমাকে আপনারা লইয়া চলিলেও তাহারা যুদ্ধ ছাড়িবে না। আমার অনুরোধ, আমার সঙ্গে একমত হইয়া আপনি তাহাদের প্রাণরক্ষা করুন।

ম। তাহা পারি, কিন্তু দস্যুর দণ্ড অবশ্য দিতে হইবে। আমি তাঁহাদের বন্দী করিব।

চ। সব পারিবেন—সেইটি পারিবেন না। তাঁহাদিগকে প্রাণে মারিতে পারিবেন কিন্তু বাঁধিতে পারিবেন না। তাঁহারা সকলেই মরিতে স্থিরপ্রতিজ্ঞ হইয়াছেন—মরিবেন।

মবা। তাহা বিশ্বাস করি। কিন্তু আপনি দিল্লী যাইবেন ইহা স্থির ?

চ। আপনাদিগের সঙ্গে আপাতত যাওয়াই স্থির। দিল্লী পর্যন্ত পৌঁছিব কি না সন্দেহ।

মবা। সে কি ?

চ। আপনারা যুদ্ধ করিয়া মরিতে জানেন, আমরা স্ত্রীলোক, আমরা কি শুধু শুধু মরিতে জানি না ?

মবা। আমাদের শক্র আছে, তাই মরি। ভুবনে কি আপনার শক্র আছে ?

চ। আমি নিজে।—

ম। আমাদের শক্রর অনেক প্রকার অস্ত্র আছে—আপনার ?

চ। বিষ।

ম। ‘কোথায় আছে’ বলিয়া মবারক চঞ্চলকুমারীর মুখপানে চাহিলেন। বুঝি অন্য কেহ হইলে তাহার মনে মনে হইত “নয়ন ছাড়া আর কোথায় বিষ আছে কি ?” কিন্তু মবারক সে ইতর প্রকৃতির মনুষ্য ছিলেন না। তিনি রাজ-সিংহের ন্যায় যথার্থ বীরপুরুষ। তিনি বলিলেন, “মা, আত্মঘাতিনী কেন হইবেন ? আপনি যদি যাইতে না চাহেন তবে আমাদের সাধ্য কি আপনাকে লইয়া যাই ? স্বয়ং দিল্লীশ্বর উপস্থিত থাকিলেও আপনার উপর বল প্রকাশ করিতে পারিতেন না—আমরা কোন্ ছার ? আপনি নিশ্চিন্ত থাকুন—কিন্তু এ রাজপুতেরা বাদশাহের সেনা আক্রমণ করিয়াছে—আমি মোগল সেনাপতি হইয়া কি প্রকারে উহাদের ক্ষমা করি ?”

চ। ক্ষমা করিয়া কাজ নাই—যুদ্ধ করুন।

এই সময়ে রাজপুতগণ লইয়া রাজসিংহ সেইখানে উপস্থিত হইলেন—

তখন চঞ্চলকুমারী বলিতে লাগিলেন, "যুদ্ধ করুন—রাজপুতের মেয়েরাও মরিতে জানে।"

মোগলসেনাপতির সঙ্গে লজ্জাহীনা চঞ্চল কি কথা কহিতেছে শুনিবার জন্য রাজসিংহ এই সময়ে চঞ্চলের পার্শ্বে আসিয়া দাঁড়াইলেন। চঞ্চল তখন তাঁহার কাছে হাত পাতিয়া, হাসিয়া বলিলেন, "মহারাজাধিরাজ! আপনার কোমরে যে তরবারি দুলিতেছে, রাজপ্রসাদস্বরূপ দাসীকে উহা দিতে আজ্ঞা হউক।"

রাজসিংহ হাসিয়া বলিলেন, "বুঝিয়াছি তুমি সত্য সত্যই ভৈরবী।" এই বলিয়া রাজসিংহ কটি হইতে অসি নির্মুক্ত করিয়া চঞ্চলকুমারীর হাতে দিলেন। চঞ্চল অসি ঘুরাইয়া, মবারকের সম্মুখে তুলিয়া ধরিয়া বলিল, "তবে যুদ্ধ করুন। রাজপুতেরা যুদ্ধ করিতে জানে। আর রাজপুতানার স্ত্রীলোকেরাও যুদ্ধ করিতে জানে। খাঁসাহেব! আগে আমার সঙ্গে যুদ্ধ করুন। স্ত্রীহত্যা হইলে, আপনার বাদশাহের গৌরব বাড়িতে পারে।"

শুনিয়া, মোগল ঈষৎ হাসিল। চঞ্চলকুমারীর কথায় কোন উত্তর করিল না। কেবল রাজসিংহের মুখপানে চাহিয়া বলিল, "উদয়পুরের বীরেরা কতদিন হইতে স্ত্রীলোকের বাহুবলে রক্ষিত?"

রাজসিংহের দীপ্ত চক্ষু হইতে অগ্নিস্ফুলিঙ্গ নির্গত হইল। তিনি বলিলেন, "যতদিন হইতে মোগল বাদশাহ অবলাদিগের উপর অত্যাচার আরম্ভ করিয়াছেন, ততদিন হইতে রাজপুত কন্যাদের বাহুতে বল হইয়াছে।" তখন রাজসিংহ সিংহের ন্যায় গ্রীবাভঙ্গের সহিত, স্বজনবর্গের দিকে ফিরিয়া বলিলেন, "রাজপুতেরা বাগ্‌যুদ্ধে অপটু। বৃথা কালহরণে প্রয়োজন নাই—পিপীলিকার মত এই মোগলদিগকে মারিয়া ফেল।"

এতক্ষণ বর্ষণোন্মুখ মেঘের ন্যায় উভয় সৈন্য স্তম্ভিত হইয়াছিল—প্রভুর আজ্ঞা ব্যতীত কেহই যুদ্ধে প্রবৃত্ত হইতে পারিতেছিল না। এক্ষণে রাণার আজ্ঞা পাইয়া "হর! হর! বম্! বম্!" শব্দে, রাজপুতেরা জলপ্রবাহবৎ মোগলসেনার উপরে পড়িল। এদিকে মবারকের আজ্ঞা পাইয়া, মোগলেরা "আল্লা—হো—আকবর!" শব্দ করিয়া তাহাদের প্রতিরোধ করিতে উদ্যত হইল। কিন্তু সহসা উভয় সেনাই নিষ্পন্দ হইয়া দাঁড়াইল! সেই রণক্ষেত্রে উভয় সেনার মধ্যে অসি উত্তোলন করিয়া—স্থিরমূর্তি চঞ্চলকুমারী দাঁড়াইয়া—সরিতেছে না।

চঞ্চলকুমারী উচ্চৈঃস্বরে বলিতে লাগিলেন, "যতক্ষণ না একপক্ষ নিবৃত্ত হয়—ততক্ষণ আমি এখান হইতে নড়িব না। অগ্রে আমাকে না মারিয়া কেহ অস্ত্রচালনা করিতে পারিবে না।"

রাজসিংহ রুষ্ট হইয়া বলিলেন, "তোমার এ অকর্তব্য। স্বহস্তে তুমি রাজপুতকুলে এই কলঙ্ক লেপিতেছ কেন ? লোকে বলিবে, আজ স্ত্রীলোকের সাহায্যে রাজসিংহ প্রাণরক্ষা করিলেন।"

চ। মহারাজ! আপনাকে মরিতে কে নিষেধ করিতেছে ? আমি কেবল আগে মরিতে চাহিতেছি। যে অনর্থের মূল—তাহার আগে মরিবার অধিকার আছে।

চঞ্চল নড়িল না—মোগলেরা বন্দুক উঠাইয়াছিল—নামাইল! মবারক চঞ্চলকুমারীর কার্য দেখিয়া মুগ্ধ হইলেন। তখন উভয় সেনাসমক্ষে মবারক ডাকিয়া বলিলেন, "মোগল বাদশাহ স্ত্রীলোকের সহিত যুদ্ধ করেন না—অতএব বলি, আমরা এই সুন্দরীর নিকট পরাভব স্বীকার করিয়া যুদ্ধত্যাগ করিয়া যাই। রাণা রাজসিংহের সঙ্গে যুদ্ধে জয়-পরাজয়ের মীমাংসা ভরসা করি, ক্ষেত্রান্তরে হইবে। আমি রাণাকে অনুরোধ করিয়া যাইতেছি যে, সেবার যেন স্ত্রীলোক সঙ্গে করিয়া না আইসেন।"

চঞ্চলকুমারী মবারকের জন্য চিন্তিত হইলেন। মবারক তখন তাঁহার নিকটে—অশ্বে আরোহণ করিতেছেন মাত্র। চঞ্চলকুমারী তাঁহাকে বলিলেন, "সাহেব! আমাকে ফেলিয়া যাইতেছেন কেন ? আমাকে লইয়া যাইবার জন্য আপনাদের দিল্লীশ্বর পাঠাইয়া দিয়াছেন। আমাকে যদি না লইয়া যান, তবে বাদশাহ কি বলিবেন ?"

মবারক বলিল, "বাদশাহের বড় আর-একজন আছেন। উত্তর তাঁহার কাছে দিব।"

চঞ্চল। সে ত পরলোকে। কিন্তু ইহলোকে ?

মবারক। মবারক আলি ইহলোকে কাহাকেও ভয় করে না। ঈশ্বর আপনাকে কুশলে রাখুন। আমি বিদায় হইলাম।

এই বলিয়া মবারক অশ্বে আরোহণ করিলেন। তাঁহার সৈন্যকে ফিরিতে আদেশ করিতেছিলেন, এমত সময়ে পশ্চাতে একেবারে সহস্র বন্দুকের শব্দ শুনিতে পাইলেন। একেবারে শত মোগল যোদ্ধা ধরাশায়ী হইল। মবারক দেখিলেন, ঘোর বিপদ—কোথা হইতে সহস্রাধিক অশ্বারোহী আসিয়া তাঁহাকে পশ্চাৎ হইতে আক্রমণ করিতেছে। দৃষ্টিমাত্র মোগলেরা পলায়ন করিল। যে যেদিকে পারিল, সেই সেই দিকে পলায়ন করিল—মবারক রাখিতে পারিলেন না। তখন শত্রুগণ হর হর বম্ বম্ শব্দ করিয়া তাহাদের পশ্চাৎ পশ্চাৎ ছুটিল।

সপ্তদশ পরিচ্ছেদ

এক্ষণে আমরা বলিব, অকস্মাৎ এই সৈন্য কোথা হইতে আসিয়া মোগলদিগকে আক্রমণ করিল।

মাণিকলাল পার্বত্য পথ হইতে নির্গত হইয়াই ঘোড়া ছুটাইয়া একেবারে রূপনগরের গড়ে গিয়া উপস্থিত হইলেন। রূপনগরের রাজার কিছু সিপাহী ছিল, তাহারা বেতনভোগী চাকর নহে ; জমি করিত ; ডাক হাঁক করিলে ঢাল, খাঁড়া, লাঠি, সোঁটা লইয়া আসিয়া উপস্থিত হইত ; এবং সকলেরই এক-একটি ঘোড়া ছিল। মোগলসেনা আসিলে রূপনগরের রাজা তাহাদিগকে ডাক হাঁক করিয়াছিলেন। প্রকাশ্যে তাহাদিগের ডাকিবার কারণ, মোগল সৈন্যের সম্মান ও খবরদারিতে তাহাদিগকে নিযুক্ত করা। গোপন অভিপ্রায়, যদি মোগলসেনা হঠাৎ কোন উপদ্রব উপস্থিত করে তবে তাহার নিবারণ। ডাকিবামাত্র রাজপুতেরা ঢাল, খাঁড়া, ঘোড়া লইয়া গড়ে উপস্থিত হইল—রাজা তাহাদিগকে, অস্ত্রাগার হইতে অস্ত্র দিয়া সাজাইলেন। তাহারা কয়দিন নানাবিধ পরিচর্যায় নিযুক্ত থাকিয়া মোগল সৈনিকগণের সহিত হাস্যপরিহাস ও রঙ্গরসে কয়দিবস কাটাইল। তাহার পর ঐ দিবস প্রভাতে মোগলসেনা শিবির ভঙ্গ করিয়া রাজকুমারীকে লইয়া যাওয়াতে, রূপনগরের সৈনিকেরাও গৃহে প্রত্যাগমন করিতে আজ্ঞা পাইল। তখন তাহারা অশ্ব সজ্জিত করিল এবং অস্ত্রসকল রাজার অস্ত্রাগারে ফিরাইয়া দিবার জন্য লইয়া আসিল, রাজা স্বয়ং তাহাদিগকে একত্রিত করিয়া স্নেহসূচক বাক্যে বিদায় দিতেছিলেন, এমত সময়ে আঙ্গুলকাটা মাণিকলাল ঘর্মাক্ত কলেবরে অশ্বসহিত সেখানে উপস্থিত হইল।

মাণিকলালের সেই মোগল সৈনিকের বেশ। একজন মোগল সৈনিক অতি ব্যস্ত হইয়া গড়ে ফিরিয়া আসিয়াছে, দেখিয়া সকলে বিস্মিত হইল। রাজা জিজ্ঞাসা করিলেন, "কি সংবাদ ?"

মাণিকলাল অভিবাদন করিয়া বলিল, "মহারাজ, বড় গণ্ডগোল বাঁধিয়াছে, পাঁচহাজার দস্যু আসিয়া রাজকুমারীকে ঘেরিয়াছে। জোনাব হাসান আলি খাঁ বাহাদুর, আমাকে আপনার নিকট পাঠাইলেন—তিনি প্রাণপণে যুদ্ধ করিতেছেন, কিন্তু আর কিছু সৈন্য ব্যতীত রক্ষা পাইতে পারিবেন না। আপনার নিকট সৈন্য সাহায্য চাহিয়াছেন।"

রাজা ব্যস্ত হইয়া বলিলেন, "সৌভাগ্যক্রমে আমার সৈন্য সজ্জিতই আছে।" সৈনিকগণকে বলিলেন, "তোমাদের ঘোড়া তৈয়ার, হাতিয়ার হাতে! তোমরা সওয়ার হইয়া এখনই যুদ্ধে চল। আমি স্বয়ং তোমাদিগকে লইয়া যাইতেছি।"

মাণিকলাল বলিল, "যদি এ দাসের অপরাধ মাপ হয়, তবে আমি নিবেদন

করি যে, ইহাদিগকে লইয়া আমি অগ্রসর হই। মহারাজ আর কিছু সেনা সংগ্রহ করিয়া লইয়া আসুন। দস্যুরা সংখ্যায় প্রায় পাঁচহাজার। আরও কিছু সেনাবল ব্যতীত মঙ্গলের সম্ভাবনা নাই।"

স্থূলবুদ্ধি রাজা তাহাতেই সম্মত হইলেন। সহস্র সৈনিক লইয়া মাণিকলাল অগ্রসর হইল; রাজা আরও সৈন্যসংগ্রহের চেষ্টায় গড়ে রহিলেন। মাণিক, সেই রূপনগরের সেনা লইয়া একেবারে মবারকের পশ্চাতে উপস্থিত হইল। মাণিকলাল দেখিয়া যায় নাই যে তৎপ্রদেশে যুদ্ধ উপস্থিত হইয়াছে। কিন্তু রন্ধ্রপথে রাজসিংহ প্রবেশ করিয়াছেন; হঠাৎ তাহার শঙ্কা হইয়াছিল যে, মোগলেরা রন্ধ্রের এই মুখ বন্ধ করিয়া রাজসিংহকে বিনষ্ট করিবে। সেই জন্যই সে রূপনগরের সেনা লইয়া উপস্থিত হইল। আসিয়াই বুঝিল যে রাজপুতগণের নাভিশ্বাস উপস্থিত বলিলেই হয়—মৃত্যুর আর বিলম্ব নাই। তখন মাণিকলাল মবারকের সেনার প্রতি অঙ্গুলি নির্দেশ করিয়া দেখাইয়া বলিল, "ঐ সকল দস্যু! উহাদিগকে মারিয়া ফেল।"

সৈনিকেরা কেহ কেহ বলিল, "উহারা যে মুসলমান!"

মাণিকলাল বলিল, "মুসলমান কি লুঠেরা হয় না? হিন্দুই কি যত দুষ্ক্রিয়াকারী? মার।"

মাণিকলালের আজ্ঞায় একেবারে হাজার বন্দুকের শব্দ হইল। মবারকের সেনা ছিন্ন ভিন্ন হইয়া পর্বতারোহণ করিয়া পলায়ন করিতে লাগিল, তাহা পূর্বেই কথিত হইয়াছে। রূপনগরের সেনা তাহাদিগের পশ্চাদ্ধাবিত হইয়া পর্বতারোহণ করিতে লাগিল।

এই অবসরে মাণিকলাল বিস্মিত রাজসিংহের নিকট উপস্থিত হইয়া প্রণাম করিল। রাণা জিজ্ঞাসা করিলেন, "কি এ কাণ্ড মাণিকলাল? কিছুই বুঝিতে পারিতেছি না। তুমি কিছু জান?"

মাণিকলাল হাসিয়া বলিল, "জানি। যখন আমি দেখিলাম যে, মহারাজ রন্ধ্রপথে নামিয়াছেন, তখন বুঝিলাম যে সর্বনাশ হইয়াছে। প্রভুর রক্ষার্থ আমাকে আবার একটি নূতন জুয়াচুরি করিতে হইয়াছে।"

এই বলিয়া মাণিকলাল যাহা যাহা ঘটিয়াছিল, সংক্ষেপে রাণাকে শুনাইল। আপ্যায়িত হইয়া রাণা মাণিকলালকে আলিঙ্গন করিয়া বলিলেন, "মাণিকলাল! তুমি যথার্থ প্রভুভক্ত! তুমি যে কার্য করিয়াছ, যদি কখন উদয়পুর ফিরিয়া যাই, তবে তাহার পুরস্কার করিব। কিন্তু তুমি আমাকে বড় সাধে বঞ্চিত করিলে। আজ মুসলমানকে দেখাইতাম যে রাজপুত কেমন করিয়া মরে!"

মাণিকলাল বলিল, "মহারাজ! মোগলকে সে শিক্ষা দিবার জন্য

মহারাজের অনেক ভৃত্য আছে। সেটা রাজকার্যের মধ্যে গণনীয় নহে! এখন উদয়পুরের পথ খোলসা। রাজধানী ত্যাগ করিয়া পর্বতে পর্বতে পরিভ্রমণ করা কর্তব্য নহে। এক্ষণে রাজকুমারীকে লইয়া স্বদেশে যাত্রা করুন।"

রাজসিংহ বলিলেন, "আমার কতকগুলি সঙ্গী এখন ওদিকের পাহাড়ের উপরে আছে—তাহাদের নামাইয়া লইয়া যাইতে হইবে।"

মাণিকলাল বলিল, "আমি তাহাদিগকে লইয়া যাইব। আপনি অগ্রসর হউন। পথে আমাদিগের সঙ্গে সাক্ষাৎ হইবে।"

রাণা সম্মত হইয়া, চঞ্চলকুমারীর সহিত উদয়পুরাভিমুখে যাত্রা করিলেন।

অষ্টাদশ পরিচ্ছেদ

রাণাকে বিদায় দিয়া, মাণিকলাল রূপনগরের সেনার পশ্চাৎ পশ্চাৎ পর্বতারোহণ করিল। পলায়নপরায়ণ মোগলসেনা তৎকর্তৃক তাড়িত হইয়া যে যেখানে পাইল পলায়ন করিল। তখন মাণিকলাল রূপনগরের সৈনিকদিগকে বলিল, "শত্রু সকল পলায়ন করিয়াছে—আর কেন বৃথা পরিশ্রম করিতেছ? কার্য সিদ্ধ হইয়াছে, রূপনগরে ফিরিয়া যাও।" সৈনিকেরাও দেখিল—তাও বটে, সম্মুখ শত্রু আর কেহ নাই। তখন তাহারা মহারাজা বিক্রমসিংহের জয়ধ্বনি তুলিয়া রণজয়গর্বে গৃহাভিমুখে ফিরিল। দণ্ডকালমধ্যে পার্বত্য-পথ জনশূন্য হইল—কেবল হত ও আহত মনুষ্য ও অশ্ব সকল পড়িয়া রহিল। দেখিয়া উচ্চ পর্বতের উপরে, প্রস্তর-সঞ্চালনে যে সকল রাজপুত নিযুক্ত ছিল, তাহারা নামিল। এবং কোথাও কাহাকে না দেখিয়া রাণা অবশিষ্ট সৈন্য সহিত অবশ্য উদয়পুর যাত্রা করিয়াছেন বিবেচনা করিয়া তাহারাও তাঁহার অনুসন্ধানে সেই পথে চলিল। পথিমধ্যে রাজসিংহের সহিত সাক্ষাৎ হইল। মাণিক-লালও আসিয়া জুটিল। সকলে একত্রে উদয়পুরে চলিলেন।

এ দিকে মোগলসেনাপতি বিষম বিভ্রাটে পড়িলেন। রণে তিনি পরাজিত হইয়াছেন—বাদশাহের ভাবী মহিষী তাঁহার হস্ত হইতে রাজপুতে কাড়িয়া লইয়াছে! কি বলিয়া তিনি দিল্লীতে মুখ দেখাইবেন? বাদশাহকে কি উত্তর দিবেন? বাদশাহের নিকট লঘুদণ্ডের সম্ভাবনাই বা কি? সৈন্যের অধিকাংশই হত হইয়াছে—যাহারা জীবিত আছে তাহারা কে কোথায় পলাইয়া গিয়াছে তাহার কোন ঠিকানাই নাই। তিনি মবারককে ডাকিয়া পরামর্শ জিজ্ঞাসা করিলেন।

মবারকের পরামর্শে এক প্রান্তরমধ্যে নিশান পুঁতিয়া ভেরী বাজাইতে আজ্ঞা করিলেন। দুইজনে সন্ধ্যা পর্যন্ত তথায় অবস্থিতি করিতে লাগিলেন! মোগল সেনাগণ এদিক ওদিক পলাইয়াছিল—যুদ্ধ ক্ষান্ত হইয়াছে বুঝিয়া তাহারা ক্রমে

ক্রমে আসিয়া নিশানের কাছে জুটিল। তখন সেই ভগ্নসেনা লইয়া সেই প্রান্তরে শিবির সংস্থাপন করিয়া হাসান আলি রাত্রিযাপন করিতে লাগিলেন।

সন্ধ্যার পর পর একাকী তাম্বুমধ্যে বসিয়া হাসান আলি খাঁ গভীর চিন্তা করিতে লাগিলেন—কি উপায়ে বাদশাহের কাছে মান ও প্রাণ রক্ষা হইবে? শেষ তাহার উপায় স্থির করিয়া আপনার প্রিয়পাত্র হামিদ খাঁকে ডাকিয়া স্বীয় অভিপ্রায় বুঝাইয়া দিলেন। হামিদ সেলাম করিয়া বিদায় হইল।

ঊনবিংশ পরিচ্ছেদ

এখন আবদুল হামিদও ভাবিতে জানে। তাহারও একটি ছোট তাম্বু ছিল—সেখানে সে আসিয়া কুরশীর উপর বসিয়া হুক্কায় অম্বুরী তামাকু চড়াইল। চারি পাঁচ জন পারিষদ জুটিয়া গেল। সকলে মিলিয়া রাজপুতগণের ধূর্ততা ও ভীরুতার বিশেষ নিন্দা, এবং আপনাদিগের অসাধারণ বীরত্বের বিশেষ প্রশংসা করিতে লাগিলেন। তাঁহারা দাড়ি চুমরাইয়া, ছেপ ফেলিতে ফেলিতে স্থির করিলেন যে, তাঁহারা একটা ভারি রণজয় করিয়াছেন, এবং রাজপুতেরা মূষিকতুল্য পলায়ন করিয়াছে—কোনক্রমে রাজকুমারীকে চুরি করিয়া লইয়া গিয়াছে মাত্র। বিশেষ, শিবিরমধ্যে গোটা কত বড় বড় বকরি ও আরও বড় বড় চতুষ্পদ ও পক্ষবিশিষ্ট দ্বিপদের শুভাগমন হইয়াছে ও শুভ জবাইয়ের উদ্যোগ হইতেছে, ইতি সংবাদ আসিয়া অদ্য রাত্রে সমাংস খিচুড়ি ভোজনের বিশেষ প্রত্যাশা সকলেরই চিত্তমধ্যে উদিত হইল। সুতরাং তাঁহারা যে বিজয়ী বীর পুরুষ তদ্বিষয়ে আর কাহারও কোন সন্দেহ রহিল না। আমাদিগের দৃঢ় বিশ্বাস আছে যে পলাণ্ডু লসুন বিমিশ্র পক্ক মাংসের সুগন্ধে যাহার মনে বীররস উছলিয়া না উঠে, তাহার দাড়ি গোঁপ বৃথায় ধারণ। সে গিয়া শ্মশ্রু গুম্ফ ও মস্তক মুণ্ডনপূর্বক ত্রিপুণ্ড্র ধারণ করিয়া, আতপ তণ্ডুল ও মর্তমান রম্ভার উপর ভরাভর করুক—তাহার আর কোন গতি দেখি না। তাহাদিগের দুঃখে আমি সর্বদা কাতর।

এইরূপে আবদুল হামিদ এবং তস্য পারিষদেরা, মাংসাহার ভরসায় উচ্ছলিত বীররসে পরিপ্লুত হইয়া, শ্মশ্রুভার বহন সার্থক বিবেচনা করিলেন। আবদুল হামিদ তখন ছিলিমে একটু ফুৎকার দিয়া বলিলেন, "ভাই সব! বীরপনা ত দেখাইয়াছ—কিন্তু মেয়েটা যে রাজপুতেরা লইয়া গিয়াছে, সে কাজটা বড় ভাল হয় নাই।—বাদশাহ সে কথা শুনিলে মনে করিবেন যে তোমাদের রণজয় সব বৃথা গল্প! বিশ্বাস করিবেন না।" এই বলিয়া আবদুল হামিদ, একটি ফারশী বয়েৎ আওড়াইলেন—আমরা শুনিয়াছি যে সে বয়েতের একটি শব্দও ফারশী নহে—তবে খাঁ সাহেবের রক্তবর্ণ চক্ষু, হাতনাড়ার

জোর, এবং গম্ভীর উচ্চারণের ঘটায় পারিষদেরা সকলেই মনে করিল যে এ একটা ভারি বয়েৎ। তখন আবদুল হামিদ বিস্মিত শ্রোতৃবর্গের সম্মুখে সেই অলৌকিক বয়েতের ব্যাখ্যা করিয়া সকলকে বুঝাইয়া দিলেন যে, ফলেই কার্যের পরিচয়। ফলটি না দেখিলে বাদশাহ রণজয়ের কথায় বিশ্বাস করিবেন কেন ? তাঁহাকে ফলটি দেখাইয়া দিতে হইবে। তবে আমাদের সেরোপা মিলিবে।

মাম্জুম হোসেন নামে একজন স্থূলবুদ্ধি পারিষদ বলিল, "সে ফলটি কি ?"

আবদুল হামিদ বলিলেন, "বদ্‌বখ্‌ৎ! বুঝিলে না ? সে ফলটি রাজকুমারী।"

মাম্জুম। রাজকুমারী আর কোথায় পাওয়া যাইবে ?

আবদুল হামিদ। কেন, রাজকুমারী কি কাহারও গায়ে লেখা থাকে ? যে হয় একটা মেয়ে ধরিয়া দোলায় চড়াইয়া লইয়া গেলেই বাদশাহকে ভুলান যাইতে পারে।

শ্রোতৃগণ আবদুল হামিদের বুদ্ধির দৌড় দেখিয়া একেবারে বিমুগ্ধ হইল। তাহারা বিস্তর সাধুবাদ করিল। কিন্তু বোকা মাম্জুম সহজে বুঝে না। সে বলিল, "হুঁ! যে-সে মেয়ে লইয়া গিয়া দিলে কি বাদশাহ ঠকিবে ? মুলুকের বাদশাহ—সে কি ছোট-লোক বড়-লোক চিনিতে পারে না !"

আবদুল। আমরা বড় ঘরের মেয়েই লইয়া যাইব।

মাম্জুম। কোথায় পাইবে ?

আব। যেখানে বড় বাড়ি দেখিব, সেইখানে তরবাল হাতে প্রবেশ করিয়া, মেয়ে কাড়িয়া আনিয়া দোলায় বসাইব।

মাম্জুম। দোলাই বা পাইবে কোথায় ? তাও ত রাজপুত ক্যাড়িয়া লইয়া গিয়াছে।

আবদুল। তাহাও যেখানে দেখিব সেইখান হইতে কাড়িয়া আনিব।

মা। বস্ত্রালঙ্কার ?

আ। তাও লুঠ করিয়া আনিব। হাতিয়ার থাকলে অভাব কিসের ? যার হাতিয়ার আছে, দুনিয়া তার।

পারিষদগণ আবদুল হামিদের বিজ্ঞতার বিশেষ প্রশংসা করিতে লাগিল। কিন্তু মূর্খ মাম্জুম তবু বুঝে না—তথাপি আপত্তি করিতে লাগিল—বলিল, "তোমরা যেন রাজকন্যা সাজাইয়া বাদশাহের সম্মুখে উপস্থিত করিয়া বলিলে এই রূপনগরের রাজকুমারী—কিন্তু কন্যা যদি বলে যে না—আমাকে মার কোল থেকে কাড়িয়া আনিয়া জাল রাজকুমারী সাজাইয়াছে ?"

আবদুল বলিল, “ফুঃ, তা আর বলিতে হয় না—দিল্লীর বাদশাহের বেগম হতে কার অসাধ ?”

মাজ্নুম। হোক—না হয় সেই যেন লোভে পড়িয়া চুপ করিল—কিন্তু এই ছাউনিতে এত শিপাহী—ইহাদের কাহারও না কাহার দ্বারা এ জাল প্রকাশ পাইবে—তখন আমাদিগের প্রাণ কে রাখিবে ?

আবদুল হতাশ হইয়া বলিল—“আল্লা! এত বড় বে-অকুব বদ-হোস কমবখ্‌ৎ বেচারা আমি ত কখন দেখি নাই! এই ছাউনির মধ্যে আমার এ কারসাজি জানিবে কে ? আমি কি এ কথা আর কাহাকে বলিব না কি ? কন্যা আনিয়া ছাউনিতে উপস্থিত করিয়া বলিব যে রাত্রে রাজপুতের ছাউনিতে পড়িয়া তাহাদের ফতে করিয়া রূপনগরের শাহজাদীকে কাড়িয়া আনিয়াছি। ভাবনা কি ? সকলে সেরোপা পাইব।”

শুনিয়া পারিষদেরা ধন্য ধন্য করিতে লাগিল। শুভান-এল্লা! এত আক্কেল ও হোস ও ফেকের ও হিম্মৎ ও যঁওয়া মরদী ও এলেম পোষত পোষতান্ বুজুর্গ মধ্যে কেহ কখন দেখে নাই। মাজ্নুমও পরাভূত হইয়া নীরব হইয়া রহিল।

তখন আবদুল হামিদ আপন পৌরুষের পরাকাষ্ঠা প্রদর্শনার্থ বলিলেন, “হে ভাইসকল! কালবিলম্বে প্রয়োজন নাই।—আজ রাত্রেই এ কার্য সম্পন্ন করিতে হইবে। এখানে কোথায় বড় লোকের বাড়ি আছে কেহ সন্ধান রাখ ?”

তখন মেহেরসেখ নামে একজন শিপাহী বলিল, “আমি একটি বড় মানুষের বাড়ি দেখিয়া আসিয়াছি। যুদ্ধকালে বড় পরিশ্রম হওয়ায় আমি দণ্ডক্ষণজন্য বিশ্রামলাভের অভিপ্রায়ে এক উদ্যানমধ্যে অবস্থিতি করিতেছিলাম (অস্যার্থঃ প্রাণ লইয়া পলাইয়া বনের ভিতর সারাদিন লুকাইয়াছিলেন)—সেইখানে এক বড় ভারি বাড়ি দেখিয়াছি—বড় লোকের বাড়ি অনুমান হয়।”

আবদুল হামিদ খুসী হইয়া জিজ্ঞাসা করিলেন, “সে বাড়িতে যুবতী ও সুন্দরী স্ত্রীলোক আছে কি না কোন সন্ধান রাখ ?”

যে বাড়ির কথা মেহেরসেখ বলিতেছিল সে মোহনলাল শেঠিয়া নামে এক-জন অতি ধনাঢ্য বণিকের বাড়ি। তাহারই পার্শ্বস্থ জঙ্গলে মেহের লুকাইয়া প্রাণরক্ষা করিয়াছিল! সেই বাড়িতে যমুনা নামে একজন অর্ধবয়সী পরিচারিকা ছিল—কৃষ্ণাঙ্গী, স্থূলোদরী,—পঞ্চাশৎ-বর্ষ-বয়স্কা। দৈবাৎ উপরের জানেলা হইতে, বনমধ্যে লুক্কায়িত মেহেরের উপর তাহার দৃষ্টি পড়িয়াছিল। মেহেরেরও সেই সময়ে যমুনার উপর দৃষ্টি পড়িয়াছিল। এখন, এ পঞ্চাশৎ বৎসর মধ্যে কেহ কখন যমুনার রূপে মুগ্ধ হইয়া তাহার পানে চাহে নাই। যমুনা মনে

করিল আজ সে সুখের দিন উপস্থিত হইয়াছে—যখন এ ব্যক্তি বনের ভিতর লুকাইয়া থাকিয়া আমার পানে চাহিতেছে তখন নিশ্চিত এ আমার উপাসক ; ইহাকে মদনানলে পীড়িত করাই আমার অবশ্য কর্তব্য। এই ভাবিয়া যমুনা মেহেরের প্রতি চক্ষুঃকোটর হইতে একটি বিলোল কটাক্ষ ঝাড়িয়া গৃহকর্মে গেল। আবার একটু ঘুরিয়া আসিয়া আবার একটি ধারাল রকম নয়নবাণ হানিয়া ফেলিল। মেহেরও মর্ম বুঝিয়া চরিতার্থ হইলেন—এই পঁয়ষট্টি বৎসর বয়সে তাঁহার পাকা দাড়ি সার্থক বিবেচনা করিলেন—এবং বিমুগ্ধচিত্তে সন্ধ্যার পর সেই ত্রিতল গৃহমধ্যে দুগ্ধফেননিভ শয্যায় গন্ধদ্রব্য ও পুষ্পমাল্য সহিত যমুনাসুন্দরীর বাহুলতায় কণ্ঠ বেষ্টনের সুখকল্পনা করিতেছিলেন—ইত্যবসরে হাসান আলির ভেরী বাজিল। অগত্যা তাঁহাকে শিবিরে আসিতে হইয়াছিল কিন্তু অদর্শনে কল্পনাদেবীর কিঞ্চিৎ অনুগ্রহ হয়—অতএব মেহের ক্রমে ভাবিতে লাগিল যে সেই বাতায়নবিহারিণী মেহের-প্রেমে অভিভূতার ন্যায় সুন্দরী আর ইহলোকে জন্মগ্রহণ করে নাই। ইহাতে মেহেরের অপরাধ নাই—কেন না এই পঞ্চষষ্টি বৎসর পরিমিত জীবনমধ্যে তাহার অস্থিময় কৃষ্ণকান্তি কখনও স্ত্রীজাতির সরস কটাক্ষের বিষয়ীভূত হয় নাই। অতএব যখন আবদুল হামিদ তাঁহাকে জিজ্ঞাসা করিলেন, সে গৃহে যুবতী ও সুন্দরী স্ত্রী আছে কি না, তখন মেহের বেচারা এককালীন কল্পনা ও অলঙ্কারশাস্ত্রাধিষ্ঠাত্রী সরস্বতী দেবীর বশীভূত হইয়া বলিল যে গোলাবের মত মোলায়েম, আফতার ও সেতারের মত রোশনাই করনেওয়ালা দুই-এক জন ষোড়শী রমণী তিনি সেই গৃহে দেখিয়া আসিয়াছেন। আরও বলিলেন যে তাঁহারা (কল্পনায় বহুচন) অত্যন্ত সুরসিকা, —তাঁহার প্রতি বিশেষ কৃপা করিয়াছিলেন—এবং কেবল নিমকের অনুরোধেই তিনি সেই ত্রিতল গৃহস্থিত দুগ্ধফেননিভ শয্যা পরিত্যাগ করিয়া শিবিরের কঠিন মাটিতে শয়ন করিতে আসিয়াছেন।

আবদুল হামিদ মেহেরের সকল কথায় বিশ্বাস করিলেন কি না বলিতে পারি না—কিন্তু তিনি আহারান্তে সেই গৃহমধ্যে ইষ্টসাধনার্থ প্রবেশ করাই স্থির করিলেন। এবং অনুচরবর্গকে বলিলেন যে, তোমরা ভাই বেরাদারী মধ্যে পঞ্চাশজন জোয়ান সংগ্রহ কর। ঠুসিয়া খিচুড়ি ভোজন করিয়া সকলে হাতিয়ারবন্দ হইয়া এইখানে আসিও। মোল্লা মুফতির মাথায় বাজ পড়ুক— আমি কিছু উত্তম সরাব সংগ্রহ করিয়াছি—একত্রে পান করিয়া কার্যোদ্ধার করিতে যাত্রা করিব!

চৈত্র-আশ্বিন ১২৮৪-৮৫

৩ সাহিত্য-প্রসঙ্গ

রস

সংস্কৃত অলঙ্কারশাস্ত্র পাঠে অবগত হওয়া যায় যে, রস নয়টি। আদি, হাস্য, করুণ, বীর, অদ্ভুত, ভয়ানক, বীভৎস, রৌদ্র ও শান্ত। ইহাদের মধ্যে স্ত্রী-বিষয়ক রতি আদিরসের স্থায়ী ভাব; হাস হাস্যরসের স্থায়ী ভাব; শোক করুণরসের স্থায়ী ভাব; উৎসাহ বীররসের স্থায়ী ভাব; বিস্ময় অদ্ভুত রসের স্থায়ী ভাব; ভয় ভয়ানকরসের স্থায়ী ভাব; জুগুপ্সা অর্থাৎ ঘৃণা বীভৎসরসের স্থায়ী ভাব; ক্রোধ রৌদ্ররসের স্থায়ী ভাব এবং নির্বেদ শান্তরসের স্থায়ী ভাব। আলঙ্কারিকেরা বলেন, পূর্বোক্ত স্থায়ী ভাবসকল প্রকৃষ্টরূপে আস্বাদ্যমান হইলে তাহাকেই রস কহে।

তাঁহারা মনের ভাবসকলকে স্থায়ী ও সঞ্চারী এই দুই ভাগে বিভক্ত করেন, কিন্তু কোনস্থলেই কি নিয়মে ভাগ করিয়াছেন, তাহা বলেন নাই। তাঁহাদের মতে কখন কখন স্থায়ী ভাবও সঞ্চারী ভাব হইয়া থাকে। তাঁহাদের মতে স্থায়ী ভাব নয়টির অধিক হইতে পারে না, সুতরাং রসও নয়টির অধিক হইতে পারে না। প্রাচীন আলঙ্কারিকদিগের মনে যাহাই থাকুক না, আধুনিক আলঙ্কারিকেরা নবাধিক রস স্বীকারে একান্ত অসম্মত।

তাঁহাদের মতে প্রত্যেক রসের দেবতা আছে ও প্রত্যেক রসের রূপও আছে। তাঁহাদের মতে আদিরস শ্যামবর্ণ, উহার দেবতা বিষ্ণু। হাস্যরস শ্বেতবর্ণ, উহার দেবতা প্রমথ। রৌদ্ররস রক্তবর্ণ, উহার দেবতা রুদ্র। বীররস হেমবর্ণ, উহার দেবতা মহেন্দ্র। বীভৎসরস নীলবর্ণ, উহার দেবতা মহাকাল। ভয়ানকরস কৃষ্ণবর্ণ, উহার দেবতা কাল। অদ্ভুতরস পীতবর্ণ, উহার দেবতা গন্ধর্ব। শান্তরস কুন্দেন্দুসুন্দরচ্ছায় অর্থাৎ উহার কান্তি কুন্দপুষ্প এবং চন্দ্রের ন্যায় সুন্দর, উহার দেবতা শ্রীনারায়ণ। করুণরস কপোতবর্ণ অর্থাৎ পারাবতের গলদেশের বর্ণের ন্যায় উহার বর্ণ, উহার দেবতা যম।

সংস্কৃত আলঙ্কারিকদিগের রসপরিচ্ছেদ পাঠ করিলে, কতকগুলি প্রশ্ন স্বতই আমাদের মনোমধ্যে আবির্ভূত হয়। তাঁহারা রস কাহাকে বলিতেন ? মনের অসংখ্য ভাবের মধ্যে নয়টিকে বাছিয়াই স্থায়ী ভাব বলিলেন কেন ? এই নয়টি ভিন্ন আরও অনেকগুলি ভাব ত মনোমধ্যে স্থায়ী হইতে পারে। স্ত্রীবিষয়ক অনুরাগ রস হইল ; কিন্তু অনুরাগ কি স্ত্রীভিন্ন অপর কাহারও প্রতি বর্তিতে পারে না ? না, বর্তিলে স্থায়ী হইতে পারে না ? আমরা ত দেখিতেছি অপত্য-স্নেহ, বন্ধুতা, পিতৃভক্তি, মাতৃভক্তি, রাজভক্তি, প্রভৃতি অনুরাগের নানা অঙ্গ, এবং সকলগুলিই স্থায়ী। যদি স্ত্রীবিষয়ক অনুরাগ ভিন্ন রস না হয়, তাহা হইলে স্বদেশানুরাগোদ্দীপক বাঙ্গালাসাহিত্যের উৎকৃষ্ট গ্রন্থাবলী নীরস অথবা নীচরস বলিয়া পরিগণিত হইবে। এই সমস্ত প্রশ্নের মধ্যে আমরা এই প্রস্তাবে রস কি ; ও রস কেন নয়টি হইল ? তাহা দেখাইবার চেষ্টা করিব।

রস কি ? এ সম্বন্ধে সংস্কৃত আলঙ্কারিকদিগের বিস্তর মতভেদ আছে। রসের কার্যের নাম অনুভাব, কারণের নাম বিভাব। উহা দুই প্রকার, আলম্বন ও উদ্দীপন! যাহা ভিন্ন রসোৎপত্তি হয় না, তাহার নাম আলম্বন। যাহাতে প্রাবল্য জন্মে তাহার নাম উদ্দীপন। রসের সঙ্গে যে অন্যভাবের উদ্দীপন হয় তাহার নাম সঞ্চারী। আদিরসের স্ত্রী আলম্বন, চন্দ্রকিরণ-মলয়-পবনাদি উদ্দীপন, দীর্ঘ নিঃশ্বাসাদি অনুভাব। উহাতে হাস্য প্রভৃতি যে নানা ক্ষণস্থায়ী ভাবের উদয় হয় তাহার নাম সঞ্চারী।

ভট্টলোল্লট প্রভৃতি বলেন, ললনা, উদ্যান প্রভৃতি কারণজনিত অনুরাগাদি স্থায়ী ভাব, কটাক্ষ, ভুজাক্ষেপ প্রভৃতি কার্যের দ্বারা প্রতীতিযোগ্য, এবং নির্বেদাদি সহকারী ভাব দ্বারা উপচিত হয়। উহা মুখ্যকল্পে প্রকৃত রামাদিতেই থাকে। কিন্তু কেহই স্বরূপ সন্ধান করেন না বলিয়াই কাব্যস্থ রামাদিতেও আছে বোধ হয়, তখনই উহার নাম রস। এই মতে বিভাবাদি দ্বারা অনু-রাগাদির অনুমান হয়।

শ্রীশঙ্কুক বলেন, সম্যক্‌ জ্ঞান, মিথ্যা জ্ঞান, সংশয় ও সাদৃশ্য জ্ঞান (যথা রামই এই, এই রাম ; উত্তরকালে এ রাম নয়, এরূপ বাধা সম্ভাবনাসত্ত্বে এই রাম, এ ব্যক্তি রাম হইতেও পারে, নাও পারে ; এ রামসদৃশ) এই যে চারিপ্রকার জ্ঞান আছে তৎসমুদয় হইতে পৃথক কোন চিত্রিত তুরঙ্গ দেখিয়া তুরঙ্গজ্ঞানের ন্যায় নর্তককে রাম বলিয়া প্রতীতি হইলে, সে যখন শিক্ষা, অভ্যাস, নৈপুণ্যবলে—

এই সে আমার দেহ সুধারসচ্ছটা কর্পূর শলাকারাশি নয়নযুগলে
মূর্তিমতী মনোরথ লক্ষ্মীস্বরূপিণী প্রাণেশ্বরী লোচনগোচরে দেখা দিলে

দৈবক্রমে ত্যজি মোরে চপলনয়না গেল চলি প্রাণপ্রিয়া সহাস্যবদনা
অমনি বিষম কাল হল উপস্থিত অবিরল হয় যাহে জলদগর্জিত

ইত্যাদি করুণ বাক্যদ্বারা কারণ, কার্য ও সহকারী ভাবসমূহ প্রকাশ করে, (ইহারই নাম বিভাব, অনুভাব ও সঞ্চারী ভাব) তখন তাহারা কৃত্রিম হইলেও লোকে কৃত্রিম বলিয়া অনুমান করিতে পারে না, এবং সেই সকল কার্য-কারণাদির দ্বারা অনুরাগাদির অনুমান করে। অনুরাগাদি যদিও নর্তকে নাই, তথাপি সামাজিকদিগের মনে উহা আছে বলিয়া আস্বাদ্যমান হয়। অন্য অনুমান হইতে অনুরাগাদির অনুমানের বিশেষ এই যে, বস্তু সৌন্দর্য বলে, এবং আস্বাদ্যমান বলিয়া উহা অনুমান বলিয়াই বোধ হয় না। প্রত্যক্ষ বলিয়া বোধ হয়, এই মতে নর্তকের ভাব দেখিয়া সীতা-বিষয়ক রামের অনুরাগ আমরা একপ্রকার সাক্ষাৎকারে দেখিতে পাই।

ভট্টনায়ক বলেন, "অনুরাগাদি রামে আছে আমি দেখিতেছি, অথবা আমাতে আছে আমিই অনুভব করিতেছি, এই উভয়প্রকার সিদ্ধান্তই ভ্রমাত্মক। কিন্তু কাব্য ও নাটকপাঠে ভাবকত্ব নামে একটি ব্যাপার (মনের কার্য) উৎপত্তি হয় এবং উহার দ্বারা বিভাবাদি সাধারণীকৃত হয়, (অর্থাৎ ঐ ব্যাপার দ্বারা রাম সীতা জ্ঞান থাকে না, কেবল স্ত্রীপুরুষ নায়িকা জ্ঞান থাকে।) ঐ ভাবকত্ব ব্যাপারে অনুরাগাদিকে উপস্থিত করে, সেই অনুরাগাদি আস্বাদ্যমান হয়। আস্বাদসময়ে রজঃ ও তমঃ গুণ অতিক্রম করিয়া সত্ত্বগুণ প্রবল হয়। তখন স্বপ্রকাশ আনন্দময় জ্ঞানমাত্র বর্তমান থাকে। এই স্বপ্রকাশ আনন্দময় জ্ঞানস্বরূপ রসাস্বাদের নাম ভোগ বা ভোজকত্ব ব্যাপার।" এই মতে মানুষের মনে ভাবকত্ব ও ভোজকত্ব নামে দুইটি ব্যাপার আছে। প্রথমটির দ্বারা অনুরাগকারণসকল সাধারণরূপে প্রতীত হয়, দ্বিতীয়টির দ্বারা উহাদের আস্বাদগ্রহণ করা যায়।

আচার্য অভিনব গুপ্ত বলেন, "যাহারা সর্বদা প্রমদাদিসহকারে অনুরাগাদির অনুমান করিতে নৈপুণ্যলাভ করিয়াছে, এরূপ সামাজিকেরা কাব্য বা নাটক পাঠ করিলে পূর্বোক্ত বিভাব অনুভাব ও সঞ্চারী ভাব কারণ, কার্য, এবং সহকারিতা পরিহার করিয়া অলৌকিক বিভাবাদিরূপে পরিণত হয়। তখন এই সকল বিভাবাদি আমার অথবা শত্রুর অথবা উদাসীনের অথবা আমার নয়, শত্রুর নয়, অথবা উদাসীনের নয়, এরূপ সম্বন্ধবিশেষে প্রতীত হয় না। সম্বন্ধশূন্য সাধারণভাবে উহা অভিব্যক্ত হইয়া সামাজিকদিগের মনে অবস্থিত হয়। যদিও উহা নিয়মিত প্রমাতৃগত তথাপি সাধারণ উপায়-বলে তৎকালে উহার নিয়মিত প্রমাতৃভাব বিগলিত হয়। তখন প্রমাতার

জ্ঞানান্তরসম্পর্কশূন্য অপরিমিত ভাবের উদয় হয়। তিনি যেন সকল হৃদয়েরই সংবাদ অবগত হইতে পারেন। তখন পূর্বোক্ত অনুরাগাদি জ্ঞান হইতে অভিন্ন হইলেও যেন নিজ আকারে প্রকাশ পাইতে লাগিল। আস্বাদই উহার প্রাণ। বিভাবাদির অবধিই উহার জীবনের অবধি। যেমন পানক রস নামক মোদকে মরীচ থাকিলেও তাহার আস্বাদ নষ্ট হয় না, অনুরাগাদির আস্বাদও তদ্রূপ বিরোধী কারণে বিকৃত হয় না। উহা যেন সম্মুখে স্ফূর্তি পাইতে থাকে, হৃদয়ে প্রবেশ করিতে থাকে, সর্বাঙ্গ আলিঙ্গন করিতে থাকে, অন্য সমস্ত তিরোহিত করে। যেন ব্রহ্মাস্বাদ অনুভব করাইয়া দেয়। ভূলোকদুর্লভ চমৎকার উৎপন্ন করে। তখন উহার নাম রস হয়।"

এই মতেও ভাবকত্ব ও ভোজকত্ব নামে ব্যাপারদ্বয় স্বীকৃত হইয়াছে। ইহা ভট্টনায়কের মতের উপর কিছু উন্নতি মাত্র। ইঁহার মতে অলৌকিক ব্যাপারদ্বারা রসনিষ্পত্তি হয়। সাহিত্যদর্পণকার বিশ্বনাথ কবিরাজও মুখ্যকল্পে এই মতই স্বীকার করিয়া লইয়াছেন।

ভাবকত্ব ব্যাপারটি কি ? উহার স্বরূপ কি ? কার্য কি ? জানা আবশ্যক। ন্যায়মতে করণের কার্যকে ব্যাপার বলে। যথা দাত্রের পতন উহার ব্যাপার। সংস্কৃত মতে মন জ্ঞানের করণ। মনের কার্যের নাম উহার ব্যাপার। ভাবকত্ব মনের কার্য, এই কার্য দ্বারা পরিমিত ব্যক্তিগত শোকাদি সাধারণরূপে প্রতীত হয়।

ভোজকত্ব ব্যাপার শব্দেও মনের কার্য বুঝায়। মনের যে কার্যদ্বারা কাব্যরসের আস্বাদগ্রহ হয়, যাহাতে চিত্ত আনন্দে উন্মত্ত হইয়া উঠে, তাহার নাম ভোজকত্ব ব্যাপার।

ইউরোপীয়দিগের মতে মন জ্ঞানোপলব্ধির করণ নহে, উহাই কর্তা। সংস্কৃত মতে আত্মা কর্তা, মন করণ। ইদানীন্তন ইউরোপীয়েরা মন ভিন্ন স্বতন্ত্র আত্মা স্বীকার করেন না। তাঁহাদের মতে মনোবৃত্তিসমূহ তিনভাগে বিভক্ত। বুদ্ধিবৃত্তি, হৃদয়বৃত্তি ও কর্মক্ষমতা। হৃদয়বৃত্তিসমূহের মধ্যে তাঁহাদের মতে কতকগুলি বৃত্তি আছে, যাহার নাম æsthetic faculty বা সৌন্দর্যগ্রাহবৃত্তি। অভ্যাসবলে এই বৃত্তি পরিপুষ্ট হইলে উহার দ্বারা আমরা সুন্দর বস্তুকে সুন্দর বলিয়া বুঝিতে পারি এবং তাহার আস্বাদও গ্রহণ করিতে পারি। এই সৌন্দর্যগ্রাহকতাবৃত্তি আমাদিগের ভোজকত্ব ব্যাপার। আমরা যাহাকে ভাবকত্ব ব্যাপার বলি, ইংরেজরা তাহা মানেন না। কবিরা সৌন্দর্য সৃষ্টি করেন। আমরা তাহার আস্বাদ গ্রহণ করি। যাহার সৌন্দর্যগ্রাহকতাবৃত্তিসমূহ যত পরিপুষ্ট সে সেই পরিমাণে তাহার আস্বাদ গ্রহণ করিতে পারে।

সৌন্দর্যগ্রহ ও রসগ্রহ যদি একই হইল, তবে রস নয়টি হয় কেন? সৌন্দর্য অশেষবিধ, সুতরাং রসও অশেষবিধ হওয়া উচিত। যদি বল বাহ্যিক সৌন্দর্য রস নহে, কেবল আন্তরিক সৌন্দর্যই রস। বাহ্যবস্তুসমূহ—আকাশ, নদ, নদী, পর্বত, কন্দর, পুরী, হর্ম্য প্রকৃতিগত সৌন্দর্যরস নহে, কেবল মনের অনুরাগাদি ভাবসমূহগত সৌন্দর্যই রস, তাহা হইলেও বাহ্যবস্তুগত সৌন্দর্য যখন আস্বাদের বিষয় হইতে পারে তখন উহা কেন রস হইবে না ইহার কারণ বুঝিতে পারিলাম না। যদিও কেবল মনোবৃত্তিগত সৌন্দর্যকেই রস বলিয়া স্বীকার করিয়া লই, তবে উহা কেন যে নয়টিমাত্র হইবে বুঝিতে পারিলাম না। মনোবৃত্তি অসংখ্য। সুতরাং রসও অসংখ্য হওয়া উচিত। যখন যে মনোবৃত্তিগত সৌন্দর্য আস্বাদনীয় হয় তখন তাহাই রস হইবে। সংস্কৃত আলঙ্কারিকদিগের মতে নয়টি স্থায়ী এবং তেত্রিশটি সঞ্চারী ভাব স্বীকার করিলে ম্যাকবেথের রাজ্যতৃষ্ণা, হ্যামলেটের অনুৎসাহময় প্রতিহিংসাপ্রবৃত্তি, প্রস্‌পেরোর উদারচরিত্রতা, ম্যানফ্রেডের মানবজাতির প্রতি ঘৃণা, রসের মধ্যেই পড়ে না; অথচ সহৃদয় ব্যক্তিমাত্রেরই সংস্কার এই যে, পূর্বোক্ত গ্রন্থচতুষ্টয়ই রসাংশে পৃথিবীর সমস্ত কাব্য অপেক্ষা উৎকৃষ্ট। অতএব আমাদের মতে মনের যে বৃত্তি সুন্দররূপে লিখিত হইতে পারে, তাহারই নাম রস। কেবল একজন মাত্র সংস্কৃত আলঙ্কারিক সৌন্দর্য বা চমৎকারকেই রস বলিয়াছেন,

রসে সারঃ চমৎকারঃ সর্বত্রৈবানুভূয়তে
তচ্চমৎকারসারত্বে সর্বত্রৈবাদ্ভুতো রসঃ ॥
তস্মাদদ্ভুতমেবাহ কৃতী নারায়ণো রসং।

কিন্তু নারায়ণের মত সংস্কৃত আলঙ্কারিকমণ্ডলীমধ্যে তাদৃশ সমাদৃত হয় নাই।

সংস্কৃত আলঙ্কারিকেরা যে নয়টি মাত্র রস নির্ধারণ করিয়াছিলেন কেন, সহজে বুঝিয়া উঠা যায় না। কিন্তু আমাদের বোধ হয় যে, যখন অলঙ্কারশাস্ত্রপ্রণীত হইয়াছিল তৎকালে প্রচলিত গ্রন্থাদিমধ্যে এই নয় প্রকার ভাবেরই প্রাধান্য দেখিয়া তাঁহারা কাব্যের নয়টি মাত্র রস নির্ধারণ করিয়াছেন।

প্রায়ই দেখিতে পাওয়া যায় এক-এক সময়ে সামাজিক অবস্থা অনুসারে এক-এক প্রকার লিখনপ্রণালী প্রচলিত হয়। কখন নাটকের বহুল প্রচার হয়, কখন গীতিকাব্যের, কখন উপন্যাসের, কখন নবন্যাসের, কখন বা মহাকাব্যের। সামাজিক অবস্থা অনুসারে লোকে ভিন্ন ভিন্ন বিষয়ক গ্রন্থাদি পড়িতে ভালবাসে। কখন যুদ্ধবিষয়িণী কবিতা, কখন প্রণয়ের প্রবন্ধ, কখন শোকোদ্দীপক প্রস্তাব, কখন ধর্মগ্রন্থ, ইত্যাদি ইত্যাদি। মধ্যসময়ে ইউরোপখণ্ডে প্রণয় ও

যুদ্ধের কাব্যই অধিক সমাদৃত হইত। আমাদের দেশে বর্তমান সময়ে প্রণয় ও স্বদেশানুরাগই অধিক পরিমাণে লিখিত ও পঠিত হয়। এরূপ অলঙ্কারশাস্ত্র প্রণীত হইবার পূর্ববর্তী সময়ে কখন প্রণয়, কখন যুদ্ধ, কখন পরিহাস, কখন শোক, কখন বিস্ময়, কখন ঘৃণা ইত্যাদি-বিষয়ক গ্রন্থাদি অধিক পরিমাণে লিখিত ও পঠিত হইত। আলঙ্কারিক পণ্ডিতেরা যখন অলঙ্কারশাস্ত্র লিখিতে বসিয়াছিলেন, তখন তাঁহাদের বোধ হইয়াছিল যে, এই নয়প্রকার মনের ভাব প্রকাশ করিয়া গ্রন্থ লিখিতে পারিলেই উহা জনসমাজে বিশেষরূপে আদৃত হইবে, এই জন্য তাঁহারা উক্ত নয়টিকেই প্রধান ভাব বা রসমধ্যে স্থির করিয়াছেন। নচেৎ এই নয়টিকেই উচ্চস্থান দিবার আর কোন কারণ দেখা যায় না।

শ্রাবণ ১২৮৮

উদ্দীপনা

সমাজ-সমালোচনা

ভারতবর্ষে অনেক ভাল বস্তু ছিল। তাহার অনেক একেবারে লুপ্ত হইয়াছে; অনেক লুপ্তপ্রায়; অনেক নির্জীব ও মরণাপন্ন, ও অনেক বিকৃতভাবাপন্ন। আবার অনেক ভাল বস্তু ছিল না। কিংবা মধ্যে মধ্যে হইয়াছিল মাত্র। যা ছিল, তা আবার হইবে। কিন্তু যা ছিল না, না-থাকাতেই এত সর্বনাশ; অথবা যা ছিল, থাকাতেই এত সর্বনাশ, তাহারই অনুসন্ধান আমাদিগের কর্তব্য। অনুসন্ধান করিয়া যে ভাল বস্তুটি ছিল না, তাহা কিসে সমাজে প্রবিষ্ট হইতে পারে, তাহার চেষ্টা করা, যদি প্রবিষ্ট হইয়া থাকে, তবে অতি যত্নপূর্বক তাহার পোষণ করা, অতি কর্তব্য। যে মন্দ বস্তুটি ছিল, তাহা যদি এখন আর না থাকে, তবে যাহাতে সেটি আর পুনঃপ্রবেশ করিতে না পারে, এমন সাবধান হওয়া উচিত, এবং যে মন্দ বস্তুগুলি এখনও জীবিত রহিয়াছে, সেগুলি যাহাতে সমাজ হইতে একবারে উৎপাটিত হইয়া যায়, তাহার জন্য বিশেষ যত্ন করা যুক্তিযুক্ত।

এই একটি ভাল বস্তু ছিল না। এটি সমাজের স্বাস্থ্যজন্য থাকা অত্যন্ত আবশ্যক। "ছিল না" এই শব্দটি ন্যায়মতের অভাবপদার্থজ্ঞাপক বোধ করিতে হইবে না। "আমার রোগে রোগে আর শরীরে কিছুমাত্র বল নাই," বলিলে বলের নিরবচ্ছিন্ন অভাব বুঝায় না। যতটুকু বল শরীরের সহজ অবস্থায় থাকা

নিতান্ত আবশ্যক, সেটুকু নাই, বুঝিতে হইবে। সেইরূপ সমাজ সম্বন্ধেও বুঝিতে হয়।

আমাদের এই একটি ভাল বস্তু ছিল না। উদ্দীপনাশক্তি ছিল না। ডিমস্থিনিস, কাইকিরো, আমাদের একজনও ছিল না। যে বাক্‌শক্তি ইউরোপে এলোকোয়েন্‌স্ বলিয়া প্রতিষ্ঠিত, তাহা আমাদের ছিল না। অলঙ্কারকারেরা উদ্দীপন-বিভাবের বর্ণন ও লক্ষণ নির্দেশ করিয়াছেন। উদ্দীপন-বিভাবকে তাঁহারা রসের একটি অঙ্গ বলেন। রসকে কাব্যের সারভূত পদার্থ বলেন। "বাক্যং রসাত্মকং কাব্যং"। কিন্তু কবিতাশক্তি ও উদ্দীপনাশক্তি দুটি যে ভিন্ন, এ কথা সংস্কৃত আলঙ্কারিকেরা বলেন না। যেমন কাব্যের সার রস, তেমনি উদ্দীপনার সারও রস। কাব্যসার রস যেমন করুণ, বীর প্রভৃতি নানা ভাগে বিভক্ত করিয়াছেন, উদ্দীপনার সার রস সেইরূপ নানা ভাগে বিভক্ত হইতে পারে। কাব্যরসবর্ণনে যেমন আলম্বন, উদ্দীপন প্রভৃতি বিভাবের আবশ্যকতা ও যেমন স্থায়ী ও সঞ্চারী ভাব নানাপ্রকার উদিত হয়, সেইরূপ উদ্দীপনা-রসেরও আলম্বন, উদ্দীপন প্রভৃতি নানা বিভাগের আবশ্যকতা ও তাহাতেও সেইরূপ নানাপ্রকার স্থায়ী ও সঞ্চারী ভাব উদ্ভূত হয়। আপাতদৃষ্টিতে কবিতা ও উদ্দীপনা এক বোধ হইতে পারে, কিন্তু তাহারা সহোদরা মাত্র। এক গোত্রে জন্মগ্রহণ করিয়া দুইজনে কালে দুই গোত্রে পরিণীতা হইয়াছেন। এক্ষণে দুইজনের বিভিন্ন গোত্র বলিতে হইবে। উদাহরণে শীঘ্র বুঝা যাইবে। একই বিষয়, উদ্দীপনা কিরূপ ভাবে বলেন, শুনুন; আর কবিতাই বা কিরূপে বলেন, পরে শুনিবেন।

উদ্দীপনা বলিতেছেন,

স্বাধীনতাহীনতায় কে বাঁচিতে চায় হে, কে বাঁচিতে চায়।
দাসত্বশৃঙ্খল বল কে পরে গলায় হে, কে পরে গলায়॥
যবনের দাস হয়ে ক্ষত্রিয়তনয় হে, ক্ষত্রিয়তনয়।
এ কথা যখন হয় মনেতে উদয় হে, মনেতে উদয়॥
ঐ শুন ঐ শুন ভেরির আওয়াজ হে, ভেরির আওয়াজ।
সাজ সাজ বলে সাজ সাজ হে, সাজ সাজ সাজ॥

—পদ্মিনী উপ্যাখ্যান।

সেই স্বাধীনতা বিষয়েই আবার কবিতা কি বলেন, শুনুন—

সেই দিন রাত্রিকালে মহাবন হইতে বিংশতি সহস্র যবন আসিয়া নবদ্বীপ প্লাবিত করিল। বঙ্গজয় সম্পন্ন হইল। যে সূর্য সেই দিন অস্তে গিয়াছে, আর তাহার উদয় হইল না। আর কি উদয়

হইবে না ? উদয় অস্ত উভয়ই ত স্বাভাবিক নিয়ম। আকাশের সামান্য নক্ষত্রটিও অস্ত গেলে পুনরুদিত হয়।

—মৃণালিনী।

দুইটিই রসাত্মক বাক্য। কিন্তু প্রথমটি কখনই আপনা-আপনি বলা যাইতে পারে না! কোন এক বিশেষ ব্যক্তি ইহার উদ্দেশ্য, তাহার আর সংশয় নাই। রসাত্মক বাক্য বটে, কিন্তু বক্তার সম্মুখে একজন শ্রোতা থাকা নিতান্ত আবশ্যক। দ্বিতীয়টি স্বতঃস্খলিত রসাত্মক বাক্য মাত্র। হইতে পারে, কবি যখন ঐ কথাগুলি কণ্ঠ হইতে বহির্গত করিতেছিলেন, তখন অনেক লোক তাঁহার নিকটে ছিল, ও সেই কথা শুনিতে পাইয়াছিল, কিন্তু তিনি কখনই তাহাদিগকে উদ্দেশ করিয়া সে কথাগুলি উচ্চারণ করেন নাই। তিনি আপনি আপনার মনের ভাব প্রকাশ করিয়াছেন, কেহ শুনিল কিনা তাহাতে তাঁহার মনোযোগ নাই।

কিন্তু উদ্দীপনা সর্বদাই লোককে ডেকে কথা কন। পরের মনোবৃত্তি সঞ্চালন, ধর্মপ্রবৃত্তি উত্তেজন, অন্যের মনে রস উদ্ভাবন, অন্যকে কোন কার্যে লওয়ান, এইরূপ একটি না একটি তাঁহার চির উদ্দেশ্য। তিনি সর্বদাই ডাকিতেছেন। নিজ মন হইতে একটু রস তোমার মনে ঢালিয়া দিলেন, তুমি হয়ত সাহসে উদ্দীপ্ত হইয়া উঠিলে, কখন বা ভয়ে কাঁপিতে লাগিলে, কখন বা তুমি ক্রন্দন করিয়া উঠিলে। উদ্দীপনা চরিতার্থ হইলেন। তিনি যে রস তোমার মনে উদ্দীপন করিয়া দিবার চেষ্টা করিয়াছিলেন, তাহা করিলেন; সুতরাং চরিতার্থ হইলেন। কবিতা সেই প্রকৃতির নহেন। তিনি কাহাকেও ডাকেনও না, নিজে হাত তুলে কাহাকেও কিছু ঢালিয়াও দেন না। তিনি কখন বসন্তসন্ধ্যাবাতান্দোলিতা, প্রস্ফুটিতা, ভূরিপ্রস্ফুটিতা, সদ্যঃজলসিঞ্চিতা, ক্বচিৎ ভ্রমরভরস্পন্দিতা যূথিকা লতারূপে বন আলো করিয়া বসিয়া আছেন, কাহাকে ডাকেনও না, কাহাকে কিছু ঢালিয়াও দেন না, চতুর্দিক গন্ধে আমোদিত হইতেছে, তিনি সেই গন্ধ বিস্তার করিয়াই সুখানুভব করিতেছেন। সে গন্ধ কেহ ঘ্রাণ করিল কিনা, সে শোভা কেহ দেখিল কিনা, তাহাতে তার ভ্রূক্ষেপও নাই। তুমি নিকটে যাইবামাত্র গন্ধে ভোর হইলে, সেই অতুল শোভা দেখিয়া তোমার মানস মোহিত হইল, তুমি চরিতার্থ হইলে; লতার তাহাতে কিছুমাত্র ক্ষতিবৃদ্ধি নাই। লতা ফুটিয়াই চরিতার্থ হইয়াছে। কবিতা কখন বা জ্বলন্ত অনলরূপে প্রকাশ পাইতেছেন। ধুউ ধুউ করিয়া অগ্নি জ্বলিতেছে; শোঁ শোঁ করিয়া শব্দ হইতেছে; মধ্যে মধ্যে চট চট শব্দে কর্ণকুহর বধির হইয়া যাইতেছে। সহস্র শিখা গগন স্পর্শ করিয়াছে। চারিদিকে স্ফুলিঙ্গ ছুটিতেছে। তেজে দিঙ্মণ্ডল আরক্ত হইয়া উঠিয়াছে। উত্তাপ ক্রমেই

চারিপার্শ্বে বিস্তার করিতেছে। কবিতা রূপ ধারণ করিয়াই চরিতার্থ হইতেছেন। তুমি দূর হইতে ব্রহ্মমূর্তি দেখিতে পাইলে, ঝঞ্ঝাপ্রধাবিত লক্ষণবাহী শব্দসদৃশ সেই তুমুল আরাব শুনিতে পাইলে, ভয়বিস্ময়ে তোমার চিত্ত পরিপূরিত হইল, তুমি নিকটে গেলে, উদ্গীরিত উত্তাপে তোমার গাত্র অভিষিক্ত হইল। যদি তুমি শীতার্ত হও, তোমার সুখস্পর্শ হইল। পতঙ্গবৎ অতি নিকটে যাও, তুমিই অবিলম্বে ভস্মীভূত হইয়া যাইবে। কিন্তু প্রচণ্ড অগ্নির তাহাতে কিছুই এসে যায় না। কখন বা কবিতা প্রেতভূমিরূপ ধারণ করিয়া নদীকূলে শয়ন করিয়া থাকেন। রাশি রাশি অঙ্গার বিকীর্ণ রহিয়াছে; অঙ্গারে অর্ধপূরিত চুল্লী; অর্ধদগ্ধ বংশখণ্ড; অর্ধভঙ্গ, অল্পভঙ্গ, সচ্ছিদ্র, অচ্ছিদ্র মৃৎকলস কত গড়াগড়ি যাইতেছে; কোন-কোনটার ভিতর সন্ধ্যাবায়ু প্রবেশ করাতে হো হো করিয়া শব্দিত হইতেছে; সমস্ত স্থান অস্থি-কপাল কঙ্কাল কেশ-পরিপূরিত। দক্ষিণে জলসমীপে একটি চিতা জ্বলিতেছে। এক ব্যক্তি একটি বাঁশ লইয়া একটি চিতাস্থিত শবের উদরে বেগে আঘাত করিল। শব দক্ষিণ বাহু উত্তোলন করিল; তোমার বোধ হইল যেন হাত নাড়িয়া বারণই করিল। তুমি পলায়নপর হইয়া বামদিকে দেখিলে; দেখিলে, ভগ্ন ঘাটের উপরি প্রৌঢ়া মাতা অপোগণ্ড নবকুমার শিশুকে বটতলায় শোয়াইয়া ছন্দে বক্ষে ক্রন্দন করিতেছে। দূরে, বোধ হইল একজন লোক বসিয়া আছে। নিকটে গেলে। এ কি! সদ্য মরা শব হেলান দিয়া বসান রহিয়াছে। তুমি চক্ষু বিস্ফারিত করিয়া শিহরিয়া উঠিলে। একটি কৃষ্ণকায় কুকুর তোমার সেই চাহনি দেখিল; ঐ শবের দিকে দেখিল; উভয়ে কি প্রভেদ, যেন কিছুই বুঝিতে না পারিয়া বিরক্ত হইয়া চলিয়া গেল। সন্ধ্যাসমীরণ-সঞ্চালনে তোমার কর্ণমূলে কে যেন দীর্ঘ নিঃশ্বাস ত্যাগ করিল; সকলের হো হো শব্দে হো হো হো করিয়া হাসিয়া উঠিল। তুমি আড়ষ্ট, আস্তব্ধ, নিস্পন্দ, তুষ্ণীভূত, চকিত ও স্থগিতনেত্র। দূরে একটি শিবারব তোমার কর্ণে প্রবেশ করিল। তুমি চারিদিকে দেখিয়া ভয়, বিস্ময়, বিরাগ, জুগুপ্সা-পরিপূরিত মনে গৃহে প্রত্যাগমন করিলে। তোমার এত ভাবান্তর হইল, শ্মশানের কি হইল? কিছুই নহে।

কবিতা রসাত্মিকা আত্মগতা কথা। উদ্দীপনা রসাত্মিকা অন্যোদ্দিষ্টা কথা। সুতরাং নির্জনে বিরলে চিন্তাই কবিতার প্রসূতি; এবং অনেক লোকের সহিত আলাপে ও কথোপকথনেই উদ্দীপনার জন্ম হইয়া থাকে। কেন পূর্বতন কালে আমাদের কবি,—পুঞ্জ পুঞ্জ কবি ছিল, ও একজনও উদ্দীপক ছিল না, তাহা এখন সহজেই বুঝা যাইতে পারে। ভারতবর্ষীয়দের মত বোধ হয়, এমন নির্জনস্পৃহ জাতি,—এমন নির্জনচিন্তাস্পৃহ জাতি, পৃথিবীতে আর ছিল না,

এখনও বোধ হয়, আর নাই। বোধ হয়, এইজন্যই এত কবি,—প্রকৃত কবি-পদবাচ্য কবি, এক দেশে এত আর কখনই জন্মে নাই। আজিও কোথাও জন্মিতেছে না।

সংসার ভাল-মন্দ-মিশ্রিত ; সুখ-দুঃখ-জড়িত। যেখানে গুণ আছে, তার সঙ্গে সঙ্গে দোষ আছে ; নিরবচ্ছিন্নতা, পূর্ণতা, অত্যন্তাভাব, এগুলি আধ্যাত্মিক পদার্থ-বাচক, সাংসারিক অবস্থাজ্ঞাপক নহে। একদিকে কিছু বেশী লাভ হইয়াছে কি অন্য দিকে ঠিক সেই পরিমাণে না হউক, কতক ক্ষতি অবশ্যই হইয়াছে। জগতের জমাখরচ সকল সময় ঠিক মিল থাকে কি না তা বলা যায় না। কিন্তু চল্‌তি কারবার। কোন কুঠিতে আজ মাল আমদানি হইল, জমার অঙ্ক দেখিতে খরচের অঙ্ক হইতে অনেক বেশী বোধ হইতেছে, অন্য কুঠিতে সেই সময় এত বিলাত বাকি যে কুঠি চালান ভার। কিন্তু সমস্ত জগতের কারবার চিরকালই চল্‌তি। সামান্য খণ্ডসমাজেও সেই রূপ। যাঁহার লক্ষ্মীর কৃপা হইয়াছে, সপত্নী সরস্বতী তাঁর দিক প্রায় চেয়ে দেখেন না ; লক্ষ্মী আবার তেমনি সপত্নী বরপুত্রদের পল্লীতেও পদার্পণ করেন না। যশোরাশি, মানধন, পণ্ডিতপ্রবর অপ্রিয়বাদিনী ভার্যা লইয়া বিব্রত ; দাসদাসী-পরিবেষ্টিতা, রূপযৌবনসম্পন্না, সুশীলা সতী, মাদকসেবনশীল উদ্ধত স্বামীর নিগ্রহে দিন দিন ম্রিয়মাণা হইতেছেন। কেহ বা লক্ষ টাকা ব্যয় করিয়া, আয়াসসাধ্য যজ্ঞ করিয়া একটি পুত্রের কামনা করিতেছেন, অন্য এক ব্যক্তি সোনারচাঁদ ছেলেদিগকে, ননীর পুতলি মেয়েগুলিকে দুবেলা দুটো মাছেভাতে, পূজার সময় এক-একখানি নীলে ছোবান কোরা কাপড় দিতে পারিতেছেন না। এই জন্য কেহ শীঘ্র আপনার অবস্থা পরিবর্তন করিতে চায় না। কিন্তু তবু যদি উচ্চরবে জিজ্ঞাসা করি, "আপনার অবস্থায় কে অসন্তুষ্ট ?" প্রতিধ্বনি অমনি তখনি মুখের উপর উত্তরচ্ছলে জিজ্ঞাসা করিবে, "হায় ! কে সন্তুষ্ট ?" সকলেই অসন্তুষ্ট, সকলেই সন্তুষ্ট। জগতের একটি বিচিত্র কৌশলই এই, যদি একদিকে কিছু কম থাকে, নিশ্চয় আর-একদিকে কিছু বেশী আছে। আমাদের অনেক কবি ছিলেন, অনেক কাব্য ছিল, সেইজন্যই আমাদের দেশে একজনও উদ্দীপক ছিলেন না, উদ্দীপনা ছিল না। যে নিভৃত চিন্তা কবিতা থাকার কারণ, সেই নির্জনস্পৃহাই উদ্দীপনা না-থাকার কারণ। সেই নিভৃত চিন্তাই এখনও আমাদের বাঙ্গালি জাতিকে গুমরে গুমরে পোড়াইতেছে। এই যে সমস্ত বঙ্গজাতি টপ্পাগানপ্রিয়, তাহাতে কি বুঝায় ? বুঝায়, এ দেশে এখনও উদ্দীপনার বীজও অঙ্কুরিত হয় নাই ; আপনার কথা আপনি বলিয়াই আমরা ক্ষান্ত, তাই যথেষ্ট ; এবং তাহাতেই আমাদের চরিতার্থতা।

ভারতবর্ষীয়েরা যেমন নির্জনস্পৃহ ছিলেন, তেমনি স্বতঃসন্তুষ্ট ছিলেন। ভাল মন্দ উভয়ই প্রয়োজনের অনুচর। সংসারে, সমাজে, গৃহে, আচরণে, সকল বিষয়েই প্রয়োজন একা শাসনকর্তা।

বাস্তবিক প্রয়োজনের নিকট ধর্মশাস্ত্রকেও পরাজিত হইতে হয়, প্রয়োজন-শাসন সর্বাপেক্ষা গরীয়ান। এইজন্যই আমাদের সামান্য কথায় বলে যে, "গরজের উপর আইন নাই।" এইজন্যই সামান্য কথায় বলে যে, "অরে দুই প্রহর বেলা সিঁধ কাটিতেছিস যে—না আমার গরজ।" কিন্তু প্রয়োজনে যেমন মন্দ বস্তু হয়, তেমনি ভাল বস্তুও হয়। ভারতবর্ষীয়রা স্বতঃসন্তুষ্ট ছিলেন। তাঁহাদের কিছুরই আর নূতন প্রয়োজন ছিল না। সুতরাং অনেক মন্দ বস্তুও জন্মে নাই, অনেক ভাল বস্তুও জন্মে নাই। উদ্দীপনাও জন্মে নাই।

দ্বিতীয় ভাগ

ভারতবর্ষীয়েরা যে স্বতঃসন্তুষ্ট জাতি ছিলেন, তাহা ভারতের যাহা কিছু পর্যালোচনা করিবেন, তাহাতেই প্রকাশ পাইবে। ভারতের সমাজভাগ দেখুন। ব্রাহ্মণে নিভৃতে চিন্তা করিলেন, বিবেচনা করিলেন, পরামর্শ দিলেন, ব্যবস্থা করিলেন। ক্ষত্রিয় বিদেশীয় শত্রুর বাহ্য আক্রমণ নিবারণ করিলেন, দস্যু হইতে আভ্যন্তরিক রক্ষা করিলেন। বৈশ্য বাণিজ্যে কৃষিকার্যে জীবনযাপন করিলেন। শূদ্র দাস। সমাজের ভাগ যেন ভূগোলের ভাগ। চারিটি খণ্ডদেশ লইয়া যেমন একটি দেশ, তেমনি চারিটি জাতি লইয়া একটি হিন্দুজাতি হইল। ঠিক যন্ত্রের মত সমুদায়। প্রয়োজন নাই, অভাবও নাই, কষ্টও নাই। কে কাহার মনে কি উদ্দীপন করিতে যাইবে? প্রয়োজন কি? জীবনে দেখুন। ব্রাহ্মণশিশু আট বৎসর বা দশ বৎসর পর্যন্ত পিতামাতার ক্রোড়ে বর্ধিত হইলেন। উপনয়ন হইল। এইটি তাঁহার বিদ্যারম্ভ। তিনি তখন ব্রহ্মচারী (বোর্ডিং ইউনিবর্সিটির বোর্ডর)। কেহ বার বৎসর, কেহ ষোল, কেহ বিংশতি বৎসর পরে গৃহস্থাশ্রমে প্রবেশ করিলেন, বিবাহ করিলেন। ক্রমে স্থবির বয়সে বনে গেলেন। নদীস্রোতের ন্যায় জীবনস্রোতঃ। পিতামাতার অনুকরণ করিলেই, শাস্ত্রানুযায়ী কার্য করা হইল। যুক্তি ও শাস্ত্রও তাহার বিপরীত কিছু বলিতে পারিত না। সুতরাং যুক্তিও শাস্ত্রসঙ্গত হইল; সমাজ সুশৃঙ্খল হইয়া চলিল। এদিকে দেখুন। বসুন্ধরা ভূরি শস্যপ্রসূতি, খনি রত্নগর্ভা; ফলফুলের উদ্যান বলিলেই হয়। কথায় বলে, পৃথিবীর সকল জিনিসের নমুনা ভারতে আছে। পূর্বকালে যে সেইরূপ ছিল, তাহার আর সন্দেহ নাই। কিছুরই অভাব নাই। প্রয়োজন নাই। সুতরাং কাহাকে কিছুই বলিতে হইল না। যাঁহার কাহাকেও কিছুই বলিতে হয় না, তাঁহার উদ্দীপনা কোথা হইতে হইবে? তিনি কবি

হইলে হইতে পারেন। হায়! রোগশোকদুঃখজরামরণসঙ্কুল পৃথিবীতে কবি নয় কে? সকলেই এক সময়ে না এক সময়ে কবি। যাঁহার লেখাপড়া বোধ আছে, যিনি আপনার মনের ভাব ভাষায় সুন্দররূপে গাঁথনি করিতে পারেন; তিনিই প্রকাশ্য কবি। কিন্তু অন্তরে অন্তরে সকলেই কবি। যিনি মৃত্যুশয্যার পার্শ্বে উপবিষ্ট হইয়া, অশ্রুপূর্ণ লোচনে, "হায় বুঝি হারাইলাম" বলিয়াছেন, তিনি অন্তরে কবি। এক্ষণে অন্তরে কবি নয় কে। তাহাতেই বলি, হায়! রোগশোকজরামরণসঙ্কুল পৃথিবীতে কবি নয় কে? আবার এদিকেও বলি—ও হো হো! সুখশান্তিসৌন্দর্যশোভাপ্রীতিপূরিত মজার সংসারে কবি নয় কে? আমরা সকলেই অন্তরে কবি। কোন নারীর স্নেহ, আদর বা প্রীতিতে গলিয়া গিয়া, যিনি মা, দিদি বা প্রেয়সী বলিয়া সম্বোধন করিয়াছেন, তিনিই অন্তরে কবি। যে হাসে নাই, কাঁদে নাই, সে মনুষ্য নয়; জীবন্ত পুতুল। মনুষ্যমাত্রেই অন্তরে অন্তরে কবি। সংসারে নানা রস ছড়ান রহিয়াছে, অবস্থানুসারে তিক্ত মিষ্ট লবণ আস্বাদন করিতে হইতেছে। মানব যদি কুশিক্ষায় অরসিক, অভাবুক না হইয়া থাকে, তাহাকে কবি হইতেই হইবে। কবিত্ব মনুষ্যের স্বভাবধর্ম। উদ্দীপনা সেরূপ নহে, ইহা বিশেষ বিশেষ অবস্থায় বিশেষ বিশেষ রূপে পরিণত, বর্ধিত ও পুষ্ট হয়।

প্রাচীন ভারতের একগতিস্রোতে ইহার বীজ মৃত্তিকা আশ্রয় করিতে পারে নাই। স্রোতের বলে কয়বার চরে লাগিয়াছিল ও সেই কয়বারই বীজ অঙ্কুরিত, লতা পল্লবিতা পুষ্পিতা এবং বোধ হয় ফলভরেও অবনতা হইয়াছিল। পুরাবৃত্তের কোন্ কোন্ স্থানে এইরূপ ঘটনা হয়, তাহাও আমাদের দেখা বিশেষ কর্তব্য। কিরূপ মৃত্তিকায়, কিরূপ জলবায়ুতে বীজ অঙ্কুরিত ও লতা বর্ধিত হয়, তাহা না জানিলে, কখনই আমরা কৃষিকার্যে সফলতা লাভ করিতে পারি না; সেই কৃষিকার্যও এখন বিশেষ আবশ্যক।

প্রাচীন ভারতের একগতিস্রোতোবাহিনীতে আমরা বড় অধিক দিন বা অধিক বার সঞ্চরণ করি নাই। ভারত-নদী বিপুলা; চর দেখিয়াই, আমরা আমাদের ক্ষুদ্র তরী সেই প্রবাহে বিসর্জন করিতেও ভরসা পাই। নাবিক পাই নাই, পাইলট পাই নাই, সুতরাং কয়টি বৃহৎ চরে লাগাইয়া সেই একটি দেখিয়াই প্রত্যাবৃত্ত হইতে হইয়াছে। ক্ষুদ্র দ্বীপ প্রায় কখনই লক্ষ্যে পড়ে নাই। যদি কখন দূরে একটি কালো মেঘের মত মধ্যে মধ্যে দেখিয়া থাকি ভরসা করিয়া যাইতে পার নাই। আর পাঁচজন সঙ্গী পাইলেও বা ভরসা হয়। তা কে কোথায়, কাহাকেও দেখি না। তখন ভয়ে বিপদে বাগেশ্রীতে বলিতে হয়:—

তরী নাহি দেখি আর, চারিদিকে অন্ধকার।
বুঝি প্রাণ যায় এবার, ঘূর্ণিত জলে।

এইরূপ অবস্থায় একবার একজন বিলাতি পাইলটের সঙ্গে দেখা হয়। তাঁহাকে দেখিয়া মনে কিছু ভরসা হয়। সাহেবেরা নৌবিদ্যায় কিছু পটু, তাহাতে জাতিতে ইংরেজ, সাহসও বিলক্ষণ আছে। পাইলট অগ্রে অগ্রে চলিলেন; আমরা সঙ্গে সঙ্গে চলিলাম। স্রোতের বিপরীত দিকে যাওয়াই আমাদের উদ্দেশ্য ছিল। সাহেব আমাদিগকে বলিলেন, ঐ যে দূরে চর দেখিতে পাইতেছ, এটি মহাভারত, আর তার এদিকে এই যে দেখিতেছ, এইটি রামায়ণ। আমরা শিহরিয়া উঠিলাম। দ্বাপরের পর ত্রেতাযুগ হইল, এ যে ঘোর কলি! সাহেবের প্রতি একবারে অশ্রদ্ধা জন্মিল। তখন সেই পূর্বের গানের মোহড়াটি গাইয়া ফিরিয়া আসিলাম,

কোথা আনিলে হে—
পথ ভুলালে হে—॥

সেই অবধি আর কাহারও সঙ্গে ভারত-নদীতে যাই না।

পরশুরামের ক্ষত্রিয়প্রাদুর্ভাবদমন সম্বন্ধে আমরা পৌরাণিক আখ্যায়িকা ব্যতীত আর কিছুই জানি না। কিন্তু তাহার পর রাম অবতার। দক্ষিণবিজয়ই রামায়ণ-যুদ্ধ। যখন ব্রাহ্মণ ক্ষত্রিয় মধ্যে আর রাজ্য লইয়া বিবাদ ছিল না; যখন সমুদায় আর্যাবর্তে আর্যসন্তানেরাই বাস করিতেছিলেন, তখনই রামায়ণের ঘটনা সমস্ত ঘটে।

তখন দাক্ষিণাত্য অনার্যভূমি; রামচন্দ্র, যে উদ্দেশ্যেই হউক, এই অনার্যভূমিতে প্রবেশ করিয়া ইহার সীমান্তবর্তী লঙ্কাদ্বীপ পর্যন্ত বিজয় করেন। আর্যাবর্তের সীমা ছাড়াইযাই, নির্জনস্পৃহ আর্য মুনিগণের তপোবন ছাড়াইয়াই, রাম এক জাতি দেখেন। এ জাতি অতি প্রাচীন; আর্যেরা ইহাদিগকে জানিতেন। আর্যগণের পীড়নে ইহারা বহিষ্কৃত হইয়া—উত্ত্যক্ত হইয়া, দক্ষিণে বাস করিতেছিল। আর্যেরা ইহাদিগকে মাংসপ্রলোভী জানিয়া ঘৃণা করিতেন ও চণ্ডাল বলিয়া হেয় অভিধান দিয়াছিলেন। শ্রীরামকে স্বকার্য উদ্ধারজন্য এই জাতির সহিত বন্ধুত্ব করিতে হইয়াছিল। রামায়ণে এই ঘটনাই গুহক চণ্ডালের সহিত মৈত্রনিবন্ধন বলিয়া বর্ণিত হইয়াছে। পরে এক অত্যন্ত অসভ্য জাতির মধ্যে যাইয়া, কোন দলের সহিত যুদ্ধ করিয়া, সেই দলকে পরাজয় এবং কোন দলের সহিত বা সন্ধিবন্ধন করিয়াছিলেন। ইহাই রামায়ণে বালিবানর-বধ ও সুগ্রীবসহ বন্ধুত্ব বলিয়া বর্ণিত। চণ্ডালেরা হিন্দুসমাজবহিষ্কৃত বটে, কিন্তু বানরগণের ন্যায় অসভ্য নহে। কিন্তু

বানরগণ চণ্ডালগণ অপেক্ষা বিশেষ সমৃদ্ধিশালী। কেননা, তাহারা দাক্ষিণাত্যের আদিমবাসী; চণ্ডালগণের ন্যায় আর্যনির্বাসিত জাতি নহে। পরে রামচন্দ্র নরমাংসভোজী, বিকৃতাকার এক জাতিকে প্রায় একেবারে লোপ করেন। ইহাই রাবণের সবংশে বধ। ইহারা অত্যন্ত সমৃদ্ধিশালী। যেমন আমেরিকার নরকপালসংগ্রহকারী, নরবলিপ্রতিষ্ঠাকারী অজতেক জাতির মধ্যে অনার্য সমৃদ্ধির বিশেষ পুষ্টি হইয়াছিল, রাক্ষসদিগেরও ঠিক সেইরূপ হইয়াছিল। আর্যগণের ন্যায় তাহাদিগের মধ্যে ব্রাহ্মণ-ক্ষত্রিয়-বৈশ্য-শূদ্রবিভাগ ছিল না। সকলেই যোদ্ধা ও ধনুর্ধারী, বেদাচারবহির্ভূত, অথচ বিশেষ সমৃদ্ধিশালী। রামায়ণ ঘটনার স্থূল মর্ম এই, কিন্তু এগুলি অত্যন্ত গুরুতর ঘটনা। বৈদিক একগতির রোধকারী। ইহাতেই বৃহৎ চর উৎপন্ন হয়। রামকে (তিনি একজনই হউন, আর অনেক জনই হউন) একটি অসাধারণ বিপ্লব করিতে হইয়াছিল। যে চণ্ডালকে দর্শন করিতে নাই, তাহার সহিত বন্ধুত্ব। সামান্য বর্ণনে বলে, গুহক চণ্ডালের সহিত কোলাকুলি। কন্দমূলফলাশী বানরসদৃশ জীবের হৃদয়ে বীররসের উদ্ভাবন ; পৃথক পৃথক নানা অসভ্য দলের একত্রকরণ। সেই সামান্য অসভ্য জাতির সাহায্যে আমমাংসলোভী, অতিবিক্রমশালী জাতিকে একেবারে উচ্ছন্ন করা, শ্রীরামচন্দ্রের কার্য। পরের চিত্তবৃত্তির উপর, পরের সাহায্যের উপর, লোকের শ্রদ্ধার উপর, তাঁহাকে নির্ভর করিতে হইয়াছিল। নিভৃত চিন্তা, নির্জনে তারস্বরে বেদপাঠ, আচার্যনিকটে ধনুর্বিদ্যা শিক্ষা করিয়া বর্ষে বর্ষে একবার নিজ পরিজন সমভিব্যাহারে অযোধ্যা-সংলগ্ন শালতালবনে মৃগয়া প্রভৃতি নিয়মিত কার্য করিয়াই তাঁহার জীবন পর্যবসিত হয় নাই। তিনি স্বীয় অসীম ক্ষমতাপ্রভাবে আর্যবৈরী, প্রভূত-বিক্রমশালী (যে বিক্রমবর্ণনজন্য আর্যমুনি আর্যদেবগণকে সেই জাতির দাসত্বে নিযুক্ত করিতে বাধ্য হইয়াছেন) সেই জাতিকে একেবারে ভারতবর্ষসন্নিহিত দ্বীপ হইতেও নির্মূল করিয়াছেন। আর্য সন্তানেরা তাঁহার সেই কীর্তি মনে করিয়া অদ্যাপি তাঁহাকে সপ্তমাবতার বলিয়া শ্রদ্ধা করেন। অদ্যাপি তাঁহার নাম মহান্ ঈশ্বর শব্দের প্রতিশব্দ। অদ্যাপি রামজী হিন্দুস্থানে একমেবাদ্বিতীয়ম্।

কিন্তু এই ত্রেতাবতার রামচন্দ্র মানবীয় উপায় অবলম্বন করিয়াই কৃতকার্য হয়েন। তাঁহার চরিত্র অসাধারণ অলৌকিক নহে। মনুষ্য যে উপায় অবলম্বন করিয়া পরের সাহায্য প্রাপ্ত হয়, রামচন্দ্র তাহাই করিয়াছিলেন। পরের সাহায্য না হইলে, কখনই মহৎকার্য সুসাধিত হয় না ; এবং অন্যে কর্তার মনোভাবে সমভাবী না হইলে, প্রাণপণে সাহায্য করে না। আন্তরিক সাহায্য নহিলে, সাহায্যই নহে। এক ব্যক্তির মনোভাবে আর-এক ব্যক্তিকে বা ব্যক্তিগণকে

সমভাবী কে করে ? রস ঢালিয়া দিয়া পান করিতে, কে বলে ? কেবল রস অনুভব করিয়াই ক্ষান্ত না হইয়া, রস উদ্দীপন করিতে চায় কে ? উদ্দীপনা। প্রয়োজন হইয়াছিল বলিয়াই, এই রামায়ণ চরে, দক্ষিণবিজয় চরে, রাবণবধ চরে, রাক্ষসধ্বংস চরে, যাহাই নাম দিউন, এই স্থানে প্রয়োজন, বিপদুদ্ধার, মহৎকার্যসাধন, এই সকল জলবায়ুর গুণে উদ্দীপনার বীজ অঙ্কুরিত হয়। সে লতা বহুপল্লবিতা, ভূরিমনোহরকুসুমশোভিতা হইয়াছিল। সে ফুলের মালা এখন রামায়ণের পাতে পাতে সাজান রহিয়াছে। রামায়ণ গ্রন্থ রামের সমকালিক। রামায়ণ কাব্য স্থানে স্থানে উদ্দীপনাপূর্ণ। রামোপ্ত উদ্দীপনা-লতা তাবৎ ভারত ব্যাপিয়া ছিল, কবিগুরু বাল্মীকি তাহারই গুটিকত অক্ষয় কুসুম তুলিয়া গাঁথিয়া রাখিয়া গিয়াছেন। কিন্তু এই লতা কতদিন জীবিতা ছিল ? তাহা কে বলিতে পারে। যে দেশে মৌনব্রতাবলম্বী মুনিগণকে দেব-সদৃশ ভক্তি করে, সে দেশে উদ্দীপনা কতদিন জীবিত থাকিবে ? কিন্তু আমরা এই সময়ের কিছুই জানি না। রাবণনিপাতকারী রাঘব বংশের প্রাদুর্ভাব কিসে হ্রস্ব হইয়া, চন্দ্রবংশের শ্রীবৃদ্ধি হইল, তা কে বলিতে পারে ? কিন্তু ভারত-নদীতে আর সহস্রেক বৎসর এদিকে বাহিয়া আসিয়া, আমরা আর-একটি বৃহৎ চর দেখিতে পাই। চর দেখিলেই আশা হয়। অবশ্য নানা তরুলতা আছে। হয়ত উদ্দীপনার লতা আছে। এ চরটি ভারতযুদ্ধ চর।

এই সময়ে বিস্তীর্ণ আর্য্যক্ষেত্রে সূত, মাগধ, বল্লব, গোপ, সূপকার প্রভৃতি নানা আগাছা জন্মিয়াছে। সৈরিন্ধ্রী, নাগকন্যা, আভীরী প্রভৃতি কত জঙ্গলী লতা উদ্ভূতা হইয়াছে, আর্য্যক্ষত্রের চতুষ্পার্শে শক, খস, দরদ, বাহ্লীক, চীন, যবন প্রভৃতি নানা অনার্য জাতি দিন দিন বিক্রম বিস্তার করিয়া আপনাদের আয়তন বৃদ্ধি করিতেছে। ভারত রাজ্য, খণ্ড রাজ্য, উপরাজ্য, মণ্ডল, ছত্র, নগর, গ্রাম বিভেদে একবার চূর্ণীকৃত হইয়াছে। চোল, কোল, চোর, মণ্ডল, অঙ্গ, বঙ্গ কলিঙ্গ, কাশী, কাঞ্চী, দ্রাবিড়, মথুরা, ত্রিগর্ত, মৎস্য, সৌরাষ্ট্র, মরুকচ্ছ, সিন্ধু, সৌবীর প্রভৃতি নানা দেশ, নানা রাজা। পরস্পরের একতা নাই, সৌহার্দ্য নাই। এই সময়ে অষ্টম যমলাবতার কৃষ্ণার্জুন জন্মপরিগ্রহ করেন। শ্রীকৃষ্ণ স্বীয় চিরবৈরী বেদদ্বেষী কংসরাজাকে বিনষ্ট করিয়া, যে জরাসন্ধ স্বীয় কারা-গারে ভারতের বীরগণকে অন্ধকারে বিনষ্ট করিতেছিলেন, যে শিশুপাল স্বীয় দম্ভে ধর্মের অবমাননা করিতেছিল, তাহাদিগকে বিনষ্ট করিবার জন্য, যুধিষ্ঠির আদি পঞ্চভ্রাতার সাহায্য লইলেন। সেই পঞ্চভ্রাতা আবার আপনাদের চিরজ্ঞাতি শত্রু দুর্যোধনকর্তৃক তাড়িত হইয়া শ্রীকৃষ্ণের সহায়তা প্রার্থনা করিলেন। স্বার্থে দুই বিভিন্ন রাজাকে একত্র করিল। শ্রীকৃষ্ণের অর্থ সুসাধিত হইল, কিন্তু তৎপরেই

জ্ঞাতিবৈরযুদ্ধে সমস্ত ভারত দুই দলে বিভক্ত হইল এবং কুরুক্ষেত্রে তুমুল সংগ্রাম হইল। চূর্ণীকৃত ভারত অন্ততঃ কিছুদিনের জন্য···এক না হউক, দুই দল হইয়াছিল। এ গৃহবিবাদে আর কি মহৎ ফল ফলিয়াছিল, তাহা আমরা বলিতে পারি না। কিন্তু অশ্বমেধপর্বের বর্ণনে বোধ হয়, সমস্ত সাম্রাজ্য একীকরণের চেষ্টা হইয়াছিল। তাহা হউক, এই মহৎ কার্যের উদ্যমের কর্তৃগণকেও আমরা দেবত্বে অভিষিক্ত করিয়াছি। শ্রীকৃষ্ণ পূর্ণাবতার, অর্জুন নারায়ণ। তাঁহার ভ্রাতৃগণ সকলেই দেবরূপী। কুরুক্ষেত্রযুদ্ধের ঘটনা সমস্ত মহাভারত প্রণয়নের সমকালিক বৃত্তান্ত। বেদব্যাসের গ্রন্থ মহাভারত রামায়ণের ন্যায় সেই কালের উদ্দীপনাশক্তির প্রাচুর্যের পরিচয় প্রদান করিতেছে। মহোদ্দীপক বেদব্যাসের গ্রন্থোক্ত শকুন্তলা উপাখ্যানের সহিত মহাকবি কালিদাসের অভিজ্ঞানশকুন্তল নাটকের লেখার একবার তুলনা করুন। উভয়েই সতী সাধবী পতিব্রতা, মানবমোহিনী শক্তিতে ভূষিতা। উভয়েই আশৈশব মুনিগৃহে পালিতা, মাধবীলতার সহিত উভয়েই বর্ধিতা, উটজপর্যন্তচারিণী হরিণী উভয়েরই সঙ্গিনী। উভয়কেই দুষ্মন্ত গান্ধর্ব বিধানে বিবাহ করিয়া, ইচ্ছাপূর্বকই হউক, আর বিস্মৃতিক্রমেই হউক, বর্জন করিলেন, অর্ধাঙ্গের ভাগিনী করিলেন না, সহধর্মিণী আখ্যা দিয়া মান বৃদ্ধি করিলেন না। কিন্তু এই আচরণে দেখুন, কবির শকুন্তলা কিরূপ ব্যবহার করেন। কবির শকুন্তলা রাজার গোপন ব্যবহার দুইবার স্মরণ করিয়া দিতে গিয়া, পরে লজ্জাতে ঘৃণাতে নিবারিত হইয়া, আপনার দুঃখ আপনি প্রকাশ করিলেন। যথা,—

রাজা। আর্যে কথ্যতাম্।

গৌত। ণাবেক্‌খিদো গুরুঅণো ইমিএ,
তু এবি ণ পুচ্ছিদো বন্ধু।
এক্কক্কস্‌সঅ চরিএ,
কিং ভণ্ণদু এক্ক একস্‌নিং॥

শকু। (আত্মগতম্) কিন্ন্‌কৃখু অজ্জউত্তোভণিস্‌সদি ?

রাজা। (সাশঙ্কমাকর্ণ্য) অয়ে! কিমিদমুপন্যস্তং।

* রাজা। আর্যে, বলুন।
গৌত। এও গুরুজনের অপেক্ষা করে নাই, তুমিও বন্ধুজনকে জিজ্ঞাসা কর নাই। একেলা একেলার কার্যে অপরে কে কি বলিতে পারে ?
শকু। (আত্মগত) না জানি আর্যপুত্র কি বলেন ?
রাজা। (শুনিয়া সভয়ে) কি গা ? উপন্যাস আরম্ভ করিলে নাকি ?

শকু। (আত্মগতম্) হদ্দী হদ্দী! সাবলেবো সে বঅণাবক্‌খেবো

* * *

রাজা। কিমত্রভবতী ময়া পরিণীতপূর্বা।

শকু। (সবিষাদমাত্মগতম্) হিঅঅ সং পদং সংবুত্তা দে আসঙ্কা।

* * *

রাজা। ভো স্তপস্বিনশ্চিন্তয়ন্নপি ন খলু স্বীকরণমত্রভবত্যাঃ স্মরামি তৎ কথমিমামাভিব্যক্তসত্ত্বলক্ষণামাত্মানমক্ষত্রিয়ং মন্যমানঃ প্রতিপৎস্যে।

শকু। (স্বগতম্) হদ্দী হদ্দী! কধং পরিণএজ্জেব সন্দেহো ভগ্‌গা দানিং দূরারোহিণী আসালদা।

* * *

শকু। (স্বগতম্) ইমং অবত্থন্তরং গদে তাদিসে অনুরাএ কিম্বা সুমরা-বিদেণ, অধবা অত্তা দাণিং মে সোধনীও হোদুত্তি কিঞ্চি বদিসসং। (প্রকাশম্) অজ্জউত্ত! (ইত্যর্ধোক্তে) অথবা সংসইদো দানিং এসো সমুদাচারো। পৌরব! জুত্তংণাম তুহ পুরা অস্‌সমপদে সম্ভাবুত্তাণহিঅঅং ইমংজণং তধাসমঅপুব্বঅং সম্ভাবিঅ সম্পদংইদি সেহিং অক্‌খরেহিং পচ্চক্‌খাদুং।

* * *

শকু। ভোদু জই পরমত্থদো পরপরি গ্‌গহসঙ্কিণা তুএ এব্বং পউত্তং তা অহিন্নাণেণ কেণবি তুহ আসঙ্কং অবণইস্‌সং।

শকু। (আত্মগত) আ ছি ছি! এঁর বচনভঙ্গী যে কেমন কেমন।

রাজা। কি, আমি এঁকে বিবাহ করিয়াছিলাম না কি?

শকু। (সবিষাদে আত্মগত) হা হৃদয়! যা ভয় করেছিলে, এখন তাই হলো!!

* * *

রাজা। হে তপস্বিগণ! ভাবিয়াও ইহাকে পরিগ্রহ করা, আমি মনে করিতে পারিতেছি না। তবে কুক্ষত্রিয়ের ন্যায় কেমন করে, এই স্পষ্টগর্ভ-লক্ষণাকে গ্রহণ করি?

শকু। (আত্মগত) ছি ছি! বিবাহেতেই সন্দেহ! এত দিনে আমার দূরারোহিণী আশালতা ভগ্ন হইল।

* * *

শকু। তেমন অনুরাগই যদি এমন অবস্থান্তরগত হইল, তবে আর মনে পড়াইবার চেষ্টা করিলেই বা কি হবে? তথাপি আপনাকে দোষমুক্ত করিবার জন্য কিছু বলি। (প্রকাশ্য)

রাজা। প্রথমঃ কল্পঃ।

শকু। (মুদ্রাস্থানং পরামৃশ্য)' হদ্দী হদ্দী! অঙ্গুলীঅঅসূণ্ণা মে অঙ্গুলী!' (ইতি সবিষাদং গৌতমীমুখমীক্ষতে।

রাজা। (সস্মিতম্) ইদং তাবৎ প্রত্যুৎপন্নমতিত্বং স্ত্রীণাম্।

শকু। এত্থ দাব বিহিণা দংসিদং পউত্তণং অবরং দে কধইস্‌সং।

রাজা। শ্রোতব্যমিদানীম্।

শকু। ণংএক্ক দিঅহে বেদসলদামণ্ডবে ণলিণীবত্তভাঅণগদং উদঅং তু হত্থে সণ্ণিহিদং আসী।

রাজা। শৃণুমস্তাবৎ।

শকু। তক্‌খণং সো মে পুত্তকিদও দীহাপঙ্গোণাম মিঅপোদও উবট্‌ঠিদো, তদো তুএ অঅং দাব পড়মং পিঅদুত্তি অনুকম্পিণা উবচ্ছন্দিদো উদএণ, ণ উণ সো অপরিচিদস্‌স দে হত্থাদো উদঅং উবগদো পাদুং, পচ্চা তস্‌সিং

আর্যপুত্র। (এই অর্ধোক্তি করিয়া) অথবা এখন এ সম্বোধন যুক্ত হইতেছে না। পৌরব ! পূর্বে আশ্রমপদে প্রণয়-প্রফুল্ল-হৃদয়া আমাকে প্রতিজ্ঞাপূর্বক আদর করিয়া এমন এইরূপে প্রত্যাখ্যান করা কি তোমার উপযুক্ত ?

* * *

শকু। ভাল, যদি যথার্থই পরস্ত্রীগ্রহণ শঙ্কা করিয়া, তুমি এরূপ করিতেছ তবে আমি কোন অভিজ্ঞান দ্বারা তোমার আশঙ্কা দূর করি।

রাজা। উত্তম কথা।

শকু! (অঙ্গুলি দেখিয়া) হায় হায়! অঙ্গুলিতে অঙ্গুরীয় নাই যে! (সবিষাদে গৌতমীর মুখদর্শন)

রাজা। (হাস্য করিয়া) একেই বলে, স্ত্রীদিগের প্রত্যুৎপন্নমতিত্ব।

শকু। এস্থলে এখন বিধাতাই প্রভুত্ব দেখাইলেন, ভাল, আমি তোমাকে আর কিছু বলিতেছি।

রাজা। বল শুনিতেছি।

শকু। একদিন বেতসলতামণ্ডপে তোমার হস্তে পদ্মপাত্রে জল ছিল ?

রাজা। তারপর বল শুনি।

শকু। সেই সময়ে সেই দীর্ঘাপাঙ্গ নামে আমার কৃতকপুত্র মৃগশাবক আসিল ? এই আগে পান করুক, এই কথা বলিয়া, তুমি আদর করিয়া, তাহাকে জল পান করিতে ডাকিলে ; কিন্তু সে অপরিচিত বলিয়া, তোমার হস্ত হইতে জল খাইতে আসিল না। তারপর আমি সেই জল লইলে, সে

জ্জেব উদএ মএ গহিদে কিদো তেণ পণও, এত্থন্তরে বিহসিঅ তুএ ভণিদং সব্বোসগণে বীসসদি, জদো দুবেবি তুম্হে আরণ্ণকা ত্তি।

রাজা। আভিস্তাবদাত্মকার্য্যপ্রবর্তনীভির্মধুরাভিরনৃতবাগ্‌ভিরাকৃষ্যন্তে বিষয়িণঃ।

গৌতমী। মহাভাঅ! ণারিহসি পব্বং মন্তিদুং, তপোবণসংবড্ঢিদো কৃখু অঅং জণো অণভিণ্ণোকইদবস্‌স।

রাজা। অয়ি তাপসবৃদ্ধে। স্ত্রীণামশিক্ষিতপটুত্বমমানুষীণাং, সংদৃশ্যতে কিমুত যাঃ পরিবোধবত্যঃ। প্রাগন্তরীক্ষগমনাৎ স্বমপত্যজাতমন্যদ্বি জৈঃপর-ভৃতাঃ কিল পোষয়ন্তি।

শকু। (সরোষম্) অণজ্জ! অত্তণো হিঅ-আনুমাণেণ কিল সব্বং পেক্‌খসি; কোণাম অণ্ণো ধর্মকঞ্চুঅব্যবদেসিণো তিণচ্ছন্নকূবোবমস্‌স তুহ অনুআবী ভবিস্‌সদি।

* * *

রাজা। ভদ্রে! প্রথিতং দুষ্মন্তস্য চরিতং প্রজাস্বপীদং ন দৃশ্যতে।

শকু। তুম্হে জ্জেব পমাণং,

জানধ ধর্মত্থিদিঞ্চ লোঅস্‌স।

লজ্জাবিনিজ্জিদাও

জাণন্তি ণ কিম্পি মহিলাও॥

ষুট্‌ঠুদাব অত্তচ্ছন্দানুচারিণী গণিয়া সমুবট্‌ঠিদা।

গৌতমী। জাদে ইমস্‌সপুরুবংসপচ্চয়েণ মুহমহুণো হিঅঅবিসস্‌স হত্থং সমুবগদাসি।

ভালবাসিয়া খাইল। তাহাতে তুমি হাসিয়া বলিলে, সকলেই স্বজাতিকে বিশ্বাস করে। তোমরা দুজনেই বন্য।

রাজা। স্ত্রীলোক আপন কার্য সাধন জন্য এইরূপ অমৃতমধুর মিথ্যা বচন দ্বারাই বিষয়ী লোকদিগকে আকর্ষণ করে।

গৌত। মহারাজ! এরূপ মনে করিবেন না। তপোবনে পালিত এই সকল লোকেরা কৈতব জানে না।

রাজা। অয়ি তাপসবৃদ্ধে! পশু-পক্ষীর মধ্যেও স্ত্রীজাতির অশিক্ষিত-পটুত্ব দেখা যায়, তবে পরিবোধবতীদিগের কথা আর কি বলিব! দেখ, কোকিলাগণ আকাশে উড়িতে পারিবার পূর্বে আপনার শাবকদিগকে অন্য পক্ষী দ্বারা প্রতিপালিত করিয়া লয়।

শকু। (পটান্তেন মুখমাচ্ছাদ্য রোদিতি।)

* * *

শার্ঙ্গরব। * * * গৌতমি, গচ্ছাগ্রতঃ।

(ইতি সর্বে প্রস্থিতাঃ)

শকু। অহংদানিং ইমিণা কিদবেণ বিপ্পলদ্ধা, তুম্হেবি মংপরিচ্চঅধ।

(ইত্যানুপ্রস্থিতা)

* * *

শার্ঙ্গ। (সরোষং প্রতিনিবৃত্য) আঃ পুরোভাগিনি! কিমিদং স্বাতন্ত্র-মবলম্বসে।

শকু। (ভীতা বেপতে)

শার্ঙ্গ। শকুন্তলে! শৃণোতু ভবতী।

যদি যথা বদতি ক্ষিতিপস্তথা ত্বমসি কিংপুনর্বৃৎকুলয়া ত্বয়া অথ তু বেৎসি শুচিব্রতমাত্মনঃ পতিগৃহে তব দাস্যমপি ক্ষমমং॥

* * *

পুরোধাঃ। (বিচার্য্য) যদি তাবদেবং ক্রিয়তাং—।

রাজা। অনুশাস্তু মাং গুরুঃ।

পুরোধা। অত্র ভবতী তাবদাপ্রসবাদস্মদ্‌গৃহে তিষ্ঠতু।

রাজা। কুত ইদম্‌?

পুরো। ত্বংসাধুনৈমিত্তিকৈরুপদিষ্টপূর্বঃ প্রথমমেব চক্রবর্তিণং পুত্রং

শকু। অনার্য! এ কি আপনার হৃদয় অনুমানে সকলকে দেখিতেছ না কি? তুমি ধর্মছদ্মবেশী, তৃণাচ্ছাদিত কূপের মত! অন্যে কে তোমার অনুকরণ করিবে?

রাজা। ভদ্রে! দুষ্মন্তের চরিত্র প্রসিদ্ধ; আমার প্রজাদের মধ্যেও এমত দেখা যায় না।

শকু। তোমাদের কথাই প্রমাণ, লোকের ধর্মস্থিতিও তোমরাই জান, লজ্জাজিতা মহিলারা কিছুই জানে না। ভাল, জিজ্ঞাসা করি, তবে কি আমি স্বেচ্ছাচারিণী গণিকা হইয়া আসিয়াছি?

গৌত। বাছা, পুরুবংশে বিশ্বাস করিয়া মধুমুখ গরলহৃদয় জনের হাতে পড়েছে।

শকু। (মুখে অঞ্চল দিয়া ক্রন্দন।)

জনয়িষ্যসীতি। সচেন্মুনিদৌহিত্রস্তল্লক্ষণোপপন্নো ভবিষ্যতি ততোঽভিনন্দ্য শুদ্ধান্তমেনং প্রবেশয়িষ্যসি, বিপর্যয়েত্বস্যাঃ পিতুঃ সমীপগমনং স্থিতমেব।

রাজা। যথা গুরুভ্যো রোচতে।

পুরো। (উত্থায়) বৎসে ইত ইতোঽনুগচ্ছ মাম্।

শকু। ভঅবদি বসুন্ধরো! দেহি মে অন্তরং।

(ইতি সহ পুরোধসা গৌতমীতপস্বিভিশ্চ রুদতী নিষ্ক্রান্তা।)

* * *

ব্যাসের শকুন্তলা সে প্রকৃতির নহেন, তিনি দুষ্মন্তকর্তৃক পরিবর্জিত হইয়া, ম্লান বদনে, ছল ছল নয়নে, দীর্ঘ নিশ্বাসের সঙ্গে আশ্বাসকে বিসর্জন দিয়া, প্রত্যাগমন করিবার মহিলা নহেন। তিনি লাঙ্গুলস্পৃষ্টা কালভুজঙ্গিনীর ন্যায় মুখ ফিরাইয়া, গর্জন করিয়া উঠিলেন। গর্জন করিয়াই প্রত্যাবৃত্তা হইবেন? তাহলে ত কবির সৃষ্টা বীররসপ্রবলা নায়িকা হইলেন মাত্র। তা নয়, তিনি

শার্ঙ্গ। গৌতমি! অগ্রসর হউন। (সকলে যাইতে লাগিলেন।)

শকু। এখন এই শঠ আমায় ত্যাগ করিল, তোমরাও আমাকে পরিত্যাগ করিবে? (এই বলিয়া সঙ্গে সঙ্গে গমন।)

শার্ঙ্গ। (ক্রোধে ফিরিয়া) দুষ্টশীলে! স্বাতন্ত্র্যাবলম্বন করিতেছিস্।

শকু। (ভয়ে কম্পান্বিত)

শার্ঙ্গ। শকুন্তলে! তুমি শুন, রাজা যাহা বলিতেছেন, তাই যদি হয়, তাহা হইলে তুমি কুলটা, তোমায় লইয়া কি হইবে? আর যদি আপনাকে তুমি শুচিব্রতা বলিয়া জান, তাহা হইলে পতিগৃহে দাসীবৃত্তিও তোমার ভাল।

পুরোধা। (চিন্তা করিয়া) যদি এরূপ করেন—

রাজা। মহাশয় উপদেশ দিন।

পুরোধা। ইনি প্রসবকাল পর্যন্ত আমার গৃহে থাকুন।

রাজা। কেন?

পুরোধা। সাধুনৈমিত্তিকেরা বলিয়াছেন যে, আপনার প্রথম পুত্র চক্রবর্তী হইবে। যদি মুনিদৌহিত্র সেইরূপ লক্ষণযুক্ত হয়, তাহা হইলে ইঁহাকে সমাদরে অন্তঃপুরে লইয়া যাইবেন, তা যদি না হয়, তবে ইঁহার বাপের বাড়ি যাওয়াই স্থির।

রাজা। গুরুর যাহা অভিরুচি।

পুরো। (উঠিয়া) বাছা, আমার সঙ্গে এই দিকে আইস।

শকু। ভগবতি বসুন্ধরে! আমাকে অন্তরে স্থান দেও। (পুরোধা ও গৌতমীর সহিত কাঁদিতে কাঁদিতে নিষ্ক্রান্তা।)

উদ্দীপনাকে স্মরণ করিয়া রাজাকে সম্বোধনপূর্বক নিজ মনোভাব তাঁহার কর্ণ কুহর দিয়া, তাঁহার হৃদয়ে বেগে ঢালিয়া দিলেন। তিনি সফলাও হইলেন।

রাজন্ সর্ষপমাত্রাণি পরচ্ছিদ্রাণি পশ্যসি।
আত্মনো বিল্বমাত্রানি পশ্যন্নপি ন পশ্যসি॥
মেনকা বিদশেষ্বেব ত্রিদশাশ্চানুমেনকাম্।
মমৈবোদ্রিচ্যতে জন্ম দুষ্মন্ত তব জন্মতঃ॥
ক্ষিতাবটসি রাজেন্দ্র অন্তরীক্ষে চরাম্যহং।
আবয়োরন্তরং পশ্য মেরুসর্ষপয়োরিব॥
মহেন্দ্রস্য কুবেরস্য যমস্য বরুণস্য চ।
ভবনান্যনুসংযামি প্রভাবং পশ্য মে নৃপ॥
সত্যশ্চাপিপ্রবাদোঽয়ং যং প্রবক্ষ্যামি তে হনঘ!
নিদর্শনার্থং নদ্বেষাৎ শ্রুত্বা তং ক্ষন্তুমর্হসি॥
বিরূপো যাবদাদর্শে নাত্মনঃ পশ্যতে মুখং।
মন্যতে তাবদাত্মানমন্যেভ্যো রূপবত্তরং॥
যদা স্ব মুখমাদর্শে বিকৃতংসোঽভিবীক্ষতে।
তদাঽন্তরং বিজানীতে আত্মানং চেতরং জনং॥
অতীব রূপসম্পন্নো ন কিঞ্চিদবমন্যতে
অতীব জল্পন্ দুর্ব্বোচোভবতীহ বিহেটকঃ॥

* মহারাজ! সর্ষপপ্রমাণ পরদোষ নিরীক্ষণ কর, কিন্তু, বিল্বপরিমিত আত্ম-দোষ দেখিতে পাও না? মেনকা দেবগণের মধ্যে গণনীয়া ও আদরণীয়া, অতএব তোমার জন্ম হইতে আমার জন্ম যে উৎকৃষ্ট, তাহাতে আর সন্দেহ নাই। আরও দেখ, তুমি কেবল পৃথিবীতে ভ্রমণ কর, আমি পৃথিবী ও অন্তরীক্ষ উভয় স্থলেই গতায়াত করিতে পারি। অতএব আমার ও তোমার প্রভেদ সুমেরু ও সর্ষপের প্রভেদের ন্যায়। আমার এরূপ প্রভাব আছে, আমি ইন্দ্র, যম, কুবের, বরুণ প্রভৃতি দেবগণের ভবনেও অনায়াসে যাতায়াত করিতে পারি। হে মহারাজ! আমি এস্থলে এক লৌকিক সত্য দৃষ্টান্ত দেখাইতেছি, শ্রবণ কর, রুষ্ট হইও না। দেখ, কুরূপ ব্যক্তি যে পর্যন্ত আদর্শমণ্ডলে আপন মুখমণ্ডল না দেখে, ততক্ষণ আপনাকে সর্বাপেক্ষা রূপবান্ বোধ করে। কিন্তু যখন আপনার মুখশ্রী নিরীক্ষণ করে, তখন আপনার ও অন্যের রূপেও প্রভেদ জানিতে পারে। যে ব্যক্তি অত্যন্ত সুশ্রী, সেঁ কখন আপনাকে অবজ্ঞা করে না। যে অধিক বাক্য ব্যয় করে, লোক তাহাকে মিথ্যাবাদী ও বাচাল কহে। যেমন শূকর নানাবিধ সুখাদ্য

মূর্খোহি জল্পতাংপুংসাং শ্রুত্বা বাচঃ শুভাশুভাঃ।
অশুভং বাক্যমাদত্তে পুরীষ্টমিব শূকরঃ ॥
প্রাজ্ঞস্তু জল্পতাংপুংসাং শ্রুত্বা বাচঃ শুভাশুভাঃ।
গুণবদ্বাক্যমাদত্তে হংসঃ ক্ষীরমিবাম্ভসঃ ॥
অন্যান্ পরিবদন্ সাধুর্যথা হি পরিতপ্যতে।
তথা পরিবদন্নন্যাং হৃষ্টো ভবতি দুর্জনঃ ॥
অভিবদ্য যথা বৃন্ধান্সন্তো গচ্ছন্তি নির্বৃতিং।
এবং সজ্জনমাক্রুশ্য মূর্খো ভবতি নির্বৃতঃ ॥
সুখং জীবন্ত্যদোষজ্ঞা মূর্খো দোষানুদর্শিনঃ।
যত্র বাচ্যাঃ পরৈঃ সন্তঃ পরানাহুস্তথা-বিধান্ ॥
অতে হাস্যতরং লোকে কিঞ্চিদন্যন্ন বিদ্যতে।
যত্র দুর্জন মিত্যাহি দুর্জনঃ সজ্জনং স্বয়ং ॥
সত্যধর্মচ্যুত্যাৎ পুং সঃ ক্রুদ্ধাদাশীবিষদিব।
অনাস্তি কোহপ্যুদ্বিজতে জনঃ কিং পুনরাস্তিকঃ ॥
স্বয়মুৎপাদ্য চৈ পুত্রং সদৃশং যো ন মন্যতে।
তস্য দেবাঃ শ্রিয়ংঘ্নন্তি ন চ লোকানু পাশ্নুতে ॥
কুলাবংশ প্রতিষ্ঠাং হি পিতরঃ পুত্রমব্রুবন্।
উত্তমং সর্বধর্মানাং তস্মাৎ পুত্রং ন সং ত্যজৎ ॥
সপত্নীপ্রভবান্ পঞ্চ লব্ধান্ক্রীতান্ বিবর্দ্ধিতান্।
কৃতানন্যাসু চোৎপন্নান্ পুত্রান্ চৈ মনুরব্রবীৎ ॥
ধর্মকীর্ত্যাবহা নৃনাং মন্যনঃ প্রীতিবন্ধনাঃ।
ত্রায়ন্তেনরকজ্জাতাঃ পুত্রাধর্মপলবাঃ পিতৃন্ ॥

মিষ্টান্ন পরিত্যাগ করিয়া পুরীষমাত্র গ্রহণ করে; সেইরূপ মূর্খ লোকেরা শুভাশুভ বাক্য শ্রবণ করিলে, শুভ কথা পরিত্যাগপূর্বক অশুভই গ্রহণ করিয়া থাকে। আর হংস যেমন সজল দুগ্ধ হইতে অসার জলীয়াংশ পরিত্যাগপূর্বক দুগ্ধরূপ সারাংশই গ্রহণ করে, সেইরূপ পণ্ডিত ব্যক্তিরা লোকের শুভাশুভ বাক্য শ্রবণ করিয়া, শুভই গ্রহণ করেন। সজ্জনেরা পরের অপবাদ শ্রবণ করিয়া অতিশয় বিষণ্ণ হয়েন; কিন্তু দুর্জনেরা পরের নিন্দা করিয়া যৎপরোনাস্তি সন্তুষ্ট হয়। সাধু ব্যক্তিরা মান্য লোকদিগকে সম্বর্ধন করিয়া যাদৃশ সুখী হন, অসাধুগণ সজ্জনগণের অপমান করিয়া ততোধিক সন্তোষ লাভ করে। অদোষদর্শী সাধু ও দোষৈকদর্শী অসাধু, উভয়েই সুখে কালাতিপাত করে; কারণ অসাধু সাধু ব্যক্তির নিন্দা করে, কিন্তু সাধু ব্যক্তি অসাধুকর্তৃক অপমানিত হইয়াও, তাহার

স ত্বং নৃপতিশার্দূল পুত্রং ন ত্যক্তুমর্হসি।
আত্মানং সত্যধর্মৌ চ পালয়ন্ পৃথিবীপতে ॥
নরেন্দ্রসিংহ কপটং ন বোঢ়ুং ত্ব মিহার্হসি।
বরং কূপশতাদ্বাপী বরং বাপীদ্দতাৎ ক্রতুঃ।
বরং ক্রতুশতাৎ পুত্রঃ সত্যং পুত্রশতাদ্বরং!
অশ্বমেধ সহস্রঞ্চ সত্যঞ্চ তুলয়া ধৃতং ॥
অশ্বমেধ সহস্রাদ্ধি সত্যমেব বিশিষ্যতে
সর্ববেদাধিগমনং সর্বতীর্থাবগাহনং ॥
সত্যঞ্চ বচনং রাজন্ সমং বাস্যান্নবা সমং।
নাস্তি সত্যসমো ধর্মো ন সত্যাদ্বিদ্যতে পরং ॥
নহি তীব্রতরং কিঞ্চিদমৃতাদিহ বিদ্যতে।
রাজন্ সত্যং পরং ব্রহ্ম সত্যঞ্চ সময়ঃ পরঃ ॥
মা ত্যাক্ষীঃ সময়ং রাজন্ সত্যং সঙ্গতমস্তু তে।
অনৃতে চেৎ প্রসঙ্গস্তে শ্রদ্দধাসি নচেৎ স্বয়ং ॥
আত্মনা হন্ত গচ্ছামি ত্বাদৃশে নাস্তি সঙ্গতং।
কৃতেঽপি ত্বয়ি দুষ্মন্ত শৈলরাজাবতংসিকাং ॥
চতুরন্তামিমামুর্বীং পুত্রোমে পালয়িষ্যতি।
(মহাভারতে আদিপর্বণি সম্ভবপর্বাধ্যায়ে
শকুন্তলোপাখ্যানে চতুঃসপ্ততিতম অধ্যায়ে।*)

নিন্দা করেন না। যে ব্যক্তি স্বয়ং দুর্জন, সে সজ্জনকে দুর্জন বলে, ইহা হইতে হাস্যকর আর কি আছে? ক্রুদ্ধ কালসর্পরূপী সত্যধর্মচ্যুত পুরুষ হইতে যখন নাস্তিকেরাও বিরক্ত হয়, তখন সাদৃশ আস্তিকেরা কোথায় আছেন। যে ব্যক্তি স্বয়ং স্বসদৃশ পুত্র উৎপাদন করিয়া তাহার সমাদর না করে, দেবতারা তাহাকে শ্রীভ্রষ্ট করেন, এবং সে অভীষ্ট লোক প্রাপ্ত হইতে পারে না। পিতৃগণ পুত্রকে কুল ও বংশের প্রতিষ্ঠা এবং সর্বধর্মোত্তম বলিয়া নির্দেশ করেন, অতএব পুত্রকে পরিত্যাগ করা অত্যন্ত অবিধেয়। ভগবান মনু কহিয়াছেন ঔরস, লব্ধ, ক্রীত, পালিত এবং ক্ষেত্রজ এই পঞ্চবিধ পুত্র মনুষ্যের ইহকালের ধর্ম, কীর্তি ও মনঃপ্রীতি বর্ধন করে, এবং পরকালে নরক হইতে পরিত্রাণ করে। অতএব হে নরনাথ! তুমি পুত্রকে পরিত্যাগ করিও না। হে ধরাপতে, আত্মকৃত সত্যধর্ম প্রতিপালন কর। হে নরেন্দ্র! কপটতা পরিত্যাগ কর। দেখ, শত শত কূপ খনন অপেক্ষা এক পুষ্করিণী প্রস্তুত করা শ্রেষ্ঠ, শত শত পুষ্করিণী খনন করা অপেক্ষা এক যজ্ঞানুষ্ঠান করা শ্রেষ্ঠ; শত শত

এইরূপ জ্বলন্ত উদ্দীপনা মহাভারতের নানা স্থানে আছে। এখানেও দেখুন প্রয়োজন হইয়াছিল। জরাসন্ধের কারাগার হইতে ভারতের বীরগণকে উদ্ধার করা, ভারতের সীমান্ত প্রদেশে নূতন দ্বারকা নগর স্থাপন করা, একবার রাজসূয় যজ্ঞকালে সমস্ত ভারতের মিলন, আবার কুরুক্ষেত্রে সেই সমস্ত ভারতের সসৈন্য আগমন ও বলপরীক্ষা, শেষে অশ্বমেধ উদ্দেশে সমস্ত ভারত বিজয় করা প্রভৃতি নানা মহৎকার্য সাধন, প্রয়োজন। যেখানে বহু লোকের প্রবৃত্তি-চালনে প্রয়োজন, সেইখানেই উদ্দীপনার আবশ্যক, এবং প্রয়োজনই প্রয়োজনীয় পদার্থের প্রসূতি।

তাৎকালিক উদ্দীপনা তাৎকালিক মহাকাব্যগ্রন্থে অবশ্যই প্রকাশিত হইবে, ভারতপল্লবিতা উদ্দীপনা-লতার পুষ্প ভারতগ্রন্থে রাশি রাশি রহিয়াছে,—শকুন্তলোপাখ্যানে, নলোপাখ্যানে, ভীষ্মবচনে, ভীমের ভর্ৎসনে, খাণ্ডব-দাহনে, দ্রৌপদীর রোদনে, ভূরি ভূরি বচনে, সেই পুষ্প, এবার মালার মত নয়, স্তূপে স্তূপে রাশীকৃত রহিয়াছে। মহাভারতের পর্বে পর্বে রস। কবিতার রস, উদ্দীপনার রস, দুই রস সমভাবে থাকাতে, মহাভারত এক অপূর্ব গ্রন্থ হইয়া উঠিয়াছে। এইজন্যই ইহাকে মহাপুরাণ বলে—পঞ্চম বেদ বলে।

অতি প্রবল ঝড়ের পর স্বভাব অত্যন্ত শান্তভাব ধারণ করে। দুষ্ট ছেলে-গুলি খানিকক্ষণ মাতামাতি করিয়া, প্রায়ই মায়ের কোলে গিয়া অকাতরে অগাধ নিদ্রা যায়। অতি আয়াসসাধ্য কার্য করিলে পরই, একটু বিশ্রাম করিতে হয়। পর্বাহে, পূজায়, উৎসবে, ব্রতনিয়মে, নামসংকীর্তনে, চান্দ্র আশ্বিন, চান্দ্র

যজ্ঞানুষ্ঠান করা অপেক্ষা এক পুত্র উৎপাদন করা শ্রেষ্ঠ; এবং শত শত পুত্র উৎপাদন অপেক্ষা এক সত্য প্রতিপালন করা শ্রেষ্ঠ। একদিকে সহস্র অশ্বমেধ ও অন্যদিকে এক সত্য রাখিয়া তুলা করিলে, সহস্র-অশ্বমেধ অপেক্ষাও এক সত্যের গুরুত্ব অধিক হয়! হে মহারাজ! সমুদায় বেদ অধ্যয়ন ও সর্ব তীর্থে অবগাহন করিলে, সত্যের সমান হয় কিনা সন্দেহ। যেমন সত্যের সমান ধর্ম নাই, এবং সত্যের সমান উৎকৃষ্ট আর কিছুই নাই, তদ্রূপ মিথ্যার তুল্য অপকৃষ্টও আর কিছু দেখিতে পাওয়া যায় না! হে রাজন্! সত্যই পরব্রহ্ম, সত্যপ্রতিজ্ঞা প্রতিপালন করাই পরমোৎকৃষ্ট ধর্ম, অতএব তুমি সত্য পরিত্যাগ করিও না। আর যদি তুমি মিথ্যানুরাগী হইয়া আমাকে অশ্রদ্ধা কর, তবে আমি আপনি এস্থান হইতে প্রস্থান করিব। তোমার সহিত আর কদাচ আলাপ করিব না, কিন্তু হে দুষ্মন্ত! তোমার অবিদ্যমানে এই পুত্র এই গিরিরাজ-বিরাজিতা সসাগরা বসুন্ধরা অবশ্যই প্রতিপালন করিবে, সন্দেহ নাই।

(কালীপ্রসন্ন সিংহের মহাভারত, ১ম খণ্ড, ১২৪—১২৬)

কার্তিক যাপিত করিয়া, বঙ্গসমাজ একবার চান্দ্র অগ্রহায়ণ, চান্দ্র পৌষ বিশ্রাম করেন। মহরমে দুই প্রহরে মাতনের পর দিন, দিবেন। যিহুদি-বিবরণে, এমন কি, সর্বশক্তিমান ঈশ্বরকেও ছয় দিন জগৎ সৃষ্টি ব্যাপারে নিযুক্ত থাকিয়া, রবিবারে বিশ্রাম করিতে হইয়াছিল। ভারত-ঘটনার পর হিন্দু সমাজ যে দিনকত বিশ্রাম করিবে, তার আর বৈচিত্র কি ? একে প্রাচীন কালের হিন্দু-সমাজ, তাহাতে কুরুক্ষেত্রের যুদ্ধ। হিন্দুজাতি অদ্যাপি সেই ভয়ানক ব্যাপার স্মরণ করিয়া রাখিয়াছে। আজ প্রায় সাড়ে তিন হাজার বৎসর হইল, এই ঘটনা হইয়া গিয়াছে, কিন্তু এমন আমরা পাঁচজনকে একত্র হইয়া, গোলমাল করিতে দেখিলে বলিয়া থাকি, ওখানে ভারি কুরুক্ষেত্র হইতেছে। এই কুরুক্ষেত্র ব্যাপারে বহুসংখ্যক সৈন্যনাশ হইয়া গেল, এখন 'যে হিন্দুসমাজ কতকাল নিদ্রা যাইবে, তাহা কে বলিতে পারে ? যে হিন্দুজাতি, কাষ্ঠ-আহরণকারী ছেদকের শিরেও নিপিড্যমান বৃক্ষ, ছায়া দান করিতে বিরত হয় না, ইত্যাদি উদাহরণ দিয়া "অহিংসা পরমধর্ম" বচনের ব্যাখ্যা করিয়াছে, যে হিন্দুজাতি সুখ অপেক্ষা স্বস্তি ভাল বলিয়া অদ্যাপি উপরতস্পৃহতার উদাহরণ কথায় কথায় দেয়, যে হিন্দুজাতি দৌড়ান চেয়ে দাঁড়ান ভাল, দাঁড়ান অপেক্ষা বসা ভাল, বসা চেয়ে শোয়া ভাল, শোয়া চেয়ে ঘুমান ভাল ইত্যাদি ধারাবাহিক বচননিচয় সৃষ্টি করিয়া, আপনাদের আলস্যপরতন্ত্রতার ভূয়োভূয়ঃ পরিচয় প্রদান করিয়াছে যে হিন্দুজাতি পৌরাণিক শাসন প্রমাণ বিবৃতি জন্য, কেহ বাল্যক্রীড়াকালে কৌতুক-প্রিয়তাবশত শলভপুচ্ছে শলাকা প্রদান করিয়াছিল বলিয়া, তাহার শতজন্ম পরে শত পুত্রের মৃত্যু প্রায়শ্চিত্ত বিধান করিয়া, নিষ্ঠুরতার শাস্তি অবশ্যম্ভাবী এবং অতিশয় গুরুতর বলিয়া প্রতিপন্ন করিয়াছে, যে হিন্দুজাতি অতি সামান্য রক্তপাতকে মহাপাপ বলিয়া গণনা করিয়া গিয়াছে ; সেই হিন্দুজাতি এই ভয়ানক ব্যাপার দেখিল, ভারত বীর্যহীন, ভারত বীরশূন্য, কুরুবংশ লুপ্ত-প্রায়, যদুবংশ লুপ্ত, গৃহবিচ্ছেদে গৃহ দগ্ধ। নির্জীব ভারত ঘুমাইতে লাগিল। সহস্রবর্ষ এইরূপ নিদ্রাভঙ্গ হয় না। পরশুরাম একবিংশবার চেষ্টা করিয়া যে কর্ম করিতে পারেন নাই, ক্ষত্রিয়েরা গৃহবিবাদে সেই কর্ম সম্পন্ন করিলেন। পৃথিবী প্রায় নিঃক্ষত্রিয়া। নিঃক্ষত্রিয় ভারতে ব্রাহ্মণেরা একাধিপত্য বিস্তার করিলেন। এখন আর ব্রাহ্মণগণ কেবল হোতাপোতা, দীক্ষা-শিক্ষাদাতা, শাস্ত্র-প্রণেতা নহেন, তাঁহারা ক্রমে ক্রমে সকল কার্যেই হস্তার্পণ করিলেন। তাঁহারাই এখন সমাজের কর্তা, তাঁহারাই এখন শাসনবিধাতা। সে কঠোর শাসনভারও আমরা এখন মনোক্ষেত্রে বিচিত্র করিতে পারি না। নিঃক্ষত্রিয় ক্লান্ত ভারত সেই কঠোর শাসনে অবসন্ন হইয়া রহিল।

হিন্দু সমাজ পূর্ব হইতেই যন্ত্রের ন্যায় চলিতেছিল। এখন সেই সমাজের এক দল পৃথক হইয়া যন্ত্রচালক হইল। বিপ্রবর্ণ যন্ত্রচালকের কর্মে অভিষিক্ত হইয়া কেবল যন্ত্রচালনাতেই সময় যাপন করিতে লাগিলেন। তাঁহাদের পূর্বের সেই শান্তভাব, সেই বিশুদ্ধভাব, একটু অপূর্ব পারলৌকিক ভাব, ঐহিক চিন্তা অবিচলিত ভাব হারাইলেন। কলচালনেই ব্যস্ত, কঠোর নিয়ম সমস্ত প্রচার করিলেন। ছায়াবাজীর পুতুলের যে স্বাধীনতা আছে, হিন্দু সমাজের সে স্বাধীনতাটুকুও রহিল না। ছায়াবাজীর পুতুলের আকর্ষণীয় রজ্জু ক্ষণমাত্রের জন্যও ছিন্ন হইলে, পুতুল তখন আর চালকের আয়ত্তাধীন নহে। কিন্তু এ শাসন, এ ব্যবস্থা এমনি সুকৌশলযুক্ত, যদি একটির আকর্ষণী রজ্জু ছিঁড়িল, আর-একটি আসিয়া তাহা বাঁধিয়া দিল।

প্রত্যেক দিনের রাত্রির শেষ ছয়দণ্ড হইতে পর দিন রাত্রি প্রহরৈক পর্যন্ত এক নিয়ম, ; প্রত্যেক চান্দ্র মাসের অমাবস্যা হইতে পূর্ণিমা, পূর্ণিমা হইতে চতুর্দশী তিথি নিয়ম; সপ্তাহের প্রত্যেক বারের এই এই ক্রিয়া ; সূর্যসংক্রমণে এই নিয়ম ; উত্তরায়ণে এই ; দক্ষিণায়নে এই ; বিশেষ চতুর্মাসে এই ; মলমাসে এই ; বর্ষগতিতে এইরূপ : মাতৃগর্ভে অঙ্কুরসংস্থাপন অবধি, শবদাহের পর বর্ষৈক কাল পর্যন্ত শুদ্ধ যাবজ্জীবন নয়, যাবজ্জীবনের মাথায় একটি চূড়া, পায়ে পাদুকা, এই আগা পিছা বাড়ান যাবজ্জীবনে এই এই সংস্কার ; এই বর্ষক্রিয়া ; ঋতুকলাপ ; মাসবিধি ; দৈনিক কর্ম ; প্রতি প্রহরের পদ্ধতি ; প্রতিক্ষণে এই করিতে হইবে ; এইগুলি দোষাচার ; এইগুলি কুলাচার ; এইটি এই বংশের রীতি ; এটি গোত্রের পদ্ধতি ; এ শাখার এইটি ধর্মশাস্ত্র : এইরূপে জন্ম লইতে হবে, এইভাবে জন্ম দিতে হবে। এই প্রকারে কাঁদিতে হবে, এইরূপে মরিতে হবে, এটি খাবে, এটি খাবে না, এখানে এখানে এই ভাবে বসিবে, এতক্ষণ ধ্যান করিবে, হিন্দুশাস্ত্র পালনের হিন্দু সমাজ, হিন্দু সমাজের রক্ষা বা উন্নতির জন্য হিন্দুশাস্ত্র নহে। তোমার প্রত্যহ পঞ্চ অতিথি ব্রাহ্মণ সেবা করা কর্তব্য, তুমি চারি জনের অধিকের সেবা করিতে পারিলে না, তোমার প্রায়শ্চিত্ত মাঘী পূর্ণিমাতে পাঁচটি তুষারধবল বৎস, পঞ্চ ব্রাহ্মণে দান করা। পাঁচটি বৎসই তুষারধবল হয় নাই উত্তম : ইহার জন্য প্রায়শ্চিত্ত শতৈক বার গায়ত্রী জপ করিয়া অষ্টোত্তর শতনিষ্ক ব্রাহ্মণে দান। গায়ত্রীজপকালে ছন্দোভঙ্গ হইয়াছে ; বেশ, ইহার প্রায়শ্চিত্ত ত্র্যহ উপবাসপূর্বক গোদাবরী নদীতে স্নাত হইয়া অষ্টাবিংশ স্নাতক বিপ্রে শুভ্র বস্ত্র দান; গোদাবরী স্নানকালে জীবিত শম্বুকপৃষ্ঠে তোমার পদস্পর্শ হইয়াছে। ভাল, ইহার জন্য

প্রায়শ্চিত্ত দক্ষিণারণ্যে অষ্টাশীতি ব্রাহ্মণ ভোজন। ২৩ নম্বরের পুতুলের দক্ষিণ হস্তের তার ছিঁড়িয়া গেল, ৫৭ নম্বরের পুতুল আসিয়া বাঁধিয়া দিতেছে। সে বাঁধিতেছে, তাহার ঘর্ম হইতেছে, ২৬৮ সংখ্যার পুতুল বাতাস করিতেছে। ৩নং পুত্তলিকা সেই বাতাস করা ভাল করে হইতেছে কিনা, তাহাই দেখিতে-ছিল, ঐ ২৩ নম্বরের হাতের তার বাঁধা হইবামাত্র তাহাকে বিবাহ করিয়া লইয়া গেল। এইরূপে ঋষিদিগের, শাখাবর্তাদিগের কাল্পনিক গাঁথনির উপর গাঁথনিতে এক বৃহৎ মায়াময় অট্টালিকা হইল। উপবাসে, জপে, জাগরণে, নিত্যকর্মপালনে, কঠোর শাসনে লোক ব্যতিব্যস্ত হইয়া উঠিল। যাজনক্রিয়ার একায়ত্তকারী ব্রাহ্মণ জাতির উপর সাধারণের দিন দিন অশ্রদ্ধা হইতে লাগিল। বিপ্রজাতির মধ্যবর্তিতা অবহেলা করিয়া লোকে যে ভক্তিতে ভগবানকে ভজিয়া চরিতার্থতা লাভ করিবে, তাহারও উপায় ছিল না। শাস্ত্রবিচ্যুত জাতিদিগকে স্পর্শন বা শুদ্ধ দর্শন করিলেও মহাপাপ, এই সংস্কার অনেকের মনে হওয়াতে তাহারা ঘৃণিত হইয়া, কদর্য বিষাক্ত সরীসৃপের ন্যায়, ধরণীবিবরে, পর্বতগহ্বরে বাস করিতে লাগিল।

ব্রাহ্মণগণ শাসনরজ্জু ক্রমেই পেঁচাও করিয়া অসংখ্য ফাঁস লোকের গলে, বক্ষে, হস্তপদে, করাঙ্গুলিতে, পদাঙ্গুলিতে দিয়া, দুজনে দুজনে ফাঁস জড়াইয়া, দশ জনে দশ জনে ফাঁস জড়াইয়া, জাতিতে জাতিতে ফাঁস জড়াইয়া, সমস্ত হিন্দুসমাজ এক বড় ফাঁসে জড়াইয়া, রজ্জুর দুই মুখ একত্র করিয়া, আপনারা ধরিয়া বসিয়া, কেবল দড়ি পাকাইতে লাগিলেন ; একটু টান পড়ে, আর তৈয়ারি দড়ি গেরো দিয়ে বাড়াইয়া দেন। কুরুক্ষেত্রের পর ভারতের এক বিশ্রামপ্রবৃত্তি হইয়াছিল, তাহাতে দৃঢ় নিয়মবিষ সমাজের শাখায় পাতায়, শিরে শিরে প্রবেশ করিয়া, লোকের মস্তকে, মস্তিষ্কে, কেশে, অস্থির মধ্যগত মজ্জাতে প্রবেশ করিয়া সব একবারে জ্বর জ্বর করিয়া রাখিল।

এই সময়ে নবমাবতার বুদ্ধদেব জন্মগ্রহণ করিলেন। তাঁহাকে ঐ সমস্ত বিপদ জঞ্জাল দূরীভূত করিতে হইবে। এক-এক গাছি করিয়া তার ছিঁড়িলে এ কার্য হইবে না, আর-একজন আসিয়া বাঁধিয়া দিবে, অর্ধেকের চেয়ে বেশী দড়ি একবারে ছিঁড়া চাই। ফাঁসের দড়িতে একটু একটু করিয়া টান দিলে তো হইবে না। মাঝখানে এমন একটি আঘাত করা চাই যে, সেই আঘাতে লোক এমন বেগে ছড়াইয়া পড়িবে যে, ব্রাহ্মণের হাত হইতে বাঁধনের দুইমুখ খুলিয়া যাইবে, সে মুখ তাঁহারা ধরিতেও পারিবেন না, অথচ নূতন দড়ি পাকাইয়া জোড় দিয়াও আর বাঁধন রাখিতে পারিবেন না।

বুদ্ধদেব তাহাই করিয়াছিলেন। তিনি এক বিরাট আঘাতে সমস্ত তার

খণ্ড খণ্ড করিয়াছিলেন। তিনি এই অবসন্ন, দিন দিন জড়ীভূত সমাজ-কেন্দ্রে এমনই একটি গুরুতর কেন্দ্রবিয়োজক বলপ্রয়োগ করিলেন যে, ব্রাহ্মণদের কঠোর শাসন একেবারে ছিন্নভিন্ন হইয়া গেল। সেই বেগ প্রাচীন হিন্দু সমাজের বন্ধন ছিন্ন করিয়াই পর্যবসিত হইল না; ভারত সাগরের ঊর্মিসঙ্কুল নীল জলরাশি তাহার গতিরোধ করিতে পারিল না, হিমালয়ের তুষারাবৃত শুভ্র শিখরশ্রেণী সেই বেগের প্রতিবন্ধক হইতে পারিল না। বাহ্লীক, লাডক, তিব্বত, তাতার, চীন, মহাচীনে, ব্রহ্ম, সুহ্ম, মলয়ক, কোচীনে; যব, বলি, সুমাত্রা, সিংহল দ্বীপে সেই বেগ চালিত হইল; সমস্ত পূর্ব আশিয়া জীবিত হইল। নববর্ষের মধ্যে পঞ্চবর্ষ নব ভাব ধারণ করিল। শাক্যমুনি ব্রাহ্মণদিগের সেই মায়াময় অট্টালিকা চূর্ণীকৃত ও ভূমিসাৎ করিয়াই ক্ষান্ত হয়েন নাই। তিনি সেই চূর্ণীকৃত অট্টালিকার উপকরণ লইয়া, একটি অপূর্ব সুদৃশ্য হর্ম প্রস্তুত করাইয়াছিলেন। তিনি রবসপিয়ারের ন্যায় হিন্দু সমাজকে একেবারে অধঃপাতে দিয়া, অতলে ডুবাইয়া, গভীর রসাতলে সমাজের সমস্ত কলঙ্ক কচলাইয়া ধুইয়া, সেইখানে তাহার দোষ ক্ষালন করিয়া, আবার নেপোলিয়ানের ন্যায় হিন্দু সমাজকে উন্নত পদবীতে প্রতিষ্ঠিত করিলেন। সামান্য কথায় বলে ভাঙ্গা সহজ, কিন্তু গড়া কঠিন। বাস্তবিক ভাঙ্গা তত সহজ নহে; ভাল পাকা মজবুত গাঁথনি ভাঙ্গা অত্যন্ত কষ্টকর, অতীব আয়াসসাধ্য এবং সময়ে সময়ে হয়ত একেবারেই দুঃসাধ্য। অতি কাঁচা গাঁথনি ভাঙ্গা আবার যেমন সহজ, তেমনি বিপদ-পরিপূর্ণ; অনেকে ভাঙ্গিতে গিয়া চাপা পড়িয়া মারা গিয়াছে। আবার এমন গাঁথনি আছে যে, খানিক অত্যন্ত শিথিল, খানিক অত্যন্ত দৃঢ়বদ্ধ। সেগুলি ভাঙ্গা সর্বাপেক্ষা কঠিন কার্য। শাক্যসিংহ হিন্দু সমাজের গাঁথনি যেমন ভাঙ্গিয়া ছিলেন, অচিরাৎ তেমনি একটি পাকা গাঁথনির সুবৃহৎ সমাজ নির্মাণ করিয়াছিলেন। এই কার্যটি যেমন সুমহৎ, তেমনি সুকঠিন। সিদ্ধার্থ উদ্দীপনার সাহায্যেই সমাজ-সংস্করণে সফলার্থ হয়েন। তাঁহার জীবনবৃত্তান্তে তাহা আমরা স্পষ্টরূপে দেখিতে পাই। তিনি ভারতবর্ষের আর্যাবর্তের নানাস্থান পর্যটন করেন; সকল স্থানই তাঁহার উদ্দীপনাতে মাতিয়া উঠে। শাক্যসিংহ মগধরাজ অজাতশত্রু, কোশলরাজ প্রসেনজিৎ ও কাশীরাজ, এই তিনজন অতিপ্রতাপশালী নরপতিকে স্বীয় মতাবলম্বী করেন। তিনি কালান্তক ধর্মশালায় কয়েক বৎসর ক্রমাগত স্বীয় মত বিস্তার করেন। তিনি এক জীবনে লক্ষ লক্ষ লোককে স্বীয় মতাবলম্বী করিয়া লোকযাত্রা সংবরণ করেন। আর্যধর্ম

ধ্বংসকারী নিজ অসীম ক্ষমতাবলে পৌরাণিক অবতার হইলেন। পৃথিবীর* অর্ধেক লোক তাঁহাকে দেবতা বলিয়া ভক্তি করে।

অদ্যাপি পৃথিবীর তিনভাগের একভাগ লোক তাঁহাকে ফো, বোধ, গডামা, মহৎলামা, বুদ্ধ প্রভৃতি নানা অভিধানে ঈশ্বরত্বে অভিষিক্ত রাখিয়াছে। অদ্যাপি হিন্দুরা তাঁহাকে নবমাবতার জানিয়া ভক্তি করিতেছে। অদ্যাপি শ্রীক্ষেত্রে তিনিই জগন্নাথ মূর্তিতে বিরাজিত থাকিয়া, ব্রাহ্মণ প্রতিষ্ঠিত হিন্দুয়ানির সার স্বরূপ জাতিভেদ সংঘটিত অন্ন-বিচার লোপ করিয়া, হিন্দুয়ানির সার হরণ করিতেছেন। অদ্যাপি তৎপ্রচারিত ধর্মপদ কঠোর নাস্তিকের পর্যন্ত হৃদয় আকর্ষণ করিতেছে। পৃথিবীর মধ্যে দুজন অমানুষ মানুষের নাম করিতে হইলে, যীশুখ্রীষ্টের সঙ্গে তাঁহারই নাম করিতে হয়।

আর্যচরিত এতদূর পর্যন্ত আলোচনা করিয়া, আমরা বেশ বুঝিতে পারিতেছি যে, ভারতবর্ষে উদ্দীপনা মহাসাগরে চরের ন্যায় মধ্যে মধ্যে দেখিতে পাওয়া যায় মাত্র। তিন সহস্র বৎসর মধ্যে আমরা উদ্দীপনা বিস্তারিত হইতে তিন-বার দেখিয়াছি মাত্র। কিন্তু বুদ্ধদেব যে লতা বর্ধিতা করেন, তাহা অনেক দিন পর্যন্ত জীবিতা ছিল। বুদ্ধের মৃত্যুর অব্যবহিত পরেই দেখিতে পাওয়া যায়, যে মৌদ্গলায়ন সারিপুত্র প্রভৃতি তাঁহার শিষ্যগণ ভারতের নানা স্থানে পর্যটন করিয়া হিমালয় প্রদেশ পর্যন্ত বৌদ্ধধর্ম সংস্থাপন করিতেছিলেন। নানা বৌদ্ধ-গ্রন্থে তাঁহাদের উপদেশবৃত্তান্ত বর্ণিত আছে।

শাক্যসিংহের মৃত্যুর পর সহস্র বৎসর ভারতবর্ষ অত্যন্ত সমৃদ্ধিশালী ছিল। ভারত-সৌভাগ্য, চতুষ্পাদপরিমিত হইয়াছিল। সে সৌভাগ্যসূর্য কিরূপে অস্তগত হয় ; শঙ্করদিগ্বিজয়ে আমাদের কত ক্ষতি হইয়াছে, তাহা বর্ণনা করা এ প্রবন্ধের অভিপ্রেত নহে। প্রাচীন ভারতে উদ্দীপনা ছিল না, ইহাই দেখান আমাদের উদ্দেশ্য ছিল। আমরা তাহাই দেখাইবার চেষ্টা করিয়াছি। মহা-সাগর যেমন জলময়, ভারত তেমনই কবিতাময়। মহাসাগরে দ্বীপ আছে, ভারতেও সেইরূপ উদ্দীপনা ছিল। এক্ষণে প্রবন্ধের সার কথাগুলি সংহতভাবে প্রদর্শন করিয়া, কোন মহাত্মা যদি এতদূর পাঠ করিয়া থাকেন, তবে আমরা তাঁহাকে তজ্জন্য ধন্যবাদ প্রদান করিয়া উপসংহার করিতেছি।

আমাদের কি ছিল না, তাহা দেখা উচিত। প্রাচীন ভারতে উদ্দীপনা ছিল না। যদ্দ্বারা পরের মনোবৃত্তির সঞ্চালন, ধর্মপ্রবৃত্তি উত্তেজন, অন্যের মনে রস উদ্ভাবন করা, বা অন্যকে কার্যে লওয়ান যায়, তাহাকে উদ্দীপনাশক্তি বলে।

* পৃথিবীর লোকসংখ্যা ১০০ বলিলে প্রায় ১৬ জন হিন্দু ও ৩২ জন বৌদ্ধ হয়, সুতরাং ১০০এর মধ্যে ৪৮ জন বুদ্ধের দেবত্ব স্বীকার করে।

উদ্দীপনা কবিতা হইতে পৃথক। কবিতা রসাত্মিকা আত্মগতা কথা। উদ্দীপনা অন্যোদ্দেশ্য, রসাত্মিকা কথা। নির্জনে চিন্তাই কবিতার প্রসূতি, অন্য লোকের সহিত আলাপেই উদ্দীপনার জন্ম হয়। ভাল থাকিলেই মন্দ আছে; নির্জনে চিন্তায় অধিক কবিতা হইল; উদ্দীপনা অতি অল্পমাত্র হইল; তাহাতে ভারতবর্ষীয়েরা স্বতঃসন্তুষ্ট জাতি। ভারতের সমাজভাগ ভূগোলভাগের মত। ভারতবর্ষীয়ের জীবন, স্রোতের ন্যায়; আবার তাহাতে স্বভাবজ কোন পদার্থেরই অভাব নাই। কাহারও বিশেষ সাহায্যের আবশ্যকতা নাই, সুতরাং উদ্দীপনা কোথা হইতে হইবে? অভাব না থাকিলেও মানুষ কবি হইতে পারে, সাধারণ সুখ-দুঃখ-বোধ থাকিলেই কবি। কিন্তু উদ্দীপনা বিশেষ ঘটনায় বিশেষ রূপে পরিবর্ধিতা হয়। প্রাচীন ভারতে তিন সহস্র বৎসরের মধ্যে আমরা দ্বীপের ন্যায় উদ্দীপনাপ্রবল কাল তিনবার মাত্র দেখিতে পাই। পরের ঘটনাবলী আমাদের আলোচ্য বিষয় নহে। এত বিস্তৃত ভাবে পুরাবৃত্ত আলোচনার উদ্দেশ্য এই যে, কিরূপ মৃত্তিকায়, কিরূপ জলবায়ুতে উদ্দীপনা-লতা বর্ধিত হইয়াছিল, তাহা না জানিলে আমরা কখনই উদ্দীপনা-রোপণী কৃষিবৃত্তিতে সফলতা লাভ করিতে পারিব না। সেই উদ্দীপনা রোপণ করাও এ সময়ে বিশেষ আবশ্যক।

বৈশাখ-জ্যৈষ্ঠ ১২৭৯

রসিকতা

অনেক কবি, দার্শনিক এবং অন্যান্য মহাত্মাগণ "সুখ কি?" এতদ্বিষয়ে মীমাংসার জন্য বিশেষ যত্ন করিয়াছেন, কিন্তু কেহই কৃতকার্য হইতে পারেন নাই। আমরা অনেক ভাবিয়া চিন্তিয়া স্থির করিয়াছি যে রসিকতা প্রকাশ করাতেই মনুষ্যের সুখ। নচেৎ রসিকতা করিবার জন্য লোকে এত অস্থির হইবে কেন? ধনের চেষ্টায় সকলেই ব্যস্ত বটে, কিন্তু আমরা স্থির সিদ্ধান্ত করিয়াছি যে, রসিক বলিয়া নাম কিনিবার জন্য লোকে যেমন উদ্যোগী, ধনী বলিয়া খ্যাতি লাভ করিবার জন্য কেহ তত নহে। অনেকেই স্বীকার করে, "আমি নির্ধন।" "আমি গরিব—আমি দিতে কোথায় পাইব?"—"আমি কাঙ্গাল, আমার উপর এ দৌরাত্ম্য করিও না", এইরূপ কথা কাহার মুখে শুনিতে না পাওয়া যায়? কিন্তু কে কোথায় কবে কাহার কাছে স্বীকার করিয়াছে যে,

"মহাশয়, আমি অরসিক ?" কে কোথায় কবে বলিয়াছেন, মহাশয় আমি অরসিক, আমার সঙ্গে হাস্যপরিহাস করিবেন না,—কে কোথায় কবে ভাবিয়াছে যে, আমার কথায় রস নাই—আমি আর রসিকতা ছড়াইবার চেষ্টা করিব না ? কে না উপযুক্ত লোক দেখিলেই আপনার রসিকতার পরিচয় দিবার জন্য ব্যতিব্যস্ত হয় ? কেহ কাহার সঙ্গে কথোপকথনে প্রবৃত্ত হইলে, আপনার ঐশ্বর্যের বা বিদ্যাবত্তার বা যশস্বিতার বা অন্য গুণের পরিচয় দিবার জন্য তাদৃশ ব্যস্ত হয় না, কিন্তু রহস্য উত্থাপন করিয়া রসিকতার পরিচয় দিবার জন্য সকলেই শশব্যস্ত।

অধুনাতন বাঙ্গালী মহলে রসিকতার অত্যন্ত দৌরাত্ম্য আরম্ভ হইয়াছে। "তামাসা", "ঠাট্টা", "ইয়ারকি", "রং", "মজা" ইত্যাদি বিবিধ নামে, রসিকতা বঙ্গদেশে একাধিপত্য করিতেছে। বরং কথোপকথনে কিছু নিস্তার আছে। সম্বন্ধবিরুদ্ধ লোকের কাছে বা শোকদুঃখাদির সময়ে বা বিষয়কর্মের সময়ে অনেক বাঁচাইয়া চলেন। কিন্তু লেখকদিগের নিকট কিছুতেই নিস্তার নাই। সুসময়ে, অসময়ে ; সৎকথায়, কুকথায় ; যেখানে সেখানে ; যখন তখন রসিকতা করা আজিকালি কতকগুলিন লেখকের ব্যবসায়।

এমত বলি না যে, সকল লেখকই রসিকতা-ব্যবসায়ী। কতকগুলিন লেখক বড় বিজ্ঞ। তাঁহারা রসিকতার প্রতি বড় অপ্রসন্ন। তাঁহাদের ধারণা আছে যে, পুত্রশোকাতুরের ন্যায় অনবরত মুখ দীর্ঘীকৃত করিয়া রাখাই পাণ্ডিত্য। রসিকতার সংস্পর্শ মাত্র দুরপনেয় কলঙ্কের কারণ। তাঁহাদের কাছে রসিকতার নাম গ্রাম্যতা। সে পাপের প্রায়শ্চিত্ত নাই। অধিকাংশ সাপ্তাহিক লেখক এই-সম্প্রদায়ভুক্ত।

অপর সম্প্রদায়ে অন্য কাজ নাই ; কেবল প্রাণপণে রসিকতা করাই কাজ। প্রথম সম্প্রদায় কৃষ্ণযাত্রার মুনি গোঁসাই, দ্বিতীয় বাসদেব। এক সম্প্রদায় শ্বেত-শ্মশ্রু, জটা এবং বিজ্ঞতা লইয়া ব্যস্ত, রসিকতায় বড় বিরক্ত। কিন্তু দ্বিতীয় সম্প্রদায় তাহা মানে না ; নিয়ত রসিকতা করিবার জন্য অস্থির, সুতরাং মুনি গোঁসায়ের বিজ্ঞতা উচ্ছৃঙ্খল হইয়া যায়। বাসদেবদিগের রসিকতা সকল সময়ে সরস হয় না,—না হউক—রসিকতা করিতে হইবে। রচনা সরস হউক বা নীরস হউক—তাহাতে কেহ হাসুক বা না হাসুক—তাঁহারা রসিকতা করিবেন। রসিকতার কথার অনুরোধে সত্যকে মিথ্যা করিতে হয়, তাহাও স্বীকার ; নিন্দনীয়কে পূজা করিতে হয়, বা পূজ্যকে নিন্দা করিতে হয়, তাহাতেও ক্ষতি নাই ; রসিকতার স্রোতঃ না মন্দ পড়ে। পূর্বে এ শ্রেণীর লেখক এদেশে সচরাচর দেখা যাইত না। পাঁচালি এবং কবিওয়ালা ও যাত্রার

দলে ইহার প্রাদুর্ভাব ছিল। কুক্ষণে হুতোম পেঁচার নক্‌সা এদেশে প্রচার হইল। সেই পর্যন্ত এই লেখকগুলির রসিকতায় দেশ প্লাবিত হইতেছে।

রসিকতা, বাচনিক হউক বা লিখিত হউক, সর্বত্র সমান প্রকৃতি দেখা যায়। প্রচলিত রসিকতা নানাপ্রকার।

প্রথম, প্রাচীন রসিকতা। কেহ কাহাকে সম্বন্ধনিষিদ্ধ কোন দোষারোপ করিতে পারিলেই আপনাকে রসিকতায় পারদর্শী বিবেচনা করেন। এইপ্রকার রসিকতা প্রাচীন সম্প্রদায়ের মধ্যেই বিশেষ আদৃত। বৃদ্ধ গাঙ্গুলি মহাশয়, যদি কোন প্রকারে ইঙ্গিত করিতে পারিলেন যে, রাম শ্বাশুড়ে, কি যদু বউও, তবেই তিনি সেদিনের মত, রসিকতার জয়পতাকা বাঁধিলেন।

ইহারই সম্প্রসারণে দ্বিতীয় প্রকারের রসিকতার সৃষ্টি। কেহ কাহাকে যে-কোন প্রকারে গালি দিলেই মনে কবেন যে, আমি বিশেষ রসিকতা করিলাম। পরের মাতৃ-পিতৃ প্রভৃতি সম্বন্ধে কদর্য কথা বলিতে পারিলেই এরূপ রসিকতার চরম হইল। সুতরাং গ্রাম্য বালকেরা এইরূপ রসিকতায় সর্বাপেক্ষা সুপণ্ডিত! হুতোম পেঁচার অনুকরণে ব্রতী লেখকেরা প্রায় তাহাদের কাছে কাছে যান।

তৃতীয় শ্রেণীর রসিকেরা রসিকচূড়ামণি। অশ্লীলতাই তাঁহাদের কাছে রসিকতা। কোনক্রমে অনুচ্চার্য কোন কথা ব্যক্ত করিতে পারিলেই, তাঁহারা রসিকতার একশেষ করিলেন। যাহা ভদ্রের অশ্রাব্য বা অপাঠ্য, এবং সুনীতির বিনাশক, তাহাই তাঁহাদের কাছে রসিকতা। কথাগুলি স্পষ্ট বলিতে পারিলেই তাঁহাদের মনের মত রস ছড়ানো হয়, কিন্তু আইনের দৌরাত্ম্যে কেবল ইঙ্গিতে রসিকতা করিয়াই অনেককে ক্ষান্ত থাকিতে হয়।

আর-এক প্রকারের রসিকতা কেবল চাপল্যমাত্র। গ্রাম্য ইতর ভাষায় তাহার নাম "ঝাপাই ঝোড়া"। অনবরত মুখভঙ্গী, নিয়ত হস্তপদসঞ্চালন, দিবারাত্র হাসিবার এবং হাসাইবার নিষ্ফল উদ্যম—এই রসিকতার সামগ্রী। যাত্রার "ভুলুয়া" এবং "মটরূ" এই সকল শ্রেণীর রসিকদিগের আদর্শ। যে ব্যক্তি মুখে মুখে এইরূপ রসিকতা করিবার জন্য কষ্ট করে, তাহার দুঃখ দেখিয়া দুঃখ হয়, রাগ হয় না। কিন্তু যে সকল লেখক এরূপ ভুলুয়াগিরিতে প্রবৃত্ত, তাহাদের রসিকতা অসহ্য। আধুনিক নাটক-লেখকদিগের মধ্যে অধিকাংশ, এবং হুতোম সম্প্রদায়ের মধ্যে অনেকে এই শ্রেণীর রসিক। রসিকতা করিবার জন্য তাহারা অত্যন্ত অস্থির; দন্ত সর্বদাই বহিষ্কৃত; অঙ্গভঙ্গীর বিরাম নাই; চক্ষুর নানা-রূপ বিকৃতি; কিন্তু রসিকতার উপকরণের মধ্যে কতকগুলিন নীরস, অসংলগ্ন, অর্থশূন্য ইতর কথা। তাঁহাদের গ্রন্থে একটু একটু তাড়িখানার গন্ধ থাকে।

আষাঢ় ১২৭৯

অশ্লীলতা

কলিকাতায় একটি অশ্লীলতা নিবারণী সভা সংস্থাপিত হইয়াছে। আমরা বিস্মিত হইলাম যে অধিকাংশ বাঙ্গালা সংবাদপত্র এই সভার বিরোধী।

যাঁহারা এই সভা সম্বন্ধে অভিপ্রায় প্রকাশ করিয়াছেন, তাঁহারা তিন শ্রেণীতে বিভক্ত হইতে পারেন। যথা—

১ম। কতকগুলি পত্র ইহার অনুমোদন করেন। তাঁহারা সংখ্যায় অল্প, এবং হয় ব্রাহ্ম বা খ্রীষ্টধর্মাবলম্বী বলিয়া পরিচিত।

২য়। কতকগুলি পত্র, বিবেচনা করেন, এরূপ সভার উদ্দেশ্য উত্তম বটে, কিন্তু ইহার দ্বারা সে উদ্দেশ্য সিদ্ধির সম্ভাবনা নাই, বরং ইহার দ্বারা অনিষ্ট ঘটিতে পারে। বাঙ্গালির সর্বপ্রধান সংবাদপত্র হিন্দু পেট্রিয়ট এই মতাবলম্বী।

৩য়। দ্বিতীয় শ্রেণীর পত্রসকল অশ্লীলতাপ্রিয় নহেন, বরং অশ্লীলতা-দ্বেষী, এবং সুসভ্যতা ও সুনীতির পরিপোষক। তাঁহারা যথার্থই এ সভার দ্বারা অনিষ্টোৎপাতের আশঙ্কা করেন বলিয়া, ইহার অনুমোদনে বিরত। কিন্তু আর-এক শ্রেণীর পত্র আছে—তাহারা অশ্লীলতাপ্রিয়। অশ্লীলতা এবং অসভ্যতা তাহাদিগের ব্যবসায়—এবং ব্যবসায়হানির আশঙ্কাতেই তাহারা এ এ সভার বিদ্বেষী।

তৃতীয় শ্রেণীর সংবাদপত্রের কথার উল্লেখ পর্যন্ত অনাবশ্যক, কেন না, কেহ তাঁহাদিগের কথা শুনিবে না। দ্বিতীয় শ্রেণীর আপত্তিসকল ভঞ্জনের যোগ্য বটে, কিন্তু আমরা সে চেষ্টা পাইব না। তাহা আমাদের উদ্দেশ্য নহে। যাঁহারা এই সভা সংস্থাপিত করিয়াছেন, তাঁহাদিগকে ধন্যবাদ করাই আমাদের উদ্দেশ্য।

ইহা সত্য বটে যে অশ্লীলতা নিবারণী সভা যদি সদ্বিবেচনা এবং ধীরতার সহিত কার্য না করেন, তবে তাঁহাদিগের উদ্দেশ্য বিফল হইবে, বরং অনিষ্ট-পাতের সম্ভাবনা। কিন্তু এমত কোন চিহ্ন এ পর্যন্ত পাওয়া যায় নাই যে, এ সভার কার্য সদ্বিবেচনা এবং ধীরতার সহিত সম্পন্ন হইবে না। যত দিন না সেরূপ কোন চিহ্ন পাওয়া যায়, ততদিন ইঁহাদিগের বিরুদ্ধাচরণ করা অন্যায়। দোষ না দেখিয়া দোষী বলিয়া নিন্দা করা অন্যায়। যত দিন দোষ না দেখা যায়, ততদিন এরূপ কার্যের অনুমোদন করাই কর্তব্য।

অশ্লীলতা বঙ্গদেশীয়দিগের জাতীয় রোগ বলিলে অত্যুক্তি হয় না। যাঁহারা ইহা অত্যুক্তি বিবেচনা করিবেন তাঁহারা বাঙ্গালির রহস্য, বাঙ্গালির

গালি, নিম্নশ্রেণীর বাঙ্গালি স্ত্রীলোকের কোন্দল, এবং বাঙ্গালির যাত্রা কবি পাঁচালী মনে ভাবিয়া দেখুন। মুহূর্তজন্য বাঙ্গালি কৃষকের কথোপকথন শ্রবণ করিয়া দেখুন—বাঙ্গালির প্রণীত যে সকল কাব্যগ্রন্থ সর্বোৎকৃষ্ট বলিয়া খ্যাত তাহা পাঠ করিয়া দেখুন। বাঙ্গালির চরিত্রে অশ্লীলতার ন্যায় কোন দোষই সর্বব্যাপী নহে। যাঁহারা এরূপ বদ্ধমূল দোষের বিলোপের উদ্যোগ করিতেছেন, তাঁহাদের যত্ন বিফল হইবার সম্ভাবনা আছে বটে, কিন্তু তাঁহারা সাধুবাদ এবং সহায়তার পাত্র সন্দেহ নাই।

কেহ মনে করিতে পারেন যে, অশ্লীলতা এবং অসভ্যতা, অজ্ঞানের ফল। দেশে যত বিদ্যালোচনার বৃদ্ধি হইতে থাকিবে, দেশ যত অন্যান্য বিষয়ে সভ্যতার বিষয়ে উঠিবে, তত স্বতঃই অশ্লীলতার হ্রাস হইবে। যদি ইহা সত্য হইত, তবে আমরা অশ্লীলতা নিবারণী সভার অনুমোদন করিতাম না। বলিতাম যে ইহার নিবারণ জন্য এত উদ্যমের প্রয়োজন নাই—আপনিই যাইবে। বহুবিবাহ সম্বন্ধে অনেকে বলেন যে, ইহা স্বতঃই নিবৃত্তি পাইবে। বঙ্গদর্শনেও ঐরূপ অভিপ্রায় প্রকাশিত হইয়াছিল। অশ্লীলতা সম্বন্ধে কি ঐরূপ বলা যাইতে পারে না?

তাহা বলা যায় না। জ্ঞানালোকসহকারে অশ্লীলতার দিন দিন হ্রাস দূরে থাকুক, বৃদ্ধি দেখিতে পাওয়া যাইতেছে। এখন, এমন অনেক সংবাদপত্র ও পুস্তক দেখিতে পাই যে, তাদৃশ অশ্লীল পত্র বা পুস্তক পাঁচ-সাত বৎসর পূর্বে কোথাও দেখা যাইত না। এ সকল পত্র বা পুস্তক অবশ্য অনেকের দ্বারা পঠিত হয়, নচেৎ লুপ্ত হইত। অতএব অশ্লীলতাপ্রিয় পাঠকদিগের সংখ্যা যে দিন দিন বৃদ্ধি হইতেছে তাহাতে সংশয় নাই। এক্ষণকার কতকগুলি পুস্তক ও পত্রের যে ভয়ানক অবস্থা তাহাতে আমরা তাঁহাদিগের রুচির সঙ্গে পূর্বকালের কবিওয়ালা ও পাঁচালিওয়ালাদিগের কোন প্রভেদ দেখিতে পাই না। প্রভেদের মধ্যে এই যে এখন দণ্ডবিধির আইনে অশ্লীলতার দণ্ডের জন্য একটি ধারা আছে, পূর্বে সেরূপ বিধান ছিল না। সুতরাং এক্ষণকার অশ্লীলতা কিছু অস্পষ্ট, পূর্বেকার অশ্লীলতা স্পষ্ট। ভাবের কদর্যতা একই প্রকার।

একদিন এমন ভরসা হইয়াছিল বটে যে অশ্লীলতা কিছু কমিতেছে। ব্রাহ্ম সমাজ, তত্ত্ববোধিনী পত্রিকার বিশুদ্ধ লিপিপ্রণালী, বিদ্যাসাগর মহাশয়ের বিশুদ্ধ লিপিপ্রণালী, লং সাহেবের যত্ন, ইত্যাদি কারণেই কমিতেছিল বোধ হয়। এক্ষণে ক্রমশঃ হ্রাস না পাইয়া অশ্লীলতা বৃদ্ধি পাইতেছে। ইহার কারণ কি?

ইহার কারণ, আমাদের বিবেচনায়, সামান্য শিক্ষার বৃদ্ধি। এ আশ্চর্য কথা বটে যে শিক্ষাবৃদ্ধিতে দুর্নীতির বৃদ্ধি হয়, এবং আপাততঃ একথা যে

অশ্রদ্ধেয় বোধ হইবে, ইহা আমরা স্বীকার করি। ইহাও স্বীকার করি যে, সামান্য শিক্ষা হইলেও, শিক্ষার বৃদ্ধিতে সচরাচর অশ্লীলতা বা অন্য প্রকার দুর্নীতির বৃদ্ধি সম্ভবপর নহে। বঙ্গসমাজের আধুনিক অপ্রাকৃত অবস্থাজন্যই, সামান্য শিক্ষায় এ কুফল ফলিয়াছে।

সামান্য শিক্ষার বৃদ্ধি হওয়ায়, অল্পশিক্ষিত পাঠকের শ্রেণী বাড়িয়াছে। তাহারা কি পড়িবে? তাহারা প্রায় বাঙ্গালা ভিন্ন অন্য ভাষায় অনধিকারী,—যদি জানে ত কিছু সংস্কৃত—সংস্কৃত ভাষায় যে দুই-চারিখানি গ্রন্থ চলিত আছে তাহা পড়িয়া শেষ করিয়াছে। ইহার মধ্যে অধিকাংশ পাঠকই কিছু কিছু ইংরেজি জানে, কিন্তু সে এরূপ সামান্য যে তদ্দ্বারা উৎকৃষ্ট ইংরেজি গ্রন্থের রসাস্বাদনে তাহারা সক্ষম হয় না—"Mysteries" পর্যন্ত তাহাদের বুদ্ধির সীমা—তাহাও সকলের আয়ত্ত নহে। তাহারা কি পড়িবে? তাহাদের মনোরঞ্জনার্থ এক শ্রেণীর লেখক উৎপন্ন হইয়াছে। তাহারাও সেই অল্পশিক্ষিত শ্রেণীর লোক—তাহাদের রুচি মার্জিত এবং পরিশুদ্ধ হয় নাই—সুতরাং অশ্লীলতা এবং কদর্যতা প্রিয়। লেখক পাঠক উভয়ই এক শ্রেণীর লোক—পরস্পরে বিলক্ষণ সহৃদয়তা—সুতরাং সেই অশ্লীলতা আদৃত এবং পুরস্কৃত হয়।

এমত অবস্থায় অন্য সমাজে কি হয়? পাঠকসংখ্যা বৃদ্ধি হইলে, যাঁহারা সুশিক্ষিত, বিশুদ্ধরুচি, তাঁহারাই অগ্রসর হইয়া অশিক্ষিত পাঠকের শিক্ষার ভার গ্রহণ করেন। সুশিক্ষিত সম্প্রদায় তাঁদের পৃষ্ঠপোষক হয়েন, তাঁহারাই সেই বলে, অশিক্ষিত সম্প্রদায়কে শাসিত ও শিক্ষিত করিয়া তুলেন।

এখানে ইংরেজি চর্চার জন্য সেরূপ ঘটে না। সুশিক্ষিত বাঙ্গালিরা, ইংরেজি লিখেন, অথবা ইংরেজি লিখিয়া কোন ফল নাই, বলিয়া আদৌ লিখেন না,—এদেশে সুশিক্ষিতে অশিক্ষিতের শিক্ষার ভার সচরাচর গ্রহণ করেন না। সুতরাং সামান্যরূপ শিক্ষিত লেখকদিগেরই আধিপত্য। এবং সেই কারণেই অশ্লীলতার বৃদ্ধি।

ইহা সত্য বটে যে, সুশিক্ষিত সম্প্রদায়ের কতকগুলি মহদাশয় ব্যক্তি বাঙ্গালা লেখক শ্রেণীভুক্ত, এবং আজিকালি কতকগুলি সংবাদপত্র ও সাময়িক পত্র সুশিক্ষিত সম্প্রদায় কর্তৃক সম্পাদিত হইতেছে। কিন্তু এসকলের সংখ্যা অধিক নহে—এবং সুশিক্ষিত সম্প্রদায় ইঁহাদিগের পৃষ্ঠরক্ষাকারী নহেন বলিয়া ইঁহাদিগের বল নাই। ইঁহাদিগের সাহস অল্প; দুর্নীতির শাসনে তাদৃশ যত্ন নাই। অনেকগুলি এমন ভদ্র এবং প্রিয়বাদী যে, তাঁহাদিগের দ্বারা দুর্নীতি নিবারণের আশা করি না।

এই বলহীনতার কারণ উপরেই নির্দিষ্ট করিয়াছি। সুশিক্ষিত সম্প্রদায়,

ইহাদিগের পৃষ্ঠরক্ষা করেন না। সুশিক্ষিত সম্প্রদায় বাঙ্গালা পড়েন না। তাঁহারা বাঙ্গালা পড়েন না বলিয়া, তাঁহাদিগের অনুমোদনজনিত যে বল তাহা সুশিক্ষিত বাঙ্গালা লেখকেরা প্রাপ্ত হয়েন না। সেই বল নাই বলিয়া তাঁহাদের সাহস নাই। সুশিক্ষিতের অনুগ্রহ নাই বলিয়া তাঁহাদিগকে অশিক্ষিতের সঙ্গে মিলিয়া মিশিয়া চলিতে হয়।

অনেকে হয়ত বঙ্গদর্শনকে অকৃতজ্ঞ বলিবেন। বঙ্গদর্শন সুশিক্ষিত সম্প্রদায় কর্তৃক বিশেষ আদৃত, ইহা আমরা জানি। সুশিক্ষিতে পৃষ্ঠপোষণ করেন না, এ উক্তি বঙ্গদর্শনের পক্ষে শোভা পায় না, ইহা স্বীকার করি। আমরা বঙ্গ-দর্শনের কথা বলিতেছি না—এবং বঙ্গদর্শনের প্রতি সুশিক্ষিত সম্প্রদায়ের কৃপা আছে বলিয়াই, আমরা বঙ্গদর্শনে এ সকল কথা বলিতেছি। নহিলে বলিতে পারিতাম না।

ইহা ভিন্ন অশ্লীলতা বৃদ্ধির আরও অনেক কারণ আছে। এক কারণ, মদ্যাদি মাদকে বাঙ্গালির আসক্তি বৃদ্ধি; দ্বিতীয়, নিষ্পাপ আমোদের হ্রাস। তাস, সতরঞ্চ প্রভৃতির অন্য গুণ নাই বটে, কিন্তু তাহাতে যাঁহারা রত হইতেন, তাঁহারা তাহাতে একপ্রকার আমোদ পাইতেন, অন্য আমোদ খুঁজিতেন না। এক্ষণে তাসপাশার প্রভাব কমিয়াছে, অশ্লীল আমোদ তাহার স্থানীয় হইয়াছে।

যে কারণেই হউক, অশ্লীলতার বৃদ্ধির লক্ষণ দেখিয়াই আমরা অশ্লীলতা নিবারণী সভার অনুমোদন করিতেছি। কিন্তু অনুমোদন করিতেছি বলিয়াই এমত বুঝিতে হইবে না যে, এ সম্বন্ধে সভার পক্ষীয়েরা যত কথা বলিয়াছেন, সকলেই আমরা সম্মত। অনেক স্থানে যে অশ্লীলতা পঙ্কিল স্বভাবের পরি-চায়ক নহে, তাহা আমরা স্বীকার করি। এমন লোক আমরা দেখিয়াছি যে তাঁহাদের কথোপকথন অশ্রাব্য, এবং চরিত্র অনুকরণীয় এবং পবিত্রতায় অতুল্য। এমন অনেক কাব্য আছে যে তাহার অশ্লীলতায় অপবিত্রতার ছায়াও নাই। এমন অনেক কাব্য আছে যে তাহা অশ্লীলতা-দোষযুক্ত হইলেও মনুষ্যবুদ্ধিসৃষ্ট রত্নের মধ্যে সর্বোৎকৃষ্ট বলিয়া চিরকাল আদরে রক্ষণীয়। কোন কোন স্থানে, অশ্লীলতা, কাব্যের উৎকর্ষপক্ষে প্রয়োজনীয় হইয়া উঠে। যিনি একথা হঠাৎ বুঝিতে পারিবেন না, তিনি দুর্যোধনের সভায় দ্রৌপদীর কথা, মহাভারতে পাঠ করিবেন। ইহাও আমরা স্বীকার করি, যাহার চরিত্র বিশুদ্ধ, অশ্লীলতা তাহাকে কলুষিত করিতে পারে না। "আমার পুত্রটির স্বভাব পবিত্র—অশ্লীল গ্রন্থ পড়িলে সে পাপপ্রিয় হইবে," যিনি এরূপ আশঙ্কা করেন, তাঁহার বুদ্ধির আমরা প্রশংসা করি না। এসকল স্বীকার করিলেও অশ্লীলতা সমাজের বিশেষ অনিষ্টকর অবশ্য বলিব। ইহার একটি ভয়ানক ফল এই যে ইহা বিশুদ্ধ চরিত্রের

কোন অনিষ্ট না করুক, পাপাসক্তের পাপস্রোতঃ বৃদ্ধি করে। অশ্লীলতা, পাপাগ্নির ইন্ধনস্বরূপ। যেখানে অগ্নি নাই, সেখানে শুধু কাষ্ঠে অগ্ন্যুৎপাত হয় না ; কিন্তু যেখানে অগ্নি আছে, সেখানে কাষ্ঠে তাহা জ্বালিত, বর্ধিত এবং সর্ব-গ্রাসক অবস্থায় পরিণত হয়। এই অগ্নিতে বঙ্গদেশ দগ্ধ হইতেছে। অশ্লীলতা দমন হইলে পাপস্রোতঃ কিছু মন্দীভূত হইবে আমাদিগের এমন ভরসা আছে।

এ কথা সমূলক না হইলেও আর-একটি গুরুতর কথা আছে। বিশুদ্ধ রুচির সঙ্গে ধর্মাধর্মের কোন সম্বন্ধ থাকুক বা না থাকুক, বিশুদ্ধ রুচিই একটি মনুষ্যের পরম সুখ। অশ্লীলতা সেই সুখের বিঘ্নকারক। যাঁহারা বলেন, অশ্লীলতায় ধর্মহানি হয় না বলিয়া, তাহা দমনের আবশ্যকতা নাই, তাঁহারা এ কথা বুঝেন না।

অশ্লীলতা নিবারণী সভার উদ্দেশ্য সিদ্ধ হউক, ইহা আমরা কায়মনোবাক্যে প্রার্থনা করি। কিন্তু এই অবকাশে, সভাকে দুই একটি পরামর্শ দিবার বাসনা করি।

১ম। অনেক সময়ে, উপদেশ, ভৎ´সনা, নিন্দার দ্বারা যেরূপ কার্যসিদ্ধি হয়, দণ্ডের দ্বারা সেরূপ হয় না। সভা, এই কথাটি স্মরণ রাখিয়া যেখানে উপদেশ, বা নিন্দার দ্বারা কার্যসিদ্ধি করিতে পারিবে, সেখানে দণ্ডের উদ্যোগ না করেন, ইহা আমাদিগের পরামর্শ। দণ্ডে যে সকল লোকের চরিত্রশোধন হয় নাই, উপদেশাদির দ্বারা তাহাদিগের চরিত্রশুদ্ধি ঘটিতে দেখা গিয়াছে। কথায় হইলে প্রহারে কাজ কি ?

২য়। অনেক স্থানে যে উপদেশাদি বৃথা হইবে, ইহা আমরা স্বীকার করি। এমন অনেক বক্তা ও লেখক দেখিতে পাই যে তাঁহারা ভদ্র লোকের নিন্দার ভয় করেন না। সেখানে দণ্ড প্রযোজ্য। কিন্তু আইনের যেরূপ অবস্থা, তাহাতে দণ্ডবিধানের তাদৃশ সুবিধা নাই। অশ্লীলতা কি ? তাহা আইনে কোথাও পরিষ্কৃত হয় নাই। কি দণ্ডনীয় ? এ বিষয়ে মতভেদ সর্বদাই ঘটে। যে অশ্লীলতা ইঙ্গিতমাত্রে ব্যক্ত তাহা কি বর্তমান আইনে দণ্ডনীয় ? দ্ব্যর্থ অশ্লীলতা দণ্ডনীয় কি না ? এ সকল স্থলে দণ্ডের অনিশ্চয়তা ঘটিবে। সভার উচিত যে যাহাতে আইনটি পরিষ্কৃত হয় তাহা করেন।

৩য়। একজন মালীর প্রভু একদা পুষ্পোদ্যানে জঙ্গল দেখিয়া মালীকে ভৎর্সনা করিয়া জঙ্গল পরিষ্কার করিতে আদেশ করেন। পর দিন আসিয়া বাবু দেখিলেন, জঙ্গল পরিষ্কার হইয়াছে বটে, কিন্তু তাহার সঙ্গে অনেক ফুলগাছ মারা গিয়াছে। বাবু জিজ্ঞাসা করিলেন, "ফুলগাছ কাটিলে কেন ?" মালী বলিল, "নহিলে জঙ্গল সাফ হয় না।" কাজটা শেষে এই মালীর মত না হয়। জঙ্গল কাটিতে উৎকৃষ্ট কাব্যকুসুমলতাসকলের উচ্ছেদ না হয়।

তুলনায় সমালোচন

অনেকে বলেন যে তুলনায় সমালোচনা অত্যন্ত হৃদয়গ্রাহিণী হয়, অথচ এখনকার কোন সমালোচকই সেরূপ সমালোচন করেন না। আমরা মধ্যে মধ্যে সমালোচক বলিয়া সমাজে মুখ দেখাই, সেইজন্যই অদ্য ঐ আক্ষেপোক্তির সারবত্তা হৃদয়ঙ্গম করিয়া তুলনায় সমালোচনের চেষ্টা করিব। সুতরাং "বঙ্গীয় সমালোচকদিগের কথায় যে আমাদিগের অচলা ভক্তি", এই প্রস্তাব তাহার দ্বিতীয় প্রমাণ।

আমাদের উপদেষ্টৃগণ ধর্মশাস্ত্রব্যবসায়ীর ন্যায় শুদ্ধ উপদেশ প্রদান করিয়াই ক্ষান্ত হন নাই, তাঁহারা সকলেই সাধ্যমত তুলনা করিয়া কোন কোন কবির বা কাব্যের ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র সমালোচন করিয়া আমাদের শুনাইয়াছেন। তাহার মধ্যে যতদূর স্মরণ আছে দুই-একটি আমরা এই স্থানে উদ্ধৃত করিতেছি। একজন বিদ্যাপতি ও কবিকঙ্কণের তুলনা করিয়া আমাদের দেখাইয়াছিলেন। তিনি বলেন যে বিদ্যাপতির পদগুলি সরল প্রোষ্ঠী মৎস্যের দলের ন্যায়। সকলগুলিই প্রায় একরূপ, দেখিলেই চেনা যায়, এক-একটির আয়তন অতি ক্ষুদ্র, কিন্তু সমস্ত দলটি সুবৃহৎ; সকলগুলি অতি চিক্কন, উজ্জ্বল, পরিষ্কৃত, সরল, মোলায়েম ও আপনাদের বাস্তুভূতে সর্বদাই ফরফরায়তে। বিদ্যাপতির পদগুলিও ঠিক এইরূপ একটির সহিত আর-একটির কোন সম্বন্ধই নাই; সকলগুলিই পদ ও রাধাকৃষ্ণ বিষয়ক; প্রোষ্ঠীদল সম্বন্ধেও তদ্রূপ, সকলগুলিই মৎস্য, ও তৈল, লবণ, জিহ্বার সহিত সমানভাবে সম্বন্ধ। পদগুলিও অতি সরস, কোমল, মিষ্ট, ক্ষুদ্র ও আপনাদের বাস্তুভূতে অর্থাৎ কীর্তনগায়কদিগের কণ্ঠে সর্বদাই ফরফরায়তে। অপিচ মৎস্যগুলি সুন্দর শল্কাবৃত কিন্তু এই শল্কগুলি অব্যবহার্য: পদগুলিও সুন্দর ব্রজভাষাময় কিন্তু ব্রজভাষা অব্যবহার্য; বিদ্যাপতির কবিতার সকলগুলিই আদিরসময়ী, আদিরসোদ্দীপিকা; আর এই সফরীযূথের যেটিকে দেখিবে, দেখিলেই তোমার সেই নিজ সফরীনয়নাকে মনে পড়িবে। সুতরাং এস্থলেও সকলগুলি আদিরসোদ্দীপিকা।

কিন্তু মুকুন্দরাম চক্রবর্তী ও তাঁহার চণ্ডীমঙ্গল বৃহৎ রোহিতসদৃশ: সুবৃহৎ একটিতেই যথেষ্ট, সুন্দর মুচ্ছন্দোধারী, অগাধসঞ্চারী, স্বচ্ছন্দবিহারী, জালভেদ-কারী। যেমন মৎস্যকুলে রোহিত, তদ্রূপ কাব্যকুলে চণ্ডীমঙ্গল, রাজা বলিলেই হয়; অতি সুন্দর, একটিতেই যথেষ্ট, নানা ছন্দে রচিত, অগাধ পাণ্ডিত্যব্যঞ্জক, স্বচ্ছন্দবিহারী অর্থাৎ কষ্টে রচিত হয় নাই ও জালভেদকারী, অর্থাৎ স্থানে স্থানে এমন কূট যে তাহার অর্থ শব্দবুদ্ধিজাল ভেদ করিয়া পলায়ন করে।

চণ্ডীকাব্যে যেমন নানা রস আছে, তেমনি বৃহৎ পক্ক রোহিত মৎস্যেও নানা রস আছে। কিন্তু কোথায় কোন্ রস আছে, সে বিষয়ে নানা মত আছে ; কেহ কেহ বলেন যে ইহার মস্তকে বীর, রৌদ্র, ভয়ানক ; মধ্যদেশে শান্ত, করুণ, আদি ; ও পশ্চাদ্ভাগে অদ্ভুত, হাস্য ও বীভৎস রস দেখিতে পাওয়া যায়। অপরে বলেন যে ইহার ঘ্রাণে আদি, দর্শনে করুণা, স্পর্শনে অদ্ভুত ও ভক্ষণেই শান্ত রসের উৎপত্তি হইয়া থাকে। যাহা হউক, ইহা যে চণ্ডীকাব্য-সদৃশ নানা রসাত্মক তাহাতে মতভেদ নাই। আমাদের প্রথম উপদেষ্টা এই-রূপে আমাদিগকে তুলনায় সমালোচকের শিক্ষা প্রদান করেন। তাঁহার তুলনা অতুল্য বলিতে হইবে।

পরে এক জ্ঞানী সমালোচক আমাদিগকে আর-একটি তুলনা শুনান। তাহাও দেওয়া যাইতেছে। তিনি বলেন যে বিদ্যাসাগর মহাশয় টাঁকশাল, ও তাঁহার গ্রন্থগুলি দুআনি সিকি আধুলি ও টাকা ব্যতীত আর কিছুই নহে। সাগরী টাঁকশালে রূপা ব্যতীত সোনার সম্পর্ক নাই, টঙ্কযন্ত্রাধ্যক্ষ বিদ্যাসাগর অন্য স্থানে রূপা ক্রয় করিয়া নিজে খাদ মিশাইয়া ব্যবসা করিতেছেন। খণ্ড রূপা যেমন একটু পরিষ্কার করিয়া চারিদিকে গোলাকার করিয়া কিরণ দিয়া, উপরে QUEEN VICTORIA ছাপিয়া দিলেই মুদ্রা হয়, সেই অন্যের রূপা একটু বাঙ্গালা রসনা চড়াইয়া, চতুষ্কোণ করিয়া চারিদিক ছাঁটিয়া উপরে "শ্রীঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর প্রণীত" ছাপিয়া দিলেই সাগরিক গ্রন্থ হয়। বর্ণপরিচয় দুআনি ; ক্ষুদ্র বালকের জন্য প্রয়োজনীয়, শীঘ্র নষ্ট হয় বা হারাইয়া যায়। এইরূপ তাঁহার কোন গ্রন্থ সিকি, কোন গ্রন্থ আধুলি ও কোন গ্রন্থ টাকা। তিনি প্রথমে এক খোট্টা মহাজনের নিকট রূপা লইয়া মুদ্রাযন্ত্র বসান, সেই খোট্টার রূপায় টাকা প্রস্তুত করান ; সে টাকার নাম "বেতাল পঁচিশ" ; সেবার চেম্বরস্ বলে একজন বিলাতি মহাজনের নিকট রূপা লইয়া "জীবনচরিত" নাম দিয়া একটু কম খাদ মিশাইয়া ক হাজার আধুলি প্রস্তুত করাইয়া অনেক লাভ করিলেন। একজন বৃদ্ধ পশ্চিমে পণ্ডিত অধিক পরিমাণে বেশ খাঁটি রূপা রাখিয়া যান ; তাহাই লইয়া আসিয়া আপনার নিজের খাদ কতকগুলি দিয়া তাহাই "সীতার বনবাস" নামে টাকা করিয়া বিক্রয় করিয়াছেন। এখন ও ব্যবসা ছাড়েন নাই, আজি চারি বৎসর হইল সেক্ষপিয়রের "ধোঁকার মজা" বলে খানিক রূপা ছিল, তাহাতেই আপনার সেই মোহর দিয়া, "ভ্রান্তিবিলাস" টাকা নাম দিয়া বিক্রয় করিলেন। এইরূপে উপদেষ্টা প্রতিপন্ন করিলেন যে বিদ্যাসাগর টঙ্কযন্ত্র মাত্র। আর-একজন উপদেষ্টা বলেন যে দীনবন্ধুবাবু কাঁচামিঠা আম গাছ। নীলদর্পণ তাহার মুকুল, তখন একবার দক্ষিণ মলয়-

বায়ুতে তাহার সৌরভ দিগ্‌বিস্তার করিয়াছিল ; তাঁহার নিমচাঁদ, মল্লিকা, শ্রীনাথ, ক্ষীরোদবাসিনী, প্রভৃতি তাঁহার কাঁচামিঠার কাঁচা অবস্থা ; আর তাঁহার "দ্বাদশ কবিতা" "সুরধুনীতে" সেই ফল যে পাকিয়া উঠিতেছে তাহা আমরা বেশ বুঝিতে পারিতেছি।

আর-একজন বলেন বঙ্কিমবাবু মিষ্ট লঙ্কার আচার ; আর বঙ্গদর্শন সেই আচারের হাঁড়ি। খানিক মিষ্ট লাগিবে ; খানিক অম্লরসময় ; অম্ল শুধু খেতে ভাল লাগে না কিন্তু ভাল খাইবার সময় অম্ল না হলে চলে না। কিন্তু ঝালের ভাগটা যাহার অদৃষ্টে পড়িবে তাহার হাড়ে হাড়ে রি রি করিবে।

আমরা তুলনায় সমালোচন সম্বন্ধে আমাদিগের উপদেষ্টৃগণের স্থানে এই-রূপ শিক্ষা প্রাপ্ত হই। এক্ষণে সেই শিক্ষার পরীক্ষা দিবার জন্য অগ্রসর হইতেছি।

আমরা রায়গুণাকর ভারতচন্দ্রকে তাঁহার সৃষ্টা মালিনীর সহিত এক বলিয়া বিবেচনা করি। কবি ভারত ও হীরা মালিনী এক ; বিদ্যাসুন্দরের প্রণয়নকর্তা ও বিদ্যাসুন্দরের প্রণয়নকর্ত্রী এক।

প্রথমে মালিনীর চিত্র।

সূর্য যায় অস্তগিরি আইসে যামিনী,
হেনকালে তথা এক আইল মালিনী,
কথায় হীরার ধার, হীরা তার নাম,
দাঁত ছোলা, মাজা দোলা, হাস্য অবিরাম,
গালভরা গুয়াপান, পাকি মালা গলে,
কাণে কড়ি কড়ে রাঁড়ি কথা কয় ছলে ;
চূড়াবান্ধা চুল, পরিধান সাদা শাড়ী,
ফুলের চুপড়ি কাঁখে ফিরে বাড়ি বাড়ি।
আছিল বিস্তর ঠাট প্রথম বয়সে,
এবে বুড়া তবু কিছু গুঁড়া আছে শেষে।
ছিটাফোঁটা মন্ত্রতন্ত্র জানে কতগুলি,
চেঙ্গড়া ভুলায়ে খায় কত জানে ঠুলি,
বাতাসে পাতিয়া ফাঁদ কন্দল ভেজায়,
পড়সী না থাকে কাছে কন্দলের দায়,
মন্দ মন্দ গতি, ঘন ঘন হাতনাড়া ;
তুলিতে বৈকালে ফুল আইল সেই পাড়া,

এই চিত্রের সহিত কবি ভারতের তুলনা করুন।

প্রথমতঃ "কথায় হীরার ধার।" কবি ভারত কথার রাজা। নানা ভাবের কথা, নানা রসের কথা তাঁহার গ্রন্থকলাপমধ্যে আছে। তিনি আপনি বলিয়াছেন,

অন্নদা কহিল বাছা না করিহ ভয়,
আমার কৃপার বলে বোবা কথা কয়,
গ্রন্থ আরম্ভিয়া মোর কৃপাসাক্ষী পাবে,
যে কবে সে হবে গীত আনন্দে মাতাবে ;
এত বলি অমৃতান্ন মুখে তুলি দিলা,
সেই বলে এই গীত ভারত রচিলা।

ইহাতে তাঁহার বলা হইল যে তাঁহার দৈবশক্তি ছিল। আবার বলিয়াছেন,

মানসিংহ পাতশায় হইল যে বাণী
উচিত যে আরবী পারসী হিন্দুস্থানী :
পড়িয়াছি সেইমত বর্ণিবারে পারি,
কিন্তু সে সকল লোক বুঝিবারে ভারি,
না রবে প্রসাদগুণ না হবে রসাল,
অতএব কহি ভাষা যাবনী মিশাল।

সুতরাং দৈবশক্তি থাকুক বা না থাকুক, তাঁহার পড়াশুনা বিস্তর ছিল বলিয়া বর্ণনা করিতে পারিতেন। ইহাতেই যথেষ্ট। আর অন্নদাদেবী যে বলিয়াছেন তাঁহার কৃপার সাক্ষী আছে, সে কথাও যথার্থ, তাহার অমৃতান্নের বলে অন্নদা-মঙ্গলে কথায় কথায় খই ফুটিতেছে। যে সংস্কৃত ছন্দগুলি বাংলায় আনা যাইতে পারে বাক্যরসরাজ সেগুলি তাঁহার গ্রন্থে দিয়াছেন। ভারত, পুরাণতন্ত্র হইতে সৃষ্টিবিবরণ দেখাইতেছেন, কাশীখণ্ড হইতে অন্নপূর্ণার অন্নদানের চিত্র প্রদর্শন করিতেছেন, রামায়ণ, মহাভারত, ভাগবত শুনাইতেছেন, পশু, পক্ষী, বৃক্ষ, লতা, মৎস্য, মক্ষীদংশ, অন্নব্যঞ্জন প্রভৃতির সুদীর্ঘ তালিকা দিতেছেন। অযোধ্যা বর্ণনা করিতেছেন, দিল্লী বর্ধমান যশোহর বর্ণনা করিতেছেন, গঙ্গার মাহাত্ম্য, জগন্নাথের মাহাত্ম্য বলিতেছেন। বারমাস, বায়ান্নপীঠ, অষ্টনায়িকা, প্রভৃতি বর্ণনা করিতেছেন। এত বৈচিত্র্য কিসের ? কথার, ভারতকথায় হীরার ধার। তিনি বাগ্‌বিশারদ। শব্দসমুদ্রের মন্থনদণ্ড তাঁহার নিজ হস্তে। বাগ্‌যুদ্ধে বঙ্গীয় সকল কবিকেই তাঁহার নিকট পরাস্ত হইতে হয়। কখনই তাঁহার মুখের কাছে প্রতিদ্বন্দ্বী টেঁকিতে পারে না ; পড়সী কাছে থাকিতে পারে না। হীরার দাঁত ছোলা ইত্যাদি অঙ্গপরিষ্কৃতির লক্ষণ মাত্র। ভারতচন্দ্র রায়ের কাব্য-সকলের পরিষ্কৃতি প্রসিদ্ধ। ভাষা পরিষ্কৃত ও মার্জিত ; ছন্দ পরিষ্কৃত ও মার্জিত ; রচনা পরিষ্কৃত ও মার্জিত।

এক্ষণে মালিনীস্বভাবের সহিত এই কাব্যের ভাবের তুলনা করুন। মনে করুন, মালিনী, সেই হীরা মালিনী, মাজা মচকান, মাজা দোলান, ফিন্‌ফিনে, শাদা ধুতীখানি পরা, চুলটি ব্রজের গোষ্ঠের ভাবে বাঁধা, কোমরের কাছে ছোট ফুলের চুপড়িটি, পানমুখে একটু হাসি, সুন্দরের সম্মুখে বকুলতলে গিয়া দেখা দিল। সুন্দরের সহিত পরিচয় হইল। সুন্দর মাসী বলিয়া হীরাকে সম্বোধন করিলেন। সম্বোধন করিয়া একবার ঊর্ধ্বে দৃষ্টিক্ষেপ করিয়া আপাদমস্তক পরীক্ষার চেষ্টা করিলেন। সুন্দর মাসী বলিয়া, ভক্তির ভাষায়, গৌরববাক্যে হীরাকে সম্বোধন করিয়াছেন। হীরাকে দেখিতে পারিলেন না। মাসী বলিলে হীরার দিকে আর পূরা নজরে চাওয়া যায় না। আমাদের কবি ভারতও তাই! প্রথমতঃ কাব্যভাব দেখুন। হীরার সেই গালভরা পান, আর কাব্যের সেই আদিরসপূর্ণতা। হীরার সেই মাজা দোলা; আর ভারতের নাচনিছন্দ। হীরার সেই সুচিকন পরিষ্কৃত দন্ত; আর কাব্যের সেই মার্জিত স্বভাব। হীরার সেই মুচ্‌কে মধুর হাঁসি; আর হীরার সেই সহজ প্রসাদগুণ। হীরাও হাসে, ভারতের কবিতাও হাসে।

কিন্তু আমরা আর-এক কথা বলিতেছিলাম যে মাসী বলিলে আর হীরার দিকে পূরা নজরে চাওয়া যায় না। অন্নদামঙ্গল ভক্তিরসাত্মক গ্রন্থ বলিলে ইহাও অপাঠ্য হইয়া উঠে। অন্নপূর্ণা বলিতেছেন, "আমার মঙ্গলগীত করহ প্রকাশ" তাহাতেই ভারতচন্দ্র তাঁহার মহিমা প্রকাশ জন্য, তাঁহার পূজা জগতে প্রচার করিবার জন্য, অন্নদামঙ্গল রচনা করেন। এই আজ্ঞা অন্নপূর্ণা না দিয়া যদি অন্য কোন দেবতা আপনার আধিপত্য বিস্তার করিবার জন্য ভারতের সাহায্য প্রার্থনা করিতেন, তাহা হইলেই উচিত হইত। আমাদের সকল ভাবেরই দেবতা আছে। কিন্তু তাহা হয় নাই; অন্নদামঙ্গল কাশীশ্বরী অন্নদাত্রী দেবী অন্নপূর্ণার পূজা যাহাতে প্রচার হয় এই উদ্দেশ্যে রচিত হয়; ইহা মনে পড়িলে তাঁহার বিদ্যাসুন্দরলীলা অপাঠ্য হইয়া পড়ে। কেবল তন্ত্র-উপাসকেরাই এইরূপ রসভেদ একত্রে সংস্থাপন করিতে পারে, আর কেবল হীরা মালিনীই বনপোর দৌত্যে অভিনিযুক্তা হইতে পারে।

মালিনী যখন প্রথমে সুন্দরকে আপন পরিচয় প্রদান করিল তখনি তাহার রীতিনীতি বেশ বোঝা গেল। মালিনী বলিতেছে,

এস যাদু আমার বাড়ি
আমি দিব ভালবাসা।
যে আশায় এসেছ ও ধন
পূর্ণ হবে মন-আশা॥

আমার নাম হীরা মালিনী,
কড়ে রাঁড়ি নাইকো স্বামী,
ভালবাসেন রাজনন্দিনী,
(করি) রাজবাড়িতে যাওয়া আসা ॥

ইহাতেই সকল কথা বলা হইল। সে নিজে পতিহীনা অল্পবয়স্কা, তাহাতে বড় ঘরে যাতায়াত আছে, আর সে বাড়ির মেয়েরাও যথেষ্ট অনুগ্রহ করে, সুতরাং বুঝে লউন। আবার ভারতেরও ভাবভক্তি এক আঁচড়ে বোঝা গিয়াছে! ভারত গ্রন্থারম্ভের পূর্বে যে দেবীর পূজা প্রচারজন্য গ্রন্থ রচনা করিবেন তাহার রূপ বর্ণন করিতেছেন ; বলিতেছেন—

কিবা সুললিত উরু, কদলী কাণ্ডের গুরু,
নিরুপম নিতম্বে কিঙ্কিণী।
শোভে নিরুপম বাস, দশ দিশ পরকাশ,
ত্রিভুবনমোহনকারিণী ॥
কটি অতি ক্ষীণতর, নাভি সুধাসরোবর,
উচ্চকুচ সুধার কলস।
কণ্ঠ কম্বুরাজ রাজে, নানা অলঙ্কার সাথে
প্রকাশে ভুবন চতুর্দশ ॥

দেখুন, এ মালিনীস্বভাবাপন্ন গ্রন্থকারের কি আশ্চর্য রুচি ও প্রবৃত্তি! জগতের পালনকর্ত্রী, জগজ্জনের অন্নদাত্রী কারণ অমৃত বিতরণ করিয়া, দেবাদিদেব মহেশ্বরকে অমৃতপানে উন্মত্ত করিয়া, যক্ষ, রক্ষ, সিদ্ধ, সাধ্য সকলের অন্নদানে পরিপোষণ ও পরিতোষণ করিয়া কিছু করিতে পারিলেন না। কিন্তু তাহার নিরুপম নিতম্বে কিঙ্কিণী আর তাহাতেই যে নিরুপম বাস শোভা করিতেছে তাহাতেই ত্রিভুবনমোহনকারিণী !!!

কি বিচিত্র রুচি! আবার ইহার উপর যদি তাঁহার "দশ দিশ পরকাশ" বাক্যে কিছু শ্লেষ থাকে তবে তাঁহাকে আর তাঁহার মালিনীকে একত্রে "উভে উভ দিব শূলে" না বলিয়া ক্ষান্ত থাকা যায় না।

এমন কদর্যস্বভাবান্বিত কবিও বঙ্গদেশে সমূহ প্রতিপত্তি লাভ করিয়াছেন।। কেন? মালিনীর যে সকল গুণ থাকাতে চেঙ্গড়া মহলে তাহার পসার ছিল, ভারত সেই সকল গুণেই বঙ্গীয় চেঙ্গড়া মহলে স্বীয় আধিপত্য বিস্তার করিয়া রাখিয়াছেন। অনেকগুলি উল্লেখ করিয়া ভারতে ও মালিনীতে তুলনা করিয়াছি ; আরো গুটিকত দেখাইতেছি। ভারতচন্দ্রের মালিনী "কথা কয় দুলে ;" স্বয়ং ভারতচন্দ্রও কথা কন ছলে। এটি কিছু কবির বিশেষ

গুণের মধ্যে নহে, কিন্তু বঙ্গদেশে এই ছল-কথা কবিতার জীবনীশক্তি। মুন্সীয়ানা দেখিল ত বাঙালী অমনি গলিয়া গেল; ভারতচন্দ্র এই মুন্সীগিরির খোষনবীশ। ভারতের মুন্সীগিরির সবিস্তার পরিচয় প্রদানের আবশ্যক নাই, তাঁহার দক্ষমুখে শিবনিন্দা, অন্নদামুখে ভবানীর পাটুনীকে পরিচয় দান, মালিনীর মুখে বিদ্যার রূপবর্ণন, আর নিজ মুখে চোর পঞ্চশত টীকা প্রভৃতিতে তাঁহার ছল-কথার পরিচয় দিতেছে; ও তাঁহার পঞ্চাশাক্ষরী স্তবে, বেসাতির হিসাবে, তোটক তূণক ভুজঙ্গপ্রয়াত প্রভৃতিতে তাঁহার শব্দ-চাতুর্যের পরিচয় দিতেছে।

ভারতকাব্যপ্রবলতার আর-একটি কারণ আছে। ভারত তাঁহার মালিনীর ন্যায় "ফুলের চুপড়ি কাঁখে ফিরে বাড়ি বাড়ি।" মনে করুন দিখি "চাই বেলফুল" বলিলে কত লোক সেইদিকে যায়; দুপয়সায় কি চারি পয়সায় এক ছড়া গড়ে; কেমন শুভ্র, সুগন্ধ, কোমল ও রমণীয়? কাল যে মালার কি দশা হবে, কোন কাজে লাগিবে কি না, তাহা কি কেহ কখন ভাবে না। আর যদি কেহ "ভাল কেতাব চাই" "ভাল কেতাব চাই" বলিয়া চিৎকার করিয়া মরে, তবে বলুন দেখি কয়জন তাহার দিকে যায়। বড় জোর আজ কাল বৎসরের প্রথম দিন না হয় একবার ডেকে জিজ্ঞাসা করা গেল; "কেমন হে হকার, বলি হাপ পাঁজি আছে?" যদি সে বলিল, না, তবেই তাহার সহিত সম্পর্ক ফুরাইল। কিন্তু ভারত ফুলব্যবসায়ী, তাহার খরিদ্দারও অনেক ও নানারঙ্গী। ভারতকে ফুলব্যবসায়ী কেন বলে? তিনি ক্ষণস্থায়ী রসব্যবসায়ী। তিনি এই ফুলের চুপড়ি লইয়া এই বঙ্গরাজ্যে কাহার বাড়ি না গিয়াছেন? প্রথমে রাজবাড়ি ফুল যোগাইতেন বটে, কিন্তু এক্ষণে ক্রমে ক্রমে সকল গৃহস্থভবন পর্যটন করিয়া সোনাগাছি, মেছোবাজার প্রভৃতি স্থলে পসার বিস্তার করিতেছেন। যেখানে দেখিবেন "চাই বেলফুলের" ডাক অধিক সেইখানেই দেখিবেন যে এখন ভারতচন্দ্র রায়ের সমাদর অধিক। তবে কি ভদ্রলোক ভারতের গ্রন্থকলাপ কখনই পাঠ করিবে না? উত্তর, কেন ভদ্রলোকে কি ফুলের আদর জানে না? না, ফুলব্যবসায়ী ভদ্রপল্লীতে থাকে না? তবে কিনা ভদ্রলোকে যদি মালিনী গোয়ালিনীর বিশেষ গৌরব করেন, বা কবি ভারতকে পরম পূজনীয় শ্রীল শ্রীযুক্ত কবিবর জ্ঞান করেন, তাহা হইলে তাঁহাদের রুচির প্রশংসা করিতে পারি না। বরং কখন কখনও তাহাতেই তাঁহাদের স্বভাবদোষ অনুমেয় হইয়া উঠে।

এতদ্ব্যতীত ভারতচন্দ্র রায় তাঁহার মালিনীর ন্যায় কতকগুলি ছিটাফোঁটা তন্ত্রমন্ত্র জানেন, সেগুলিও তাঁহার সুখ্যাতিবিস্তারের কারণ বলিতে হইবে।

সুদীর্ঘ বর্ণনে ভারতচন্দ্র কৃতকার্য হইতে পারেন নাই বটে; কিন্তু ছিটেফোঁটা মত তাঁহার দু-একটি গান অতি মনোহর। ভাল সামগ্রীর সমাদর থাকাই শ্রেয়; আমরা ভাল বস্তুর বিশেষ সমাদর করি, তাহাতেই তাঁহার দুইটি গান এই স্থলে উদ্ধৃত করিলাম।

অন্নপূর্ণার অধিষ্ঠান

রাগ বসন্ত

কাল কোকিল অলিকুল বকুলফুলে।
বসিলা অন্নপূর্ণা মণি-দেউলে।
কমল পরিমল লয়ে শীতল জল,
পবনে ঢল ঢল উছলে ফুলে;
বসন্ত রাজা আনি ছয় রাগিণী রাণী,
করিল রাজধানী অশোকমূলে;
কুসুমে পুন পুন, ভ্রমর গুণ গুণ,
মদন দিল গুণ ধনুক হুলে,
যতেক উপবন, কুসুমে সুশোভন,
মধু মুদিত মন ভারত ভুলে ॥

সুন্দরের পুরপ্রবেশ

ওহে বিনোদ রায় ধীরি ধীরি যাও হে,
অধরে মধুর হাসি বাঁশিটি বাজাও হে;
নব জলধর তনু, শিখিগুচ্ছ শুক্রধনু,
পীতধড়া বিজলীতে ময়ূরে নাচাও হে;
নয়ন চকোর মোর, দেখিয়া হয়েছে ভোর,
মুখসুধাকরে হাসিসুধায় বাঁচাও হে,
নিত্য তুমি খেল যাহা, নিত্য ভাল নহে তাহা,
আমি যে খেলিতে কহি, সে খেলা খেলাও হে,
তুমি যে চাহনি চাও, সে চাহনি কোথা পাও,
ভারত যেমন চাহে সেইমত চাও হে ॥

এরূপ মধুমন্ত্র গানে সকলেই মোহিত হয়; ভারত একস্থানে বলিয়াছেন,

সুশোভিত তরুলতা নবদলপাতে,
তর তর থর থর ঝর ঝর বাতে,

অলি পিয়ে মকরন্দ কমলিনীকোলে,
সুখে দোলে মন্দ বায়ে জলের হিল্লোলে।

এ সকল যাদুমন্ত্র বিশেষ বলিলেই হয়। একটি আড়াই অক্ষরের মন্ত্র দেখুন,

নির্মল চন্দ্রিকা, প্রফুল্ল মল্লিকা,
শীতল মন্দ পবন।

স্বভাবের কি অপরূপ চিত্র! এমন সব ছিটেফোঁটায় বাঙালি বশ হইবে তাহার আর বিচিত্রিতা কি?

আর-একটি—

তনু মোর হৈল যন্ত্র, যত শির তত তন্ত্র,
আলাপে মাতিল মন মাতালে নাচায়ো না,
ওহে পরাণবঁধু যাই গীত গায়ো না।

কোন ভাবপ্রসঙ্গে শরীরমধ্যে যে শিরায় শিরায় তাড়িত প্রবাহ চালিত হইতে থাকে তাহা যিনি অনুভব করিয়াছেন তিনিই এ মন্ত্র-মহৌষধের বল বুঝিতে পারিবেন।

এই পর্যন্ত দেখাইয়াই ক্ষান্ত হইতে বলিলাম। মালিনী ও ভারত উভয় পক্ষেই বলা যায় যে

আছিল বিস্তর ঠাট প্রথম বয়সে
এবে বুড়া তবু কিছু গুঁড়া আছে শেষে,
ছিটাফোঁটা মন্ত্রতন্ত্র জানে কতগুলি,
চেঙ্গড়া ভুলায়ে খায় কত জানে ঠুলি।

এখনও ভারত-সমাদরের কিঞ্চিৎ থাকুক, তাহাতেও আপত্তি নাই এবং ভারত ও তাঁহার মালিনী এখনও চেঙ্গড়া ভুলায়ে খাইতে থাকুন, তাহাতেও আপত্তি নাই। কিন্তু যে যুবক মালিনীর বাড়ি বাসা লইয়া থাকে, তাহার দিকে একটু সকলের দৃষ্টি থাকিলে ভাল হয়, আর যে সকল বঙ্গীয় মহাজন ভারতকে মালিনীস্বভাবাপন্ন কবিযোগ্য আদর অপেক্ষা অধিক গৌরব প্রদান করিতে চান তাঁহাদের দিকেও সকলের একটু দৃষ্টি রাখা কর্তব্য!

বৈশাখ ১২৮০

নবেল বা কথাগ্রন্থের উদ্দেশ্য

এক্ষণে ইংলণ্ডে যত গ্রন্থ প্রকাশিত হয়, তাহার মধ্যে বোধ হয় শতকরা ৭৫-খানি কথাগ্রন্থ। কেহ বা শুদ্ধ মনোরঞ্জনের উদ্দেশ্যে, কেহ বা নীতি সংশোধনের নিমিত্ত, কেহ বা কোন পলিটিকেল উদ্দেশ্য সংসাধনের অভিপ্রায়ে, কেহ বা বৈজ্ঞানিক ও দার্শনিক তত্ত্বসমূহ সাধারণের আয়ত্তীকৃত করিবার জন্য কথাগ্রন্থ প্রণয়ন করিতেছেন। আমাদের দেশের লেখকেরাও কমলিনী, কুমুদিনী, শৈবলিনী প্রভৃতি ভিন্ন ভিন্ন নাম দিয়া, নানাপ্রকারের কথাগ্রন্থ বাহির করিতেছেন। সুতরাং এ সময়ে কথাগ্রন্থ সম্বন্ধে দুই-চারিটি কথা বলা অসঙ্গত হইবে না।

উপাখ্যান লিখিবার তিনটি প্রধান প্রণালী প্রচলিত আছে, যথা—নাটক, আখ্যায়িকা ও কথাগ্রন্থ। নাটকে শুদ্ধ নাট্যোল্লিখিত ব্যক্তিগণ কথাবার্তা কহেন। সমস্ত ভাব, সমস্ত কার্য এই ব্যক্তিদের দ্বারা প্রকাশিত হয়। গ্রন্থকার অন্তরালে থাকিয়া, এইসকল ব্যক্তিদিগকে পরিচালিত করেন। আখ্যায়িকায় গ্রন্থকর্তা স্বয়ং সমস্ত বিষয়ের ব্যাখ্যা করেন। গ্রন্থোল্লিখিত ব্যক্তিগণের সহিত আমাদের প্রায় সাক্ষাৎ হয় না। কথাগ্রন্থ এই উভয়ের মধ্যস্থলবর্তী। ইহার কিয়দংশে গ্রন্থোল্লিখিত ব্যক্তিগণ কথাবার্তা কহেন; কিন্তু অন্য অন্য অংশে গ্রন্থকর্তা স্বয়ং আমাদিগকে সমস্ত বিষয় স্পষ্ট করিয়া বুঝাইয়া দেন। নাটক লেখা যত শক্ত হউক বা না হউক; নাটক সম্যক্ প্রকারে বুঝিয়া উঠা অতি কঠিন। নাট্যোল্লিখিত ব্যক্তিগণ কে কি চরিত্রের লোক, কি জন্য ভিন্ন ভিন্ন সময়ে ইঁহারা ভিন্ন ভিন্ন প্রকারে কার্য করেন; সে সমস্ত বুঝিবার জন্য অনেক জ্ঞান, অনেক চিন্তার প্রয়োজন। কথাগ্রন্থলেখক এই জ্ঞান ও এই চিন্তার সম্বন্ধে আমাদের অনেক সাহায্য করেন। গ্রন্থের যে যে অংশ আমরা বুঝিতে পারিব না বলিয়া তাঁহার বোধ হয়, তিনি সেই সেই অংশগুলি আমাদের নিকট অতি পরিষ্কাররূপে বুঝাইয়া দেন। সুতরাং নাটক বুঝা অপেক্ষা কথাগ্রন্থ বুঝা অধিকতর সহজ হইয়া উঠে। যাহা সহজে বুঝা যায়, তাহাতে অধিকতর আমোদ অনুভব করিতে পারা যায়। এইজন্যই দেখিতে পাওয়া যায় যে, সকল দেশেই কথাগ্রন্থের সৃষ্টি হইলে আর নাটক বা আখ্যায়িকার সমধিক আদর থাকে না। আখ্যায়িকায় সমস্ত বস্তুই গ্রন্থকর্তা নিজের ভাষায় বর্ণনা করেন। সুতরাং নাটকে যেরূপ নাট্যোল্লিখিত ক্রিয়ার বা ব্যক্তির সাক্ষাৎ প্রতিমূর্তি দেখিতে পাওয়া যায় আখ্যায়িকায় তাহা পাইবার সম্ভাবনা নাই। এজন্য আখ্যায়িকা অপেক্ষা নাটকে অধিকতর আমোদ আছে।

কথাগ্রন্থ নূতন সৃষ্টি। সংস্কৃতে অধিকাংশ গ্রন্থই কবিতায় লিখিত হইত। যে কয়খানি গদ্যগ্রন্থ আছে, তাহাদের অধিকাংশই আখ্যায়িকা। কাদম্বরী, দশকুমারচরিত প্রভৃতি এই-শ্রেণীভুক্ত। সংস্কৃতে নাটকও অনেক ছিল। কিন্তু নাটক ও আখ্যায়িকামিশ্রিত কোন কথাগ্রন্থ সংস্কৃতে ছিল বলিয়া আমাদের বোধ হয় না। ইংলণ্ডেও কথাগ্রন্থের অতি অল্প দিন মাত্র সৃষ্টি হইয়াছে। পূর্বে ইংলণ্ডের উপাখ্যান সমস্ত আখ্যায়িকার প্রণালীতে লিখিত হইত। এইসকল আখ্যায়িকায় বড় বড় রাজার ও বীরপুরুষের বীরকীর্তি সমস্ত বর্ণিত হইত। ইংলণ্ডে নাটকও অনেক ছিল। কিন্তু কেবল ডিফোর সময় হইতে বর্তমান প্রকারের কথাগ্রন্থ প্রকাশিত হইতে আরম্ভ হয়। অনেকে মনে করেন যে, নাটক লিখিবার জন্য যেরূপ প্রতিভা বা ক্ষমতার প্রয়োজন, এক্ষণে মনুষ্যের আর সেরূপ ক্ষমতা বা প্রতিভা নাই। কথাগ্রন্থে প্রতিভার প্রয়োজন আছে বটে, কিন্তু নাটকীয় প্রতিভা অপেক্ষা, এই প্রতিভা অনেক অংশে ন্যূন। এই জন্যই এক্ষণে আর নাটক লিখিত হয় না। মনুষ্যের প্রতিভা দিন দিন কমিতেছে, এক্ষণে ইহা কথাগ্রন্থ পর্যন্ত যাইতে পারে, নাটক পর্যন্ত যাইবার ক্ষমতা আর ইহার নাই। এই মতটি আমার সত্য বলিয়া বোধ হয় না, কারণ শেক্সপীয়রকে ছাড়িয়া দিলে যে সকল নাটককার অবশিষ্ট থাকেন, তাঁহারা যে প্রতিভা সম্বন্ধে ফিল্ডিং, ডিকেন্স, থ্যাকারে প্রভৃতি অপেক্ষা কোন অংশে উৎকৃষ্ট তাহা আমাদের বোধ হয় না। ফলতঃ কথাগ্রন্থ নাটকের ন্যায় সমান আমোদ প্রদান করে। নাটকে যে যে উপদেশ পাওয়া সম্ভব, কথাগ্রন্থেও সেই সেই উপদেশ পাওয়া যায়। তবে এক কথা এই যে, নাটক সকলে সহজে বুঝিতে পারে না। কথাগ্রন্থ সকলে সহজে বুঝিতে পারে। এজন্য লোকে নাটকের আদর না করিয়া কথাগ্রন্থের আদর করিয়া থাকে। যে কারণেই হউক, ইহা স্পষ্ট দেখিতে পাওয়া যাইতেছে যে, যতদিন কথাগ্রন্থের প্রকাশ ছিল না, ততদিন নাটকের অতি সমাদর ছিল। কিন্তু কথাগ্রন্থের প্রকাশ হওয়া অবধি নাটক ক্রমশঃ হতাদরই হইতেছে।

আমাদের দেশে বঙ্কিমবাবু হইতে কথাগ্রন্থের প্রথম প্রকাশ আরম্ভ হইয়াছে। এই কথাগ্রন্থ ইংরেজী কথাগ্রন্থের সম্পূর্ণ অনুকরণ। ইহাতে অনেক স্থলে ইংরেজী চরিত্র, ইংরেজী ভাব, এমনকি ইংরেজী ভাষা পর্যন্ত* অনুকরণ করা হইয়াছে। বঙ্কিমবাবুর প্রতিভাগুণে এই অনুকরণের মধ্যেও নানাপ্রকারের

* দুর্গেশনন্দিনী-"যদি সেই সময়ে মন্দিরমধ্যে বজ্রপতন হইত, তাহা হইলে তাঁহারা অধিকতর চমকিত হইতেন না।" ইংরেজী অনেক নভেলে ঠিক এই ভাবটি এই ভাষায় বর্ণিত হইয়াছে।

সৌন্দর্য অনুপ্রবিষ্ট হইয়াছে। তাহার পর হইতেই বাঙ্গালায় নভেলের সংখ্যা দিন দিন বর্ধিত হইতেছে।

কথাগ্রন্থ প্রধানতঃ দুই প্রকারের। প্রথম প্রকারের নাম ইংরেজীতে রোমান্স। ইহা বীররসপ্রধান। ইহাতে যুদ্ধ, বিগ্রহ, রাজা, বীরপুরুষ, রাজকীর্তি, বীরকীর্তি প্রভৃতি বর্ণিত হয়। বাংলায় দুর্গেশনন্দিনী, বঙ্গাধিপপরাজয়, শতবর্ষ প্রভৃতি কথাগ্রন্থগুলি এই শ্রেণীভুক্ত। দ্বিতীয় প্রকারের কথাগ্রন্থে প্রকৃত ঘটনা সমস্ত বর্ণিত হয়। যে সকল ঘটনা আমরা আমাদের মধ্যে নিত্য দেখিতে পাই, সেইগুলি এইরূপ কথাগ্রন্থে আমাদের নিকট সুন্দররূপে প্রতিভাসিত হয়। বিষবৃক্ষ, কৃষ্ণকান্তের উইল, স্বর্ণলতা প্রভৃতি গ্রন্থগুলি এই শ্রেণীভুক্ত।

পাঠকের মনোরঞ্জন করা—এইমাত্র পূর্বে উপাখ্যান লিখিবার প্রধান উদ্দেশ্য ছিল। ইউরোপীয়েরা পূর্বে অত্যন্ত যুদ্ধপ্রিয় ছিলেন। এজন্য তাঁহাদের মনোরঞ্জনের নিমিত্ত যুদ্ধসম্বন্ধীয় ঘটনা সমস্ত বিবৃত হইত। এখনও ইউরোপে যুদ্ধপ্রিয়তা কমে নাই। সুতরাং যুদ্ধবর্ণনা ইউরোপীয় কথাগ্রন্থের প্রধান উপাদান। বাঙ্গালা কথাগ্রন্থ ইউরোপীয় কথাগ্রন্থের অনুকরণ। সুতরাং বাঙ্গালা কথাগ্রন্থেও যুদ্ধাদি সন্নিবিষ্ট হইয়াছে। ইহাতে এই লাভ হইয়াছে যে, আমাদের মধ্যে ডন্ কুইক্সটের প্রণালীর যুদ্ধপ্রিয়তা অত্যন্ত বর্ধিত হইয়াছে। শীর্ণ বঙ্গীয় যুবক আপনাকে জগৎসিংহ বা হেমচন্দ্রের অবস্থায় উপস্থাপিত করে, এবং এইরূপে লোকের নিকট অতীব উপহাসাস্পদ হয়। "ভারত উদ্ধার"-লেখক এ বিষয়ের সাক্ষী। পাঠকের মনে পড়িতে পারে—

"বঁটাইয়া দিব আজি পাষণ্ড ইংরেজে।"

কিন্তু রোমান্স পাঠে যে এককালেই কিছুমাত্র লাভ নাই তাহা নয়। ইহাতে কল্পনাশক্তির প্রচুর পরিচালনাবশতঃ একরূপ অদ্ভুত আনন্দ জন্মে। যুবকেরা যে কি আনন্দের সহিত স্কটের "আইভ্যানহো" বা বঙ্কিমবাবুর "দুর্গেশনন্দিনী" পাঠ করে, তাহা মনে হইলে, বিস্ময়ান্বিত হইতে হয়। কিন্তু এ আনন্দ ক্ষণিক। ইহার ফলবত্তা অতি অল্পই আছে। যাহা কিছু ফলবত্তা আছে, তাহাও বোধ হয়, অনিষ্টের দিকে। কল্পনাশক্তির প্রচুর পরিচালনা হওয়াতে বিবেচনাশক্তির কিঞ্চিৎ হ্রাসতা হয়। এবং বস্তুত যথার্থ ব্যবহার না দেখিয়া, কেবল তাহার সৌন্দর্য, মনোহারিত্ব প্রভৃতি দেখিতে ইচ্ছা হয়। সাংসারিক অনেক কার্যের প্রতি বীতশ্রদ্ধ হইতে হয়। মনুষ্য আপনাকে অত্যন্ত উন্নত করিতে ইচ্ছা করে। ইচ্ছা করে মাত্র, কিন্তু সেই পর্যন্ত তাহার নিজের বা সংসারের কিছুমাত্র উন্নতি হয় না, উপকারও হয় না, কেবল পদে পদে মনস্তাপ পায়।

কথাগ্রন্থের আলোচনায় লাভালাভের বিচার দেখিয়া হয়তো অনেকে বলিয়া

উঠিবেন, নভেল গল্পের বই। নদীর স্রোতের মত উহাতে গড়াইয়া যাইব। ইহাতে আবার লাভালাভ দেখিব কি? ফুল ফুটিয়াছে দেখিয়া নয়নের তৃপ্তি হইবে, তাহাতে লাভালাভের প্রশ্ন উত্থিত করিলে, ধান ভানিতে শিবের গীত করা হয়। যদি এই মতটি সত্য হয়, তাহা হইলে নভেলের সংখ্যা যে এত বর্ধিত হইতেছে, ইহা পৃথিবীর পক্ষে অনিষ্টকর বলিতে হইবে। নৃত্য, গীত প্রভৃতি যে সকল কলায় শুদ্ধ আমোদানুভব হয়, সংসারে তাহাদের নভেলের মতো আদর নাই। প্রধান প্রধান পণ্ডিতেরা নৃত্যগীতে অতি অল্প সময় ব্যয়িত করেন। কিন্তু নভেল লেখায় বা নভেল পড়ায় অনেক মহা পণ্ডিত আপনা-দিগকে নিযুক্ত রাখিয়াছিলেন। যদি নভেল শুদ্ধ আমোদের বস্তু হয়, তাহা হইলে ইহার এত আদর কেন? এক্ষণে 'ব্যবহারোপযোগিতা' লইয়া ইংলণ্ড একপ্রকার উন্মত্ত হইয়াছেন। সেখানে শুদ্ধ আমোদের বস্তুর এত আদর কেন? ফলতঃ, যদিও অনেক নভেল কেবল মনোরঞ্জনের উদ্দেশ্যে লিখিত হয়, তথাপি ইহা অবশ্য স্বীকার করিতে হইবে, যে সারবত্তা না থাকিলে, নভেল কখনই শিক্ষাবিষয়ে এত উচ্চ স্থান পাইত না। নভেল ফুলের ন্যায় সুন্দর বটে, কিন্তু ফলই ইহার পরিণাম।

ইহাতে কেহ হয়তো আপত্তি করিবেন যে "সত্যবর্ণনাই নভেলের উদ্দেশ্য। লাভালাভবিচার তাহার উদ্দেশ্য নহে। এই পৃথিবীতে আমরা যে বস্তু যেরূপ দেখিতে পাই, সেই বস্তুটি যথাযথরূপে বর্ণিত করিলেই উপন্যাসলেখকের উদ্দেশ্য সিদ্ধ হয়। ফিল্ডিংএর টম্ জোন্স এইরূপ নভেলের দৃষ্টান্ত। টম্ জোন্স যখন যে অবস্থায় পড়িয়াছিলেন, গ্রন্থকর্তা অসঙ্কুচিত হৃদয়ে তাহা বর্ণনা করিয়াছিলেন। নভেল লিখিতে হইলে, এইরূপেই লেখা উচিত।" কিন্তু সত্য দুই প্রকার, আংশিক সত্য ও সম্পূর্ণ সত্য। কোন উকিল যে কখন স্পষ্ট মিথ্যাকথা কহেন, এমত নহে। তিনি যতদূর বলেন, ততদূর সত্য। কিন্তু তিনি সমস্ত কথা বলেন না। মনে করুন, আপনি বলিলেন, "চোর সিঁধ দিল, ধরা পড়িল না, বাড়ি ফিরিয়া আসিল, পথে কোন বিপদ ঘটিল না, বাড়িতে আসিয়া অপহৃত ধন লইয়া সে গাড়ি, ঘোড়া করিল, সকলের নিকট সম্মানিত হইল।" যদি এই পর্যন্ত বলিয়াই আপনি ক্ষান্ত হন, তাহা হইলে আপনি সত্যের আংশিক বর্ণনা করিলেন। কারণ চোর অনেক সময় ধৃত হয়, জেলে যায়, বহুতর কষ্ট পায়, এবং কখন কখন দ্বীপান্তরিত হয়। যেখানে সত্যের আংশিক বর্ণনা, সেখানে নানাবিধ অনিষ্টের আশঙ্কা। কারণ সত্য-মিথ্যা নির্বাচন করিয়া লওয়া অতীব কঠিন। মিথ্যাবর্ণনা সকল সময়ে অবিধেয়। কিন্তু সম্পূর্ণ মিথ্যায় প্রায় কাহারও অনিষ্ট হয় না। কারণ লোকে অক্লেশে

তাহার মিথ্যাত্ব বুঝিতে পারে। প্রণয় নভেলের পরম পদার্থ। এই প্রণয়ের বর্ণনা নভেলে নিম্নরূপে প্রকটিত হয়—"যুবক যুবতী উভয়ে অতীব রূপবান্, অতীব গুণবান্। যুবক পুরুষদিগের সর্বোৎকৃষ্ট, নারী যুবতীদিগের সর্বোৎকৃষ্টা। উভয়ের পরস্পর সাক্ষাৎ হইল। যে কারণেই হউক, উভয়ে উভয়কে ভালবাসিল। তাহার পর উভয়ে সংসারের সমস্ত বস্তু উপেক্ষা করিতেছেন, পিতামাতার আজ্ঞা অবহেলা করিতেছেন, হয়তো কোন সময়ে উভয়ে কোন কোন অসৎ কর্মও করিয়া ফেলিতেছেন। তাহার পরে উভয়ের বিবাহ হইল।" এখানেই অনেক নভেলের সমাপ্তি হয়। যতদূর ইহাতে বলা হইয়াছে তাহার মধ্যে একটি কথাও মিথ্যা নয়। কিন্তু ইহাতে সকল কথা বলা হয় নাই। বিবাহের পর যুবক যুবতী অনেক দিন বাঁচিয়া থাকে, সংসারের অনেক প্রলোভন অনেক বিঘ্ন বিপদ তাহাদের সম্মুখে উপস্থিত হয় এবং তাহারা আপন আপন পূর্ব চরিত্র অনুসারে সুখী বা দুঃখী হইয়া জীবন অতিপাত করে। সুতরাং যাঁহারা যুবক-যুবতীর বিবাহ দিয়াই নভেলের সমাপ্তি করেন, তাঁহারা মনুষ্য-হৃদয়ের একমাত্র অংশ উজ্জ্বলবর্ণে রঞ্জিত করিয়া অপর সমস্ত অংশের মনোহারিত্ব কমাইয়া দেন।

আর-এক কথা, কোন্‌টি সত্য কোন্‌টি মিথ্যা, তাহা কি কোথাও নির্বিবাদে স্থিরীকৃত হইয়াছে? তুমি যাহাকে সত্য বল, আমি তাহাকে মিথ্যা বলি, তুমি যাহা স্বাভাবিক বল, আমি তাহা কাল্পনিক * বলি। তবে তুমি যাহাকে সত্য বলিয়া মনে কর, শুদ্ধ সেইরূপ অনিশ্চিত সত্যের জন্য আমার সুখের আশা কেন হারাইব।

আর-এক কথা, সত্য বলিতে হইবে কেন? সত্য বলায় লাভ আছে, অসত্য বলায় অনিষ্ট আছে। সুতরাং সত্যাসত্যের বিচার প্রকারান্তরে লাভালাভের বিচার ভিন্ন অন্য কিছুই নয়।

আর-এক দল লোক আছেন, তাঁহারা বলেন যে, স্বভাববর্ণনাই নভেলের উদ্দেশ্য। রুশো এই স্বভাবর্ণনার প্রবর্তক। মনুষ্য স্বভাবতঃ যেরূপ, তাহাই বর্ণনা করিতে হইবে। কেন? মনুষ্য স্বভাবতঃ অতি সুন্দর, স্বভাবের ব্যত্যয় করিলেও অনিষ্ট বই ইষ্ট হয় না।' সুতরাং এ স্থলেও লাভালাভের প্রশ্ন উত্থিত হইতেছে, কিন্তু ইহাতে নানারূপ আপত্তি আছে। আমরা স্বভাবতঃ সুন্দর-

*সিজউইক্ লাভালাভ সম্বন্ধেও এই প্রশ্ন উত্থাপিত করিয়াছেন। তিনি বলেন তুমি যাহাকে লাভ বল, আমি তাহাকে অলাভ বলি, আবার তুমি যাহাকে অলাভ বল, আমি তাহাকে পরমলাভ বলিয়া মনে করি। কিন্তু সত্যাসত্য বুঝিতে মনুষ্যের মধ্যে যেরূপ বিসম্বাদিতা, লাভালাভ সম্বন্ধে, বোধ হয়, তাহা অপেক্ষা অনেক কম।

স্বভাব কি না তাহার সম্বন্ধে অনেক তর্ক আছে। সে সকল তর্কের এক্ষণে কোন প্রয়োজন নাই। এখানে এই পর্যন্ত বলিলেই পর্যাপ্ত হইবে যে লাভালাভের বিচার কথাগ্রন্থে অপ্রাসঙ্গিক নয়।

আমরা পূর্বে দেখিয়াছি যে, রোমান্স পাঠে অধিক লাভ হয় না। ইহাতে কেবল কল্পনাশক্তির সম্যক্ পরিচালনা হয় মাত্র। আমাদের চরিত্রসম্বন্ধে যে কিছু পরিবর্তন জন্মে, তাহার অধিকাংশই অনিষ্টের দিকে। এজন্যই এক্ষণে রোমান্সের সহিত সাধারণতঃ মনুষ্যের সহানুভূতি দেখিতে পাওয়া যায় না।

এক্ষণে দেখিতে হইবে, দ্বিতীয় প্রকারের কথাগ্রন্থ পাঠে কোনরূপ লাভ হয় কি না। আমাদের দেশের কথাগ্রন্থ প্রধানতঃ ইংরেজী কথাগ্রন্থের অনুকরণ। সুতরাং আমাদের কথাগ্রন্থের লাভালাভ বিচার করিতে হইলে ইংরেজী কথাগ্রন্থ পর্যন্ত অনুসন্ধান করা কর্তব্য। দ্বিতীয় প্রকারের কথাগ্রন্থ (আমরা ইহার নাম গার্হস্থ্য কথাগ্রন্থ রাখিলাম) পূর্বোক্ত প্রণালীতে আলোচনা করাই এই প্রস্তাবের মুখ্য উদ্দেশ্য।

সমাজের অবস্থা অনুসারে মনুষ্যের চিন্তাস্রোতও পরিবর্তিত হয়। যখন সমাজ ধর্মপরায়ণ, তখন মনুষ্যের রচনায় ধর্মের আধিক্য দেখিতে পাওয়া যায়। আবার যখন সমাজ অধঃপতিত হইতে আরম্ভ হয়, তখন মনুষ্যের রচনাতেও এই অধঃপাতের লক্ষণ দেখিতে পাওয়া যায়। ইংলণ্ড যখন ধর্ম লইয়া উন্মত্ত, তখন মিল্টন্ তাঁহার 'প্যারাডাইস লস্ট' লিখেন। আবার যখন নীচপ্রকৃতি দ্বিতীয় চার্লস ফ্রান্সের উচ্ছৃঙ্খলতা ইংলণ্ডে প্রবর্তিত করেন, তখন ড্রাইডেন তাঁহার "All for Love" প্রভৃতি জঘন্য নাটক লিখেন। যাঁহারা এই সমাজস্রোতে গড়াইয়া যান, তাঁহারা পরবংশীয়দিগের নিকট বিশেষ ধন্যবাদ প্রাপ্ত হন না। কিন্তু যাঁহারা সমাজের অবনতি দেখিয়া সমাজস্রোতের বিপরীতে দণ্ডায়মান হইয়া সমাজকে সুপথে পরিবর্তিত করিতে চেষ্টা করেন তাঁহারাই সর্বসাধারণের যথার্থ ধন্যবাদের পাত্র। যখন ড্রাইডেন, উইচারলি, কনগ্রিভ প্রভৃতি জঘনা জঘন্য গ্রন্থ লিখিয়া সমাজকে উৎসন্ন দিতেছিলেন, সেই সময়ে জেরিমি কলিয়ার এইরূপ সমাজ-পরিবর্তনের চেষ্টা করেন।

এক্ষণে ইংলণ্ডে অর্থোপার্জনই জীবনের মুখ্য উদ্দেশ্য হইয়াছে। গাড়ি, ঘোড়া, ঘর, বাড়ি, অলঙ্কার, পোশাক প্রভৃতি ভোগবিলাস সকলের একমাত্র ধ্যেয় হইয়া উঠিয়াছে। কিন্তু অর্থোপার্জন করিতে হইলে অনেকটা কঠোরহৃদয় হওয়া আবশ্যক। আমাদের দেশে চলতি কথায় বলে, "চক্ষুলজ্জা যাঁর অর্থনাশ তাঁর।" ইংলণ্ড অনেক দিন হইতে এই চক্ষুলজ্জার মাথা খাইতেছেন। কর্তব্যকার্য্যের জন্য (অর্থাৎ অর্থোপার্জনের জন্য) ইংলণ্ড সকল প্রকার চক্ষুলজ্জা

ত্যাগ করিতে প্রস্তুত। সুতরাং ইংলণ্ডে কঠোরহৃদয়তার অত্যন্ত প্রাদুর্ভাব হইয়া উঠিয়াছে। যাহাতে এই কঠোরহৃদয়তার হ্রাস হয়, ইংলণ্ডের নভেলিস্টগণ সেই চেষ্টা করিতেছেন। ডিকেন্সের প্রত্যেক নভেলে অন্ততঃ একজন কঠোরহৃদয় অর্থপিশাচ আছে। ইহারা সকলেই নানারূপ কষ্টে পড়িয়া শেষ দশায় অত্যন্ত যাতনা পাইয়া, সকল লোকের নিকট অবমানিত হইয়া, কেহ বা আত্মহত্যা করিয়া, কেহ বা রাজদণ্ডে দণ্ডিত হইয়া প্রাণত্যাগ করিয়াছে। এইরূপ চরিত্র বর্ণনার উদ্দেশ্য এই যে, মনুষ্য কঠোরহৃদয়তার এই সকল ফল দেখিতে পাইয়া আর কঠোরহৃদয় হইতে চাহিবে না। ডিকেন্সের প্রত্যেক নভেলে আর-একটি চরিত্র বর্ণিত আছে।* ইঁহাদের অর্থের প্রতি সম্পূর্ণ অনাদর। ইঁহারা স্বকীয় সহৃদয়তার বলে নানারূপ সুখসম্ভোগ করতঃ অবশেষে সকলের নিকট সম্মানিত হইয়া প্রাণত্যাগ করিয়াছেন। এইরূপ বর্ণনার উদ্দেশ্য এই যে, মনুষ্যের হৃদয়ে কিঞ্চিৎ পরিমাণে অর্থের প্রতি অনাদর হইবে এবং কঠোরহৃদয়তার স্থলে কিঞ্চিৎ পরিমাণে সহৃদয়তা আসিবে। ডিকেন্সের উপদেশ এই—"অর্থের লোভে কঠোরহৃদয় হইও না, কারণ তাহাতে অনেক কষ্ট পাইতে হয়। অর্থের লোভ ত্যাগ করিয়া সহৃদয় হও, কারণ তাহাতে পরিণামে অনেক সুখ পাওয়া যায়।" ইংলণ্ডের এক্ষণে যেরূপ সমাজের অবস্থা, তাহাতে ডিকেন্সের নভেল যে সেখানকার পক্ষে নিতান্ত উপযোগ্য, তাহাতে আর কিছুমাত্র সন্দেহ নাই।

কিন্তু বঙ্গসমাজের অবস্থা, ইংলণ্ডীয় সমাজের অবস্থা হইতে সম্পূর্ণ স্বতন্ত্র। সুতরাং ইংলণ্ডে যাহা অতীব উপকারী, এখানেও যে তাহা উপকারী হইবে, এরূপ আশা করা যায় না। ইংলণ্ড এক্ষণে লক্ষ্মীদেবীর বিলাসভূমি। ইংলণ্ডে স্বর্ণমুদ্রায় বিনিময়কার্য সম্পাদিত হয়। রাশি রাশি ধনের উপর বসিয়া ইংলণ্ড ধনের স্পৃহা একটু ত্যাগ করিতে পারেন। কিন্তু ইংলণ্ডের দেখাদেখি যদি তুমি আমি ধনস্পৃহা ত্যাগ করি, তাহাতে সংসারের অনিষ্ট বই ইষ্ট হইবে না। কঠোরহৃদয়তা আমাদের দেশে প্রবল নয়। অর্থার্জনচেষ্টা আমাদের দেশে বড় নাই। বৈরাগ্য আমাদের দেশের প্রধান শিক্ষা, সুতরাং আমাদের দেশে সহৃদয়তা কিছু কমাইয়া অর্থার্জনচেষ্টা কিঞ্চিৎ বর্ধিত করা উচিত। সুতরাং ইংলণ্ড যে পথে চলিতেছেন, এ বিষয়ে আমাদের ঠিক তাহার বিপরীত পথে চলা উচিত। অর্থার্জনস্পৃহা ও সহৃদয়তা উভয়েরই দোষগুণ আছে। সমাজের অবস্থা অনুসারে কাহারও বা বৃদ্ধি, কাহারও বা হ্রাস হওয়া উচিত।

পূর্বের দৃষ্টান্ত দেখিলে বুঝিতে পারা যাইবে যে, ইংলণ্ডে যে প্রবৃত্তিটি পরিপুষ্ট

*"নিকোলাস নিকল্‌বির" "র‍্যালফ্ নিকলবি" ও "নিকলাস নিকলবির" কথা পাঠক মহাশযেব মনে পড়িতে পারে।

হওয়া আবশ্যক, এদেশে সেই প্রবৃত্তিটি দমিত হওয়া প্রয়োজনীয়। আবার ইংলণ্ডে যে প্রবৃত্তিটি দমিত হওয়া আবশ্যক, আমাদের এখানে সেইটি পরিবর্ধিত করা উচিত। সুতরাং ইংলণ্ডের অনুকরণে আমাদের ইষ্ট হওয়ার সম্ভাবনা অপেক্ষা অনিষ্ট হওয়ার সম্ভাবনা অধিক। আর-একটি দৃষ্টান্ত দিয়া আমরা এ বিষয়টি আরও স্পষ্ট করিয়া বুঝাইতে চেষ্টা করিব।

প্রণয় কবিমাত্রেরই আদরের বস্তু। কিন্তু প্রণয় লইয়াই নভেল লেখকদের ব্যবসা। কিন্তু এই প্রণয়ের ভাব ইংলণ্ডে একরূপ ও আমাদের দেশে অন্যরূপ। ইংলণ্ডীয়দের মতে প্রণয় হৃদয়ের কার্য। হৃদয় বলিল, অমুককে ভালবাস, অমনি তাহাকে ভালবাসিলাম। হৃদয় বলিল, অমুককে ভালবাসিও না, অমনি আমার ভালবাসা বন্ধ হইল। আমার একজন স্বামী আছেন। কিন্তু আমি তাঁহাকে ভালবাসিতে পারি না। কেন? আমার হৃদয় আমাকে এ বিষয়ে সম্মতি দেয় না! হৃদয়ের কথা যে সকল সময়ে আমাকে শুনিতে হইবে তাহা নয়। হৃদয় আমাকে অনেক সময় অনেক অন্যায় কার্য করিতে বলে। জ্বরের সময় হৃদয়, জল খাইতে বলে, অপরের টাকা ধার লইলে হৃদয় আর তাহা শোধ করিতে চায় না, ইত্যাদি। এ সকল সময়ে হৃদয়কে দমিত করিতে হইবে। কিন্তু প্রণয়ের বেলা হৃদয় যাহা বলিবে, তাহাই শিরোধার্য। শৈবলিনীর স্বামী উদার, মহান্ এবং সর্বগুণান্বিত। শৈবলিনী অনেক বুঝাইল, অনেক মিনতি করিল, কিন্তু হৃদয় রাজি হইল না। সুতরাং শৈবলিনী প্রতাপকে বিবাহের পরেও পূর্বের ন্যায় ভালবাসিতে লাগিল। ইহাতে শৈবলিনীর দোষ হইল বটে, কিন্তু সে দোষ অতি অল্প। কেন অল্প? শৈবলিনীর হৃদয় তাহাকে ভালবাসিতে বলে নাই। কুন্দ বেচারাও হৃদয়কে অনেক বুঝাইল। শুধু কুন্দ কেন? কুন্দ বুঝাইল, কমল বুঝাইল, সূর্যমুখী বুঝাইল। কিন্তু কুন্দের হৃদয় বুঝিল না।* ইহাতে যে কুন্দের দোষ হইল না, তাহা নয়। কিন্তু সে দোষকে যদি তুমি দোষ বলিয়া মনে কর, তাহা হইলে তুমি নিষ্ঠুরহৃদয় পাষণ্ড। কেন কুন্দের হৃদয় তাহাকে ভালবাসিতে বলিয়াছিল।

পূর্বের ভাবগুলি ইংরেজদের। ইংরেজের দেশে ইহা সম্ভব। কারণ বালিকাকাল হইতেই যুবতী প্রণয় সম্বন্ধে আপনাকে স্বাধীন দেখিতে পায়। ইহাতে তাহার সমাজে নিন্দা হয় না। কিন্তু আমাদের দেশে বিবাহের পর হইতে প্রণয়ের অঙ্কুর আরম্ভ হয়। বিবাহের পূর্বে পাত্র কন্যা কেহ কাহাকে দেখিতে

*নগেন্দ্র নিজেই বলিয়াছিল, "আমি নিজের সহিত যুদ্ধ করিয়া ক্ষত বিক্ষত হইয়াছি, কিন্তু আমার হৃদয় বশ হইল না।"

পায় না। আমাদের দেশে প্রণয় সমাজপ্রথার অধীন মাত্র। তোমার হৃদয়কে ইহাতে সমাজের বশে চলিতে হইবে। যেমন অন্য স্থলে, তুমি হৃদয়কে সমাজের বশবর্তী করিতে চেষ্টা কর, প্রণয়ের বেলাও তোমাকে তাহাই করিতে হইবে। হৃদয় তোমাকে আইনের বশবর্তী হইয়া চলিতে নিষেধ করে, হৃদয় তোমাকে অন্যের উপার্জিত অর্থ বলপূর্বক লইতে বলে। তুমি এ সকল স্থলে হৃদয়ের আজ্ঞা উপেক্ষা করিয়া সমাজের উপদেশমতে চলিয়া থাক। প্রণয়ের বেলাও তোমাকে তাহাই করিতে হইবে। পিতা, মাতা যাঁহাকে স্বামী কি স্ত্রী বলিয়া আমার সম্মুখে উপনীত করিলেন, আমি তাঁহাকে যাবজ্জীবন ভালবাসিব, হৃদয়ের হৃদয়ে তাঁহাকে যত্নের সহিত রক্ষা করিব। যদি হৃদয় ইহাতে কোনরূপ অসন্তোষ বা বিরক্তি প্রকাশ করে, আমি সেই পাপিষ্ঠ হৃদয়কে পদতলে মর্দিত করিব, প্রয়োজন হইলে খণ্ড খণ্ড করিয়া ছিঁড়িয়া ফেলিব, কিন্তু আমার হৃদয়মন্দিরের দেব বা দেবীকে সিংহাসনচ্যুত করিব না। রোগে, শোকে, বিপদে, সম্পদে, দুঃখে, সুখে ছায়ার ন্যায় উহার সঙ্গে সঙ্গে ফিরিব। সম্মুখে কি আছে দেখিব না, পার্শ্বে কি আছে দেখিব না। যদি স্বামী হই, স্ত্রীকে বক্ষে করিয়া যাবজ্জীবন কাটাইব। যদি স্ত্রী হই, স্বামিপদে মস্তক রাখিয়া জীবন কাটাইব।

ইহাই বঙ্গদেশের প্রণয়ের লক্ষণ, যাঁহারা হৃদয়ের প্রলোভনে মোহিত হইয়া ইহার অন্যথাচারণ করেন, তাঁহারা আমাদের দেশে ঘৃণ্য। ইংরেজদের মত তাঁহাদের দেশে সত্য হইলে হইতে পারে, কিন্তু আমরা ইহাকে প্রাণ ধরিয়া আমাদের দেশে সত্য বলিয়া স্বীকার করিতে পারি না। বৈজ্ঞানিকেরা সতীত্বকে মনের ভ্রম বলিয়া বুঝাইতে পারেন, দার্শনিকেরা সতীত্বকে কুসংস্কার বলিয়া উপহাস করিতে পারেন, কিন্তু সতীত্ব আমাদের কলঙ্কিত মস্তকের একমাত্র উজ্জ্বল মণি। ইংলণ্ডে কি অন্য পূর্বোক্ত মতের আদর দিন দিন বাড়িতেছে, তাহা আমরা নিশ্চয় করিয়া বলিতে পারি না। জর্জ ইলিয়ট হইতে সামান্য নভেল-লেখক পর্যন্ত কিজন্য প্রণয়কে এই অপবিত্র আকারে চিত্রিত করেন, তাহা আমরা ঠিক করিয়া বলিতে পারি না। ইংরেজেরা স্বাধীনতাপ্রিয়। বোধ হয় প্রণয়সম্বন্ধেও স্বাধীনতা আনিতে ইঁহারা ইচ্ছা করেন। আমরা অন্য সকল বিষয়ে স্বাধীনতার ইচ্ছুক হইলে হইতে পারি, কিন্তু আমরা প্রণয়ের স্বাধীনতা চাই না। ড্রাইডেন বলিতে পারেন—"One to one was cursedly confined"। আমরা বলিব—"One to one was blessedly confirmed"।

যাহা হউক, এক্ষণে দেখা গেল, যে ইংলণ্ডীয়েরা প্রণয়কে যে আকারে চিত্রিত করেন, আমাদের দেশে তাহা লাম্পট্যসূচক এবং অতীব ঘৃণাজনক।

সতীত্বের বৃদ্ধিতে যে সমাজের সুখবৃদ্ধি হয় তাহা বলিবার প্রয়োজন নাই। যদি প্রণয় হইতে এই সতীত্বটুকু বাদ দেওয়া যায়, তাহা হইলে পশুভাব ভিন্ন আর কিছুই অবশিষ্ট থাকে না। আমাদের বিশ্বাস এই যে প্রণয় সম্বন্ধে ইংলণ্ড আজিও সভ্যপদবীতে আরূঢ় হন নাই। কারণ যে দেশ যত সভ্য হইবে, সে দেশে সমাজের আজ্ঞা ততই সম্মানার্হ বলিয়া গণ্য হইবে। সুতরাং যদি ইংলণ্ডীয় প্রণয়ভাব আমরা অবিকল অনুকরণ করি, তাহাতে আমাদের এই লাভ হইবে যে আমরা স্বদেশীয় সতীত্বের প্রতি বীতশ্রদ্ধ হইয়া প্রণয়কে কেবল পশুভাবপূর্ণ বলিয়া মনে করিব।

যাঁহারা এই সমস্ত বিবেচনা করিয়া, আমাদের দেশের অভাব সমস্ত হৃদয়ঙ্গম করতঃ, সেই সমস্ত অভাব দূরীকরণের চেষ্টায় নভেল লিখিবার প্রয়াস পাইবেন তাঁহাকে আমরা আমাদের যথার্থ হিতৈষী বলিয়া সহস্র সহস্র ধন্যবাদ দিব। আর যাঁহারা শুদ্ধ মনোরঞ্জনের উদ্দেশ্যে ইংরেজী ভাব সমস্তের অবিকল "তরজমা" করিয়া আমাদের সম্মুখে উপস্থাপিত করিবেন, তাঁহারা প্রতিভাশালী হইতে পারেন, কিন্তু তাঁহাদিগকে কখনই দেশের ধন্যবাদার্হ বলিয়া মনে করিতে পারিব না।

বৈশাখ ১২৮৭

হিন্দুদিগের নাট্যাভিনয়

মনুষ্য স্বভাবতঃ আমোদপ্রিয়। দৈনন্দিন কার্য সমাপনান্তে একজন বিষয়ী ব্যক্তিরও কোন প্রকার আমোদে কিয়ৎকাল অতিবাহিত করিতে বাসনা হয়। কালক্রমে সমাজের সংস্কার ও অবস্থার পরিবর্ত সহকারে আমোদ-প্রমোদের পরিবর্ত হইতেছে। সর্বপ্রকার আমোদ-প্রমোদের মধ্যে তৌর্যত্রিক সর্বপ্রধান, এবং কি সভ্য বা অসভ্য সকল জাতির আদরণীয়। সুসভ্য ইউরোপীয়েরা যন্ত্রসহযোগে বীটোবন বা বেলীনির সঙ্গীতে, হিন্দুগণ বিশুদ্ধ তানলয়-সংযোগে সুমধুর "গীতগোবিন্দ গানে" এবং অসভ্য আদিমবাসিগণ ঢক্কা বা দামামা বাদন দ্বারা স্ব স্ব অবকাশকাল অতিবাহিত করেন। ইহার মধ্যে বীণাবাদনকারী এবং ঢক্কাবাদ্যকার উভয়েই সমান আমোদে প্রবৃত্ত, কেবল সমাজের সংস্কারে রুচিভেদ দৃষ্ট হয়। আদিমবাসীর কর্ণকঠোর কণ্ঠস্বর এবং অদ্যতনীয় সুসভ্য ব্যক্তির বাক্যালাপে যেরূপ প্রভেদ, সঙ্গীতেও তাদৃশ

প্রভেদ প্রতীয়মান হইবেক। ভাষার ও মনুষ্যের অবস্থার পরিবর্ত সহকারে সঙ্গীতের উন্নতি হইয়াছে।

সঙ্গীত মনুষ্যের স্বভাবসিদ্ধ। দুগ্ধপোষ্য বালক কিঞ্চিৎ আহ্লাদিত হইলেই মস্তকে হস্তোত্তোলন করিয়া নৃত্য ও গান করিবে এবং দুর্বলমনা বঙ্গীয় কামিনী প্রিয়জনবিয়োগে নানামত খেদগানে প্রতিবাসিগণের মন, করুণারসে আর্দ্র করে। সভ্যতার প্রোজ্জ্বল দীধিতি বিকীর্ণ হইবার পূর্বে মনুষ্য পদ্যে মনের ভাব ব্যক্ত করিত। এক্ষণে নাট্যাভিনয়ে যেরূপ কবিতায় বাক্যালাপ হইয়া থাকে, তদ্রূপ প্রাচীনকালে অসভ্যগণ তারস্বরে কথা বলিয়া তাহা "হো" বা "ও" শব্দে শেষ করিত। মনুষ্যপ্রণীত প্রথম গ্রন্থ পদ্যে রচিত। আর্ষ-জাতির বেদ, মনুষ্যের প্রথম রচনাকুসুম। উহার মন্ত্রভাগ আদ্যোপান্ত কবিতায় রচিত এবং পরে ব্রাহ্মণভাগ গদ্যে রচিত হয়। যজুর্বেদের মন্ত্রভাগ যদিও গদ্যের ন্যায় তথাপি তাহা স্বরদ্বারা গেয়। সঙ্গীতে মনোমধ্যে কোন বিষয় শীঘ্র ধারণা হয়, এজন্য ঈশ্বরের প্রেমে সহজে লোকের মন আকৃষ্ট করিবার জন্য প্রাচীনকালে ঈশ্বরবিষয়ক বিবরণ গীতস্বরে পাঠ হইত। পরে সঙ্গীত পৃথক শাস্ত্রমধ্যে পরিগণিত হইল। এবং কালক্রমে এই গীত বা কবিতা-শাস্ত্রের উন্নতি হইতে লাগিল। সঙ্গীতে মনকে শীঘ্র আর্দ্র করিতে পারে; এজন্য ঈশ্বরপ্রেমিক ও নাস্তিক সকলেই সঙ্গীতপ্রিয়। ইউরোপে ফরাশীশ বিজ্ঞানবিৎ কোমৎ-মতাবলম্বিগণ, প্রত্যক্ষ দর্শনবাদী সভার অধিবেশনের পূর্বে "হার্মোনিয়ম" যন্ত্র সহকারে নানারসসমাকীর্ণ কবিতাকলাপ গান করিয়া উপস্থিত সভ্যনিকরের মনোরঞ্জন করিয়া থাকেন। সঙ্গীত সর্বমনোরঞ্জক বিদ্যা এবং এজন্যই শাস্ত্রকারেরা কহেন "গানাৎ পরতরং নহি।" আমরা অদ্য এই প্রস্তাবে কেবল হিন্দুদিগের প্রাচীন নাট্যাভিনয়ের বিষয় লিখিব। পরে কণ্ঠ- ও যন্ত্র-সঙ্গীতের বিষয় লিখিতে ইচ্ছা আছে।

সঙ্গীত দ্বিবিধ, দৃশ্য এবং কাব্য যথা "সঙ্গীতং দ্বিবিধং প্রোক্তং দৃশ্যং শ্রাব্যঞ্চ সূরিভিঃ" ইহার মধ্যে পরিগণিত। এইরূপ কাব্যও দ্বিবিধ, যথা সাহিত্যদর্পণে "দৃশ্যশ্রাব্যত্বভেদেন পুনঃ কাব্যং দ্বিধা মতং। দৃশ্যং তত্রাভিনেয়ং তৎ।" নাটকের অভিনয়ে ক্রীড়া হইয়া থাকে, এজন্য তাহার অপর নাম দৃশ্যকাব্য। অভিনয়ের সঙ্গীত ও নৃত্য প্রধান অঙ্গ এবং তাহার সহিত কুশীলবগণের অঙ্গ ভঙ্গী ও বাক্যচাতুরী বিশেষ আবশ্যক। মহামুনি ভরত নাট্যশাস্ত্রের সৃষ্টিকর্তা। কথিত আছে, তিনি উহা ব্রহ্মার নিকট হইতে প্রাপ্ত হইয়া ইন্দ্রের সভায় গন্ধর্ব ও অপ্সরাগণকে শিক্ষা দিতেন। মহাদেব স্বয়ং তাণ্ডব ও পার্বতী লাস্য নৃত্য করিতেন যথা—"দশরূপম্।"

উদ্ধৃত্যোদ্ধৃত্য সারং যমখিল নিগমান্ নাট্যবেদং বিরিঞ্চিশ্চক্রে যস্য প্রয়োগং মুনিরপি ভরতস্তাণ্ডবং নীলকণ্ঠঃ। সর্বাণী লাস্যমস্য প্রতিপদমপরং লক্ষকঃ। কর্তুমিষ্টে নাট্যানাং কিন্তু কিঞ্চিৎ প্রগুণরচনায়া লক্ষণং সঙ্ক্ষিপামি।

লাস্য ও তাণ্ডব চারি অংশে বিভক্ত। যথা পেবলি, বহুরূপ, যৌবত এবং ছুরিত। অভিনয়কালে পুরুষেরা বহুরূপ ও রূপলাবণ্যবতী নটীগণ যৌবত এবং ছুরিত নৃত্য করিয়া থাকে। এই সকল নৃত্যমাত্রই তালের অধীন। যথা দশরূপম্ "নৃত্যং তাললয়াশ্রয়ম্।" পূর্বকালে দেবতারাও নৃত্যে পরাঙ্মুখ ছিলেন না, এবং মহাভারত ও সংস্কৃত নাটকে দৃষ্ট হয় বলিয়া রাজা ও সম্ভ্রান্ত-বংশীয়া রমণীগণ নৃত্যশিক্ষা করিতেন। এক্ষণে ভারতবর্ষীয় সম্ভ্রান্ত ব্যক্তিগণের মধ্যে নৃত্য একেবারে লোপ হইয়াছে! ইউরোপীয়েরা নৃত্যে অত্যন্ত নিপুণ। "বলে" যদি কোন ব্যক্তি বা কামিনী নৃত্য করিতে না পারেন, তবে তাঁহার সমাজমধ্যে বাস করা ভার হইয়া উঠে। রাজা, রাজ্ঞী, মন্ত্রী, সকলেই নৃত্য করিয়া থাকেন। অশীতিবর্ষবয়স্ক পুরুষকেও নৃত্যে নিপুণতা দেখাইতে হয়। এবং এই নৃত্যেই যুবক যুবতী পরস্পরের মনোহরণ করিয়া পরিণয়সূত্রে আবদ্ধ হইবার প্রথম সূচনা করেন। শুক্লকেশধারী প্রশান্তমূর্তি প্রাড্‌বিবাকের লম্ফ দিয়া দ্রুতবেগে নৃত্য একপ্রকার বিড়ম্বনা মাত্র, কিন্তু ইংরাজ সভ্যতায় সকলই শোভা পায়। কাহার সাধ্য ইহার প্রতিবাদ করে? সূর্যবংশীয় মহাতেজা জয়পুরাধিপতিকেও ইংরেজের অনুকরণ করিয়া নৃত্য করিতে হইল! বোধ হয় কালে স্ত্রীস্বাধীনতার একজন প্রধান উত্তরসাধক রামকৃষ্ণ বসু, স্বীয় প্রণয়িনী নৃত্যকালী বসুর হাত ধরিয়া প্রকাশ্য "বলে" নৃত্য করত ইংরাজগণের প্রীতিভাজন হইবেন। কালে সকলই ঘটিতে পারে!

নাটক অঙ্ক ও গর্ভাঙ্কে বিভক্ত। নাট্যোল্লিখিত ব্যক্তিগণের মধ্যে নান্দী, বিদূষক, সূত্রধর, পারিপার্শ্বিক ও নটনটীর উল্লেখ থাকিবে। পুরুষগণের ভাষা সংস্কৃত এবং স্ত্রীলোকের প্রাকৃত ভাষায় কথোপকথন হওয়া আবশ্যক যথা লক্ষণমালা (৮ পৃষ্ঠা)

পুরুষাণামনীচানাং সংস্কৃতং স্যাৎ কৃতাত্মনাং।
শৌরসেনী প্রযোক্তব্যা তাদৃশীনাঞ্চ যোষিতাং॥
আসামেব তু গাথাসু মহারাষ্ট্রীং প্রয়োজয়েৎ।
অত্রোক্তা মাগধীভাষা রাজান্তঃপুরচারিণাং॥
চেটানাং রাজপুত্রাণাং শ্রেষ্ঠিনাং চার্ধমাগধী।
প্রাচ্যা বিদূষকাদীনাং ধূর্তানাং স্যাদবন্তিকা॥

যোধনাগরিকাদীনাং দাক্ষিণাত্যাহি দিব্যতাং।
শকারাণাং শকাদীনাং শাকারীং সম্প্রযোজয়েৎ ॥
বাহ্লীকভাষা দীব্যানাং দ্রাবিড়ী দ্রবিড়াদিষু।
অভীরেষু তথাভীরী চাণ্ডালী পুক্কসাদিষু ॥
আভীরী শাবরী চাপি কাষ্ঠপত্রোপজীবিষু।
তথৈবাঙ্গারকারাদৌ পৈশাচী স্যাৎ পিশাচবাক্ ॥
চেটীনামপ্যানীচানা মপিস্যাৎ শৌরসেনিকা।
বালানাং ষণ্ডকানাঞ্চ নীচ গ্রহ বিচারিণাং ॥
উন্মত্তানামাতুরানাং সৈব স্যাৎ সংস্কৃতং ক্বচিৎ ॥
ঐশ্বর্যেণ প্রমত্তস্য দারিদ্র্যোপস্কৃতস্যচ।
ভিক্ষুবন্ধধরাদীনাং প্রাকৃতং সম্প্রযোজয়েৎ ॥
সংস্কৃতং সম্প্রযোক্তব্যং লিঙ্গিনীষূত্তমাসুচ।
দেবীমন্ত্রিসুতাবেশ্যাস্বপি কৈশ্চিত্তথোদিতং ॥
যদ্দেশং নীচপাত্রন্তু তদ্দেশং তস্য ভাষিতং।
কার্য্যতশ্চোত্তমাদীনাং কার্যো ভাষা বিপর্যয়ঃ ॥
যোষিৎসখীবালবেশ্যা কিতবাপ্সরসাং তথা।
বৈদগ্ধ্যার্থং প্রদাতব্যং সংস্কৃতং চান্তরান্তরা ॥

উচ্চপদবীস্থ ভদ্র পণ্ডিত ব্যক্তিদিগের বক্তব্য ভাষা সংস্কৃত। তাদৃশা স্ত্রীলোক-দিগের সম্বন্ধে "শৌরসেনী" এবং তাদৃশ ভদ্র স্ত্রীজাতীয় গাথা সম্পর্কে মহা-রাষ্ট্রীয় ভাষা প্রযুক্ত হইবে।

রাজান্তঃপুরচারী জনগণের "মাগধী"। রাজপুত্র ও রাজপরিচারক এবং শ্রেষ্ঠীগণের সম্বন্ধে "অর্ধমাগধী।" বিদূষকের "প্রাচ্য", ধূর্তের "অবন্তিকা", যোদ্ধা ও নাগর প্রভৃতির পক্ষে "দাক্ষিণাত্য" ভাষা প্রয়োগ করা কর্তব্য।

শকার এবং শক প্রভৃতি অন্ত্যজ জাতির প্রতি "শাকারী" এবং বাহ্লিকের "বাহ্লিকী", দ্রাবিড়ের "দ্রাবিড়ী", আভীরদেশীয়ের "আভীরী", পহ্লবের এবং তৎসদৃশ জাতিতে "চাণ্ডালী" রীতির ভাষা ব্যবহার্য।

কাষ্ঠ বা পত্রপর্ণাদিজীবী ব্যক্তির সম্বন্ধে "আভীরী" বা "চাণ্ডালী", অঙ্গার কারক প্রভৃতি নীচ ব্যবসায়িগণেরও "আভীরী" বা "চাণ্ডালী" ভাষা গ্রাহ্য। কুৎসিতবাক্ মর্খদিগের পক্ষে "পৈশাচী" এবং উচ্চপদাভিষিক্ত চেটচেটীদিগের "শৌরসেনী", বালক, উন্মত্ত, ষণ্ড, নীচ গ্রহগণকের ও আর্তব্যক্তিদিগের "শৌর-সেনী", স্থানবিশেষে "সংস্কৃত"ও ব্যবহার্য। ঐশ্বর্যমদে মত্ত এবং দারিদ্র্য-ব্যাকুল, ভিক্ষু, বন্ধধারী জনগণের "প্রাকৃত" প্রয়োগ করাই কর্তব্য। উত্তমাশয়

ব্যক্তি লিঙ্গধারী (চিহ্নধারী যথা—কপট সন্ন্যাসী প্রভৃতি) ব্যক্তি, দেবী, মন্ত্রি-কন্যা ও বেশ্যা—এই সকল ব্যক্তির পক্ষে "সংস্কৃত" ভাষাই শোভনীয়। অন্য-প্রকার হইলেও হানি নাই।

পরন্তু, যে দেশ নীচপ্রধান সে দেশ বা দেশীয় সম্বন্ধে তত্তৎ ভাষা (অর্থাৎ নীচ হইলে নীচশ্রেণীগত ভাষা ইত্যাদি) প্রযুক্ত হইবে। উত্তমাধম মধ্যম জাতীয় ব্যবহার্য ভাষার বিভাগ তত্তৎকার্যানুসারে ভাষার বিপর্যয় বা পর্যয় হইয়া থাকে। স্ত্রী, সখী, বালক, বেশ্যা, ধূর্ত, অপ্সরাদিগের সম্বন্ধে ভাষা-ব্যবহার কালে চাতুর্যাতিশয় প্রদর্শনের জন্য মধ্যে মধ্যে সংস্কৃতও ব্যবহার করা যাইতে পারে।

আলঙ্কারিকেরা নাটক দুই অংশে বিভাগ করিয়াছেন, যথা, রূপক ও উপ-রূপক। রূপক দশ ও উপরূপক অষ্টাদশ অংশে বিভক্ত। যথা, সাহিত্য-দর্পণ,

নাটকমথ প্রকরণং ভাণ ব্যায়োগ সমবকার ডিমাঃ।
ঈহামৃগাঙ্কবীথ্যঃ প্রহসনমিতি রূপকাণি দশ ॥
নাটিকা ত্রোটকং গোষ্ঠী সট্টকং নাট্যরাসকং।
প্রস্থানোল্লাপ্য কাব্যানি প্রেঙ্ক্ষণং রাসকং তথা ॥
সংলাপকং শ্রীগদিতং শিল্পকঞ্চ বিলাসিকা।
দুর্মল্লিকা প্রকরণী হল্লীশোভাণিকে তিচ ॥
অষ্টাদশ প্রাহুরূপরূপকাণি মণীষিণঃ।
বিনা বিশেষং সর্বেষাং লক্ষ্ম নাটক বন্মতং ॥

১। দৃশ্যকাব্যমধ্যে নাটক সর্বপ্রধান। উহার গল্প পৌরাণিক বিবরণ হইতে গৃহীত বা কিয়দংশ কবির মনঃকল্পিত হইবেক। ইহার নায়ক দুষ্মন্তের ন্যায় নৃপতি, রামচন্দ্রের ন্যায় অলৌকিক ক্ষমতাসম্পন্ন রাজা বা শ্রীকৃষ্ণের ন্যায় দেবতা। শৃঙ্গার বা বীররস নাটকের বর্ণিত বিষয়। "অভিজ্ঞান শকুন্তলা", "মুদ্রারাক্ষস", "বেণীসংহার", "অনর্ঘরাঘব" প্রভৃতি নাটক-শ্রেণীভুক্ত।

২। প্রকরণ লক্ষণ নাটকের ন্যায়, কিন্তু ইহার গল্পে সমাজের প্রতিকৃতি এবং প্রেমবিষয়ক বর্ণন থাকিবে। প্রকরণ দুই অংশে বিভক্ত। শুদ্ধ এবং সংকীর্ণ। শুদ্ধ প্রকরণের নায়িকা বেশ্যা এবং সংকীর্ণের নায়িকা কোন ভদ্রবংশের প্রতি-পালিতা কামিনী বা সহচরী। প্রকরণের নায়ক নাটকের ন্যায় উচ্চশ্রেণীর ব্যক্তি নহেন। ইহার নায়ক মন্ত্রী, ব্রাহ্মণ বা সম্ভ্রান্ত বণিক। "মৃচ্ছকটিক", "মালতীমাধব" প্রভৃতি প্রকরণ।

৩। ভাণ এক অঙ্কে সম্পূর্ণ। ইহার ভাষা বিশুদ্ধ এবং প্রারম্ভে ও শেষে সঙ্গীত থাকিবে। নাট্যের নায়কমাত্র অভিনয়ক্রীড়া করিবেন। তিনি রঙ্গভূমিতে

আসিয়া নানা স্তরে ও ভাবভঙ্গী দ্বারা বিবিধ ব্যক্তিকে সম্বোধন করিয়া সভ্যগণের মনোরঞ্জন করিবেন। "লীলামধুকর" এবং "সারদাতিলক" ভাণশ্রেণীভুক্ত।

৪। ব্যায়োগ এক অঙ্কে সম্পূর্ণ। যুদ্ধবর্ণন ইহার উদ্দেশ্য, প্রেম বা রহস্য বর্ণনা ইহার উদ্দেশ্য নহে। ইহার নায়ক অলৌকিক ক্ষমতাসম্পন্ন পুরুষ। "জামদগ্নেয়জয়", "সৌগন্ধিকাহরণ" এবং "ধনঞ্জয়বিজয়" ব্যায়োগ-গ্রন্থ।

৫। সমবকার তিন অঙ্কে সম্পূর্ণ। এবং দেবতা ও অসুরগণের যুদ্ধ বর্ণন ইহার প্রধান উদ্দেশ্য। ইহা আদ্যোপান্ত বীররসব্যঞ্জক এবং উষ্ণী ও গায়ত্রীছন্দে রচিত। অভিনয়কালে, হয়, হস্তী, রথাদি পরিপূর্ণ যুদ্ধক্ষেত্র, তুমুল সংগ্রাম এবং নগরাদি ধ্বংস, অতি উত্তমরূপে দৃষ্ট হইয়া থাকে। "সমুদ্র-মন্থন" নামক একখানি সমবকার সংস্কৃত ভাষায় আছে, তাহাও এক্ষণে সুপ্রাপ্য নহে।

৬। ডিমা, বীর-ও ভয়ানক-রসসংযুক্ত রূপক। ইহা চারি অঙ্কে সম্পূর্ণ। অসুর বা দেবতা ইহার নায়ক। "ত্রিপুরদহ" নামক ডিমা বর্তমান আছে।

৭। ঈহামৃগ চারি অঙ্কে সম্পূর্ণ এবং দেবদেবী ইহার নায়ক নায়িকা। প্রেম ও কৌতুক ইহার বর্ণনোদ্দেশ্য। "কুসুমশেখরবিজয়" একখানি ঈহামৃগ।

৮। অঙ্ক এক অঙ্কে সম্পূর্ণ এবং করুণরসপ্রধান রূপক। কোন প্রসিদ্ধ পৌরাণিক বিষয়ে কবি ইহার গল্প রচনা করিবেন। "শর্মিষ্ঠা-যযাতি" একখানি অঙ্ক।

৯। বীথ্য, ভাণের ন্যায় লক্ষণাক্রান্ত এবং এক অঙ্কে সম্পূর্ণ। কিন্তু "দশরূপের" মতানুসারে দুই অঙ্ক থাকিবে।

১০। প্রহসন হাস্যরসপ্রধান রূপক। ইহা এক অঙ্কে সম্পূর্ণ। এবং সমাজের কুরীতি সংশোধন ও রহস্যজনক বিবরণ বর্ণনা করা ইহার মুখ্য উদ্দেশ্য। নাট্যোল্লিখিত ব্যক্তিগণ রাজপারিষদ, ধূর্ত, উদাসীন, ভৃত্য এবং বেশ্যা। ইহার মধ্যে নীচজাতীয় পুরুষগণ স্ত্রীলোকের ন্যায় প্রাকৃত ভাষায় কথোপকথন করিবে। "হাস্যার্ণব", "কৌতুকসর্বস্ব" এবং "ধর্ত নাটক" প্রসিদ্ধ প্রহসন।

এই দশপ্রকার রূপক। এক্ষণে অষ্টাদশ প্রকার উপরূপকের বিবরণ সংক্ষেপে বক্তব্য।

১। নাটিকা বা প্রকরণিকা প্রায় এক প্রকার। আদিরস উহার উদ্দেশ্য বিষয়। "রত্নাবলী নাটিকা" অতি প্রসিদ্ধ।

২। ত্রোটক ৫।৭।৮ বা নবম অঙ্কে সম্পূর্ণ। পার্থিব ও স্বর্গীয় বিষয় ইহার বর্ণনোদ্দেশ্য যথা "বিক্রমোর্বশী"।

৩। গোষ্ঠী এক অঙ্কে সম্পূর্ণ। ইহার নাটোল্লিখিত ব্যক্তি ৯।১০ জন পুরুষ এবং ৫।৬ স্ত্রী। "রৈবতমদনিকা" একখানি গোষ্ঠী।

৪। সট্টকে একটি আশ্চর্য গল্প আদ্যোপান্ত প্রাকৃত ভাষায় রচিত হইবে। যথা "কর্পূরমঞ্জরী।"

৫। নাট্যরাসক এক অঙ্কে সম্পূর্ণ এবং বর্ণিত বিষয় প্রেম ও কৌতুক। ইহার আদ্যোপান্ত অভিনয়কালে নৃত্য ও সঙ্গীতে সম্পন্ন হইবেক। "নর্মবতী" ও "বিলাসবতী" এই দুইখানি নাট্যরাসক।

৬। প্রস্থান নাট্যরাসকের ন্যায় কিন্তু ইহার নায়ক নায়িকা এবং নাট্যোল্লিখিত ব্যক্তিবৃন্দ অতীব নীচজাতীয়। ইহাও তাল, লয়, স্বর সংযোগে নৃত্য-গীতপরিপূর্ণ এবং দুই অঙ্কে সমাপ্ত।

৭। উল্লাপ্য এক অঙ্কে গ্রথিত এবং প্রেম ও হাস্য ইহার জীবন। ইহার বিষয়টি পৌরাণিক এবং নাট্যে কথোপকথনমধ্যে সঙ্গীতগেয়। "দেবী মহাদেবম্" এই-শ্রেণীভুক্ত।

৮। কাব্য, প্রেমবিষয়ক বর্ণন এবং এক অঙ্কে সমাপ্ত। ইহার মধ্যে মধ্যে সঙ্গীত এবং কবিতা থাকিবে। "যাদবোদয়" একখানি কাব্য।

৯। প্রেঙ্ক্ষণ, বীররসপ্রধান এবং এক অঙ্কে সম্পূর্ণ। ইহার নায়ক নীচ শ্রেণীর ব্যক্তি। "বালিবধ" প্রেঙ্ক্ষণ প্রসিদ্ধ।

১০। রাসক, হাস্যরস-উদ্দীপক উপরূপক এবং এক অঙ্কে সম্পূর্ণ। ইহার পঞ্চব্যক্তি মাত্র অভিনেতা। নায়ক নায়িকা উচ্চশ্রেণীর ব্যক্তি এবং নায়ক মূর্খ এবং তথা নায়িকা বুদ্ধিমতী হইবেক। "মেনকাহিত" একখানি রাসক।

১১। সংলাপক, এক, দুই, তিন বা চারি অঙ্কে সম্পূর্ণ। ইহার নায়ক প্রচলিত ধর্মের বিরুদ্ধমতাবলম্বী। ইহার অধিকাংশ যুদ্ধাদি বর্ণন। "মায়া-কাপালিক" এই-শ্রেণীভুক্ত।

১২। শ্রীগদিত, এক অঙ্কে সম্পূর্ণ। এবং ইহার নায়িকা লক্ষ্মী। ইহার অধিকাংশ সঙ্গীত। "ক্রীড়ারসাতল" একখানি শ্রীগদিত।

১৩। শিল্পক, চারি অঙ্কভুক্ত। শ্মশান ইহার রঙ্গস্থল এবং নায়ক ব্রাহ্মণ এবং প্রতিনায়ক চণ্ডাল। ঐন্দ্রজাল ও আশ্চর্য ঘটনা শিল্পকের বর্ণনোদ্দেশ্য। "কণকাবতী-মাধব" এই-শ্রেণীভুক্ত।

১৪। বিলাসিকা, এক অঙ্কে গ্রথিত। প্রেম ও কৌতুক ইহার বর্ণনোদ্দেশ্য।

১৫। "দুর্মল্লিকা" হাস্যরসপ্রধান উপরূপক এবং চারি অঙ্কে সমাপ্ত, যথা "বিন্দুমতী।"

১৬। প্রকরণিকা নাটিকার ন্যায়।

১৭। হল্লীশা, ইংরাজী "অপেরা" বা গীতাভিনয়সদৃশ। অভিনয়ে আদ্যোপান্ত সঙ্গীত ও নৃত্য হইয়া থাকে। ইহা এক অঙ্কে সম্পূর্ণ এবং অভিনয়কার্য একজন পুরুষ এবং ৮ বা ১০ জন স্ত্রীলোকের দ্বারা সম্পাদিত হওয়া উচিত। "কেলি রৈবতক" এই-শ্রেণীভুক্ত।

১৮। ভাণিকা, এক অঙ্কে সম্পূর্ণ এবং হাস্যরসময়, যথা "কামদত্তা"।

রূপক ও উপরূপক লক্ষণে পাঠকবর্গ দেখিতে পাইবেন সংস্কৃত ভাষায় হিন্দুদিগের ইউরোপিয়গণের ন্যায় সকল প্রকার দৃশ্যকাব্য বর্তমান ছিল। শেক্সপীয়র, করনীল, মলীএর, ভলটেয়ার প্রভৃতি কবিগণের ন্যায় ভারতবর্ষীয় কবিনিকর যদিও বহুসংখ্যক নাটক লিখিয়া যাইতে পারেন নাই, তথাপি কালিদাস, ভবভূতি, শ্রীহর্ষ প্রভৃতি প্রসিদ্ধ গ্রন্থকারগণ যে সকল নাটক রচনা করিয়া গিয়াছেন, তাহা পৃথিবীর সর্বপ্রধান কবির নাটকের ন্যায় উৎকৃষ্ট, তাহা মুক্তকণ্ঠে স্বীকর্তব্য। দশরূপ, সাহিত্যদর্পণ, সাহিত্যসার, কুবলয়ানন্দ প্রভৃতি অলংকারগ্রন্থে যে সকল নাটকের উদাহরণ উদ্ধৃত হইয়াছে, তাহার অধিকাংশ এক্ষণে দুষ্প্রাপ্য। কলিকাতার সংস্কৃত কলেজ স্থাপিত হইবার পূর্বে বঙ্গদেশীয় অধ্যাপকগণ সংস্কৃত নাটকের তাদৃক্ আদর করিতেন না। এমন কি স্যার উইলিয়ম জোন্‌স্‌কে কেহই নাটকের প্রকৃত বিবরণ উত্তমরূপ পরিজ্ঞাত করিতে পারেন নাই; তৎপরে অনেক কষ্টে রাধাকান্ত—নামক জনৈক ভূসুর তাঁহাকে নাটক যে ইংরাজী "প্লের" সদৃশ, তাহা বুঝাইয়া দিলেন। বঙ্গদেশীয়গণ পূর্বে অন্যান্য নাটকাপেক্ষা "প্রবোধচন্দ্রোদয়" মনোনিবেশ করিয়া পাঠ করিতেন। তৎপরে বঙ্গীয় বৈষ্ণব সম্প্রদায়, "জগন্নাথবল্লভ", "ললিতমাধব", "বিদগ্ধমাধব", "দানকেলিকৌমুদী" প্রভৃতি নাটক আগ্রহ সহকারে পাঠ করিতেন কিন্তু প্রকৃত কবিত্বশক্তিসম্পন্ন মহাকবি কালিদাস, ভবভূতি, শ্রীহর্ষ প্রভৃতি প্রধান কবিগণের দৃশ্যকাব্যের অধ্যাপনায় এককালে পরাঙ্মুখ ছিলেন। মাননীয় সোমপ্রকাশ-সম্পাদকমহাশয় আমাদিগের একটি প্রস্তাবের প্রতি কটাক্ষ করিয়া লিখিয়াছেন যে, সুপ্রসিদ্ধ পণ্ডিত জগন্নাথ তর্কপঞ্চাননের অভিজ্ঞানশকুন্তল নাটক কণ্ঠস্থ ছিল,—তাহা থাকিতে পারে, কিন্তু তাই বলিয়া পূর্বে যে বঙ্গদেশে নাটকের অত্যন্ত আলোচনা ছিল, তাহার কোন প্রমাণ হইতেছে না। এখানে যদি নাটকের বহুল প্রচার থাকিত, তাহা হইলে সহজে এই বঙ্গদেশ হইতেই সংস্কৃত কলেজ ও এসিয়াটিক সোসাইটির নিমিত্ত প্রসিদ্ধ নাটকগুলি সংগৃহীত হইত এবং তাহা হইলে কিজন্য এখানকার শিক্ষাবিভাগের কর্তৃপক্ষগণ ও উইলসন সাহেব বহুবায়াস স্বীকার

করিয়া কাশী কাঞ্চী পর্যন্ত অনুসন্ধান করত "শকুন্তলা", "বিক্রমোর্বশী", "মৃচ্ছকটিক", "উত্তরচরিত" প্রভৃতি সংগ্রহ করিবেন।

ইউরোপে নাটকের অভিনয় হইয়া থাকে, এজন্য তথায় নাটকের বহুল প্রচার। আমাদিগের দেশে অভিনয়প্রথা একাল পর্যন্ত প্রচলিত থাকিলে সকল প্রকার দৃশ্যকাব্যের লোপ হইত না। প্রায় প্রসিদ্ধ নাটকসমূহ অভিনয়ের জন্য রচিত। ভবভূতি নটগণের অনুরোধে, কালপ্রিয়নাথ মহাদেবের যাত্রা-মহোৎসবে অভিনয়ের নিমিত্ত "উত্তরচরিত" রচনা করেন, "হয়গ্রীববধ" নাটক মাতৃগুপ্তের সভায় অভিনীত হইবার জন্য লিখিত হইয়াছিল, এতদ্ব্যতীত জগন্নাথের জন্মযাত্রা উপলক্ষে ও মদনমহোৎসবে বিবিধ নাটক রচিত হইত।'

ফ্রান্স ও ইংল্যাণ্ডে নাট্যাভিনয়ে বিপুল অর্থ ব্যয় হইয়া থাকে। "এডিলফি", "হেমারকেট" এবং "থিয়েটার ফ্রান্সে" নাট্যগৃহে অসংখ্য অসংখ্য ব্যক্তি প্রতিবার অভিনয় দর্শনে গমন করিয়া থাকেন, ইহাতে নাটক-রচকগণেরও খ্যাতিবিস্তার হয় এবং এক-একজন সুবিখ্যাত নট কিয়ৎক্ষণের মধ্যে বিলক্ষণ ধনসঞ্চয় করেন। অতি অল্পদিবস হইল প্যারিসের থিয়েটারে ভিক্তর হ্যুগোর একখানি নাটকের অভিনয় দর্শনে দর্শকগণ এত মোহিত হইয়াছিলেন যে, অভিনয় সমাধা হইলে সকলেই কবিকে একবার দেখিবার জন্য ব্যাকুল হইয়া উঠিলেন এবং উচ্চস্বরে সহস্র সহস্র ব্যক্তিরা তাঁহার প্রশংসাধ্বনি করিল। "ইতালীয় অপেরা" অর্থাৎ গীতাভিনয় ইউরোপীয়গণের অধিক প্রিয়। সঙ্গীতবিদ্যানিপুণা, সুমধুরভাষিণী প্রিয়দর্শনা পাটীর সঙ্গীত শুনিতে এক-একবার বিংশতি সহস্র লোক উপস্থিত হইয়া থাকে। এবারে কলিকাতায় ইতালীয় "অপেরা" আগমন না করায় সাহেব সমাজ যারপরনাই দুঃখিত হইয়াছেন, যদি লুইসের থিয়েটার শীত ঋতুতে না আসিত তবে কলিকাতার ন্যায় অমরাবতীতে তাঁহাদিগের বাস করা কঠিন হইয়া উঠিত। নাটকের অভিনয়দর্শন বিশুদ্ধ আমোদ। ইহাতে প্রসিদ্ধ কবিগণের রচনা মনোমধ্যে উত্তমরূপে অঙ্কিত হয় এবং সমাজের কুরীতি-সংশোধন প্রহসনদ্বারা যেমত হইয়া থাকে, এমত কিছুতেই হয় না। নীতিশাস্ত্রবিশারদগণের বক্তৃতা অপেক্ষা কবির ব্যঙ্গোক্তি দ্বারা সমাজের অনেক উন্নতি হইয়া থাকে। "উভয় সংকট" ও "চক্ষুদান" প্রহসনের অভিনয় দর্শনে অনেক বহুবিবাহপ্রিয় এবং লম্পটের চৈতন্য হইয়াছে।

আমাদিগের বঙ্গীয় সমাজে দিন দিন বিদ্যার বিমল বিভা বিস্তারিত হইতেছে বটে, কিন্তু এ পর্যন্ত সুসভ্যগণের ন্যায় রুচির পরিবর্ত না হওয়ায় অত্যন্ত পরিতাপিত হইতেছি। যে আর্যজাতি উদাত্ত, অনুদাত্ত ও স্বরিত স্বরে

সামবেদ গান করিয়া কাননস্থ পশুপক্ষীকেও মোহিত করিতেন, যাঁহারা সঙ্গীত-শাস্ত্রে অতি প্রবীণ, যাঁহাদের সুধাসম কাব্যরস দিগ্দিগন্তবাসী মানবেরা পান করিয়া আপনাকে কৃতার্থ বোধ করিতেছে, যে আর্যজাতির নাট্যপ্রথা চিরপ্রসিদ্ধ, অদ্য সেই আর্যজাতির অগ্নিস্ফুলিঙ্গসম তেজোরাশি যবনগণের পদবিমর্দনে এককালে নির্বাপিত হইয়াছে। আর সে তেজ নাই, সে বুদ্ধি নাই, কাজেই আমরা দুর্বল, ক্ষীণ, "কুখ্যাত জগতে"। অথবা

"—সিংহের ঔরসে
শৃগাল কি পাপে মোরা—"

কাজেই আমাদিগের রুচির পরিবর্ত হইতেছে। মহাকবি কালিদাসের শকুন্তলার নাট্যাভিনয়ের পরিবর্তে, যাত্রার কুৎসিত আমোদে অনুরক্ত হইয়াছি। এ কি সাধারণ পরিতাপের বিষয়! কোথা অভিনয়কালে ভবভূতির উত্তর-চরিতে বৈদেহীবিলাপশ্রবণে হৃদয় বিলোড়িত হইবে, মালতীমাধবে নির্ঝর-মালায় সুশোভিত পর্বতের বিচিত্রচিত্রপটসন্নিকটে চিরযোগিনী সৌদামিনীকে দেখিয়া মনোমধ্যে শান্তরসোদয় হইবে, এবং কোথা মুদ্রারাক্ষসে নীতিশাস্ত্রবেত্তা চাণক্যের বুদ্ধিকৌশলের একশেষ উদাহরণ পাইয়া আধুনিক মেকায়ভেলীকেও তুচ্ছবোধ হইবে, তাহা না হইয়া গোবিন্দ অধিকারীর যাত্রায় মানভঞ্জনগানে অনুপ্রাসচ্ছটা এবং অর্থশূন্য মধুকাইনের গীত শ্রবণে, রামযাত্রায় শীর্ণকায় "কাগজের মুখসে" মুখাবৃত রাবণের বীরত্বপ্রকাশ এবং কালুয়া ভুলুয়ার কুৎসিত মুখভঙ্গী দর্শনে, বিরক্ত না হইয়া আনন্দজনক বোধ করিয়া থাকি। বঙ্গ-সমাজের হিতচিকীর্ষু ব্যক্তি এ সকল দর্শনে যে কি পর্যন্ত দুঃখিত হয়েন তাহা বর্ণনাতীত। যাত্রার ন্যায় কুৎসিত আমোদে মনের ভাব কলুষিত হইয়া যায়। কৃতবিদ্য ব্যক্তিগণের এ সকল আমোদ সন্দর্শন করা কখনই উচিত নহে। আজিকালি আমাদিগের জাতীয় বিশুদ্ধ আমোদের হীনাবস্থা সন্দর্শনে অনেক কৃতবিদ্য বাঙ্গালীগণ ইংরাজী থিয়েটর বা "অপেরায়" গমন করিয়া থাকেন। কিন্তু আহ্লাদের বিষয়, সম্প্রতি একটি জাতীয় নাট্যশালা স্থাপিত হওয়াতে আমাদিগের মনঃকষ্ট অনেক নিবারণ হইয়াছে। এক্ষণে ইহার শৈশবাবস্থা, এজন্য কার্যপ্রণালীর দিন দিন উৎকর্ষ সাধিত হইতে পারে এবং তাহা হইলেই কবির এই খেদগান সফল হইবে—

অলীক কুনাট্যরঙ্গে,
মজে লোকে রাঢ়ে বঙ্গে,
নিরখিয়া প্রাণে নাহি সয়।
সুধারস অনাদরে,

বিষবারি পান করে
তাহে হয় তনু মনঃ ক্ষয়।
মধু বলে জাগ মাগো, (ভারতভূমি)
বিভুস্থানে বর মাগ,
সুরসে প্রবৃত্ত হউক তব তনয়নিচয়।

প্রস্তাবের উপসংহারকালে নাট্যামোদী ও সঙ্গীতশাস্ত্রপ্রিয় রাজা যতীন্দ্র-মোহন ঠাকুর ও তাঁহার সুযোগ্য ভ্রাতাকে আমাদিগের আন্তরিক ধন্যবাদ না দিয়া থাকিতে পারিলাম না। তাঁহাদিগের প্রযত্নে বোধ হয় সঙ্গীত ও নাট্যশাস্ত্র প্রাচীন শ্রী পুনর্ধারণ করিবে।

শ্রাবণ ১২৮০

বাঙ্গালার সাহিত্য

বড় হাড় জ্বালাতন হইয়া উঠিল। বঙ্গদর্শনের ভূতপূর্ব সম্পাদক বোধ হয় কিছু বুদ্ধি লইয়া ঘর করিতেন; বঙ্গদর্শনে বাঙ্গালা গ্রন্থের সমালোচনা বন্ধ করিয়া দিয়াছিলেন। যেদিন তিনি বলিলেন যে, আর গ্রন্থসমালোচনা করিব না— সেইদিন হইতে বঙ্গদর্শন কার্যালয়ে, আর সেই সকল হরিত কপিশ নীল পীত রক্ত আবরণে রঞ্জিত, বৃহৎ, ক্ষুদ্র, স্থূল, সূক্ষ্ম, লঘু, গুরু অবয়বধারী পুস্তক সকলের আমদানি কমিল। ক্ষুদ্র গ্রন্থকারদিগের সঙ্গে বঙ্গদর্শনের আর বড় সম্বন্ধ রহিল না। ক্রিয়াবাড়িতে লোকজনের ভোজনের পর স্থান পরিষ্কার হইয়া গেলে পর, গৃহের যেরূপ অবস্থা হয়, বঙ্গদর্শন পুস্তকালয়েরও সেই দশা হইল; ফলাহার সমাপ্ত হইয়াছে জানিয়া দুই-একটি আহূত ভদ্র-লোক ব্যতীত, অনাহূত, রবাহূত, ভদ্র অভদ্র প্রাঙ্গণে সম্মার্জনীর ঘর্ষণশব্দ শুনিয়া বিমুখ হইতে লাগিল—কেবল দুই-একজন নাছোড়বান্ধা ফকির দরওয়াজা ছাড়ে না। সাহিত্য-সংসারের কাকের দল আলিসার উপর জুটিয়া অকালের ফলার বন্ধের পক্ষে ঘোরতর প্রটেস্ট আরম্ভ করিল—আর যাঁহারা সাহিত্যসমাজের ক্ষুদ্রানুক্ষুদ্র জীব তাঁহারা দংষ্ট্রা নির্গত করিয়া উৎসৃষ্ট কদলীপত্রের উপর ক্ষুদ্র রকম কুরুক্ষেত্র আরম্ভ করিলেন। শেষে শান্তি উপস্থিত হইল।

অদৃষ্টবিপাকে পড়িয়া বঙ্গদর্শনের বর্তমান সম্পাদক আবার পত্রমধ্যে বাঙ্গালা গ্রন্থের সাধারণতঃ সমালোচনা আরম্ভ করিলেন। অমনি বঙ্গসাহিত্য-সমাজে ঘোষিত হইল যে—সে বাড়িতে আবার ফলার। আবার দেখিতেছি, ন্যায়ালঙ্কার, তর্কালঙ্কার, বিদ্যারত্ন, বিদ্যাবাগীশ, বিদ্যানবিশ, বিদ্যাকপীশ, টিকির উপর চাঁপাফুল ঝুলাইয়া, নামাবলীর কোণে ভক্তিভাবে যান্ত্রিক বিল্ব-পত্র দূর্বাদল বাঁধিয়া, সমালোচনা-ফলাহারে উপস্থিত। আবার দেখিতেছি সেই আহূত, অনাহূত, কাঙ্গালী, ফকির, আত্মগরিমার জলে আশা-কদলীখানি ধৌত করিয়া, যশোরূপ লুচিমণ্ডার আশায় পাত পাতিয়া বসিয়াছেন। তাই বলিতে-ছিলাম যে, বড় হাড় জ্বালাতন হইয়া উঠিল।

ব্যঙ্গ ত্যাগ করিয়া বলা যাইতে পারে যে, সদ্‌গ্রন্থের সমালোচনার অপেক্ষা সুখ আর নাই। কিন্তু যে স্তূপাকার ছাইভস্ম প্রতিদিনের ডাকে, আমাদিগের আপিসে আসিয়া উপস্থিত হয়, তাহার সমালোচনা বড় দুঃখদায়ক—তাহার পঠন অপেক্ষা কষ্ট বুঝি আর নাই।

আমাদিগকে যে জ্বালা পোহাইতে হয়, তাহার দুই-একটা উদাহরণ দিলেই পাঠকের কিছু করুণা জন্মিতে পারে। কি শুভক্ষণে লর্ড লিটন ভারতেশ্বরীর নাম ঘোষণা করিয়াছিলেন বলিতে পারি না—কিন্তু সেইক্ষণ অবধি, কবিদিগের প্রাণ গেল। সেই অবধি "ভারতেশ্বরী" সম্বন্ধীয় ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র কাব্যগ্রন্থে দেশ প্লাবিত হইয়া গেল। উচ্চশ্রেণীর কবিগণ মার্জনা করিবেন, ক্ষুদ্রাশয় পাঠকদিগের জন্য আমরা একটি উপমা প্রয়োগ না করিয়া থাকিতে পারি না। যে সেই নৌকাপথে ভ্রমণ করিয়াছেন, তিনিই চরস্থিত পক্ষিগণের চরিত্র অবগত আছেন। এক-এক চরে বহুসহস্র পক্ষী পালে পালে বিচরণ করিতে থাকে। কোন শব্দ নাই—কোন গোল নাই। কিন্তু যদি কোন অসতর্ক নৌপথিক দৈবাৎ লোভপরতন্ত্র হইয়া একটি বন্দুকের আওয়াজ করেন,—তবে বড় বিপদ ; সেই সহস্র সহস্র পক্ষী এককালীন উড্‌ডীন হইয়া কিচির মিচির চিঁচির ছিছি প্রভৃতি চিৎকার করিয়া একবারে কর্ণরন্ধ্র বিদীর্ণ করে। তখন চিঁচি কুচি ছিছির জ্বালায় অস্থির হইয়া পথিক কোথায় পলাইবেন, পথ পান না। তেমনি, এই বঙ্গসাহিত্য-মরুভূমিবিহারী কবিবিহঙ্গমণ্ডলীর শ্রুতিপথে, হঠাৎ লর্ড লিটন দিল্লীর কামান দাগিয়া, বড় কিচির মিচির রব তুলিয়া দিয়াছেন—আমাদের কর্ণ বধির হইয়া গেল।

এই কিচির মিচির কাকলী কললহরী মধ্য হইতে দুই-একটি সুরতরঙ্গ পাঠক মহাশয়ের পদপ্রান্তে আছাড়িয়া পড়িতেছে—পাঠক দেখুন—গায়ক শ্রীরাধাবল্লভ দে, কুমারখালি স্কুলের ছাত্র—

ভারতের জয়ধ্বনি,
শুভ আশীর্বাদবাণী,
ভীম, বজ্রনাদে ওই উঠিল গগনে ;
অমর-অমরীগণে,
ত্রাসে জয়নাদ শুনে,
কাঁপিল সভয়ে তারা মনে ভয় গণে ;
মর্তলোক কাঁপাইল,
কাঁপাইল রসাতল,
কাঁপাইল সর্বস্থল সর্ব রাজপুরী ;—
ইংলণ্ড-ঈশ্বরী আজ ভারত-ঈশ্বরী !
গভীর গর্জন করি,
অতি ভীম বেগ ধরি,
ব্রিটিসের জয়কারী কামান ছুটিল,
মহীধর হিমালয়,
মনানন্দ ঘোষণায়,
গঙ্গারূপে নয়নাশ্রু হরষে ত্যাজিল ;
সুখনীরে মগ্ন হয়ে,
সুখধ্বনি শব্দ পেয়ে,
প্রতিধ্বনি শব্দে বলে ওই বিন্ধ্যগিরি ;—
"ইংলণ্ড-ঈশ্বরী আজ ভারত-ঈশ্বরী ।

অমর-অমরীগণে যদি এমনই কথায় কথায় কাঁপিয়া উঠিতে ইচ্ছা করেন, তাহাতে কেহ বিশেষ আপত্তি করিবে না ; কিন্তু মহীধর হিমালয় "মনানন্দ ঘোষণায়" এত কালের পর গঙ্গারূপে নয়নাশ্রু ত্যাগ করিবেন, ইহাতে বিশেষ আপত্তি । একান্ত পক্ষে কুমারখালি স্কুলের পণ্ডিত মহাশয় ছাত্রের এত বিদ্যা দেখিয়া বিশেষ আপত্তি করিবেন আশঙ্কা করি ।

এ ত গেল বীররস । তারপর রজনীকান্ত চক্রবর্তী প্রণীত চিত্তোন্মাদিনী নামে গ্রন্থ হইতে কিঞ্চিৎ আদিরসের পরীক্ষা করুন ।

(সখি !) আইল শরদকাল কিবা সুখময় রে ।
পৌর্ণমাসী নিশি শশী গগনে উদয় রে ।
শরদেন্দু সুধাকরে,
লইয়া প্রকৃতি করে,

জীবন সঞ্চার করে,
মহীরুহকুলে রে।
আইল শরদকাল কিবা সুখময় রে।
পৌর্ণমাসী নিশি শশী গগনে উপরে রে॥
(সখি রে!) কহ্লার কুমুদ কত,
পদ্ম কোকনদ যত,
কিবা শোভে অবিরত,
জলজাত ফুলে রে॥
আইল শরদকাল কিবা সুখময় রে।
পৌর্ণমাসী নিশি শশী গগনে উদয় রে॥

—ইত্যাদি।

দেখ কবির কি আশ্চর্য ক্ষমতা।

"শরদেন্দু সুধাকরে, লইয়া প্রকৃতি করে,
জীবন সঞ্চার করে, মহীরুহ কুলেরে।"

শরদিন্দুকে পদচ্যুত করিয়া শরদেন্দু, পক্ষীর ন্যায় প্রকৃতির করে উঠিয়া, মহীরুহকুলের জীবন সঞ্চার করিতে আরম্ভ করিয়াছেন। শরদেন্দুর আশ্চর্য শক্তি বলিতে হইবে—একেবারে ব্যাকরণ, অলঙ্কার ও বিজ্ঞানের মুণ্ডপাত করিয়াছেন। যাহাই হউক, দেখিয়া শুনিয়া বোধ হয় চিত্ত উন্মাদিনী পাঠক-দিগের এমনি চিত্তের উন্মাদ জন্মিয়া দিবার সম্ভাবনা যে আমরা বিবেচনা করি, লেখক পথে ঘাটে সতর্ক হইয়া বাহির হইবেন। অনেকেই উন্মত্ত।

গীতিকাব্য ছাড়িয়া একবার নাটকে গিয়া দেখা যাউক। যে নাটকখানি হাতে উঠিল তাহার নাম বীরেন্দ্রবিনাশ। এটি বিরাট-পর্বান্তর্গত কীচকবধ-বিষয়িণী অপূর্ব কথা লইয়া রচিত হইয়াছে। নাটককুলগুরু শেক্সপীয়র দেশ-কালের প্রভেদ বড় মানেন না; হৃদয়াভ্যন্তরের চিত্রে একাগ্রচিত্ত হইয়া বাহ্য সংস্কারে অনেক সময়ে অমনোযোগী। প্রাচীন "গল" বা প্রাচীন রোমানের মুখে অনেক সময়ে আধুনিক ইংরেজের মত কথা বসাইয়াছেন। বাঙ্গালী নাটককার সকলেই মনে করেন আমরা একটি ক্ষুদ্র শেক্সপীয়র, আমরাও ঐরূপ করিলে ক্ষতি নাই। বীরেন্দ্রবিনাশের আরম্ভে বিরাটমহিষীর দুই পরিচারিকার যে কথোপকথন আছে, তাহা হইতে দুই-চারি ছত্র উদ্ধৃত করিলেই আমাদের কথা প্রমাণীকৃত হইবে। কিন্তু পাঠকদিগকে সে দুঃখ দিতে পারি না; আমরা দয়ালুচিত্ত বলিয়াই ক্ষান্ত হইলাম।

তার পর আর-একখানি নাটক হাতে তুলিলাম—নাম সুকুমারী নাটক।

এক স্থানে দেখিলাম, কেশববাবুর চরিত্র লইয়া বাগবিতণ্ডা। লেখক বোধহয় মনে করিয়াছেন যে, ইহাতে নাটক বিশিষ্ট প্রকারে নাটকত্ব প্রাপ্ত হইল। তার পর একস্থানে একটি কবিতা খুঁজিয়া পাইলাম। নায়িকা সুকুমারী আওড়াই-তেছেন ;—

দেখ না কেমন—শশী সুচিকন
জগত ভূষণ উঠেছে ঐ
উহার তুলনা, তুল না তুল না
জগতে বল না অমন কৈ।

পড়িতে পড়িতে বদন অধিকারীকে মনে পড়িল—"ছিই! ছিই! চাঁদের তুলনা।" আমাদিগের একটি বন্ধু কবিতাটি আর-একটু বৃদ্ধি করিয়া দিলেন যথা—তুলনা তুল না, বল না ললনা, করো না ছলনা, চিত্তচলনা, নলিনী-ললনা, ভোজন হল না, ইত্যাদি ইত্যাদি।

ইহাকে বলে বাঙ্গালার সাহিত্য!

শ্রাবণ ১২৮৪

বঙ্গীয় সাহিত্য সমাজ

অনুষ্ঠানপত্র

ভারতবর্ষের সর্ব প্রদেশ অপেক্ষা বিদ্যানুশীলন ও সভ্যতা বর্ধনে বাঙ্গালা প্রদেশ সম্পূর্ণ রূপে অগ্রগামী হওয়াতে, ভারতবর্ষের অপরাপর প্রদেশের সাহিত্যাপেক্ষা বঙ্গীয় সাহিত্য উৎকর্ষ প্রাপ্ত হইয়া ইউরোপীয় সাহিত্য সদৃশ হইতেছে। পৌরাণিক ইতিহাসের বারংবার অনুকরণ এবং সামান্য শিশুবোধ অথবা অশ্লীল উপন্যাস পরিত্যাগ করিয়া বাঙ্গালীরা এক্ষণে গদ্যকাব্য, নাটক, দেশপর্যটনবৃত্তান্ত, ইতিহাস, বিজ্ঞান, পদ্য, কাব্য, প্রবন্ধ ইত্যাদি লিখিতেছেন। অতএব বঙ্গ-ভাষাকে প্রণালীবদ্ধ করিয়া তাহার একতা সম্পাদন করিবার ও সাহিত্যে প্রয়োগ-যোগ্য ভাষা নির্ণয় করিবার সময় উপস্থিত হইয়াছে।

এক্ষণে বাঙ্গালায় দুই দল দেখা যায়। একদল পাণ্ডিত্যাভিমানে অপর্যাপ্ত সংস্কৃত শব্দ ব্যবহার করিতে প্রযত্নশীল। সাধারণ সমাজে তাঁহাদের ব্যবহৃত কঠিন শব্দসকল বুঝে কি না, তৎপ্রতি দৃষ্টিপাত না করিয়া বাঙ্গালাকে তাঁহারা সংস্কৃত করিতে চাহেন। অপর দল ইতর ও স্থানীয় ভাষা ব্যবহার করত সুশিক্ষিত সংস্কারের প্রতিযোগী হইয়া উঠিতেছেন।

ইউরোপীয় ভাষার মধ্যে সংস্কারবিশিষ্টা পাঁচটি প্রধান ; ইংরাজি, ফ্রেঞ্চ, জরমান, ইটালীয় এবং স্পানীয়। তত্তদ্দেশীয় সুশিক্ষিত সম্প্রদায়ের পাঠযোগ্য পুস্তকাদির জন্য এক-একটি পৃথক ও সুনির্ণীত ভাষা অবধারিত আছে। সুশিক্ষিত ইংরাজেরা ইংলণ্ডের যে প্রদেশ বা বিভাগ হইতেই লিখুন, এক ভাষাতেই লিখিবেন। বলটিক হইতে আল্প্‌স্‌ পর্যন্ত সকল জরমান জাতি, সাবয় হইতে পালারোয় পর্যন্ত সমস্ত ইটালীয়েরা, লিলে হইতে মারসেল পর্যন্ত সকল ফরাসিসেরা এবং কাটালান গালিসিয়ান, অণ্ডালুসিয়ান, কাস্টিলিয়ান প্রভৃতি সমস্ত স্পানীয়েরা, এক-এক সুনির্ণীত সাধুভাষা ব্যবহার করিয়া থাকেন, এবং সেই সেই ভাষাতে ব্যাকরণভেদ অথবা নির্ণীত শব্দসকলের বিভিন্নতা কুত্রাপি দেখা যায় না।

অথচ প্রাচীন কালে, অর্থাৎ খ্রীষ্টীয় পঞ্চদশ শতাব্দীতে ঐ ঐ ভাষার ঐক্য ছিল না। ইংলণ্ডে "হাবলক দি ডেন" লিঙ্কন্‌ প্রদেশের স্থানীয় ভাষায়, "পিয়র্স প্লৌমান" হাণ্টস প্রদেশের স্থানীয় ভাষায় লিখিত। বারবর এবং সর ডেবিড লিণ্ডসে উত্তরপ্রদেশীয় ইংরাজি অর্থাৎ "লোলাণ্ড" স্কচে লিখিয়া গিয়াছেন। কিন্তু এই সকল গ্রন্থকার যে স্থানীয় ভাষায় লিখিয়াছেন, তাহা তাঁহাদের উপলব্ধিও হয় নাই। মধ্যস্থিত সর্বমান্য কোন ভাষার সহিত তুলনা না করিলে খণ্ডদেশস্থিত কোন ভাষাকে স্থানীয় ভাষা অথবা অপভ্রংশপ্রাপ্ত ভাষা বলা যায় না, এবং মধ্যস্থিত সাধারণের কোন গ্রাহ্য ভাষা "লিণ্ডসের" স্কচ, এবং লাংলাণ্ডের স্ট্রাফোর্ডশায়র ইংরাজি বলিয়া অবশ্য পরিগণিত হইতে পারে না।

সপ্তম হেনরির রাজ্যকালে বিদ্রোহশান্তি হয়। তদনন্তর তাঁহার পুত্রের অমাত্যবর্গ মহাপ্রভাশীল ধনগুণবিশিষ্ট মহাত্মাগণ লণ্ডন মহানগরকে শোভিত করাতে সহজেই ঐ স্থানের ভাষা সর্বাপেক্ষা উন্নতভাব গ্রহণ করিয়াছিল। এবং এলিজেবেথের রাজ্যকালে অদ্বিতীয় এবং চিরস্মরণীয় কতিপয় লেখক-চূড়ামণির দ্বারা উৎকৃষ্ট গ্রন্থাদি লিপিবদ্ধ হইলে ইংরাজি ভাষা স্থিরীকৃত হইয়া উঠিয়াছিল। যে ভাষায় শেক্ষপীয়র লিখিয়াছেন, তাহার সহিত অপর স্থানীয় ভাষার তুলনা বিরহ জন্য, তদবধি আধুনিক ইংরাজি ভাষা স্থায়িত্ব প্রাপ্ত হইয়াছে।

ফ্রান্সে দৃষ্টিপাত করিলে দেখা যায় যে, ষষ্ঠ শতাব্দীতে তদ্রাজ্যের যেরূপ ছিন্নাবস্থা, ভাষারও তদ্রূপ। উক্ত দেশে তৎকালে অসংখ্য ভাষা প্রচলিত হয়। সে সকল ভাষাই লাটিন ভাষা হইতে উৎপন্ন কিন্তু কেল্ট এবং জরমান ভাষা মিশ্রিত প্রবেন্‌সল্‌ অর্থাৎ এক ভাষা এবং ফ্রেঞ্চ কর্থাৎ অএল ভাষা প্রধান। নরমান্‌ পিকার্দে এবং অপরাপর ভাষা সকলেই সমভাবাপন্ন এবং সমকক্ষ হইয়া

প্রচলিত হয়, এবং বড় বড় লেখকেরাও আপনাপন স্থানীয় ভাষায় গ্রন্থ প্রস্তুত করিয়াছিলেন। উক্ত সকল ভাষার মূল দুইটি, প্রথম ফ্রেঞ্চ, দ্বিতীয় প্রবেন্সল। উত্তর প্রদেশীয় ভাষা অর্থাৎ ফ্রেঞ্চ, ফ্রান্সের সীমার বাহিরেও ব্যবহৃত হইত, অর্থাৎ ইংলণ্ডীয়, ইটালীয় ও জরমানির ভদ্র সমাজে প্রচলিত ছিল। যদিও এই ভাষা ক্রমে একতা প্রাপ্ত হইতেছিল, কিন্তু ষষ্ঠদশ শতাব্দী পর্যন্তও তাহার উচ্চারণ, বর্ণবিধান, এবং ব্যাকরণের বিশুদ্ধাবস্থা হয় নাই। ১৫৫৯ অব্দে এলিয়ট এবং ১৫৮০ অব্দে মণ্টেন ফ্রেঞ্চ ভাষা প্রথমে একতাবদ্ধ করেন।

১৬৩৫ অব্দে কার্দিনাল রিশলু ফ্রেঞ্চ একাডেমী স্থাপনপূর্বক দেশীয় ভাষার সংশোধন ও একতা বদ্ধমূল করিয়াছিলেন।

জার্মানি ফ্রান্স হইতে অধিকতর বিস্তৃত। সহজেই তদ্দেশে ভাষাভেদের আরও আধিক্য ছিল, এবং জরমানি রোমরাজ্যের অধীন না হওয়ায় একতা-লাভের বিশেষ উপায়ও হয় নাই।

জরমানির প্রাচীন ভাষার অল্পমাত্রই উদাহরণ এক্ষণে পাওয়া যায়, যথা, ৩৫০ খ্রীষ্টাব্দে আলফিলাসের মিসোগথিক, ৪৯০ খ্রীষ্টাব্দে কয়েকটি শব্দ ফ্রাঙ্কিস এবং কিঞ্চিৎ আলিমানিক পাওয়া যায়। অনেক দিবসাবধি এক রাজার শাসনাধীন হওয়া প্রযুক্ত ফ্রাঙ্কিস্, আলিমানিক এবং বাবেরিয়ান্ ভাষাত্রয় ক্রমে মিলিত হইয়া একভাষাপ্রায় হইয়া "হাই জরমান" নামে বিখ্যাত হইয়াছে। এবং অপর ভাষা মিলিত না হওয়া প্রযুক্ত "লো জরমান" আখ্যা প্রাপ্ত হইয়াছে। স্থানীয় জরমান ভাষাসকল যে প্রণালীতে ক্রমে একতাভাব গ্রহণ করিয়াছে, তাহার বিস্তারিত বিবরণ এস্থলে অনাবশ্যক। ৮০০ খ্রীঃ "কারল দি গ্রেট" কর্তৃক বিদ্যানুশীলনের উন্নতি হইয়াছিল, কিন্তু অল্পকালমাত্র স্থায়ী ছিল। রাজবংশ ফ্রাঙ্কিস থাকা জন্য ভাষাও ফ্রাঙ্কিস্ ছিল। অটফ্রিড রেবেলসের এবং অপর অপর গ্রন্থকারের রচনা অদ্যাবধি বর্তমান আছে। ইহার মধ্যে কতক লো জরমানে, কতক সাক্ষণে, কতক ফ্রাঙ্কিসে লিখিত। অনেককালাবধি এইমত ভাষাভেদই প্রচলিত থাকে। কখন সাক্ষণ কবিরা, কখন স্বাবিয়ান লেখকেরা, কখন লো জরমান গ্রন্থকারেরা উন্নতিশীল হইয়াছিলেন, কিন্তু নব্য হাই জারমান সাধুভাষা মহাতেজস্বী, বহুজ্ঞানাপন্ন লথর মহোদয়ের দ্বারা স্থাপিত হয়। উত্তরাঞ্চলের লোডচ এবং বাবরিয়ার ভাষার, মধ্যবর্তী সাক্ষণির ভাষা অবলম্বন করিয়া তিনি সাধারণের উপকারার্থে বহু পরিশ্রমে এবং মহাযত্ন-সহকারে ভদ্রসমাজের সাধুভাষাতে ধর্মপুস্তক অনুবাদ করিয়া তাহা ১৫০৪ খ্রীঃ প্রকাশিত করেন। সাধুভাষাসমূহকে লুপ্ত করিয়া জরমানির ভদ্রসমাজের ভাষা হইয়াছে।

ইটালীও ঐমত নানা স্থানীয় ভাষায় পূর্ণ ছিল। এ দেশে যদিও ভদ্র-সমাজে শত শত বৎসরাবধি লাটিন ভাষা ব্যবহার হইত, কিন্তু অনুমান করিতে পারা যায় যে, সাধারণ লোকে আপন আপন স্থানীয় ভাষা কখনই ত্যাগ করে নাই। ষষ্ঠ শতাব্দীতে ইটালীতে বিদ্যা লুপ্ত হয়, এবং পাঁচশত বৎসর পর্যন্ত ভাষার একতা ও উদ্দীপনাসাহিত্যাদির আলোকাভাবে ইটালী অন্ধকারপূর্ণ ছিল। একাদশ শতাব্দী হইতে কিঞ্চিৎ উন্নতি আরম্ভ হইয়া দ্বাদশ শতাব্দীতে ইটালীর প্রভাততারার স্বরূপ দান্তে এবং পেত্রার্কার উদয় হয়। এই কবিদ্বয়ের গভীর ও স্থায়ী গুণসকল সমস্ত দেশমধ্যে প্রচারিত হইলে, ইটালীয় ভাষার একতা আরম্ভ হয়, কিন্তু দেশীয় "একাডেমি" হইতে তাহার স্থায়িত্ব এবং নির্ণীতাবস্থা প্রাপ্তি হয়।

ইটালীদেশীয় সমস্ত একাডেমি মধ্যে ফ্লরেন্স নগরের একাডেমি সর্বত্র প্রসিদ্ধ। এই সভা ১৫৪০ খ্রীঃ স্থাপিত হয়। এতৎকালে ইটালীয় ভাষা টস্‌কান্ নামে বিখ্যাত ছিল। টস্‌কান্ ভাষার সংশোধনকরণাভিপ্রায়ে এই একাডেমির নিয়োগ করা হয়। ইটালির অন্যান্য নগরে বহুসংখ্যক এইপ্রকার একাডেমি স্থাপিত হয়, কিন্তু ফ্লরেন্সের একাডেমি সর্বাপেক্ষা মঙ্গলদায়ক হইয়াছিল। এই একাডেমির কয়েকজন সভ্য মূলসভা পরিত্যাগ করিয়া নূতন অপর এক সভা স্থাপিত করেন, তাহার নাম "একাদামি দেলা ক্রুস্কা"। চালুনির মত দোষ ছাঁকিয়া ফেলা ইহার উদ্দেশ্য, সেইজন্য ঐ নাম। স্বদেশে যে যে পুস্তকাদি প্রকাশ হইত, তাহার দোষগুণ বিচার করা এই সভার সভ্যাদিগের কার্য এবং রচনাসকলের গুণের প্রশংসা এবং দোষের নিন্দা করিয়া তাঁহারা দেশীয় লোকের বিচারশক্তির এবং রসগ্রাহিতার উৎকর্ষ সম্পাদন করিয়াছিলেন। ১৫৯০ খ্রীঃ এই সভা হইতে "বকেবলোরিয়া ডিলা ক্রুসা" নামক প্রথম শুদ্ধ ইউরোপীয় অভিধান প্রকাশিত হয়।

গথদিগের আক্রমণের পর বহু শতাব্দী পর্যন্ত স্পেনদেশ মূর্খতান্ধকারে পূর্ণ ছিল। কিয়দংশ রাজ্য আরবগণের দ্বারা শাসিত হয়, এবং অপরাপর অংশ ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র স্বাধীন রাজ্যে বিভক্ত হওয়াতে সহজেই সমস্ত দেশ নানা স্থানীয় ভাষায় পরিপূর্ণ হইয়াছিল। ষষ্ঠদশ শতাব্দীতে কাস্টিলিয়ানেরা তাহাদের বিখ্যাত নাটকাদি লিখিতে আরম্ভ করে। উসিনা নাহারো এবং রুহো স্পেনের আদ্য বিখ্যাত নাম, কিন্তু তথাকার অসামান্য গ্রন্থকারত্রয়,—সরবণ্টিস, লোপ দে বেগা এবং কালদেরন আর এক শতাব্দীর পর আবির্ভূত হইয়াছিলেন। ১৬০৩ খ্রীঃ সরবণ্টিস-কৃত "ডন কুইকজট" প্রকাশ হয়। লোপের নাটকাদি তৎপরে এবং কালাদেরনের পুস্তকাদি তৎপরে প্রকাশিত হয়।

পঞ্চম চার্‌ল্‌স্‌ এবং দ্বিতীয় ফিলিপের রাজ্যকালে যে যে মহাত্মা জন্মগ্রহণ করত স্বদেশকে মহাপ্রভাসম্পন্ন এবং শোভমান করিয়াছিলেন, তাঁহারা সকলই কাস্টিলিয়ান। কবিতা ও প্রবন্ধে স্পেন অতি বিখ্যাত, কিন্তু প্রাচীন কবিতা সকলই প্রায় কাস্টিলিয়ান ভাষাতে প্রস্তুত। কাটালান আরাগন বিসকে গালিসিয়া আন্দালুসিয়া বলেনসিয়া এবং স্পেনের অপরাপর প্রদেশস্থ লোকে সাহিত্য প্রণয়নের দ্বারা দেশের হিতসাধন করিতে পারেন নাই। সুতরাং কাস্টিলিয়ান্‌ স্পেনের সাধু ভাষার পদে অভিষিক্ত হইয়াছে। সরবণ্টিসের স্বদেশস্থ সকল লোকে দেশ সম্বন্ধে অদ্যাপি আপনাদিগকে স্পানিয়ার্ড বলিয়া পরিচয় দেয়, কিন্তু ভাষার উল্লেখে তাহারা "কাস্টালো" বলিয়া থাকে। স্পেনে ফ্রেঞ্চ একাডেমির সদৃশ এক সভা আছে, এবং তদ্দ্বারা স্পেনের সর্বতোভাবে হিতসাধন হইয়াছে।

সংক্ষেপে এবং অস্পষ্টরূপে ইউরোপীয় প্রধান পঞ্চ ভাষার উৎপত্তি এবং উন্নতির ইতিহাস উপরে বর্ণন করা হইল। সম্প্রতি উক্ত ভাষা সকলের যে যে কারণে ক্রমে সৌন্দর্য ও স্থায়িত্ব বিধান হইয়াছে, তাহা লিখা যাইতেছে। এই কারণসমূহের মধ্যে প্রধান উক্ত "একাডেমি"।

ফ্লোরেন্সের একাডেমি এবং তদনুকরণে যে যে একাডেমি স্থাপিত হয়, তত্তৎ সভ্যেরা পেত্রার্কার গ্রন্থসকল আদর্শস্বরূপ গ্রহণ করিয়া, ক্রমে অপরাপর প্রধান কবিদিগের, অর্থাৎ দান্তে আরিয়স্তো এবং তাসোর রচনা এবং পলসি, বইয়ার্দো প্রভৃতি নিম্নশ্রেণীর কবিদিগেরও গ্রন্থসকল পরীক্ষিত ও সমালোচিত করিতে আরম্ভ করেন। স্বদেশের সাহিত্যের এবং ভদ্র সমাজের কথোপকথনের উপযুক্ত ভাষা নির্ণীত ও স্থাপিত করা সভ্যদিগের উদ্দেশ্য ও সংকল্প ছিল। এতদভিপ্রায়জনিত প্রথা ও কর্মপ্রণালী নিম্নে লিখিত হইতেছে। সভ্যেরা মধ্যে মধ্যে একত্র হইয়া প্রধান প্রধান গ্রন্থকারদিগের ব্যবহৃত শব্দ ও ব্যাকরণপদ্ধতির বিচার করিতেন। যে যে শব্দ নিয়মসঙ্গত ও উত্তম জ্ঞান করিতেন, তাহা গ্রাহ্য এবং যাহা অশুদ্ধ ও অসামাজিক বিবেচনা করিতেন, তাহা অগ্রাহ্য করিয়া, সভার মতামত প্রকাশ করিতেন। এইরূপ উৎকর্ষের এক আদর্শ ধার্য হইলে, লেখকেরা আপন গ্রন্থসমুদয় আদর্শসদৃশ হইয়াছে কি না, তাহার বিচার করিয়া ও নিয়মানুসারে সংশোধিত করত একাডেমির সভ্যদের বিচারজন্য অর্পিত করিতেন। সভ্যদিগের দ্বারা সংশোধিত হইলে গ্রন্থ প্রকাশিত হইত। এইরূপ বিচারে যদ্যপি মধ্যে মধ্যে বাগাড়ম্বর, এবং বৃথা ও কঠোর তর্কে সামান্য শুদ্ধাশুদ্ধের অনেক অলীক কল্পনা হইত, কিন্তু পরিণামে যে তদ্দ্বারা সামাজিক সাহিত্যের পরিমার্জিতাবস্থা জন্মিয়াছিল, তাহা অবশ্য স্বীকার করিতে হইবেক।

ইটালীর একাডেমি হইতে ফ্রেঞ্চ একাডেমি অধিকতর গৌরবান্বিত এবং বিখ্যাত ছিল। ফ্রেঞ্চ একাডেমির সভ্যেরা কেবল শব্দের ও সমকালিক গ্রন্থের সমালোচনে তৃপ্ত হয়েন নাই। তাঁহারা প্রথম উদ্যম হইতেই অভিধান এবং ব্যাকরণ সৃজনে যত্নশীল হইয়াছিলেন। অভিধান সংগ্রহে ফ্রান্সের সর্বোত্তম গ্রন্থকারদিগের ব্যবহৃত উৎকৃষ্ট ফ্রেঞ্চ কথামাত্র উদ্ধৃত, এবং অশুদ্ধ অসামাজিক এবং দূরকল্পিত ভাববোধক শব্দসকল ত্যাগ করা তাঁহাদিগের উদ্দেশ্য। ভদ্রসমাজে সাধারণ বাক্যালাপে যে যে কথা চলিত ছিল, তাহা তাঁহারা গ্রহণ করিতেন এবং ইতর লোকের ব্যবহৃত শব্দ সামান্য হইলেও তাহার অনায়াসবোধগম্যতা এবং ভাবব্যক্তিগুণ থাকিলে তাহাও উদ্ধৃত করিতেন। বহু পরিশ্রমে এবং যত্নে ১৬৯৪ খ্রীঃ এই অভিধান প্রকাশিত হইয়া ১৭০০ খ্রীঃ সংশোধিত হয়। সমাজে ইহার এমত মান ছিল যে, কখন কোন গ্রন্থকার তাহার অবহেলা করিতে পারেন নাই। যে সময়ে এইমত ভাষা নির্ণীত হয়, তখন পাস্কল বসুএট মালেব্রান্‌শ এবং আর্নল্‌ড্‌ নামক লেখকসকল অতি পরিশুদ্ধ গ্রন্থসমূহ লিখিয়া স্বদেশকে পূজ্য করিয়াছিলেন। কেবল ভাষার প্রতি লক্ষ্য করিয়া রচনা করিতে হইলে সামান্য লোকের উদ্যমভঙ্গ হইতে পারে। কিন্তু উক্ত মহাত্মারা ভাষার প্রতি দৃষ্টি রাখিয়াও নিজ নিজ প্রভাসম্পন্ন শক্তির আশ্চর্য গুণে রচনা একবারে দোষশূন্য করিয়াছিলেন। তাঁহারা জানিতেন যে, যেমন বাহ্য প্রাকৃতিক নিয়মাদি অলঙ্ঘ্য, সেইমত কাব্যরচনার এবং ব্যাকরণের নিয়মাদিরও গতি অলঙ্ঘ্য। যেমন পদার্থের স্বাভাবিক নিয়মাদি মনুষ্যের বুদ্ধিকৌশলে সুফলপ্রদায়িনী হইতে পারে, কিন্তু তৎপ্রতি বিদ্রোহাচরণ করা অনর্থক ও বিফল, সেইমত সাহিত্যরচনার এবং ব্যাকরণের নিয়মাদির গতিরোধ কাহারও সাধ্য নহে। কেহ তাহা করস্থ করিতে সক্ষম নহেন। উত্তম রচনার চিহ্ন এই যে, তাহা শুদ্ধ, অর্থবোধক এবং সহজ হইবেক। কোন গ্রন্থকার, বিশেষ গদ্যলেখক আপন মাতৃভাষার নির্দিষ্ট নিয়মাদি ভঙ্গ অথবা চিত্তাকর্ষণজন্য নূতন কথা কিংবা নিয়মাদি ব্যবহার করিতে কোনমতে সক্ষম নহেন।*

ফ্রান্সের এবং ইংলণ্ডের আচার ব্যবহার পৃথক। ফ্রান্সে ভাষাপদ্ধতি সাধারণের ঐক্যে ও যত্নে নির্ণীত হইয়াছে, ইংলণ্ডে তাহা ক্রমে সময়ানুসারে ব্যক্তিবিশেষের স্বাধীন চর্চ্চায় উন্নতি প্রাপ্ত হইয়াছে। ফ্রান্সে যাহা সাধারণের জ্ঞাতকৃত সমবেত চেষ্টায় সম্পাদিত, ইংলণ্ডে তাহা স্বতঃসৃষ্ট। কি প্রকারে জন্মিল, তাহা হঠাৎ বোধগম্য নহে।

* "হালমস্‌ ইউরোপীয় লিটেরেচর" ৪, ২৯৩।

ফ্রান্সে এবং ইটালীতে পর্যটন করায় ইংরাজদিগের আপনাদিগের রূঢ় অথচ ব্যক্তিক্ষম ভাষার প্রতি প্রথম দৃষ্টিপাত হয়। প্রাচীন ইংরাজি কবি "চসর" নিজ কবিতাবলী সুমিষ্টকরণজন্য অনেক ফ্রেঞ্চ শব্দ তাহাতে ব্যবহার করিয়াছেন, এবং এই প্রথা অদ্যাপিও প্রচলিত আছে। লিলী আপন ইউফিস গ্রন্থে অপর প্রকারে ভাষাশুদ্ধির চেষ্টা পাইয়াছিলেন, এবং কিয়দ্দিনের জন্য তাঁহার পুস্তক মহামান্যও হইয়াছিল, কিন্তু যাহার যে যথার্থ নাম, তাহা তাহাকে না দিয়া, প্রকারান্তরের প্রচুর শব্দ প্রয়োগ দ্বারা সামান্যভাবে বৃহৎ শব্দ ব্যবহার করা, ভাষার ব্যভিচার বলিতে হইবেক। লিলীর সময়ের ভদ্রসমাজেরও কথাবার্তা অশ্লীল ছিল। ইউফিসের প্রণালী দ্বারা সামাজিক ভাষার অনেক উপকার হইয়াছিল, ইহা স্বীকার করিতে হইবেক। ইউফিস ১৫৭৯ খ্রীঃ প্রকাশ হয় এবং ৫০ বৎসর পরেই গদ্য লিখিবার এ প্রকার বিশুদ্ধ নিয়ম দেখা যায় যে, তাহার তুল্য রচনা এখনও পাওয়া দুঃসাধ্য। সর ফিলিপ সিডনির "আরকেডিয়া", বেকনের সারবতী ও গভীরা রচনা, এবং হুকর ও টেলরের অসামান্য মধুরতা, ইংরাজমাত্রেরই আদরের স্থল। ১৬৪৪ খ্রীঃ প্রকাশিত মিলটনের "আরিওপেজিটিকা" বোধ হয়, ইংরাজি গদ্যের অদ্বিতীয় আদর্শ। এই প্রবন্ধ গ্রন্থপত্রাদির স্বাধীনতা রক্ষার জন্য লিখিত হয়, এবং কবিবর পদ্যে যেমন আপনার অসামান্য মধুরতার পরিচয় দিয়াছেন, তেমনি তাঁহার এই গদ্যপ্রবন্ধ গাম্ভীর্য ও সৌন্দর্য এবং সুমিষ্ট রসের পরিচয়।

পর শতাব্দীতে ইংলণ্ডে বহুতর সুলেখক জন্মিয়াছিলেন, কিন্তু তাঁহাদের গ্রন্থসকল তৎকালপ্রচলিত পদ্ধতির দোষে মনকে তাদৃশ আকর্ষণ করে না। প্রাচীনদিগের গাম্ভীর্য ও মিষ্টতা অতি মনোহর, ইংরাজি ভাষার উৎকৃষ্ট রূপ সেমুয়েল জনসন কর্তৃক নির্ণীত হয়। জনসনের রচনা যদিও শ্রমসিদ্ধা, কিন্তু বিশুদ্ধ এবং রমণীয় ছিল। ১৭৬০ খ্রীঃ জনসন নিজ মহাভিধান সংগ্রহ করিয়াছিলেন। নানা গ্রন্থ হইতে উদ্ধৃত এবং দৃষ্টান্তে পরিপূর্ণ সমস্ত ইংরাজি শব্দ অভিধানে স্থাপিত করিয়া ভাষার স্থায়িত্ব এবং শব্দের অর্থ নির্ণয় করিয়াছেন। উদ্ধৃত করিবার জন্য পুস্তকের অভাব ছিল না। তিনি নিজ অসাধারণ বিচারশক্তি এবং দক্ষতার দ্বারা অসীম পরিশ্রমে এই কঠিন ব্যাপার সুসম্পন্ন করিয়াছিলেন। এলিজেবেথের সময়ের লেখকদের ব্যবহৃত অনেক কঠিন লাটিন শব্দ সাধারণের বোধগম্য নহে। জনসন তৎসমুদায় এবং অপর অপর লেখকদের স্থানীয় অনেক রূঢ় শব্দ পরিত্যাগ করিয়া, অভিধানে কেবল বিশুদ্ধ অর্থবোধক ইংরাজি শব্দের সঙ্কলন করিয়াছিলেন। অভিধান

প্রকাশমাত্রেই সমাজের আদরণীয় হইয়া অদ্যাবধি ইংরাজি ভাষার "মাগ্নাচার্টা" হইয়া, পূজ্য হইয়া রহিয়াছে।

জরমানদিগের ভাষার আদ্যোপান্ত জন্মবৃত্তান্ত কলহপূর্ণ। তাহাতে হস্তক্ষেপণ করিবার অনাবশ্যক। এক্ষণে উক্ত সকল তর্কবিতর্ক বাঙ্গালা ভাষার পক্ষে উচিত কি না তাহাই বিবেচ্য।

বাঙ্গালা ভাষা প্রণালীবদ্ধ করা যে আবশ্যক, তাহা বোধ হয়, সকলেই স্বীকার করিবেন। বাঙ্গালাকে একেবারে সংস্কৃত ভাষা করিয়া তোলা এবং সংস্কৃত আভিধানিক শব্দসমূহ প্রয়োগপূর্বক ভাষাকে সাধারণের বোধাতীত করা কখনও উচিত নহে। অথচ রূঢ়, স্থানীয়, কর্কশ এবং অশ্লীল বাক্যসকল সাধু ভাষা হইতে বর্জিত করা আবশ্যক।

কথিত হইয়াছে যে, ইংরাজি ভাষা ক্রমে স্বতন্ত্র উপায়ের দ্বারা কোন কোন অসাধারণ ব্যক্তির পরিশ্রম এবং ক্ষমতাতে প্রণালীবদ্ধ হইয়াছে। আর ফ্রেঞ্চ, ইটালিয়ান এবং স্পানীয় ভাষা একত্রিত উৎসাহবিশিষ্ট সভার প্রযত্নে সুপ্রণালীবদ্ধ হইয়াছে। এই দুইপ্রকার গতির মধ্যে সভার দ্বারা বাঙ্গালা ভাষার হিতসাধনই উপযুক্ত ও সম্ভবপর বোধ হয়। বাঙ্গালায় এমত কোন সর্বজনপ্রতিষ্ঠিত ব্যক্তি নাই যে তাঁহার প্রচলিত নিয়ম, দেশীয় সকল লোকের নিকট মান্য হইবেক, এবং পাঠ্য পুস্তকেরও এমত আধিক্য ও উত্তমতা হয় নাই যে, তাহা হইতে জনসনসদৃশ কোন ব্যক্তি সঙ্কলনপূর্বক সাধুভাষা অবধারিত করিতে সক্ষম হইতে পারেন।

অতএব বাঙ্গালা সাহিত্যের ভাষার স্থিরতাবিধানজন্য সকল বাঙ্গালীর মিলিত হইয়া সভাস্থাপন করত তদ্দ্বারা ভাষার উন্নতিসাধন করা আবশ্যক। যদি এমত সভা স্থাপিত হয়, এবং তদ্দ্বারা ভাষার নির্ণয় হয়, তাহা হইলে বঙ্গদেশের পরমোপকার হইবেক, সন্দেহ নাই। আর সভা স্থাপিত হইলে যে এই কার্য সমাধা হওয়া সম্ভব, তাহাও সহজে অনুমান হয়। সভার দ্বারা অভিধান প্রকাশিত হইলে তাহাতে যে যে শব্দের স্থান নাই, কোন লেখক তাহা ব্যবহার করিতে সক্ষম হইবে না; এবং ইহাতেই ভাষা প্রণালীবদ্ধ হইবেক।

ইউরোপীয় একাডেমিতে প্রায় ৫০ জন সভ্য থাকিতে দেখা যায়, কিন্তু এদেশ বহুবিস্তীর্ণ এবং এদেশে স্থানীয় ভাষাও অনেক। অতএব একাডেমির শতাধিক সভ্য হইলেও হানি নাই। কলিকাতা রাজধানী, অতএব আদিসভা কলিকাতায় হওয়াই উচিত এবং ৩০ জন সভ্যের তথায় বাস করা আবশ্যক। অপর সভ্যগণ অন্যত্রনিবাসী পণ্ডিতবর্গ হইতে মনোনীত হইতে পারেন।

কলিকাতার সভ্যেরা সময়ে সময়ে একত্রিত হইবেন। অধিবেশনের জন্য একটি গৃহ অবধারিত করিলেও হানি নাই। কিন্তু প্রাচীন ফ্লরেণ্টাইনদিগের ন্যায় সভ্যগণের মধ্যে কোন এক সভ্যের বাগানবাটীতে একত্রিত হইলে সুখকর হইতে পারে। কলিকাতায় এ প্রকার উদ্যানের অভাব নাই। এবং বুদ্ধি-বিদ্যাসম্পন্ন সাধুগণ একত্রিত হইলে অবশ্যই সকলেরই পরমাহ্লাদজনক ও শুভকর হইবেক। সুখদ বলিয়া ক্রমে সভার কার্য সাধারণের চিত্তাকর্ষণপূর্বক দেশের কুশল সাধন করিতে পারে।

অভিধান প্রস্তুত করাই সভার মূল কর্ম। অথচ ঐ সম্বন্ধে প্রবন্ধপাঠাদি এবং তর্কবিতর্ক হইবার বাধা নাই। গ্রন্থকারেরা নিজ নিজ গ্রন্থ প্রকাশের পূর্বে সভাতে পাঠ করিবেন এবং পণ্ডিতসমূহের পরামর্শে তাহার সৌন্দর্যের বৃদ্ধি করিবেন। এমতে সাহিত্যের ক্রমে নির্মলতা এবং প্রতিভা বৃদ্ধি হইবেক। সঙ্গীত আলোচনা দ্বারা সভার মনোরঞ্জনও হইতে পারে। এবং প্রাচীন কবিগণের গীত ও নব্য গীতের সমালোচন সহকারে সঙ্গীতেরও উন্নতি লাভ হইতে পারিবেক।

প্রথম উদ্যমে টাকার আবশ্যক দেখা যায় না, কেবল বিদ্যাবুদ্ধি ও বিচারের আবশ্যক। ঈশ্বরপ্রসাদাৎ সম্প্রতি কলিকাতায় এবং দেশাভ্যন্তরে পল্লীগ্রামেও ইহার অভাব নাই। সভার দ্বারা আর-এক বিশেষ উপকার এই যে, ঐক্য এবং প্রীতিবন্ধনে সকলে বাঁধা থাকিবেন, এবং একতাবলে বলিষ্ঠ হইবেন। পল্লীগ্রামস্থ পণ্ডিতেরা মফঃস্বলে কোন কথা প্রচলিত থাকিলে তাহা ব্যবহার করা আবশ্যক কিনা এবং সংস্কৃত যে যে শব্দে সহজে অর্থবোধক হইবেক, তদ্বিষয়ে সুপরামর্শ দিতে পারিবেন। বঙ্গভাষা অপার। ইহা প্রণালীবদ্ধ করা মহৎ কার্য মনে করিলে আহ্লাদ হয়।

অধিকাংশ সভ্যগণ সহজেই বাঙ্গালী হইবেন, এবং কোন কোন হিতৈষী এবং বিজ্ঞ ইংরাজ মহোদয়গণকে গ্রহণ করাও অত্যাবশ্যক। অনেক উৎসাহ-শালী এবং বঙ্গহিতৈষী ইংরাজ মহাত্মা আগ্রহসহকারে এবিষয়ে উৎসাহদান করিবেন, তাহাতে সন্দেহ নাই। ভরসা হয়, সভা স্থাপন পরে ভারতবর্ষের মহামহিম গৌরবান্বিত গবর্ণর জেনারেল বাহাদুর সভার অধিপতিপদ গ্রহণ স্বীকার করিয়া সভাকে সম্মানিত করিতে পারেন।

*

যে অনুষ্ঠানপত্র উপরে প্রকটিত হইল, তাহা পণ্ডিতবর শ্রীযুক্ত জে বীম্‌স্ সাহেব কর্তৃক বঙ্গসমাজমধ্যে প্রচারিত হইবে। ইহা প্রচারিত হইবার পূর্বেই আমরা তাঁহার অনুগ্রহে বাঙ্গালায় প্রাপ্ত হইয়া সাদরে প্রকাশ করিলাম। বীম্‌স্

সাহেব দেশবিখ্যাত পণ্ডিত, এবং বঙ্গদেশের বিশেষ মঙ্গলাকাঙ্ক্ষী। তাঁহার কৃত প্রস্তাব যে পণ্ডিতসমাজে বিশেষ সমাদৃত হইবে, ইহা বলা বাহুল্য। তাঁহার কৃত প্রস্তাবের উপর অনুমোদনবাক্য আবশ্যক নাই, এবং বলিবার কথাও তিনি কিছু বাকি রাখেন নাই। আমরা ভরসা করি, যে সকল বঙ্গপণ্ডিতেরা দেশের চূড়া, তাঁহারা ইহার প্রতি বিশেষ মনোযোগী হইবেন। তাঁহাদিগের অভিপ্রায় বুঝিতে পারিলে আমরা এই প্রস্তাবের পুনরুত্থাপন করিব। ইতি।

বঙ্গদর্শন-সম্পাদক।

আষাঢ় ১২৭৯

৪ সামাজিক প্রসঙ্গ

একান্নবর্তী পরিবার

যেমন জ্যোতিষ্কসকল মাধ্যাকর্ষণশক্তির প্রভাবে পৃথক অথচ সংযুক্ত রূপে নভোমণ্ডলে পরিভ্রমণ করিতেছে, তদ্রূপ মনুষ্যগণ পরস্পরের সহিত বিভিন্ন হইলেও কোন অদ্ভুত কারণে আকৃষ্ট হইয়া একত্র সংসারযাত্রা নির্বাহ করিতেছেন। অনেকেই সময়ে সময়ে মনে করেন যে, "একাকী আসিয়াছি, একাকী মরিতে হইবেক", অতএব "পার্থিব সম্পর্ক নিতান্ত অকিঞ্চিৎকর"; পরন্তু এতাদৃশ বৈরাগ্যভাব কেবল ভাবুকদিগের কল্পনামাত্র। যদ্যপি পার্থিব সম্পর্ক বৃথাই হয়, এবং মৃত্যুকর্তৃক তাহা একেবারে বিনষ্ট হইয়া যায়, তবে বিয়োগযন্ত্রণা এত অসহ্য ও দীর্ঘকালস্থায়ী কেন? মনুষ্যের কথা দূরে থাকুক, পশু-পক্ষী আদি নিকৃষ্ট জন্তু এবং নদী-বৃক্ষ-গৃহ-পুষ্করিণী আদি নির্জীব পদার্থের উপরেও মায়া সংস্থাপিত হয়। বহু দিন হইল পিতৃমাতৃহীন হইয়াছি, তথাপি "মাতা এই স্থানে বসিয়া আমাকে আদর করিয়াছেন, পিতা এইখানে একবার ভর্ৎসনা করিয়াছিলেন, এবং এইখানে বসিয়া তাঁহাদিগের অন্তিমকালে অশ্রুবিসর্জন করিয়াছি", এইরূপ কথা মনে হইলে কত সময়ে চক্ষু বাষ্পাকুল হইয়া উঠে। অতএব কিরূপে বলিব যে তাঁহাদিগের সহিত এখন আর সম্পর্ক নাই। সদ্যোপ্রসূত সন্তানই হউক, অথবা দীন দুঃখী কিংবা নিতান্ত দুর্বৃত্ত দুরাচারই হউক, কেহই মৃত্যুমাত্র সংসার হইতে সর্বতোভাবে অপসারিত হইতে পারে না। দেহ পঞ্চত্ব পায়, জীবাত্মা কোথায় থাকেন, তদ্বিষয়ে অনেকের মতি স্থির নাই; তথাপি কোন কোন জীবিত ব্যক্তির অন্তঃকরণে যে থাকিতে হইবেক, তাহাতে কেহই সন্দেহ করেন না। এমন মনুষ্য নাই যে কোন মৃত ব্যক্তিকেই স্মরণ করে না অথবা আপনি মরিলে স্মরণ করিবার লোক নাই বলিয়া নিশ্চিন্ত থাকিতে পারে। এই অদ্ভুত মায়াজাল কেহই ত্যাগ করিতে পারে না, কাহারও ত্যাগ করিতে ইচ্ছা হয় না—এবং পণ্ডিতেরা যাহাই বলুন, আমাদের বিবেচনায়—ইহা ত্যাগ করা কর্তব্যও নহে। অতএব ইহা হইতে যেপ্রকারে সমাজের মঙ্গল হয়,

সেইরূপ বিধান করাই শ্রেয়ঃ। যাঁহারা ইহাকে ভাল মনে করেন, তাঁহাদিগের দ্বারা এই মায়াজাল বর্ণিত হওয়াই উচিত, এবং যাঁহারা ইহাকে মন্দ মনে করেন, তাঁহাদিগের পক্ষেও অগত্যা ইহার আনুষঙ্গিক দোষ দূরীকরণপূর্বক লোকের হিতচেষ্টা করা নিতান্ত বিধেয়।

মনুষ্যজাতি যে পশুগণের ন্যায় যথেচ্ছা বিচরণ না করিয়া একত্র বসবাস করেন, তাহার আদিকারণ বিবাহসংস্কার। শুদ্ধ নিজের আহারাচ্ছাদন লোকের উদ্দেশ্য হইলে, অতি অল্প আয়াসেই তাহা সম্পন্ন হইতে পারিত। কিন্তু মনুষ্য পরের চিন্তাতেই নিতান্ত ব্যস্ত। পরিবারের ভরণপোষণ, এবং সন্ততিগণের ভাবী অবস্থা সকলের মনেই নিতান্ত জাগরূক রহিয়াছে। তদ্ভিন্ন কেহ অন্যান্য আত্মীয়দিগের মঙ্গল এবং কেহ বা স্বদেশবাসীদিগের হিত অথবা সমগ্র মনুষ্য-সম্প্রদায়ের শুভানুধ্যানে সর্বদা মগ্ন থাকেন। জনসমাজে বিবাহপ্রথা না থাকিলে ইহার কিছুই মনুষ্যের মনে উদয় হইত না। বিবাহ হইলেই স্ত্রীপুরুষের পূর্ব-কালীন স্বাধীনভাব নির্মূল হইয়া যায়, এবং উভয়ের মনেই আত্মচিন্তার পার্শ্বে পরচিন্তা আসিয়া আবির্ভূত হয়। তখন নিজের সম্বন্ধে যতই তাচ্ছল্য থাকুক, পতিপত্নীর মঙ্গলকামনা বিলক্ষণ প্রবল হইয়া উঠে। এইরূপ চিন্তা উপস্থিত না হইলে, কেহ কোন সৎকর্মে প্রবৃত্ত হইতে পারে না। অতএব, পরিবারের ভরণ-পোষণনিমিত্ত ব্যাকুল হইয়া যে ব্যক্তি কোন কুকর্ম করে, তাহার জন্য 'মহা-মায়া'কে নিন্দা না করিয়া তাহার দারিদ্র্যনিবারণের উপায়প্রচেষ্টা করাই সঙ্গত।

আবার, বিবাহের পর সন্তান-উৎপত্তি হইলে, পতিপত্নীর মধ্যে নূতন একটি শৃঙ্খল নিবদ্ধ হয়। যে দেশে বিবাহপ্রথা নাই এবং স্ত্রীপুরুষেরা সকলেই এতদ্বিষয়ে স্বেচ্ছাচারী, সেখানে কেহ সন্তানলাভের সম্পূর্ণ সুখ অনুভব করিতে পারে না। জন্মদাতার সেই সন্তানে কোন অধিকার বর্তে না, মাতাও তাহার জন্য আপনার ভিন্ন অন্যের প্রতি নির্ভর করেন না; সুতরাং, সন্তান স্ত্রীপুরুষের প্রণয়বৃদ্ধিকারী না হইয়া বরং বিচ্ছেদের হেতু হয়। বিবাহসংস্কারকে স্ত্রীপুরুষের মধ্যে চুক্তিবিশেষ বলিয়া ভ্রম হইতে পারে বটে, কিন্তু সন্তানের সহিত সম্পর্ক কখনই সেরূপ বোধ হয় না; অতএব, ইহার প্রতি লক্ষ্য করিলেই বিবাহের নিগূঢ় মর্ম বোধ হইবেক। মহাভারতে লিখিত আছে যে, শ্বেতকেতু পিতৃসমক্ষে আপন মাতাকে কোন অপরিচিত পুরুষের সহিত গমন করিতে দেখিয়া, এই নিয়ম নির্দিষ্ট করিয়া দিয়াছিলেন যে, স্ত্রীজাতি পতি ভিন্ন অন্য পুরুষের সেবা করিতে পারিবেন না। এই গল্পটি বিবাহপ্রথাসংস্থাপনের রূপক-মাত্র। ইহার প্রকৃত মর্ম এই যে, পুত্রই মাতার স্বেচ্ছাচার নিবারণ করেন এবং পিতাকে তাঁহার প্রতি অনুরক্ত করিয়া রাখেন। অতএব, পতিপত্নীসম্বন্ধ শিথিল

করা উচিত নহে, বরং যত প্রগাঢ় হয়, ততই তদুভয় এবং পুত্রের পক্ষে মঙ্গল। আর, এই মঙ্গলে সমস্ত বর্তমান ও ভবিষ্যৎ কালেরই মঙ্গল।

পতিপত্নীর চিরকাল একত্র থাকাই ভাল। একথা স্বীকার করিলেও আর-একটি পৃথক মীমাংসার প্রয়োজন হইতেছে যে, পুত্রকন্যাও পিতৃসংসারে মাতার ন্যায় সংযুক্ত থাকিবেন কিনা ? কিন্তু যখন (নানাবিধ বিশিষ্ট কারণে) ভ্রাতা-ভগিনীতে বিবাহ নিষিদ্ধ হইয়াছে, তখন বিবাহান্তে পুত্র কন্যা উভয়েই কখন পিতৃ-আবাসে থাকিতে পারেন না ; হয় কন্যাকে পতিগৃহে যাইতে হইবেক,—নতুবা পুত্র পিতৃগৃহ ত্যাগ করিয়া আপন শ্বশুরালয়ে থাকিতে বাধ্য হইবেন। আমাদিগের দেশে কেবল কন্যাই পিতৃগৃহ ত্যাগ করেন। কিন্তু ইউরোপীয়-দিগের মধ্যে পুত্র কন্যা উভয়েই বিবাহিত হইলে স্বাধীনভাবে কালযাপন করেন। এই নিয়মে সমাজের মঙ্গল কি অমঙ্গল বৃদ্ধি হয়, তাহা স্থির করা কর্তব্য। ফলতঃ, ইহাই একান্নবর্তী পরিবার বিষয়ক বিচারের মূল কথা।

বিবাহের সময়ে পৃথক্-অন্ন হইলে গৃহত্যাগজনিত কোন দোষ বোধ হয় না। কিন্তু বিবাহ করিবার পরে পিতৃভবনে বাস করিলে স্বভাবতঃ পিতাপুত্রে এবং ভ্রাতৃগণের মধ্যে একান্নবর্তী পরিবার নিবদ্ধ হইয়া যায়। তদনন্তর যাঁহারা পৃথক হইতে ইচ্ছা করেন, তাঁহারা ন্যায্যমতে গৃহবিচ্ছেদের নিমিত্তক বলিয়া গণ্য হয়েন। অতএব, যদি পৃথগন্ন হওয়াই বাঞ্ছনীয় হয়, তবে বিবাহের সময়েই তাহার বন্দোবস্ত করা কর্তব্য।

১। একান্নে থাকার মহৎ গুণ এই যে, গৃহস্বামীর মৃত্যু হইলে তাঁহার ভ্রাতা, তদভাবে পুত্র অথবা ভ্রাতুষ্পুত্র, কেহ না কেহ পরিবাররক্ষার ভার গ্রহণ করিতে পারেন। ইঁহারা পৃথকালয়ে বাস করিলে, তাহার অনেক অসুবিধা জন্মে। বাঙ্গালির সংসারে পুরুষ অভিভাবক না থাকিলে, নানা ক্লেশ সহ্য করিতে হয়, কারণ ইউরোপীয়দিগের ন্যায় আমাদিগের মহিলারা সকলের সঙ্গে কথা কহিতে ও ইচ্ছামত সর্বত্র যাতায়াত করিতে পারেন না।

একান্নে থাকিলে সকলেই সময়ান্তরে বা ঘটনাবিশেষে পরস্পরের সাহায্য করিতে বাধ্য হয়েন। ইহাতে ইচ্ছা না থাকিলেও কার্যগতিকে একজনের দ্বারা অন্যের হিতসাধন হয়, এবং তাহা হইতে কখন কখন কার্যকারণের বিপর্যয় ঘটিয়া—স্নেহ হইতে যত্নের পরিবর্তে, অগত্যা যত্ন করিতে করিতে—লোকের মনে প্রকৃত ভক্তি, স্নেহ ও দয়ার উদ্রেক হইয়া থাকে। পিতামাতার ত কথাই নাই ; একান্নবর্তী পরিবারে অন্যের প্রতিও কখন কখন এতাদৃশ মমতা জন্মে যে পৃথগন্নে থাকিলে মনোমধ্যে তাহার উদয় হইতেই পারে না। এতদ্ভিন্ন, তৃণ-নির্মিত রজ্জুর ন্যায়, একান্নবর্তী পরিবারের বল তুল্যসংখ্যক পৃথক সংসারের

সমষ্টি অপেক্ষা অধিকতর হইবার সম্ভাবনা, অবশ্যই স্বীকার করিতে হইবেক।

কিন্তু এই সঙ্গে সঙ্গে একান্নবর্তী পরিবারের অনেকগুলি দোষও স্পষ্ট দেখা যায়। বহু পরিবারের অভিভাবকেরা কেহই স্বীয় কর্তব্য সম্পাদন করিতে পারেন না। একান্নবর্তী পরিবারদিগের পরস্পরের প্রতি মায়া যেমন বৃদ্ধি, তেমনি হ্রাস পাইবার সম্ভাবনাও অপেক্ষা অধিক। পিতামাতার প্রতি পুত্রের ভক্তি সহজে বিনষ্ট হয় না বটে, কিন্তু সচরাচর দেখিতে পাওয়া যায় যে, অন্যান্য পরিবারের মধ্যে গাঢ় প্রণয় না হইয়া বরং অসাধারণ বৈরিতা এবং ভয়ানক জ্ঞাতিবিরোধ জন্মে। পূর্বকালে জ্যেষ্ঠ সহোদরকে কনিষ্ঠেরা পিতৃ-তুল্য মান্য করিতেন, সুতরাং সকল কার্যেই পরস্পরের মধ্যে আনুগত্য এবং মঙ্গলানুষ্ঠানের লক্ষণ দৃষ্ট হইত, এবং কোন বিষয়ে কাহারও মনে দ্বিধা উপস্থিত হইত না। কিন্তু এক্ষণে সকল লোকের ইচ্ছাগুলি পূর্বাপেক্ষা এতাদৃশ নূতন রূপ ধারণ করিয়াছে যে, জ্যেষ্ঠেরা কোনমতেই পরিবারস্থ ব্যক্তিগণের মনের ভাব বুঝিয়া উঠিতে অথবা তদনুসারে কার্য করিতে পারেন না। অধিকন্তু কনিষ্ঠেরা তাহা প্রকাশ করিলে জ্যেষ্ঠের মনে বিরক্তি জন্মে। পূর্বে স্ত্রীকে তাচ্ছল্য করাই স্বামীর সচ্চরিত্রতার লক্ষণ ছিল; এক্ষণে পতিপত্নীর প্রণয় দেখিলে কেহই দোষ দিতে পারেন না; অথচ এরূপ প্রণয় হইতে যে সকল কার্য উদ্ভাবিত হয়, তাহা প্রকাশ হইলে সামান্য লোকে পরিহাস করেন আর গৃহস্থের মনোবেদনা হয়। সকলেই জানেন, পুত্র কি কনিষ্ঠ সহোদর বিদেশ-যাত্রাকালীন সস্ত্রীক গমনেচ্ছা প্রকাশ করিলে, গৃহস্বামী কিঞ্চিৎ অসুখী হয়েন। ইহা অভিভাবকের পক্ষে উচিত ব্যবহার নহে।

একান্নবর্তী পরিবারের ভ্রাতাদিগের মধ্যে বয়োধিক্যমতে প্রাধান্য জন্মে, কিন্তু সন্তানগণের পক্ষে পিতাই কর্তা; গৃহস্বামী কনিষ্ঠদিগের সেই কর্তৃত্বের প্রতি হস্তক্ষেপ করিতে পারেন না। ইহাতে একটি গুরুতর হানি হয়। বালক-বালিকারা একজনের দ্বারা শাসিত হইলে অন্যের নিকট আশ্রয় গ্রহণ করে, সুতরাং একদিকে পিতা, অন্যদিকে গৃহস্বামী আংশিক রূপে তাহাদিগের অভিভাবক হওয়াতে উভয়ের কেহই আপন কর্তব্য সম্পাদন করেন না, এবং উহারাও মস্তকহীনের ন্যায় আচরণ করে।

পূর্বকালে বধূগণ কেবল গৃহস্বামীকেই সর্বাচ্ছাদক বলিয়া জানিতেন, এক্ষণে দাম্পত্য প্রণয়ের আধিক্যবশতঃ তাঁহারাও পতি এবং শ্বশুর অথবা ভাসুর, দুইজন কর্তার অধীন হইয়া নিতান্ত স্বেচ্ছাচারীর ন্যায় ব্যবহার করেন।

ভ্রাতৃস্নেহ অতি অমূল্য পদার্থ; কিন্তু একবার ভ্রাতার স্নেহ বাহ্য বলিয়া

সন্দেহ হইলে সে ক্ষোভ কদাচ নিবৃত্ত হয় না। অপর ব্যক্তি মৌখিক স্নেহ প্রকাশ করিলেও সুখোৎপত্তি হয়, কিন্তু আত্মীয়গণের বিন্দুমাত্র ত্রুটি হইলেই অসহ্য বোধ হয়। ফলতঃ, মনুষ্যের মনে একটি প্রবৃত্তি বলপ্রাপ্ত হইলে অন্য-গুলি সহজেই খর্ব হইয়া যায়; পতিপত্নীর মধ্যে প্রগাঢ় স্নেহ এবং গুরুজনের প্রতি অবিচলিত ভক্তি, উভয় রক্ষা করা অসাধ্য। অতএব, একান্নবর্তী পরিবারে বিশৃঙ্খলা স্বভাবসিদ্ধ বলিতে হইবেক।

২। এতদ্দেশে অতি অল্প বয়সে বিবাহ হইয়া থাকে। তৎকালে পুত্র অথবা পুত্রবধূ কেহই আশ্রমরক্ষার নিয়ম শিক্ষা করিতে পারেন না। তজ্জন্য কিছুকাল গুরুজনের আশ্রমে থাকা প্রয়োজন। আবার, পক্ষান্তরে দেখা যাইতেছে, বিবাহের অব্যবহিত পরে পৃথক হইবার নিয়ম প্রচলিত হইলে, বাল্যবিবাহ এবং তজ্জনিত ক্ষতি, সমস্তই যুগপৎ নিবারিত হইতে পারে।

৩। পৃথগন্ন হইলে সম্পত্তিবিভাগের প্রয়োজন হয়, এবং তৎকারণে ব্যয়বাহুল্য হইয়া উঠে। একান্নে থাকিলে তাহা উপস্থিত হয় না। বস্তুতঃ ইহাই পৃথগন্ন হইবার মূলীভূত প্রতিবন্ধক। এতদ্দেশীয় লোকের প্রধান সম্পত্তি ভূমি। কৃষকদিগের পক্ষে ভূমিবিভাগে বিশেষ ক্ষতি নাই, কিন্তু যাঁহারা তাহাদিগের করগ্রহণপূর্বক ভূমি অধিকার করেন, তাঁহাদিগের বিষয়বিভাগের পর করসংগ্রহের জন্য পৃথক বন্দোবস্ত করিতে হয়, তাহাতে কাজে কাজেই অধিক খরচ পড়ে। ভূমির পরিবর্তে কেবল ভূমিস্বত্ববিভাগ করিলে ভূমি কিংবা প্রজার উপরে মালিকের তাদৃশ ক্ষমতা থাকে না। কোন কার্যে একজন শরিক বক্র হইলেই অন্য সকলকে তাহা হইতে বিরত হইতে হয়। ওদিকে ভূমি-বিভাগ করিলে সে অসুবিধা দূরীকৃত হইতে পারে বটে, কিন্তু একবার বিরোধ উপস্থিত হইলে তাহার পরে ভূমিবিভাগ করা একপ্রকার অসাধ্য বলিয়া গণ্য। কারণ, বর্তমান এবং ভবিষ্যৎ কালের সকল প্রকার ক্ষতিবৃদ্ধির বিচার করিলে ভূমিবিভাগ কখনই সর্বাঙ্গসুন্দর হইতে পারে না। তদ্ভিন্ন এতদ্দেশের ভূমি "বেঁধা ফোঁড়া" (পিতলগোলা) বলিয়া এই সঙ্কট শতগুণে বর্ধিত হইয়াছে। এই জন্য ভূমিসম্পত্তিবিশিষ্ট লোকেরা নিতান্ত অসহ্য না হইলে একান্নে থাকিবার ক্লেশ মোচনের চেষ্টা করেন না।

ভদ্রাসনবিভাগের নিয়ম আরো ভয়ানক। কত সময়ে ভ্রাতৃগণ পৃথক কুঠরী গ্রহণ করিতে অসম্মত হইয়া এক-একটি কুঠরীকে দ্বিভাগ করতঃ উভয়াংশই অব্যবহার্য করিয়া ফেলেন। বিবাদের এতই দৌড় যে, কেহ কেহ বিভাগের সময়ে পুষ্করিণীর মধ্যস্থলে বাঁধ দিয়া থাকেন।

ইংরাজদিগের মধ্যে জ্যেষ্ঠ পুত্র একাকী সমস্ত স্থাবর সম্পত্তি অধিকার

করেন। সুতরাং এরূপ কোন গোলযোগই নাই। কিন্তু অভিনব সমাজশাস্ত্রবেত্তাদিগের মতানুসারে এই নিয়ম দূষণীয়। অন্যান্য দেশে বিভাগবিষয়ে শরিকদিগের মধ্যে মতভেদ হইলে ভূমিবিক্রয়পূর্বক মূল্য ভাগ করিয়া লয়। এতদ্দেশে এই প্রণালীতে ন্যায্য মূল্য পাওয়া যায় না, এবং অস্থায়ী বলিয়া, ভূমির পরিবর্তে, অর্থগ্রহ করিতে সকলেই আপত্তি করেন।

৪। একান্নবর্তী পরিবারের কলহের বিষয় বাঙ্গালিমাত্রেই অবগত আছেন। তদ্বিষয়ে আমাদিগের এইমাত্র বক্তব্য যে, তাহা অনিবার্য। কলহ হইবেক না, এরূপ প্রত্যাশা লুব্ধ আশ্বাসমাত্র। সুতরাং প্রথম হইতেই তাহার উপায় করা যুক্তিসিদ্ধ।

কোন কোন পরিবারের পৃথক হইবার প্রতি এতই আপত্তি আছে যে, সম্পত্তি-অধিকারী মোকদ্দমা ব্যতীত শরিককে ভাগ দিতে চাহেন না। এরূপ স্থলে শরিকের অংশ অপহরণ করাই অনেকের মানস থাকে। কিন্তু তাদৃশ অসৎ অভিসন্ধি না থাকিলেও কেহ কেহ মনে করেন যে, অন্যায়কারী ব্যক্তি মোকদ্দমার ক্লেশ জানিতে পারিলে, তাহা হইতে নিবৃত্ত থাকিয়া একান্নে থাকিতে সম্মত হইবেন, এবং উভয়েই লোকাপবাদ হইতে অব্যাহতি পাইব। কিন্তু তাঁহারা বুঝিতে পারেন না যে, আন্তরিক মনোবাদ জন্মিলে লোকের লাভালাভের প্রতি দৃষ্টি থাকে না। পৃথক হইবার যত প্রতিবন্ধক উপস্থিত হয়, পরিণামে সমস্তই অকর্মণ্য হইয়া যায়। কেবল উভয় পক্ষের অর্থনাশ, মানহানি, মনের গ্লানি এবং লোকাপবাদের সীমা থাকে না।

পরিবারের মধ্যে একজন অন্য শরিকের অর্থাপহরণ করিলে, তাহাদিগকে কোনপ্রকারে উৎপীড়ন করিলে, অথবা অপব্যয়ী হইলে, সংসার সহজেই ভাঙ্গিয়া যায়। অতি বড় ধনী পরিবারেও অপব্যয়ী ব্যক্তির ব্যয়সংকুলান হওয়া দুঃসাধ্য। সুতরাং, এরূপ স্থলে যাঁহারা আত্মরক্ষা এবং স্ত্রীপুত্রের মঙ্গলার্থ ভ্রাতৃত্যাগ করেন তাঁহাদিগের নিন্দা করা অন্যায়।

মধ্যবর্তী পরিবারে অর্থের অসচ্ছলতা-নিবন্ধন নানাপ্রকারে পরস্পরের মধ্যে বিরোধ উৎপন্ন হয়। স্বার্থসাধনের জন্যই হউক বা পরিবারের সম্ভ্রমরক্ষার জন্যই হউক, গৃহস্বামী সকল ব্যক্তিকে ন্যায্য অংশ না দিয়া যদি কোনপ্রকারে নিজের আধিক্য রক্ষা করেন, তাহা হইলে সকলেই তাঁহার প্রতি কুপিত হয়েন। মনে কর, কোন পরিবারের একখানি গাড়ি আছে ; না রাখিলে প্রধানতঃ গৃহস্বামীর নিজ প্রয়োজনে ব্যবহৃত হয়। কিন্তু ইহাতেও বিরোধ ঘটে ; কর্তা মনে করেন, আমি সকলের মানরক্ষা করিতেছি ; অধীনেরা মনে করেন, তিনি ন্যায্যাংশের অতিরিক্ত লইতেছেন ; এরূপ ঘটনা কেবল গাড়ির বিষয়ে নহে ;

পোশাক, চাকর প্রভৃতি সমস্ত সম্ভ্রমসূচক ব্যয়ের স্থলেই উপস্থিত হইয়া থাকে।

জ্যেষ্ঠ দেশকাল বিবেচনা না করিয়া জ্ঞানতঃ বা অজ্ঞানতঃ কনিষ্ঠগণের নিকট আপনার কোন প্রাধান্য প্রকাশ করিলেই তাঁহাদিগের মনে ক্রোধ উপস্থিত হয়। আবার যেখানে কনিষ্ঠ কৃতী হইয়া জ্যেষ্ঠের ন্যায় প্রাধান্য প্রাপ্ত হয়েন, সেখানে তাঁহার দ্বারা এরূপ কর্তৃত্বপ্রকাশ নিতান্ত অসহনীয়। কিন্তু অর্থ বা বিদ্যাবুদ্ধির শ্রেষ্ঠতাজন্য যে প্রাধান্য জন্মে, তাহাতে কোন ব্যক্তি সর্বতোভাবে গর্বহীন হইতে পারেন না—এবং মনে যাহা থাকে, তাহা কালসহকারে অতি মূর্খের নিকটেও প্রকাশ হয়। ফলতঃ নিতান্ত দরিদ্র অথবা মহাধনী না হইলে সকল ব্যক্তির মধ্যে সমস্ত বিষয়ের তুল্যতা রক্ষা করা অসম্ভব। গৃহস্বামী সর্বদা সকলের সুখদুঃখের তত্ত্বাবধান, সামান্য বিষয়েও আত্মসংযম—এবং সর্বোপরি বাকসংযম—না করিলে কখনই ভ্রাতৃগণকে একান্নে রাখিতে পারেন না। এতাদৃশ বৈরাগ্য, সংসারী ব্যক্তির মধ্যে নিতান্ত দুর্লভ।

সহোদরগণের সন্তানসন্ততি লইয়া আর-এক বিশৃঙ্খলা উপস্থিত হয়। কোন ব্যক্তির সন্তানসংখ্যা অধিক এবং কাহার অল্প হইলে খরচপত্র বিষয়ে ভ্রাতা এবং সন্তান উভয় শ্রেণীতেই প্রত্যেকের তুল্যতারক্ষা করা অসম্ভাবিত। সুতরাং ইহার অব্যর্থ ফল—পরদ্বেষ, অভিমান এবং যন্ত্রণা প্রভৃতি সহস্র বিপদ—নিবারণ করা অসাধ্য; পরিশেষে নিশ্চয়ই সংসার বিচ্ছিন্ন হইয়া যায়। অন্তঃপুরবাসিনী-দিগের মধ্যে কেহ ভর্তার বিশেষ অনুগ্রহপ্রার্থী হইলে সর্বনাশ হয়। পিতৃদত্ত আনুকূল্যের প্রতি কেহ আপত্তি করিতে পারে না ; কিন্তু যে বধূ পিতার নিকট সর্বদা উপকার প্রাপ্ত হয়েন, তাঁহার স্বাভাবিক গর্ব অপরের পক্ষে অসহ্য হইয়া উঠে।

একান্নবর্তী পরিবারে কনিষ্ঠেরা পদে পদে কেবল জ্যেষ্ঠের দোষই দেখেন, কিন্তু গুণের বিষয় কেহই মনে করেন না। সকলেই পরামর্শ দিতে প্রস্তুত, কিন্তু কি জ্যেষ্ঠ কি কনিষ্ঠ, তাহা গ্রহণ করিতে কেহই ব্যগ্র নহেন। কিন্তু গৃহস্বামীর সহস্র দোষ থাকিলেও স্বীকার করিতে হইবেক যে, তাঁহাকে পরিবারের জন্য সর্বদাই চিন্তা করিতে হয়। কনিষ্ঠেরা কেবল আত্মবিষয়ক চিন্তাতেই নিপুণ, সুতরাং গৃহস্বামী স্বভাবতঃ কনিষ্ঠদিগের নিকট কৃতজ্ঞতা প্রত্যাশা করেন। পরন্তু মনুষ্য প্রাত্যহিক উপকারের জন্য কৃতজ্ঞতাপ্রতিপালনে নিতান্ত অপটু। অতএব, গৃহস্বামীর সেই প্রত্যাশা অসম্পূর্ণ থাকাতে প্রথমতঃ অসন্তোষ, পরে তাচ্ছল্য, এবং পক্ষান্তরে অভিমান, পরিণামে বিরোধ অবশ্যই ঘটিবেক। এইপ্রকার ঘটনা দুই-একটিতে কিছুই হয়

না ; পুনঃ পুনঃ হইতে থাকিলে কেহ তাহার প্রতি লক্ষ্য না করিলেও মনের মালিন্য ক্রমশঃ সঞ্চিত হইতে থাকে।

জ্যেষ্ঠ-কনিষ্ঠ্যমধ্যে এইরূপ ; আবার কনিষ্ঠপরম্পরার মধ্যে বিরোধ আরো সহজে উৎপন্ন হয়। সামান্য বিষয়ে তাহা প্রকাশ পায় না, কিন্তু প্রকাশ পাইলে তাহা নিবারণ করা দুঃসাধ্য। গৃহস্বামী তজ্জন্য কর্তৃত্বপ্রকাশ করিলে কনিষ্ঠদিগের আক্রোশে পতিত হয়েন। তাচ্ছল্য করিলে বিরোধী ব্যক্তিগণের উভয় পক্ষই ক্ষুণ্ণ হয়েন, এবং মীমাংসার চেষ্টা করিলে, উভয়েই পক্ষপাতের দোষ দেন। একান্নবর্তী পরিবারের মহদ্দোষ এই যে, কনিষ্ঠেরা কখনই সহিষ্ণুতা অভ্যাস করিতে পারেন না।

পুরুষদিগের তুলনায় অন্তঃপুরবাসিনীগণের বিরোধ চতুর্গুণ ভয়ঙ্কর। বধূগণ সকলেই শ্বশ্রু অথবা জ্যেষ্ঠ যাতাকে ভয় করেন ; তাঁহার ছিদ্রানুসন্ধানে নিবিষ্ট থাকেন : তৎকৃত উপকার ভুলিয়া যান ; তাঁহার নিকট মনের কথা গোপন করেন এবং পরস্পরের প্রতি অসন্তোষ সঞ্চয় করিতে থাকেন। অন্দরে থাকেন বলিয়া লোকলজ্জা অল্প হয়, এবং শারীরিক ও মানসিক দৌর্বল্যবশতঃ কথার কোন আটক থাকে না। অধিকন্তু, বধূগণের মধ্যে কেহ সম্পর্কে ছোট কিন্তু বয়সে বড় অথবা তদ্বিপরীত ঘটনা উপস্থিত হইলে বিরোধের আর-একটি সূত্র বৃদ্ধি হয়। বয়ঃকনিষ্ঠের সম্মান পাওয়া দুষ্কর, কিন্তু তিনি আপন পদের প্রাধান্য ভুলিতে পারেন না। বিশেষতঃ স্বামীর নিকট বিশেষ আদর পাইলে (দ্বিতীয় সংসার স্থলে ইহা সর্বদাই ঘটে) তখন আর তাঁহার বুদ্ধি স্থির থাকা অসম্ভব হইয়া উঠে। তিনি ভর্তার উপর কর্ত্রী, অতএব এই স্পর্ধা প্রদর্শন করিবার জন্য বয়সে-জ্যেষ্ঠ-সম্পর্কে-কনিষ্ঠ বধূগণ ভিন্ন আর উৎকৃষ্ট স্থান কোথায় পাইবেন ?

পৃথিবীতে যত বিরোধ উপস্থিত হয়, সূত্রপাতকালীন বিবদমানদিগের মধ্যে প্রায় কেহই তাহা জানিতে পারেন না। কিন্তু পুরুষেরা লোকচরিত্রবিষয়ে স্ত্রী-জাতি অপেক্ষা অভিজ্ঞ, এইজন্য অবিলম্বে বিরোধের লক্ষণ ও পরিণাম বুঝিতে পারিয়া অনেক কৌশলের দ্বারা তাহা হইতে নিষ্কৃতি পান। স্ত্রীজাতি চিরকাল অন্তঃপুরে বাস করাতে সেরূপ কৌশলও শিক্ষা করেন নাই, এবং পুরুষের ন্যায় হঠাৎ বিপদও টের পান না। অনন্তর গৃহত্যাগ, রোদন, কপালে আঘাত, স্বামীর নিকট নালিশ ইত্যাদি গৃহবিচ্ছেদের সমস্ত উপকরণ আসিয়া উপস্থিত হয়। মনে কর, একটি বধূ অনবধানতাবশতঃ কোন কার্যের দ্বারা আর-একজনের কিঞ্চিৎ ক্লেশ জন্মাইলেন। ইনি ইহার হেতু অনুসন্ধানে কালহরণ বা বাক্যব্যয় না করিয়া প্রথমার দুরভিসন্ধি অনুমান করিয়া লইলেন। এবং

প্রতিফল না দিলে আধিক্য বা তুল্যতা রক্ষা হয় না ; অতএব সুযোগ বুঝিয়া একটি জ্ঞানকৃত অন্যায় করিলেন। প্রথমাও দ্বিতীয়ার অনুরূপ, বিশেষতঃ স্পষ্ট অন্যায় দেখিয়া কি প্রকারে ক্ষান্ত থাকেন ; অতএব একটি শ্রেষ্ঠতর অন্যায় করিলেন। একবার কল চালিলে আর থামান কাহার সাধ্য ? ওদিগে ইঁহাদিগের প্রভুগণ প্রত্যহ রাত্রিতে বিচারকার্যে নিযুক্ত হইতেছেন। ভ্রাতাদিগের মধ্যে স্ত্রীসম্বন্ধীয় আলাপ নিষিদ্ধ, সুতরাং অনেক স্থলে 'একতরফা' বিচারেই একান্নবর্তী পরিবার নিঃশেষিত হয়। যদি ভ্রাতৃগণ "ওয়াইফের" বিষয়ে আলাপ করেন, তবে কথা চালাচালিতে আর কিছুদিন অতিবাহিত হয়। মীমাংসার জন্য চারিজনের সাক্ষাৎ হওয়া নিতান্ত অভব্যতার লক্ষণ। অতএব পরিশেষে মূল কথা অন্তরীক্ষে থাকিয়া কাল্পনিক কথার প্রসঙ্গে সংসার ভাঙ্গিয়া যায়।

এইসকল কারণে আমরা বিবেচনা করি যে, মনে মনে বিচ্ছেদ হইবার পূর্বেই অন্ন পৃথক করা ভাল।

একান্নবর্তী পরিবারের অন্যান্য দোষের মধ্যে পরভোগ্যোপজীবিতা অতি প্রধান। যাঁহারা পৈতৃক সম্পত্তি প্রাপ্ত হয়েন, তাঁহারা স্বভাবতঃ পরভোগ্যোপ-জীবী, সুতরাং একান্ন পৃথগন্ন উভয় অবস্থাতেই সমান। কিন্তু যাঁহারা স্বয়ং উপার্জন করেন, তাঁহারা সকলেই কখন তুল্যরূপ উপায়ী হইতে পারেন না। অথবা স্বাধীন হইবার ক্ষমতা জন্মিলে সামান্য কষ্টও অসহ্য বোধ হয়, সুতরাং অল্পকালমধ্যেই পৃথগন্ন হয়েন। আর যাঁহারা একান্নে থাকেন, তাঁহাদিগের অধিকাংশই উপার্জনে অক্ষম অথবা প্রধান ভ্রাতার তুল্য না হইতে পারিলে, অভিমানবশতঃ তাঁহার অন্ন ধ্বংস করাই শ্রেয় মনে করেন। কিন্তু ইঁহাদিগের ন্যায় অকর্মণ্য পুরুষ পৃথিবীতে আর নাই। অথচ উপার্জনকারী আশ্রয় না দিলে তাঁহাদিগের যে দিনপাতের ব্যাঘাত হয়, এমত নহে ; বরং কেহ কেহ অর্থসঞ্চয়ও করিতে পারেন। পরিবারগণের মধ্যে উপার্জনের ন্যূনাতিরেক থাকিলে, একজনের গর্ব, অন্যের অভিমান, কাহারো ঈর্ষা, এবং কখন কখন কোন ব্যক্তির দ্বারা ভ্রাতৃধনাপহরণ পর্যন্তও ঘটনা হয়।

অনন্তর এই বিপত্তি নিবারণজন্য আমরা যে উপায় অবলম্বন করা কর্তব্য মনে করিয়াছি, তাহা প্রকাশ করা যাইতেছে। এতদ্বিষয়ে সর্বসাধারণের পরামর্শ অত্যাবশ্যক।

উপায়। গৃহস্বামী পুত্রকে উপার্জনে সক্ষম দেখিলে তাহার বিবাহ দিবেন এবং পুত্রবধূকে সংসারকার্য শিখাইবার জন্য কিছুদিন তাঁহার শ্বশ্রূর অধীনে রাখিবেন, অনন্তর সঙ্গতি অনুসারে তাঁহাদিগের জন্য পৃথক আবাস নির্দিষ্ট

করিয়া দিবেন। নতুবা, বিবাহের ব্যয় সংক্ষেপ করিয়া কিঞ্চিৎ অর্থ দান করিবেন। এইরূপ একজনের বাসস্থান পৃথক না করিয়া অন্য পুত্রের বিবাহ দিবেন না। যাঁহারা উপার্জনে অক্ষম, তাঁহাদিগের বিবাহ না দিয়া, কোন নির্দিষ্ট বয়সে কিঞ্চিৎ অর্থদানান্তে তাঁহাদিগকে পৃথক করিবেন। পরিণামে কনিষ্ঠ পুত্র পিতৃআবাস অধিকার করিরা মাতা, বিমাতা ও বৃদ্ধ পিতার প্রতি-পালন করিবেন। পিতার অবর্তমানে মাতা এবং তদভাবে ভ্রাতা কি অন্য অভিভাবক এই নিয়মে পিতৃকার্য সম্পাদন করিবেন। ভূমিসম্পত্তি যদি পিতা বিভাগ করিয়া দেন, তবেই সর্বাঙ্গসুন্দর হইতে পারে। তাঁহার অকস্মাৎ মৃত্যু হইলে ভ্রাতৃগণ স্বয়ং বিভাগের উপায় করিবেন। কিন্তু কোন ব্যক্তি কিঞ্চিৎমাত্র আপত্তি প্রকাশ করিলেই শালিশ নিযুক্ত করা কর্তব্য। অন্ততঃ অগত্যা আদালতের সাহায্য লইতে হইবেক। কিন্তু দুটি নিয়ম অভিন্নরূপে প্রতিপালন করা কর্তব্য। যথা,—

১। বিরোধ হইবার অগ্রে অন্ন পৃথক করা বিধেয়।

২। পৃথগন্ন হইয়া এত দূরবর্তী স্থানে আবাস নির্দিষ্ট করা উচিত যে, ইচ্ছার বহির্ভূত সাক্ষাৎ না ঘটে। সর্বদা একত্র থাকিলে বিরোধ নিবারণ করা অসাধ্য, অতএব যাহাতে ইচ্ছা করিলে অনায়াসে বিনা সাক্ষাতে কাল-যাপন করা যায়, এরূপ বন্দোবস্ত করা আবশ্যক।

আশ্বিন ১২৭৯

বহুবিবাহ

প্রায় দুই বৎসর হইল, পণ্ডিতবর শ্রীযুক্ত ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর বহুবিবাহের অশাস্ত্রীয়তা সম্বন্ধে একখানি পুস্তক প্রচার করেন। তদুত্তরে শ্রীযুক্ত তারানাথ তর্কবাচস্পতি, এবং অন্যান্য কয়জন পণ্ডিত যদৃচ্ছাপ্রবৃত্ত বহুবিবাহের শাস্ত্রীয়তা প্রমাণ করিতে যত্ন পাইয়াছিলেন। প্রত্যুত্তরে বিদ্যাসাগর মহাশয় দ্বিতীয় পুস্তক প্রচার করিয়াছেন। ইহার বিচার্য বিষয় এই যে, যদৃচ্ছাক্রমে বহুবিবাহ হিন্দু-শাস্ত্রসম্মত কি না ? আমরা প্রথমেই বলিতে বাধ্য হইলাম যে আমরা ধর্মশাস্ত্রে সম্পূর্ণ অজ্ঞ ; সুতরাং এ বিচারে বিদ্যাসাগর মহাশয় প্রতিবাদীদিগের মত খণ্ডন করিয়া জয়ী হইয়াছেন কিনা, তাহা আমরা জানি না। এবং সে বিষয়ে কোন অভিপ্রায় ব্যক্ত করিতে অক্ষম। তবে এ বিষয়ে অশাস্ত্রজ্ঞ ব্যক্তিরও কিছু বক্তব্য থাকিতে পারে। আমাদিগের যাহা বক্তব্য তাহা অতি সংক্ষেপে বলিব।

বহুবিবাহ যে সমাজের অনিষ্টকারক, সকলের বর্জনীয়, এবং স্বাভাবিক নীতিবিরুদ্ধ, তাহা বোধহয় এদেশের জনসাধারণের হৃদয়ঙ্গম হইয়াছে। সুশিক্ষিত বা অল্পশিক্ষিত, এদেশে এমত লোক বোধহয় অল্পই আছে, যে বলিবে, "বহুবিবাহ অতি সুপ্রথা, ইহা ত্যাজ্য নহে।" যাঁহারা বিদ্যাসাগর

বহুবিবাহ রহিত হওয়া উচিত কি না এতদ্বিষয়ক বিচার। দ্বিতীয় পুস্তক। ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর প্রণীত। শ্রীপীতাম্বর বন্দ্যোপাধ্যায় দ্বারা সংস্কৃত যন্ত্রে মুদ্রিত।

বঙ্গদর্শনের আষাঢ় ১২৮০ সংখ্যায় বঙ্কিমচন্দ্রের এই সমালোচনাটি প্রথম প্রকাশিত হয়—বিদ্যাসাগর মহাশয় তখন জীবিত। পরে, ১৮৯২ বঙ্গাব্দে রচনাটি অনেকাংশে বর্জিত হয়ে 'বিবিধ প্রবন্ধ—২য় ভাগ'-এর অন্তর্ভুক্ত হয়। পুস্তকাকারে পুনঃপ্রকাশের সময়ে বঙ্কিমচন্দ্র যে টীকাটি লেখেন সেটি এই—

[স্বর্গীয় ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর মহাশয়ের দ্বারা প্রবর্তিত বহুবিবাহবিষয়ক আন্দোলনের সময়ে বঙ্গদর্শনে এই প্রবন্ধ প্রকাশিত হয়। বিদ্যাসাগর মহাশয় প্রণীত বহুবিবাহ সম্বন্ধীয় দ্বিতীয় পুস্তকের কিছু তীব্র সমালোচনায় আমি কর্তব্যানুবোধে বাধ্য হইয়াছিলাম। তাহাতে তিনি কিছু বিরক্তও হইয়াছিলেন। তাই আমি এ প্রবন্ধ আর পুনর্মুদ্রিত করি নাই। এই আন্দোলন ভ্রান্তিজনিত, ইহাই প্রতিপন্ন করা আমার উদ্দেশ্য ছিল, সে উদ্দেশ্য সফল হইয়াছিল। অতএব বিদ্যাসাগর মহাশয়ের জীবদ্দশায় ইহা পুনর্মুদ্রিত করিয়া দ্বিতীয় বার তাঁহার বিরক্তি উৎপাদন করিতে আমি ইচ্ছা করি' নাই। এক্ষণে তিনি অনুরক্তি-বিরক্তির অতীত। তথাপি দেশস্থ সকল লোকেই তাঁহাকে শ্রদ্ধা করে, এবং আমিও তাঁহাকে আন্তরিক শ্রদ্ধা করি, এজন্য ইহা এক্ষণে পুনর্মুদ্রিত করার ঔচিত্য বিষয়ে অনেক বিচার করিয়াছি। বিচার করিয়া যে অংশে সেই তীব্র সমালোচনা ছিল, তাহা উঠাইয়া দিয়াছি। কোন না কোন দিন কথাটা উঠিবে, দোষ তাঁহার, না আমার। সুবিচার জন্য প্রবন্ধটির প্রথমাংশ পুনর্মুদ্রিত করিলাম। ইচ্ছা ছিল যে, এ সময়ে উহা পুনর্মুদ্রিত করিব না, কিন্তু তাহা না করিলে আমার জীবদ্দশায় উহা আর পুনর্মুদ্রিত হইবে কি না সন্দেহ। উহা বিলুপ্ত করাও অবৈধ ; কেন না, ভাল হউক, মন্দ হউক, উহা আমাদের দেশে আধুনিক সমাজসংস্কারের ইতিহাসের অংশ হইয়া পড়িয়াছে—উহার দ্বারাই বহুবিবাহবিষয়ক আন্দোলন নির্বাপিত হয়, এইরূপ প্রসিদ্ধি। আর এখনও Malabari সম্প্রদায় প্রবল—তাঁহারা না পারেন, এমন কাজ নাই।]

মহাশয়ের পুস্তকের প্রতিবাদ করিয়াছেন, বোধহয় তাঁহাদেরও এইমাত্র উদ্দেশ্য যে, তাঁহারা আপন আপন জ্ঞানমত বহুবিবাহের শাস্ত্রীয়তা প্রতিপন্ন করেন। তাঁহাদের প্রণীত গ্রন্থ আমরা সবিশেষ পড়ি নাই, কিন্তু বোধহয়, তাঁহারা কেহই বলেন না যে বহুবিবাহ সুপ্রথা, ইহা তোমরা ত্যাগ করিও না। যদি কেহ এমত কথা বলিয়া থাকেন, তবে ইহা বলা যাইতে পারে যে, তাঁহার মতো কুসংস্কারবিশিষ্ট লোক এক্ষণে অতি অল্প। যাঁহারা স্বয়ং বহুবিবাহ করিয়া থাকেন, তাঁহাদিগেরই মুখে বহুবিবাহপ্রথার ভূয়সী নিন্দা এবং কৌলীন্যের উপর ধিক্কার আমরা শতবার শুনিয়াছি। তবে যে তাঁহারা কেন এত বিবাহ করেন, সে স্বতন্ত্র কথা। এমত চোর কেহই নাই যে জিজ্ঞাসা করিলে চুরিকে অসৎকর্ম বলিয়া স্বীকার করিবে না—কিন্তু অসৎকর্ম বলিয়া স্বীকার করিয়াও সে আবার চুরি করে। কুলীনেরাও বহুবিবাহ করেন। কিন্তু সে যাহাই হউক, বহুবিবাহ যে কুপ্রথা, তদ্‌বিষয়ে বাঙ্গালীর মতৈক্য সম্বন্ধে আমাদের কোন সংশয় নাই!

এই ঐকমত্য যে বিদ্যাসাগর মহাশয়ের কৃত বহুবিবাহবিষয়ক প্রথম পুস্তক প্রচারের পর হইয়াছে, এমত নহে। অনেক দিন হইতেই ইহা সংস্থাপিত হইয়া আসিতেছে। ইহা দেশের মধ্যে সুশিক্ষা প্রচার, বা ইউরোপীয় নীতির প্রচার, বা সাধারণ উন্নতির ফল। তথাপি তাঁহার প্রথম পুস্তকের জন্য আমরা বিদ্যাসাগর মহাশয়ের নিকট কৃতজ্ঞ। যাহা কিছু সদভিপ্রায়ে অনুষ্ঠিত তাহা সার্থক হউক বা নিরর্থক হউক, প্রয়োজনবিশিষ্ট হউক বা নিষ্প্রয়োজনীয় হউক, তাহাই প্রশংশনীয় এবং কৃতজ্ঞতার স্থল। বিশেষ, বহুবিবাহ সম্বন্ধে লোকের মত যাহাই হউক, বহুবিবাহপ্রথা দেশ হইতে একেবারে উচ্ছিন্ন হয় নাই। তবে বহুবিবাহ এদেশে যতদূর প্রবল বলিয়া, বিদ্যাসাগর প্রতিপন্ন করিবার চেষ্টা করিয়াছেন, বাস্তবিক ততটা প্রবল নহে। আমাদিগের স্মরণ হয় হুগলী জেলায় যতগুলিন বহুবিবাহপরায়ণ ব্রাহ্মণ আছেন, বিদ্যাসাগর প্রথম পুস্তকে তাহাদিগের তালিকা দিয়াছেন। অনেকের মুখে শুনিয়াছি যে তালিকাটি প্রমাদশূন্য নহে। কেহ কেহ বলেন যে মৃতব্যক্তির নামসন্নিবেশের দ্বারা তালিকাটি স্ফীত হইয়াছে। আমরা স্বয়ং যে দুই-একটির কথা সবিশেষ জানি, তাহা তালিকার সঙ্গে মিলে নাই। যাহা হউক, বিদ্যাসাগর মহাশয়ের খ্যাতির অনুরোধে আমরা সেই তালিকাটি যথার্থ বলিয়া গ্রহণ করিলাম। তাহা করিলেও, হুগলী জেলার সমুদায় লোকের মধ্যে কয় জন বহুবিবাহপরায়ণ পাওয়া যায়? এই বাঙ্গালায় এক কোটি আশী লক্ষ হিন্দু বাস করে; ইহার মধ্যে আঠার শত জন ব্যক্তিও যে অধিবেদনপরায়ণ নহে, ইহা নিশ্চিত বলা যাইতে পারে। অর্থাৎ দশ

সহস্র হিন্দুর মধ্যে একজনও অধিবেদনপরায়ণ কিনা সন্দেহ। এই অল্প-সংখ্যকদিগের সংখ্যাও যে দিন দিন কমিতেছে, স্বতঃই কমিতেছে, তাহাও সকলে জানেন। কাহারও কোন উদ্যোগ করিতে হইতেছে না—কোন রাজ-ব্যবস্থার আবশ্যক হইতেছে না—কোন পণ্ডিতের ব্যবস্থার আবশ্যক হইতেছে না, আপনা হইতেই কমিতেছে। ইহা দেখিয়া অনেকেই ভরসা করেন যে, এই কুপ্রথার যাহা কিছু অবশিষ্ট আছে, তাহা আপনা হইতেই কমিবে। এমত অবস্থায়, বহুবিবাহরূপ রাক্ষসবধের জন্য বিদ্যাসাগর মহাশয়ের ন্যায় মহারথীকে ধৃতাস্ত্র দেখিয়া, অনেকেরই ডনকুইক্সোটকে মনে পড়িবে।

কিন্তু সে রাক্ষস বধ্য, তাহাতে সন্দেহ নাই। মুমূর্ষু হইলেও বধ্য। আমরা দেখিয়াছি, এক-এক জন বীরপুরুষ, মৃত সর্প বা মৃত কুক্কুর দেখিলেই, তাহার উপর দুই-এক ঘা লাঠি মারিয়া যান ; কি জানি যদি ভাল করিয়া না মরিয়া থাকে। আমাদিগের বিবেচনায় ইঁহারা বড়ো সাবধান এবং পরোপ-কারী। যিনি এই মুমূর্ষু রাক্ষসের মৃত্যুকালে দুই-এক ঘা লাঠি মারিয়া যাইতে পারিবেন, তিনি ইহলোকে পূজ্য এবং পরলোকে সদ্গতিপ্রাপ্ত হইবেন সন্দেহ নাই।

কিন্তু একটা কথায় একটু গোলযোগ বোধ হয়। আমরা স্বীকার করিলাম, বহুবিবাহ এদেশে বড় চলিত—আপামর সাধারণ সকলেই বহুপত্নীক। জিজ্ঞাস্য এই, এ প্রথা কি প্রকারে নিবারিত হওয়া সম্ভব? বিদ্যাসাগর মহাশয় যে সকল উপায় অবলম্বন করিতে ইচ্ছুক, বহুবিবাহের অশাস্ত্রীয়তা প্রমাণ করা তাহার একটি প্রধান। বাস্তবিক এই প্রথা শাস্ত্রবিরুদ্ধ কিনা তাহা আমরা বলিতে পারি না, কেন না, পূর্বজন্মার্জিত পুণ্যবলে ধর্মশাস্ত্র সম্বন্ধে আমরা ঘোরতর মূর্খ। দেখা যাইতেছে যে এ বিষয়ে মতভেদ আছে। তবে বিদ্যাসাগর মহাশয়ের উদ্যম, পুস্তকের আকার, এবং স্মৃতিশাস্ত্রোদ্ধৃত বচনের আড়ম্বর দেখিয়া, আমরা তাঁহার পক্ষ অবলম্বন করিতে প্রস্তুত আছি। মনে করুন, দেশশুদ্ধ লোক সকলেই স্বীকার করিল যে বহুবিবাহ প্রাচীনহিন্দুশাস্ত্র-বিরুদ্ধ। তাহাতে কি বহুবিবাহপ্রথা নিবারিত হইবে? আমরা সে বিষয়ে বিশেষ সংশয়াবিষ্ট। বঙ্গীয় হিন্দুসমাজে যে সকল সামাজিক প্রথা প্রচলিত আছে তাহা সকলই শাস্ত্রসম্মত বলিয়া প্রচলিত, এমত নহে। সে সমাজ-মধ্যে ধর্মশাস্ত্রাপেক্ষা লোকাচার প্রবল। যাহা লোকাচারসম্মত তাহা শাস্ত্র-বিরুদ্ধ হইলেও প্রচলিত ; যাহা লোকাচারবিরুদ্ধ তাহা শাস্ত্রসম্মত হইলে প্রচলিত হইবে না। বিদ্যাসাগর মহাশয় পূর্বে একবার বিধবাবিবাহের শাস্ত্রীয়তা প্রমাণ করিয়াছেন ; প্রমাণ সম্বন্ধে কৃতকার্যও হইয়াছেন ; অনেকেই তাঁহার

মতাবলম্বী; কিন্তু কয়জন, স্বেচ্ছাপূর্বক, বিধবাবিবাহের শাস্ত্রীয়তা বা অনুষ্ঠেয়তা অনুভূত করিয়া আপন পরিবারস্থা বিধবাদিগের পুনরায় বিবাহ দিয়াছেন ? কোন একজন বিশেষ শাস্ত্রজ্ঞ, শাস্ত্রীয় অনুষ্ঠানে প্রবৃত্ত ব্রাহ্মণ লইয়া বসুন। এবং তৎসঙ্গে মন্বাদি স্মৃতিশাস্ত্রবিষয়ক গ্রন্থ লইয়া এক-একটি বচন ধরিয়া তাঁহার আচারব্যবহারের সহিত মিলাইয়া লউন। কয়টি বচনের সঙ্গে তাঁহার কৃতানুষ্ঠান মিলিবে ? শাস্ত্রজ্ঞ মাত্রেই বলিবেন, অতি অল্প। যদি শাস্ত্রজ্ঞ, শাস্ত্রীয় অনুষ্ঠানে প্রবৃত্ত ব্রাহ্মণদিগের এই দশা, তবে আপামর সাধারণের কথার আর কাজ কি ? বাস্তবিক, মানবাদি ধর্মশাস্ত্রোক্ত বিধিসকলের সম্পূর্ণ চলন, কোন সমাজমধ্যে সম্ভব নহে। কস্মিন্ কালে, কোন সমাজে ঐ সকল বিধি সম্পূর্ণরূপে প্রচলিত ছিল কিনা সন্দেহ। সকল বিধিগুলি চলিবার নহে। অনেকগুলি অসাধ্য। অনেকগুলি, সাধ্য হইলেও মনুষ্যের এতদূর ক্লেশকর, যে তাহা স্বতই পরিত্যক্ত হয়। অনেকগুলি পরস্পরবিরোধী। এই বিধিগুলি সম্যক্ প্রচলিত রাখা, যদি কোন সমাজের অদৃষ্টে কখন ঘটিয়া থাকে, বা কখন ঘটে, তবে সে সমাজের অদৃষ্ট বড় মন্দ সন্দেহ নাই। অনেকেরই বিশ্বাস আছে, প্রাচীন ভারতে এই ধর্মশাস্ত্র সম্পূর্ণরূপে প্রচলিত ছিল, কেবল এখনই কালমাহাত্ম্যে লুপ্ত হইতেছে। যাঁহারা এরূপ বিবেচনা করেন তাঁহাদের সহিত আমরা বিচারে প্রবৃত্ত হইব না। কিন্তু ইহা স্বীকার করি যে পূর্বকালে ভারতবর্ষে এইসকল বিধি কতকদূর প্রচলিত ছিল, এখনও কতকদূর প্রচলিত আছে। প্রচলিত ছিল, এবং প্রচলিত আছে, বলিয়াই ভারতবর্ষের এ অধোগতি। যাঁহারা ধর্মশাস্ত্রব্যবসায়ী, তাঁহাদিগকে একথা বলা বৃথা। কিন্তু অনেক হিন্দু আমাদিগের কথার অনুমোদন করিবেন ভরসা আছে। আমরা হিন্দুধর্মবিরোধী নহি ; হিন্দুধর্ম, পরিশুদ্ধ হইয়া, প্রচলিত থাকে, ইহাই আমাদিগের কামনা। তাই বলিয়া, যাহা কিছু ধর্মশাস্ত্র বলিয়া পরিচিত, তাহাই যে হিন্দুধর্মের প্রকৃত অংশ, এবং সমাজের মঙ্গলকারক, একথা আমরা স্বীকার করিতে পারি না।

আমরা বিদ্যাসাগর মহাশয়ের উদ্দেশ্য সম্পূর্ণ বুঝিতে পারিয়াছি কি না বলিতে পারি না। যদৃচ্ছাপ্রবৃত্ত বহুবিবাহ শাস্ত্রনিষিদ্ধ, সেই কারণেই বহুবিবাহ হইতে নিবৃত্ত হইতে বলিলে একটি দোষ ঘটে। বহুবিবাহপরায়ণপক্ষেরা বলিতে পারেন, "যদি আপনি আমাদের শাস্ত্রানুসারে কার্য করিতে বলেন, তবে আমরা সম্মত আছি। কিন্তু যদি শাস্ত্র মানিতে হয়, তবে আপনার ইচ্ছামত, তাহার একটি বিধি গ্রহণ করা, অপরগুলি ত্যাগ করা যাইতে পারে না। আপনি কতকগুলিন বচন উদ্ধৃত করিয়া বলিতেছেন, এই বচনানুসারে তোমরা যদৃচ্ছাক্রমে বহুবিবাহ করিতে পারিবে না। ভাল, আমরা তাহা করিব না। কিন্তু

সেই সেই বিধিতে যে যে অবস্থায় অধিবেদনের অনুমতি আছে, আমরা এই দুই কোটি হিন্দু সকলেই সেই সেই বিধানানুসারে প্রয়োজনমত অধিবেদনে প্রবৃত্ত হইব—কেননা সকলেরই শাস্ত্রানুমত আচরণ করা কর্তব্য। আমরা যত ব্রাহ্মণ আছি—রাঢ়ীয়, বৈদিক, বারেন্দ্র, কান্যকুব্জ প্রভৃতি—সকলেই অগ্রে সবর্ণা বিবাহ করিয়া কামতঃ ক্ষত্রিয়কন্যা, বৈশ্যকন্যা এবং শূদ্রকন্যা বিবাহ করিব। আমাদিগের মধ্যে যখনই কাহারও স্ত্রী স্বামীর সঙ্গে বচসা করিয়া বাপের বাড়ি যাইবে, আমরা তখনই বিবাহের উদ্দেশ্য অসিদ্ধ বলিয়া, ছোট জাতের মেয়ে খুঁজিব। গৃহিণী যখন ঝগড়া করিয়াছেন, তখন রাগের মাথায় সম্মতি দিবেন সন্দেহ নাই। এই দুই কোটি বাঙ্গালীর মধ্যে যাহারই স্ত্রী বন্ধ্যা,* সেই আর-একটি বিবাহ করুক, যাহারই স্ত্রী মৃতপ্রজা, সেই আর-একটি বিবাহ করুক—যে হতভাগিনীকে বিধাতা বর্ষে বর্ষে মনঃপীড়া দিয়া থাকেন; স্বামীও তাহার মর্মান্তিক পীড়ার বিধান করুন, কেননা ইহা শাস্ত্রসম্মত। তদ্ভিন্ন যাহার কন্যা ভিন্ন পুত্র জন্মে নাই, এই দুই কোটি হিন্দুর মধ্যে এমত যত লোক আছে, সকলেই আর এক-এক দারপরিগ্রহ করুন। আমাদিগের এমন ভরসা আছে যে এইসকল কারণে হিন্দুগণ শাস্ত্রানুসারে অধিবেদনে প্রবৃত্ত হইলে, এখন যেখানে একজন কুলীন ব্রাহ্মণ বহুবিবাহপরায়ণ, সেখানে সহস্র সহস্র কুলীন, অকুলীন, ব্রাহ্মণ, শূদ্র, বহু পত্নী লইয়া সুখে স্বচ্ছন্দে শাস্ত্রানুসারে সংসারধর্ম করিতে থাকিবেন।

কিন্তু এখনও শাস্ত্রের মহিমা শেষ হয় নাই। ধর্মশাস্ত্রের প্রধান বিধির উল্লেখ করিতে বাকি আছে।—"সদ্যস্ত্বপ্রিয়বাদিনী!" ভার্যা অপ্রিয়বাদিনী হইলে সদ্যই অধিবেদন করিবে! আমাদিগের বিশেষ অনুরোধ যে, যাঁহার যাঁহার ভার্যা অপ্রিয়বাদিনী, তাঁহারা, হিন্দুশাস্ত্রের গৌরব বর্ধনার্থ, সদ্যই পুনর্বার বিবাহ করুন। স্ত্রীলোক স্বভাবতঃ মুখরা, দ্বিতীয়া ভার্যাও অপ্রিয়বাদিনী হইলে হইতে পারে—তাহা হইলে আবার তৃতীয় বিবাহ করিবেন, তৃতীয়াও যদি অপ্রিয়বাদিনী হয় (বাঙ্গালীর মেয়ের মুখ ভাল নহে) তবে আবার বিবাহ করিবেন—এরূপ "লোকহিতৈষী নিরীহ শাস্ত্রকারদিগের"† অনুকম্পায় আপনারা অনন্ত গৃহিণীশ্রেণীতে পুরী শোভিতা করিতে পারিবেন। এমন বাঙ্গালীই নাই যাহাকে একদিন না একদিন স্ত্রীর কাছে মুখঝামটা খাইতে না হয়। অতএব আমাদিগের ধর্মশাস্ত্রের অনন্ত মহিমার গুণে সকলেই অনন্তসংখ্যক

* বন্ধ্যাষ্টমেঽধিবিদ্যাব্দে দশমে তু মৃতপ্রজা। একাদশে স্ত্রীজননী সদ্যস্ত্বপ্রিয়বাদিনী॥—বহুবিবাহ, দ্বিতীয় পুস্তক, ১৪৩ পৃষ্ঠা।

† বহুবিবাহ, দ্বিতীয় পুস্তক, ২৫২ পৃষ্ঠা।

গৃহিণীগণকর্তৃক পরিবেষ্টিত হইয়া জীবনযাত্রা নির্বাহ করিতে পারিবে। যাঁহারই স্ত্রী, ননন্দার সহিত বচসা করিয়া আসিয়া, স্বামীর উপর তর্জনগর্জন করিবেন, তিনিই তৎক্ষণাৎ অন্য বিবাহ করিতে পারিবেন। যাঁহারই স্ত্রী, যাতার অঙ্গে নূতন অলঙ্কার দেখিয়া আসিয়া, স্বামীকে বলিবেন, "তোমার হাতে পড়িয়া আমার কোন সুখ হইল না", তিনি তৎক্ষণাৎ সেই রাত্রে ঘটক ডাকাইয়া সম্বন্ধ স্থির করিয়া, সদ্যই অন্যদার গ্রহণ করিবেন। যাহার স্ত্রী, স্বামীর মুখে স্বকৃত পাকের নিন্দা শুনিয়া বলিবেন, "কিছুতেই তোমার মন যোগাইতে পারিলাম না, আমার মরণ হয় ত বাঁচি"—তিনি তখনই চেলির কাপড় পরিয়া, সোলার টোপর মাথায় দিয়া, প্রতিবাসীর দ্বারে গিয়া দাঁড়াইয়া বলিবেন, "মহাশয়, কন্যা দান করুন।" এতদিনে বাঙ্গালীর ঘরে জন্মগ্রহণ করা সার্থক হইল,—অমূল্য-ধন স্ত্রীরত্ন পর্যাপ্ত পরিমাণে লাভ করা যাইতে পারিবে। বঙ্গসুন্দরীগণ বোধহয় ধর্মশাস্ত্র প্রচারের এই নবোদ্যম দেখিয়া তত সন্তুষ্ট হইবেন না। কিন্তু তাঁহা-দিগের শাসনের যে একটা সদুপায় হইতে পারিবে, ইহাতে আমরা বড় সুখী। আমাদের এমত ভরসা হইয়াছে যে অনেক ভদ্রলোক নিখুঁত মুক্তা খুঁজিয়া বেড়াইবার দায় হইতে নিষ্কৃতি পাইবেন—কেননা নথনাড়া দিবার দিনকাল গেল। বিধুমুখী ঘোষ, সৌদামিনী মিত্র, কামিনী গাঙ্গুলী প্রভৃতি দেশের শ্রীবৃদ্ধির পতাকাবাহিনীগণ, বোধ হয় পতাকা ফেলিয়া দিয়া, ফিরে বাঙ্গালীর মেয়ে সাজিয়া, স্বামীর শ্রীচরণমাত্র ভরসা মনে করিয়া, বিবিয়ানা চাল খাট করিয়া আনিবেন। কালভুজঙ্গিনী কুলকামিনীগণ এখন হইতে মুখের বিষ হৃদয়ে লুকাইয়া, কেবল কটাক্ষবিষকে সংসারজয়ের একমাত্র সম্বল করিবেন। তাঁহাদিগের মনে থাকে যেন "সদস্ত্বপ্রিয়বাদিনী"—বিদ্যাসাগর মহাশয় প্রণীত বহুবিবাহ নিবারণ বিষয়ক দ্বিতীয় পুস্তকে এ ব্যবস্থা খুঁজিয়া পাইয়াছি। বিদ্যাসাগর মহাশয় বহুবিবাহ নিবারণ জন্য এই পুস্তক লিখিয়াছিলেন, কিন্তু বাঙ্গালীর অদৃষ্ট সুপ্রসন্ন! আমাদিগের পূর্বজন্মার্জিত পুণ্য অনন্ত! সেই পুস্তকোদ্ধৃত ধর্মশাস্ত্রের বলে, বাঙ্গালীমাত্রেই অসংখ্য বিবাহ করিতে পারিবেন। বিদ্যাসাগর মহাশয় যে শাস্ত্রকারদিগকে "লোকহিতৈষী" বলিয়াছেন, তাহা সার্থক বটে।

এরূপ শাস্ত্রের দোহাই দিয়া কি ফল! এ শাস্ত্রানুসারে লোককে কার্য করিতে বলিলে বহুবিবাহ নিবারণ হয়, না বৃদ্ধি হয়?

কিন্তু বোধ হয়, শাস্ত্রাবলম্বনপূর্বক বহুবিবাহ পরিত্যাগ করিতে বলা, বিদ্যাসাগর মহাশয়ের প্রকৃত উদ্দেশ্য নহে। বিদ্যাসাগর মহাশয় এবং তাঁহার সহিত যাঁহারা একমতাবলম্বী, তাঁহাদের মুখ্য উদ্দেশ্য এই যে, বহুবিবাহনিবারণ-জন্য রাজব্যবস্থা প্রচার হউক। দ্বিতীয় পুস্তকে সে কথা কিছুই নাই, কিন্তু

প্রথম পুস্তকে আছে। সেই উদ্দেশ্যে প্রবৃত্তিদায়কস্বরূপ বহুবিবাহের অশাস্ত্রীয়তা প্রমাণ করিবার জন্য যত্ন করিয়াছেন। নচেৎ শাস্ত্রের নামে ভয় পাইয়া হিন্দু বহুবিবাহ বা কোন চিরপ্রচলিত প্রথা হইতে নিবৃত্ত হইবেক, এমত ভরসা বিদ্যাসাগর মহাশয় করিবেন, বোধ হয় না। কিন্তু রাজব্যবস্থার পক্ষে প্রবৃত্তি-দায়ক বলিয়াও এ বিষয়ে ধর্মশাস্ত্রের সাহায্য অবলম্বন করা আমাদিগের উপযুক্ত বোধ হয় না। এবিষয়ে রাজবিধি প্রণীত করিতে গেলে, তাহা কি শাস্ত্রানুমত হওয়া আবশ্যক? না শাস্ত্রবিরুদ্ধ হইলেও ক্ষতি নাই? যদি তাহা শাস্ত্রানু-মত হওয়া আবশ্যক হয়, তবে "সদ্যস্তুপ্রিয়বাদিনী" ক্ষত্র বিট্ শূদ্রকন্যাস্তু * * * বিবাহ্যাক্কচিদেবতু" প্রভৃতি কথাগুলিও বিধিবদ্ধ করিতে হইবে। আর যদি তাহা শাস্ত্রবিরুদ্ধ হইলেও চলে, তবে বহুবিবাহের অশাস্ত্রীয়তা প্রমাণ করিতে প্রয়াস পাওয়া নিষ্প্রয়োজনে পরিশ্রম করা মাত্র।

আর-একটি কথা এই যে, এদেশে অর্ধেক হিন্দু, অর্ধেক মুসলমান। যদি বহুবিবাহনিবারণজন্য আইন হওয়া উচিত হয়, তবে হিন্দু মুসলমান উভয় সম্বন্ধেই সে আইন হওয়া উচিত। হিন্দুর পক্ষে বহুবিবাহ মন্দ, মুসলমানের পক্ষে ভাল, এমত নহে। কিন্তু বহুবিবাহ হিন্দুশাস্ত্রবিরুদ্ধ বলিয়া, মুসলমানের পক্ষেও তাহা কি প্রকারে দণ্ডবিধির দ্বারা নিষিদ্ধ হইবে? রাজব্যবস্থাবিধাতৃগণ কি প্রকারে বলিবেন যে, "বহুবিবাহ হিন্দুশাস্ত্রবিরুদ্ধ, অতএব যে মুসলমান বহুবিবাহ করিবে, তাহাকে সাত বৎসরের জন্য কারারুদ্ধ হইতে হইবে।" যদি তাহা না বলেন তবে অবশ্য বলিতে হইবে যে, "আমরা বড় প্রজাহিতৈষী ব্যবস্থাপক বটে; প্রজার হিতার্থ আমরা বহুবিবাহ কু-প্রথা উঠাইব; কিন্তু আমরা অর্ধেক প্রজাদিগের মাত্র হিত করিব। হিন্দুদিগের শাস্ত্র ভাল, তাঁহা-দিগের ব্যাকরণের গুণে একস্থানে "ক্রমশোবরা" ও "ক্রমশোহবরা" উভয় পাঠ চলিতে পারে, সুতরাং তাহাদিগেরই হিত করিব। আমাদিগের অবশিষ্ট প্রজা তাহাদিগের ভাগ্যদোষে মুসলমান, তাহাদিগের শাস্ত্রপ্রণেতৃগণ সুচতুর নহে; আরবী কায়দা হেলে দোলে না; বিশেষ মুসলমানদের মধ্যে শ্রীযুক্ত ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর মহাশয়ের ন্যায় কেহ পণ্ডিত নাই, অতএব বাকি অর্ধেক প্রজাগণের হিত করিবার আবশ্যক নাই। আমাদিগের ক্ষুদ্র বুদ্ধিতে বোধ হয় যে, ব্যবস্থাপক সমাজ এই দ্বিবিধ উক্তির মধ্যে কোন উক্তিই ন্যায়সঙ্গত বিবেচনা করিবেন না।

অতএব, আমাদিগের সামান্য বিবেচনায়, ধর্মশাস্ত্রের দোহাই দিয়া কোন দিকে কোন ফল নাই। তবে ইহা অবশ্য স্বীকার্য যে, যদি ধর্মশাস্ত্রে বিদ্যাসাগর মহাশয়ের বিশ্বাস ও ভক্তি থাকে, এবং যদি বহুবিবাহ সেই শাস্ত্রবিরুদ্ধ বলিয়া

তাঁহার বিশ্বাস থাকে, তবে তিনি আত্মপক্ষসমর্থনে অধিকারী বটে, এবং তাঁহার পুস্তক, একজন সদনুষ্ঠাতার সদনুষ্ঠানে প্রবৃত্তির প্রমাণস্বরূপ সকলের নিকট আদরণীয়। আর যদি বিদ্যাসাগর মহাশয়ের শাস্ত্রে বিশ্বাস ও ভক্তি না থাকে, তবে সেই শাস্ত্রের দোহাই দেওয়া কপটতা মাত্র। যিনি বলিবেন যে, সদনুষ্ঠানের অনুরোধে এইরূপ কপটতা প্রশংসনীয়, আমরা তাঁহাকে বলিব যে, সদনুষ্ঠানের উদ্দেশেই হউক বা অসদনুষ্ঠানের উদ্দেশেই হউক, যিনি কপটাচার করেন তাঁহাকে কপটাচারী ভিন্ন আর কিছুই বলিব না। আপনার ক্ষুধা নিবারণার্থে যে চুরি করে সেও যেমন চোর, পরকে বিতরণার্থে যে চুরি করে সেও তেমনি চোর। বরং দাতা চোরের অপেক্ষা ক্ষুধাতুর চোর মার্জনীয়, কেননা সে কাতরতা বশতঃ, এবং অলঙ্ঘ্য প্রয়োজনের বশীভূত হইয়া চুরি করিয়াছে। তেমনি যে ব্যক্তি আত্মরক্ষার্থ কপটতা করে, তাহার অপেক্ষা যে নিষ্প্রয়োজনে কপটতা করে সেই অধিকতর নিন্দনীয়। যিনি এই পাপপূর্ণ, মিথ্যাপরায়ণ মনুষ্যজাতিকে এমত শিক্ষা দেন যে, সদনুষ্ঠানের জন্য প্রতারণা এবং কপটাচারও অবলম্বনীয়, তাঁহাকে আমরা মনুষ্যজাতির পরম শত্রু বিবেচনা করি। তিনি কুশিক্ষার পরম গুরু।

আমরা একথা বিদ্যাসাগর সম্বন্ধে বলিতেছি না। আমরা এমত বলিতেছি না যে বিদ্যাসাগর মহাশয় ধর্মশাস্ত্রে স্বয়ং বিশ্বাসবিহীন বা ভক্তিশূন্য। তিনি ধর্মশাস্ত্রের প্রতি গদ্‌গদচিত্ত হইয়া তৎপ্রচারে প্রবৃত্ত হইয়াছেন। আমরা ইহাও বলিতেছি যে, বিদ্যাসাগর মহাশয়ের ন্যায় উদার চরিত্রে কপটাচরণ কখনই স্পর্শ করিতে পারে না—তিনি স্বয়ং ধর্মশাস্ত্রে অবিচলিতভক্তিবিশিষ্ট সন্দেহ নাই। কেবল আমাদিগের কপালদোষে বহুবিবাহ নিবারণের সদুপায় কি, তৎসম্বন্ধে তিনি কিছু ভ্রান্ত। ইহার অধিক আর কিছুই আমাদিগের বলিবার নাই।

এতদিনের পর যদি বিদ্যাসাগর মহাশয়ের কোন বিষয়ে ভ্রান্তি দেখি, তবে কথা কহিতে পারি না। চিরকাল অভ্রান্ত কেহ নহে। কিন্তু কোন কোন বিষয়ে ভ্রান্তির একটু আধিক্য হইয়াছে, বিবেচনা করিতে হয়। এমত হইতে পারে যে, এই ক্ষুদ্রপৃথিবীমধ্যে যে কয়েকজন পণ্ডিত আছেন, তাঁহাদের মধ্যে বিদ্যাসাগর মহাশয়ই সর্বাপেক্ষা ধর্মশাস্ত্রে বিশারদ। কিন্তু সে কথা পরের মুখেই ভাল শুনায়। বিদ্যাসাগর মহাশয় ততক্ষণ বিলম্ব করিতে পারেন নাই। শ্রীযুক্ত তারানাথ তর্কবাচস্পতি, শ্রীযুক্ত রাজকুমার ন্যায়রত্ন, শ্রীযুক্ত ক্ষেত্রপাল স্মৃতিরত্ন, শ্রীযুক্ত সত্যব্রত সামশ্রমী ও শ্রীযুক্ত গঙ্গাধর কবিরাজ কবিরত্ন তাঁহার প্রতিবাদী। বিদ্যাসাগর মহাশয় একে একে পাঁচজনকেই বলিয়াছেন যে তাঁহারা ধর্মশাস্ত্রের অনুশীলন করেন নাই।* গ্রন্থমধ্যে এই কথা স্থানে স্থানে, নানাবিধ-অলঙ্কারবিশিষ্ট হইয়া

* ক্ষেত্রপাল স্মৃতিরত্নকে একটু ক্ষমা করিয়া স্পষ্ট বলেন নাই।

পুনরুক্ত হইয়াছে। প্রতিবাদী পণ্ডিতেরা এ কথার এই অর্থ করিবেন যে বিদ্যাসাগর বলিয়াছেন, "তোমরা কেহ কিছু জান না, ধর্মশাস্ত্রে যাহা কিছু জানি তা আমিই।" আমরা ইহাতে দুঃখিত হইলাম। কেননা আমাদের নিতান্ত বাসনা ছিল যে, আমরা ঐ পণ্ডিতদিগকে বলিব যে, "মহাশয়েরা কোন্ সাহসে বিদ্যাসাগর মহাশয়ের সহিত বিচারে প্রবৃত্ত হইয়াছেন? তিনি ধর্মশাস্ত্রে অভ্রান্ত, আপনারা কিছু জানেন না।" আমাদিগের আক্ষেপ এই যে, বিদ্যাসাগর মহাশয় আমাদিগকে সে কথা বলিতে অবকাশ দিলেন না, আপনি সকল কথা বলিয়াছেন।

ইহা অপেক্ষা আর-একটি গুরুতর দোষের উল্লেখ করিতে বাধ্য হইলাম। প্রাচীন বাঙ্গালীদিগের নিয়ম ছিল এবং এখনও শ্রেণীবিশেষের লোক ভিন্ন সকল বাঙ্গালীদিগের নিয়ম আছে, যে, কোন বিষয়ের বিচারে প্রবৃত্ত হইলে, বিচারকেরা পরস্পর পূর্বপুরুষের উল্লেখ করিয়া গালি না দিয়া ক্ষান্ত থাকিতে পারিতেন না বা পারেন না। রাম যদি বলিল, যে এটা ঘট, শ্যাম যদি বলিল, না এটা পট, তবে রাম বলিবে, "শ্যালা তুই কি জানিস্"—অমনি শ্যাম তদনুরূপ মধুবৃষ্টি করিবে! বাঙ্গালী লেখক ও বাঙ্গালী অধ্যাপকেরা এক্ষণেও সেই রীতির অনুবর্তী। অধ্যাপকেরা বিদায়ের আশায় সভাস্থ হইয়া বিচারে প্রবৃত্ত হয়েন, দুই-চারি কথার পর পরস্পরকে "পাষণ্ড", "ব্যলীক", "নরাধম" বলিয়া সম্বোধন করেন। বাঙ্গালীর নিম্নশ্রেণীর লেখকেরাও পরস্পর মতভেদ দেখিলে অমনি, ভিন্নমতাবলম্বীকে "মূর্খ", "ধৃষ্ট", "অসৎ", "মিথ্যাবাদী" এবং অন্যান্য উচ্চার্য এবং অনুচ্চার্য কথায় অভিহিত করিতে আরম্ভ করেন। তাঁহাদিগের শিক্ষা ও সংসর্গ বিবেচনা করিয়া তাঁহাদিগের নিকট অন্য ভাষার প্রত্যাশা করা যায় না; ইতরে ইতরের ব্যবহার্য ভাষাই ব্যবহার করিবে। কিন্তু বিদ্যাসাগর মহাশয়ের নিকট আমরা বিচারকালে ভদ্রের ব্যবহার্ধ ভাষারই প্রত্যাশা করি। ইতিপূর্বে বিদ্যাসাগর মহাশয় কখনও দূষণীয় ভাষা ব্যবহার করেন নাই—এ সম্বন্ধে তাঁহার রচনা পূর্বাবধি কলঙ্কশূন্য। কিন্তু এই পুস্তকে দেখিলাম যে তিনি আত্মবিস্মৃত হইয়াছেন। সভারূঢ় বিচারমত্ত তৈলোজ্জ্বলললাটবিশিষ্ট নৈয়ায়িকদিগের ন্যায় তিনি প্রতিবাদিগণকে গালি দিয়াছেন। কিন্তু যদি এইরূপ ভাষায় বিদ্যাসাগর মহাশয়ের প্রীতির এই একটিমাত্র চিহ্ন দেখিতাম, তাহা হইলে মনে করিতাম, দৈবনিগ্রহে এরূপ একবার ঘটিয়াছে। কিন্তু ইদানীন্তন বিদ্যাসাগর মহাশয়ের উপাসকদিগের মধ্যে এইরূপ ভাষায় অতিশয় আধিক্য দেখিতেছি। ইদানীং এইরূপ ভাষাতেই বিদ্যাসাগর মহাশয়ের স্তব লিখিত ও পঠিত হইয়া থাকে। উপাসকদিগের নিয়ম এই যে যাহাতে উপাস্য দেবতার প্রীতি জন্মে

তাহাই তাঁহাকে উপহার দিয়া থাকে—নারায়ণকে তুলসীচন্দন, ঘেঁটুকে ঘেঁট-ফুল, ছেঁড়াচুল, এবং গোময়। অতএব যাহা উপাসক নিবেদন করিতেছেন, উপাস্য তাহাই উৎসৃষ্ট করিতেছেন, দেখিয়া যদি কেহ মনে করেন যে উপাস্যের তাহাতেই আন্তরিক প্রীতি, তবে তিনি মার্জনীয় সন্দেহ নাই। উপাসক সম্প্রদায় আমাদিগকে ক্ষমা করিবেন, আমরা তাঁহাদিগের নিন্দা করিতেছি না। অন্নের দায়ে ভদ্রলোকেও দাস হয়, উপাসক জাতি কোন্ ছার! কেন তাঁহারা এরূপ আচরণে প্রবৃত্ত, তাহা বুঝিয়া কেহই তাঁহাদের অপরাধ লইবে না। কিন্তু বিদ্যা-সাগর মহাশয়ের এইরূপ রুচির পরিবর্তন দেখিয়া সকলেই দুঃখিত হইবে সন্দেহ নাই। গালি দিলেই যে বিচারে জয়ী হওয়া যায় না, গালিতে বাক্যের সারবত্তা বাড়ে না, সত্যনির্ণয়পক্ষে কটু কথার প্রয়োজন মাত্র নাই—তাহাতে যে লেখকের প্রতি পাঠকের অভক্তি জন্মে মাত্র, ইহা বিদ্যাসাগর মহাশয়কে বুঝাইতে হইবে না। যাঁহারা বিদ্যাসাগর মহাশয়ের এ পুস্তক পড়েন নাই, তাঁহাদিগের কৌতূহল-নিবারণার্থ দুই-একটি উদাহরণ উদ্ধৃত করিতেছি ;—

৩ পৃষ্ঠায় পণ্ডিত তারানাথ তর্কবাচস্পতি সম্বন্ধে লিখিয়াছেন ;

"অনেকে বলিয়া থাকেন, তর্কবাচস্পতি মহাশয়ের বুদ্ধি আছে, কিন্তু বুদ্ধির স্থিরতা নাই ; নানা শাস্ত্রে দৃষ্টি আছে কিন্তু কোন শাস্ত্রে প্রবেশ নাই ; বিতণ্ডা করিবার বিলক্ষণ শক্তি আছে, কিন্তু মীমাংসা করিবার তাদৃশী ক্ষমতা নাই। বলিতে অতিশয় দুঃখ উপস্থিত হইতেছে, তিনি বহুবিবাহবাদ পুস্তক প্রচার দ্বারা এই কয়টি কথা অনেক অংশে সপ্রমাণ করিয়া দিয়াছেন।"

পুনশ্চ ৬ পৃষ্ঠায়,—

"ফলতঃ, এই অলৌকিক আচরণ দ্বারা তর্কবাচস্পতি মহাশয় যে রাগদ্বেষের নিতান্ত বশীভূত ও নিতান্ত অবিমৃশ্যকারী মনুষ্য, ইহারই সম্পূর্ণ পরিচয় প্রদান করা হইয়াছে।"

তর্কবাচস্পতি যেমন ইচ্ছা তেমন মনুষ্য হউন, সাধারণের তাহাতে ইষ্ট বা অনিষ্ট নাই। তিনি কুলোক হইলেও, বিচার্য বিষয় কেবল এই যে তাঁহার উক্ত কথাগুলি যথার্থ, না অযথার্থ ? যদি সেগুলি অযথার্থ হয়, তবে তাঁহার চরিত্রের কথা উল্লেখ না করিয়াও তাঁহার মত খণ্ডন করা যাইতে পারে। আর যদি সে কথাগুলি যথার্থ হয়, তবে প্রতিপক্ষ যেমন চরিত্র হউন না কেন, তাহা যথার্থই থাকিবে। রাগ, দ্বেষ এবং অবিমৃশ্যকারিতা বোধ হয় পৃথিবীতে এত সুলভ, যে আমরা অন্যের প্রতি তাহার আরোপণ না করিলেও ভাল করিব। এই নৈতিক উক্তির প্রমাণস্বরূপ, গঙ্গাধর কবিরাজ মহাশয়ের সম্বন্ধে বিদ্যাসাগর যাহা বলিয়াছেন, তাহা আমরা পাঠক মহাশয়কে উপহার দিব।

"যদি এরূপ রাজাজ্ঞা প্রচারিত থাকিত; পূর্বে বঙ্গদেশবাসী অধুনা মুরশিদাবাদনিবাসী, সর্বশাস্ত্রদর্শী, চিকিৎসাব্যবসায়ী, শ্রীযুক্ত গঙ্গাধর রায় কবিরাজ কবিরত্ন মহোদয় যে স্মৃতি-বচনের যে অর্থ যথার্থ বা অযথার্থ বলিয়া অভিপ্রায় প্রকাশ করিবেন, অদ্যাবধি দ্বিরুক্তি না করিয়া ঐ অর্থ যথার্থ বা অযথার্থ বলিয়া ভারতবর্ষবাসী লোকদিগকে শিরোধার্য করিতে হইবেক; তাহা হইলে আমি যে সকল ব্যাখ্যা লিখিয়াছি, সে সমস্ত যথার্থ নহে, তদীয় এই সিদ্ধান্ত নির্বিবাদে অঙ্গীকৃত হইতে পারিত। কিন্তু সৌভাগ্যক্রমে, সেরূপ রাজাজ্ঞা প্রচারিত নাই; সুতরাং অকুতোভয়ে নির্দেশ করিতেছি, আমি শাস্ত্রের অযথার্থ ব্যাখ্যা লিখিয়া, লোককে প্রতারণা করিবার নিমিত্ত প্রয়াস পাই নাই। পূর্বে নির্দেশ করিয়াছি, এবং এক্ষণেও নির্দেশ করিতেছি, কবিরাজ মহাশয় ধর্ম-শাস্ত্রে সম্পূর্ণ অনভিজ্ঞ; চিকিৎসাবিষয়ে কিরূপ বলিতে পারি না, কিন্তু ধর্মশাস্ত্র বিষয়ে তাঁহার কিছুমাত্র নাড়ীজ্ঞান নাই; এজন্যই নিতান্ত নির্বিবেক হইয়া এরূপ গর্বিত বাক্যে, এরূপ অসঙ্গত নির্দেশ করিয়াছেন।"

পুনশ্চ, ২৩৯ পৃষ্ঠায়,

"ফলকথা এই, কবিরত্ন মহাশয় ধর্মশাস্ত্র বিষয়ে সম্পূর্ণ অনভিজ্ঞ; * * *, এজন্যই এরূপ অসঙ্গত অশ্রুতপূর্ব ব্যবস্থা প্রচার করিয়াছেন। যাহার যে শাস্ত্রে বোধ ও অধিকার না থাকে, নিতান্ত অর্বাচীন না হইলে সে ব্যক্তি সাহস করিয়া সে শাস্ত্রের মীমাংসায় হস্তক্ষেপ করে না। কবিরত্ন মহাশয়, প্রাচীন ও বহুদর্শী হইয়া কি বিবেচনায় অনধীত অননুশীলিত ধর্মশাস্ত্রের মীমাংসায় হস্তক্ষেপ করিলেন, বুঝিতে পারা যায় না।"

এই বলিয়া, বিদ্যাসাগর মহাশয় উদাহরণস্বরূপ, প্রবোধচন্দ্রিকা নামক অশ্লীলতার ভাণ্ডার হইতে একটি অশ্লীল উপাখ্যান উদ্ধৃত করিয়া স্বীয় * গ্রন্থকে কলঙ্কিত করিয়াছেন। সে উপাখ্যানটি এরূপ অশ্লীল, যে বোধ হয় সামান্য ইতর লেখকও তাহা উদ্ধৃত করিতে সাহস করিতেন না, কেননা তাঁহাদের লজ্জা না থাকুক, রাজদণ্ডের ভয় আছে। বিদ্যাসাগর মহাশয়ও, তাহার একটি শব্দ পরিবর্তিত করিয়া লজ্জানুরোধের প্রমাণ দিয়াছেন—আর-একটি শব্দ মৃত্যুঞ্জয় তর্কালঙ্কারের লজ্জাহীনা লেখনী হইতে যেমন বাহির হইয়াছিল, বোধ হয় তেমনই আছে। বিদ্যাসাগর মহাশয় এরূপ অশ্লীল উপাখ্যান স্বীয়গ্রন্থমধ্যে সন্নিবিষ্ট করিয়াছেন, ইহা অনেকে বিশ্বাস করিবেন না। যাঁহারা বিশ্বাস না করিবেন, তাঁহাদের প্রবৃত্তি থাকিলে বিদ্যাসাগর মহাশয়ের পুস্তকের ২৪০ পৃষ্ঠায়

* বহুবিবাহ, দ্বিতীয় পুস্তক, ২৪৯-২৫০ পৃষ্ঠা।

সন্ধান করিবেন, আমরা সে উপাখ্যান উদ্ধৃত করিয়া ভদ্রলোকের পাঠ্য বঙ্গদর্শন কলুষিত করিতে পারি না।

বিদ্যাসাগর এই পুস্তকে উপাখ্যান-প্রিয়তার বিশেষ পরিচয় দিয়াছেন। নেত্র-রোগীর উপাখ্যান ভিন্ন, গ্রন্থমধ্যে আরও একটি উপাখ্যান ২২৭ পৃষ্ঠায় আছে। যেসকল উপাখ্যান নীতিবিরুদ্ধ, বা অশ্লীল, বা অন্য কারণে ভদ্রের অনাদরণীয়, তাহা কদাচিৎ রসবাহুল্যের অনুরোধে সহ্য যায়। ধর্মশাস্ত্রের বিচারমধ্যে যদি উপন্যাস ন্যস্ত হইল, তবে তাহা একটু সরস হইলে ক্ষতি ছিল না। কিন্তু এক শাশুড়ী কুন্তীর দৃষ্টান্তানুবর্তিনী, তাঁহার বধূ দ্রৌপদীর দৃষ্টান্তনুকারিণী, এরূপ উপাখ্যান বিদ্যাসাগর মহাশয়ের লিপিকৌশলেও সরস হয় নাই, অথবা তাঁহার নামের বা বয়সের গুণেও নীতিগর্ভ বা ভদ্রলোকের পাঠ্য বলিয়া গৃহীত হইবে না।

একজন সামান্য ব্যক্তি এরূপ লিখিলে, আমরা তাহাকে ভর্ৎসনা করিবার জন্য বঙ্গদর্শনের এতটা স্থান নষ্ট করিতাম না। কটুবাক্যে অনুরক্তি, অশ্লীলতাকে রসিকতা জ্ঞান, ইহা বঙ্গীয় লেখকদিগের মধ্যে সর্বদা দেখা যায়। আমরা তাহার শাসনের জন্য বিশেষ প্রয়াস পাইয়া থাকি না, কেননা আমাদিগের দৃঢ় বিশ্বাস আছে, যে সাধারণ পাঠকের রুচির দৈনন্দিন উৎকর্ষসিদ্ধি হইতেছে, কদর্যভাষী লেখকদিগের ব্যবসায় শীঘ্র লোপ পাইবে। কিন্তু যেখানে শ্রীযুক্ত ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগরের ন্যায় বিজ্ঞ, মান্য, এবং সুপণ্ডিত লেখকের এরূপ প্রবৃত্তি, তখন বঙ্গীয় সাধারণ লেখক ও পাঠকের মঙ্গলকামনায়, বাঙ্গালা সাহিত্যে কোন ভবিষ্যৎকালে ভদ্রতা ও সভ্যতা স্থান পাইতে পারে এই বাসনায়, ভিন্নজাতীয়গণের নিকট চিরকাল আমরা ইতরজাতি বলিয়া পরিচিত না থাকি, এই ইচ্ছায়, আমরা এই কুপ্রথার নিন্দা করিলাম। আমাদিগের এই বিশেষ আশঙ্কা যে বিদ্যাসাগর মহাশয় কতকগুলি লেখকের আদর্শস্বরূপ, তাহারা এ নজির দেখিয়া অপরিমিত রসিকতা উদ্গীর্ণ করিতে আরম্ভ করিবেন। সেই আশঙ্কাতেই আমরা এত কথা বলিতে বাধ্য হইলাম। নচেৎ যে বাক্য উপদেশবাক্যের ন্যায় শুনায়, তাহা বিদ্যাসাগর মহাশয়ের প্রতি প্রয়োগ করিতে আমাদের লজ্জা করে। বিদ্যাসাগর মহাশয় সদনুষ্ঠানপ্রিয়তাগুণে আমাদের শ্রদ্ধার পাত্র। যাঁহাদিগকে তিনি কটু কথা বলিয়াছেন—তারানাথ তর্কবাচস্পতি বা গঙ্গাধর রায় কবিরাজ, ইঁহাদিগকে আমরা চিনি না; তাঁহাদিগের পক্ষতাবলম্বন করিয়া বিদ্যাসাগরের প্রতি দোষারোপ করিব এমত কোন কারণই নাই। তাঁহার প্রথম পুস্তকের উত্তরে ইঁহারা যাহা লিখিয়াছেন, তাহার যৎকিঞ্চিৎ পরিচয় পাইয়াছি, তাহাতে তাঁহাদিগের লিপিপ্রণালীরও প্রশংসা করিতে পারি না। তাঁহারাও বিদ্যাসাগরকে কটু বলিতে ত্রুটি করেন নাই। গালি খাইয়া

বিদ্যাসাগর গালি দিয়াছেন। কিন্তু যাঁহারা লিপিকার্যের সুসভ্য প্রণালী তাদৃশ অবগত নহেন, বিদ্যাসাগর যে তাঁহাদিগের অনুকরণে প্রবৃত্ত হইয়াছেন, ইহারই জন্য এত কথা বলিলাম। কেবল বঙ্গীয় সাহিত্য হইতে অসভ্যতাকলঙ্ক দূর করিবার প্রয়োজনানুরোধেই, এসকল কথা বলিতে হইল। বহুবিবাহবিষয়ক দ্বিতীয় পুস্তকে যে ভাষা ব্যবহৃত হইয়াছে, তাহাতে ভদ্রসমাজে বিচার চলিতে পারে না। ভদ্র লেখকে বিদ্যাসাগরকে বলিতে পারেন, "আপনার সহিত বিচারে প্রবৃত্ত হইব না। যিনি ভদ্রলোকের ব্যবহার্য ভাষা ব্যবহার না করিয়া কটূক্তি করেন, তাহার সহিত বিচার করিতে ঘৃণা করি।"

যে কয়টি কথা বলা আমাদিগের উদ্দেশ্য তাহা সংক্ষেপে পুনরুক্ত করিতেছি।

১। বহুবিবাহ অতি কুপ্রথা ; যিনি তাহার বিরোধী তিনিই আমাদিগের কৃতজ্ঞতার ভাজন।

২। বহুবিবাহ এ দেশে স্বতঃই নিবারিত হইয়া আসিতেছে ; অল্পদিনে একেবারে লুপ্ত হইবার সম্ভাবনা ; তজ্জন্য বিশেষ আড়ম্বর আবশ্যক বোধ হয় না। সুশিক্ষার ফলে উহা অবশ্য লুপ্ত হইবে।

৩। এ কথা যদিও সত্য বলিয়া স্বীকার না করা যায়, তথাপি ইহার অশাস্ত্রীয়তা প্রমাণ করিয়া কোন ফললাভের আকাঙ্ক্ষা করা যাইতে পারে না।

৪। আমাদিগের বিবেচনায় বহুবিবাহ নিবারণের জন্য আইনের প্রয়োজন নাই। কিন্তু যদি প্রজার হিতার্থ, আইনের আবশ্যকতা আছে, ইহা স্থির হয়, তবে ধর্মশাস্ত্রের মুখ চাহিবার আবশ্যক নাই।

৫। যে শাস্ত্রীয় বিচারে ভদ্রলোকের বর্জনীয় ভাষার অনুশীলন হয়, তাহা পরিহার্য।

উপসংহারকালে, আমরা বিদ্যাসাগর মহাশয়ের নিকট ক্ষমা প্রার্থনা করিতেছি। তিনি বিজ্ঞ, শাস্ত্রজ্ঞ, দেশহিতৈষী, এবং সুলেখক, ইহা আমরা বিস্মৃত হই নাই। বঙ্গদেশ তাঁহার নিকট অনেক ঋণে বদ্ধ। এ কথা যদি আমরা বিস্মৃত হই তবে আমরা কৃতঘ্ন। আমরা যাহা লিখিয়াছি, তাহা কর্তব্যানুরোধেই লিখিয়াছি। তিনি যদি কর্তব্যানুরোধে বহুবিবাহের বিচারে প্রবৃত্ত হইয়া থাকেন, তবে আমাদের এ কথা সহজেই বুঝিবেন।

আষাঢ় ১২৮০

সতীদাহ

এক মরণে দুইজন মরিত, ইহা আমাদের পক্ষে প্রায় কাহিনী হইয়া উঠিয়াছে ; কিন্তু আবালবৃদ্ধবনিতা সকলেই জানেন যে, অতি অল্পকাল পূর্বে এরূপ মৃত্যু সচরাচর সংঘটিত হইত। ইংরেজের অধিকৃত প্রদেশসমূহ হইতে প্রথাটা রহিত হইয়া গিয়াছে বটে,—মুসলমান রাজত্বকালেও অনেক স্থানে সহগমন নিষিদ্ধ ছিল ; আবে দুবোয়া দাক্ষিণাত্যের রীতিনীতি প্রসঙ্গে বলিয়াছেন যে, মুসলমান শাসনকর্তারা আপন আপন শাসনাধীন প্রদেশে সতী যাইতে দিতেন না, এবং আর্যাবর্তে এ ব্যবহারের বহুল প্রচার হইলেও দাক্ষিণাত্যে বিরল প্রচার ছিল ;—ইংরেজের অধিকারমধ্যে রহিত হইয়াছে বটে, কিন্তু ভারতবর্ষীয় স্বাধীন রাজ্য সকল হইতে এখনও একেবারে লুপ্ত হয় নাই। সে দিনও মৃত জং বাহাদুরের ভার্যারা সহগমন করিয়াছেন।

প্রথাটা কত কালের, তাহা স্থির করা দুষ্কর। অনেকের মতে, ঋগ্বেদের দশম মণ্ডলে সতীগমনের অনুমতি আছে ; কিন্তু উইল্‌সন, মক্ষমূলর, কাউয়েল প্রভৃতি পাশ্চাত্য পণ্ডিতেরা উক্ত বিধির পাঠের সত্যতায় সন্দেহ করেন। তাঁহারা বলেন, যেখানে 'অগ্নে' আছে, সেখানে 'অগ্রে' পড়িতে হইবে। সে যাহাই হউক, অনুগমনের অনুকূল বিধি বেদে থাকুক বা নাই থাকুক, প্রাচীন ধর্মশাস্ত্রে যে আছে তাহাতে আর সন্দেহ নাই। অঙ্গিরা, ব্যাস, পরাশর পত্যনুগমনই স্ত্রীলোকের প্রধান ধর্ম বলিয়া নির্দেশ করিয়াছেন। কিন্তু ইঁহাদিগেরই যখন কালনির্ণয় হয় না, তখন ইঁহাদের বচনের উপর নির্ভর করিয়া প্রথাবিশেষের মূলানুসন্ধান কিরূপে হইতে পারে ? তবে, ভিন্নদেশীয় সাহিত্যেও ইহার উল্লেখ আছে। দিওদোরস্‌ এই প্রথার উল্লেখ করিয়াছেন। কথিত আছে, খ্রীঃ পূঃ চতুর্থ শতাব্দীতে ইউমিনিসের সৈন্যমধ্যে সতীদাহ হইয়াছিল। অতএব ইহা একরূপ সিদ্ধ যে, সতীদাহপ্রথাটা সার্ধদ্বিসহস্র বর্ষ বা ততোধিক কালের।

প্রথাটির মূল নির্ণয় করা আরও কঠিন। এ সম্বন্ধে লিখিত কিছুই নাই, সুতরাং ইহার উপর অনুমান ব্যতীত আর কিছু চলিতে পারে না। অনেকে অনেক অনুমান করিয়া থাকেন। তন্মধ্যে দুই-চারিটার উল্লেখ করিলেই যথেষ্ট হইবে।

দিওদোরস্‌ বলেন, পত্যনুগমনের মূল কারণ, হিন্দুসমাজে বিধবার দুর্গতি এবং দুরবস্থা। এ অনুমানটি সঙ্গত বলিয়া আমাদের বোধ হয় না। সামাজিক নিয়মানুসারে বিধবার যে দুর্গতি, তাহা বিধবামাত্রেরই—দুই-চারিজনের নহে।

বৈধব্যদুঃখই যদি সহমরণের কারণ হইত, তাহা হইলে অধিকাংশ অথবা বহু-সংখ্যক বিধবা পতিবর্ত্মগা হইত। তাহা হয় নাই। সতী যাওয়া যখন অত্যন্ত প্রচলিত, তখনও অনুগামিনী বিধবার সংখ্যা শতকরা একজনেরও ন্যূন—উর্ধ্ব-সংখ্যা, হাজারে পাঁচজন। এতও বটে কি না, সন্দেহ। দ্বিতীয়তঃ, বৈধব্য-নিবন্ধন যে দুঃখ, তাহা নীচজাতীয়ার অপেক্ষা উচ্চজাতীয়ার অধিক—প্রকৃত ব্রহ্মচর্য কেবল ব্রাহ্মণের বিধবার কপালে। সুতরাং ভারতবর্ষের যে সকল স্থলে সতীদাহ হইত, সে সকল স্থানেই নীচজাতীয় সতীসংখ্যা অপেক্ষা উচ্চজাতীয় সতীসংখ্যা অবশ্য অধিক হওয়া উচিত ছিল, কেননা উচ্চজাতীয় বিধবার দুর্গতি অধিক। কিন্তু তাহা হয় নাই। সর্ তামস্ স্ট্রেঞ্জ বলেন, আর্যাবর্তে না হউক, অন্ততঃ দাক্ষিণাত্যে সতীর সংখ্যা নীচজাতির মধ্যেই অধিক। দিওদো-রসের অনুমানের সঙ্গে এ কথার সামঞ্জস্য হয় না। অতএব ইহা একরূপ নিশ্চিত যে বৈধব্যদুঃখ সহমরণের একমাত্র কারণ ত নহেই, প্রধান কারণও নহে।

তবে কি স্বর্গলাভের জন্য? তাহাও সম্ভবপর বলিয়া বোধ হয় না, কেননা চিতারোহণ অপেক্ষা এমন অনেক সহজ কার্য আছে, যাহা করিলে শাস্ত্রানুসারে স্বর্গ হয়। কিন্তু স্বর্গের জন্য সে সকল অপেক্ষাকৃত সহজ কাজও লোকে করে না। যদি স্বর্গের জন্য সুকরতর কার্য না করে, তবে সেই স্বর্গের জন্যই যে এমন দুষ্কর কার্য করিবে—জ্বলন্ত বহ্নিতে জীবন্তে পুড়িয়া মরিবে—এ সিদ্ধান্ত যুক্তি-সিদ্ধ বলিয়া বোধ হয় না। অতএব ইহাও বুঝা গেল যে, কেবল স্বর্গের জন্য সতীরা পুড়িত না।

বুঝি ভালবাসার জন্য। তাহাও বোধ হয় না। স্বামীকে ভালবাসে বলিয়া, স্বামিবিরহদুঃখ অসহ্য বলিয়া যে প্রাণত্যাগ করিতে চায়, তাহার চিতারোহণ করিয়া পুড়িয়া মরিবার আবশ্যকতা রাখে না—সে অন্য উপায়েও মরিতে পারে। সত্য সত্যই মরিবার ইচ্ছা থাকিলে কেহ কাহাকেও ধরিয়া রাখিতে পারে না। যমালয়ের পথ অসংখ্য। রাজবিধি একটা প্রকাশ্য পথ রুদ্ধ করিতে পারে, কিন্তু সকল পথ বন্ধ করা রাজবিধির সাধ্যাতীত। প্রকাশ্যরূপে, ধূমধাম করিয়া, ধূপধূনা জ্বালিয়া, শঙ্খঘণ্টা বাজাইয়া চিতারোহণ করা যেন রহিত হইল, কিন্তু তেমন ইচ্ছা থাকিলে, অন্য পথও আছে—গলায় দড়ি দেওয়া যাইতে পারে, বিষ খাওয়া যাইতে পারে, জলে ঝাঁপ দেওয়া যাইতে পারে—ধ্বংসপুরের শত সহস্র দ্বার। তবে, যেদিন হইতে ১৮২৯ সালের ১৭ আইন জারি হইয়াছে, সেই দিন হইতে আর কেহ পতিবিরহে প্রাণত্যাগ করে না কেন? আরও একটা কথা আছে। যে কেহ হিন্দুসমাজের প্রকৃতি এবং গতি একটু পর্যালোচনা করিয়াছেন, তিনিই জানেন যে স্বামীকে ভালবাসিতে হইবে, ইহা কোন কালেই

হিন্দুসমাজ কর্তৃক নারীধর্মের মধ্যে পরিগণিত হয় নাই। হিন্দু-ললনার ধর্ম, পতিভক্তি—পতিপ্রেম নহে। হিন্দুসমাজ হিন্দু-ললনাকে ইহাই শিখায় যে, স্বামী দেবতা, তাঁহাকে ভক্তি করিতে হইবে, তাঁহার প্রসাদ খাইতে হইবে, তাঁহার পাদোদক সেবন করিতে হইবে,—তাঁহাকে ভালবাসিতে হইবে, এ শিক্ষা হিন্দু-সমাজের নহে। এই অপরিবর্তনীয় জাতিভেদপ্রপীড়িত বৈষম্যপূর্ণ দেশে সাম্য-নীতি নাই, সুতরাং প্রেম-শিক্ষাও নাই। যদি কিঞ্চিৎ প্রেম-শিক্ষা আমাদের হইয়া থাকে, তাহা পাশ্চাত্য সভ্যতার ফল। দাম্পত্য প্রণয়ের ভাবটা কেবল নব্য দলে। অতএব, কেবল ভালবাসার জন্যও সতীরা পুড়িত না। আমরা এমন কথা বলিতেছি না যে, পূর্বতন হিন্দু-ললনাদের হৃদয়ে পতিপ্রেম আদৌ ছিল না। আমাদের এইমাত্র বক্তব্য যে, যাহা ছিল তাহা এত প্রবল নহে যে আগ্নেয় পথ দিয়া মৃত্যুর দ্বারে লইয়া যাইতে পারিত।

তবে কেন? কারণাভাবে কার্য হয় না। আমরা দেখিলাম যে পূর্ব-লিখিত কারণনিচয়ের মধ্যে বিশেষ কোনটিই প্রকৃত কারণ নহে। আমাদের বিশ্বাস এই যে, সতীদাহের নিন্দা-প্রশংসায় সকলগুলিরই দাবি আছে। প্রথমতঃ, এই চিতায় পুড়িতে পারিলে স্বর্গ নিশ্চিত। কিন্তু স্বর্গ হইলেই যথেষ্ট হইল না :

যার যেথা ভালবাসা, তার সেথা চির আশা
সুখ দুঃখ মনের খনিতে।

অতএব বাঞ্ছিতকে চাই, নতুবা বিমল খাঁটি সুখ হইল না। সতী যাইলে সে সুখও পাওয়া যাইবে। স্বামীর যদি পাপ থাকে—এ সংসারে কাহার নাই? তাহাও এই আত্মবিসর্জনে ধুইয়া যাইবে। হিন্দু-ললনার এ সংসারে সুখ স্বামী লইয়া। স্বামীর সঙ্গে স্বর্গে যাইতে পারিলে স্বর্গের সুখ, সংসারের সুখ, উভয় সুখই পাওয়া গেল। অতএব দ্বিতীয়তঃ, স্বামিলাভ। তৃতীয়তঃ, দুঃখনিবৃত্তি; বৈধব্য এবং দুঃখ আমাদের দেশে একই কথা। চতুর্থতঃ, গৌরবলাভ; যে সাধ্বী পত্যনুগমন করিল, সে ইহলোকেও ধন্য, পরলোকেও ধন্য। কিন্তু এ সম্বন্ধে আর অধিক বলিবার প্রয়োজন নাই। আমরা যে মত প্রকাশ করিলাম, এল্‌ফিন্‌স্টোন সাহেবের সেই মত।

এই স্থলে সহমরণপ্রথার দোষগুণ বিচার করা আবশ্যক হইতেছে। এতদুদ্দেশে আমরা প্রথমে সতীদাহের প্রতিকূল তর্কসকলের সমালোচনা করিব, তৎপরে অনুকূল তর্কের অবতারণা করা যাইবে।

সহমরণের বিরুদ্ধে প্রথমে আপত্তি এই যে আত্মহত্যা মহাপাপ এবং

যাহারা আত্মহত্যার সহায়তা বা অনুমোদন করে, তাহারাও মহাপাতকী। যতদূর সাধ্য, এ পাপপ্রবাহ রোধ করা উচিত।

আত্মহত্যা পাপ কিসে, তাহা ঠিক বুঝা যায় না। ফলনিরপেক্ষ পাপপুণ্যে আমাদের বিশ্বাস নাই। যাহা পাপ, তাহা সকল সময়ে, সকল স্থানে, সকল অবস্থাতেই পাপ, যাহা পুণ্য, তাহাও তেমনি সকল অবস্থায় পুণ্য ; এ মতে আমাদের আস্থা নাই। আমাদের বিশ্বাস, যাহা স্থানবিশেষে এবং অবস্থাবিশেষে দুষ্কর্ম, স্থানান্তরে এবং অবস্থান্তরে তাহা সৎকর্ম হইতে পারে। সুতরাং বিষয়বিশেষকে সাধু বা অসাধু বলিতে হইলে তাহার সুফল কুফল দেখান চাই। নতুবা কেবল সাধু বা অসাধু বলিলে বিচার্য কথাটা স্বীকার করিয়াই লওয়া হইল। ইহা ন্যায়বিরুদ্ধ এবং অযৌক্তিক। অতএব দেখা যাউক, সহগমনে সমাজে কোন অমঙ্গল আছে কি না।

দুই-চারি-দশজন মনুষ্যের মৃত্যুতে যে সমাজের বিশেষ কোন অনিষ্ট আছে, ইহা আমরা বোধ করি না। পুরুষের মৃত্যু সমাজকর্তৃক অনুভূত না হইলেও তাহাতে পরিবারবিশেষের গ্রাসাচ্ছাদনের ক্লেশ সংঘটিত হইতে পারে। এদেশীয় স্ত্রীলোকের মৃত্যুতে সে অসুবিধাটুকুও নাই। কেবল সাংসারিক অসুবিধার কথা বলিতেছি, মানসিক সুখদুঃখের কথা পরে বলিব।

যাঁহারা পৃথিবীর প্রভূত উপকার করিয়াছেন, মহান্ সত্যের আবিষ্কার করিয়াছেন, চিন্তার জন্য নূতন পথ খোদিত করিয়াছেন, মনুষ্যজাতিকে উন্নতির পথে অগ্রসর করিয়াছেন, তাঁহাদের অপগমেও সংসারের তাদৃশ ক্ষতি নাই। নিউটন না থাকিলেই যে মাধ্যাকর্ষণ-নিয়ম আবিষ্কৃত হইত না, এমত নহে। সূর্যকে বেষ্টন করিয়া পৃথিবী ঘুরিতেছে, এ সত্য গালিলীয় না জন্মিলেই যে চিরকাল অজ্ঞাত থাকিত, এমত নহে। হর্বি না জন্মিলেও রক্তসঞ্চরণ আবিষ্কৃত হইত, টরিচেলি বাল্যে মৃত্যুকবলিত হইলেও বায়ুর ভার স্থিরীকৃত হইত ; তবে কি না, দশদিন পূর্বে হইল, না হয় দশ দিন পরে হইত। নিউটন অথবা কেপ্লর, গালিলীয় অথবা বেকন, বিস্তৃতক্ষেত্রপার্শ্বস্থ উচ্চশির গিরিশৃঙ্গ মাত্র ; —সূর্যালোক ক্ষেত্রে আসিবার পূর্বে, অবশ্য তাঁহাদের মস্তকে পড়িবে, কিন্তু তাঁহারা না থাকিলেও সূর্যালোক ক্ষেত্রে আসিত।

সকলই সময়ে করে। নিউটনের পূর্বে কি ইউরোপে বুদ্ধিমান্ লোক ছিল না—তত্ত্বানুসন্ধায়ী লোক ছিল না, তবে মাধ্যাকর্ষণ আবিষ্কৃত হয় নাই কেন ? ইহার একমাত্র সদুত্তর, তখন সময় হয় নাই। মাধ্যাকর্ষণ আবিষ্কৃত হইবার পূর্বে যে সকল সত্যের আবিষ্কার এবং প্রচার নিতান্ত প্রয়োজনীয়, সে সকল আবিষ্কৃত এবং প্রচারিত হয় নাই। যে সময়ে এবং সমাজের যে অবস্থায় তিনি

পৃথিবীতে আসিয়াছিলেন, সে সময়ে, সে অবস্থায় আবিষ্কৃত সত্য আবিষ্কৃত হইতই হইত!* নিউটন না করিতেন, আর কেহ করিত ; কেবল— বলিয়াছি ত, দশদিন অগ্র পশ্চাৎ। তাহাতেই বলি, কাহারও সমাগমাপগমে সংসারের বিশেষ ক্ষতিবৃদ্ধি নাই। যে ক্ষতি তাহা অপূরণীয় নহে। যে বৃদ্ধি তাহা অবশ্যম্ভাবী।

নিউটন অথবা কেপ্লরের, কোমৎ অথবা বিষার অভাবে যদি জগতের বিশেষ এবং অপূরণীয় ক্ষতি না থাকে, তবে মুগ্ধা, প্রণয়বিহ্বলা, বিরহকাতরা, সন্তাপদগ্ধা, অন্তঃপুরবদ্ধা হিন্দুবিধবার মৃত্যুতে কি ক্ষতি? বিদ্যায় যে বর্ণজ্ঞান-শূন্যা, ভূয়োদর্শন যার স্বামিমুখ পর্যন্ত, সংসারজ্ঞান যার শয়নমন্দিরের চতুঃসীমা-বদ্ধ, ঘর হইতে আঙ্গিনা যার বিদেশ—হিন্দুবিধবার মৃত্যুতে সমাজের কি ক্ষতি?

এরূপ তর্ক উঠিতে পারে যে, হিন্দুর স্ত্রীলোকমাত্রেরই ত এই দুর্দশা—সকলেই নিরক্ষর, অজ্ঞান, অন্তঃপুরবদ্ধ—তবে সধবা, বিধবা অথবা সকলেই মরিবে কি?

ইহার উত্তরে প্রথমতঃ ইহা বলা যাইতে পারে যে, হিন্দুবিধবার যে অবস্থা, সেই অবস্থা যাহারই হইবে তাহাকেই মরিতে হইবে, এমন কথা আমরা বলি নাই। আমরা এইমাত্র বলিয়াছি যে, তাহার মৃত্যুতে বিশেষ ক্ষতি নাই। দ্বিতীয়তঃ কুমারী এবং সধবা যে সমাজের কোন উপকারে লাগে না, তাহা কে বলিল? সমাজের অস্তিত্ব পর্যন্ত তাহাদের উপর নির্ভর করে। তাহারা মরিলে গর্ভধারণ করিবে কে? নূতন জীবের সমাবেশ না হইলে, যেমন যেমন প্রাচীনেরা ইহলোক ত্যাগ করিবেন, সঙ্গে সঙ্গে সমাজও লুপ্ত হইবে। কিন্তু এ কার্যকারিতা বিধবার নাই। বিধবার বিবাহই যখন নিষিদ্ধ তখন গর্ভধারণের ত কথাই নাই। যদি কোন হতভাগিনী অবৈধ উপায়ে গর্ভধারণ করে, সেও গর্ভ বিনষ্ট করিতে বাধ্য হয়, নতুবা তাহাকে সমাজচ্যুত হইতে হয়।

আরও একটা তর্ক আছে। ইহা একরূপ নিশ্চিত যে, অন্যান্য জীবের ন্যায় মনুষ্যও জীবিতচেষ্টানিবন্ধন, প্রাকৃতিক নির্বাচন নিয়মে, উপস্থিত উন্নত পদবীতে আরোহণ করিয়াছে। ভবিষ্যতে আরও উন্নত হইতে হইলে, এই কঠোর জীবিতচেষ্টা দ্বারাই হইতে হইবে। জীবিতচেষ্টা যত কঠোর হইবে, উন্নতিও তত অধিক হইবে। আবার জীবিতচেষ্টার মূলভিত্তি, জনসংখ্যার আধিক্য এবং বৃদ্ধি। যে কোন প্রথা জীবসংখ্যা হ্রাস করে, সুতরাং

*নিউটন যে সময়ে মাধ্যাকর্ষণ নিয়ম আবিষ্কার করেন, ফ্রান্সে অন্য এক ব্যক্তি সেই সময়ে উক্ত নিয়ম আবিষ্কার করিয়াছিলেন।

জীবনসংগ্রামের বেগ হ্রস্ব করিয়া দিয়া উন্নতির ব্যাঘাত জন্মায়, তাহাকে অবশ্যই দোষাবহ বলিতে হইবে। অতএব সহমরণপ্রথা মন্দ।

ইউরোপে এবং আমেরিকায় এ তর্কের উত্তর নাই। ভারতবর্ষে আছে। স্ত্রীলোকের সাক্ষাৎসম্বন্ধে জীবিতচেষ্টা অতি অল্প। যাহা কিছু আছে আমেরিকায়। ইউরোপে তদপেক্ষা অল্প। ভারতবর্ষে নাই বলিলেও অত্যুক্তি হয় না, কেননা ভারতীয় স্ত্রীলোকদিগকে স্ব স্ব অভাব পূরণের ভার লইতে হয় না। পিতা বা ভ্রাতা, তৎপরে স্বামী, তৎপরে পুত্র, এ সকলের অভাবে আত্মীয়,—ইঁহারাই তাহাদের অভাবপূরণের ভার লইয়া থাকেন। যাহাকে নিজের অভাব নিজে পূরণ করিতে হয় না, তাহার আবার জীবিতচেষ্টা কি?

স্ত্রীলোকে সাক্ষাৎসম্বন্ধে জীবিতচেষ্টা না করিলেও পরম্পরা-সম্বন্ধে যে জীবিতচেষ্টার সাহায্য করে, তাহা অবশ্য স্বীকার্য—তাহারা গর্ভধারণ করে বলিয়াই জনসংখ্যা বৃদ্ধি হয়। কিন্তু এদেশীয় বিধবায় গর্ভধারণ করে না, কেননা বিধবাবিবাহই নিষিদ্ধ। সুতরাং এদেশীয় বিধবা জীবিতচেষ্টার সাহায্যও করে না। অতএব উপরিউক্ত তর্ক ভারতবর্ষে খাটিল না।

সতীদাহের বিরুদ্ধে আর-একটা আপত্তি এই যে, সতীদিগের ইচ্ছা না থাকিলেও আত্মীয় স্বজন অনেক সময়ে তাহাদিগকে উৎসাহিত করিত। সহজে সিদ্ধকাম না হইলে প্রবঞ্চনা, প্রতারণা, ভয়প্রদর্শন, লাঞ্ছনা, গঞ্জনা, তিরস্কার, ছল, বল, কৌশল,—এ সকলও অবলম্বিত হইত। সে অবস্থায় এ সকলের দ্বারা অভীষ্টসিদ্ধও হইত। একেই স্ত্রীলোকেরা কুসংস্কারান্ধা এবং সংসার-জ্ঞানশূন্যা, তাহাতে আবার তখন নববিয়োগবিধুরা, সুতরাং বীতসংসারানুরাগিণী; এ অবস্থায় কৌশলে প্রতারিত করা অতি সহজ।

কদাচিৎ কোথাও এরূপ ঘটিলেও ঘটিয়া থাকিতে পারে। হইতে পারে, কোন স্থলে কোন অর্থলোলুপ আত্মীয় বিষয়াধিকারিণী বিধবাকে পোড়াইয়া মারিবার যত্ন করিয়াছে। হইতে পারে, কোথাও কোন অনুদারপ্রকৃতি আত্মীয় ভবিষ্যৎ কলঙ্কের আশঙ্কা করিয়া নব-বিরহিণীকে জ্বলন্ত চিতায় আত্ম-সমর্পণ করিতে উত্তেজিত করিয়াছে। কিন্তু ব্যক্তিবিশেষের দোষ প্রথার উপর দেওয়া উচিত নহে। আমি যদি কুবুদ্ধির বশবর্তী হইয়া কোন সদনুষ্ঠানকে আমার স্বার্থসাধনে প্রয়োগ করি, সে পাপ আমার—প্রথার দোষ কি? ধর্মভাবের দোহাই দিয়া অনুষ্ঠিত না হইয়াছে, জগতে এমন দুষ্কর্ম নাই; কিন্তু তাই বলিয়া কি ধর্মভাবকে মন্দ বলিতে হইবে? পশুপ্রকৃতি গোস্বামীদিগের চরিত্র দেখিয়া হিন্দুধর্মের বিচার হওয়া কর্তব্য নহে। ক্লাইব এবং হেস্টিংসের চরিত্রের জন্য

খ্রীষ্টিয়ান্ ধর্মকে দায়ী করা বিহিত নহে। ইহা মনুষ্যচরিত্রের দোষ, এই রক্তমাংসের দোষ ; এ দোষ ব্যক্তিবিশেষের, এ দোষ স্বভাবের—সহমরণপ্রথা তাহার দায়ী নহে।

যাঁহারা মনে করেন যে অধিকাংশ স্থলেই বলপ্রয়োগ অথবা প্রতারণার দ্বারা অবলাগণ চিতানলে নিক্ষিপ্ত হইত, তাঁহারা বড় ভ্রান্ত। ইংরেজে এরূপ মনে করিতে পারেন,—চীনাবাজারের ফিরিওয়ালাদিগের চরিত্র দেখিয়া লর্ড মেকলে সমস্ত বাঙ্গালির মস্তকে গালিবর্ষণ করিয়াছেন—কিন্তু এ সকল বিষয়ে তাঁহাদিগের অপেক্ষা আমরা অধিক অভিজ্ঞ। আমরা ইহা মুক্তকণ্ঠে বলিতে পারি যে, অধিকাংশ স্থলেই পতিবিয়োগবিধুরা সতী আপন ইচ্ছায় পতির অনুগমন করিতেন। ইংরেজদিগের মধ্যেও যাঁহারা বিশেষজ্ঞ, তাঁহারাও এই-রূপ বিশ্বাস করেন। এলফিনস্টোন লিখিয়াছেন,—সকল স্থলেই না হউক, অধিকাংশ স্থলেই আত্মীয়েরা অকপট হৃদয়ে মরণোদ্যতা সাধ্বীকে নিবারিত করিতে চেষ্টা করিতেন। আপনারা অনুরোধ করিতেন, পুত্রকন্যায় অনুরোধ করিত, বন্ধুবান্ধব এবং পদস্থ ব্যক্তিদিগের দ্বারা অনুরোধ করাইতেন। হেন্‌রি জেফ্রিস বুস্বি সাহেব, তাঁহার 'সতীদাহ' নামক গ্রন্থে লিখিয়াছেন যে প্রায়ই বিধবারা ইচ্ছাপূর্বক অগ্নিপ্রবেশ করিয়া থাকে,—কচিৎ ইহার ব্যভিচার দৃষ্ট হয়। 'সতীদাহের' এই স্থলটি এত সুন্দর যে আমরা লোভ সম্বরণ করিতে না পারিয়া কতকটা উদ্ধৃত করিলাম।*

সতীদাহের প্রতিকূল কথা আমরা আন্দোলন করিলাম। এক্ষণে তদনুকূল কথার বিচার করা যাউক।

হিন্দুবিধবার মৃত্যুতে সমাজের দুঃখ কিয়ৎপরিমাণে হ্রাস হয়। সে নিজে

* With rare exceptions, the suttee is a voluntary victim. Resolute, undismayed, confident in her own inspiration, but betraying by the tone of her prophecies, which are almost always auspicious, that her tender woman's heart is the true source whence that inspiration flows. Her veil is put off, her hair unbound, and so exposed, she goes forth to gaze on the world for the first time, face to face, as she leaves it. She does not blush or quail. She scarcely regards the busied crowd who press so eagerly towards her. Her lips move in momentary prayer. Paradise is in her view. She sees her husband awaiting with approbation the sacrifice which shall restore her to him, dowered with the expiation of their sins, and ennobled with a martyr's crown. Exultingly she mounts that last earthly couch which she shall share with her lord. His head she places fondly on her lap. The priests set up their chaunt; it is a strange hymeneal, and her first-born son, walking thrice round the pile, lights the flame.

H. I. Bushby's Widow Burning; London 1855.

দুঃখিনী এবং তাহার দুঃখ দেখিয়া আত্মীয় স্বজন দুঃখী। যাহার গৃহে বিধবা কন্যা, তাহার দুঃখের পার নাই। নৈদাঘ একাদশীতে প্রাণের অধিক ধন আগুন করিয়া বেড়ায়, তাহা স্বচক্ষে দেখিতে হয়—আপনার হাতের গ্রাস চক্ষের জলে সিক্ত করিয়া মুখে তুলিয়া দিতে হয়। পাপ সমাজের এমনই নিদারুণ রীতি যে, তৃষ্ণায় ছাতি ফাটিলেও একবিন্দু জল দিবার যো নাই—পিতার প্রাণ ইহাতে কাঁদে না কি? যাহাকে দশমাস দশদিন দেহাভ্যন্তরে করিয়া বহিয়াছেন, বুকের রক্ত দিয়া মানুষ করিয়াছেন, সেই সাগর-সিঞ্চিত ধন প্রতিনিয়ত বজ্রদগ্ধ স্মৃতি-তরুমূলে নয়নবারি সিঞ্চন করিতেছে, বুকে করিয়া রাবণের চিতা বহিতেছে, আপনার সঙ্গে যুদ্ধ করিয়া আপনি ক্ষত বিক্ষত হইতেছে—মায়ের বুক ইহা দেখিয়া ফাটে না কি? তার উপর আশঙ্কা,—কোন দিন এই হতভাগিনী প্রকৃতির সঙ্গে যুদ্ধে পরাজিত হইবে, মনের আবেগ চাপিয়া রাখিতে অসমর্থ হইবে, আর অমনি আত্মীয়স্বজনের মাথা হেঁট হইবে। এরূপ আশঙ্কা যে হয় না, তাহা কে সাহস করিয়া বলিবে? পুরুষের স্ত্রীবিয়োগ হইলে, পিণ্ডান্ত-পিণ্ডশেষ প্রদত্ত হইতে না হইতে গ্রামে গ্রামে মেয়ের অনুসন্ধানে ঘটক বাহির হয়—ভয়, পাছে ছেলেটির দুর্বুদ্ধি ঘটে। স্ত্রীলোকের সম্বন্ধে যে এ আশঙ্কা হয় না, ইহা কেমন করিয়া বলা যায়? স্ত্রীলোক কি মানুষ নহে? তাহাদের রক্তমাংস কি অন্য উপকরণে নির্মিত? অবশ্য আশঙ্কা হয়, এবং আশঙ্কা দুঃখের ভাব। বিধাতার মারই ভাল। কেবল অন্যের দুঃখ নিবারিত হয় বলিয়া বলিতেছি না, কিন্তু বিধবার মরাই ভাল। তাহার মৃত্যুতেও আত্মীয়-স্বজনের দুঃখ আছে, কিন্তু সে বাঁচিয়া থাকিলে যত দুঃখ, মরিলে কি তত? মৃত্যুনিবন্ধন যে দুঃখ, তাহা কালে মন্দীভূত হইয়া যায়; কিন্তু বিধবার দুঃখ নিত্য নূতন, সুতরাং যাহারা তাহার দুঃখে দুঃখী, তাহাদের দুঃখও নিত্য নূতন।

আবার তাহার নিজের দুঃখ। হিন্দুবিধবার জীবন দুঃখের জীবন। আহারে বল, ব্যবহারে বল, ধর্মানুষ্ঠানে বল, হিন্দুবিধবার জীবন দুঃখের জীবন। আবার, সুন্দর যায়, সৌন্দর্যোন্মাদ ত যায় না; প্রণয়পাত্র চক্ষের বাহিরে হয়, প্রণয়তৃষ্ণা ত হৃদয়ের বাহির হয় না; সুতরাং হৃদয়ের জ্বালা চিরদিন হৃদয়ের ভিতর ধিকি ধিকি জ্বলিতে থাকে। আবার দুঃখের উপর দুঃখ স্ত্রীলোকের জন্য লজ্জার শাসন এতই কঠোর, যে বুক ফাটিয়া বলিবার যো নাই। হৃদয়ের তাপ হৃদয়ে চাপিয়া রাখিতে হয়, মনের দুঃখ কেবল মন জানে, অন্তরের শ্বাস অন্তরে মিলায়, চক্ষের জল চক্ষে শুকায়,—আবার বলি, হিন্দুবিধবার জীবন বড় দুঃখের জীবন। এ দারুণ দুঃখ অপ্রতিকার্য, কেননা হিন্দুবালার বৈধব্য অনপনেয়।

না মরিলে আর বিধবার যন্ত্রণা ফুরায় না। যে রোগের যে ঔষধ, সে রোগে তাহাই ব্যবস্থা। বিধবার মরাই ভাল।

দেখান গিয়াছে, বিধবার মৃত্যুতে সংসারের ক্ষতি নাই। দেখান গেল, বিধবার মৃত্যুতে দুঃখের হ্রাস আছে। যদি কেবল ইহাই হইত, তাহা হইলেও বিধবার মৃত্যুকে অমঙ্গল বলিতাম না। কিন্তু আরও দেখান যাইতেছে যে, সহমরণে সমাজের লাভ আছে।

স্মাইল বলিয়াছেন এবং আমরাও বলি, দৃষ্টান্তের ন্যায় উপদেষ্টা নাই। যাঁহারা বলেন,—আমি যাহা করি তাহা করিও না, আমি যাহা বলি তাহাই কর,—তাঁহারা মতিভ্রান্ত ; তাঁহারা মনুষ্যচরিত্র বুঝেন না। এই পথে যাও, —এ কথায় কেহ যাইবে, কেহ যাইবে না। তুমি এই পথে যাও, আমি অন্য পথে যাইব,—এ কথায় হয়ত কেহই যাইবে না। কিন্তু আমি পথ-প্রদর্শক হইতেছি, তোমরা আমার সঙ্গে আইস, ইহা বলিলে অনেকে যাইবে। তোমার সঙ্গে সমস্ত পথ না যাইতে পারে, অনেক দূর যাইবে। অন্ততঃ কিয়দ্দূরও যাইবে। দৃষ্টান্তের ন্যায় উপদেষ্টা নাই।

আর স্বামীর জন্য ইচ্ছাপূর্বক প্রাণত্যাগ করা, কেমন দৃষ্টান্ত। পতিবিয়োগ-বিধুরা সতী পবিত্রতার, সতীত্বের, ভালবাসার, আত্মবিসর্জনের, সংসারে যাহা কিছু ভাল তাহারই বীরধ্বজা স্বর্গে উড়াইয়া, গভীর অনুরাগের, উৎকট মহত্ত্বের, অপার সহিষ্ণুতার দুন্দুভিনিনাদে জগৎ ভরিয়া, জ্বলন্ত চিতারোহণ করিলেন,—এ জাজ্বল্যমান দৃষ্টান্ত চক্ষের উপর দেখিয়া কার হৃদয় গলিবে না?—ধর্মে কার মতি হইবে না?—আত্মবিসর্জনের মহত্ত্ব কার হৃদয়ঙ্গম হইবে না? ধর্মের পথে পদস্খলন হইবার উপক্রম হইতেছিল, এমন অনেক রমণী ভার ঠিক করিয়া লইয়া সেই পথে চলিবে। যাহাদের সতীত্বের গ্রন্থি শিথিল হইয়া আসিতেছিল, তাহাদের অনেকে সতীত্বের মাহাত্ম্য বুঝিবে,—পাপ পিশাচকে দূর হইতে নমস্কার করিয়া পতিপদারবিন্দে মন স্থির করিবে। রমণীর, ধর্মে আস্থা হইবে। পুরুষের, রমণীর প্রতি ভক্তি হইবে। সহমরণে সংসারের লাভ বই ক্ষতি নাই।

আর-একটি কথা আছে। এ কথাটি আমরা তুলিতাম না ; কিন্তু অনেক কৃতবিদ্য লোকের মুখেও এরূপ আপত্তি শুনিয়াছি বলিয়াই এ কথার প্রসঙ্গ করা যাইতেছে। তাঁহারা বলেন যে, যাহার প্রণয় এত গভীর, যাহার সহিষ্ণুতা এমন অপার, তিনি যদি না মরিয়া আবার অভিনব বিবাহসূত্রে বদ্ধ হয়েন, তাহা হইলে জগতের আরও মঙ্গল।

ইহার উত্তরে আমরা বলি যে, আরও মঙ্গল হউক বা না হউক, তাহা দেখিবার আবশ্যক হইতেছে না, কেননা তিনি বাঁচিয়া থাকিলেই বা আর বিবাহ

করিতে পারিতেন কই ? বিধবার বিবাহ শাস্ত্রবিরুদ্ধ !* কেবল শাস্ত্রবিরুদ্ধ হইলেও ক্ষতি ছিল না—অশাস্ত্র অনেক প্রথা সমাজমধ্যে প্রচলিত আছে,—কিন্তু ইহা দেশাচারবিরুদ্ধ ; এবং আমরা হিন্দুসমাজের কথা বলিতেছি।

দ্বিতীয়তঃ, যদি কোন অবলা, আমাদের এই এঙ্গলোবর্ণেকুলের সমাজের মতানুসারে, প্রথম স্বামীর মৃত্যুর পর পত্যন্তর পরিগ্রহ করিতে ইচ্ছা করেন, তাহাতে কাহারও আপত্তি নাই। যে স্থলে পুরুষের দুইবার বিবাহ হইতে পারে, সে স্থলে স্ত্রীলোকেরও হওয়া উচিত। আপনারা যে নিয়মের বাধ্য হইতে পারি না, সে নিয়মে অন্যাকে বাধ্য করা অন্যায়। জানি, বুঝি, মানি ; কিন্তু যখন আদৌ বিবাহই হইতে পারে না, তখন অনর্থক ধরিয়া রাখিবার ফল কি ? দুঃখ-ভোগের জন্য তাহাকে ধরিয়া রাখিবার তুমি কে ? তবে যে সহমরণপ্রথার জন্য হিন্দুসমাজের এত দুর্নাম, শাস্ত্রকারদিগের এত অখ্যাতি, ইহার অর্থ সম্পূর্ণরূপে বুঝিয়া উঠা যায় না। স্বীকার করি, ভারতে স্ত্রীলোকের উপর পুরুষের অনেক অত্যাচার ছিল এবং আছে—কোথায় নাই ?—কিন্তু সতীদাহ তাহার অন্তর্গত নহে। দুগ্ধপোষ্য বালকের সঙ্গে দুগ্ধপোষ্যা বালিকার পরিণয়, অবশ্য অত্যাচার। কুলীনকন্যার চিরকৌমার্য, অবশ্য অত্যাচার। মৃতভর্তৃকার চিরবৈধব্য অবশ্য অত্যাচার। কিন্তু সহমরণ অত্যাচার নহে। মৃত্যুতেই যার যাতনার অবসান, মৃত্যুতেই যার শান্তি, মৃত্যু তাহার পক্ষে অমঙ্গল নহে। যে স্থলে বিধবাবিবাহ নিষিদ্ধ, সে স্থলে সহগমনের স্বাধীনতা থাকা উচিত।

শাস্ত্র এমন নহে যে বিধবামাত্রকেই বলপূর্বক পোড়াইতে হইবে। শাস্ত্র এমন নহে যে বিধবামাত্রকেই স্বামীর মৃতদেহের সঙ্গে চিতারোহণ করিতে হইবে। যার ইচ্ছা হয়, মরুক ;—ইহাতে অত্যাচার কি ?

তবে শাস্ত্রকারদিগের কলঙ্ক এই যে, বিধিটা একতরফা করিয়াছিলেন। পরাশর যেমন লিখিয়াছিলেন যে, সহমৃতা বিধবা সাড়ে তিন কোটি বৎসর স্বর্গ-ভোগ করিবে,* তেমনই সঙ্গে সঙ্গে যদি লিখিতেন যে সহমৃত পুরুষ সাড়ে তিন শত কোটি বৎসর স্বর্গভোগ করিবে, তাহা হইলে এত কলঙ্কের ভাগী হইতে হইত না।

ইংরেজ গবর্নমেণ্ট সতীদাহ উঠাইয়া দিয়া ভাল করিয়াছেন কি ? বেণ্টিঙ্ক

* নষ্টে মৃতে প্রব্রজিতে ক্লীবে চ পতিতে পতৌ ইত্যাদি—পরাশরসংহিতার এ বচন বাগ্দত্তা কন্যার পক্ষে, মৃতভর্তৃকার পক্ষে নহে।

*তিস্রঃ কোট্যার্ধকোটীচ যানি লোমানি মানবে।
তাবৎ কালং বসেৎ স্বর্গে ভর্তারং যানুগচ্ছতি ॥
পরাশর সংহিতা।

সাহেবকে আমরা এ সদনুষ্ঠানের জন্য আশীর্বাদ করিব, না অভিসম্পাত করিব? চশমা চোখে সমাজসংস্কারক বাবুর মনে কি আছে, তা তিনিই জানেন ; আমরা বলি, গবর্নমেণ্টের এ কার্য ভাল হয় নাই।

ভাল হয় নাই ; কেননা ইংরেজ গবর্নমেণ্ট প্রতিজ্ঞা করিয়াছিলেন, হিন্দুর ধর্মে হস্তক্ষেপ করিবেন না। ভাল হয় নাই, কেননা বেন্থামের হিতবাদের দ্বারা পরীক্ষা করিয়া সতীদাহে দোষাধিক্য দেখা যায় না। ভাল হয় নাই, কেননা হর্বট স্পেন্সরের সমস্বাতন্ত্র্যবাদের দ্বারা পরীক্ষা করিয়া ইহাতে দোষ দেখা যায় না। বরং রাজবিধির দ্বারা ইহা রহিত করায় দোষ দেখা যায়। জন স্টুয়ার্ট মিল দেখাইয়াছেন যে, যে সকল কার্যের সঙ্গে সম্বন্ধ প্রধানতঃ কেবল নিজের, তাহার উপর সমাজের অথবা রাজবিধির হস্তক্ষেপ করা বিধেয় নহে। যে সকল বিষয়ে সাক্ষাৎসম্বন্ধে অন্যের অনিষ্ট নাই, তাহা স্ব স্ব প্রবৃত্তি এবং ইচ্ছার উপর নির্ভর করা উচিত। সহমরণ উঠাইয়া দেওয়ায় হিন্দু বিধবার কি লাভ হইয়াছে?—তাহাদের দুর্দশার কি তারতম্য হইয়াছে? এইমাত্র যে তখন একদিন পুড়িত, এখন সমস্ত জীবন পুড়িতে থাকে। তখন পুড়িয়া মরিতে পাইত,—এখনও পুড়িতে পায়, কেবল মরিতে পায় না ‡

আষাঢ় ১২৮৪

বঙ্গোন্নয়ন

বাঙ্গালি মাত্রেই বাঙ্গালার শ্রীবৃদ্ধি কামনা করেন। কতকগুলি নৈসর্গিক কারণ বঙ্গোন্নতির প্রতিকূল আছে। সেই সকল কারণের সমালোচনা প্রায় কেহই করেন না। ঈদৃশ সমালোচনা এই প্রস্তাবের মুখ্য উদ্দেশ্য।

একজন মুসলমান গ্রন্থকার লিখিয়াছেন, "বঙ্গভূমির উর্বরতা দেখিলে বাঙ্গালাকে পার্থিব নন্দনকানন (বেহেস্ত-ই-আলম্) বলা যাইতে পারে, কিন্তু তথাকার জল ও বায়ু এমন দূষ্য যে সে দেশকে নরকের প্রান্তভূমি বলিলে অত্যুক্তি হয় না।"

‡ এই প্রবন্ধে যে সকল পক্ষ সমর্থিত হইয়াছে, তাহা আমাদিগের মতে অনেক স্থানে অনুমোদনীয় নহে। কিন্তু বঙ্গদর্শনে সকলপ্রকার মত সমর্থিত ও সমালোচিত হউক, ইহা আমাদিগের ইচ্ছা ; স্বাধীন সমালোচনা ভিন্ন উন্নতি নাই। সে জন্যও বটে, এবং লেখকের লিপিচাতুর্যে মুগ্ধ হইয়াও বটে, আমরা এ প্রবন্ধ পত্রস্থ করিলাম। বং সং।

প্রথম পরিচ্ছেদ/উর্বরতা ও পৌরুষ

ভূমির উর্বরতা যে মহামঙ্গলময়ী ইহা বলা বাহুল্য। বুভুক্ষার ন্যায় মনুষ্যের কোন প্রবৃত্তি বলবতী নহে। সংসারে প্রায় সকলেই আহারের সংস্থানজন্য প্রত্যহই ব্যস্ত; অতএব ভূমির যে গুণে আহার্যের উৎপত্তি হয়, সেই গুণের কীর্তনজন্য মসিব্যয় করার প্রয়োজন নাই। ভারতবর্ষের নানাপ্রদেশে অনাবৃষ্টি-জাত দুর্ভিক্ষে লক্ষ লক্ষ প্রাণীর মৃত্যু হইয়াছে। উর্বরতাগুণে বহুকাল বাঙ্গালার সে দুর্দশা ঘটে নাই।

উর্বরতা মহোপকারসাধিনী হইয়াও নিরবচ্ছিন্ন মঙ্গলের কারণ নহে। যাহারা স্বল্পায়াসলব্ধ ভক্ষ্য পাইয়া সন্তুষ্ট হয়, তাহারা প্রায় শ্রমশীল হয় না। শ্রমাভাবে পৌরুষের হানি হয়। উর্বরাদেশবাসীরা প্রায় কোথাও পৌরুষজন্য বিখ্যাত নহে। বাঙ্গালিদের পৌরুষের পরিচয় দিবার প্রয়োজন নাই।

গত বারশত বৎসরের ইতিহাসের পর্যালোচনা করিলে আসিয়ার অধিবাসী-দের মধ্যে আরবীয়েরা বলবিক্রমে সর্বপ্রধান, এবং তাতারগণ প্রায় আরবীয়দের সদৃশ বলিয়া প্রতীয়মান হইবে। ইউরোপীয়েরা এক্ষণে আসিয়াবাসীদিগকে মনুষ্য বলিয়াই গ্রাহ্য করেন না। তাঁহাদের একবার স্মরণ করা উচিত যে আরবীয়েরা ইউরোপে স্পেন, সিসিলি ও ফ্রান্সের দক্ষিণভাগ জয় করিয়াছিল এবং কন্‌স্তন্‌তনিয়ার ইউরোপীয় সম্রাটকে করদ রাজার শ্রেণীতে অবনত করিয়া-ছিল।*

এই আরবীয়দেশ মরুভূমি। মাঞ্চু তাতারগণ চীন জয় করে; বর্তমান চীনের সম্রাট তাতার-বংশোদ্ভব। তুর্কোমান তাতারগণ ইউরোপে ইউনান সাম্রাজ্য অধিকার করিয়াছে। রুশকর্তৃক পরাজিত হইয়াছে বটে, কিন্তু প্লেব্‌নার সমরক্ষেত্রে পৌরুষের বিলক্ষণ পরিচয় দিয়াছে। রোম সাম্রাজ্যের যত বর্বর অরি ছিল, হুনতাতারদের অধিরাজ আতিলা তাহাদের মধ্যে সর্বপ্রধান, ১৪০০ বৎসর হইল ইহার নামে পৃথিবী কাঁপিত।

মোগল তাতারগণ ভারতবর্ষ জয় করিয়াছিল। এই সমস্ত তাতারদের আদিনিবাস মরুভূমি।

বস্তুতঃ এ বিষয়ের প্রতিপাদন জন্য অধিক দূর দৃষ্টি করার প্রয়োজন নাই।

* সম্রাট নিকেফরূপ করদান বন্ধ করিবেন বলিয়া খলিফা হারুন রসিদকে লেখায় খলিফা এই উত্তর পাঠাইয়াছিলেন, 'কুক্কুরীপুত্র কাফের, তোমার পত্রের উত্তর পড়িতে হইবে না, দেখিতে পাইবে।' সম্রাট যখন দেখিলেন আরবসেনা অগ্নি ও তরবার দ্বারায় ইউনান সাম্রাজ্য নষ্ট করিতেছে, তখন কৃতাঞ্জলি হইয়া খলিফাকে পুনর্বার কর দিলেন।

ভারতবর্ষে বীরপ্রসূতি রাজস্থানকে প্রাচীনগণ ইরিনদেশ অর্থাৎ মরুভূমি বলিতেন।† শত শত সমরক্ষেত্রে রাজপুতগণ পরিচয় দিয়াছে যে, তাহারা প্রাণাপেক্ষা মানের অধিকতর গৌরব করে। চিতোর দুর্গের রক্ষকগণ যাদৃশ স্বাধীনতানুরাগ ও আত্মবিসর্জনের আদর্শ দেখাইয়া গিয়াছেন, এমন কোন পাষণ্ড নাই যে, সে কথা স্মরণ করিয়া চক্ষুর জল সম্বরণ করিতে পারে। এই ভারতবর্ষ যে অর্জুনের জন্মভূমি ছিল, ইহার বর্তমান অবস্থা দেখিলে সে কথায় শীঘ্র বিশ্বাস হয় না। তবে রাজপুত ও শিখদের ইতিহাস পর্যালোচনা করিলে মনোমধ্যে এ বিষয়ে কতকটা প্রতীতি জন্মে! রাজপুতগণের যেরূপ পৌরুষ, যদি সেরূপ রণকৌশল ও একতা থাকিত—জয়পুর, যোধপুর ও উদয়পুরের প্রতি তাহাদের যাদৃশ অনুরাগ, ভারতের প্রতি যদি তাদৃশ অনুরাগ থাকিত, তাহা হইলে ভারতে যবনাধিকার হইত কি না সন্দেহ। এই রাজপুতদের দেশের ভূমি বালুকাপ্রধান। তাহাতে বার্বরবৃক্ষ যত জন্মে, শস্য তত জন্মে না।

দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ/অধিত্যকাবাস ও পৌরুষ

মহাকবি মিল্টন গাইয়াছেন—

'মহীধর-অধিষ্ঠাত্রী, স্বাধীনতা দেবী।'*

বাঙ্গালা যদি পার্বত্যদেশ হইত, তাহা হইলে বাঙ্গালিদের পৌরুষ, নেপালের গোরক্ষদের ন্যায় না হউক, অন্ততঃ কাশ্মীরীদের ন্যায় হইতে পারিত।

যদি আফগানস্থান পার্বত্য দেশ না হইত তাহা হইলে পাঞ্জাব জয় পরেই ঐ দেশ ইংরেজাধিকৃত হইত, সন্দেহ নাই।

১৮৭৮ খ্রীষ্টাব্দের নভেম্বরে যে যুদ্ধারম্ভ হয়, সে যুদ্ধে আফগানস্থানের উপত্যকা প্রদেশ ব্রিটিস সেনা অনায়াসে জয় করিয়াছিল ; অধিত্যকাজয় অতি দুরূহ ব্যাপার। যদি আমাদের রাজপুরুষগণ ভারতের ন্যায় আফগানস্থান অধিকৃত করিবার চেষ্টা করিতেন, তাহা হইলে কৃতকার্য হইতেন না, এমন কথা বলা যাইতে পারে না ; কিন্তু আফগানদের এরূপ পৌরুষ ও স্বাধীনতাপ্রিয়তা যে অর্থব্যয়ে আমাদের রাজকোষ শূন্যপ্রায় হইত এবং ভারতসৈনিকদের রক্তে অধিকৃত দেশ প্লাবিত হইত। নেপাল পার্বত্যদেশ বলিয়াই নেপালরাজের পদ মহারাজা সিন্ধিয়া ও মহারাজা হোল্‌কারের পদাপেক্ষা উন্নত।

নেপালে ইংরেজ রেসিডেণ্ট আছেন। ভোটে তাহাও নাই। ভোটরাজ সর্বতোভাবে স্বাধীন। ভোট পার্বত্যদেশ না হইলে এই স্বাধীনতা কোন্ কালে

† মারবার শব্দ মরু হইতে উৎপন্ন। মরু মারবার প্রদেশের পূর্ব নাম।
* "The mountain-nymph, sweet Liberty"

অন্তর্হিত হইত। কেহ কেহ এই আপত্তি উত্থাপন করিতে পারেন, 'পার্বত্যদেশে বাসের সহিত পৌরুষের কি সম্বন্ধ ? পার্বত্যদেশ একটি বৃহৎ দুর্গস্বরূপ ; সেই দুর্গই স্বাধীনতা রক্ষা করিতেছে ; পৌরুষের কি কার্য ?'

ইহার উত্তর এই যে অধিত্যকাবাস পৌরুষবর্ধন ও পৌরুষসহায়। পৌরুষ ব্যতীত কেবল দুর্গবলে স্বাধীনতার রক্ষা হয় না। বস্তুতঃ পৌরুষ হইতে যেমন বুদ্ধিবল ও অস্ত্রবল বিচ্ছিন্ন হইতে পারে না, তেমন দুর্গবলেরও বিচ্ছেদ হইতে পারে না। মনুষ্যের যদি কেবল প্রকৃতিদত্ত নখ ও দন্তের উপর নির্ভর করিতে হইত, তাহা হইলে মনুষ্যের ন্যায় দুর্বল জীব অতি বিরল ; এতদিন সিংহ ও ব্যাঘ্রে মানবকুল ধ্বংস করিয়া ফেলিত। বীরেন্দ্র অর্জুনের যদি গাণ্ডীব না থাকিত, যদি তিনি নিরস্ত্র হইতেন, তাহা হইলে একজন সাধারণ অস্ত্রধারী কৌরবসৈনিক তাঁহাকে নষ্ট করিতে পারিত। তাহা হইলে ব্যাসদেবকর্তৃক অর্জুনের পৌরুষগুণকীর্তন হইত না। জর্মন ও ইংরেজ জাতির যদি উৎকৃষ্ট আগ্নেয় অস্ত্র—ক্রুপ্‌গন, আরম্‌স্ট্রংগন, নীডলগন, হেনরিমার্টিনী রাইফল—না থাকিত, যদি তাঁহাদের উত্তমরূপে রণকৌশল শিক্ষা না হইত, তাহা হইলে তাঁহাদের পৌরুষের খ্যাতি কে শুনিত ? যদি অস্ত্রের সাহায্য লইলে পৌরুষের হানি না হয়, পর্বতরূপ দুর্গ সাহায্য লইলে, পৌরুষহানি কেন স্বীকার করিব ?

পার্বত্যদেশে অধিক পরিশ্রম না করিলে জীবিকানির্বাহ হইতে পারে না। শারীরিক পরিশ্রম যে পৌরুষবর্ধক, তাহা পূর্বেই বলা হইয়াছে। অতএব কেহই অস্বীকার করিতে পারিবেন না যে, বাঙ্গালা পার্বত্যদেশ হইলে, বাঙ্গালিদের কাপুরুষ বলিয়া কলঙ্ক হইত না।

মাঘ ১২৮৭

দশমহাবিদ্যা

কালী তারা মহাবিদ্যা ষোড়শী ভুবনেশ্বরী।
ভৈরবীচ্ছিন্নমস্তা চ বিদ্যা ধূমাবতী তথা ॥
বগলা সিদ্ধবিদ্যা চ মাতঙ্গী কমলাত্মিকা।
এতা দশমহাবিদ্যাঃ সিদ্ধাবদ্যাঃ প্রকীর্তিতাঃ ॥

আমি যে ঘরে বসি পূর্বে সেই ঘরের চারিদিকে এই দশমহাবিদ্যা বিরাজ

করিতেন। আমার ব্রাহ্ম বন্ধুগণ যখনই সেই গৃহে পদার্পণ করিতেন সেই সকল মূর্তির অধিষ্ঠানে সর্বদাই বিরক্তি প্রকাশ করিতেন, ছিন্নমস্তাকে দেখিয়া তাঁহারা খড়্গহস্ত হইতেন ; কত বক্রোক্তি আমাকে এই দশমহাবিদ্যার জন্য শিরে বহন করিতে হইয়াছে ; অশ্লীল কদর্য প্রভৃতি কত বিশেষণপদ আমার রুচির পরিচয় প্রদান করিয়াছে।

দশমহাবিদ্যার প্রতি আমার ভক্তি বড় অচলা নহে ; ক্রমে তাঁহারা স্থানান্তরিত হইলেন ; ও দেশী বিলাতী আলেখ্য শোভন-কারিণী আধুনিকী মহাবিদ্যাগণ সেই পৌরাণিকী মহাবিদ্যাদিগের স্থলে বিরাজ করিতেছেন। একটি দেশী মহাবিদ্যার বিবরণ দেওয়া যাইতেছে ; ইনি অতি সূক্ষ্ম কৃষ্ণফুল শ্বেতাম্বর পরিহিতা ; আলুলায়িতকেশা ; ইঁহার বক্ষস্থলের অর্ধভাগ আচ্ছাদিত, অর্ধভাগ অনাবৃত ; হস্তে ডায়মনকাটা বালা, তাহে উজ্জ্বল রসান ; পদে ডায়মনকাটা মল, তাহে নকাশিপুটে ; দক্ষিণ হস্তে সেই আলুলায়িত ঈষৎ সিক্ত কুন্তলরাশি কুলাইতেছেন ; ও বিকৃত বিকট কটাক্ষক্ষেপ করিতেছেন। চিত্রকর প্রতিমূর্তির সুনাসায়, সুনথে গজমতি পরাইয়াছে ; সুচিকন বস্ত্র ভেদ করিয়া গৌরাঙ্গীর গৌর কান্তি ফুটাইতেছে ; গুচ্ছ গুচ্ছ কেশের সহিত দেবীর অঙ্গুলিগুলি কৌশলে চিত্রিত করিয়াছে।

আমাকর্তৃক এই প্রতিমার প্রতিষ্ঠা হয় নাই—ইহা জানিয়াই হউক, অথবা আমি বঙ্গদর্শনে লিখিতে অভ্যাস করিতেছি বলিয়াই হউক, আমার উন্নত-রুচি বন্ধুবর্গ আর এখন বড় রুচিবিষয়ে বাদানুবাদ করেন না। একজন আগন্তুক কেবল একদিন বলিয়াছিলেন যে "এসকল বড় ভাল নহে।" তিনি প্রস্থান করিলে পর শুনিলাম তিনি একজন স্কুলমাস্টার ; তাঁহার কথায় আর বড় আস্থা হইল না। আস্থা করি আর না করি, আমি কিন্তু সেই পূর্বস্থাপিত পৌরাণিকী ছিন্নহস্তা আর এই আধুনিকী ছিন্নশীলার মধ্যে বড় প্রভেদ দেখিতে পাই না।

একটি বিলাতী মহাবিদ্যার কথাও বলি। ইনি অপরাজিতা—পুষ্পাভাক্ষী ; ইঁহার বক্ষ অর্ধাবৃতা ; ইনি বেণীবদ্ধকেশা ; ইঁহার রক্তাভ কপোল ; যুগ্ম ভ্রূ, উৎসঙ্গে একটি বহুরোমশ মার্জার ; বিলাতী আসনে আসীনা ; আসনের এক পার্শ্বে একটি কুকুর অর্ধোত্থিত ভাবে দেবীর বস্ত্রাঞ্চল কর্ষণ করিতেছে ; ক্রোড়স্থিত বিড়ালের প্রতি আক্রমণ করিতে ব্যগ্র হইয়াছে ; দেবী বিড়ালকে বাম হস্তে অভয় প্রদান করিয়া, দক্ষিণ হস্তের তর্জনী প্রদর্শন করিয়া সারমেয়কে ভ্রূকুটি ভাবে যেন বলিতেছেন, "তিষ্ঠ" ; আলেখ্যের নিম্নদেশে ইংরাজীতে লেখা আছে "বিবাদ"। এইসকল বিলাতী চিত্রের আমি সম্পূর্ণ রসজ্ঞ নহি ; বরং পৌরাণিকী কমলাত্মিকা বা রাজরাজেশ্বরীর প্রতি অধিকতর শ্রদ্ধা হয় ;

তবে দেশীয় চিত্রের সহিত বিলাতীর তুলনায় বিলাতীয়েরই প্রশংসা ও গৌরব করিতে হয়।

যাহা হউক, এই সকল আধুনিকী মূর্তি এক্ষণে বসিবার গৃহে অধিষ্ঠান করেন। পৌরাণিকী দশমহাবিদ্যা আমার শয়নাগারে অন্তঃপুরে স্থান পাইয়াছেন।

দশমহাবিদ্যা আমার শয়নাগারে আছেন ; আমি রাত্রির অল্পালোকে তাঁহাদিগকে দেখিতে পাই ; বালসূর্যের কিরণপাতে তাঁহাদিগকে দেখিয়া নিদ্রাভঙ্গ হয় ; ধূমাবতী আমার সম্মুখে থাকেন ; ছিন্নমস্তাকে পশ্চাতে রাখিয়াছি। এই সকল দেখিয়া দেখিয়া এক্ষণে খেয়াল দেখিতেছি ; যদি আমার মতিভ্রম হয়, আমার রুচি সংশোধনকারিগণ দায়ী হইবেন।

আমার বোধ হয় যে এই ভারতবর্ষের দশ দশাই দশমহাবিদ্যা। এক্ষণে সপ্তমী দশা চলিতেছে, সেই দশার প্রতিমূর্তিই ধূমাবতী মূর্তি।

প্রথম দুই দশায় কালী ও তারা মূর্তি। আর্য্য-দস্যুবিবাদ লইয়া যখন ভারতবর্ষ প্রত্যহ রক্তে স্নান করিত, এ সেই তখনকার মূর্তি। তখনই ভারতবর্ষ অনার্য জাতিদিগের জন্য "সদ্যশ্ছিন্ন শিরঃ খড়্গ বামাধোর্ধ করাম্বুজা" আবার তখনই আর্যদিগের প্রতি "অভয়ং বরদাঞ্চৈব দক্ষিণাধোর্ধপাণিকা"। তখন ভারত দস্যুশোণিতপ্লাবিত ; "শিবাভির্ঘোররাবাভিশ্চতুর্দিক্ষুসমন্বিতা"। ভারতের ভীম নৃশংসতাই কালী ও তারা মূর্তি,—তখনই ভারতমাতা করালবদনা, ঘোর মহামেঘপ্রভা, মুক্তকেশী, "কণ্ঠাবসক্ত মুণ্ডালী, গলদ্রুধিরচর্চিতা, ঘোররাবা, মহারৌদ্রী"। তখনই ভারতক্ষেত্র অনার্যগণের জন্য অনন্ত চিতাস্বরূপ, তাহাতেই—তারার ধ্যানে বলা হইয়াছে যে "জ্বলচ্চিতা মধ্যগতা, ঘোর দংষ্ট্রা করালিনী। সাবেশ স্মেরবদনা স্ত্রল্যঙ্কারবিভূষিতা ॥"

এই গেল ভারতের প্রথমাবস্থা, তাহার পর ষোড়শী, ভুবনেশ্বরী দুই মূর্তি। তখন আর পূর্বের ভাব নাই। সে নৃশংসতা বিদূরিত হইয়াছে ; কিন্তু যুদ্ধস্পৃহা এখনও যায় নাই।

এখন দেবী আর মুণ্ডমালা, কলকাঞ্চীবিভূষিত হইয়া, খড়্গ কাতি ধারণ করিয়া, ঘোর অট্টহাসে ভূমিকম্প, হৃৎকম্প সম্পাদন করেন না বটে, কিন্তু তথাপি রাজরাজেশ্বরী মূর্তিতে—

রক্তবর্ণা ত্রিনয়না ভালে সুধাকর।
চারিহাতে শোভে পাশাঙ্কুশ ধনুঃশর ॥"

এখন ভারত-সিংহাসনের দেবতারাই মূল। হস্তে পাশাঙ্কুশ ধনুঃশর।

পাশাঙ্কুশ শাসনাস্ত্র ; ধনুর্বাণ যুদ্ধাস্ত্র ; ভারত এক্ষণে রাজ্ঞী, কিন্তু যুদ্ধার্থিনী। কিন্তু পরেই ভুবনেশ্বরী মূর্তিতে দেখুন,

"রক্তবর্ণা সুভূষণা আসন অম্বুজ।
পাশাঙ্কুশ বরাভয়ে শোভে চারি ভুজ ॥

সেই পাশাঙ্কুশ আছে কিন্তু সে ধনুর্বাণ পরিত্যাগ করিয়াছেন। এখন রাজ্ঞী অভয়দানে সকলকে তুষ্ট করিতেছেন। এক্ষণে ভারত, রাজ্ঞী; এক্ষণে ভারত, শান্তি। এটি বড় সুন্দর মূর্তি। ভারতমাতা তখন যথার্থই ভুবনেশ্বরী।

তাহার পর তন্ত্রশাস্ত্রের প্রাদুর্ভাব। তান্ত্রিক যোগের সৃষ্টি। ভারত অধঃপাতে যাইবেন তাহারই সূচনা হইতেছে। ভারত আর রাজ্ঞীরূপে পাশাঙ্কুশ ধরিতে ইচ্ছা করেন না। তাহাতেই এক্ষণে

অক্ষমালা পুঁথি বরাভয় চারিকর
ত্রিনয়ন অর্ধচন্দ্র ললাট উপর ॥

পূর্বের বরাভয় আছে কিন্তু পাশাঙ্কুশের পরিবর্তে পুথি অক্ষমালা লইয়াছেন। ভারতে সংস্কৃত গ্রন্থের এই সময়ে অত্যন্ত আড়ম্বর, যোগের জপের বড়ই আড়ম্বর, তাহাতেই ভারতমাতা অক্ষমালা করে গ্রহণ করিয়াছেন; শুদ্ধ অক্ষমালা লইয়াই ক্ষান্ত নহেন; এখন

'রক্তবর্ণা চতুর্ভুজা কমল-আসনা।
মুণ্ডমালা গলে নানা ভূষণ-ভূষণা ॥'

"মুণ্ডমালা গলে" তান্ত্রিক শবসাধনা আরম্ভ হইয়াছে। ভারত উচ্ছিন্ন যায়, আর বিলম্ব নাই। তান্ত্রিক ভাবের ভারতের এই মূর্তি; এখন আর ভারত রাজ্ঞী নহেন—ভারত যোগিনী, ভারত ভৈরবী। এই ভৈরবীদশায় যত কেন অমঙ্গল হউক না, বহুল সংস্কৃতচর্চা হইয়াছিল; নানা তন্ত্রের সৃষ্টি হয়; সেই সকল তন্ত্রে মগধ, মিথিলা, বঙ্গ, মহারাষ্ট্র প্রভৃতি দেশ অদ্যাপি আকুল করিয়া রাখিয়াছে।

ষষ্ঠীদশায় তন্ত্রপ্লাবন। ছিন্নমস্তা মূর্তি। স্বার্থপরতা ও স্বার্থশূন্যতা উভয় যোগ নিষ্পন্না কঠোর বাতুলতা; নৃশংসতা; শোণিতস্পৃহা; কুৎসিত কামপ্রবৃত্তি; নির্লজ্জতা; এইগুলি এ মূর্তির সমবায়ী কারণ। ইহার সংস্কৃত ধ্যান সংস্কৃতই থাকুক।

জবাকুসুমশঙ্কাশং রক্তবন্ধুকসন্নিভং।

* * * *

মধ্যেতুতাং মহাদেবীং সূর্যকোটিসমপ্রভাং।
ছিন্নমস্তাং করে বামে ধারয়ন্তীং স্বমস্তকং ॥
প্রসারিতমুখীং দেবীং লেলিহানাগ্রজিহ্বিকাং।

পিবন্তীং রৌধিরীং ধারাং নিজকণ্ঠবিনির্গতাং ॥
বিকীর্ণকেশপাশাঞ্চ নানাপুষ্পসমন্বিতাং।
দক্ষিণে চ করে কর্ত্রীং মুণ্ডমালাবিভূষিতাং ॥
দিগম্বরীং মহাঘোরাং প্রত্যালীঢ় পদেস্থিতাং।
অস্থিমালা ধরাং দেবীং নাগযজ্ঞোপবীতিনীং ॥

দেবীর সহচরী ডাকিনী বর্ণিনীর মূর্তিও ঐরূপ ভয়ানক।

দেবীগলোচ্ছলদ্রক্তধারাং পানং প্রকুর্বতীং।
বর্ণিনীং লোহিতাং সৌম্যাং মুক্তকেশীং দিগম্বরাং ॥
কপালকর্তৃকাহস্তাং বামদক্ষিণ যোগতঃ।
নাগযজ্ঞোপবীতাঢ্যাং জ্বলত্তেজোময়ীমিব ॥
প্রত্যালীঢ় পদাং দিব্যাং নানালঙ্কারভূষিতাং।
সদা দ্বাদশবর্ষীয়াং অস্থিমালাবিভূষিতাং ॥
ডাকিনীং বামপার্শ্বেতু কল্পসূর্যান লোপমাং।
বিদ্যুজ্জটাত্রিনয়নাং দন্তপংক্তি বলাকিনীং ॥
দংষ্ট্রা করালবদনাং * * *
মহাদেবীং মহাঘোরাং মুক্তকেশীং দিগম্বরাং ॥
লেলিহানমহাজিহ্বাং মুণ্ডমালাবিভূষিতাং।
কপালকর্তৃকাহস্তাং বামদক্ষিণ যোগতঃ ॥
দেবী গলোচ্ছলদ্রক্তধারাপান প্রকুর্বতীং।
করস্থিত কপালেন ভীষণেনাতিভীষণাং ॥

ভারতমাতা আপনার মুণ্ড আপনি কাটিয়াছেন, ভারতসঙ্গিনীরা সেই রক্ত পান করিতেছে; উন্মত্তা জ্ঞানহীনা ভারতমাতা আপনিও সেই রুধিরধারা গলাধঃকরণ করিতেছেন; ভৈরবীদশায় ভারত জপে বসিয়াছিলেন; এখন ভারত উচ্ছিন্ন হইয়াছেন। কুৎসিত কামপ্রবৃত্তির উপর ভারতমাতা নৃত্য করিতেছেন। আপনার শোণিতে আপনি মাতোয়ারা হইয়া নৃত্য করিতেছেন; লজ্জাহীনা নৃত্য করিতেছেন; মস্তকচ্ছিন্না নৃত্য করিতেছেন; জ্ঞানচ্ছিন্না নৃত্য করিতেছেন; কি ভয়ানক নৃত্য; উন্মত্ততা নৃশংসতা একত্র হইলে কি ভয়ানক ভাব হয় !!! ভারতমাতার এই ভাব ! আর দেখিতে পারি না।

ভারতের কি এইবার সব ফুরাইল ? ভারত নাম কি পৃথিবী হইতে লুপ্ত হইল ? যবনশাসনে কি ভারতবর্ষীয়েরা যবনত্ব প্রাপ্ত হইবে ? ছিন্নমস্তা কি দশমহাবিদ্যার শেষ বিদ্যা। না—দেবতারা মরেন না। ভারতমাতাও

মরেন না। যবনের পর ইংরাজ আসিয়াছে, ভারতের পুনরুদ্ধারের চেষ্টা করিতেছে; ভারতকে জীবিত করিয়াছে; কিন্তু জীবিত করিয়াছে মাত্র; তেজোদান করিতে পারে নাই—ভারত জীর্ণ, ভারত শীর্ণ, ভারত মলিন, ভারত ক্ষুধায় আকুল, ভারত চিন্তায় ব্যাকুল। ভারতের এক হাতে কুলা; আর হাতে মালা। পূর্বেই বলিয়াছি ভারতমাতার এক্ষণে ধূমাবতীর দশা। ভারতমাতা এক্ষণে—

বিমুক্তকুন্তলা রূক্ষা বিধবা বিরলদ্বিজা।
কাকধ্বজরথরূঢ়া বিলম্বিত * * ॥
সূর্প হস্তাতি রূক্ষাক্ষা ধৃতহস্তবরান্বিতা।
প্রবৃদ্ধঘোণাতু ভৃশং কুটিলা কুটিলেক্ষণা ॥

বিধবা ভারতের পেটে অন্ন নাই, গায়ে বস্ত্র নাই; রুক্ষকেশা, রুক্ষাক্ষ্যা; দন্ত বিরল হইয়াছে; শোকে তাপে দৃষ্টি কুটিল হইয়াছে, যেন সকল আশ্রয় পরিচ্যুতা হইয়া পুরাতন ভগ্নযান রথে গিয়া আশ্রয় লইয়াছেন; হায়! সেই রথের উপরি কাক বসিতেছে। বড় কুলক্ষণ; ভয়ে ভারত কাঁপিতেছেন, কাঁপিতে কাঁপিতে সেই কম্পিত হস্তে ভঙ্গী করিয়া বলিতেছেন, "আমায় রক্ষা কর, আমি দেবী এক্ষণে অনাথা, রক্ষা কর, তোমার মঙ্গল হইবে।" উদ্ধত ইংরাজ শাসনকর্তা! একবার স্থিরচিত্তে এই মূর্তির ধ্যান কর। একবার চারিদিকে চাহিয়া দেখ। দেখ দেখি সোনার পুরী কি হইয়াছে? ভুবনেশ্বরী এখন পথের কাঙ্গালিনী হইয়াছেন। কাঙ্গালিনীকে দেখিয়া তোমার দুঃখ হয় না? তুমি মনুষ্য, অবশ্যই দুঃখ হয়। তবে এই সময় দুঃখে দুঃখে দুঃখীদিগের জন্য ঐ দুঃখিনীর সন্তানগণের জন্য কিছু ব্যথার ব্যথী ব্যবস্থা কর দেখি।

এখনও আমার জাগ্রত স্বপ্ন ভঙ্গ হয় নাই, আমার এখনও আশা হইতেছে যে ভারতমাতা আবার বগলামূর্তিতে দেখা দিবেন।

ইংরাজ অনুকম্পায় ভারতেব বৈরিপক্ষ ভারতের করকবলগত হইবে; ভারতমাতা আবার রত্নগৃহে রত্নসিংহাসনে অধিষ্ঠিতা হইবেন, ভারতমাতা আবার সুভূষণে ভূষিতা হইবেন। এমন দিন হইবে। ভারতবাসিগণ, আইস সকলে আমার সঙ্গে একস্বরে একবার সেই মূর্তির ধ্যান কর;

মধ্যে সুধাব্ধিমণিমণ্ডপরত্নবেদীসিংহাসনোপরিগতাং পরিপীতবর্ণাং।
পীতাম্বরাভরণমাল্যবিভূষিতাঙ্গীং দেবীং স্মরামি ধৃতমুদ্গরবৈরিজিহ্বাং ॥
জিহ্বাগ্রমাদায় করেণ দেবীং বামেন শত্রুং পরিপীড়য়ন্তীং।
গদাভি ঘাতেন চ দক্ষিণেন পীতাম্বরাঢ্যাং দ্বিভুজাং নমামি ॥

বগলা সিদ্ধবিদ্যার মন্ত্রে সকলে সিদ্ধ হইবার উপায় অবলম্বন কর; বগলা

দেবীই তোমাদের ইষ্ট দেবতা হউন ; হৃদয়পটে তোমরা এই দেবীর মূর্তিই চিত্রিত করিয়া রাখ।

ইহার পরেই ভারতের মাতঙ্গী মূর্তি। ভারতমাতা আপনার চিরপরিচিত দয়ার বশবর্তিনী হইয়া সেই করকবলিত শত্রুকে বিমুক্ত করিয়াছেন; আত্মরক্ষার্থে খড়্গ চর্ম ধারণ করিয়াছেন ; শাসনাস্ত্র পাশাঙ্কুশ পুনর্বার গ্রহণ করিয়াছেন ; রত্ন পদ্মাসনে রক্তবস্ত্র পরিধান করিয়া বিরাজ করিতেছেন। ভারতমাতা বহুকাল এ ভার গ্রহণ করিয়া থাকিতে পারিবেন না। তিনি ইহার পরেই মহালক্ষ্মীরূপে ভবে দেখা দিবেন,—

"সুবর্ণ সুবর্ণ বর্ণ আসন অম্বুজ।
দুই পদ্ম বরাভয়ে শোভে চারি ভুজ॥
চতুর্দন্ত চারিশ্বেত বারণ হরিষে।
রত্ন ঘটে অভিষেকে অমৃত বরিষে॥

ভারতমাতার যুগযুগান্তরের মলরাশি শ্বেতহস্তিগণ অমৃতবারিসিঞ্চনে বিধৌত করিয়া দিতেছে। ভারতমাতা অস্ত্র শস্ত্র পরিত্যাগ করিয়াছেন ; পদ্মাসনে পদ্মাসনা পদ্মহস্তে জগতে অভয় দান করিতেছেন। আহা কি শুভদিন! শরীর রোমাঞ্চ হয়। সকলে একবার আনন্দজয়ধ্বনি কর।

ভারতমাতার অভিষেক হইতেছে। মাতা, যোগিনী মূর্তি, রাজ্ঞী মূর্তি, এমন যে ভুবনে অতুলা ভুবনেশ্বরী মূর্তি, মাতা তাহা গ্রহণ করেন নাই; মা এখন মহালক্ষ্মী ভাবে শোভা পাইতেছেন ; সকলে জয়ধ্বনি কর। * * *

তাহাতেই বলিতেছিলাম, আমার বুঝি মতিভ্রম হইয়াছে। ভারতমাতা মহালক্ষ্মী মূর্তি কতশত বৎসর পরে ধারণ করিবেন, আমি এখনই জয়ধ্বনি করিতে বসিলাম! সম্মুখে কি দেখ দেখি—ঐ দেখ মাতার সেই ভগ্নযান রথোপরি কাক বসিয়া আছে ; ডাকিতেছে ক-অ-অ-অ, ক-অ-অ-অ দেবীর ক্ষুৎপিপাসার্দিত ভ্রূকুটিপাতে অন্তর্দাহ হয় ; আর সহিতে পারি না।

মাতর্বগলে আবিরাবিঃ।

আশ্বিন ১২৮০

৫ / চরিত-প্রসঙ্গ

দেবীবর ঘটক ও যোগেশ্বর পণ্ডিত

(মেলবন্ধন ও তাহার সময় নিরূপণ। আনুষঙ্গিক তাৎকালিক সামাজিক অবস্থা)

এরূপ জনশ্রুতি প্রচলিত আছে যে দেবীবর ঘটক ও যোগেশ্বর পণ্ডিত এক-জনের দৌহিত্র। তদনুসারে এই দুইজন পরস্পর মাসতুত ভাই। যোগেশ্বর কুলীনপুত্র। দেবীবর বংশজগোষ্ঠীসম্ভূত। সুতরাং সমাজমধ্যে দেবীবর অপেক্ষা যোগেশ্বর পণ্ডিতের মর্যাদা অধিক। যোগেশ্বর মুখ-বংশে জন্মগ্রহণ করেন। তিনি নানা শাস্ত্রে পণ্ডিত ছিলেন। নানাদেশীয় ছাত্রগণকে নানা শাস্ত্র অধ্যাপনা করাইতেন। সেইজন্য তাঁহার উপাধি পণ্ডিত হয়। যোগেশ্বর সম্বন্ধে এক প্রবাদ আছে যে, তিনি অত্যন্ত আতিথেয়ী ছিলেন। নিজের দান অতি সঙ্গোপনে নির্বাহ করাই তাঁহার ব্যবস্থা ছিল। তাঁহার বদান্যতার বিষয় আপামর সাধারণের শ্রুতিগোচর ছিল না।

যোগেশ্বর পণ্ডিত এক সময়ে যদৃচ্ছাপ্রবৃত্ত হইয়া দেশভ্রমণে নির্গত হন। দৈবগত্যা একদিন ভ্রমণ উপলক্ষে মধ্যাহ্নে দেবীবরের ভবনে উপস্থিত হইলেন। যোগেশ্বরের আগমনবার্তা শ্রবণে দেবীবরের জননী শশব্যস্তে দ্রুতপদে আসিয়া যথাবিহিত স্নেহসম্ভাষণ পুরঃসর অভিনন্দন ও অভ্যর্থনা করিলেন। যোগেশ্বর বিনম্রবচনে অতি নম্রভাবে তদীয় মাতৃষ্বসার শ্রীচরণ বন্দনা করিলেন। তিনিও যথাবিহিত আশীর্বচন প্রয়োগপূর্বক যোগেশ্বরকে কহিলেন, "বাছা, জলপান কর, আমি তোমার জন্যে অন্নাদি প্রস্তুত করিতে যাই।"

যোগেশ্বর তদীয় মাতৃষ্বসার সেই কথা শুনিয়া উত্তর করিলেন, "মাসি, আমার মাতামহ আপনাকে যে কুলে সম্প্রদান করিয়াছেন, আমরা সে কুলে পদপ্রক্ষালনও করি না। অতএব আপনি আহারের জন্য আমায় বিশেষ অনুরোধ করিবেন না। আপনি মাসি, আপনার অন্ন পরিত্যাগ করিয়া আপনার বাটীতে স্বপাকে ভোজন করিলে গুরুজনের প্রতি অবজ্ঞা করা হয়। তাহাতে পাতক জন্মে। এবং মাসতুত ভাই দেবীবরের গৃহে ভোজন করিলে

সেইদিনই ভারতে বৌদ্ধধর্মের সূত্রপাত হইয়াছে। বিভিন্ন স্থানে ভিন্ন ভিন্ন অগ্নি প্রজ্বলিত হইতেছিল। মহাত্মা শাক্যসিংহ সেই সকল অগ্নি একত্রিত করিয়া, তাহাতে নবীন আহুতি দিয়া, যে অগ্নি জ্বালিলেন তাহা সমুদয় ভারত, সমুদয় আসিয়া আলোকিত করিল।

এই সকল প্রাচীন ঐতিহাসিক তত্ত্ব অনুসন্ধান করিয়া আমরা কোনমতে চৈতন্যদেব কর্তৃক বঙ্গসমাজের পরিবর্তন হঠাৎ অর্থাৎ কোন বিশেষ কারণমূলক নহে একথা বলিতে পারি না। দৃষ্টিনিরপেক্ষ যুক্তিতে ও অতীত কালের দৃষ্টান্তে যাহা যুক্তিযুক্ত বোধ হইতেছে, বঙ্গসমাজের ইতিহাস অনুসন্ধান করিলেও তাহাই জাজ্বল্যমান প্রমাণিত হইবে। এই আন্দোলনের কারণও বহুকাল হইতে সঞ্চিত হইতেছিল।

সাধারণতঃ লোকে মনে করিয়া থাকে, চৈতন্যদেব কেবলমাত্র ধর্মসংস্কার করিয়াছিলেন। তাঁহার জন্মের পূর্বে বঙ্গদেশ কখন বা জ্ঞানকাণ্ড-কখন বা কর্মকাণ্ড-প্রধান হইয়াছিল; কিন্তু তিনি বঙ্গের সমুদয় নগরে নগরে, গ্রামে গ্রামে, পল্লীতে পল্লীতে ভক্তির বীজ বপন করিয়াছিলেন। সত্য বটে, ভক্তি-মাহাত্ম্য প্রচারই চৈতন্যদেবের মুখ্য উদ্দেশ্য ছিল, কিন্তু তাঁহার প্রতিভা বঙ্গের কি সামাজিক অবস্থা, কি সাহিত্য, কি গার্হস্থ্য সকল বিষয়কেই নব আলোক ও নব জীবনে রঞ্জিত করিয়াছিল। জাতিভেদ রহিত, অসবর্ণে বিবাহ, ভ্রাতৃভাব সংস্থাপন, বিধবাবিবাহ প্রভৃতি যে সমুদয় সামাজিক পরিবর্তনের জন্য* ঊনবিংশ শতাব্দীর সংস্কারকগণ সর্বদা চীৎকার ও অনেক "টেবল থাবড়াইয়াও" সত্য বলিলে, কিছুই করিতে পারিতেছেন না; চৈতন্য এ সকল কর্তব্য বিশেষের জন্য কিছুমাত্র যত্ন না করিয়া একমাত্র ধর্মপ্রচার দ্বারা অনেকাংশে কৃতকার্য হইয়াছিলেন।

চৈতন্যদেব কর্তৃক বঙ্গসমাজের আন্দোলন ধর্মমূলক হইয়াও কেবল মাত্র ধর্মসম্বন্ধীয় আন্দোলন নহে। এইজন্য উক্ত আন্দোলনের কারণ অনুসন্ধান করিতে হইলে বঙ্গসমাজের সকল শাখাপ্রশাখার অবস্থাই পর্যালোচন আবশ্যক।

খ্রীষ্টিয় ত্রয়োদশ শতাব্দীর প্রারম্ভে বঙ্গীয় আর্যোপনিবেশীদিগের স্বাধীনতা-সূর্য অস্তে যায়। শেষ রাজা লক্ষ্মণ সেন হিন্দুধর্মাবলম্বী ছিলেন। মন্ত্রী, সেনাপতি, রাজকর্মচারী, সৈনিক পুরুষ প্রভৃতি অনেকেই হিন্দু ছিলেন। দাস রাজের সেনাপতি বখ্‌তিয়ার বঙ্গে প্রবেশ করিলে, রাজসভাসদ্ ব্রাহ্মণ পণ্ডিতগণ শাস্ত্রোদ্‌ঘাটন করিয়া রাজাকে বলিলেন, "বঙ্গে যবনাধিকার অনিবার্য

* ইহার সকলগুলিনকে আমরা প্রকৃত উন্নতি জ্ঞান করি না, এই জন্য উন্নতি আখ্যা প্রদান না করিয়া পরিবর্তন মাত্র বলিলাম। —গ্রীকৃ

যেহেতু শাস্ত্রে লেখা আছে।" বখ্‌তিয়ার ১৭ জন মাত্র অশ্বারোহী লইয়া রাজধানী প্রবেশ করিয়াছিলেন। কিন্তু তাহাতে কি হইবে, শাস্ত্রের বচন অখণ্ড্য। রাজা যুদ্ধ করিলে নিশ্চয় পরাজয় হইবে স্থির বুঝিয়া বিজ্ঞের কার্য করিলেন—সিংহাসন পরিত্যাগ করিয়া, রাজধানী পরিত্যাগ করিয়া, সপরিবারে পলায়ন করিলেন। আজন্ম অশীতি বৎসর রাজত্ব করিয়া রাজত্বের প্রতি মমতা এতাধিক! বঙ্গদেশাধিপতির এত বীর্য ও তেজস্বিতা! পৃথিবীর ইতিহাস অনুসন্ধান করিলে এরূপ হাস্যজনক রাজপরিবর্ত আর প্রায় দেখা যায় না। যে দেশে এত নিস্তেজ ও আত্মাভিমানশূন্য রাজা নিরাপদে রাজত্ব করিতে পারেন, তথাকার অধিবাসিগণ কত দুর্বলপ্রকৃতি ও অভিমানশূন্য তাহা সহজেই অনুমান করা যায়।

তেজস্বিতাশূন্য জাতির উচ্চাভিলাষ বা ঐহিক মানসম্ভ্রমের প্রতি বিশেষ আস্থা নাই, পক্ষান্তরে মানবমন কদাপি নিশ্চেষ্ট থাকিতে পারে না। এই জন্য যে মনুষ্যের অথবা যে জাতির মান সম্ভ্রম প্রভৃতি বীরজনোচিত গুণ না থাকে তাহারা স্বতঃই ধর্মপরায়ণ অথবা সামাজিক আন্দোলনপ্রিয় হইয়া উঠে। বঙ্গদেশের ইতিহাস পর্যালোচনা করিলে কৌলীন্যপ্রথা প্রচলন, বৌদ্ধধর্ম প্রচার, বৌদ্ধধর্ম দূরীকরণে তান্ত্রিক মত প্রচার, বৈষ্ণবধর্ম প্রচার, ব্রাহ্মধর্ম প্রচার প্রভৃতি ইহার ভূরি ভূরি দৃষ্টান্ত পাওয়া যায়।

১২০৬ খ্রীষ্টাব্দের অব্যবহিত পরেই বঙ্গদেশ যবন-শাসনাধীন হইল। এই সময়ে কঠোর ব্রাহ্মণ্য ধর্ম লোকের পদকে দৃঢ় নিগড়ে আবদ্ধ করিয়া রাখিয়াছিল। ব্রাহ্মণ নামে ধর্মযাজক কিন্তু কার্যে সর্বেসর্বা। বিদ্যা তাঁহার, বুদ্ধি তাঁহার, ভোগ তাঁহার, ক্ষমতা তাঁহার, মান তাঁহার, সমুদয় দান তাঁহার, নিমন্ত্রণে অগ্রে আহার তাঁহার, ধর্ম তাঁহার, ঈশ্বর তাঁহার। শূদ্র তাঁহার দাস, বৈশ্য তাঁহার কৃষক, বৈদ্য তাঁহার চিকিৎসক। এরূপ উপদ্রব লোকে কয়দিন সহ্য করিতে পারে? নিতান্ত অক্ষম না হইলে কে চিরকাল কাহার দাস হইয়া থাকিতে বাসনা করে? এতদিন কতক ধর্মশাসনে ও কতক রাজশাসনে ব্রাহ্মণগণ আপনাদের কার্য সিদ্ধ করিয়াছেন। কিন্তু রাজপরিবর্ত হইল। যবন সিংহাসনাধিরূঢ় হইল। আর সে প্রাধান্য কোথায়? লোকের মন বহুকাল যে নিগড়ে আবদ্ধ ছিল, রাজবল দূর হইলে, আপনা হইতে তাহা ভাঙ্গিতে উদ্যত হইল। হিন্দুধর্ম ক্রমশঃ নিস্তেজ হইতে লাগিল। জাতিভেদের বন্ধন শিথিল হইল। ব্রাহ্মণ শূদ্র অনেকাংশে সমান হইল। তখন বঙ্গবাসিগণ দেখিল পৃথিবী কেবল তাহাদিগের দৃষ্টিমধ্যগত নহে—ইহার আরও অনেক বিস্তৃতি আছে—এমন অনেক লোক আছে যাহারা তাঁহাদিগের ন্যায় পরলোকের

চিন্তা করে কিন্তু ধর্মশাস্ত্রের দ্বারা তেমন জ্বালাতন হয় না, ধর্মের জন্য ঐহিকের সুখে একেবারে জলাঞ্জলি দেয় না, প্রতি পাদবিক্ষেপে—আহারে, বিহারে, শয়নে, উত্থানে, প্রতি মুহূর্তে শাস্ত্রের ব্যবস্থা লইয়া চলে না, স্বেচ্ছানুরূপ অনেক সুখ সম্ভোগ করিতে পারে অথচ পরলোকের হানি হয় না। এই সকল দেখিয়া কেহ কেহ প্রকাশ্যে ইস্‌লাম ধর্মে দীক্ষিত হইল এবং পরোক্ষে জনসাধারণের অনেকে ক্রমশঃ স্বধর্মের প্রতি গতরাগ হইয়া ইস্‌লাম ধর্মের সত্যবিশেষের পক্ষপাতী হইতে লাগিল।

যবনাধিকারে বঙ্গদেশে যেমন এই সুফল উৎপন্ন হইয়াছিল, সেইরূপ আবার তাহাদিগের বিলাসপ্রিয়তা, সুখলিপ্সা ও ব্যভিচার অনেক পরিমাণে লোককে পাপে প্রবর্তিত করিয়াছিল।

একদিকে জাতিভেদ রহিত ও বিলাসবাসনার চরিতার্থতা এবং অপর-দিকে আর্যজাতির বহুকালবর্ধিত ঈশ্বরস্পৃহা, পরলোকভীতি যখন মনুষ্যের মনকে আকর্ষণ করিতেছিল তখনই তন্ত্রের* মত ক্রমশঃ উদ্ভূত হইল। ষোড়শ শতাব্দীর কিছু পূর্বে সর্ববিদ্যা† উপাধিধারী জনৈক ব্রাহ্মণ পূর্ববঙ্গে আবির্ভূত হইয়া অসাধারণ ক্ষমতা ও পাণ্ডিত্যবলে বঙ্গদেশের অনেক স্থলে তন্ত্রের মত প্রচার করিলেন। তন্ত্র যদিও হিন্দুধর্মের অন্তর্গত শিবের উক্তি বলিয়া প্রচলিত হইয়াছিল, কিন্তু এ বিষয় নিঃসংশয়ে বলা যাইতে পারে, তন্ত্রোক্ত আবরণ দ্বারা ব্রাহ্মণ্য ধর্মের বন্ধন অনেক পরিমাণে শিথিল হইয়াছিল; এবং ব্রাহ্মণ্য ধর্মের বন্ধন কথঞ্চিৎ শিথিল না হইলে তন্ত্র কখন রচিত হইতে পারিত না।—

প্রবৃত্তে ভৈরবীচক্রে সর্বে বর্ণাদ্বিজোত্তমাঃ।
নিবৃত্তে ভৈরবীচক্রে সর্বে বর্ণাঃ পৃথক্ পৃথক্॥

ইত্যাকার তন্ত্রোক্ত-বচনোচিত আচরণ যে জাতিভেদপ্রথার মূলে কুঠারাঘাত করিয়াছিল এবং ইত্যাকার বচন যে জাতিভেদপ্রথা কথঞ্চিৎ শিথিল না হইলে রচিত হয় নাই, এ কথাতে কে সন্দেহ করিবে?

সামাজিক পরিবর্ত ক্রমশঃ ও অননুভূত। মনুষ্য হঠাৎ চির-অভ্যস্ত প্রথার বিপরীত আচরণ করিতে বা চিরসংস্কারের বিপরীত বিশ্বাস করিতে প্রস্তুত নহে। অদ্য আমার যে আচরণ বা সংস্কার আছে, আমার বিজ্ঞতা অনুযায়ী অল্প অধিক বা অনেক অধিক দিবসে তাহা পরিবর্তিত হইতে পারে। সুতরাং তন্ত্রের দ্বারা জাতিভেদপ্রথা কিয়ৎ পরিমাণে শিথিল না হইলে চৈতন্য কদাপি

* অবশ্য এ স্থলে মহানির্বাণতন্ত্রের বিষয় বিবেচনা করা যাইতেছে না।
† ইঁহার নাম আমরা অনুসন্ধান করিয়া জানিতে পারি নাই।

এক জীবনে আচণ্ডাল* ব্রাহ্মণকে আলিঙ্গন করিতে পারিতেন না এবং

চণ্ডালোঽপি মুনিশ্রেষ্ঠো হরিভক্তিপরায়ণঃ।
হরিভক্তিবিহীনস্তু দ্বিজোঽপি শ্বাপদাধমঃ॥

এইরূপ পুরাণোক্ত বচন কার্যে পরিণত করিতে পারিতেন না।

যদিও বঙ্গদেশের শেষ রাজা লক্ষ্মণ সেন হিন্দুধর্মাবলম্বী ছিলেন, কিন্তু অনতিদীর্ঘকাল পূর্বে বৌদ্ধধর্মাবলম্বী পালবংশীয় নরপতিগণ বঙ্গের সিংহাসনাধিরূঢ় ছিল। ইহাদিগের রাজত্বকালে বৌদ্ধধর্ম সমধিক প্রাধান্য লাভ করিয়াছিল। হিন্দুধর্ম এতদূর নিস্তেজ ও নিষ্প্রভ হইয়াছিল যে, পরবর্তী সেনবংশীয় আদিভূপতি আদিশূর কোন যাজ্ঞিক কার্যের অনুষ্ঠানের জন্য কান্যকুব্জ হইতে বেদজ্ঞ ব্রাহ্মণ আনয়ন করিতে বাধ্য হইয়াছিলেন। কুলকালিমার গ্রন্থকার ও আধুনিক কোন কোন পণ্ডিত বল্লাল সেন প্রভৃতি সেনবংশীয় কোন কোন ভূপতিকে বৌদ্ধধর্মাবলম্বী বলিয়া বর্ণনা করেন। বল্লাল বৌদ্ধধর্মাবলম্বী ছিলেন কিনা—তদ্বিষয়ে অনুসন্ধান করার আবশ্যক নাই। "তিনি বৌদ্ধধর্মাবলম্বী ছিলেন" ইহার কথঞ্চিৎ প্রমাণ থাকাতেই অনুভূত হয়, সেনবংশীয় ভূপতিদিগের সময়েও এদেশে বৌদ্ধধর্ম একেবারে অপ্রচলন হয় নাই। কালে ভারতবিখ্যাত পরিব্রাজক শঙ্করাচার্য ও পণ্ডিতাগ্রগণ্য পক্ষধর মিশ্র প্রভৃতি দার্শনিকগণ কর্তৃক বৌদ্ধমত বিচারে পরাভূত ও সম্পূর্ণরূপে নিষ্প্রভ হইলে ভারতের অন্যান্য স্থানের ন্যায় তাহা বঙ্গদেশ হইতে একেবারে তিরোহিত হয়। বঙ্গদেশ হইতে বৌদ্ধধর্ম দূর হইল, তথাপি লোকের আচার-আচরণ ও সংস্কারের উপর তাহার বহুশতাব্দীব্যাপক ফল কোথায় যাইবে? অদ্য পর্যন্ত অনেক বাঙ্গালীর মুখে শুনা যায় অহিংসা পরমো ধর্ম। কেহ ভ্রমেও এ কথা মনে করেন না, এ বাক্য হিন্দু শাস্ত্রে নাই, বৌদ্ধ শাস্ত্রে আছে। যদিও চৈতন্যদেবের জন্মের কিছুদিবস পূর্বে বৌদ্ধমত বঙ্গ হইতে উঠিয়া গিয়াছিল, তথাপি বহুকাল প্রচলিত থাকায় লোকে—

যজ্ঞার্থে পশবঃ সৃষ্টা যজ্ঞার্থে পশুঘাতনং।
অতস্ত্বাং ঘাতয়িষ্যামি তস্মাদ্যজ্ঞে বধোঽবধঃ॥

প্রভৃতি শাস্ত্রীয় মতের উপর গতরাগ হইয়াছিল এবং সর্বজীবে সমদয়া প্রভৃতি নীতি অনুসরণ করিয়াছিল। সত্য বটে বৌদ্ধ ধর্মের প্রাধান্যসময়ে পানভোজন সম্বন্ধে যারপরনাই প্রতিবন্ধক ছিল; এবং তাহার অভ্যুদয় হইলে, ধর্মাচরণভাণে লোকে স্বতঃই অপরিমিতাচারী হইয়া উঠিয়াছিল। (এইজন্যই তন্ত্রে ঈদৃশ

* কেবল চণ্ডাল কেন, চৈতন্য সকলকেও স্বমতে দীক্ষিত করিয়াছেন।

ব্যভিচারের আধিক্য দৃষ্ট হয়।) তথাপি সর্বজীবে সমদয়া প্রভৃতি বৈষ্ণবদিগের প্রধান নীতি বঙ্গে একদা বৌদ্ধমতাধিক্য থাকার অন্যতম ফল।

যখন বঙ্গদেশের একদিকে পৌত্তলিকতা,* অপরদিকে ইসলাম ধর্মের একেশ্বরবাদ লোকের মনকে আকর্ষণ করিতেছিল এবং দাক্ষিণাত্য ও উত্তর-পশ্চিমাঞ্চলে বৈষ্ণবমতাবলম্বী রামানুজ আচার্য সংস্থাপিত শ্রীবৈষ্ণব সম্প্রদায় বহু-কাল হইতে প্রতিষ্ঠিত হইয়া সমধিক প্রবল হইয়া উঠিয়াছিল, যখন বঙ্গে একদিকে বৌদ্ধমত প্রচলন থাকার ফলস্বরূপ অনেক উচ্চনীতি প্রচার হইতেছিল, অপরদিকে মুসলমানদিগের দৃষ্টান্তে ও তন্ত্রের উপদেশে লোকে স্বাভাবিক প্রবৃত্তি বশতঃ ব্যভিচারস্রোতে ভাসিয়া যাইতেছিল, তখনই বঙ্গদেশে বৈষ্ণবধর্মের মতা† সূক্ষ্মভাবে দুই-একজনের মনে উদয় হইতেছিল। ক্রমে উহা তাঁহাদিগের মনে দৃঢ় হইল এবং তাঁহারা তৎপ্রচারজন্য যত্নশীল হইলেন। কয়েকজন কবি (জয়দেব, বিদ্যাপতি ও চণ্ডীদাস) এই মতের পক্ষপাতী হইয়া কৃষ্ণরাধার প্রেম‡ বর্ণন করিতে লাগিলেন। এই সকল কবির লেখা লোকের চিত্তকে বিগলিত করিল। আরও অনেক লোক বৈষ্ণবধর্মে দীক্ষিত হইল। এইরূপে কিছুদিন চলিয়া আসিতে আসিতে, ষোড়শ শতাব্দীতে চৈতন্যদেবের জন্মের কিছু পূর্বে অনেক প্রকৃত বৈষ্ণব বঙ্গের বিবিধ স্থান বিশেষতঃ নবদ্বীপ ও তাহার পার্শ্ববর্তী শান্তিপুর প্রভৃতি আলোকিত করিলেন। চৈতন্যচরিতামৃতের গ্রন্থকার কৃষ্ণদাস কবিরাজ বলেন—

আগে অবত বিলা যে গুরু পরিবার,
সংক্ষেপে কহি যে কহা না যায় বিস্তার।
শ্রীশচী জগন্নাথ শ্রীমাধব পুরী,
কেশব ভারতী আর শ্রীঈশ্বর পুরী।
অদ্বৈত আচার্য আর পণ্ডিত শ্রীবাস।
আচার্য রত্ন বিদ্যানিধি ঠাকুর হরিদাস ॥
শ্রীহট্টনিবাসী শ্রীউপেন্দ্র মিশ্র নাম।
বৈষ্ণব পণ্ডিত ধনী সম্মুখ প্রধান ॥
সপ্ত মিশ্র তার পুত্র সপ্ত ঋষীশ্বর।
কংসারি পরমানন্দ পদ্মনাভ সর্বেশ্বর ॥

* হিন্দুধর্মে একেশ্বরবাদও আছে, কিন্তু তাহা তৎকালে বঙ্গে প্রচলিত ছিল না।

† সংক্ষেপতঃ ঈশ্বরে প্রেম, ভক্তি ও জীবে দয়া।

‡ বৈষ্ণবদিগের মূলগ্রন্থ ভাগবত, এ গ্রন্থে কৃষ্ণরাধিকার প্রেমস্থলে ভক্তিমাহাত্ম্য-বর্ণন আছে। অনেক বৈষ্ণব তাহার নিগূঢ় অর্থ বুঝিতে না পারিয়া কৃষ্ণরাধার প্রেমবর্ণন-শ্রবণই ধর্মের প্রধান অঙ্গ জ্ঞান করিল।

জগন্নাথ মিশ্রবর পদবী পুরন্দর।
নন্দ বাসুদেব পূর্বে সদ্‌গুণসাগর ॥
তাঁর পত্নী শচী নাম পতিব্রতা সতী।
যাঁর পিতা নীলাম্বর নাম চক্রবর্তী ॥
রাঢ় দেশে জন্মিলা ঠাকুর নিত্যানন্দ।
গঙ্গাদাস পণ্ডিতগুপ্ত মুরারি মুকুন্দ ॥
অসংখ্য ভক্তের করিয়া অবতার।
শেষে অবতীর্ণ হৈলা ব্রজেন্দ্রকুমার ॥ *

ইতিহাস পর্যালোচনা করিলে দেখা যায়, যখনই কোন দেশে কোন নবীন সত্য প্রচার হয়, বহুকাল পূর্ব হইতেই তত্তৎ দেশে তাহার সূত্রপাত হয়। ইতিহাস, সমাজতত্ত্ব, মনস্তত্ত্ব, বিজ্ঞান, রাজনীতি, ধর্ম, সকল বৈষয়িক সত্য প্রচারই এই সাধারণ নিয়মান্তর্গত। ইসার জন্মের পূর্বে জোহার প্রভৃতি ধর্ম-প্রচারক, মার্টিন লুথারের পূর্বে উইক্লিফ প্রভৃতি সংস্কারক, পূর্বসংস্কারমুক্ত স্বাধীনচেতা পণ্ডিত পার্কারের পূর্বে রামমোহন রায় প্রভৃতি আত্মপ্রত্যয়মূলক ধর্মবাদী এবং চৈতন্যের পূর্বে অদ্বৈতাচার্য, ভারতী গোস্বামী প্রভৃতি বৈষ্ণবগণ জন্ম পরিগ্রহ করিয়া ভূমণ্ডলকে উজ্জ্বল করিয়াছিলেন এবং পরবর্তী মহাত্মা যে সত্য প্রচার করিবেন, তাহার পথ কথঞ্চিৎ পরিষ্কার করিয়াছিলেন। কেবল ধর্মে কেন? বিজ্ঞানেও অবিকল সেইরূপ হইয়াছে। নিউটনের বহুকাল পূর্বে লোকে মাধ্যাকর্ষণ-শক্তির আভাস বুঝিয়াছিলেন। নিউটনের জন্মের পূর্বেই পণ্ডিতবর গালিলীও মাধ্যাকর্ষণ-শক্তির নিয়মাদি পর্যন্ত আবিষ্কার করিয়াছিলেন। তবে ঐ নিয়ম যে বিশ্বব্যাপী, অর্থাৎ যে নিয়মে বৃক্ষ হইতে পত্র স্খলিত হইলে ভূপতিত হয় সেই নিয়মেই সমুদয় বিশ্বের গ্রহ উপগ্রহ যথাস্থানে রক্ষিত হয়, একথা নিউটনের পূর্বে কেহ গ্রহণ করিতে পারে নাই। বৈষ্ণব ধর্ম সম্বন্ধেও এইরূপ ঘটিয়াছিল।

ইহার কারণ কি? কোন মতের প্রথম উদ্ভাবক বা প্রবর্তক কেন তাহা প্রতিপালন করিতে বদ্ধপরিকর হন না? কি জন্য উইক্লিফ রাজা কর্তৃক ধৃত হইলে আপনার মত পোপের বিরোধী নহে, এরূপ স্পষ্টাক্ষরে ব্যক্ত করিয়াছিলেন? পক্ষান্তরে কি জন্য পরবর্তী ঐ মতাবলম্বী কাল্ভিন ক্রান্মোর প্রভৃতি সংস্কারকগণ কোনরূপ অত্যাচারেও পোপের অধীনতা স্বীকার করেন নাই? ইহার কারণ এই যে, যখন কেহ প্রথমতঃ কোন নবীন সত্য আবিষ্কার করে,

* কৃষ্ণ। ইঁহাকে বৈষ্ণবগণ পূর্ণব্রহ্মের অবতার বলেন।

প্রথম সময়ে তাহা তাঁহার মনে অপরিস্ফুটভাবে অবস্থান করে, হয়ত পক্ষাবলম্বী লোক একটিও থাকে না। সুতরাং তদনুযায়ী আচরণ করিতে হইলে লোকের প্রতিকূলাচরণ একাকী সহ্য করিতে হয়। এদিকে উক্ত সত্য চিরপ্রসিদ্ধ মতবিরোধী হওয়ায় সাধারণ লোকে তৎপ্রতিপালকের উপর যারপর-নাই অত্যাচার করে। কিন্তু ঐ সত্য কিছুকাল প্রচারিত হইলে অনেকে উহার উৎকৃষ্টতা অনুভব করিয়া তন্মতাবলম্বী হয় এবং জনসাধারণও স্বাভাবিক সত্যানুরাগবশতঃ কিয়দংশে তাহার পক্ষগত হয়। এইজন্য কোন নবীন সত্য প্রচারের কিছুকাল পরে তাহা কার্যে পরিণত করিতে চেষ্টা করিলে কৃতকার্য হওয়া অপেক্ষাকৃত সহজ। কারণ, কালে যেরূপ উৎপীড়নের গূঢ়ত্ব ও উৎপীড়কের সংখ্যার হ্রাস হয়, সেইরূপ তন্মতাবলম্বীর সংখ্যা বর্ধিত হওয়ায় অনেকে একত্র হইয়া উৎপীড়ন সহ্য করে, সুতরাং তাহার ভার অপেক্ষাকৃত লঘু হয়। (একথা অবশ্যই স্বীকার্য যে, দুঃখভার একক বহন করা অপেক্ষা দশজনে একত্র হইয়া বহন করা সহজ।) এইজন্যই যথার্থ প্রচারকের পূর্বে তন্মতাবিষ্কারক ও উদ্ভাবক জন্ম পরিগ্রহ করেন।

বস্তুতঃ বিধাতা তাঁহাদিগকে তদ্রূপ-প্রকৃতিবিশিষ্ট করেন না, কিন্তু দেশ-কাল-পাত্রানুযায়ী প্রথম উদ্ভাবক আপনার মত সম্যকরূপে কার্যে পরিণত করিতে পারেন না এবং তাঁহার পরবর্তী শিষ্য সেইমত অশেষবিধ অত্যাচার ও ত্যাগস্বীকার সহ্য করিয়াও জীবনে পরিণত করে। এইজন্য কোন ধর্ম-সংস্কারক অথবা কোন নবধর্মপ্রবর্তকের আবির্ভাবের আবশ্যক হইলে, অগ্রে কয়েকজন সাধারণ অথবা সাধারণ অপেক্ষা কিঞ্চিৎ প্রধান লোক জন্মপরিগ্রহ করিয়া তত্তৎ সত্য কার্যে পরিণত করিতে চেষ্টা করে। পরিশেষে একজন অসাধারণ ক্ষমতাশালী ব্যক্তি আবির্ভূত হইয়া তাহা সাধারণ্যে বিশেষরূপে প্রকাশ করে। পূর্বে অদ্বৈতাচার্য প্রভৃতির জন্ম ও পরে চৈতন্যের জন্ম দ্বারা এই সত্য বিশেষ সপ্রমাণ হইতেছে।

চতুর্দশ শতাব্দীতে শ্রীহট্টে উপেন্দ্র মিশ্র পুরন্দর নামক জনৈক বৈদিক শ্রেণীস্থ ব্রাহ্মণ বাস করিতেন। তাঁহার তনয় জগন্নাথ মিশ্র স্বীয় পত্নী শচীর সহিত নবদ্বীপে আসিয়া বাস করিয়াছিলেন। জগন্নাথ মিশ্রের ক্রমে আট কন্যা জন্মগ্রহণ করিয়া গতাসু হয়। তৎপরে বিশ্বরূপ নামক এক পুত্র জন্মে। বিশ্বরূপের পর শচী আর-এক পুত্রসন্তান প্রসব করেন—ঐ সন্তানই অদ্যকার শিরোনামাঙ্কিত মহাত্মা চৈতন্যদেব।

বালকের কোমল মন আর্দ্র মৃত্তিকাবৎ, যেরূপ ইচ্ছা গঠিত হইতে পারে। যাহা দেখে তাহারই অনুকরণ করে—ভাব সংসর্গগুণে তাহারই হৃদয়ে বিদ্ধ হয়। বহুদর্শন নাই। জ্ঞান ও চিন্তার বিষয় অতি অল্প। পক্ষান্তরে মন নিশ্চেষ্ট থাকিতে পারে না। বহুবিষয়াভাবে এক বিষয় লইয়াও সর্বদা আন্দোলিত হয়। বালকের বুদ্ধিবৃত্তি নৈসর্গিক অবস্থায় অবস্থিত, পরিমার্জিত নহে। বুদ্ধিবৃত্তি পরিমার্জিত না হইলে, প্রায় কার্য করিতে পারে না। সংসারে কে না দেখিয়াছেন মার্জিত বুদ্ধির লোক ব্যতীত অন্যে বুদ্ধিবৃত্তি বিশেষ পরিচালন করে না, কিন্তু কল্পনা সেই অভাব পূরণ করে। এইজন্যই অপরিণতবয়স্ক বালক কল্পনাপরায়ণ। ভাব সংসর্গগুণে যাহা মনমধ্যে বিদ্ধ হয় কল্পনা তাহা লইয়া সর্বদা ক্রীড়া করে। নানারূপ চিত্রবিচিত্র প্রতিমা নির্মাণ করে। কতবার নির্জন প্রান্তরের হরিৎবর্ণ শোভা সন্দর্শন করিতে করিতে করিতে, নিদাঘসন্তপ্ত শরীরে সায়ংকালীন সমীরণ সেবন করিতে করিতে, কল্পনা তাহাতে কত সুখের চিত্র আঁকে। কতবার নদীতটে উপবিষ্ট হইয়া নদীর মধুমাখা সঙ্গীতরব শ্রবণ করিতে করিতে কল্পনা তাহাতে কত দূরাগত সুখবর শুনিতে পায়। কতবার গভীর রজনীতে নিদ্রিত হইলে কল্পনা কত মনোহর চিত্র দেখিতে পায়। কালে যুবক এই বিষয়ে একেবারে তন্ময়ত্ব প্রাপ্ত হইয়া উন্মত্তবৎ হইয়া উঠেন। নিষ্ঠুর বিবুদ্ধাভিজ্ঞান ইহার অলীকতা প্রত্যক্ষ প্রমাণ করিয়া দিলে কদাপি হৃদয়ঙ্গম করিতে পারেন না। যখন সেই কল্পনা পারলৌকিক সুখসহ যুক্ত হয়, তখন মনুষ্য কদাপি তদনুসরণ জীবদ্দশাতে ত্যাগ করিতে পারে না, যেহেতু তাহার সত্য মিথ্যা এ জীবনে প্রত্যক্ষ হয় না। এইজন্যই ধর্মানুসরণকারীদিগের ন্যায় অন্যপথাবলম্বী তাদৃশ বদ্ধপরিকর হয় না। কলম্বাস প্রথম যাত্রায় হয়ত পশ্চিম প্রদেশে বৃহৎ দ্বীপ আবিষ্কারের ভাব ত্যাগ করিতে পারিতেন কিন্তু মার্টিন লুথার জীবন থাকিতে পোপের বিবুদ্ধাচরণ ত্যাগ করিতে পারিতেন না। চৈতন্যের কল্পনা ধর্মসহ যুক্ত হওয়ায় অবিকল ইহাই ঘটিয়াছিল। পণ্ডিতশ্রেষ্ঠ বক্ল * বলেন, "আমার কার্যের জন্য আমা অপেক্ষা আমি যে সমাজে বাস করি সেই সমাজ অধিক পরিমাণে দায়ী।" বস্তুতঃ যে জন্য ইংলণ্ডীয়গণ স্বাধীনতাপ্রিয়, বারাঙ্গনাত্মজা অলীক হাস্যকৌতুকপ্রিয়, সর্বদেশীয় কামিনীবৃন্দ বস্ত্রালঙ্কারপ্রিয়, কামরূপবাসী শক্তিভক্ত, সেইজন্যই যেমন মিলের তনয় জন্ মিল দর্শনাসক্ত এবং জগন্নাথ মিশ্র পুরন্দরের তনয় বিশ্বরূপের কনিষ্ঠ পরম

* Buckle's History of Civilisation. Vol. 1.

বিষ্ণুভক্ত ও সংসারে গতরাগ। শৈশবে পিতার ও সহোদরের ধর্মানুরাগ দেখিয়া চৈতন্য অবশ্যই মনে করিয়াছিলেন, ধর্মই মনুষ্যজীবনের সার, ইহলোকের অকিঞ্চিৎকর ভোগ সুখাপেক্ষা অশেষগুণে প্রার্থনীয়। ধর্মজনিত সুখ নিত্য আর বিলাসসুখ অনিত্য। বিশেষতঃ যখন দেখিলেন, ধর্মের জন্য জ্যেষ্ঠ ইহ-লোকের সর্বস্ব ত্যাগ করিয়া, প্রাণাপেক্ষা প্রিয় জনকজননী ত্যাগ করিয়া, সংসারের খ্যাতিপ্রতিপত্তির অভিলাষ ত্যাগ করিয়া সন্ন্যাস করিয়াছেন, তখন তাঁহার মন ধর্মচিন্তায় অবশ্যই বিচলিত হইয়াছিল। যদিও জনক-জননীর অপত্যবিরহজনিত অসহ্য যন্ত্রণা দেখিয়া বিচলিত হইয়াছিলেন এবং তাহার কারণ ধর্মের উপর কথঞ্চিৎ গতরাগ হইয়াছিলেন, তথাপি একথা স্বীকার করিতে হইবে, অগ্রজের সন্ন্যাস তাঁহার মনে সংসারের ভোগবাসনা সম্বন্ধে যুগান্তর উপস্থিত করিবার বীজ বপন করিয়াছিল। তবে তাহা দীর্ঘকালে অঙ্কুরিত হইয়া পুষ্ট হয়।

চৈতন্য পিতামাতার নিকট প্রতিজ্ঞা করিলেন, "আমি চিরদিন আপনাদিগের নিকট থাকিয়া চরণসেবা করিব।"

এই সকল ঘটনাবশতঃ চৈতন্য বাল্যকাল হইতেই ক্রমশঃ ধর্মের পক্ষপাতী হইয়া আসিতেছিলেন। কেবল প্রথম যৌবনে জ্ঞানচর্চায় মনোভিনিবেশ করিয়া তৎপ্রতি অযথা আসক্ত হইয়াছিলেন, কিন্তু তখনও তাঁহার বয়স ১৬।১৭ বৎসর মাত্র। এই সময়ে একদিন শিষ্যবর্গ সঙ্গে করিয়া গঙ্গাস্নান করিতে যাইতেছেন এমন সময়ে পথে শ্রীবাস পণ্ডিতের সহিত সাক্ষাৎ হইল। শ্রীবাস তাঁহাকে বৈষ্ণববিদ্বেষী বলিয়া জানিতেন, তাঁহার মুখদর্শন পাপ বিবেচনা করিয়া সহসা অন্যদিকে গমন করিলেন। চৈতন্য শিষ্যদিগকে ইহার কারণ জিজ্ঞাসা করিলেন। শিষ্যগণ বলিল, "শ্রীবাস কার্যান্তরে ঐ পথে গিয়াছে।" চৈতন্য বলিলেন, "তাহা নহে, আমাকে পাষণ্ড বিবেচনা করিয়া শ্রীবাস আমার মুখদর্শন করিবে না, এজন্য অন্য পথে গেল।"

এই ঘটনা চৈতন্যকে প্রথমতঃ ধর্মের দিকে লইয়া যায়। বস্তুতঃ একটি ঘটনা বা একটি উপদেশ সময়ে মনুষ্যের মনে যুগান্তর উপস্থিত করে। সময়ে একটি সামান্য ঘটনা দেখিয়া যেমন কোন বিষয় মনে বিদ্ধ হয়, সহস্র গ্রন্থ অধ্যয়ন অথবা সহস্র উপদেশ শ্রবণ করিলে তাহা হয় না। ঘোর অবিশ্বাসী নাস্তিকও হঠাৎ কোন বিপদে পতিত হইয়া অথবা প্রিয়জন হারাইয়া ঈশ্বরের অস্তিত্ব স্বীকার করিয়াছে। চৈতন্যের জীবনেও শ্রীবাসের এই আচরণ এইরূপ ফলোৎপাদন করিয়াছিল। চৈতন্য তখনই হৃদয়ের সহিত বলিলেন।—

এমন বৈষ্ণব মুই হইনু সংসারে।
অজ ভব আসিবেক আমার দুয়ারে।।
শুন ভাইসব এই আমার বচন।
বৈষ্ণব হইব মুই সর্ব বিলক্ষণ।।
আমারে দেখিয়া সে যে সকলে পলায়।
তাহারাও যেন মোর গুণকীর্তি গায়।।

এই সময়ে নবদ্বীপ ও শান্তিপুরে বৈষ্ণবগণ নামসংকীর্তন করিতে আরম্ভ করিয়াছিলেন। পাষণ্ডেরা তাঁহাদিগকে যারপরনাই উপহাস করিতে আরম্ভ করিল। বৈষ্ণবগণ মহাদুঃখিত হইয়া অদ্বৈতাচার্যের নিকট সমুদয় বর্ণন করিলেন। অদ্বৈত বলিলেন, শীঘ্রই আমাদিগের দল পুষ্ট হইয়া দুঃখনিবৃত্তি হইবে। ইহার কিছুদিন পরে, ঈশ্বরপুরী নামক জনৈক মহাপণ্ডিত ও ভাগবত শান্তিপুরে অদ্বৈতের আলয়ে আগমন করিলেন। বৈষ্ণবগণ ঈশ্বরপুরীকে দেখিয়া যারপরনাই সন্তুষ্ট হইলেন। ঈশ্বরপুরী কিয়দ্দিবস শান্তিপুরে অবস্থান করিয়া নবদ্বীপ গমন করিলেন এবং তথায় গোপীনাথ আচার্যের আলয়ে অবস্থান করিলেন। চৈতন্যদেব ঈশ্বরপুরীর সহিত আনুগত্য করিয়া প্রতিদিন ধর্মবিষয়ে কথোপকথন করিতে লাগিলেন। ঈশ্বরপুরী চৈতন্যের অসাধারণ রূপলাবণ্য, অসামান্য প্রতিভা ও আন্তরিক ঈশ্বরনিষ্ঠা দেখিয়া যারপরনাই প্রীত হইলেন।

একদা ভারতী মহাশয় কৃষ্ণের চরিত সম্বন্ধে একখানি গ্রন্থ রচনা করিয়া চৈতন্যকে দোষগুণ জিজ্ঞাসা করিলেন। চৈতন্য বলিলেন, "ভক্ত যাহা বলে ভগবান তাহাতেই সন্তুষ্ট, অতএব গ্রন্থের দোষগুণ বলা নিরর্থক।"

মূর্খোবদতি বিষ্ণায় ধীবোবদতি বিষ্ণবে।
উভয়োস্ত সমং পুণ্যং ভাবগ্রাহী জনার্দনঃ।।

ভক্তিমাহাত্ম্যপ্রতিপাদক চৈতন্যের এই প্রথম বচন। প্রাচীন আর্যদিগের শাস্ত্রাদি কর্ম ও জ্ঞান কাণ্ডপ্রধান, যদিও ভাগবত প্রভৃতি কতিপয় গ্রন্থে ভক্তি-মাহাত্ম্য বর্ণিত হইয়াছে, তথাপি বৈষ্ণবদিগের* বিশেষতঃ চৈতন্যের পূর্বে তাহা প্রায়ই কেহ প্রকৃষ্টরূপে জীবনে পরিণত করেন নাই।

অদ্যাপি চৈতন্য অধ্যয়ন অধ্যাপন ও বিচার এই ত্রিবিধ পণ্ডিতের কার্য পরিহার করেন নাই। মুকুন্দ কবিরাজ, গদাধর পণ্ডিত প্রভৃতি বৈষ্ণবগণের সহিত ক্রমে চৈতন্যের পরিচয় ও বিচার হইল। সকলেই তাঁহার অলোক-সামান্য বিদ্যাবুদ্ধিতে মোহিত হইলেন।

* রামানুজ আচার্য প্রতিষ্ঠিত শ্রীবৈষ্ণব সম্প্রদায় ভক্তিপ্রধান, কিন্তু চৈতন্যদেবের জন্মের পূর্বে ভক্তি সাধারণ্যে পরিগৃহীত হয় নাই।

একদা প্রদোষকালে চৈতন্যদেব গঙ্গাতীরে উপবেশন করিয়া শিষ্যদিগকে শাস্ত্রোপদেশ করিতেছেন, এমন সময়ে কয়েকজন বৈষ্ণব তথায় সমাগত হইয়া ব্যাখ্যা শ্রবণ করিয়া বিমোহিত হইলেন এবং এরূপ মহাপুরুষ কৃষ্ণভক্তি-বিরহিত এজন্য নানারূপ মনোদুঃখ প্রকাশ করিতে লাগিলেন। একজন চৈতন্যের সম্মুখীন হইয়া বলিলেন—

—হের শুন নিমাঞি পণ্ডিত।
বিদ্যায় কি কাজ কৃষ্ণ ভজহ ত্বরিত।
পড়ে কেন লোক কৃষ্ণভক্তি জানিবারে।
সে যদি নহিল তবে বিদ্যায় কি করে।

চৈতন্যদেব উত্তর করিলেন—

তোমরা শিখাও মোরে কৃষ্ণ ভজিবার।
—শ্রীচৈতন্যভাগবত।

এই সময়ে চৈতন্যের জীবন নূতন বেশ ধারণ করিয়াছে এবং যে ভক্তিভাবে সমুদয় ভারত মোহিত হইয়াছিল তাহার অঙ্কুর দেখা দিয়াছে। একদা চৈতন্য ভক্তিরসে আর্দ্রমনা হইয়া গৃহে রহিয়াছেন, এমন সময়ে তাঁহার দশা* উপস্থিত হইল। তিনি ক্ষণ নৃত্য, হুঙ্কার, তর্জন, গর্জন ও ক্রন্দন করিতে লাগিলেন। আত্মীয়-বন্ধু বায়ুরোগ বিবেচনা করিয়া মস্তিষ্কে নারায়ণ তৈল মর্দন করিতে লাগিলেন। বৈষ্ণবগণ এই সংবাদ শ্রবণ করিয়া তথায় আসিয়া বলিলেন, এ বায়ুরোগ নহে, প্রেমবিকার। ক্ষণেক পরে চৈতন্য প্রকৃতিস্থ হইলেন। চৈতন্যের এই প্রথম দশা।

দশাভঙ্গ হইলে চৈতন্য নগরভ্রমণে বহির্গত হইয়া নবদ্বীপের প্রত্যেক ঘরে ঘরে ভ্রমণ করিতে লাগিলেন। নবদ্বীপের আপামর সাধারণ সকলেরই আলয়ে ভ্রমণ করিলেন। এইরূপ শিষ্টতা ও অলোকসামান্য বিদ্যাবুদ্ধি ও রূপলাবণ্যে ক্রমে চৈতন্য আবালবৃদ্ধবনিতার প্রতিষ্ঠা ও শ্রদ্ধাভাজন হইয়া উঠিলেন। হিন্দু-মুসলমান স্ত্রী-পুরুষ সকলেই চৈতন্যের প্রতিষ্ঠা করিতে লাগিলেন।

নবধর্মসংস্থাপক ও প্রতিষ্ঠাকারকদিগের জীবনী সম্বন্ধে এইরূপই হইয়া থাকে। নানক, মহম্মদ প্রভৃতি সকলেই সাধারণ প্রচলিত মতের বিরুদ্ধে বাক্যোচ্চারণ করিয়া উৎপীড়িত হওয়ার পূর্বে সর্বসাধারণের যারপরনাই প্রিয় ছিলেন। বস্তুতঃ সকল ধর্মের মূল এক। সত্যকথন, ন্যায়ব্যবহার ও পরোপকার সকল ধর্মের মূল কথা, সুতরাং নিতান্ত বিরুদ্ধাচরণ (যথা হিন্দুর

* প্রেমভক্তিতে বাহ্যজ্ঞানশূন্য হওয়া।

পক্ষে গোমাংসভক্ষণ) না দেখিলে, কেন তাদৃশ সদ্‌গুণশালী মহাপুরুষের প্রশংসা করিবে না।

এই সময়ে চৈতন্য সংকীর্তন করিতে আরম্ভ করিয়াছিলেন, কিন্তু তত বাহুল্যের সহিত নহে। অদ্যাপি অধ্যয়ন ও অধ্যাপনাই জীবনের প্রধান কার্য ছিল। প্রধান পণ্ডিতদিগের ন্যায় চৈতন্য গৃহীদিগের নিকট নানারূপ ভেট ও বিদায় পাইতে লাগিলেন, তাঁহার প্রচুর অর্থাগম হইতে আরম্ভ হইল। এদিকে তাঁহার শিষ্যসংখ্যা বৃদ্ধি হইল। নানা আত্মীয় বন্ধু ও অতিথিতে গৃহ পরিপূর্ণ হইল। লক্ষ্মীদেবী স্বয়ং রন্ধন করিয়া সকলকে ভোজন করাইতে লাগিলেন। এইরূপ গার্হস্থ্যাশ্রমই গৃহী বৈষ্ণবদিগের আদর্শ। বৈষ্ণবমাত্রেই অতিথিপরায়ণ, আখড়াধারিগণ ভিক্ষা করিয়া অতিথি সৎকার করেন। চৈতন্য বলেন,

তৃণানি ভূমিরুদকং বাক্‌চতুর্থী চ সূনৃতা।
এতান্যপি সতাং গৃহে নোচ্ছিদ্যন্তে কদাচন॥

* * *

সত্য-বাক্যে কবিবেক করি পবিহ'র।
তথাপি অতিথিশূন্য না হয় তাহাব॥

পঞ্চম অধ্যায় / বঙ্গদেশ দর্শন

১৪২৬ অথবা ২৭ শকে* ঊনবিংশ বৎসর বয়ঃক্রমকালে চৈতন্য বঙ্গদেশে গমন করিতে ইচ্ছা করিলেন। শ্রীহট্টে তাঁহার পূর্বপুরুষদিগের বাটী (শ্রীহট্ট বঙ্গদেশের অন্তঃপাতী), সুতরাং পৈতৃক বাসস্থান দেখিতে কৌতূহল জন্মিবে তাহাতে আশ্চর্য কি ? যদিও এ যাত্রায় শ্রীহট্ট পর্যন্ত যাইতে পারিয়াছিলেন না, তথাপি বোধ হয় পৈতৃক বাসস্থান সন্দর্শনও তাঁহার প্রধান উদ্দেশ্য ছিল।

চৈতন্য বঙ্গদেশাভিমুখে পদব্রজে যাত্রা করিয়া পদ্মাবতীর তীরে উত্তীর্ণ হইলেন। কিয়দ্দিবস অবস্থান করিলেন। পদ্মাবতী জঙ্গীপুরের ৬।৭ ক্রোশ

* বৎসর গণনা বৈষ্ণবদিগেব গ্রন্থ ও যুক্তি উভয়ানুসবণ কবিযা নির্ণীত হইল। চৈতন্য ২৩ বৎসর ১১ মাস বয়ঃক্রমকালে গৃহত্যাগ করেন।

চব্বিশ বর্ষেব শেষে সেই মাঘ মাস।
তবে শুক্লপক্ষে প্রভু কৈলা সন্ন্যাস॥

তাঁহার জন্ম ১৪০৭ শকের ফাল্গুন মাসে হয়—১ম অঃ দেখ।

আবার চৈতন্যভাগবতে ও চৈতন্যচরিতামৃতে স্পষ্টাক্ষরে লিখিত আছে, চৈতন্য বঙ্গ হইতে প্রত্যাগত হওয়ার অব্যবহিত পরেই গয়াধামে যাত্রা করেন এবং গয়া হইতে প্রত্যাগত হইয়া চারি বৎসর কাল গৃহে অবস্থান করেন। বঙ্গদেশ হইতে প্রত্যাগত হইয়া তিনি আব একটি কার্য কবেন অর্থাৎ দ্বিতীয়বার পাণিগ্রহণ। তীর্থযাত্রা ও বিবাহ ন্যূনাধিক ১ বৎসর ও গৃহে অবস্থান চারিবৎসর, ২৩ বৎসর ১১ মাস হইতে বাদ দিলে ১৮ বৎসব ও কযেক মাস হয় এবং তাঁহার জন্ম ১৪০৭ শকের ফাল্গুন মাস। এই জন্য উক্তকাল ১৪২৬ অথবা ২৭।

উত্তর ছাপঘাটি হইতে গঙ্গা হইতে বহির্গত হইয়া ২২ কোদালী মোকামে ব্রহ্মপুত্রসহ মিলিত হইয়াছে। ছাপঘাটি, মুর্শিদাবাদ জিলার অন্তর্গত ২২ কোদালী ঢাকা। এই বিস্তীর্ণ পদ্মানদীর উপকূলের কোন্ স্থানে তিনি অবস্থিত হইয়াছিলেন, চৈতন্যচরিতামৃত, চৈতন্যমঙ্গল, চৈতন্যভাগবত প্রভৃতি গ্রন্থে অথবা কোন নাটকাদিতে তাহার নিদর্শন পাওয়া যায় না।

অন্যদীয় প্রমাণাবলম্বন করিলে জানা যায়, অধুনা পদ্মাতীরে যত গ্রাম আছে তন্মধ্যে শাদিখাঁরদিয়াড়* ও তাহার নিকটবর্তী কয়েকটি গ্রাম ও তাহার অপর পারস্থিত মিরগঞ্জ † ও তাহার পার্শ্ববর্তী কয়েকটি গ্রাম সমধিক বৈষ্ণবপ্রধান এবং হয়ত শাদিখাঁরদিয়াড়েই তিনি অবস্থান করিয়াছিলেন। প্রেমতলী এবং খেতরী সমধিক বৈষ্ণবপ্রধান স্থান বটে, কিন্তু অধুনা পদ্মার নিকটবর্তী হইলেও তৎকালে নিকটে ছিল না। যে হেতু বিগত ২০।২৫ বৎসর পূর্বেই প্রেমতলী হইতে পদ্মা ৩ ক্রোশের অধিক ব্যবধান ছিল, এবং প্রেমতলী পার হইয়া অপর পারে ক্রমাগত ৮।১০ ক্রোশ গমন করিলেও তাহা পদ্মার চর বোধ হয়, সুতরাং বোধ হয়, এককালে পদ্মা প্রেমতলী হইতে অনেক দূরে ছিল। বিশেষ প্রেমতলীর ২০০।৩০০ হস্ত পরেই, খেতরীর গ্রাম ক্রোশার্ধ অগ্র হইতে ভূবীন্দ্র। পদ্মা, ভূবীন্দ্রের তাদৃশ নিকটস্থ থাকিতে পারে না। যেহেতু পদ্মার তীরের দিয়াড় এবং ভড় অতিক্রম করিলে ভূবীন্দ্র পাওয়া যায়। অপর প্রেমতলী নিকটে কুমারপুরে অদ্যাপি মুসলমান ও বঙ্গের প্রাচীন পালবংশীয় ভূপালদিগের যে সকল ভগ্নাবশেষ দেখা যায়, তদ্দৃষ্টে নিশ্চয় অনুভূত হয় যে, সে সকল পদ্মার তীরে গঠিত হয় নাই এবং তৎকালে পদ্মা কুমারপুর, প্রেমতলী প্রভৃতি গ্রাম হইতে দূরে ছিল। তবে যে এ সকল গ্রাম বৈষ্ণবপ্রধান তাহার কারণ, অন্যূন ১০০ বৎসর অতীত হইল গড়ের হাট পরগণায় রাজা বৈষ্ণব চূড়ামণি নরোত্তম অবস্থান করিতেন, এবং গোবিন্দদাস কবিরাজ (কবি গোবিন্দদাস) রামচন্দ্র কবিচন্দ্র কবিরাজ প্রভৃতি পরবর্তী বৈষ্ণবগণ (যাঁহারা পূর্ববর্তীদিগের অবতার বলিয়া খ্যাত হইয়াছিলেন।) তথায় অনেক সময় বাস করিতেন। নরোত্তমদাসের পূর্বে প্রেমতলী প্রভৃতি ঘোর শক্তিপ্রধান ছিল। সুতরাং চৈতন্যদেবের তথায় অবস্থান যুক্তিসঙ্গত বোধ হয় না, শাদিখাঁরদিয়াড় অথবা মিরগঞ্জই তাঁহার বঙ্গদেশে অবস্থানের স্থান বলিয়া বোধ হয়। কিন্তু মিরগঞ্জে অদ্যাপি চৈত্রমাসে গঙ্গাস্নানের দিবসে "দধি-চিঁড়ার

* জেলা মুর্শিদাবাদে স্থিত।
† জেলা রাজশাহী স্থিত।

ফলার" করা বৈষ্ণবদিগের তৎপ্রদেশীয় সাধারণ লোকদিগের ধর্মের অঙ্গ বলিয়া বোধ আছে। সাধারণের বিশ্বাস, চৈতন্য ঐ দিবসে তথায় "দধি-চিঁড়ার ফলার" করিয়াছিলেন। পক্ষান্তরে পথিক লোকই "দধি-চিঁড়ার ফলার" করিয়া থাকে, এজন্য মিরগঞ্জে চৈতন্য পথিকও শাদিখাঁরদিয়াড়ে অবস্থিত হইয়াছিলেন, ইহাই অনুভূত হয়। তবে যদি কেহ কেহ এ আপত্তি করেন, শাদিখাঁরদিয়াড় পদ্মাতীর হইতে ৪ ক্রোশ ব্যবধান, ইহার উত্তরস্থলে এই প্রস্তাব লেখক বলিতে পারেন যে, ১৮।১৯ বৎসর অতীত হইলে তিনি শাদিখাঁরদিয়াড় হইতে পদ্মা, ক্রোশ ক্রোশ ব্যবধান দেখিয়াছিলেন, এই ১৮।১৯ বৎসর এপার ভাঙ্গিয়া অপর পারে ২ ক্রোশ চর প্রশস্ত হইয়াছে। সুতরাং এক-কালে যে তাহা পদ্মাতীরস্থ ছিল তাহাতে আশ্চর্য কি? বিশেষ দিয়াড় নামই তাহার অমোঘ প্রমাণ।

চৈতন্য বঙ্গদেশে অবস্থিতি করিয়া মহানন্দে পদ্মার জলে ক্রীড়া করিতে লাগিলেন। পদ্মার শোভা গম্ভীর ও ভীষণ মূর্তি সন্দর্শন করিয়া তাঁহার মন আরও প্রশস্ত হইল, কল্পনা উদ্দীপ্ত হইল, স্ফূর্তি দ্বিগুণিত হইল।

এদিকে, নবদ্বীপ হইতে একজন পণ্ডিত আসিয়াছেন শুনিয়া তদ্দেশীয় বিদ্যাব্যবসায়ী ভট্টাচার্য পণ্ডিত ও বিদ্যাব্যবসায়ী বালকগণ, যাহারা বিদ্যো-পার্জনজন্য নবদ্বীপ যাইতে উদ্যত ছিল, তথায় চৈতন্যের সহিত মিলিত হইল। বৈষ্ণব গ্রন্থকারগণের মতে নিমাঞি পণ্ডিতের নামে সকলে আকৃষ্ট হইয়াছিল, কিন্তু আমাদিগের বিবেচনায় নিমাঞি পণ্ডিতের নামে হউক বা না হউক, নবদ্বীপের পণ্ডিতের নামে বটে।

চৈতন্য, বিদ্যা ও ধর্ম যুগপৎ প্রচার করিতে লাগিলেন। তাঁহার বিদ্যা, বুদ্ধি ও ধর্মের ভাবে সকলেই মোহিত হইলেন। তাঁহার ছাত্রসংখ্যা পূর্বাপেক্ষা অনেক বৃদ্ধি হইল।

একদা একজন ব্রাহ্মণ পরমার্থতত্ত্বজিজ্ঞাসু হইয়া তথায় আগমন করিলেন। চৈতন্য বলিলেন,—

সত্যে ধ্যায়তে বিষ্ণুঃ ত্রেতায়াং যযতে মখৈঃ।
দ্বাপরে পরিচর্যায়াং কলৌতদ্ধরিকীর্তনাৎ।।
তথাহি হরের্নাম হরের্ন ম হরের্নামৈব কেবলম্।
কলৌ নাস্ত্যেব নাস্ত্যেব নাস্ত্যেব গতিরন্যথা।।

অথ মহামন্ত্র

হরেকৃষ্ণ হরেকৃষ্ণ কৃষ্ণ কৃষ্ণ হরে হরে।
হরে রাম হরে রাম রাম রাম হবে হরে।।

এই হরিনাম উচ্চারণ করিতে করিতে প্রেমের অঙ্কুর হয় এবং ঈশ্বরে প্রেমিক

হইলে পরম তত্ত্ব লাভ হইল। এইরূপে কিছুকাল বঙ্গদেশে অবস্থান করিয়া চৈতন্য গৃহে প্রত্যাগত হইলেন।

এদিকে লক্ষ্মীদেবী স্বামিবিরহজনিত ক্লেশে নিতান্ত কাতর হইয়া চৈতন্যের বঙ্গে অবস্থানকালে প্রাণত্যাগ করিলেন। চৈতন্য গৃহে প্রত্যাগত হইলে বন্ধু-বান্ধবগণ তাঁহাকে দেখিতে আসিলেন। চৈতন্য মাতার চরণবন্দনা করিতে যাইয়া দেখেন, তিনি যারপর নাই বিষাদিতা ও তাঁহার মুখে বাক্যব্যয় নাই। সুতরাং বুঝিলেন নিশ্চিত বিশেষ অমঙ্গল হইয়াছে। পরে শচী বলিলেন, বধূমাতা পীড়িতা হইয়া প্রাণত্যাগ করিয়াছেন। চৈতন্য কিঞ্চিৎ ধৈর্যাবলম্বন করিয়া জননীকে বলিলেন—

কস্য কে পতি . . . মোহ এব হি কেবলং।

* * * *

"ভবিতব্য যে আছে তাহা খণ্ডিবে কেমনে।
অতীত সে হইল ঈশ্বর ইচ্ছাস।
সে হইল আর কি কার্য দুঃখে তায়।"

সংসারের অনিত্যতা সম্বন্ধে চৈতন্যের এই প্রথম উক্তি। চৈতন্য ভবিতব্যবাদী ছিলেন, সুতরাং ইচ্ছা স্বাধীন বিশ্বাস করিতেন না। দ্বিতীয়তঃ তিনি ঈশ্বর ইচ্ছাময় স্বীকার করিতেন, সাংখ্যদর্শনকারের ন্যায় উদাসীন বলিতেন না।

আশ্বিন, অগ্রহায়ণ-পৌষ ১২৮২

মহাত্মা রাজা রামমোহন রায়

আধুনিক বঙ্গদেশের গৌরবই মহাত্মা রাজা রামমোহন রায়। এই মহাত্মাকে সম্মান করিলে বাঙ্গালী জাতি সম্মানিত হয়। ইঁহাকে সম্মান করা অগ্রে বাঙ্গালী জাতির কর্তব্য। তিনি জীবিতকালে অনাদৃত ছিলেন বটে, কিন্তু এক্ষণে যখন আমরা তাঁহার জীবনের মহত্ত্ব ও গৌরব সম্যক্ উপলব্ধি করিয়াছি, এখন তাঁহার যথোচিত সম্মান ও আদর না করিলে আমরা নিতান্ত নিন্দনীয় হইব। সর্বসাধারণে যাহাতে রামমোহন রায়ের জীবনের মহত্ত্ব বুঝিতে পারেন

* মহাত্মা রাজা রামমোহন রায়ের জীবনচরিত। শ্রীনগেন্দ্রনাথ চট্টোপাধ্যায় কর্তৃক প্রণীত। কলিকাতা রায় যন্ত্রে মুদ্রিত, সন ১২৮৮ সাল।

তজ্জন্য সর্বাগ্রে তাঁহার জীবনী প্রকাশ করা উচিত। নগেন্দ্রবাবু সেই কর্তব্য সম্পন্ন করিয়াছেন। এতকাল যে তাঁহার অমূল্য জীবনী প্রচারিত ছিল না, ইহা বাঙ্গালী জাতিরই কলঙ্ক। নগেন্দ্রবাবু সেই কলঙ্ক অপনয়ন করিয়াছেন। সেইজন্য গ্রন্থকার অনেক কারণে আমাদিগের কৃতজ্ঞতার ভাজন। বাঙ্গালী জাতি যে রামমোহন রায়ের নিকট কতপ্রকার ঋণে আবদ্ধ নগেন্দ্রবাবু তাহা প্রকাশ করিয়াছেন। প্রকাশ করিয়া রামমোহন রায়ের প্রতি বাঙ্গালী জাতির কি কর্তব্য তাহা স্পষ্টাক্ষরে প্রদর্শন করিয়াছেন।

রামমোহন রায়ের জীবনী অতি সরল বিশুদ্ধ ভাষায় রচিত হইয়াছে। গ্রন্থকার নানাস্থান হইতে বিবরণ সংগ্রহ করিয়াছেন। আর্যদর্শনে শ্রীনন্দমোহন চট্টোপাধ্যায় রামমোহনের যে সংক্ষিপ্ত জীবনী লেখেন তাহাতে গ্রন্থকারের অনেক সাহায্য হইয়াছে, গ্রন্থকারের একটি চমৎকারগুণ এই, তিনি বক্তব্য বিষয় বেশ সাজাইয়া বলিতে পারেন। সে গুণ সমালোচ্য গ্রন্থেও বিলক্ষণ প্রদর্শিত হইয়াছে। রামমোহন রায়ের জীবনী আলোচনায় যে স্থলে যেরূপ চিন্তা সহজে উদয় হয়, সেইরূপ চিন্তায় গ্রন্থখানি পরিপূর্ণ ; এবং গ্রন্থকার অনেক স্থলে যে সমস্ত মত ও অভিপ্রায় প্রকাশ করিয়াছেন তাহা বিশুদ্ধ ও ন্যায্য।

জীবনীলেখকের যেরূপ শ্রদ্ধা ও ভক্তির আবশ্যক করে, নগেন্দ্রবাবুর তাহা আছে। গ্রন্থখানি পাঠ করিলে এমত প্রতীত হয় যে তিনি রামমোহন রায়কে অত্যন্ত ভক্তি করেন। সেই ভক্তিভাজনের জীবনী লিখিতে উৎসাহিত হইয়া তিনি বিলক্ষণ পরিশ্রমও করিয়াছেন। পরিশ্রমের ফলস্বরূপ তিনি এমত অনেক বিষয় সংগ্রহ করিয়া প্রকাশ করিয়াছেন যাহা পূর্বে অল্পলোকেরই বিদিত ছিল। তিনি সমস্ত বিষয় অতি শ্রদ্ধার সহিত লিপিবদ্ধ করিয়াছেন। রামমোহন রায়ের বিশুদ্ধ নামে যে অপকলঙ্ক ছিল, যে অপকলঙ্ক তাঁহার সমগ্র জীবনের ঘটনাবলীর সহিত কখন সম্ভবপর হইতে পারে না, যাহা কেবল তাঁহার শত্রুগণের বিদ্বেষভাবের পরিচায়ক মাত্র বলিয়া উপলব্ধ হইতে থাকে, সেই দুই অপকলঙ্কের নগেন্দ্রবাবু অতি সুন্দররূপে অপনয়ন করিয়াছেন। বাস্তবিক সমগ্র গ্রন্থখানি ভক্তির উপহারস্বরূপ এবং যিনি ইহা পাঠ করিবেন তিনি রামমোহন রায়কে ভক্তি না করিয়া থাকিতে পারিবেন না।

রামমোহন রায় যে একজন অসাধারণ প্রতিভাসম্পন্ন লোক ছিলেন, তাহা তাঁহার জীবনীতে বিলক্ষণ প্রকাশিত হয়। অতি তরুণ বয়সে যখন তিনি হিন্দু শাস্ত্রালোচনা করিতে করিতে সহসা একদা একেশ্বরবাদে উপনীত হন, তখন তাঁহার প্রতিভার প্রথম আলোক পরিদৃশ্য হয়। বহুকাল ধরিয়া হিন্দুরা শাস্ত্রালোচনা করিয়া আসিতেছিলেন। কিন্তু কেহ কখন সেই শাস্ত্রসমুদ্র মন্থন

করিয়া রামমোহনের মত অতি তরুণ বয়সেই একেশ্বরবাদে উপনীত হইতে পারেন নাই। যদিও রামমোহনের সময়ে খৃষ্টীয় পাদরিগণ এখানে আসিয়াছিলেন সত্য, কিন্তু তাঁহারা খ্রীষ্টের বিশেষ মতামত প্রচারে এত ব্যস্ত যে তাহাতে ঠিক প্রকৃত একেশ্বরবাদ কখন প্রকাশিত হয় নাই। তৎকালে খৃষ্টান পাদরিগণের মতামতও বিশেষরূপে সকলের শ্রবণযোগ্য হইত না এবং সাধারণ জনেরা অবগত ছিলেন না। বিশেষতঃ রামমোহন রায় যে অল্প বয়সে একেশ্বরবাদে উপনীত হন, তখন তিনি খৃষ্টীয় মত বোধ হয় অবগত ছিলেন না। যদি থাকেন, তাহা হয়ত খৃষ্টীয় মত বলিয়াই জানিতেন। কিন্তু রামমোহন রায়ের বিশেষ গৌরব এই, তিনি সেই একেশ্বরবাদ হিন্দুশাস্ত্রমধ্যে নিহিত দেখিয়াছিল, তাঁহার তীক্ষ্ণ বুদ্ধি শাস্ত্রের অশেষ মতামত ভেদ করিয়া এই মহৎ সত্য উপলব্ধি করিয়াছিল। রামমোহন রায় প্রথমে ইহা হিন্দুশাস্ত্রের সারমাত্র বলিয়া দেখিলেন, এবং তাহা প্রচার করিতে উদ্যত হইলেন। তিনি এই মত প্রচার করিতে এত উদ্যোগী হইলেন, ইহার সত্য তাঁহার মনে এত বদ্ধমূল হইয়াছিল, যেন তিনি হঠাৎ কি অমূল্য নিধি প্রাপ্ত হইয়াছিলেন। যেন কোন দিব্যালোক তাঁহার মনে সহসা প্রভাসিত হইয়াছিল। তিনি সে আলোকে মোহিত হইয়া তাহা জগৎময় প্রকাশিত না করিয়া থাকিতে পারিলেন না।

রামমোহনের প্রতিভা সকল অবস্থায় তাঁহাকে প্রচালন করিত। তিনি এই প্রতিভাবলে অতি জটিল তর্কসকল ভেদ করিয়া সত্য প্রকাশিত করিতেন। এই প্রতিভাবলে সকল শাস্ত্রালোচনায় অতিসূক্ষ্ম তত্ত্বসকল নির্ধারণ করিতেন। বাক্‌বিতণ্ডায় ও তর্কযুদ্ধে এই প্রতিভাবলে তিনি সকলের উপর জয়লাভ করিতেন। তাঁহার বিপক্ষে যে কেহ উদয় হউন না কেন, তিনি কাহারও সহিত বিচার করিতে শঙ্কা করিতেন না। যেরূপ তর্কজাল হউক না কেন, সে তর্ক না পড়িতে পড়িতে রামমোহন রায় তাহার অসারতা সুন্দর দেখাইয়া দিতে পারিতেন। যেন তাঁহার নিকট সকল কুতর্কের অস্ত্র ছিল। কুতর্ক উপস্থিত হইবামাত্র তিনি তাহা খণ্ডন করিতেন। একটু কালবিলম্ব হইত না। ইহাই উপস্থিত বুদ্ধি, ইহাই প্রতিভা যেন আন্তরিক আলোকরূপে তাঁহার মনোমন্দিরে বিরাজিত ছিল। কুতর্কজালের কুজ্‌ঝটিকা বিস্তৃত হইবামাত্র তাঁহার আভ্যন্তরিক আলোক দ্বারা তাহা বিচ্ছিন্ন হইয়া যাইত।

যাঁহারা প্রতিভাসম্পন্ন লোক হন, তাঁহারা এক-এক যুগের অগ্রণীস্বরূপ হন। রামমোহন রায় এক্ষণকার কালের অগ্রগামী লোক ছিলেন। তাঁহার কালের পূর্বে তিনি উদয় হইয়াছিলেন। অথবা তিনি এক নূতন যুগের প্রারম্ভ করিয়া যান। এ দেশীয় দেশাচার সম্বন্ধে আজকাল অনেক তর্কের পর যে

সমস্ত সত্য নির্ণীত হইতেছে, রামমোহন রায় বহুকাল পূর্বে তাহা স্থির করিয়া গিয়াছেন। বলিতে গেলে আমরা আজিকালি তাঁহারই মতামতের অনুসারী হইয়াছি মাত্র। রামমোহন রায় তাঁহার পরিষ্কার বুদ্ধিতে সকল বিষয় বহুকাল পূর্বে স্থির সিদ্ধান্ত করিয়া গিয়াছেন। তিনি এক্ষণকার কালের উজ্জ্বল সুখতারা-রূপে বঙ্গগগনে উদয় হইয়াছিলেন।

যে সমস্ত অসাধারণ গুণে রামমোহন রায়কে উচ্চগৌরবে উত্তোলিত করিয়াছিল, প্রতিভা তাহার অন্যতম। প্রতিভা তন্মধ্যে সামান্য গুণ। কারণ প্রতিভা অনেকেরই থাকিতে পারে। রামমোহন রায় যদি অন্যান্য গুণের আধার না হইতেন, তাহা হইলে তিনি কখনই একজন অসাধারণ লোক হইতে পারিতেন না। তাঁহার অপরাপর গুণের মধ্যে তাঁহার সাহসকে আমরা একটি শ্রেষ্ঠতম গুণ বলি। যে সাহস থাকিলে মানব উচ্চে উঠিতে পারে, রামমোহন রায়ের সেই সাহস ছিল। সকল সময়ই মনুষ্যসমাজ এক-এক স্থির অবস্থায় অথবা স্তরে স্থাপিত থাকে। রামমোহন রায়ের যে সময় অভ্যুদয় হয়, তখনকার কালে বঙ্গীয় হিন্দুসমাজ কিরূপ জঘন্য অবস্থায় অবস্থাপিত ছিল, তাহা সমালোচ্য গ্রন্থমধ্যে সুন্দর বর্ণিত আছে। মনুষ্যসমাজের ধর্ম এই যে, লোকে এই স্তরে সর্বসাধারণকে রক্ষা করিতে চেষ্টা করে। ইহাই সামাজিক শাসন ও বন্ধন। মানবজাতির অবস্থা কখন একভাবে থাকিতে পারে না। সমাজ কখন একভাবে দাঁড়াইতে পারে না, হয় তাহা ভিতরে ভিতরে উন্নতিপথে উঠিতেছে, না হয় তাহা অবনতির দিকে অবনত হইতেছে। মানবসমাজের নিশ্চেষ্টতায়ও তাহার অপকার সাধন হয়। বঙ্গীয় হিন্দুসমাজ নিশ্চেষ্টতায় ক্রমশই অধঃপাতে যাইতেছিল। দিন দিন তাহার অবনতি হইতেছিল। বঙ্গীয় হিন্দুসমাজ তখন এইরূপ নিশ্চেষ্ট স্থির ভাবে অবস্থিত ছিল। ভিতরে ভিতরে তাহার অবনতিসাধন হইতেছিল। তাহার গতি অধোদিকেই অভিমুখী ছিল। রামমোহন রায় এই সমাজের গতি ফিরাইয়া দিলেন। সামাজিক তরঙ্গে বিপরীত বল বিক্ষেপ করিলেন। সমাজে হুলস্থুল পড়িয়া গেল। যে বল রামমোহন রায়ের হৃদয়ে, সেই বল, সেই সাহস, সেই অধ্যবসায়, সেই বিদ্যাবুদ্ধি, সেই প্রতিভা, সেই মহান্ আভ্যন্তরিক বলে রামমোহন রায় এই সামাজিক তুফানে দণ্ডায়মান হইলেন। বলিতে গেলে একাকীই দণ্ডায়মান হইলেন। যে বলে, সে সাহসে তিনি আত্মস্বজন, ভাইবন্ধু, জনক-জননীকে পরিত্যাগ করিয়া একাকী দেশে ফিরিয়াছিলেন, সেই বল রামমোহন রায়কে আবার স্বদেশীয় জনসমাজের প্রতিকূলমুখে সংরক্ষা করিল। সমুদায় সমাজ তাঁহার বিপক্ষে। রামমোহন রায় একাকী বীরের ন্যায়

দণ্ডায়মান আছেন। শুদ্ধ দাঁড়াইয়া নয়, মহাসমরে প্রবৃত্ত হইয়াছেন। যে যেরূপ অস্ত্রবিক্ষেপ করিতেছে, রামমোহন রায় তাহা সেইরূপ বলে কাটাইতেছেন। যাহা সহ্য করিবার তাহা সহ্য করিতেছেন। যাহা কাটাইবার তাহা কাটাইতেছেন। ইহাই বীরত্ব, ইহাই সাহস। এই সাহসে রামমোহন রায় সামাজিক গতি উন্নতির দিকে বিক্ষেপ করিয়াছেন। রামমোহন যখন প্রথম সমাজকে পরিত্যাগ করিয়া ধর্মের জন্য, সত্যের জন্য দেশে দেশে ভ্রমণ করিয়া বেড়ান; যখন নদ নদী, বন, পর্বত, সিংহশার্দূল এবং মানবের ভয়ঙ্কর শত্রুতা প্রভৃতি কিছুতেই তাঁহার গতিরোধ করিতে পারে নাই, তখন তাঁহার হৃদয়বল একদিন দেখা গিয়াছিল। তখন তাঁহার সহিষ্ণুতা ও অধ্যবসায় কত, একদিন দেখা গিয়াছিল। তখন তাঁহার ভবিষ্যৎ জীবনের প্রথম আলোক প্রভাসিত হইয়াছিল। এই হৃদয়বলে কয়জনকে বলীয়ান্ দেখা যায়? এই মহান হৃদয়বলে কয়জন লোক সর্বত্যাগী হইয়াছেন, সত্যের জন্য, প্রকৃত ধর্মের অনুসন্ধানের জন্য সর্বত্যাগী হইয়াছেন? আবার যখন আমরা ভাবি, রামমোহন রায়ের বয়স তখন তরুণ, সম্পত্তি ও সহায় কেমন বিহীন, তখন তাঁহার হৃদয়বলের যে কতদূর গৌরব তাহা একদিন উপলব্ধি হয়। তখন তাঁহাকে আমরা ভবিষ্যৎ রামমোহন বলিয়া চিনিতে পারি। চিনিতে পারি, তিনি দেশের উদ্ধারের জন্য উদয় হইতেছেন তিনি দেশের উন্নতিকল্পে সজ্জিত হইতেছেন। চিনিতে পারি, এই হিমালয়-অতিক্রমী তিব্বতভ্রমী রামমোহন রায় একদিন সাত সমুদ্র পার হইয়া আবার বিলাতে যাইবেন, ফ্রান্সে সম্মানিত হইবেন, বিলাতে আবার ফিরিয়া আসিবেন, বিলাতের সর্বস্থানে পূজিত হইবেন, এবং সেই সাত সমুদ্র পারে বিদেশীয় শোভাময়ী ব্রিস্টল নগরীতে পূজার সহিত দেহত্যাগ করিবেন। চিনিতে পারি, রামমোহন রায়ের এই হৃদয়বল একস্থানে আবদ্ধ থাকিবার নহে, বঙ্গদেশে তাহা ধরিবে না, তাহা বিস্তীর্ণ হইয়া সমুদায় পৃথিবী একদা গ্রহণ করিতে উদ্যত হইবে। একস্থানে আবদ্ধ হইলে, ইহার তেজ কত, তাহা বঙ্গদেশ জানিয়াছে। বিস্তীর্ণ হইলে, ইহার প্রসার কত, তাহা বিদেশীয়গণ বিলক্ষণ পরিচয় পাইয়াছেন।

সত্যের জন্য, ধর্মের জন্য সন্ন্যাসিগণ সংসার পরিত্যাগ করিয়াছেন। সন্ন্যাসী হইতে রামমোহন রায়ের অনেক প্রভেদ। এই প্রভিন্নতা না থাকিলে রামমোহন রায় যে তরুণবয়সে সংসারধাম পরিত্যাগ করিয়া গিয়াছিলেন তাহাতে তিনিও হয়ত একজন সন্ন্যাসী হইতেন। আর যে সময়ে রামমোহন রায় সংসার পরিত্যাগ করিয়াছিলেন সে সময়ে সন্ন্যাস ধর্মেরও বিশেষ গৌরব ছিল। সেই গৌরব রামমোহন রায়ও প্রত্যক্ষ দেখিয়াছিলেন। তখন সন্ন্যাসী

হওয়ার দৃষ্টান্তেরও বঙ্গধামে অভাব ছিল না। ঈশ্বরোপাসনার জন্য সংসার পরিত্যাগ করিয়া যাওয়া তখন গৌরবের বিষয় বলিয়া লোকে জ্ঞান করিত। সেকালের অনেক সন্ন্যাসীও হয়ত আজিও জীবিত আছেন। দুই কারণে রামমোহন রায়কে সন্ন্যাসী করে নাই।

প্রথম কারণ এই, যে জন্য সন্ন্যাসিগণ সংসার পরিত্যাগ করিয়া যান, রামমোহন রায় সে কারণে যান নাই। সন্ন্যাসিগণ ঈশ্বরের উপাসনার জন্য প্রলোভনপূর্ণ, মায়াময় সংসার পরিত্যাগ করিয়া বনে যান। রামমোহন রায় সংসার পরিত্যাগ করেন নাই। কিন্তু সংসার তাঁহাকে দাঁড়াইতে স্থল দেয় নাই। সংসার তাঁহাকে পরিত্যাগ করিয়াছিল। তিনি ঈশ্বরের উপাসনার জন্য সংসারের বহির্দেশে যান নাই। কিন্তু তিনি তত্ত্বানুসন্ধানী ছিলেন। সকল ধর্মের সার কি, তিনি অনুসন্ধান করিয়া বেড়াইতেছিলেন। সকল ধর্মের দোষগুণ বিচারোদ্দেশে তিনি দেশে দেশে বেড়াইতেছিলেন। এইরূপে তাঁহার জ্ঞান পূর্ণ না হইলে তাঁহাকে ধর্মসংস্কারক মহাত্মা রামমোহন করিতে পারিত না। সংসার তাঁহাকে পরিত্যাগ করিয়া তাঁহার উপকারসাধন করিয়াছিল। তাঁহাকে ভবিষ্যৎ রামমোহন রায় করিয়া দিয়াছিল।

দ্বিতীয় কারণ, রামমোহন রায়ের হৃদয়। রামমোহন রায়ের হৃদয় সন্ন্যাসিগণের হৃদয়ের মত যদি শুষ্ক, নির্মম হইত, রামমোহন রায় হয়ত তত্ত্বানুসন্ধানের পর ঈশ্বরোপাসনার জন্য সন্ন্যাসধর্ম অবলম্বন করিতেন, কিন্তু রামমোহন রায় হৃদয়শূন্য লোক ছিলেন না। যে নির্মম জনসমাজমধ্যে রামমোহন রায় বাস করিতেন, সেই সমাজের জন্য রামমোহনের তরলহৃদয় অতি তরুণ বয়সেই কাঁদিয়া উঠিয়াছিল। তাঁহারই পরিবারমধ্যে যখন সতীদাহের দৃষ্টান্ত ঘটে, তখনই তাহার হৃদয় একেবারে ওতঃপ্রোত হইয়া আলোড়িত হইয়াছিল। তিনি তখনই যে উচ্চরবে কাঁদিয়া প্রতিজ্ঞা করিলেন, সেই প্রতিজ্ঞাতেই তাঁহার হৃদয়-ব্যথার প্রকৃষ্ট পরিচয় প্রাপ্ত হওয়া গিয়াছে। তাঁহার মমতা লোকের জন্য ছিল না, তাহা ব্যক্তিগত মমতা ছিল না, কিন্তু তাঁহার মমতা মানবজাতির প্রতি ছিল, তিনি একজনের জন্য যত না কাঁদিতেন, সমাজের জন্য ততোধিক কাঁদিতেন।

রামমোহন রায় একজন বিশেষরূপে সামাজিক লোক ছিলেন। সমাজের রোদন তাঁহার হৃদয়ে আঘাত করিত। সমাজের অমঙ্গল তাঁহার হৃদয়কে আলোড়িত করিত। তিনি বঙ্গসমাজের দুরবস্থা দেখিয়াছিলেন মাত্র নহে। তাঁহার প্রতিভা তাঁহাকে সেই দুরবস্থার ভাব প্রকৃষ্টরূপে প্রদর্শন করিয়াছিল; তাঁহার সহৃদয়তা সেই দুরবস্থা অপনয়ন করিবার জন্য ব্যস্ত হইয়াছিল। তিনি ভারতের দেশবিদেশে ভ্রমণ করিতেন বটে, কিন্তু তাঁহার হৃদয় স্বদেশে

আকৃষ্ট ছিল, স্বদেশের দুঃখের জন্য কাঁদিত। তাঁহার হৃদয় যে প্রকৃতপক্ষে কাঁদিত, স্বদেশে ফিরিয়া আসিয়া যখন তিনি তাহার দুঃখ মোচনের জন্য ব্যস্ত-সমস্ত হইয়াছিলেন, কায়মনোবাক্যে তাহার হিতকামনায় নিরত হইয়াছিলেন, তখন তাঁহার সেই হৃদয়ব্যথার একদা পরিচয় পাওয়া গিয়াছিল। তিনি আত্ম-স্বজনের জন্য তত ভাবিতেন না, কিন্তু সমগ্র বঙ্গসমাজ ও জাতির জন্য ভাবিতেন। এ প্রবৃত্তি কি সন্ন্যাসিগণের হৃদয়ে অবস্থিতি করে। সন্ন্যাসিগণ কেবল আত্মোন্নতির জন্য ব্যস্ত। আপনার মুক্তিসাধনের জন্য দিনরাত অশেষ কষ্ট সহ্য করিয়া থাকেন। তাঁহারা সংসারের মায়া-মমতা একেবারে পরিত্যাগ করিয়া ফেলেন। হৃদয়ের সকল প্রবৃত্তি ও বাসনা বিসর্জন দেন। আত্মীয়-স্বজনের প্রতি স্নেহ মমতা ভুলিয়া যান। সংসারের কেহই তাঁহাদিগের ভাবনার বিষয় নহে। কাহারও প্রতি দয়া নাই, শ্রদ্ধা নাই, মমতা নাই, স্নেহ নাই। কাহারও জন্য এবং কিছুরই জন্য তাঁহাদিগের হৃদয়ে কখনও ব্যথা উপস্থিত হয় না। যদি হয়, তাহা তাঁহারা দমন করেন। তাঁহারা হৃদয়কে ক্রমশঃ শুষ্ক ও নীরস করিয়া ফেলেন, তখনই তাঁহারা একদা তৎসঙ্গে সংসারের সকল মায়া বিসর্জন দিয়া দেন। সেই মন, সেই হৃদয় তাঁহারা বরাবর রক্ষা করিয়া আসিতে থাকেন। কোন কোমল প্রবৃত্তির অঙ্কুরমাত্র তাহাতে জন্মিতে পারে না। অঙ্কুরোৎপত্তি হইবামাত্র তাহা বিনষ্ট করেন। কারণ তদ্রূপ অঙ্কুরকে স্থান দেওয়াই তাঁহাদিগের পক্ষে মহাপাতক। এ হৃদয় কি মান-বোচিত? এ ব্যক্তিগণকে কি সংসারে স্থান দেওয়া উচিত? তাঁহারা সংসারের জন্য নহে, সংসারও তাঁহাদিগকে চাহে না। তাঁহারা যত শীঘ্র সংসার হইতে দূরীকৃত হন, যত শীঘ্র তাঁহাদিগের পাপদৃষ্টান্ত সংসারকে স্পর্শ না করে, ততই সংসারের পক্ষে মঙ্গল ও শ্রেয়স্কর। রামমোহন রায় এ ধাতুর লোক ছিলেন না। তিনি এরূপ হৃদয়ে সংসারধাম পরিত্যাগ করেন নাই। এরূপ হৃদয়ে তিনি দেশে দেশে ভ্রমণ করেন নাই। এরূপ হৃদয় লইয়া তিনি স্বদেশে প্রত্যাগমন করেন নাই। এরূপ হৃদয়ে তিনি স্বদেশের মঙ্গলকার্যে ব্যাপৃত হন নাই। যখন তিনি স্বদেশে প্রত্যাগমন করেন, তখন তাঁহার হৃদয়কোষ স্বদেশের মমতায় ও স্বজাতির হিতকামনায় পরিপূর্ণ ছিল। তিনি গৃহে আসিয়া সেই পরিপূর্ণ হৃদয়ের সম্যক্ পরিচয় প্রদান করিয়াছিলেন। সেই হৃদয়-বাসনা চরিতার্থ করিবার জন্য সকল সম্পত্তি বিসর্জন দিয়াছিলেন, সকল কষ্ট সহ্য করিয়াছিলেন এবং সকল নিন্দার ভার গ্রহণ করিয়াছিলেন। ইহারই জন্য তিনি বিদূর বিদেশবাসে প্রাণ পরিত্যাগ করিলেন।

আশ্চর্য এই, রামমোহন রায়ের হৃদয়ে এই প্রকার সামাজিক প্রবৃত্তি কোথা

হইতে উৎপন্ন হইল। যে অপবিত্র, ঘোর স্বার্থপর জনসমাজক্ষেত্রে রামমোহন রায় বাস করিতেন, সে গগনে প্রবৃত্তির সুখস্পর্শ বায়ু কখনও বহিত না, যে লোক-মণ্ডলীর মধ্যে তিনি বাস করিতেন সেই লোকমণ্ডলীর স্বপ্নেতেও কখনও এ প্রবৃত্তির বিষয় উদয় হয় নাই। তখন ইউরোপীয় ভাব দেশমধ্যে প্রবেশ লাভ করে নাই। তখন ইংরেজি সাহিত্যে রামমোহন রায় শিক্ষিত হন নাই। সাহিত্য অধ্যয়ন করিলেই এরূপ ভাব তন্মধ্য হইতে গ্রহণ করা বড় সহজ লোকের কার্য নহে। রামমোহন রায় এই প্রবৃত্তি লইয়া জন্মগ্রহণ করিয়াছিলেন। দেশের দুরবস্থা তাঁহার এই প্রবৃত্তিরই স্ফূর্তিসাধন করিয়াছিল, এ প্রবৃত্তি ক্রমশঃ প্রবল হইয়া তাঁহার হৃদয়কে বলীয়ান্ করিয়াছিল। তিনি নিশ্চেষ্ট ও নিরীহ বাঙ্গালী ছিলেন না। তাঁহার হৃদয়বল ও চেষ্টায় দেশশুদ্ধ আলোড়িত হইয়াছিল। তিনি স্বদেশের প্রবৃত্তিস্রোতকে ভিন্ন দিকে ফিরাইয়া দিয়াছিলেন। তাঁহার এই প্রবৃত্তি তাঁহাকে একজন অসাধারণ লোক করিয়াছিল। একজন মহাজনের যশোগৌরবে উত্তোলিত করিয়াছিল। তিনি ইহারই জন্য সমগ্র বাঙ্গালীজাতি হইতে পৃথক হইয়াছেন।

রামমোহন রায় স্বদেশহিতৈষী সন্ন্যাসী ছিলেন। ঐশ্বরিক ধ্যান ও জ্ঞানে তাঁহার সন্ন্যাস নিয়োজিত ছিল না, কিন্তু তাঁহার সন্ন্যাস ঐশ্বরিক সর্বাঙ্গীণ উপাসনা, যে উপাসনা কেবল ঐশ্বরিক ধ্যানে নিঃশেষিত হয় না, যাহার প্রধান কার্য ঈশ্বরের প্রিয় কার্য সাধন করা, রামমোহন রায় সেই কার্যময় উপাসনায় বিশেষরূপে নিরত ছিলেন। এই উপাসনায় নিরত হইয়া রামমোহন রায় যেরূপ কঠিন যোগসাধন করিয়াছিলেন তাহা ভাবিতে গেলে আশ্চর্য হইতে হয়। তিনি দিবারাত্র এই সাধনায় অনুরক্ত থাকিয়া আহার নিদ্রা ভুলিয়া গিয়াছিলেন, ইহার জন্য তিনি বিব্রত হইয়া বেড়াইতেন। তাঁহার কার্যময় জীবনে বিশ্রান্তি ছিল না। এক কার্য সমাধা করিয়া অন্য কার্যে হস্তক্ষেপ করিতেন। স্বদেশের মঙ্গল যখন যে রূপে তাঁহার নিকট উদয় হইয়াছিল, তখন তিনি সেইরূপে তাহা সাধন করিতে চেষ্টা করিতেন, তিনি অনেক মঙ্গল অনুষ্ঠানে হস্তক্ষেপ করিয়া গিয়াছেন, অনেক মঙ্গলকার্য সাধন করিয়াছেন, তাঁহার তুল্য লোক আজি পর্যন্ত জন্মে নাই বলিয়া তাঁহার প্রারম্ভিত অনুষ্ঠানপ্রণালী অবলম্বিত হইল না। তাঁহার জীবন অগ্নিময় অনুরাগে পরিপূর্ণ ছিল। এখন সে অগ্নিরাশি চারিদিকে বিক্ষিপ্ত হইয়াছে, সে রাশির তাপ ও তেজ ক্ষুদ্র অগ্নিতে প্রাপ্ত হওয়া যায় না, এক্ষণকার স্বদেশহিতৈষী কতিপয় বাঙ্গালীর জীবনে ইহাই প্রমাণিত করে মাত্র। আমরা আজি পর্যন্ত কোন বাঙ্গালীর জীবন রামমোহন রায়ের মত কার্যময় ও উদ্যোগ-পূর্ণ দেখি নাই, সমুদায় জীবন কেবল, মঙ্গলময় উদ্যোগ ও অনুষ্ঠানে উৎসর্গিত

দেখি নাই, কার্যের পর কার্য, অনুষ্ঠানের পর অনুষ্ঠান, ব্রতের পর ব্রতে কাহারও জীবন অবিশ্রান্ত ভাবে নিয়োজিত হয় নাই, বিশ্রাম কাহাকে বলে রামমোহন রায়ের জীবনে তাহা লক্ষিত হয় নাই। এই কঠিন কার্যময় যোগসাধনায় রামমোহন রায় জীবনকে উৎসর্গিত করিয়াছিলেন। বাঙ্গালীর মধ্যে এরূপ যোগী ত কখন জন্মে নাই, অপর জাতি মধ্যেও এরূপ যোগী প্রাপ্ত হওয়া দুষ্কর। দুঃখের বিষয় ইহার দৃষ্টান্ত আজি পর্যন্ত কোন বাঙ্গালী অবলম্বন করেন নাই।

যে দেশের দুরবস্থা যত, সে দেশের সন্তানগণের কার্যভার তত গুরুতর, ভারতের দুরবস্থা যত, ভারতের সন্তানগণের কর্তব্য তত কঠিনতর। এরূপ কর্তব্যজ্ঞান ভারতসন্তানগণের মধ্যে কাহার আছে, বোধ হয় রামমোহন রায়ের এই জ্ঞান অন্তরে পূর্ণমাত্রায় উপলব্ধি ছিল। তিনি জানিতেন আমার স্বদেশ যতদূর দুরবস্থাগ্রস্ত, তাহার মঙ্গলোদ্দেশে ততদূর উদ্যোগী হওয়া আমার কর্তব্য। কিন্তু শুদ্ধ কর্তব্যজ্ঞানে রামমোহন রায় তাঁহার সদনুষ্ঠানব্রতে উত্তেজিত হন নাই। সেই জ্ঞান যে অনুরাগ আনিয়া দিয়াছিল, তাহা একটি প্রবল রিপুরূপে পরিণত হইয়াছিল। তিনি সেই রিপুবশবর্তী হইয়াছিলেন। যতক্ষণ না লোকে কোন রিপুর বশবর্তী হয়, ততক্ষণ তাহার সমস্ত জীবনকে ব্যাপৃত করিতে পারে না। রামমোহন রায়ের জীবনে এই রিপু ক্রমশঃই প্রবল হইতেছিল, তিনি সেই প্রবল রিপুর বশবর্তী হওয়াতে তাঁহার সমুদায় জীবন দেশের মঙ্গলময় কার্যাবলীতে ব্যাপৃত হইয়াছিল। এই রিপু তাঁহাকে স্বদেশহিতৈষী রামমোহন রায় করিয়াছিল। আশ্চর্য রামমোহন রায়ের কার্যশক্তি, আশ্চর্য তাঁহার যোগসাধনা।

রামমোহন রায় একজন অধ্যয়নশীল লোক ছিলেন। তিনি হিন্দুশাস্ত্রের বিস্তর গ্রন্থ তন্ন তন্ন করিয়া পাঠ করিয়াছিলেন। ইংরেজি ভাষা সুন্দর জানিতেন। তদ্ব্যতীত তিনি চারিটি ভাষায় ব্যুৎপন্ন ছিলেন। তাঁহার যে গ্রন্থ অধ্যয়নের প্রয়োজন হইত, একদিনে তাহা অধ্যয়ন করিতেন। সপ্তকাণ্ড রামায়ণ তিনি এইরূপ একদিনে অধ্যয়ন করিয়াছিলেন। অধ্যয়নকালে তাঁহার আহার নিদ্রা মনে থাকিত না। যখন যে গ্রন্থের আবশ্যক হইত, তিনি কলিকাতাময় তজ্জন্য অন্বেষণ করিতেন। কিন্তু তিনি যে শুদ্ধ জ্ঞানলাভের জন্য এতদূর অনুরক্ত ছিলেন, তাহা নহে, তিনি সুধীগণের মত শুদ্ধ বিদ্যার প্রতি অনুরাগী হইয়া অধ্যয়নশীল হয়েন নাই। তিনি যে মহৎ লক্ষ্যে সমুদায় জীবনকে ব্যাপৃত করিয়াছিলেন, অধ্যয়নশীলতা ও জ্ঞানলাভ তাহার অন্যতর উপায়মাত্র ছিল। ইহা তাঁহার একটি প্রধান উপায় ছিল। তাঁহার শত্রুদিগের উপর জয়লাভ করিবার এই প্রধান উপায় ছিল। তিনি ইহা দ্বারা প্রতিবাদিগণকে

পরাস্ত ও নীরব করিয়া সত্যজ্ঞান ও ধর্মের প্রচার করিতেন, পৃথিবীতে সত্যের পতাকা দৃঢ়রূপে প্রোথিত করিতেন।

রামমোহন রায়ের জীবনে একটি সুন্দয় শিক্ষা ও উপদেশ নিহিত আছে। হৃদয়ভার ক্রমশঃ কেমন প্রসারিত হয়, প্রীতি ক্রমশঃ কেমন বর্ধিত হয়, স্বদেশ-হিতৈষণা ও স্বজাতিপ্রেম ক্রমশঃ কেমন বিশ্বপ্রেমে পরিণত হয়, ইহা রামমোহন রায়ের জীবনে সুস্পষ্ট প্রকাশিত আছে। রামমোহন রায় প্রথমে স্বদেশের ধর্ম-সংস্করণে প্রবৃত্ত হন। সেই ধর্মসংস্করণ-কার্যে তাঁহাকে যে উৎপীড়ন সহ্য করিতে হইয়াছিল তাহাতে তাঁহার হৃদয়ানুরাগ ক্রমশঃ প্রগাঢ় হইয়াছিল। সেই কার্যে তিনি আরও দৃঢ়রূপে ব্রতী হইয়াছিলেন। যাহাতে সামান্য জনগণকে নিরুৎসাহ ও নিরুদ্যোগী করে, তাহাতে রামমোহন রায়কে দ্বিগুণতর উদ্যোগ ও উৎসাহে পূর্ণ করিয়াছিল। মহৎজনগণের জীবনের এই একটি সুন্দর ভাব, উৎপীড়নে তাঁহা-দিগের সদনুরাগ ক্রমশঃ বর্ধিত হইতে থাকে। রামমোহন রায়ের এই বর্ধিত অনুরাগ শুদ্ধ স্বদেশীয় ধর্মসংস্করণে নিঃশেষিত হয় নাই। ইহা ক্রমে স্বদেশহিতৈষণায় উত্থিত হইয়াছিল। যাহা প্রথমে ধর্মে আরব্ধ হইয়াছিল, তাহা ক্রমে ক্রমে সামাজিক মঙ্গলমাত্রে প্রসারিত হইয়াছিল। ধর্মসংস্কারক ক্রমে স্বদেশহিতৈষী পেট্রিয়টের মহৎকার্যে ব্যাপৃত হইয়াছিলেন। স্বদেশের সর্ববিধ মঙ্গল রামমোহন রায়ের আলোচ্য হইয়াছিল। ধর্মীয় হিতকামনা সামাজিক হিতকামনায় উন্নত হইল। তাঁহার হস্ত স্বদেশের সর্ববিধ মঙ্গলকার্যে প্রসারিত হইল। যে হৃদয়াকাশে সন্ধ্যাকালে কেবল একটিমাত্র উজ্জ্বল তারকা ফুটিয়াছিল, সেই হৃদয়াকাশে ক্রমশঃ সহস্র তারকা একে একে প্রস্ফুটিত হইল। অবশেষে তাহা বিশ্বপ্রেমের চন্দ্রালোকে আলোকিত হইয়া গেল। যে রামমোহন রায় একদিন শুদ্ধ স্বদেশের মঙ্গলোপায় ভাবিতেন, সেই রামমোহন রায় পরে ইংরেজ ও ফরাসী সমাজের উন্নতিকল্পনায় একদিন মস্তক আলোড়িত করিয়াছিলেন। কিন্তু দুর্ভাগ্যের বিষয় এই যে, যখন রামমোহন রায়ের বিশ্বপ্রেমপ্রবৃত্তি কেবলমাত্র সঞ্জাত হইতেছিল তখনই তিনি কালগ্রাসে পতিত হইলেন। আমরা তাঁহাকে স্বদেশ-হিতৈষী বলি, বিদেশীয়গণ তাঁহাকে বিশ্বপ্রেমিক বলেন। বিদেশীয়গণ অবশ্য তাঁহার বিশ্বপ্রেমের বিশিষ্টরূপ পরিচয় পাইয়াছেন। যদিও স্বদেশ তাঁহার মনকে এত অধিকার করিয়াছিল যে, তজ্জন্য তাঁহার বিশ্বপ্রেম স্ফূর্তি পাইতে পারে নাই, তথাপি আশ্চর্য এই, বিদেশীয়গণের নিকট তাঁহার সার্বভৌমিক প্রীতির এতদূর পরিচয় হইয়াছিল যে, তাহারা তাঁহাকে একজন বিশ্বপ্রেমিক নামে অভিহিত না করিয়া থাকিতে পারেন নাই।

আমরা রামমোহন রায়ের অনেকগুলি গুণের বিষয় আলোচনা করিয়াছি।

এইসমস্ত গুণ তাঁহার জীবনীতে সুন্দর প্রদর্শিত হইয়াছে, চিন্তাশীল ব্যক্তিমাত্রেই তাহা দেখিতে পান। এক্ষণে রামমোহনের নাম প্রধানতঃ যেজন্য এদেশমধ্যে সুপ্রচারিত আছে তাহারই বিষয় আলোচনা করিয়া প্রস্তাব সমাপ্ত করিব। দুই কারণে রামমোহনের নাম ভারতমধ্যে সুবিখ্যাত হইয়াছে। তিনি এদেশে প্রকৃত ও বৈদিক হিন্দুশাস্ত্রের আলোচনা প্রবর্তিত করেন এবং তৎপরে একেশ্বরের সার্বভৌমিক সামাজিক পূজার পরিস্থাপনা করিয়া যান। এই দুই কার্যে তিনি যে শুদ্ধ এতদ্দেশীয় ধর্মীয় জগৎকে আলোড়িত করিয়াছেন এমত নহে, সেই জগতের প্রবৃত্তিস্রোতকে বিভিন্নদিকে প্রত্যাবৃত্ত করিয়া দিয়াছেন। বলিতে গেলে, তিনি এদেশের ধর্মীয় জগতে এক মহাবিপ্লব সাধন করিয়াছেন।

বৈদিকসাহিত্যের আলোচনা এদেশে বহুকাল হইতে বিলুপ্ত হইয়াছিল। কিরূপে ও কোন্ সময় হইতে এরূপ ঘটিয়াছিল, তাহা আজি নিরূপণ করা একপ্রকার অসাধ্য কার্য। পূর্বে যাহা কিছু ছিল, কিন্তু মুসলমান রাজত্বকালে ত্রয়ীবিদ্যার আলোচনা একেবারে উঠিয়া গিয়াছিল বলিলেও বলা যাইতে পারে। ধর্মানুষ্ঠানে যে সমস্ত ক্রিয়াকাণ্ডের আবশ্যক ব্রাহ্মণপণ্ডিতগণ শুদ্ধ সেই শাস্ত্রের আলোচনা করিত। এমত কি, মনুর স্মৃতিশাস্ত্র যে ক্রিয়াকাণ্ডের নিদানভূত, সেই স্মৃতিরও মতামত সর্বসময় পরিগৃহীত হইত না। সুতরাং তাহারও আলোচনা ক্রমশঃ বিলোপ হইয়াছিল। এ সমস্ত শাস্ত্রের স্থানে, পৌরাণিক ও তান্ত্রিক সাহিত্য এবং কথঞ্চিৎ বৈষ্ণব গ্রন্থাদির আলোচনা প্রবর্তিত হইয়াছিল। রামমোহন রায় যে সময়ে উদিত হন, তখনকার কালে বঙ্গদেশে শাস্ত্রালোচনা একপ্রকার উঠিয়া গিয়াছিল বলিলে অত্যুক্তি হয় না। এই সময়কার অবস্থা সমালোচ্য গ্রন্থের একস্থানে সুন্দর বর্ণিত আছে। আমরা সে স্থলটি উদ্ধৃত না করিয়া থাকিতে পারিলাম না। পাঠকগণ তখনকার অবস্থার সহিত এখনকার সামাজিক অবস্থা তুলনা করিয়া দেখুন।

"রামমোহন রায় যে সময়ে কলিকাতায় আসিয়া উপস্থিত হইলেন, তখন সমুদয় বঙ্গভূমি অজ্ঞানান্ধকারে আচ্ছন্ন ছিল; পৌত্তলিকতার বাহ্যাড়ম্বর তাহার সীমা হইতে সীমান্তর পর্যন্ত পরিব্যাপ্ত ছিল, বেদের যে সকল ধর্মকাণ্ড, উপনিষদের ব্রহ্মজ্ঞান তাহার আদর এখানে কিছুই ছিল না, কিন্তু দুর্গোৎসবের বলিদান, নন্দোৎসবের কীর্তন, দোলযাত্রার আবীর, রথযাত্রার গোল, এই সকল লইয়াই লোকেরা মহা আমোদে, মনের আনন্দে কালহরণ করিত। গঙ্গাস্নান, ব্রাহ্মণ-বৈষ্ণবে দান, তীর্থভ্রমণ, অনশনাদিদ্বারা তীব্র পাপ হইতে পরিত্রাণ পাওয়া যায়, পবিত্রতা লাভ করা যায়, পুণ্য অর্জন করা যায়, ইহা সকলের মনে একেবারে স্থিরবিশ্বাস ছিল, ইহার বিপক্ষে কেহ একটি কথাও বলিতে পারিতেন না। অন্নের

বিচারই ধর্মের কাষ্ঠাভাব ছিল, অন্নশুদ্ধি উপায়েই বিশেষরূপে চিত্তশুদ্ধি নির্ভর করিত। স্বপাক হবিষ্যভোজন অপেক্ষা আর অধিক পবিত্রকর কর্ম কিছুই ছিল না। কলিকাতায় বিষয়ী ব্রাহ্মণেরা ইংরেজদিগের অধীনে বিষয়কর্ম করিয়াও স্বদেশীয়দিগের নিকটে ব্রাহ্মণ জাতির গৌরব ও আধিপত্য রক্ষা করিবার জন্য বিশেষ যত্ন করিতেন। তাঁহারা কার্যালয় হইতে অপরাহ্নে ফিরিয়া আসিয়া অবগাহন স্নান করিয়া ম্লেচ্ছসংস্পর্শজনিত দোষ হইতে মুক্ত হইতেন এবং সন্ধ্যাপূজাদি শেষ করিয়া দিবসের অষ্টম ভাগে আহার করিতেন। ইহাতে তাঁহারা সর্বত্র পুজ্য হইতেন এবং ব্রাহ্মণ পণ্ডিতেরা তাঁহাদের যশঃ সর্বত্র ঘোষণা করিতেন। যাঁহারা এত কষ্ট স্বীকার করিতে না পারিতেন, তাঁহারা কার্যালয়ে যাইবার পূর্বেই সন্ধ্যা-পূজা হোম সকলই সম্পন্ন করিতেন ; এবং নৈবেদ্য ও টাকা ব্রাহ্মণদিগের উদ্দেশ্যে উৎসর্গ করিতেন। তাহাতেই তাঁহাদিগের সকল দোষের প্রায়শ্চিত্ত হইত। ব্রাহ্মণ পণ্ডিতেরা তখন সংবাদপত্রের অভাব অনেক মোচন করিতেন। তাঁহারা প্রাতঃকালে গঙ্গাস্নান করিয়া পূজার চিহ্ন কোশা-কুশি হস্তে লইয়া সকলেরই দ্বারে দ্বারে ভ্রমণ করিতেন এবং দেশবিদেশের ভাল মন্দ সকল প্রকারই সংবাদ প্রচার করিতেন। বিশেষতঃ কে কেমন দাতা, শ্রাদ্ধ দুর্গোৎসবে কে কত পুণ্য করিলেন, ইহারই সুখ্যাতি ও অখ্যাতি সর্বত্র কীর্তন এবং ধনদাতাদিগের যশঃ-মহিমা সংস্কৃত শ্লোক দ্বারা বর্ণন করিতেন। ইহাতে কেহ বা অখ্যাতির ভয়ে, কেহ বা প্রশংসালাভের আশ্বাসে বিদ্যা-শূন্য ভট্টাচার্যদিগকেও যথেষ্ট দান করিতেন। শূদ্র ধনীদিগের উপর তাঁহাদিগের আধিপত্যের সীমা ছিল না। তাঁহারা শিষ্যবিত্তাপহারক মন্ত্র-দাতা গুরুর ন্যায় কাহাকেও পাদোদক দিয়া কাহাকেও পদধূলি দিয়া যথেষ্ট অর্থ উপার্জন করিতেন। ইহার নিদর্শন অদ্যাপি গ্রামে নগরে বিদ্যমান রহিয়াছে। তখনকার ব্রাহ্মণ পণ্ডিতেরা ন্যায়শাস্ত্রে ও স্মৃতিশাস্ত্রে অধিক মনোযোগ দিতেন এবং তাহাতে যাঁহার যত জ্ঞানানুশীলন থাকিত তিনি তত মান্য ও প্রতিষ্ঠাভাজন হইতেন। কিন্তু তাঁহাদের আদিশাস্ত্র বেদে এত অবহেলা ও অনভিজ্ঞতা ছিল যে, প্রতিদিন তিন বার করিয়া যে সকল সন্ধ্যার মন্ত্র পাঠ করিতেন তাহার অর্থ অনেকে জানিতেন কিনা সন্দেহ। বিষয়ী ধনীদিগের মধ্যে ত কোন প্রকার বিদ্যাচর্চা ছিল না। চলিত বাঙ্গালা ভাষার ব্যাকরণ জানা দূরে থাকুক কাহারও বর্ণাশুদ্ধিজ্ঞান ছিল না। বিষয়কর্মের উপযোগী পত্রলেখা ও অঙ্ক জানা থাকিলেই তাঁহাদের পক্ষে যথেষ্ট হইত। তাঁহাদের মধ্যে যাঁহারা পারসী পড়িতে ও ইংরেজী অক্ষর ভাল করিয়া লিখিতে পারিতেন তাঁহারা বিদ্যার গরিমা আর মনে ধারণ

করিতে পারিতেন না। তখনকার বাঙ্গালা পুস্তকের মধ্যে কেবল চৈতন্য-চরিতামৃত, কবিকঙ্কণের চণ্ডী, আর ভারতচন্দ্রের অন্নদামঙ্গল ও বিদ্যা-সুন্দর প্রসিদ্ধ, এ সকলই পদ্যের; গদ্যের গ্রন্থ তখন একখানিও ছিল না। বুলবুলি ও ঘুঁড়ীর খেলা, কৃষ্ণযাত্রা ও কবির লড়াই, বিন্ সেতার ও তবলাতেই তখনকার কলিকাতার যুবাদিগের আমোদ ছিল, এবং তাহারা দোলের আবির খেলার ন্যায় নন্দোৎসবের গোলা হরিদ্রা লইয়া পথে ঘাটে দলে দলে মাতা-মাতি করিয়া ফিরিতেন ও দেবকী প্রসূতির প্রসাদ ঝালের লাড়ু ভক্তিপূর্বক খাইতেন। তথাপি অনেক রক্ষা ছিল এই যে, তখন পানদোষ তাহার মধ্যে প্রবেশ করে নাই এবং ইউরোপ দেশের বিজাতীয় সভ্যতার কলঙ্ক তাহাতে লিপ্ত হয় নাই।”

বঙ্গদেশের যখন এইরূপ অবস্থা, রামমোহন রায় তখন জন্মগ্রহণ করেন। দেশ যখন অজ্ঞানতায় পরিপূর্ণ, রামমোহন রায় তখন শাস্ত্রালোচনা আরম্ভ করেন। অতি তরুণ বয়সেই পৌত্তলিকতার প্রতি তাঁহার বিদ্বেষ জন্মে এবং সেই পৌত্তলিকতার প্রতিবাদ করিতে উদ্যত হয়েন। ইহার ফলাফল যাহা ঘটিয়াছিল তাহা সকলেরই বিদিত আছে। যাহাতে তাঁহার মত সমর্থন করিতে পারেন এরূপ গ্রন্থাদি তিনি নানাদেশে গিয়া পড়িতে আরম্ভ করেন। তাহাতে ব্যুৎপন্ন হইয়া গৃহে ফিরিয়া আসেন এবং ফিরিয়া আসিয়া তাহারই সম্যক্ আলোচনায় প্রবৃত্ত হয়েন। তিনি স্বদেশীয়গণের মন সেই সকল এক-ব্রহ্ম-প্রতিপাদক গ্রন্থাদির প্রতি প্রথম আকৃষ্ট করেন। তিনি দেখিয়াছিলেন, পুরাণাদির অলীক মতামতসমূহ দেশমধ্যে এতদূর সুপ্রচারিত যে তাহাতে ধর্ম ও ঈশ্বর সম্বন্ধীয় প্রকৃত তত্ত্ব সমুদায় একেবারে বিলুপ্তপ্রায় হইয়াছে। যে মূল বৈদিকশাস্ত্রে, উপনিষদে ও দর্শনাদিতে সেই প্রকৃত তত্ত্ব সমুদায় প্রাপ্ত হওয়া যায় তাহার আলোচনা দেশমধ্যে কিছুই নাই। অথচ হিন্দুজাতির তাহাই প্রধান ও মূল শাস্ত্র। এজন্য তিনি সেই শাস্ত্রের প্রতি যাহাতে সাধারণ জনগণের মন আকৃষ্ট হয় এমত চেষ্টা করিয়াছিলেন। সে চেষ্টা যে বিফল হইয়াছে একথা কেহ বলিতে পারেন না। যেহেতু তাঁহারই সময় হইতে বেদ ও দর্শনাদির আদর বৃদ্ধি হইয়াছে।

মাষ্টার ফেয়ারবেয়ারন বলেন* যে আর্যজাতির শাস্ত্রমধ্যে যে একেশ্বর-বাদ প্রাপ্ত হওয়া যায় তাহার সহিত সেমেটিক জাতীয় ধর্মশাস্ত্র নিহিত একেশ্বরবাদের একটু বিভিন্নতা আছে। তিনি কহেন, আর্যজাতীয় ধর্মশাস্ত্রের

* In his 'Studies on the Philosophy of Religion'.

মূল প্রকৃতিপূজা। আদিতে এই প্রকৃতিপূজাই প্রচলিত ছিল। প্রকৃতিপূজা হইতে আর্যজাতি একেশ্বরবাদে উত্থিত হয়েন, এজন্য তিনি বলেন যে যদিও আমরা দেখিতে পাই যে, আর্যজাতীয় একেশ্বরবাদে ঈশ্বরের একত্ব ব্যক্ত হইয়াছে বটে, কিন্তু সেমিটিক জাতীয় ধর্মশাস্ত্রে যেমন বলে যে, সেই এক ঈশ্বর ব্যতীত আর দ্বিতীয় ঈশ্বর নাই, দেব দেবতা সকলই মিথ্যা, একেশ্বরবাদের এই সূক্ষ্ম তত্ত্ব আর্যজাতীয় ধর্মে প্রাপ্ত হওয়া যায় না। আর্যশাস্ত্রে যেমন একদিকে বলিয়াছে ব্রহ্ম একমাত্র, অন্যদিকে বলিয়াছে তাঁহার সহস্র অবতার। কিন্তু সেমিটিক জাতীয় ধর্মে ব্রহ্ম ব্যতীত দ্বিতীয় দেবতার অস্তিত্ব ও অবতারণ অসম্ভব। জিসস এই একেশ্বরবাদ শিক্ষা দেন। মহম্মদ ইহার প্রধান উপদেশক।* ফেয়ারবেয়ারনের এ সমস্ত কথা কতদূর সত্য তাহা এস্থলে আলোচিত হইতে পারে না। তাহা একটি স্বতন্ত্র প্রস্তাবের বিষয়। কিন্তু রামমোহন প্রাণপণে প্রমাণ করিতে চেষ্টা করিয়াছেন যে, আর্যজাতীয় ধর্মেও ফেয়ারবেয়ারন যাহাকে সেমেটিক জাতীয় একেশ্বরবাদ বলেন, তাহা সুস্পষ্ট বিদ্যমান আছে। তিনি এক নিরাকার ব্রহ্ম ব্যতীত দ্বিতীয় ব্রহ্ম নাই. এই বৈদিক মত দ্বারা পৌত্তলিকতার সম্পূর্ণ প্রতিবাদ করিয়াছেন। যাঁহারা সেই বেদাদি হইতেও দ্বিতীয় ব্রহ্ম অথবা দেবতার কল্পনার অস্তিত্ব প্রমাণ করিতে গিয়াছেন, রামমোহন রায় তাঁহাদিগের বিপক্ষে আপন মত সমর্থন করিয়াছেন। তবে রামমোহনের যুক্তি সমুদায় কত শাস্ত্রসঙ্গত তাহা এখনও সমালোচ্য হইতে পারে। এমত হইতে পারে যে, রামমোহন রায়ের একেশ্বরবাদ সম্বন্ধীয় মত মহম্মদীয় অথবা খৃষ্টীয় ধর্ম হইতে প্রথমে গৃহীত হইয়া থাকিবে; তৎপরে তিনি সেই মত হিন্দু ধর্মে আরোপ করিয়া তাহার সমর্থন করিয়া গিয়াছেন।

বৈদিক শাস্ত্রে একমাত্র অদ্বিতীয়ের স্বরূপনিরূপণ যেরূপই হউক না কেন, উপনিষদ ও দর্শনশাস্ত্রে ঐশ্বরিক কল্পনা যে অতি পরিস্ফুট রূপে পরিব্যক্ত আছে তাহা সকলেই স্বীকার করিবেন। কিন্তু দার্শনিক ঈশ্বর যত কেন পরিস্ফুট রূপে পরিব্যক্ত হউক না কেন, তাহা কেবল কল্পনা ও নীরস চিন্তার বিষয় মাত্র

* Mr. Fairbairn traces upwards Indo-European religion from its more complete to its simpler forms, until he finds it in that condition which is generally understood by the word Monotheism, but which, it must be admitted, is more accurately designated as Henotheism, the affirmative belief in one God without the sharply defined exclusive line, which makes it a belief in Him as the only God. This latter form of monotheism proper may be rather the semetic than the Aryan conception.—W. E. Gladstone.

ছিল, তাহা কেহ কখন পূজার বিষয় করেন নাই। পাতঞ্জলের ঈশ্বরভক্তি কখন পূজাতে পরিণত হয় নাই, তাহা কেবল শুদ্ধ ঈশ্বর কল্পনা করিয়াই সন্তুষ্ট ছিল। কিন্তু দার্শনিক ঈশ্বরকল্পনা ও পূজার ঈশ্বর এ দুই বিভিন্ন ভাব, দার্শনিকতত্ত্বে ঈশ্বরের অনেক স্বরূপ নিরূপণ হইয়াছে বটে, কিন্তু কোন মুনি, ঋষি আজি পর্যন্ত ভারতবর্ষে ঐশ্বরিক পূজা প্রতিষ্ঠা করিয়া যান নাই, ঈশ্বরকে কেহ ব্যক্তি-স্বরূপ দর্শন করেন নাই। দর্শনশাস্ত্রে ঈশ্বরের একত্ব অদ্বিতীয়ত্ব প্রতিপাদন করিয়াছে সত্য কিন্তু তাহা কেবল মতখণ্ডন মাত্র। কোন উপনিষদ বা দর্শন-শাস্ত্রপ্রণেতা ঐশ্বরিক ধর্ম স্থাপন করিয়া যান নাই। ধর্মের ঈশ্বর পূজার বিষয়, কিন্তু দর্শন ও তত্ত্ববিদ্যার ঈশ্বর, কেবল চিন্তার ফল মাত্র।*

রামমোহন রায় এই বৈদিক ও দার্শনিক ঈশ্বরকে পূজার বিষয় করিয়া গিয়াছেন। তিনি উপনিষদ ও দর্শনের ঐশ্বরিক তত্ত্ব কেবল নিরূপণ ও উৎঘোষণ করিয়া ক্ষান্ত হয়েন নাই, সেই শুষ্ক ও নীরস চিন্তার বিষয়কে পূজার সামগ্রী করিতে চেষ্টা পাইয়াছেন। তিনি দর্শনশাস্ত্র হইতে ঈশ্বরকে বিমুক্ত করিয়া দেবালয় ও মন্দিরবেদির উপর তাঁহাকে স্থাপন করিয়া গিয়াছেন। গ্রন্থকার লিখিয়াছেন "রামমোহন রায় নূতন কি করিয়া গিয়াছেন ?" নিরাকার পরমেশ্বরের উপাসনা কি নূতন ? সহস্র সহস্র বৎসর পূর্বে ভক্তিভাজন মহর্ষি-গণ নিরাকার ব্রহ্মকে করতলন্যস্ত আমলকবৎ অনুভব করিয়াছিলেন। অনুভব করিয়াছিলেন সত্য, কিন্তু প্রকাশ্য রূপে তাঁহার অর্চনাপ্রণালী কেহ স্থাপন করিয়া যান নাই। এ দেশে দেবাদির অর্চনাপ্রণালী যেমন প্রবর্তিত আছে একে-শ্বরের উপাসনাপ্রণালী সেরূপ প্রবর্তিত করিতে কোন মুনি ঋষি কখন যত্ন করেন নাই। বৌদ্ধ ধর্ম নিরীশ্বর ছিল। অথবা তাহা বৌদ্ধদেবের উপাসনা-প্রণালী মাত্র, রামমোহন যথার্থ একেশ্বরের উপাসনাপ্রণালী প্রবর্তিত করিতে যত্ন করিয়াছিলেন। ভারতে এই তাঁহার নূতন কার্য। আশ্চর্য এই, যে ভারতে ঈশ্বরচিন্তা এতদূর উন্নত হইয়াছে যে, আজিও ইউরোপীয় দর্শন তদূর্ধ্বে উঠিতে পারে নাই, সেই ভারত চিরকাল পৌত্তলিকতায় পূর্ণ ছিল! আশ্চর্য এই, যে মুনিঋষিগণ ঐশ্বরিক ভাবে ততদূর উন্নতি করিয়াছিলেন, তাঁহারা কখন নিজ

* Mr. Fairbairn recognises the tendency of the semetic races to Monotheism, and considers that Indo-European man not only has been tolerant of the different gods of different nations, but has conceived the Divine Unity as abstract, while the semite holds it as personal. The Indo-European tendency was not to religious multiplicities, but to philosophic unities. The God of a religion is an object of worship; the deity of a philosophy is the product of speculation—W. E. Gladstone.

নিজ নবভাবে মোহিত হইয়া দেবপূজাস্থলে একেশ্বরের অর্চনা প্রতিষ্ঠা করিয়া যান নাই। সে কার্যের জন্য যে কয়জন রামমোহনের আবশ্যক হইবে এই আশ্চর্য। দুই সহস্র বৎসর মধ্যে ভারতে কি এমত কেহ জন্মেন নাই যে এই কার্য সম্পন্ন করিয়া উঠেন।

খ্রীষ্টীয় ধর্মে প্রকৃত ঐশ্বরিক পূজা নাই। নিজে জিসস ও তদীয় শিষ্যগণ যে ঐশ্বরিক পূজা প্রতিষ্ঠা করিতে মানস করিয়াছিলেন, খ্রীষ্টানেরা সে ঐশ্বরিক পূজাকে বিকৃত করিয়া ফেলিয়াছেন। মহম্মদীয় ধর্মে কেবল ঐশ্বরিক পূজা আছে। কিন্তু সে ঐশ্বরিক পূজায় নিতান্ত অনুদার মুসলমান ভিন্ন অন্য কেহ অধিকৃত নহে। মহম্মদীয় ঐশ্বরিক কল্পনাও তত বিশুদ্ধ নহে, তদপেক্ষা জিসসের ও হিন্দুশাস্ত্রীয় ঐশ্বরিক কল্পনা অধিকতর বিশুদ্ধ ও পবিত্র। রামমোহন যে ঐশ্বরিক কল্পনা গ্রহণ করেন তাহা সম্পূর্ণ হিন্দুশাস্ত্রসঙ্গত। তিনি দেখিয়াছিলেন, আমাদিগের উপনিষদ ও দর্শনেও যখন সে কল্পনা অতি বিশুদ্ধ ও পবিত্র রূপে পাওয়া যায়, তখন অন্য ধর্মের কল্পনা গ্রহণ করা অন্যায়। তিনি এই উপনিষদের ঈশ্বরের উপাসনা জন্য সমাজ প্রতিষ্ঠা করিলেন। এক্ষণকার ব্রাহ্মসমাজ রামমোহন রায়ের সুমহৎ কীর্তিস্তম্ভ।

ভারতে ঐশ্বরিক উপাসনাপ্রণালী প্রতিষ্ঠা করা নূতন কার্য হইলেও জগতে তাহা নূতন কার্য নহে। জগতের মধ্যে রামমোহন রায় কি নূতন কার্য করিয়া গিয়াছেন। রামমোহন রায় প্রবর্তিত একেশ্বরের উপাসনাপ্রণালী মধ্যেও একটি নূতন ভাব বিদ্যমান আছে, আমাদিগের গ্রন্থকার রামমোহন রায়ের সেই প্রধান ভাবটি এইরূপে ব্যক্ত করিয়াছেন :—

"মহাজনগণের জীবনবৃত্ত পাঠ করিলে দেখা যায় যে, নানা মহৎ ভাবের মধ্যে একটি ভাব প্রধান হইয়া তাঁহাদিগের জীবনপথের নেতাস্বরূপ হয়। তাঁহারা যাহা কিছু বলেন, যাহা কিছু করেন, সেই ভাবটি তন্মধ্যে মধ্যবিন্দু হইয়া অবস্থিতি করে। 'আত্মাতে পরমাত্মার দর্শন' উপনিষদকারদিগের ইহাই প্রধান ভাব। 'বিশ্বব্যাপী মৈত্রী' বুদ্ধদেবের ইহাই প্রধান ভাব। 'আপনাকে আপনি জান', সক্রেটিসের ইহাই প্রধান ভাব। 'একমাত্র ঈশ্বরের পূজা, অপর সকল দেব-পূজার প্রতিবাদ' মহম্মদের ইহাই প্রধান ভাব। 'ধর্মচিন্তায় ব্যক্তিগত স্বাধীনতা' লুথরের ইহাই প্রধান ভাব। 'ভক্তিতেই মুক্তি' চৈতন্যের ইহাই প্রধান ভাব। 'মানব প্রকৃতির সর্বাঙ্গীণ উন্নতি' থিওডোর পার্কারের ইহাই প্রধান ভাব। সেইরূপ রাজা রামমোহন রায়ের প্রধান ভাব 'সার্বভৌমিক উপাসনা'। কেবল তাহাই নহে, সেই সার্বভৌমিক উপাসনার জন্য সমাজ প্রতিষ্ঠা, এটিও

জগতের পক্ষে নূতন। দ্বিতীয় ভাবটি প্রথম ভাবেরই অন্তর্ভুক্ত। এই ভাবের মৌলিকত্ব কেহ অস্বীকার করিতে পারেন না।”

রামমোহন রায়ের এই উদার ভাব তৎপ্রতিষ্ঠিত ব্রাহ্মসমাজের ট্রস্টডিডে প্রকাশিত আছে। তিনি এইরূপ উদার ভাবে এক ব্রহ্মের প্রকাশ্য উপাসনালয় স্থাপন করিয়া ভারতে অক্ষয় কীর্তিস্তম্ভ রাখিয়া গিয়াছেন। আজি সেই ব্রাহ্ম সমাজ নানা শাখা-বিশাখায় বিস্তৃত হইয়া ঈশ্বরের যশোঘোষণার সঙ্গে সঙ্গে রামমোহন রায়ের সুমহৎ জীবনের পরিচয় দিতেছে। এই ব্রাহ্মসমাজের সহিত রামমোহন রায়ের নাম পৃথিবীতে চিরদিন অবস্থান করিবে।

জ্যৈষ্ঠ ১২৮৮

৬ / গ্রন্থ-প্রসঙ্গ

বেদ ও বেদব্যাখ্যা

বেদপ্রকাশিকা, ঋগ্বেদ সংহিতা ভাষা সংক্ষিপ্ত টীকা বাঙ্গালা অনুবাদ এবং বাঙ্গালা টিপ্পনীর সহিত শ্রীরামনাথ সরস্বতী এম. এ. কর্তৃক বিশদীকৃত, ব্যাখ্যাত। ভাষান্তরীকৃত ও প্রকাশিত। প্রথম খণ্ড।

বাঙ্গালা ভাষায় বাঙ্গালা অক্ষরে বাঙ্গালা টীকা বাঙ্গালা অনুবাদের সহিত বেদের প্রকাশ এক নূতন জিনিস। বাঙ্গালা তন্ত্রময়, বাঙ্গালা পুরাণময়, বাঙ্গালা অনার্যজাতিপরিপূর্ণ, বাঙ্গালা হইতে প্রায় পাঁচশত বৎসর বেদের চাষ উঠিয়া গিয়াছে। এখন এই বাঙ্গালায় যিনি আর্যজাতির গর্বহেতু বেদের প্রকাশ, বেদের চর্চা, বেদের ব্যাখ্যা আরম্ভ করিতে চাহেন, তিনি বঙ্গীয় আর্য-দিগের একজন প্রবীণ বন্ধু, তাঁহার নিকট আমরা আপনাদিগকে বাস্তবিকই ঋণী বলিয়া বোধ করি। রমানাথ সরস্বতী এই দুরূহ কার্যের ভার লইয়াছেন, এজন্য তিনি আমাদের ধন্যবাদের পাত্র। আজি আমরা রমানাথ সরস্বতীর বেদপ্রকাশিকা উপলক্ষ করিয়া বেদের বিষয় কিছু লিখিব বাসনা করিয়াছি। বেদ জিনিসটি কি, বেদের কিরূপে অর্থ করিতে হয়, বেদের উপর কত ব্যাকরণ, কত অভিধান, কত ছন্দোবোধ, কত দর্শন লেখা হইয়াছে, বেদের উপর দেশীয় লোকের ও বিদেশীয় পণ্ডিতদিগের কিরূপ আদর, এই সকল বিষয়ে কিছু কিছু বলিব ইচ্ছা করিয়াছি। আমাদের দেশের লোক বেদ পুরাণ ইত্যাদি বড় একটা পড়েন না। তাঁহারা যদি বেদ ও বেদব্যাখ্যার উপব দুই ফর্মা আর্টিকেল দেখেন অমনি বঙ্গদর্শনের গ্রাহকশ্রেণী হইতে নাম তুলিয়া লইবেন; এইজন্য আমরা প্রাণপণে চেষ্টা করিব যত অল্পে পারি গোটাকত মোটা কথা বলিয়া বেদপ্রকাশিকা বঙ্গীয় পাঠকসমাজে পরিচিত করিয়া দিব।

বেদের নাম শুনিলেই আমাদের দেশে আবালবৃদ্ধবনিতা সকলেরই মনে ভয়-ভক্তিসম্বলিত কেমন একটি প্রকাণ্ড ভাবের উদয় হয়। বেদ যে পড়িল সে একজন ক্ষণজন্মা পুরুষ যে বেদব্যাখা করিল সে শঙ্কর বা নারায়ণের

অবতার। বেদ পড়িতে হইলে শরীর ও মন উভয়কে পবিত্র করিয়া পড়িতে হইবে। যে বেদ পড়িল সে মন্ত্রবলে অসাধ্যসাধন করিতে পারে। বিশ্বামিত্র মন্ত্র পড়িলেন, অমনি দ্বাদশ বৎসর অনাবৃষ্টির পর মুষলধারে বৃষ্টি আরম্ভ হইল। এখান হইতে মন্ত্র পড়িলাম, দিল্লীতে আমার শত্রুনিপাত হইল; বন্ধ্যার বন্ধ্যাত্বমোচন বেদমন্ত্রে হয়, রোগী আরোগ্য হয়, নির্ধনের ধন হয়। লোকে মৃত্যুমুখ হইতে মন্ত্রবলে প্রত্যাবৃত্ত হয়। কোন প্রমাণ দিতে হইলেই "বেদের বচন" বলিলেই আর তাহার উপর দ্বিরুক্তি নাই। এইরূপ অজ্ঞ-লোকের সংস্কার বেদ মোহিনীময়, উহা দ্বারা অসাধ্যসাধন হয়, কিন্তু উহা দুর্বোধ্য, দুষ্পাঠ্য, দুষ্প্রবেশ্য, দুরধিগম্য। সরস্বতীর বিশেষ অনুগ্রহ না থাকিলে, পূর্বজন্মের বিশেষ পুণ্যবল না থাকিলে, বেদ কাহারও আয়ত্ত হইবার নহে।

কিন্তু বাস্তবিক বেদ কি জিনিস? ভিন্ন ভিন্ন কালের ভিন্ন ভিন্ন অবস্থায় ভিন্ন ভিন্ন কারণে ভিন্ন ভিন্ন মহাকবিপ্রণীত, কতকগুলি কবিতা গান আদির সংগ্রহ মাত্র। আমরা তাহা বুঝাইবার চেষ্টা করিতেছি, কিন্তু ভরসা করি, যাঁহারা কেবল সংস্কৃতব্যবসায়ী অথচ বেদ পড়েন নাই, কেবল জানেন বেদ ব্রহ্মার প্রণীত, তাঁহারা এই অংশটি পাঠ করিতে বিরত হইবেন।

প্যালগ্রেভস গোল্ডেন ট্রেজারি অফ সংস এণ্ড লিবিস (Palgrave's Golden Treasury of Songs and Leaves) হইতে এই জিনিসের প্রভেদ নাই। পূর্বোক্ত ইংরেজি গ্রন্থও ভিন্ন ভিন্ন মহাকবিপ্রণীত কবিতা ও গান সংগ্রহমাত্র। অনেক ঋষিপ্রণীত সূক্ত বেদে গ্রন্থিত আছে। যদি গোল্ডেন ট্রেজারির সহিত তুলনা করিতে কষ্ট বোধ হয়, স্কান্দিনেভিয় সাগা সংগ্রহের সহিত ঠিক তুলনা হইবে। আজি লডব্রক ভূগর্ভস্থ কারাগৃহে শত্রুপুরীমধ্যে প্রাণত্যাগ করিলেন। তাঁহার এক সাগা মৃত্যুগীত রহিল, কালি মার্টন যুদ্ধে জয়ী হইল, আর-এক সাগা হইল, এইরূপ সাগা একত্র সংগ্রহ করিলে যাহা হয়, বেদও প্রায় সেইরূপ।

কিন্তু সাগাসংগ্রহ হইতে বেদের আদরগত এত তারতম্য কেন? গীতসংগ্রহ গীতেরই সংগ্রহ, তাহার ধর্মের উপর এত আধিপত্য কেন? আর শতাধিক পুরুষ ধরিয়া এই বেদের জন্য লোকের এত মাথাব্যথা কেন?

প্রধান কারণ বেদের প্রাচীনত্ব। পৃথিবীর মধ্যে যত গ্রন্থ আছে, বেদ সর্বা-পেক্ষা প্রাচীন, তাহার আর সন্দেহ নাই। ইউরোপীয় সময়তালিকাকারদিগের বিশ্বাস যে, ভারতবর্ষীয় সময়তালিকাকারগণকৃত সময়নির্দেশ ভ্রমাত্মক, আমরা যাহাকে বহু বৎসরের পুরাণ বলি তাঁহারা উহাকে ১৫০০ বৎসরের বলিতে চান। আমরা বেদসংগ্রহকে ৪৯৭৭ বৎসরের পুরাণ বলিতে চাই, উঁহারা

বলেন, যীশু খ্রীষ্টের পূর্ব দ্বাদশ শতাব্দীতে বেদসংগ্রহ হয়। তাহাই স্বীকার, তথাপি বেদ প্রাচীনতম গ্রন্থ। বাইবেল উহা হইতে নূতন। যদিই তুরাণীয় বা অন্য জাতির অন্য কোন প্রাচীনতম গ্রন্থ থাকে তবে তাহা অপেক্ষাও আর্যজাতির বেদ যে সর্বপ্রাচীন গ্রন্থ তাহাতে অণুমাত্র সন্দেহ নাই।

আর-এক কথা এই যে, যেকালে বেদ রচনা হয়, সেকালের কথা জানিতে হইলে, আমাদের বেদ ভিন্ন আর উপায় নাই, অথচ মানবজাতির বাল্যাবস্থার ভাব কি ছিল জানিবার জন্য লোকের বড়ই ঔৎসুক্য। সুতরাং বেদ ভাল করিয়া পড়া আবশ্যক। মনে করুন, ৩০০০ বৎসর পরে ইংরেজদিগের সকল পুস্তক নষ্ট হইয়া গেল, কেবল গোল্ডন ট্রেজরি রহিল। তখন গোল্ডেন ট্রেজরিরও এইরূপ মান হইবার সম্ভাবনা, কারণ উহা ভিন্ন ইংরেজ জাতির চিন্তাশক্তি, কবিত্বশক্তি, সমাজপ্রণালী ইত্যাদি জানিবার আর উপায় থাকিল না।

ইতিহাসলেখক ও প্রত্নতত্ত্বব্যবসায়িগণ বেদের ঐতিহাসিক মাহাত্ম্য মাত্র দেখিবেন। কিন্তু যিনি কবি তিনি দেখিবেন, বেদের তুল্য কাব্য জগতে আর নাই। বেদ হোমারের একখানি মহাকাব্য মত নহে। কিন্তু বেদের এক-একটি সূক্ত এক-একখানি মহাকাব্য। মানবজাতির তখন শৈশবকাল, বাহ্যজগতে এখন তাহাদিগের যেরূপ অসীম আধিপত্য জন্মিয়াছে, তখন সেরূপ কিছুই ছিল না। তখন অগ্নি বায়ু মেঘ বজ্র বিদ্যুৎ বাত্যা সকলেই দেবতা। অগ্নির অধিষ্ঠাত্রী দেবতা অগ্নিই নহে, অগ্নি দেবতা। অধিষ্ঠাত্রী দেবতা সম্বন্ধে সংস্কার জন্মিতে অনেক চিন্তার প্রয়োজন, শৈশবে সে চিন্তার ক্ষমতাও তাঁহাদের ছিল না। তাঁহারা জগতের যাবতীয় বস্তুকেই শিশুর চক্ষে দেখিতেন—সকলই উজ্জ্বল বিচিত্রবর্ণে চিত্রিত দেখিতেন। কবির চক্ষে দেখিতেন। অথচ হোমারের ন্যায় বৃহৎ কাব্যগ্রন্থ রচনায় যে জ্ঞান, যে পরিশ্রম, অন্তর্জগতের উপর যে আধিপত্য প্রয়োজন, তাহা তাঁহাদের ছিল না। সুতরাং তাঁহারা কেবল হৃদয়ের গভীরতার ভয় ভক্তি স্নেহ আশঙ্কা আশা ভরসা ইত্যাদি মাত্র প্রকাশ করিয়াই ক্ষান্ত থাকিতেন। কিন্তু সেই ভাবগুলি ব্যক্ত তাঁহারা কিরূপে করিয়াছেন! সে ভাব প্রকাশে চাতুরী নাই, শ্রম নাই, চিন্তা নাই। কোন ভাব ভয় কি ভক্তি মনে উদয়মাত্রেই তাহা সমস্ত অন্তর অধিকার করিয়াছে, আর অমনি তাহা বাক্যে প্রকাশ করিয়াছে। সে বাক্য সরল প্রাঞ্জল ও মহীয়ান্, ভাবও সরল প্রাঞ্জল ও মহীয়ান্, অলঙ্কারের দোষ পরিচ্ছেদের ভয় নাই, সুরুচি কুরুচি চিন্তা নাই, আর পাঁচজনকে ভুলাইবার জন্য ভাবপ্রকাশের চাতুরী নাই। তাঁহাদের ভাষা ও ভাব এক, এবং অপরূপ মহত্ত্বসম্পন্ন। বেদের সূক্ত অধ্যয়নকালে

হৃদয়ের সম্প্রসারণ হয়, প্রকাণ্ড সুন্দর ও নূতন পদার্থ পর্যালোচনায় কল্পনার আমোদ, কল্পনার বিকাশ ও কল্পনার উৎকর্ষ হয়। সেকালে তাঁহারা যাহাই দেখিতেন, তাহাই সুন্দর ও নূতন। আমরা আজি হিমালয় পর্বত দেখিয়া যেরূপ প্রকাণ্ড বলিয়া আনন্দিত হই তাঁহারা সামান্য পর্বতমালা দেখিয়া তাহা অপেক্ষা শতগুণে আনন্দিত হইতেন। সময়ে সময়ে সামাজিক বন্ধন-ভয়ে আমরা মনের অনেক ভাব ফুটিয়া বলিতে পাই না, তাঁহারা সেই ভাব শতগুণে অধিকতর গভীর ও সহজ ভাষায় বলিতেন। যে বিস্ময় কবি-হৃদয়ের সর্বব্যাপী ভাব, তাঁহারা সেই বিস্ময়ময় ছিলেন, তাহাতেই কবি ছিলেন, আধুনিক কবিরা তাঁহাদের সঙ্গে তুলনায় নীরস বিষয়ী লোক।

বেদের ধর্মগ্রন্থত্ব সম্বন্ধেই অধিক আদর। ইয়ুরোপীয় পণ্ডিতেরা এই জন্য পড়েন যে হিন্দুরা এতকাল যে বেদকে ধর্মপুস্তক বলিয়া আদর করিয়া আসিয়াছে সে বেদ কি? লক্ষ লক্ষ লোক যে গ্রন্থকে সহস্র সহস্র বৎসর ধরিয়া পূজা করিয়া আসিতেছে, সে গ্রন্থ কি? আমাদের এখন দেখান চাই যে কতকগুলি গান ও কবিতা কিরূপে ধর্মগ্রন্থ হইল। ইহা জানিতে হইলে "সেকেলে লোক নির্বোধ ছিল" বলিয়া চুপ করিয়া থাকা নির্বোধের কার্য। বাস্তবিক উহাতে মনোবিজ্ঞান শাস্ত্রের একটি গূঢ় তত্ত্ব অন্তর্নিহিত আছে। যাঁহারা ঐ গান লিখিয়াছেন তাঁহাদের বিশ্বাস, তাঁহারা কোন স্বর্গীয় দেবতার সাহায্য পাইয়াছেন। তাঁহাদের সমসাময়িক লোকেরও বিশ্বাস যে লেখকরা ঈশ্বরপ্রেরিত বা ঈশ্বরানুগৃহীত পুরুষ। তুমি কবি আমি অকবি, দুইজনেই একত্র থাকি, একত্র বাস করি। তুমি কল্পনাবলে জগৎসংসার কত সুন্দর দেখ, আমি অকবি মাটিকে মাটিই দেখি, আকাশকে আকাশই দেখি। তোমায় আমায় এই প্রভেদ আমরা জানি যে আমাদের দুই জনের মানসিক প্রকৃতির বিভিন্নতা মাত্র। কিন্তু সেকালের লোক তাহা জানিত না। কবি যখন গান করিতেন অন্য অবস্থায় তাঁহার অন্তরের যেমন ভাব থাকে তখন তাহা অপেক্ষা তাঁহার হৃদয় অত্যন্ত চঞ্চল এবং উদ্বেলিত হইতে দেখিতেন। কেন হইল? যেমন সর্বত্র কবিরা দেবতা দেখিতেন এখানেও সেইরূপ দেবতা দেখিলেন, বলিলেন—দেবতা আমায় প্রণোদন করিয়াছেন। অন্য লোকেও দেখিল, আমরা যাহা পারি না এ পারে কেন, অবশ্য এ দেবতা সহায় পাইয়াছে।

এই যে মনের চঞ্চলতা ইহাকেই সাহেবরা inspiration বলেন। পরে কবির নামলোপ হইতে লাগিল, কবি যে দেবতার সাহায্য পাইয়াছেন সেই দেবতাই বেদরচক বলিয়া পরিগণিত হইলেন। দেবতাই রচক, কবি কেবল

দেখিলেন মাত্র। এইজন্যই মাধবাচার্য লিখিলেন যিনি মন্ত্র দেখিলেন তিনিই ঋষি। ঋষ-ধাতুর অর্থ দর্শন। এইজন্যই কালিদাসের "মন্ত্রকৃতাং" লেখা দেখিয়া ভবভূতি যেন চটিয়াই লিখিলেন, মন্ত্রকৃতাং নহে মন্ত্রদৃশাং। ঋষিরা মন্ত্র করেন নাই, দেখিয়াছেন মাত্র। বেদের রচক দেবতা হইলেন, শেষ যখন দেবতা ঘুচিয়া একমেবাদ্বিতীয়ং ব্রহ্ম ব্রাহ্মণ্যধর্মের প্রধান মত দাঁড়াইল, দেবতার বেদপ্রণেতৃত্ব ঈশ্বরে অর্পিত হইল। ঈশ্বর নিত্য, বেদও নিত্য হইয়া দাঁড়াইল। বেদ ঈশ্বরের বাক্য, উহাতে মিথ্যা নাই; উহা সত্যময়, ধর্মময়, জ্ঞানময়; এই-রূপে কতকগুলি গান ধর্মপুস্তকরূপে পরিণত হইল।

বেদ কি জিনিস, কেন উহার এমন সম্মান, একপ্রকার বলা হইল। কিন্তু আমরা এখন বেদ বলিতে ঋক্‌বেদ সামবেদ যজুর্বেদই যে কেবল বুঝি তাহা নহে। প্রথম বুঝি বিপ্লবের পূর্ববর্তী সময়ে সম্ভবতঃ আমাদের ইতিহাস দুই-ভাগে বিভক্ত; প্রকৃতি-উপাসনা ও যজ্ঞবাহুল্য। প্রকৃতি-উপাসনা ঋগাদি বেদত্রয়ে বর্তমান, যজ্ঞকার্যপ্রণালী ব্রাহ্মণাদি গ্রন্থে উক্ত। এই দুই সময়ের সাহিত্যসংসারের যাহা কিছু ভগ্নাবশেষ আমরা প্রাপ্ত হইয়াছি, আমরা সেই সমস্তকেই বেদ এই সাধারণ আখ্যা দিয়া থাকি। বেদ বলিতে গেলে বেদ, ব্রাহ্মণ, আরণ্যক, উপনিষৎ পর্যন্ত বুঝাইয়া যায়।

বেদ হইল, এখন বেদব্যাখ্যার কথা কিছু বলা চাহি। কারণ রমানাথ সরস্বতীর বেদব্যাখ্যাই আমাদিগকে আজি এত কথা কহাইতেছে।

প্রথম ব্যাখ্যা ব্রাহ্মণগ্রন্থে। প্রকৃতি-উপাসনা যে সময়ে হয় তাহার অনেক পরে ভারতভূমি যজ্ঞপ্রধান হইয়া উঠে। বেদের অনেক পরে ব্রাহ্মণ লিখিত হয়, ভাষাই তাহার প্রধান সূচিকা। পাণিনি ছান্দসপ্রকরণে মন্ত্র ও ব্রাহ্মণের স্বতন্ত্র স্বতন্ত্র সূত্র দিয়াছেন। প্রকৃতি-উপাসনাসময়ে যে যজ্ঞ ছিল না তাহা নহে, দেবতার উদ্দেশে খাদ্যপুষ্পচন্দনাদি দান সকল সময়েই ছিল। কিন্তু তখন এত বাড়াবাড়ি ছিল না। যখন যজ্ঞবাহুল্য হইল তখন কি বলিয়া দেবতা উদ্দেশে আহুতি দিতে হইবে এই লইয়া গোল বাঁধিল। পূর্বে ঋষিরা আপন আপন মন্ত্র পাঠ করিয়া দিতেন, ইহারা এখন কি বলিয়া দিবেন, কাজেই বেদের মন্ত্রই ইহাদের অবলম্বন হইল। বাস্তবিকও আমি যখন ভক্তিভাবে গদ্‌গদ হইয়া ঈশ্বরকে ডাকি তখন আমার ভাষা যদি বাহির হয় কেমন শুনায়, যেন আমার ভাব প্রকাশ হইল না। কিন্তু যদি একজন মহৎ কবির বচন ধরি "Father of life and light" অথবা "These are Thy glorious work Father of light" বলিয়া ধরি কত যেন অধিক ভাব প্রকাশ হয়। যে কবির বচন উদ্ধার করিলাম তাঁহারা পার্থিব কবি। যদি আবার সেই

কবি ঈশ্বরপ্রেরিত হন, অথবা সেই বচন ঈশ্বরের নিজের বচন হয় আরও অধিক ভাব প্রকাশ হইল বোধ হয়। এই অনুমানে ব্রাহ্মণসময়ের লোক যজ্ঞকাণ্ডে বেদমন্ত্র ব্যবহার করিতে লাগিলেন। কিন্তু তাহার ব্যাখ্যা চাহি; ব্রাহ্মণগ্রন্থে ভূরিভূরি ঋক্‌মন্ত্রের ব্যাখ্যা আছে। এই ব্যাখ্যাই বেদের প্রথম ব্যাখ্যা। বেদ রচনার অল্প পরেই ব্রাহ্মণ প্রণীত হয়, কিন্তু এই সময়ের মধ্যেই অনেক কথার অর্থ লোকে ভুলিয়া গিয়াছিলেন। এখন আমরা যেমন বিদ্যাপতির অনেক ভাব অনেক কথা বুঝিতে পারি না, ইংরেজেরা যেমন চসরের অনেক ভাব অনেক কথা বুঝিতে পারেন না, তাঁহারাও সেইরূপ বেদের অনেক কথা অনেক ভাব বুঝিতে সমর্থ হন নাই। অনেক স্থানে কথার অর্থ করিতে গিয়া আজগবি গল্প তৈয়ারি করিয়াছেন; আজগবি ধাতু-প্রত্যয় ব্যবহার করিয়াছেন।

দ্বিতীয় ব্যাখ্যা প্রথম বুদ্ধিবিপ্লবের সময় হয়। এই সময় বেদের উপর ব্যাকরণাদি লিখিত হয়। স্বরপ্রক্রিয়া, ধাতুপ্রক্রিয়া, আদি অভিধান, ছন্দো-বোধাদি পুস্তক লিখিত হয়। ব্রাহ্মণ প্রয়োজনমত মন্ত্রব্যাখ্যা করিয়াছেন; ইঁহারা সেই ব্যাখ্যার জন্য বৈজ্ঞানিক নিয়মাবলী স্থাপন করিলেন। ব্রাহ্মণ যে প্রণালী আরম্ভ করিয়াছিলেন এক্ষণে তাহার পরিশিষ্ট হইল। নিগম নিরুক্ত ব্যাকরণই এই ব্যাখ্যা।

এই সময়ের পর বৌদ্ধধর্মোৎপত্তি। পৌরাণিক ধর্ম দ্বারা বৌদ্ধধর্মের প্রভাব নাশে, পৌরাণিক ধর্মনাশের জন্য শঙ্করাচার্য কর্তৃক অদ্বৈতধর্ম প্রচারে, প্রায় ১৫০০ শত বৎসর গত হইল। বৈদিকধর্মের পুনঃপ্রচার শঙ্করাচার্যের পূর্ব হইতেই আরম্ভ হয়। প্রচারকগণ বেদব্যাখ্যার তত চেষ্টা করেন নাই। কেবল যাগযজ্ঞের যাহা প্রয়োজন তাহার জন্য আধুনিক সংস্কৃত গ্রন্থ লিখিয়া ও বেদমন্ত্র কেবল মুখস্থ করিয়াই ক্ষান্ত থাকিতেন। খ্রীষ্টীয় চতুর্দশ শতাব্দীতে মাধবাচার্য দেখিলেন, লোকে কেবল মুখস্থ করিয়াই কার্য শেষ করে, এইজন্য তিনি বিজয়নগরের রাজার সাহায্যে সরল সংস্কৃতে ব্যাখ্যা লিখিতে আরম্ভ করিলেন। মুখস্থ মাত্র করার প্রথার তৎকালে যে বহুল প্রচার ছিল তাহার প্রমাণ এই যে, ঋক্‌বেদ-অনুক্রমণিকায় মাধবাচার্য একটি মত খণ্ডন করিয়াছেন। সে মতটি এই যে "বেদমন্ত্র যজ্ঞের জন্য প্রয়োজন, মুখস্থ থাকিলেই যথেষ্ট হইল, বেদের অর্থ হয় না, অর্থ জানার আবশ্যকতাই নাই।" এই মত খণ্ডন করিয়া-ছেন আর শুদ্ধ মুখস্থ মতাবলম্বীদের বিলক্ষণ গালি দিয়াছেন।

স্থাণুরযং ভারহারঃ কিলাভূৎ
অধীত্য বেদং ন বিজানাতি যোঽর্থং

যে বেদ পড়িয়া অর্থ না বুঝে সে কেবল গোঁড়া মাত্র; সে কেবল ভার

বহন করে। মাধবাচার্যের টীকার এক প্রধান দোষ তাঁহার টীকা তাঁহার নিজের লেখা নহে, তাঁহার ছাত্রদিগের লেখা ; তাঁহার কেবল তত্ত্বাবধারণ মাত্র। উহার ভিন্ন ভিন্ন স্থানের ভাষা ভিন্ন ভিন্ন প্রকৃতি। কোথায় বিশুদ্ধ সংস্কৃত, কোথাও হিন্দিতর্জমা সংস্কৃত, কোথাও দ্রাবিড়ীতর্জমা সংস্কৃত। আর-এক প্রমাণ আরও গুরুতর। বেদের প্রথম ঋক্ তিন-চারি পাতা ধরিয়া সব ব্যাকরণের সূত্র দিয়া লেখা হইল। তাহার পর বরাবর খানিক দূর ঐ ঋকের টীকার বরাত দেওয়া হইল। দুই-তিনটি সূক্তের পর আবার প্রথম ঋকের টীকা। তিন-চারি পাত টীকায় সব ব্যাকরণের সূত্র দেওয়া আছে, কিন্তু অনেক কথার বরাত দিলে বিলক্ষণ চলিত। তাহা নাই। এইরূপে একস্থানে যে কথার যে অর্থ যেরূপে ব্যুৎপত্তি করা হইয়াছে আর একস্থানে সেই কথার সেই অর্থে অন্যরূপ ব্যুৎপত্তি। আবার তামাসা এই, প্রথমটি হয়ত যথার্থ ব্যুৎপত্তি, দ্বিতীয়টি ভুল। যাঁহারা বৈদিক ব্যাকরণ উত্তমরূপ পড়িয়াছেন তাঁহাদের উচিত এই সকল ভুল সংশোধন করিয়া লন। রমানাথ সরস্বতী মহাশয় সে ভুল সংশোধন করিয়া লইতে যেন বিশেষ যত্ন করেন।

চতুর্থ ব্যাখ্যা রোথ সাহেবের। রোথসাহেব ব্যাখ্যা করেন নাই, কিন্তু এই সম্বন্ধে একটি নূতন মত প্রচার করিয়া গিয়াছেন। সেটি এই যে ব্রাহ্মণকালে যে ব্যাখ্যা হইয়াছে তাহাতে এমত অনেক বিষয় আছে যাহা আমরা বিশ্বাস করিতে পারি না। অতএব আমাদের উচিত ঔপমিক ভাষাতত্ত্বের সাহায্য লইয়া সমগ্র বেদ নূতন করিয়া ব্যাখ্যা করা হয়। যে সকল সংস্কৃত শব্দ সংস্কৃত হইতে উঠিয়া গিয়াছিল তাহা ত ভিন্ন আকারে ভাষান্তরে থাকিতে পারে। সেই ভাষা হইতে অর্থ সংগ্রহ করিয়া বেদব্যাখ্যা করিতে হইবে এ কথায় অনেক সত্য আছে বটে, কিন্তু কোন্‌টি ঠিক অর্থ তাহা জানিবার কোন উপায় নাই। হয়ত বেদে যে কথাটি যে অর্থে ব্যবহৃত হইয়াছে গ্রীকে সেইটি অন্য অর্থে আছে। এ স্থলে নিশ্চয়তার সম্ভাবনা নাই।

মাক্সমূলার রোথমতাবলম্বী। তাঁহার নূতন মত এই ;—তিনি ঋক্‌বেদ হইতেই ঋগ্বেদের অর্থ করিতে চান। এবং এই উদ্দেশ্যে অসাধারণ অধ্যবসায় ও পরিশ্রম সহকারে ঋগ্বেদের একখানি নির্ঘণ্ট করিয়াছেন। উহাতে এক-একটি শব্দ ঋগ্বেদের কোথায় কোথায় ব্যবহার আছে সব ধরিয়া দেওয়া আছে। মাধবাচার্য পূর্বোক্ত কারণবশতঃ এক কথায় সতের জায়গায় সতের প্রকার অর্থ করিয়াছেন। এরূপ গোলমাল অনেক এবার সংশোধন হইবার সম্ভাবনা। কিন্তু সংস্কৃত এক কথার যে একই অর্থ হইবে তাহার কোন প্রমাণ নাই। এক কথায় নানা অর্থ হয় বলিয়াই সকল অভিধানে নানার্থকোষ বলিয়া এক-এক অধ্যায় দেওয়া আছে।

রেবরেণ্ড ডাক্তার কৃষ্ণমোহন বন্দ্যোপাধ্যায় বলেন, সায়নাচার্য ও প্রাচীন টীকা পরিত্যাগ করা অন্যায় বটে, কিন্তু যেখানে যেখানে ভিন্নদেশীয় বিষয়ের কোন উল্লেখ আছে, সেখানে এ টীকা গ্রাহ্য নহে। অনেক কথা সায়নাচার্য যাহার অর্থে মেঘ জল বা অন্য জড়পদার্থ বলেন, বন্দ্যোপাধ্যায় মহাশয় তাহার মধ্যে পারস্যরাজা বা সেনাপতির নাম দেখেন। তিনি বলেন শরফলাকৃতি যে সকল শাসন পারস্যের পশ্চিমাংশে পাওয়া গিয়াছে, তাহা বেদব্যাখ্যায় বিশেষ উপযোগী। একস্থানে পণিশব্দে সায়ন গো লিখিয়াছেন; বন্দ্যোপাধ্যায় মহাশয় সেখানে আসিরীয় সেনাপতি অর্থ করিয়াছেন। ইহাতে কতদূর উপকার হইবে আমরা বলিতে পারি না।

কিন্তু আমরা এতক্ষণ যে সকল মতামতের কথা কহিতেছিলাম সে ত সামান্য। সায়ন ও প্রাচীন টীকাই সকলের মূল। কেহ কোথায় সায়নের সঙ্গে মিলেন, কেহ কোথায় মিলেন না এই পর্যন্ত। কিন্তু বেদের যে আর যথার্থ ব্যাখ্যা কোনকালে হইবে না, তাহার এক সম্ভাবনা হইয়াছে। দয়ানন্দ সরস্বতী একজন এক্ষণকার লোক, তিনি সমাজসংস্কারক, তিনি হিন্দুসমাজ "ভাঙ্গিয়া চুরিয়া গড়িতে চান।" তিনি যদি বলেন, তোমরা এই এই ভাবে এই এই কার্য কর, এই এই কর্ম করিও না, কে তাঁহার কথা শুনিবে? এইজন্য তিনি বেদের শরণ লইয়াছেন। বেদ গান মাত্র; উহাতে তাৎকালিক সমাজের রীতি-নীতি কতক কতক জানা যায় বটে কিন্তু সব জানা যায় না। তিনি বলেন, বৈদিককালে জাতিভেদ ছিল না, স্ত্রী স্বাধীনা ছিল। শিক্ষিত যুবকগণ যাহা কিছু ইউরোপ হইতে আনিতে চান, তিনি বলেন, সে সবই বেদে আছে। বিশেষ তিনি বলেন বেদ একেশ্বরবাদী। শঙ্করাচার্য শুদ্ধ বেদের শিরোভাগ উপনিষৎ একেশ্বরবাদী বলিয়া গিয়াছেন; দয়ানন্দ তাহা অপেক্ষা শতগুণে অধিক সাহসী; তিনি গোড়া হইতে শেষ পর্যন্ত সমস্ত বেদ একেশ্বরবাদী বলিতে চান। তিনি অগ্নি শব্দের অর্থ ঈশ্বর বলেন। অগ্রে নীয়তে এই ব্যুৎপত্তিতে সায়ন অগ্নি শব্দের অর্থ আগুন করিয়াছেন দয়ানন্দ সেই ব্যুৎপত্তিতেই উহার অর্থ ঈশ্বর করিতে চান। তাঁহার মতে ধান্য শব্দের অর্থ ঈশ্বর; ধা-ধাতু হইতে নিষ্পন্ন, যিনি ধারণ করেন তিনিই ধান্য। ঈশ্বর পৃথিবী ধারণ করেন; অতএব ঈশ্বর ধান্য। তাঁহার মত এই—সায়নাচার্য ভ্রান্ত। মহাভারতের পূর্বে যে টীকা লিখিত হয় সে টীকা, সেই প্রমাণ। নিগমনিরুক্তাদি সেই টীকা। কিন্তু আমরা পূর্বেই বলিয়াছি, সায়ন নিজের মত কোথাও দেন নাই। সর্বত্র নিগম নিরুক্তের কথায় চলিয়াছেন। তথাপি দয়ানন্দ তাঁহাকে ঠেলিলেন। দরকার এমনি জিনিস্!

বেদের সময়ের লোক অতি সরল ও সোজা ছিল। তাহাদের মনের মধ্যে আমাদের প্রবেশ করা অতি দুরূহ। যদি অনেক ভাবনা চিন্তার পর আমরা একবার আমাদিগকে বৈদিক জগতে কল্পনাবলে লইয়া যাইতে পারি, আমরা বেদ অনেক ভাল বুঝিব। তৎকালীন লোকের কার্যকলাপ রীতিনীতি প্রভৃতির মধ্যে অনেক বুঝিতে পারিব। কিন্তু সেই জগতে প্রবেশ বড় সহজ কথা নহে। প্রাচীন জগতের অনেক কথা জানিতে হইবে; প্রাচীন লোকের মন কেমন ছিল, সেইটি বিশেষ জানা চাহি—শুদ্ধ ভারতবর্ষ নহে, যেখানে যেখানে আর্যজাতি সেই সেইখানেই প্রাচীন জগতের ইতিহাস জানা চাহি।

রমানাথ সরস্বতী বেদ অনেক পড়িয়াছেন, বেদের ব্যাকরণ তাঁহার সুন্দররূপ জানা আছে; ইংরেজি বেশ জানা আছে। আপনাকে সাধ্যমত বৈদিক আর্যসমাজে স্থাপিত করিতে চেষ্টা করিয়াছেন। বেদব্যাখ্যা বিষয়ে তাঁহার মত এই যে, ব্যাকরণ অভিধান কোনরূপে বজায় রাখিয়া সহজ অথচ মহান, সরল অথচ উচ্চ প্রকৃতির মনোগত ভাব বা প্রকৃতি চিত্র দেখাইতে পারিলেই বেদের ব্যাখ্যা করা হইবে।

রমানাথ সরস্বতী বেদের ব্যাকরণখানি তাঁহার বেদপ্রকাশিকায় ক্রমশঃ অনুবাদ করিয়া দিতেছেন। তাঁহার ভাষা অতি কটমট অথচ কথায় কথায় তর্জমা নহে। তাঁহার অনুক্রমণিকা পাঠ করিয়া আমাদের কিছুই তৃপ্তি হইল না। অনুক্রমণিকায় তিনি পুরাণশাস্ত্র হইতে অনেক বচন তুলিয়াছেন। কিন্তু সেই বচনগুলি পরিপাক করিয়া সুন্দররূপে আপনার মনোভিপ্রায় ব্যক্ত করিয়া উঠিতে পারেন নাই। অনেক স্থলে কেন রাশি রাশি বচন উদ্ধার হইয়াছে সহজে অনুমান করা যায় না। তিনি প্রথমবারেই আপনার কুরুচির পরিচয় দিয়াছেন। তিনি তাঁহার গ্রন্থে ষষ্ঠ সূক্ত ব্যাখ্যাস্থলে ম্যাক্সমুলরের সঙ্গে তাঁহার মতভেদ হওয়ায় "ম্যাক্সমুলর আমাদের দেশের কথা কিছু বুঝেন না" বলিয়া গালি দিয়াছেন। ম্যাক্সমুলার মধ্যে মধ্যে গুরুতর ভ্রমে পতিত হন বলিয়া, ঋগ্বেদের প্রথম প্রকাশক, বেদব্যাখ্যা বেদপাঠে ক্ষয়িতজীবন মহাপুরুষকে সরস্বতী মহাশয়ের "কিছু বুঝেন না" বলিয়া গালি দেওয়া বড় অন্যায় হইয়াছে। তাঁহার উচিত ছিল ভূমিকায় ম্যাক্সমুলারের নিকট আপনার কৃতজ্ঞতা স্বীকার করা। যদি ম্যাক্সমুলারের ঋগ্বেদ না বাহির হইত তবে সরস্বতী মহাশয়ের বেদপ্রকাশিকা কোথায় থাকিত?

যখন মহাভারত অনুবাদ তিন-চারিবার মুদ্রিত হইয়া গেল, তখন বেদ যে এ পর্যন্ত হয় নাই সে কেবল বাঙ্গালার কলঙ্ক। সরস্বতী মহাশয় সে কলঙ্ক অপনয়ন করিতে উদ্যোগী হইয়াছেন। বঙ্গীয় প্রতি কুটীরে বেদপ্রকাশিকা

থাকা কর্তব্য। ব্রাহ্মণগণের একান্ত উচিত ইঁহার উৎসাহ দেওয়া। তাঁহাদের নিজের দলের ত কেহ করিল না, শেষ একজন কায়স্থ বেদপ্রকাশ করিল। তাঁহাদিগকে ধিক্! কিন্তু তাঁহাদের উচিত ইঁহার সহায়তা করা। তাঁহাদের কার্য আর একজন করিল, ইঁহার সহায়তা না করিলে, তাঁহাদের কলঙ্ক ধুইলেও যাইবে না। সন্ধ্যা, গায়ত্রী, জপ, হোম, সর্বত্র যে বেদের দরকার, সে বেদ তাঁহাদের গৃহে থাকা অত্যন্ত আবশ্যক।

পৌষ ১২৮৪

জেন্দ অবস্থা

পার্সিদের মূল ধর্মগ্রন্থের নাম 'জেন্দ অবস্থা।' এই প্রাচীন গ্রন্থের ভাষা অর্থ বিধি ব্যবস্থা লইয়া পাশ্চাত্য কতকগুলি পণ্ডিতদের মধ্যে বিস্তর বিচার চলিতেছে। কয়েক বৎসর মধ্যে ফরাসিস, জারমান, দিনামার ভাষায় এই গ্রন্থের অনুবাদ হইয়া গিয়াছে। একসময় আমাদের সংস্কৃত ভাষায়ও ইহার অনুবাদ হইয়াছিল, কিন্তু এক্ষণে আমাদের বাঙ্গালীর মধ্যে দুইচারি জন ভিন্ন বোধ হয় আর কেহই জেন্দ অবস্থার নামও শুনেন নাই।

গ্রন্থখানি জেন্দ ভাষায় লিখিত। বহুকাল পূর্বে পারস্য রাজ্যে এই ভাষা প্রচলিত ছিল। উইলিয়ম আর্স্কিন সাহেব বিবেচনা করেন যে জেন্দ ভাষা সংস্কৃতের অপভ্রংশ মাত্র। বিখ্যাত দিনামার পণ্ডিত রাস্ক সাহেব সে মতের প্রতিবাদ করেন। তিনি বলেন যে, জেন্দ ভাষা কোন ভাষারই অপভ্রংশ নহে, স্বয়ং স্বতন্ত্র ভাষা। মক্ষমূলরেরও সেই মত; তবে তিনি এই বলেন যে অন্যান্য ভাষা অপেক্ষা সংস্কৃতের সহিত জেন্দ ভাষার কিঞ্চিৎ নিকট সম্বন্ধ আছে, এমন কি জেন্দভাষায় এরূপ অনেক কথা পাওয়া যায় যে, তাহার দুই-একটি বর্ণ পরিবর্তন করিয়া দিলে সংস্কৃত হয়, যথা—"অহুর" "হপ্তহিন্দু" ইহার হ-স্থলে স করিলে অসুর ও সপ্তসিন্ধু হয়। এইরূপ অনেক কথা পাওয়া যায়।

জেন্দভাষা হইতে এখনকার পারস্য ভাষার উৎপত্তি। এইজন্য জেন্দ-ভাষার কোন কোন শব্দ পারস্য ভাষায়ও পাওয়া যায়। কিন্তু সংস্কৃতের সহিত জেন্দ ভাষার সমসাদৃশ্য অধিক। মক্ষমূলর বলিয়াছেন যে যাঁহারা জেন্দভাষা ব্যবহার করিতেন তাঁহাদের পূর্বপুরুষ ভারতবর্ষে বাস করিতেন। তাহা হইলে সংস্কৃত ভাষা হইতে জেন্দভাষার উৎপত্তি, এরূপ অনুভব করা নিতান্ত অন্যায় নহে। কথিত আছে যে, পূর্বে যজাতি রাজার এক পুত্র পিতৃকর্তৃক পরিত্যক্ত হইলে তিনি বহু লোক সমভিব্যাহারে সপ্তসিন্ধু অতিক্রম

করিয়া পশ্চিমাভিমুখে গমন করেন, তাঁহা হইতেই যবনের উৎপত্তি। এইটি স্মরণ রাখিলে কতক বুঝা যায় যে, বৃত্রাসুরবধ বা তদ্বৎ সংস্কৃত গ্রন্থমূলক কথা কেন জেন্দ অবস্থায় পাওয়া যায়।

জেন্দভাষা আর এক্ষণে প্রচলিত নাই। দুই সহস্র বৎসরের বরং অধিক হইবে এই ভাষা পৃথিবী হইতে একেবারে লোপ পাইয়াছে। এ ভাষার আর উপদেষ্টা নাই, এক্ষণে শিখিতে হইলে কতক আপনা আপনি শিখিতে হয়। গ্রীক্ বলুন সংস্কৃত বলুন ইহার মধ্যে কোন ভাষাই আর প্রচলিত নাই, কিন্তু তাহা বলিয়া এ সকল ভাষার লোপ হয় নাই, ইহাদের অধ্যয়ন অধ্যাপন চলিয়া আসিতেছে। কিন্তু জেন্দভাষার অধ্যয়নও নাই, অধ্যাপনাও নাই। কাজেই এই ভাষা এক্ষণে বুঝিবার উপায় গিয়াছে। বিলাতে যে কয়েকজন পণ্ডিত দৃঢ়সংকল্প হইয়া জেন্দ অবস্থার উদ্ধারসাধন করিতেছেন তাঁহারা যে কি প্রকারে এই ভাষা শিখিয়াছেন তাহার পরিচয় অতি বাহুল্য। এখানে এই পর্যন্ত বলা আবশ্যক যে তাঁহার এ ভাষায় সম্পূর্ণ অধিকারী হয়েন নাই। তাঁহারা যে অনুবাদ করিয়াছেন তাহার অধিকাংশ স্থলে ভুল আছে। আপনারাও তাহা জানেন। ক্রমে সে ভুল সংশোধনের চেষ্টা করিতেছেন।

বিলাতীয় পণ্ডিতসম্বন্ধে এইরূপ। কিন্তু জেন্দ অবস্থা যাঁহাদের মূল ধর্মগ্রন্থ তাঁহাদের সম্বন্ধে আর একরূপ। তাঁহারা কেহই ইহার ভাষা বুঝেন না, বুঝিতে বা শিখিতে চেষ্টাও করে না। অথচ ভক্তিভাবে গ্রন্থখানি পুরুষানুক্রমে রক্ষা করিতেছেন। ধর্মযাজকেরা এই গ্রন্থের দোহাই দিয়া ধর্ম-যাজন করেন। ধর্ম সম্বন্ধে কোন ব্যবস্থা দিতে হইলে বা কোন তর্ক করিতে হইলে জেন্দ অবস্থার মুণ্ডপাত করেন, তাঁহাদের পরস্পর সকলের যুক্তি, সকলের ব্যবস্থা, সমুদয় জেন্দ অবস্থায় আছে বলেন, অথচ কেহ জেন্দ অবস্থা পাঠ করেন নাই, তাহার ভাষাও কেহ জানেন না। আমাদের বাঙ্গালায় ধর্মযাজকমধ্যেও এইরূপ। কেহই বেদ পাঠ করেন নাই, বেদে কি আছে তাহা একেবারে জানেন না, অথচ তাঁহারা বেদের ব্যবস্থা দেন। ভট্টাচার্য মহাশয় বলিলেন, দশমীর দিন তুলসীতলায় দশবার গোময় লেপন করিতে হইবে। জিজ্ঞাসা করিলে বলিবেন বেদে ইহার স্পষ্ট বিধান আছে।

বম্বের পার্সিরা জেন্দ অবস্থায় লিখিত বিষয় কিছুই অবগত নহেন অথচ সেই গ্রন্থোক্ত ধর্ম অনুসরণ করেন বলিয়া তাঁহাদের দৃঢ় বিশ্বাস আছে। তিন চারি সহস্র বৎসর পূর্বে এই গ্রন্থোক্ত স্তব অভ্যাস করা রীতি ছিল। পিতা পুত্রকে শিখাইতেন, পুত্র আবার পৌত্রকে শিখাইতেন। এইরূপ পুরুষপরম্পরা স্তবগুলি মুখস্থ থাকিত, স্তব সম্বন্ধে আর গ্রন্থপাঠের প্রয়োজন হইত না। সেই

প্রথা পার্সিদের মধ্যে অদ্যাপি চলিয়া আসিতেছে। ভাষা লোপ পাইয়াছে কিন্তু সে ভাষার স্তবগুলি আছে। কি বড় কি ছোট সকলেই দিনে রাত্রে যোলবার জেন্দ ভাষার স্তব পাঠ করিয়া থাকেন। কিন্তু মাথা মুণ্ড কি পাঠ করেন তাহার অর্থ তাঁহারা আপনারাও বুঝেন না, তাঁহাদের দেবতারাও বুঝেন না। এইরূপ না বুঝায় এক মহৎ লাভ আছে। ধর্মগ্রন্থ না বুঝিলে ধর্ম টেকসই হয়। পার্সিধর্ম যে এতকাল চলিয়া আসিতেছে তাহার এই বিশেষ কারণ। যে অবধি বাইবেল চলিতভাষায় অনুবাদিত হইয়াছে সেই অবধি খ্রীষ্টানধর্ম দুর্বল হইয়া পড়িয়াছে। সাধারণের মূর্খতা পারত্রিক ধর্মের জীবনস্বরূপ। ধর্ম-গ্রন্থের দুর্জ্ঞেয়তা সেই ধর্মের পরমায়ু স্বরূপ।

আমাদের হিন্দুধর্ম যে এতকাল চলিয়া আসিতেছে তাহারও প্রতি সেই কারণ। ধর্মগ্রন্থ পাঠ করিতে অধিকাংশ লোকের প্রতি নিষেধ ছিল। কাজেই সাধারণও সকলেই অন্ধের ন্যায় ধর্মপথে চলিত। অন্ধের আর যতই দোষ থাক, পথদর্শকের বড় আজ্ঞাকারী। ধর্মযাজক বলিলেন এইদিকে জল ছিটাও ধর্মভীতেরা জল ছিটাইলেন। মনে করিলেন শাস্ত্রে ইহার বিশেষ তাৎপর্য লিখিত আছে। ধর্মযাজক বলিলেন অঙ্গুষ্ঠের দ্বারা কর্ণমূল ঘর্ষণ কর অন্ধাত্মারা তৎক্ষণাৎ তাহা করিল, কোন ওজর নাই। উত্তর কি পূর্বদিকে জল ছিটাইলে পরকালের কি উপকার হইবে তাহা তাহাদের জিজ্ঞাসা করিবার অধিকার নাই। জিজ্ঞাসা করিবার প্রয়োজনও নাই, যখন ভট্টাচার্য মহাশয় বিধি দিতেছেন, তখন অবশ্য তাহা শাস্ত্রে আছে। শাস্ত্র দেবপ্রণীত ; সংস্কৃত দেববাক্য। মন্ত্রের মহাশক্তি ; ভূত ছাড়ে, বিষ উড়ে, গাছ পড়ে। মারণ, বশীকরণ, উচাটন, সকলই মন্ত্রবলে। মন্ত্রে দেবতা বশ হয়, পরকালও আয়ত্তের মধ্যে আসিবে, ইহার আর আশ্চর্য কি ?

কিন্তু আমাদের মধ্যে এক্ষণে যাঁহারা ভক্তিভাবে ত্রিসন্ধ্যা করেন তাঁহাদের যদি বাঙ্গালা ভাষায় সন্ধ্যা করিতে বলা যায়, বোধ হয়, অধিকাংশই একেবারে সন্ধ্যা ত্যাগ করিবেন। অনেকেই বলিবেন বাঙ্গালায় সন্ধ্যা করিলে কোন ফল হইবে না। সংস্কৃত দেববাক্য, বাঙ্গালা নরবাক্য। দেবতাদিগের নিকট নরবাক্যে কোন ফল হয় না। বাস্তবিক তাহা না হইতে পারে, কেন না আমরা ভাল লোকের মুখে শুনিয়াছি অনেক দেবতা বাঙ্গালা ভাষা একেবারে বুঝিতে পারেন না। তাঁহাদের মধ্যে বিশ্ববিদ্যালয় নাই, কাজেই মাতৃভাষা (সংস্কৃত) ভিন্ন আর কোন ভাষা তাঁহাদের শিক্ষা বা অধিকার হয় না।

মূল কথা, বাংলা ভাষায় সন্ধ্যা অনুবাদিত হইলে সন্ধ্যার প্রতি লোকের আর শ্রদ্ধা থাকিবে না। অনুবাদ যতই মূলানুরূপ হউক, যতই সুন্দর হউক,

তাহাতে শ্রদ্ধার হ্রাস হইবে। অর্থ না বুঝাই শ্রদ্ধার প্রীতি কারণ, বাঙ্গালায় সন্ধ্যা সকলে বুঝিবে কাজেই গোদাবরী আমায় শুদ্ধ কর নর্মদা আমায় শুদ্ধ কর, এ সকল উক্তি ফলদায়ক বলিয়া আর কাহার বোধ হইবে না। সন্ধ্যার অর্থ যতদিন সংস্কৃত ভাষায় গোপন আছে ততদিন তাহার মহিমা অপ্রতিহত চলিয়া আসিতেছে। পার্সিধর্ম সম্বন্ধেও তাহাই হইয়াছে। জেন্দ অবস্থা পার্সিরা কেহ বুঝেন না, তাই তাঁহাদের নিকট জেন্দ অবস্থার এত গৌরব।

জেন্দ অবস্থার মূল প্রণেতার নাম জরতুষ্ট্র অথবা জরোস্তর। ইদানীং কেহ কেহ তাহাকে জরদোস্ত বলেন। তিনি যাহা বলিয়াছিলেন তাহা প্রথমে সহস্রাধিক বৎসরের মধ্যে লিখিত হয় নাই। স্মৃতিরূপে শিষ্য প্রশিষ্য দ্বারা চলিয়া আসিয়াছিল। পার্সিদের মধ্যে যে জেন্দ অবস্থা প্রচলিত আছে তাহা, মক্ষমূলার বলেন, প্রায় সতের শত বৎসর হইল লিখিত হইয়াছিল। জরতুষ্ট্র নিজে সমুদয় জেন্দ অবস্থা রচনা করেন নাই, কতক তিনি করিয়াছিলেন বাকী তাঁহার শিষ্য প্রশিষ্যেরা করিয়াছিল। পুরাতন গ্রন্থমাত্রেই এইরূপ হইয়া থাকে।

ধর্মপ্রচারকগণ বলিয়া থাকেন যে ঈশ্বরের আদেশমত ধর্মগ্রন্থ লিখিত হয়। তিনি নিজে কোন কথার উপদেশ দেন না, আর-একজন তাঁহার মধ্যবর্তী থাকে। ঈশ্বরের আদেশমত মহাম্মদ কোরান শরিফ প্রচার করেন, সে স্থলে মধ্যবর্তী গেব্রূল ছিলেন। গেব্রূল আসিয়া মহম্মদের কর্ণে ঈশ্বর-আদেশ জানাইয়া যাইতেন, মহম্মদ তাহা চেলাদের নিকট প্রকাশ করিতেন। চেলারা তাহাই অভ্যাস করিত। জেন্দ অবস্থায় সেই প্রথা অবলম্বন করার কথা আছে। জরতুষ্ট্র ঈশ্বরবাক্য অর্মজের নিকট শুনিয়া প্রচার করিয়াছিলেন। অর্মজ আমাদের ব্রহ্মার ন্যায় সৃষ্টিকর্তা, তিনিই প্রথমে অরণ্যবীজ নামে দেশ সৃষ্টি করেন, তথায় জরতুষ্ট্রের জন্ম হয়। অরণ্যবীজ কেহ কেহ বলেন আর্য-বীজ। অরণ্যবীজ শব্দ ভারতবর্ষীয়দের মধ্যে নিতান্ত অপরিচিত নহে। অদ্যাপি বাঙ্গালার বৃদ্ধারা রাজা-রাণীর গল্পে বনের বর্ণনা করিতে হইলে অরণ্য-বীজের উল্লেখ করিয়া থাকে। 'অরণ্যবিজুবন' তাঁহারা বলিয়া থাকেন।

জেন্দ অবস্থার মতে পৃথিবী সৃষ্টি করিতে এক বৎসর লাগিয়াছিল। পৃথিবীর পরমায়ু দ্বাদশ সহস্র বৎসর। এই বার হাজার বৎসর চার যুগে বিভক্ত। প্রত্যেক যুগ তিন হাজার বৎসর করিয়া স্থিতি। প্রথম তিন হাজার বৎসর পৃথিবীর সৃষ্টি ও উন্নতি। দ্বিতীয় যুগে আদি মনুষ্যের নির্বিঘ্নে জীবন যাপন, অপ্রতিহত সুখ। তৃতীয় যুগে দুঃখের আগমন, সুখ-দুঃখের যুদ্ধ। এক্ষণে সেই যুগ চলিতেছে। চতুর্থ যুগে দুঃখের পতন ও সুখের রাজ্য।

মেঘনাদবধ কাব্য সম্বন্ধে কয়টি কথা

"মেঘনাদবধ কাব্যে"র প্রকৃত সমালোচনা আজিও হইল না। অথচ এই রূপকপ্রিয় দেশে, কোন লেখক যদি অধুনাতন বঙ্গসাহিত্যের শ্রীবৃদ্ধি দেখিয়া "ভগবান্ মরীচিমালী"র সহিত ইহার উপমা দিবার লোভটুকু সংবরণ করিতে পারেন, তবে তাঁহাকে মনে করিতে হইবে যে, "মেঘনাদ"ই বঙ্গের "প্রদীপ্ত প্রভাততারা"। যিনি বাঙ্গালিকে "মেঘনাদবধ কাব্য" বুঝাইতে সক্ষম, তিনি বুঝাইলেন না। ভরসা ছিল, বঙ্কিমবাবু একবার সে প্রয়াস পাইবেন। কিন্তু তিনি বুঝি আর তাহা করিলেন না। কে তবে এই গুরুতর ব্রত গ্রহণ করিবে? প্রবন্ধলেখকের সে উদ্যম কেবল ধৃষ্টতামাত্র। তবে কথা এই যে, "মেঘনাদবধে"র রীতিমত সমালোচনার দায়িত্ব আমরা গ্রহণ করিতেছি না।

হিন্দুসন্তানমাত্রই রামায়ণের উপাখ্যানভাগের সহিত সুপরিচিত। রামের মহত্ত্ব; তাঁহাদের চরিত্রের বীরদর্প; জগতে অতুলনীয়া, দোষমাত্রপরিশূন্যা সীতার কমনীয়তা, তাঁহার পতিভক্তি; লক্ষ্মণের ভ্রাতৃপ্রেম, সেই বীরপুরুষের চিরোজ্জ্বল, নিঃস্বার্থপর বীরভাব, সংক্ষেপতঃ রামায়ণের সেই স্বর্গীয় ভাব, বাল্যকালাবধি হিন্দুসন্তান অনুদিন হৃদয়ে ধারণ করেন। আর সেই সঙ্গে রাবণের বংশাবলীর উপর আমাদের কেমন একটা বিজাতীয় ঘৃণা জন্মিয়া যায়। কবির "সৌধকিরীটিনী" লঙ্কা পাঠকের চক্ষে ভাসিতে থাকে, কিন্তু হৃদয়ে স্থান পায় না। লঙ্কার কথা মনে আসিলে নরভুক্ রাক্ষসের ভীষণ পাপাচার সর্বাগ্রে তাঁহার মনে পড়ে। আর সেই অশোকবনে চেড়ীদলবেষ্টিতা, চিরলোকমোহিনী জনকনন্দিনীর চিত্র মনে করিয়া তিনি ইচ্ছায়, অনিচ্ছায় অশ্রুবর্ষণ করেন। ইহাই রামায়ণ, অন্ততঃ প্রথম দৃষ্টিতে রামায়ণ ইহা ব্যতীত আর কিছুই নহে। "মেঘনাদবধ কাব্য" রামায়ণমহাবৃক্ষের পল্লবমাত্র লইয়া রচিত। কিন্তু যেমন কেন পাঠক হউন না, "মেঘনাদবধ" পাঠকালে তাঁহার মনে হইবে, যাহা রামায়ণে নাই, "মেঘনাদে" তাহা পড়িতেছি, "মেঘনাদে"র রাক্ষসকে ঘৃণা করিতে ইচ্ছা হয় না;—সে ভাবই মনে আসে না। প্রতি পদে যেন "জগতের অলঙ্কার" লঙ্কার প্রতি সহানুভূতি হয়। কবি নিজেই বন্ধুকে পত্রে লিখিয়াছেন, "People here grumble and say that the heart of the poet in "মেঘনাদ" is with the Rakshasas. And that is the real truth." অর্থাৎ "এ দেশের লোকেরা অসন্তুষ্ট হইয়া বলিয়া থাকে "যে মেঘনাদবধ কাব্যে কবির

মনের টান রাক্ষসদের প্রতি। বাস্তবিকও তাহাই বটে।" জানিয়া শুনিয়া কবি হিন্দুসন্তানের চিরাচরিত সংস্কারস্রোতের বিপরীতে কাব্যতরণী ভাসাইতেছেন! আপাততঃ ইহা বড় বিসদৃশ বলিয়া বোধ হয়। কিন্তু ভাবুক দেখিবেন, এই প্রভেদই মেঘনাদবধ কাব্যের বীজ।

আবার রামায়ণের সেই রাবণকে মনে কর!—যেন প্রলয়ের স্থানচ্যুত গ্রহ, মিল্টনের সেই শয়তানতুল্য! নরকে রাজ্য করিবে সেও ভাল, তথাপি স্বর্গের দ্বিতীয় অধীশ্বর হইতে চাহে না! এ দৃশ্য অনন্ত গাম্ভীর্যময় বটে, কিন্তু কেমন ভয়ানক! আর "মেঘনাদবধে"র রাবণ? কতকটা ভক্তিপ্রীতির আধার! তিনি নিজ হৃদয়ের উচ্ছ্বাসে, সেতুনিগড়বদ্ধ, চিরকল্লোলময়, চিরস্বাধীনতাময় সমুদ্রকে লক্ষ্য করিয়া, তীব্র ব্যঙ্গের লহরী তুলিয়া বলেন—

কি সুন্দর মালা আজি পরিয়াছ গলে
প্রচেতঃ! হা ধিক্, ওহে জলদলপতি!
এই কি সাজে তোমারে, অলঙ্ঘ্য, অজেয়
তুমি? হায় এই কি তোমার ভূষণ
রত্নাকর?

যখন পুত্রশোকাতুরা, অভিমানিনী, সাধ্বী চিত্রাঙ্গদা দৃপ্ত বাক্যে তাঁহাকে বলিয়াছিলেন,

হায় নাথ, নিজ কর্মফলে
মজালে রাক্ষসকুলে, মজিলে আপনি!

তখন "মহামন্ত্রবলে" নম্রমুখ ফণীর মত রাবণ নতমুখে তাহা শুনিয়াছিলেন। যেন নিরুত্তরে নিজের দোষ স্বীকার করিয়া লইয়াছিলেন। রামায়ণের রাবণ তাহা পারিতেন কি? অসভ্যাবস্থায় দুর্বৃত্ত নর যেমন নারীমাত্রকে জঘন্য ইন্দ্রিয়তৃপ্তিরই নিদানমাত্র মনে করে, রামায়ণের রাবণ সেই প্রকৃতির। "মেঘনাদবধে"র রাবণ কতকটা ভক্তি ও প্রীতির আধার। যখন ইন্দ্রজিতের মৃত্যুসংবাদ দিয়া রক্ষোদূতবেশী বিরূপাক্ষ চর অদৃশ্য হইলেন, স্বর্গীয় সৌরভে সভা পূর্ণ হইল,

দেখিলা রাক্ষসনাথ দীর্ঘজটাবলী
ভীষণ ত্রিশূলছায়া

তখন মর্মপীড়িত লঙ্কেশ্বর প্রণাম করিয়া ভক্তিগদগদস্বরে বলিয়াছিলেন,—শুনিলে অশ্রুসংবরণ করা যায় না,—বলিয়াছিলেন,

এত দিনে প্রভু,
ভাগ্যহীন ভৃত্যে এবে পড়িল কি মনে
তোমার? এ মায়া হায় কেমনে বুঝিব
মূঢ় আমি, মায়াময়? কিন্তু অগ্রে পালি

আজ্ঞা তব হে সর্বজ্ঞ ; পরে নিবেদিব
যা কিছু আছে এ মনে, ও রাজীবপদে!

ফলতঃ "মেঘনাদবধ কাব্যে"র রাবণকে দেখিলে, রামায়ণের সেই রাবণ বলিয়া বড় একটা চেনা যায় না, "মেঘনাদে"র রাবণ,—যেন মানুষ অনেক শোক পাইয়া স্থৈর্যলাভ করিয়াছে,—দুর্বৃত্ত যুবক যেন কত ঠেকিয়া, কতক বুঝিয়া শান্ত হইয়াছে। বলা বাহুল্য যে, অলৌকিক চরিত্র কল্পনাস্থলেও কবি কিয়ৎ পরিমাণে মানবচরিত্রের অনুকরণ করিতে বাধ্য! আর অবস্থাবৈষম্যেও একই চরিত্রের যে উত্থান-পতন হইতে পারে এবং হইয়া থাকে, একথা মনে রাখিলে, ভরসা করি, কেহ কেহ রাবণকে কেবলমাত্র "কোমল সে ফুলসম" বলিয়া উড়াইয়া দিতেন না।

আমরা যাহা বুঝাইতে চাই, তাহাতে রাবণ-চরিত্রের বিশেষ প্রয়োজন নাই। তবে সে চরিত্রকে রামায়ণের চরিত্র করিয়া গড়িবার যে তাৎপর্য আছে তাহা বুঝাইবার জন্যই এ প্রয়াস পাইলাম। ভাবুক দেখিতে পাইবেন যে কাব্যমধ্যে এই চরিত্রের বিলক্ষণ উপযোগিতা আছে। আমাদের মুখ্য প্রয়োজন ইন্দ্রজিতের চরিত্র লইয়া। একবার তাহা সূক্ষ্মানুসূক্ষ্ম করিয়া দেখি।

প্রথম সর্গে ধাত্রীর মুখে লঙ্কার বিপদবার্তা শুনিয়া মেঘনাদ বীরের যোগ্যভাবে বিলাসশয্যা ত্যাগ করিলেন,—ক্রোধে সে কুসুমদাম ছিঁড়িলেন! বলিলেন—

ধিক্ মোরে!
হা ধিক্ মোরে! বৈরীদল বেড়ে
স্বর্ণলঙ্কা, হেথা আমি বামাদলমাঝে ?
এই কি সাজে আমারে, দশাননাত্মজ
আমি ইন্দ্রজিৎ ; আন রথ ত্বরা করি ;
ঘুচাব এ অপবাদ, বধি রিপুকুলে!

মেঘনাদের পিতৃভক্তি বড় সুন্দর। তাঁহার বীরভাব যেমন সঙ্গত, তেমনি সরল! এতদিন তিনি নিশ্চিত মনে, প্রমোদ উদ্যানে পত্নীসহবাসে আমোদ-নিরত ছিলেন। পিতার আকস্মিক বিপদবার্তায় অপ্রতিভ হইলেন। কিন্তু বিপদ তিনি তৃণজ্ঞান করেন। সে কথা হাসিয়াই উড়াইয়া দিলেন,—

হে রক্ষকুলপতি,
শুনেছি মরিয়া নাকি বাঁচিয়াছে পুনঃ
রাঘব! এ মায়া, পিতঃ, বুঝিতে না পারি!
কিন্তু অনুমতি দেহ, সমূলে নির্মূল
করিব পামরে আজি! ঘোর শরানলে
করি ভস্ম, বায়ু অস্ত্রে উড়াইব তারে ;
নতুবা বাঁধিয়া আনি দিব রাজপদে।

ইন্দ্রজিতের তেজস্বিতা তড়িৎতরঙ্গের মত হৃদয়ে প্রবেশ করে। এই দেখুন—

কি ছার সে নর, তারে ডরাও আপনি
রাজেন্দ্র ? থাকিতে দাস, যদি যাও রণে
তুমি, এ কলঙ্ক, পিতঃ, ঘুষিবে জগতে।
হাসিবে মেঘবাহন ; রুষিবেন দেব
অগ্নি ! দুই বার আমি হারানু রাঘবে ;
আর একবার পিতঃ, দেহ আজ্ঞা মোরে,
দেখিব এবার বীর বাঁচে কি ঔষধে !

ইন্দ্রজিতের মাতৃভক্তি হৃদয়কে স্নিগ্ধ করে ! পুত্রবৎসলা মন্দোদরী কিছুতেই যুদ্ধার্থ মেঘনাদকে বিদায় দিবেন না। রামের দৈববল সৈন্যবলের উল্লেখ করিয়া যুদ্ধযাত্রার অবৈধতা প্রতিপন্ন করিলেন। বিপদ অবশ্যম্ভাবী জানিয়া রক্ষোমহিষী বিদায়ার্থী পুত্রের সম্মুখে অশ্রুবিসর্জ্জন করিলেন। এ সংসারে বীর যিনি, তিনি বুঝি সকলই সহিতে পারেন, কিন্তু মাতার মাতৃভূমির রোদন সহিতে পারেন না। এ সংসারে ক্ষণজন্মা বীরবর সেকন্দর সাকে কখন মাতৃভূমির রোদন শুনিতে হয় নাই, কিন্তু তিনি মাতার অশ্রু সহিতে পারেন নাই। কুমার কাতর হইলেন, কিন্তু যুদ্ধে না গেলে নহে। বলিলেন,

কি সুখ ভুঞ্জিব
যত দিন নাহি তারে সংহারি সংগ্রামে !
আক্রমিলে হুতাশন কে ঘুমায় ঘরে ?
বিখ্যাত রাক্ষসকুল, দেব দৈত্য নরত্রাস
ত্রিভুবনে দেবি ! হেন কুলে কালি
দিব কি রাঘবে দিতে, আমি মা রাবণি
ইন্দ্রজিৎ ? কি কহিবে শুনিলে এ কথা
মাতামহ দনুজেন্দ্র ময় ? রথী যত
মাতুল ? হাসিবে বিশ্ব। আদেশ দাসেরে
যাইব সমরে মাতঃ, নাশিব রাঘবে।
ওই শুন কুজনিছে বিহঙ্গম বনে।
পোহাইল বিভাবরী। পূজি ইষ্টদেবে,
দুর্দ্ধর্ষ রাক্ষসদলে পশিব সমরে
আপন মন্দিরে দেবি, যাও ফিরি এবে।
ত্বরায় আসিয়া আমি পূজিব যতনে
ও পদরাজীবযুগল, সমরবিজয়ী।
পাইয়াছি পিতৃ আজ্ঞা, দেহ আজ্ঞা তুমি।
কে আঁটিবে দাসে, দেবি, তুমি আশীষিলে।

এই বীরত্ব, এই পিতৃমাতৃভক্তি, পত্নীর প্রণয়ে আরও মধুময় হইয়াছে। মেঘনাদের পত্নীবাৎসল্য প্রেমের আদর্শস্থল। তাহার মাধুর্য ও গাম্ভীর্যে হৃদয়

আনন্দে পরিপ্লুত হয়। ঊষাসমাগমে কুঞ্জবনগীতে, কুমারের নিদ্রাভঙ্গ হইয়াছে। প্রমীলা তখনও নিদ্রিতা—

প্রমীলার করপদ্ম, করপদ্মে ধরি
রথীন্দ্র মধুর স্বরে, হায়রে যেমতি
নলিনীর কানে অলি কহে গুঞ্জরিয়া
প্রেমের রহস্যকথা, কহিলা (আদরে
চুম্বি নিমীলিত আঁখি) "ডাকিছে কূজনে
হৈমবতী ঊষা তুমি, রূপসি, কমললোচন।
উঠ চিরানন্দ মোর! সূর্যকান্তমণি
সম এ পরানকান্তে, তুমি রবিচ্ছবি;—
তেজোহীন আমি, তুমি মুদিলে নয়ন।
ভাগ্যবৃক্ষে ফলোত্তম তুমি হে জগতে
আমার নয়নতারা! মহার্হ রতন।
উঠি দেখ শশীমুখি, কেমনে ফুটিছে,
চুরি করি কান্তি তব মঞ্জু কুঞ্জবনে
কুসুম।

আবার,—তখন প্রমীলার নিদ্রাভঙ্গ হইয়াছে—

পোহাইল এতক্ষণে তিমিরশর্বরী;
তা না হলে ফুটিতে কি তুমি কমলিনী,
জুড়াতে এ চক্ষুদ্বয়;

প্রমীলাকে, রক্ষোমহিষী ইন্দ্রজিতের সঙ্গে যজ্ঞাগারে যাইতে দিলেন না। পুত্রের বিরহে, পুত্রবধূর মুখ দেখিয়াও তপ্ত প্রাণ শীতল করিবেন। তবু প্রমীলা আর-একবার স্বামীকে নির্জনে না দেখিয়া থাকিতে পারিলেন না। মেঘনাদ "ধীরে ধীরে"—

"কুসুমবিবৃত পথে যজ্ঞশালামুখে" যাইতেছিলেন! "ধীরে ধীরে", কেন না তখন প্রমীলার চারুমূর্তি হৃদয়ে তাঁহার জাগিতেছিল। এমন সময়ে,

সহসা নূপুরধ্বনি ধ্বনিল পশ্চাতে।
চির-পরিচিতময়ী, প্রণয়ীর কানে
প্রণয়িনী-পদশব্দ। হাসিলা বীরেন্দ্র,
সুখে বাহুপাশে বাঁধি ইন্দিবরাননা
প্রমীলারে।

ইন্দ্রজিতের দেবভক্তি,—তাহাও বড় উন্নত। নিকুম্ভিলাযজ্ঞাগারে তিনি ধ্যানে মগ্ন। দেববৈশ্বানর সশরীরে আবির্ভূত হইয়া বর দিবেন, কথা আছে, এমন সময়ে লক্ষ্মণ মায়াবলে যজ্ঞাগারে প্রবেশ করিলেন। কুমার নয়নোন্মীলন করিয়া দেখিলেন মূর্তি চিরশত্রু লক্ষ্মণের!—কিন্তু দেবতায় তাঁহার অটল ভক্তি,—

সাষ্টাঙ্গে প্রণমি শূর কৃতাঞ্জলিপুটে কহিলা।

আবার যখন মূর্তিমান্ অন্যায় যুদ্ধের ফলে মেঘনাদ অন্তিম শয্যায় শয়ান, প্রাণ দেহ বিচ্যুত হইতে আর বড় দেরি নাই, তখন তাঁহাকে দেখ! তখনও দেবতায় তাঁহার ভক্তি অটল। নিজের পাপের ফলে এ শাস্তি হইল, ইহাই তাঁহার ধারণা হইল, তথাপি বিধাতার ন্যায়শাসনে সন্দেহ জন্মিল না!

দৈত্যকুলদল ইন্দ্রে দমিনু সংগ্রামে
মরিতে কি তোর হাতে? কি পাপে বিধাতা
দিলেন এ তাপ দাসে, বুঝিব কেমনে?

নিকুম্ভিলাযজ্ঞাগারের সেই অপূর্ব দৃশ্য আমূল উন্নত করিতে পারিলে তবে মেঘনাদ-চরিত্রের পূর্ণতা বুঝাইতে পারি। কিন্তু তাহার প্রয়োজন নাই। আমরা জানি সে অংশ কৃতবিদ্য বাঙ্গালীর হৃদয়ে অনল-অক্ষরে মুদ্রিত আছে।

সংসারে যাহা কিছু পবিত্র, যাহা কিছু উন্নত, যাহা কিছু সুন্দর, সেই উপকরণেই ইন্দ্রজিতের চরিত্র সৃষ্ট হইয়াছে। সৌন্দর্য লইয়াই কাব্য;—ইন্দ্রজিতের চরিত্র অনন্ত সৌন্দর্যময়! সে হৃদয় যাহার সে যদি মানুষের সহানুভূতি আকর্ষণ না করিবে, তবে মানবহৃদয়ের মহত্ত্ব কি? তাই যখন নিকুম্ভিলাযজ্ঞাগারে, আত্মাভিমানমাত্র সহায় করিয়া অসহায়, নির্ভীক ইন্দ্রজিৎ আত্মচরিত্রের সর্ববিধ বীরদর্প দেখাইয়া আসন্ন মৃত্যুকে উপহাস করে, তখন আমাদের বিস্ময়েয় সীমা থাকে না। দেবতাদিগকেও ভাল লাগে না,—তাঁহাদের কার্য কাপুরুষের ন্যায় বলিয়া বোধ হয়! সকল ভুলিয়া পূজা করিতে ইচ্ছা হয় মেঘনাদের বীরদর্প; সে চরিত্রের অতুলিত সৌন্দর্য!

রামায়ণের মেঘনাদবধে পাঠকের মনে আনন্দ হয়। মনে হয় দুঃখিনী সীতার উদ্ধারের তরে আর বড় বিলম্ব নাই! কিন্তু "মেঘনাদবধ কাব্যে"র মেঘনাদের অন্যায় মৃত্যুতে কে চক্ষের জল সংবরণ করিতে পারে? 'অন্যায় মৃত্যু'? সে আবার কি? রামায়ণপাঠকালে সে কথা তো মনেই হয় না! সে অন্যায়বোধ, সে দুঃখে সহানুভূতি কেবল "মেঘনাদবধ" পাঠকালেই হয়! ইহার অর্থ কি?

এতক্ষণে বোধহয় আলোক দেখিতে পাইলাম। যে মহাবিধ বৃক্ষ শেষে বিপুল রাক্ষসকুল ধ্বংস করিয়াছিল, তাহার বীজ উপ্ত করিয়াছিল কে? রাবণ! তাহার দণ্ড হউক, সেই ত ন্যায়ানুগত। কিন্তু একের দোষে অন্যে মরে কেন? সর্বগুণাধার মেঘনাদ পিতৃদোষে অকালে, অপঘাতে মরিল কেন?

প্রবাসে যথা মনোদুঃখে মরে
প্রবাসী আসন্নকালে না হেরি সম্মুখে

স্নেহপাত্র তার যত—পিতামাতা ভ্রাতা
দয়িতা—মরিল আজি স্বর্ণলঙ্কাপুরে
স্বর্ণলঙ্কা অলঙ্কার।

তাই বলিতেছিলাম যে এতক্ষণে বুঝি আলোক দেখিতে পাইলাম। পিতার দোষে পুত্র নষ্ট হয়, ইহা পুরান কথা ; কিন্তু ইহাই 'মেঘনাদবধ কাব্যে'র বীজ, নহিলে মেঘনাদকে সকল গুণের আধার করিয়া গড়িবার অন্য কোন উদ্দেশ্য নাই.। চিরাচরিত সংস্কারস্রোতের বিপরীতে কাব্যতরণী ভাসাইবার নহিলে অন্য অর্থ নাই।

এক কথায় বুঝইেতে চেষ্টা করিলাম বটে কিন্তু কথাটা বোধ করি পরিষ্কার হইল না। আমাদের বাহ্য ও অন্তর্জগতের জ্ঞান বড় সঙ্কীর্ণ, তাই আমরা কাব্যে যে নীতি-উপদেশ দিতে চাই তাহাও সাধারণতঃ সঙ্কীর্ণ হইয়া পড়ে। কাব্যের ন্যায়পরতা বা poetical justice এইরূপ সঙ্কীর্ণতার ফল। উন্নত জ্ঞানে মনুষ্য দিনদিন বুঝিতে পারিতেছে যে যে সকল নিয়মে জড়জগৎ শাসিত, নিয়মিত, সংযমিত হয়, অন্তর্জগৎ অবিকল তাহাদেরই অনুবর্তন করে। মনের মাধ্যাকর্ষণ কি, আজি জানি না, ঠিক করিয়া বলিতে পারি না বটে, কিন্তু এমন দিন আসিবে, যখন তাহা আর হাসির কথা থাকিবে না। প্রকৃত প্রতিভাশালী কবি এমন অনেক কথা মানেন, এমন অনেক তত্ত্ব বুঝাইতে চেষ্টা করেন যাহা তোমার আমার ধারণায় আইসে নাই—কাজেই না হাসিলে চলিবে কেন? পিতার দোষে পুত্র নষ্ট হয়, ইহা আমাদের দেশের চিরপ্রচলিত কিংবদন্তী, কিন্তু এটা কি কেবল কথার কথা মাত্র, না কিছু সত্য ইহাতে আছে। এই অসীম ব্রহ্মাণ্ডে নিয়ম ভিন্ন কথা নাই। সামান্য নীহারকণা যে শস্পোপরি ভানুরশ্মি মাখিয়া মুহূর্তে মিশিয়া যায়, সে যেমন নিয়মের অধীন ; অনন্ত শূন্যে অনন্ত পরিমিত অনন্ত সৌরজগৎমণ্ডলী তেমনি নিয়মের অধীন—সর্বত্র নিয়ম! তুমি কবি ;—শরতের চাঁদকে অকস্মাৎ জলদাবৃত হইতে দেখিলে ব্যথিত হও ; প্রবল বাত্যায় সুকুমার তরুকে ধরাশায়ী হইতে দেখিলে অশ্রুবিসর্জন কর ; তোমার মনে হয় যে এ বড় অবিচার! অবিচার হইতে পারে, কিন্তু ইহা নিয়ম। জড়জগৎ কাহারও মুখাপেক্ষা করে না। ইহা শক্তিবিশেষ, যখন আপন প্রভাব বিস্তার করে, তখন ইহার গন্তব্য পথে কেহ দাঁড়াইও না। দাঁড়াইও না!—দাঁড়াইলে নিয়তিচক্রের পদতলে মথিত হইয়া যাইবে! বিজ্ঞান নিত্য এই কথা বলে ; ইতিহাসও অনুদিন এই মহাতত্ত্ব কীর্তন করে, 'মেঘনাদবধ কাব্যে'রও বীজ এই তত্ত্ব! সৌন্দর্যসার মেঘনাদ দেবদুর্লভ গুণে

তোমার আমার আরাধ্য ! সর্বজ্ঞ কবির অপূর্ব, অতুল্য, মোহময় সৃষ্টি ! সত্য বটে।—কিন্তু যে অজেয় শক্তি রক্ষোবংশ ধ্বংস করিতে আসিয়াছিল, তিনি সেই চক্রে মথিত হইলেন। এ জগতে ইহাই নিয়ম—ইহাই সত্য ! এ সত্যের ব্যভিচার নাই।

বলিয়াছি ত যে জড় জগৎ বল, অন্তর্জগৎ বল ; দুইই এক শক্তির আধার। শক্তি এক, তবে মূর্তি বিভিন্ন। যে ভয়ানক শক্তির উচ্ছ্বাসে ব্রহ্মাণ্ডে প্রলয়-কাল উপস্থিত হয়, তাহার নাম জড়শক্তি ; আর যে অদম্য শক্তি রোমরাজ্য ধ্বংস করিয়াছিল, আজি রুশিয়া সাম্রাজ্যে বিষবীজ বপন করিয়াছে, তাহা অন্তঃ-শক্তি !—শক্তি এক, তবে মূর্তি বিভিন্ন। নামও বিভিন্ন !—এক প্রলয়, অন্য বিপ্লব। তবে সান্ত্বনার কথা এই যে, অন্তর্জগতের শক্তিবিশেষের বীজ রোপণ করা মানুষের আয়ত্তের মধ্যে। জড়শক্তি সম্বন্ধে তেমন কিছু আছে কিনা আজও মনুষ্যজ্ঞানে তাহা প্রতিভাত হয় নাই। কিন্তু যে শক্তিই বল, একবার বিকাশ হইলে তাহার বেগ অসহ্য, অপ্রতিহত ! সাধ্যপক্ষে কেহ সে পথে দাঁড়াইও না ! সাবধান ! বিষবীজ রোপণ করিও না ; কুশক্তিপ্রয়োগের কারণ হইও না ! তোমার কার্যের ফলভোগী তুমি একা নও। তোমার সৃষ্ট শক্তিতে, তোমার বংশপরম্পরা ভাসিয়া যাইবে।

আধুনিক বৈজ্ঞানিক অদৃষ্টবাদীরও সেই কথা। একটু ঘুরাইয়া ফিরাইয়া বুঝিয়া দেখ, কথা এক। সুতরাং স্বতঃ না হউক পরতঃ 'মেঘনাদবধ কাব্য' অদৃষ্টবাদের দৃঢ় ভিত্তিতে প্রণীত হইয়াছে। জগতের অধিকাংশ অমর কাব্যের এই তত্ত্বই মেরুদণ্ড।

'মেঘনাদবধ কাব্যে'র জ্ঞানময় কবি প্রমীলাচরিত্রে কয়েকটি গুরুতর নৈতিক তত্ত্ব নিহিত রাখিয়াছেন। সেগুলি স্বতঃসুন্দর এবং লোকহিতকর। এক্ষণে আমরা যথাসাধ্য তাহা পরিস্ফুট করিতে প্রয়াস পাইব।

যে বলিয়াছিল যে ভারতীয় সমাজ পক্ষাঘাতরোগগ্রস্ত, সে বাস্তবিক ভাবিতে শিখিয়াছে। আমাদের সমাজে স্ত্রীপুরুষের সাম্য কখন ছিল কিনা ঠিক বলা যায় না, থাকিলেও তাহা যে বহুকাল হইতে লোপ পাইয়াছে, তাহাতে বড় সন্দেহ নাই। আর্যধর্মশাস্ত্র দেখ, যত বন্ধন স্ত্রীজাতি লইয়া ! কাব্য দেখ, স্ত্রীজাতির প্রধান ধর্ম সতীত্ব। ইহা গুরুতর বৈষম্য। পবিত্রতা ইহ সংসারে সকল সুখের আকর ; কিন্তু বিধিটা একতরফা করায় ইহার শুভকারিতা অনেক কমিয়াছে। যখন ভাবিয়া দেখি যে পবিত্রতার সাক্ষাৎ প্রতিমা সীতাচরিত্র আর্য নারীসমাজের আদর্শ এবং আমাদের গৃহে গৃহে সে দেবীদুর্লভ চরিত্রের অভাব নাই, তখন মনে হর্ষ-বিষাদের তরঙ্গ খেলে, বিষাদ,—কেন না

তাহা হইলে সমাজের এ পক্ষাঘাতরোগ বুঝি জন্মিত না। যে ধর্মের পরিণতিতে সামাজিক মঙ্গল নাই, তাহা ঠিক ধর্ম নহে। ফলনিরপেক্ষ ধর্মাধর্ম সংসার-বিরাগী সন্ন্যাসীর কথা। সীতা চরিত্রের পবিত্রতা, পবিত্রতার একশেষ! যে সমাজ স্ত্রীপুরুষের সমবায়ে নির্মিত, উভয়ের সহকারিতা যাহার প্রাণ, তাহাতে ইহা একরূপ বিড়ম্বনা। সীতা চরিত্র আমাদের জাতীয় গৌরব, কিন্তু তাহার পরিণাম গৌরববিধ্বংসকর!

সীতাচরিত্র সমাজে যে অশুভ উৎপাদন করিয়াছে, লোকহিতৈষী কবিগণ মধ্যে মধ্যে তেজস্বিনী চিত্তময়ী রমণী-চরিত্র সৃষ্টি করিয়া তাহার নিরাকরণের চেষ্টা পাইয়াছেন, এই আর্য সমাজে দুই-তিনবার সে চেষ্টা হইয়াছে;—তবে ফল বড় নাই। কেননা সে সকল চরিত্রের কার্যকারিতা সমাজ গণ্য করে না। একবার দ্রৌপদীচরিত্রে সে চেষ্টা হইয়াছে। দ্রৌপদী পবিত্রা আর্য রমণী কিন্তু দ্রৌপদী আবার প্রখরবুদ্ধিশালিনী, প্রতিজ্ঞাময়ী জ্যোতির্ময়ী দেবী! তিনি পুরুষের যোগ্য সহধর্মিণী!—সখী, কিন্তু দাসী নহেন। যুধিষ্ঠিরাদি ভ্রাতৃগণ তাঁহার সহিত পরামর্শ না করিয়া কোন কাজ করেন না। আর-একবার সে যত্ন হইয়াছিল তন্ত্রশাস্ত্রে। যিনি মন দিয়া তন্ত্রশাস্ত্রালোচনা করিয়াছেন তিনি প্রতি পদে ইহা স্বীকার করিবেন। তন্ত্রপ্রচারের সময় দেশ বোধহয় বড় বৈষম্যময় হইয়াছিল। পুরুষ সর্বেসর্বা, স্ত্রী বলিতে গেলে কেহ নহে। পক্ষাঘাতগ্রস্ত, অধঃপতিত সমাজ আর চলে না। যে কেহ আসিয়া—অসভ্য বা অর্ধসভ্য যে সে আসিয়া—অত্যাচার করে; রাজা হইয়া বসিতে যায়। তখন স্থিতিশীল ফলবাদী ব্রাহ্মণকুলের চিরোর্বর মস্তিষ্ক আর স্থির থাকিতে পারিল না। তাহার ফলে তন্ত্রশাস্ত্রের কুহক বিস্তৃত হইল। বুঝা গেল যে, দিনকতক স্ত্রী-চরিত্রের একটু বাড়াবাড়ি হইলে ক্ষতি নাই—শেষে আপনিই সাম্য আসিবে। শক্তিরূপিণী অসুরকুলদলনী দুর্গার আর নৃমুণ্ডমালিনী, করালবদনী, হরহৃদি-বিলাসিনী কালিকার মূর্তি দেখিলে বীরপুরুষেরও আতঙ্ক উপস্থিত হয়! যাহা অনন্তশক্তি দেবে পারিল না বলিয়া কল্পিত হইয়াছে তন্ত্রের দেবী মুহূর্তে তাহা করিল। তন্ত্রশাস্ত্রে নারীচরিত্র অনেক সময়ে পুরুষ হইতে প্রবলতর; কখন বা পুরুষের সমান; পুরুষ অপেক্ষা হীন কখন নহে। ওডিনের Odin উপবর্গ অসভ্য ইয়ুরোপীয়গণকে সাহস শিখাইয়াছিল। বঙ্গভূমে তন্ত্রশাস্ত্র সামাজিক সাম্য প্রচারের জন্য প্রণীত হইয়াছিল।

'মেঘনাদবধ কাব্য' যখন লিখিত হয়, তখন বঙ্গসমাজে সবেমাত্র পাশ্চাত্য জ্ঞানচর্চার উন্নতি আরম্ভ হইতেছিল। সুশিক্ষিত বাঙ্গালী যুবক, হৃদয়ে যে সাম্যভাব ধারণ করিলেন, গৃহে তাহা পূর্ণ হইবার সম্ভাবনা নাই। তাই

অবগুণ্ঠনবর্তী ব্রীড়াসঙ্কুচিতা বঙ্গনারীকে প্রমীলার বেশে দেখিয়া কৃতবিদ্য যুবক তখন মোহিত হইয়াছিলেন।

অধরে ধরিলো মধু, গরল লোচনে আমরা ;
নাহি কি বল এ ভুজ মৃণালে ?

বড় মধুর, বড় ভাবব্যঞ্জক আর বড় সাম্যসংস্থাপক। যখন পড়ি, যতবার পড়ি, মিষ্ট লাগে! প্রথমে বুঝি আরও মিষ্ট লাগিয়াছিল। দার্শনিকপ্রবর জন্ স্টুয়ার্ট মিল স্ত্রীজাতির সাম্য প্রতিপাদন করিয়া প্রবন্ধ লিখিয়াছেন ;—আর আমাদের মধুসূদন 'প্রমীলা' চরিত্র সৃষ্টি করিয়াছেন। উদ্দেশ্য উভয়েরই এক।

প্রমীলাচরিত্রের আর একটি ভঙ্গী দেখ। ইহা ইন্দ্রজিতের মত বীরত্বময়। এই প্রবন্ধে আমরা ইন্দ্রজিতের চরিত্র সবিশেষ আলোচনা করিয়াছি ;—প্রমীলা-চরিত্র সন্ধান করিয়া প্রবন্ধ বিস্তৃত করিতে চাহি না। তবে সে চরিত্র যে ইন্দ্রজিতের মত বীরত্বময় তাহা কেহ বোধ হয় অস্বীকার করিবেন না। এই চরিত্রসাম্য এই রাক্ষস দম্পতির অতুল মোহময় প্রেমের কারণ। যাঁহারা সাম্যকে প্রেমের কারণ বলিতে প্রস্তুত নহেন, এ কথাটি তাঁহারা একবার ভাবিয়া দেখিবেন।

আশ্বিন ১২৮২

কুন্দনন্দিনী

বিষবৃক্ষের চিত্রভূমিতে দৃষ্টিপাত হইলেই কতিপয় সুন্দর চিত্র অতি উজ্জ্বল বর্ণে তোমার দৃষ্টিপথে পতিত হইবে। একদিকে দেবেন্দ্র হীরার সহিত হাস্য পরিহাস করিতেছেন, অন্যদিকে নগেন্দ্র সূর্যমুখীর জন্য জাগরণে নিশাবসান করিতেছেন, এমত সময়ে সূর্যমুখী সহসা উদিতা হইয়া তদীয় মুখকমল প্রফুল্লিত করিলেন, অপরদিকে ঐ দেখ কমলমণি সূর্যমুখীর পার্শ্বে বসিয়া তাহার মনোদুঃখ শ্রবণ করিতেছেন ; আবার ঐ হরিদাসী বৈষ্ণবী কেমন গান গাইতে গাইতে, নৃত্য করিতে করিতে, নগেন্দ্রের পৌরজনের চিত্তহরণ করিয়া চলিয়া যাইতেছেন। দেবেন্দ্র, হীরা, সূর্যমুখী, নগেন্দ্র ও কমলমণি—ইহারা সকলেই বর্ণগৌরবে চিত্রভূমি উজ্জ্বল করিয়াছে। কিন্তু ইহাদিগের পার্শ্বে ঐ যে অবগুণ্ঠনবতী—মৃদুরঞ্জনে রঞ্জিত হইয়া অবনতমুখী অশ্রুপাতে মনোদুঃখ বিগলিত করিতেছেন, উঁহাকে কি তুমি চিনিতে পারিবে—উনি কুন্দনন্দিনী।

উঁহার চিত্র তত বিভাসিত নহে, অতি কোমলবর্ণে মৃদুরঞ্জিত, কিন্তু উঁহার চিত্রে এমন মাধুর্য, এমন সৌন্দর্য আছে, যাহা তাহার পার্শ্বস্থ কোন উজ্জ্বল চিত্রে নাই। সূর্যমুখী উজ্জ্বলতর গুণে এবং কমলমণি তদপেক্ষাও উজ্জ্বলতর গুণে পরিভূষিতা বটে, কিন্তু কুন্দনন্দিনীতে যে ধীর আবরিত সৌন্দর্য, যে কোমল রমণীয়তা, যে অসামান্য সলজ্জ সরলতা আছে, তাহা সূর্যমুখী ও কমলমণিতে নাই। বঙ্কিমবাবু বিষবৃক্ষের বর্ণোদ্ভাসিত চিত্রভূমি আঁকিতে আঁকিতে কোথা দিয়া যে রমণীরত্নের চিত্র সুস্পষ্ট অথচ মৃদুবর্ণে আঁকিয়া গিয়াছেন, পাঠক তাহা শীঘ্র উপলব্ধি করিতে পারেন না। অপরাপর চিত্রের উজ্জ্বল অঙ্কপাতে তাঁহার চিত্ত এত আকৃষ্ট থাকে যে, অশ্রুপূর্ণা বিমলিনা কুন্দনন্দিনীর দিকে তাঁহার সহজে দৃষ্টিপাত হয় না। কেহ না দেখাইয়া দিলে তিনি যে দেখিতে পান না। এইজন্য বিষবৃক্ষের সমালোচনার আবশ্যক ; নহিলে বিষবৃক্ষের সৌন্দর্য এবং গুণাবলী গ্রন্থকার নিজ অক্ষরেই এমন সুস্পষ্ট দেখাইয়া দিয়া গিয়াছেন যে, তিনি তীক্ষ্ণদৃষ্টি সমালোচকের জন্যে আর কিছুই রাখিয়া যান নাই।

বঙ্গের অন্ধ অন্তঃপুরীমধ্যে যে সকল কুলকামিনী রমণীরত্ন জন্মে, পৃথিবীর আর কোনখানে সেরূপ জন্মে কিনা সন্দেহ। অনেক কারণে এখানে অনেক রমণী পতিপরায়ণতার পরাকাষ্ঠা প্রাপ্ত হয়। ততদূর পাতিব্রত্য অন্যদেশের কুলকামিনী সতীতে প্রত্যাশা করা যাইতে পারে না। সূর্যমুখী অন্যদেশে নিশ্চয় সুদুর্লভা ; তদপেক্ষা কমলমণি এবং কমলমণি অপেক্ষা কুন্দনন্দিনী। সূর্যমুখীর পাতিব্রত্য কায়মনোবাক্যে প্রকাশিত হইয়াছিল, কমলমণি একদিন সূর্যমুখীকেও পাতিব্রত্য শিক্ষা দিয়াছেন। কুন্দনন্দিনীর পাতিব্রত্য কায়মনোবাক্যে প্রকাশিত হয় নাই বটে, কিন্তু তজ্জন্য কিছুতেই ন্যূন নহে, বরং তজ্জন্যই অধিকতর উজ্জ্বল, বিশুদ্ধ, এবং পবিত্র বলিয়া প্রতীত হয়। সূর্যমুখী অন্যদেশে দুর্লভ, কিন্তু কুন্দনন্দিনী বঙ্গদেশেও দুর্লভ। এখানে যদি দুইশতের মধ্যে একজন সূর্যমুখী থাকে, পঞ্চশতের মধ্যে একজন কমলমণি থাকে, তবে সহস্র বঙ্গবধূর মধ্যে একজন কুন্দনন্দিনী আছে কিনা সন্দেহ। বঙ্গগৃহবধূর ভীরুতা, নম্রতা, সরলতা, অনভিজ্ঞতা ও কোমলতা যতদূর অনুমান করা যাইতে পারে, কুন্দনন্দিনীর ততদূর ছিল। বাস্তবিক কুন্দনন্দিনী মৃদুপ্রকৃতি বঙ্গগৃহবধূর অবয়বী কল্পনা। এইজন্য কুন্দনন্দিনী এদেশেও দুর্লভ। অপরদেশীয় কবি কুন্দনন্দিনীকে কল্পনাতেও আনিতে পারিবেন না। কিন্তু বিরল বলিয়াই, সূর্যমুখী অপেক্ষা কুন্দনন্দিনী শ্রেষ্ঠতর। সূর্যমুখী বঙ্গগৃহের শোভা, কমলমণি গৃহধাম গুণে আলোকিত করেন এবং কুন্দনন্দিনী

সেই অন্ধ ধামের অভ্রদেশে মাণিক্যের ন্যায় গোপনে উজ্জ্বলিত রহেন। যিনি এরূপ রত্ন চিনিতে পারেন, তিনি তুলিয়া হৃদয়ে ধারণ করেন ; যিনি না চিনিতে পারেন, তাহার মাণিক্য কুন্দনন্দিনীর ন্যায় অবশেষে সর্পের বিষের জ্বালায় জ্বলিয়া যায়।

ঐ যে সরোজিনী জলাশয়ে প্রস্ফুটিত হইয়া, রূপে ঢলঢল করিয়া, চারিদিক্ সৌরভে আমোদিত করিয়া, মলয়বায়ুহিল্লোলে জলতরঙ্গে নাচিয়া নাচিয়া প্রফুল্লমুখবিকাশে উদ্যানরাজি প্রফুল্লিত করিয়াছে, উহা একদিন কমলমণির সহিত তুলনীয় হইতে পারে। আর ঐ যে পূর্ণবিকশিত, শতদলশোভিত, পরিমলসুগন্ধিত, রূপে আনন্দিত গোলাবকুসুম উদ্যানের মধ্যস্থিত গর্বস্বরূপ হইয়া তোমার নয়নের তৃপ্তিসাধন করিতেছে, উহা সূর্যমুখীর সদৃশ চতুর্দিক সুশোভিত করিয়া রহিয়াছে। কিন্তু যদি কুন্দনন্দিনীর সাদৃশ্য দেখিতে চাও, তবে ঐ গোলাবেরই নিকটস্থ আর-এক তরুশিরে গিয়া দেখ, একদল অর্ধ-মুকুলিত গোলাবগুচ্ছ বৃন্তশিরে সুশোভিত রহিয়াছে ; তাহার মধ্যকুসুম প্রস্ফুটিতপ্রায়, অথচ দলগুঞ্জে সম্যক্ প্রস্ফুটিতে পারে নাই। আর উহা ফুটিতে পারিবে না। তুমি অনুমানে উহাকে ফুটাইয়া লও, এবং বল দেখি, উহা সম্যক্ প্রস্ফুটিত হইলে, ঐ পূর্ববিকশিত গোলাবের শোভা পরাজয় করিত কি না? কুন্দনন্দিনী ঐরূপ অর্ধবিকশিত অথচ প্রস্ফুটিত গোলাবস্বরূপ। অনুমানে তাহাকে ফুটাইয়া লইতে হয়। তাহা নিজে সম্যক্ শোভা বিকশিত করিতে পারে না। রূপে যেন গর্বিত থাকে। পরিমলে হৃদয়কন্দর পরিপূর্ণ করিয়া রাখে, যিনি আদরে তাহাকে দেখিতে আসেন, তাহাকে আপনার হৃদয়ধন কথঞ্চিৎ বিতরণ করিয়া আমোদিত করেন। তাহার হৃদয়ে যে সম্পত্তিরাশি সঞ্চিত আছে, তাহা অন্য কুসুমে নাই ; সেই জন্যই বুঝি সাহসভরে সম্যক্ প্রস্ফুটিতে পারে নাই।

কুন্দনন্দিনীর হৃদয়, এইরূপ ভাবে পরিপূর্ণ। সে ভাব অবাতবিক্ষোভিত জলধির ন্যায় গভীর, অচঞ্চল, এবং স্থির। সে জলধি মথিত করিলে অমৃত উঠে। ঘটনা-বায়ু তাহাতে ক্রীড়া করিয়া বেড়ায়। যদি আলোড়িত ও তরঙ্গে আন্দোলিত করে, জলধি নিজ হৃদয়েই সে আন্দোলন ধারণ করিয়া রাখেন। চন্দ্র হাসিলে তাহা আনন্দে স্ফীত হইয়া উঠে, কিন্তু সে বক্ষস্ফীতি কেহ দেখিতে পায় না। চন্দ্রকে বক্ষে ধারণ করিয়া সুখহিল্লোলে নাচিতে থাকে। চন্দ্র সরসীর কুমুদিনীর শোভাতেই মোহিত। তিনি এ জলধির আনন্দভাস দেখিতে পান না। চন্দ্র একবার এই জলধিতে নিমগ্ন হইয়াছিলেন ; আবার মেঘের উচ্চ সিংহাসনে উঠিয়া বসিলেন ; বসিয়া সেই দূর পশ্চিম

সরসীর কুমুদিনীর প্রতি হাসিতে লাগিলেন। মেঘে প্রবল বাত্যা বহিল। জলধি তমসাচ্ছন্ন ও আন্দোলিত হইল। আন্দোলন শেষ হইলে পর যখন শশী আবার প্রকাশিত হইলেন, তখন দেখা গেল তিনি সেই পশ্চিম সরসীর দিকে ঢলিয়া পড়িয়াছেন। শশী, জলধি পার হইয়া অস্তমিতপ্রায়। তখন অর্ধরাত্রের ঘন তিমির আসিয়া জলধিকে অন্ধকারে পরিপূর্ণ করিল। জলধি রজনীর বিশ্বব্যাপী ঘন তিমিরে ডুবিয়া গেলেন।

বাঙ্গালীর মত ভীরুজাতি পৃথিবীতে আছে কিনা সন্দেহ। কুন্দনন্দিনী এই ভীরুতার ফল। বাঙ্গালিনী রমণী কতদূর ভীরুস্বভাব হইতে পারে কুন্দনন্দিনী তাহা প্রকাশিত করে, সংসারের সাহসিকতা কিরূপ কুন্দনন্দিনীর ন্যায় রমণী তাহা জানে না, ভাবিতেও পারে না ; সে সাহসিকতার উপন্যাস বলিলে শিহরিয়া উঠে। যে অল্প বীর্য ও তেজ বাঙ্গালির আছে, তজ্জন্য সর্বদাই সশঙ্কিত থাকে। কেহ উচ্চরবে কথা কহিলেও ভীত হয়। পুষ্পের আঘাতেও মূর্ছা যায়। জননীর নিতান্ত অঙ্কপ্রিয় হয়। কিছু করিবার জন্য হস্তপ্রসারণ করিতে ভয় পায়। উচ্চরবে কথা কহিতে জানে না। অন্যে উচ্চরবে কথা কহিলে থমকিয়া কাঁদিয়া পড়ে। কেহ কিছু বলিলে কুটীরমধ্যে একাকিনী বসিয়া নীরবে কাঁদিতে থাকে। তাহার অবগুণ্ঠনবিমুক্ত মুখচন্দ্রিমা অল্পলোকেই দেখিতে পায়। একাকিনী থাকিতে ভালবাসে। অন্যান্য রমণীর সহিত মিশিতে সাহস হয় না। মিশিলে তাহাদিগের সহিত দুই-একটি কথামাত্র কয়। তাহাদিগের সহিত অগ্রসারিণী হইয়া কার্য করিতে যায় না, হয়তো একপার্শ্বে দাঁড়াইয়া থাকে, অবগুণ্ঠন টানিয়া পরের সাহস ও কার্য দেখিতে থাকে। পরের প্রতি দুই চক্ষে চাহিতেও ভয় পায়। চক্ষে চক্ষে মিলিলে অমনি নয়নপল্লব ফেলিয়া মুখ অবনত করে। মনের ইচ্ছা ব্যক্ত করিতে পারে না ; ইচ্ছা হইলে মনে মনেই বিলীন হয়। কোন ইচ্ছা প্রকাশিত করিতে নিতান্ত অনুরোধ করিলে তাহা আপনি সাহসভরে বলিতে পারে না ; সঙ্গিনীর সহিত চুপিচুপি কানে কানে কহিয়া দেয়। সে ইচ্ছা, দেখা যায়, অন্য রমণীর ইচ্ছার সহিত কিছু স্বতন্ত্র। অন্যের সহিত সে ইচ্ছার কিছু বিশেষ হইবেই হইবে। সে ইচ্ছাতে হয়তো ধীরতা আছে, নম্রতা আছে, উচ্চাশা নাই, সাহস নাই। হরিদাসী বৈষ্ণবী আসিলে কুন্দনন্দিনী এইরূপ ব্যবহার করিয়াছিলেন। অনুরুদ্ধ না হইলে, যাহা হইত ও ঘটিত, তিনি নীরবে ও নিঃশব্দে তাহা শুনিয়া ও দেখিয়া যাইতেন। সহিষ্ণুতা, ভীরুতার ফল। সুতরাং কুন্দের ন্যায় রমণীর সহিষ্ণুতা থাকা অবশ্যম্ভাবী ধর্ম। আবার প্রকৃত সোহাগ কি, তাহা ইহারাই জানে, ইহাদিগেরই থাকে। ইহাদিগেরই প্রকৃতিতে

ভীরুতা কোমলতার সহিত মিশিয়া যায়। কোমলতার সহিত না মিশিলে ইহাদিগের ভীরুতা অন্যবিধ কামিনীর স্বাভাবিক ভীরুতার সহিত সমান হইত, তাহার বিশেষ ভাব লক্ষিত হইত না। হৃদয়ের কোমলতার সহিত ভীরুতা মিশিয়া প্রকৃতি যে সুকোমলভাব ধারণ করে তাহা বাঙ্গালির প্রকৃতিতে আছে। তাহা বাঙ্গালিনী রমণীতে পরাকাষ্ঠা প্রাপ্ত হইয়াছে। কুন্দনন্দিনী সেই অভূতপূর্ব সুকোমলতার অবয়বী কল্পনা ও সুন্দর দৃষ্টান্ত। এই সুকোমলতা প্রকৃত জীবনে এতদূর প্রাপ্ত হওয়া যায় না। যে মাত্রায় কুন্দনন্দিনী প্রকৃত জীবনের উপর দাঁড়াইয়া আছেন, সেই মাত্রা, কবির চিত্রবিভাস, তাহাই কাব্য-সৃষ্টি। প্রকৃত জীবনে বঙ্গগৃহলক্ষ্মী তাহার অনেক দূর নিকটবর্তিনী হইতে পারেন, কিন্তু ঠিক সেই উচ্চতায় উঠিতে পারেন না। প্রকৃত জীবনের উপর এই অত্যল্প মাত্রায় উচ্চতা দেওয়া কবির কার্য ; এই উচ্চতা কেবল উপন্যাসে ও কাব্যেই প্রাপ্ত হওয়া যায়। যিনি কবি নহেন, যিনি সামান্য লেখক, তিনি এই বর্ণগৌরব, প্রকৃত চিত্রে এই বর্ণবিভাস দিতে সমর্থ হয়েন না। এই ঈষৎ চিত্ররঞ্জন সূর্যমুখী ও কমলমণিতেও আছে, তবে তাহাদিগের চিত্রের সহিত কুন্দনন্দিনীর চিত্রের প্রভেদ এই, কোমলবর্ণ বঙ্গগৃহবধূ কুন্দনন্দিনীতে কোমলতার বর্ণ প্রাপ্ত হইয়াছে এবং সূর্যমুখী কমলমণি উজ্জ্বলবর্ণে উজ্জ্বলতরা হইয়াছেন। প্রকৃত জীবনের চিত্র বঙ্কিমবাবু অল্পই লিখিয়াছেন। কিন্তু তাঁহার বিষবৃক্ষ সমুদায় প্রকৃত জীবনের চিত্র। অথচ প্রকৃত জীবনের চিত্র ধরিলে, বঙ্কিমবাবুর ন্যায় ভাবচিত্রকর সেই চিত্রে কেমন কাব্যসৃষ্টি দেখাইতে পারেন তাহা বিষবৃক্ষের চিত্রাবলীতে স্পষ্ট বর্ণে প্রতীত হয়।

ভাবময়ী কুন্দনন্দিনী কোমলতায় পরিপূর্ণ। কুন্দনন্দিনীর যদি কিছু গুণ ও সম্পত্তি থাকে তাহা তাহার হৃদয়, প্রেম, সহৃদয়তা ও কোমলতা। শেলির লজ্জাবতী লতা এতদূর কোমলপ্রকৃতি নহে। তাঁহার হৃদয় ভাবে সর্বদাই উদ্বেলিত হইত। তিনি স্বভাবগুণে কোমল ভাবকে কোমলতর করিতেন। তাঁহার ভাবোদ্বেগ হৃদয়কে স্তম্ভিত করিয়া রাখিত। কখন অশ্রুধারায় বিগলিত হইত। অশ্রুধারাই সে হৃদয়পূর্ণতার বাহ্যবিকাশ। সূর্যমুখী হৃদয়ভাবকে সুন্দর প্রকাশিত করিতে জানিতেন। এমন কি অনেক সময় তাঁহার ভাবব্যক্তি হৃদয়স্থ ভাবকে সুন্দরতর করিয়া দেখাইত। কুন্দনন্দিনী ভাব প্রকাশ করিতে জানিতেন না। তাঁহার ভাব নিজেই প্রকাশিত হইয়া পড়িত, ভাবপূর্ণতা উথলিয়া পড়িত। কিন্তু তাঁহার এই নিগূঢ় ভাববিকাশ কি সূর্যমুখীর সহিত সমান অর্থপূর্ণ ছিল না? যিনি তাহা পড়িতে জানিতেন, অশ্রুধারা ও অস্ফুট বাক্‌স্ফূর্তি তাহার নিকট অধিকতর অর্থপূর্ণ বোধ হইত। কমলমণি তাহার নিগূঢ়

অর্থ তন্ন তন্ন বুঝিতেন। নগেন্দ্র তাহার কিছুই বুঝিতে পারিতেন না। কুন্দনন্দিনীর অগাধভাবপূর্ণতা কখন নীরবতায় কখন অশ্রুধারায়, কখন একটিমাত্র ক্ষুদ্র কথায় অর্থপূর্ণ হইয়া প্রকাশিত হইত। সে বিকাশ সূর্যমুখীর বাক্‌পূর্ণতা অপেক্ষাও অধিকতর অর্থপূর্ণ। সূর্যমুখীর বাক্‌পূর্ণতা হৃদয়ের অন্তস্থল পর্যন্ত সুস্পষ্ট প্রকাশিত করিত। কুন্দনন্দিনীর অবাকস্ফূর্তি হৃদয়ের আভাসমাত্র দিত। সে হৃদয় কত গভীর, কত পূর্ণ, সম্যক প্রকাশিত করিত না। যাহা প্রকাশিত হইয়া পড়িত তাহা হৃদয়ের অস্ফুট ভাবব্যক্তি। সে ক্ষুদ্র আলোকে তাহার হৃদয়ের পূর্ণতামাত্র দেখাইত, গভীরতার আভাসমাত্র দিত। দেখাইত, কুন্দনন্দিনীর যাহা কিছু সৌন্দর্য তাহা তাহার ভাবপূর্ণ সরলতাময় সুন্দর হৃদয়। সেই হৃদয়ের গভীরতা কত, সে আলোকে দেখা যাইত না। বোধ হইত, সেই হৃদয়গভীরে অনেক রত্ন নিহিত আছে।

এই পূর্ণ হৃদয়ের কি বাহ্যবিকাশ হয়? হৃদয় ফাটিয়া ইহার কিঞ্চিন্মাত্রা সময়ে সময়ে বাহিরে বহিয়া পড়ে। নীরবতা ইহার স্তম্ভিতভাব দেখায়, অশ্রুধারা ইহার কোমলতা দেখায়, এবং দুই-একটি মৃদু কথা মাত্র ইহার গাম্ভীর্য ও সুন্দরতা দেখায়। অবাকস্ফূর্তি কুন্দনন্দিনীর প্রকৃতিবিশেষ নহে, কিন্তু ইহা তাঁহার প্রকৃতিবিশেষের ফল। যে বাপীকূলে প্রদোষকালে একদা কুন্দনন্দিনী বসিয়া নীলপ্রভ জলরাশিতে প্রতিবিম্বিত আকাশচিত্রে জলের গাম্ভীর্য দেখিতেছিলেন, কুন্দনন্দিনী জানিতেন না যে, সেই স্থির নীলবর্ণ, কাল জলরাশি তাঁহার হৃদয়ের সদৃশ বলিয়াই সেখানে বসিয়া তিনি হৃদয়ের প্রতিবিম্ব দেখিতে লাগিলেন, হৃদয় একবার অধ্যয়ন করিলেন, সে জলে তিনি নিজে নিমজ্জিতা হইতে পারিলেন না; তাহা অপরকে নিমজ্জিতা করিতে পারিত। কুন্দনন্দিনীর হৃদয় তেমনি তরল, তেমনি পূর্ণ, তেমতি নীল, তেমতি কালিমায় সুগভীর। যে হৃদয়াকাশ ইহার উপর আসিয়া পড়িত, তাহার সুন্দর তারকাবলী ইহাতে প্রতিবিম্বিত হইয়া ইহার সৌন্দর্য বর্ধন করিত, ইহার গাম্ভীর্য দেখাইত, ইহার কালিমা এবং তরলতা প্রকাশিত করিত। সূর্যমুখী সেই হৃদয়াকাশ, নগেন্দ্র সেই হৃদয়াকাশ এবং কমলমণি সেই অশেষতারারাজিত হৃদয়াকাশ। কুন্দনন্দিনী কেবল নগেন্দ্রকেই প্রতিবিম্বিত করিয়াছিলেন এমত নহে, সূর্যমুখীরও বিরহে কাতরা, এবং কমলমণির সমক্ষে হৃদয়-বক্ষ খুলিয়া দিয়াছিলেন। তাহাতে কমল-হৃদয়ের তারারাজি ফুটিয়াছিল বটে, কিন্তু সে আলোকে কুন্দনন্দিনীর হৃদয় আলোকিত হয় নাই, তাহার নীলিমা, গভীরতা ও তরলতাই প্রকাশ করিয়াছিল।

বঙ্গগৃহবধূ যখন অবগুণ্ঠনে নিজ মুখমণ্ডল আবরিত করিয়া রাখেন, তখন

কেহই জানিতে পারেন না সেই অবগুণ্ঠনমধ্যে কি রূপরাশি লুক্কায়িত আছে। সেই অবগুণ্ঠন বিমুক্ত হইলে যখন অচিরাৎ এক অপূর্ব মোহিনীমূর্তি তোমার নিকট প্রকাশিত হয়; তখন দেখিয়া চমকিত হও, সে কি রূপ? না— কমলকান্তি, সেই কমলের ন্যায় প্রস্ফুটিত সুন্দর, নবীন, মধুর, প্রফুল্ল অথচ সুকুমার, সে কি রূপ?—না চন্দ্রবিভা, সেই চন্দ্রের ন্যায় উজ্জ্বল, স্নিগ্ধ, কোমল অথচ আলোকময়; নয়ন মুদিত আছে; নহিলে সে নয়নকটাক্ষে তোমার হৃদয় এখনি অস্থির হইত, কুসুমশর কোমল কি তীক্ষ্ণ এখনি জানিতে পারিতে; অধরে বর্ণরাগ ফুটিয়াছে, যেন চুম্বনের জন্য তোমাকে আহ্বান করিতেছে। অবগুণ্ঠনবিমুক্ত সেই রূপমাধুরী দেখিয়া যেমন মোহিত ও আশ্চর্য হইতে হয়, কুন্দনন্দিনীর হৃদয় নীরবতার আবরণ বিমুক্ত হইয়া যখন প্রকাশিত হইয়া পড়ে, আমরা তদ্রূপ মোহিত ও আশ্চর্য হই। আমরা এই আবরণ ভেদ করিয়া তাঁহার হৃদয় দেখিবার জন্য বরাবর তাঁহাকে অনুসরণ করিয়াছি। সেই ত্রয়োদশবর্ষীয়া বালিকা যখন মুমূর্ষু পিতার শিয়রে বসিয়া ছলছল করিয়া চাহিয়া আছেন, ভাবিতেও পারেন না যে তাঁহার পিতার মৃত্যু সন্নিকট, কেন না তাহা হইলে তিনি একেবারে নিরাশ্রয়া হইবেন, মৃত্যু-অঙ্কে তাঁহাকে শায়িত দেখিয়া ভাবিতেছেন, তিনি বুঝি আবার নিদ্রাভিভূত হইলেন; পৃথিবীর ভাবগতিক কিছুই জানেন না। তখনকার এই সরলতা দেখিয়া ভাবিলাম, ইহা বুঝি তাঁহার বালস্বভাবের অনভিজ্ঞতা মাত্র। কারণ, এই তাঁহার প্রথম পরিচয়। তৎপরে যখন চাঁপা কুন্দকে সঙ্গে করিয়া নগেন্দ্রের দিকে লইয়া যাইতেছেন, "আসিতে আসিতে দূর হইতে তখন নগেন্দ্রকে দেখিয়া, কুন্দ অকস্মাৎ স্তম্ভিতের ন্যায় দাঁড়াইল। তাহার আর পা সরিল না। সে বিস্ময়োৎফুল্ল লোচনে বিমূঢ়ার ন্যায় নগেন্দ্রের প্রতি চাহিয়া রহিল।" "দেখিল যাহাকে স্বপ্নে দেখিয়াছেন, নগেন্দ্র ঠিক সেই মূর্তি। তখন তাহাকে ভয়বিহ্বলা ও সঙ্কুচিতা দেখিয়া নগেন্দ্র কুন্দকে অনেক বুঝাইয়া বলিলেন। কুন্দ কোন উত্তর করিতে পারিল না; কেবল বিস্ময়বিস্ফারিত লোচনে নগেন্দ্রের প্রতি চাহিয়া রহিলেন।" তৎপরে তাহার অনুগমনে কলিকাতায় যাইলেন। এই নিরীহ, অশক্ত, সরল বালিকা যখন স্নেহময়ী কমলের নিকট লেখাপড়া শেখেন তখন তিনি লেখাপড়া সুন্দর শিখিতে পারেন, কিন্তু "অন্য কোন কথাই বুঝেন না। বলিলে, বৃহৎ, নীল, দুইটি চক্ষু—চক্ষু দুইটি শরতের পদ্মের মত সর্বদাই স্বচ্ছ জলে ভাসিতেছে—সেই দুইটি চক্ষু নগেন্দ্রের মুখের উপর স্থাপিত করিয়া চাহিয়া থাকে কিছুই বলে না—নগেন্দ্র সে চক্ষু দেখিতে দেখিতে অন্যনমস্ক হন।" সে চক্ষের প্রভাব নগেন্দ্র কেন, অন্য লোকেও

বিলক্ষণ অনুভব করিত। সে দৃষ্টির সরলতা, অর্থপূর্ণতা, নিরাশ্রয়ের ভাব-ব্যঞ্জকতা, সূর্যমুখীও সহস্রবাক্যে তত সুন্দর প্রকাশ করিতে পারিতেন না। তারাচরণ যখন এই কুন্দনন্দিনীকে সাজাইয়া আনিয়া দেবেন্দ্রের সঙ্গে আলাপ করিয়া দিলেন ; "কুন্দ তখন দেবেন্দ্রের সঙ্গে কি আলাপ করিলেন ? ক্ষণকাল ঘোমটা দিয়া দাঁড়াইয়া থাকিয়া কাঁদিয়া পলাইয়া গেলেন।" তাঁহার এই ব্যবহার সকলই নীরব, অথচ কত দূর ভাবব্যঞ্জক। প্রথমে তিনি থতমত খাইয়া অপ্রস্তুত হইয়া লজ্জায় ঘোমটা দিলেন। অনন্তর কি করিবেন কিছুই জানেন না বলিয়া ক্ষণিক স্তম্ভিতভাবে দাঁড়াইয়া রহিলেন। দাঁড়াইয়া কি ভাবিলেন। অবশেষে একদা লজ্জায়, অপমানে, আত্মতিরস্কারে হৃদয় উদ্বেলিত হইল ; তখন তিনি কাঁদিয়া পলাইয়া গেলেন। কাহাকেও কিছু বলিলেন না। আর কোন রমণী দেবেন্দ্রের নিকট আনীত হইতে হয়তো সম্মতা হইত না। কিন্তু সরলা কুন্দ কিছুই জানেন না, তিনি জড়ের মতো আনীত হইলেন ; আনীত হইয়া আত্মপরিচয় দিয়া পলাইয়া গেলেন। সরলা, ভাবময়ী কুন্দকে লইয়া কি কোন ক্রীড়া চলে ? তাহার ভাবপূর্ণ জড়প্রায় ব্যবহার ক্রীড়ার অতীত।

ইহার পর হরিদাসী বৈষ্ণবীর অভিনয়। নগেন্দ্রের অন্তঃপুরে হরিদাসী গাইতে আসিলে, শ্রোত্রীগণ নানাবিধ ফরমাসের আরম্ভ করিলেন। বৈষ্ণবী সকলের হুকুম শুনিয়া কুন্দের প্রতি বিদ্যুদ্দামতুল্য এক কটাক্ষ করিয়া কহিল :—

"হাঁ গা তুমি কিছু ফরমাশ করিলে না ?" কুন্দ তখন লজ্জাবনতমুখী হইয়া অল্প একটু হাসিল, কিছু উত্তর করিল না। কিন্তু তখনই একজন বয়স্যার কানে কানে কহিল, কীর্তন গায়িতে বল না ?" এতক্ষণ সবাই নানাবিধ ফরমাস করিয়াছিল, কিন্তু কুন্দ চুপ করিয়াছিল। বিশেষরূপে অনুরুদ্ধ হইলে কুন্দ আনন্দে একটু হাসিল; কিন্তু তা বলিয়া ধৃষ্টতা দেখাইয়া উত্তর করিবার লোক তিনি নহেন। তিনি এখন পূর্ণযৌবনা, বয়স ষোড়শেরও অধিক। যুবতীর কি এই ব্যবহার ? যৌবনের সে চঞ্চলতা ও অধীরতা কোথায় ? কুন্দের ইচ্ছা মনে মনেই বিলীন হইতেছিল। অপরে সে ইচ্ছা জানিতে চাহিলে তিনি সাহসভরে তাহা উচ্চরবে প্রকাশ করিতেও পারেন নাই। একজন বয়স্যার কানে কানে বলিয়া স্থির হইয়া বসিয়া রহিলেন। বঙ্কিমবাবুর এই চিত্রটি কেমন স্বভাবানুরূপ, কেমন সংক্ষেপে সুন্দর ও অর্থপূর্ণ! ইহা কুন্দনন্দিনীর যথাযথই চিত্র বটে। কুন্দনন্দিনীর এই প্রকৃতি বিশেষ সুস্পষ্ট দেখাইবার জন্যই তিনি নানাবিধ রমণীমণ্ডলে তাহাকে আনিলেন, পরে বহুবিধ

রমণীগণের সহিত তাহার প্রভেদ কি, তাহা কবির একটিমাত্র সুন্দর চিত্রলেখায় সমুদায় প্রকাশিত করিয়া দিলেন।

এতক্ষণ আমরা কুন্দনন্দিনীর প্রকৃতিবিশেষেরই পর্যালোচনা করিতেছি। দেখিলাম সরলতা ও বালিকাদুর্লভ অচঞ্চলতা, ভীরুতা ও মৃদুতাহেতু নিশ্চেষ্টতা, বিচিত্রভাবে তাঁহার রমণী-প্রকৃতিতে মিশিয়াছে। মিশিয়া এক অসামান্য বিচিত্র রমণীকে প্রদর্শন করিল। এ প্রকৃতির রমণী কেবল বঙ্গধামেই পাওয়া যায়। বঙ্গরমণীর এই প্রকৃতিবিশেষের ব্যবধানে কিরূপ কোমল হৃদয় লুক্কায়িত থাকে তাহা বঙ্কিমবাবু এখনও প্রকাশিত করেন নাই। তিনি প্রথমে বাহ্যরেখায় এই বিচিত্র রমণীর ছায়াপাত মাত্র করিলেন; এই ছায়াপাতেই চেনা গেল কুন্দনন্দিনী কোন্ প্রকৃতির বঙ্গগৃহবধূ। তৎপরে বঙ্কিমবাবু সহসা অথচ ধীরে ধীরে তাঁহার হৃদয়-আবরণ খুলিতে লাগিলেন। তখন পাঠক কুন্দের হৃদয়লাবণ্য দেখিয়া আরও চমকিত হয়েন। চমকিত হইয়া বলেন, এমন অগৌরবিণী মৃদু-প্রকৃতির ভিতরে যে এমন হৃদয়মাধুরী ও সৌকুমার্য লুক্কায়িত থাকিবে তাহা বিচিত্র নহে। এইরূপ প্রকৃতির এইরূপ হৃদয় হওয়াই উচিত, এবং এইরূপ হৃদয়ের এইরূপ প্রকৃতিই উপযোগিনী হইয়া থাকে। আমরা পরবারে কুন্দনন্দিনীর বাহ্য ব্যবধান বিমুক্ত করিয়া তদীয় হৃদয়সৌন্দর্য দেখিবার জন্য বঙ্কিমবাবুর সহিত তাঁহাকে অনুসরণ করিব।

জ্যৈষ্ঠ ১২৮৫

ভার্গববিজয়

সাধারণতঃ ও প্রধানতঃ, আমাদের 'আদর্শ' বাঙ্গালি সমালোচক বাবু দ্বিবিধ সমালোচনা শিখিয়া রাখিয়াছেন। যে কোন গ্রন্থ হাতে পড়ুক না কেন, এই দুইয়ের অন্যতর অবলম্বিত হইয়া থাকে। এক প্রকার সমালোচনা এইরূপ,—"এই গ্রন্থ ভাল, খুব ভাল, অতি ভাল, এমত গ্রন্থ হয় না, হইবার নয়।" আর এক প্রকারের সমালোচনা—"গ্রন্থ মন্দ, অতি মন্দ, যারপরনাই মন্দ; ইহার ভিতরে কেবল মাথা আর মুণ্ড, ছাই আর ভস্ম।" ফল কথা, ইহা এক প্রকার স্থির যে, যাহাকে ভাল বলিতে হইবে, তাহাকে, আকাশে তুলিতে হইবে,

ভার্গববিজয় কাব্য। শ্রীগোপালচন্দ্র চক্রবর্ত্তী কর্তৃক প্রণীত ও প্রকাশিত। কলিকাতা, মেছুয়াবাজার স্ট্রিট, আলবার্ট প্রেসে মুদ্রিত। মূল্য ১৷৹ মাত্র।

যাহাকে মন্দ বলিতে হইবে, তাহাকে, দুই পায়ে দলিতে হইবে। নিয়ম এই, হয় স্তুতি কর নয় নিন্দা কর—সমালোচনা একেবারেই করিও না।

এ কথার সমর্থনার্থ দৃষ্টান্ত খুঁজিতে অধিক দূর যাইবার প্রয়োজন নাই। এই "ভার্গববিজয়" কাব্যের কতকগুলি সমালোচনা মুদ্রিত হইয়া গ্রন্থের প্রারম্ভে সন্নিবেশিত হইয়াছে; তাহা পাঠ করিয়া আমরা হতবুদ্ধি হইয়াছি। যে প্রশংসা করা হইয়াছে, তাহা 'প্যারাডাইস লস্ট' অথবা "ডিভাইনা কমেডিয়া" সম্বন্ধে করিতে গেলেও একটা কিন্তু রাখিয়া করিতে হয়। একজন লিখিয়াছেন, —"যে পর্যন্ত পাঠ করিয়াছি তাহাতেই বলিতে পারি যে, পুস্তকখানি অতি উৎকৃষ্ট; ইহাতে রস-ভাব-রীতি-গুণ আদি যথাস্থানে যথাসময়ে সন্নিবেশিত হইয়াছে।" যে পর্যন্ত পড়িয়াছেন তাহাতেই এই, শেষ পর্যন্ত পড়িলে না জানি কি বলিতেন। আমরা নির্লজ্জ হইয়া জিজ্ঞাসা করি, রস, ভাব, রীতি, গুণ আবার আদি, যথাস্থানে এবং যথাসময়ে সন্নিবেশিত হইল, তবে আর বাকীই থাকিল কি? বাল্মীকি অথবা ব্যাসে, বর্জিল অথবা মিল্টনে, গোটে অথবা শেক্ষপীয়রে, ইহার অধিক আর কিছু আছে কি?

আবার কতকগুলি সংবাদপত্রে এই পুস্তকের যে সমালোচনা বাহির হইয়াছে তাহা দেখিয়াও আমরা অবাক্ হইয়াছি। সে কেবল খাঁটি নির্জলা নিন্দা। তার সারমর্ম এই যে, গ্রন্থখানি কিছুই নহেরও অধম, এবং গ্রন্থকার বাতুল। লিউইস সাহেব তাঁহার 'দর্শনশাস্ত্রের ইতিহাসের' একস্থলে লিখিয়াছেন যে, কোমতকে নূতন নূতন মত সকল প্রচার করিতে দেখিয়া অনেকে তাঁহাকে বাতুল স্থির করিয়াছিল, কিন্তু 'প্রামাণিক দর্শন' যদি বাতুলতার ফল হয়, তাহা হইলে আমাদের কামনা, বাতুলতার এপিডেমিক হউক। এতটা গৌরবের সঙ্গে না হউক, কিন্তু তবু আমরা বলিতে পারি যে, ভার্গববিজয় যদি বাতুলতার ফল হয়, তাহা হইলে আমরা কায়মনোবাক্যে কামনা করি—বাঙ্গালার কাব্য-লেখকদিগের পালের মধ্যে বাতুলতার এপিডেমিক হউক। অধিকাংশ বাঙ্গালা কাব্য অপেক্ষা ইহা ভাল।

কিন্তু এ কথায় কিছু প্রশংসা হইল না। জলধরের অপেক্ষা সুন্দর বলিলে কিছু সৌন্দর্যের প্রশংসা হয় না। বিদ্যাদিগ্‌গজ অপেক্ষা বুদ্ধিমান্ বলিলে কিছু বুদ্ধিমত্তার প্রশংসা হয় না। অধিকাংশ বাঙ্গালা কাব্যগ্রন্থ এত জঘন্য যে, তাহার অপেক্ষা ভাল বলিলে কোনই প্রশংসা হয় না। সেইজন্য একটু বিস্তৃত সমালোচনার প্রয়োজন।

ভার্গববিজয় গ্রন্থের বিষয় সম্বন্ধে কোন পরিচয় দিবার আবশ্যক রাখে না। কৃত্তিবাস ও কাশীরামের প্রসাদে, কথক ও গায়কের প্রসাদে, যাত্রাওয়ালা ও

নাটকলেখকদিগের দৌরাত্ম্যে, মহাভারত ও রামায়ণের কথা কিছু কিছু না জানে এমন লোক বঙ্গদেশে বিরল। রামচন্দ্র কর্তৃক পরশুরামের অভিভব, এ গ্রন্থের বিষয়। জিনিসটা কি, সকলেই বুঝিয়াছেন।

ইহা সকলেই স্বীকার করিবেন যে বিষয়টা গুরুতর বটে। এ মহদ্ব্যাপারে যাহারা লিপ্ত তাহারা সকলেই মহৎ—আকাশের ন্যায় উচ্চ, সাগরের ন্যায় গভীর, বাসুকীর ন্যায় ধীর, হিমালয়ের ন্যায় স্থির। নায়ক, সাক্ষাৎ পুরুষোত্তম —দেবতার ভয় দূর করিতে, পৃথিবীর ভার লঘু করিতে মনুষ্যদেহ ধারণ করিয়াছেন। নায়িকা, অযোনিসম্ভবা সীতা—যিনি স্ত্রীবিহিত গুণে রমণীকুলের আদর্শস্থলাভিষিক্তা। প্রতিনায়ক, ভার্গব পরশুরাম—যিনি একবিংশতিবার পৃথিবী নিঃক্ষত্রিয় করিয়া ক্ষত্রিয়শোণিতে "সমন্তপঞ্চকে পঞ্চ চকার রৌধিরান্ হ্রদান্।" লোকসমাবেশ অতি উচ্চ অঙ্গের বটে। বিষয় মনোনীত করা নিতান্ত মন্দ হয় নাই।

খুব ভালও হয় নাই। পরশুরাম বীর, রামচন্দ্র বীর, লক্ষ্মণ বীর, দশরথও বীর; বিশ্বামিত্র ঋষি, বশিষ্ঠ ঋষি, পরশুরামও ঋষি;—এইরূপ একপ্রকারের লোক একত্র কার্যক্ষেত্রে আনিয়া তাহাদের ব্যক্তিগত পার্থক্য রক্ষা করা অতি দুরূহ ব্যাপার—সকলে পারে না। আবার ঘটনা এত অল্প, কথা এমন সংক্ষেপ, যে ইহা লইয়া সার্ধ তিনশত পৃষ্ঠারও অধিক একখানি গ্রন্থ লেখা হয় না—অন্ততঃ সকলে পারে না। তবে কি না, কবি আপন কল্পনাসম্ভূত অনেক নূতন চিত্র দিতে পারেন, অনেক নূতন সৃষ্টি সন্নিবেশিত করিতে পারেন —ইহাও সকলে পারে না। ভার্গববিজয়ের শেষে গোপালবাবু পরিচয় দিয়াছেন যে, তিনি অতি অল্পবয়স্ক—অল্প বয়সে, প্রথম উদ্যমে, এই অগাধ, অপার-সাগরে ঝাঁপ দেওয়া ভাল হয় নাই।

এক্ষণে গ্রন্থের পরিচয়। প্রথম সর্গে বড় কিছু নাই—বাজে কথায় পরিপূর্ণ, কাজের কথা দেখিলাম না। তবে শেষকালে কবি বলিয়া দিয়াছেন, কোন্ কোন্ খনি হইতে রত্ন সংগ্রহ করিবেন,—

"হে বাল্মীকে, কালিদাস, কীর্তিবাস, মধো,
তোমাদের কোষ হতে হে রাজেন্দ্রগণ;
লইবে—ইত্যাদি।"

কোষগুলি যে বহুরত্নপূর্ণ তাহাতে সন্দেহ নাই; কিন্তু এই সকল কোষ হইতে রত্ন সংগ্রহ করিয়া অভিনব কাব্যভূষণ নির্মাণ করিলে কতদূর মহামূল্য হয়, তাহাতে বিলক্ষণ সন্দেহ আছে—হয়ত খাটে না—প্রায়ই মিলে না। ভার্গববিজয় হইতেই ইহার প্রমাণ দেওয়া যায়।

দ্বিতীয় সর্গে ভার্গবের আশ্রম বর্ণনা। হিমাচলের এক নির্ঝরিণীতীরে ভার্গবের আশ্রম বিরাজিত। তথায় দেবদারুতরুব্রজ অম্বর স্পর্শ করিয়া দাঁড়াইয়া আছে। ইঙ্গুদী, খদির, তীব্রগন্ধ তেজপত্র, লবঙ্গবল্লরী, এলালতাবীথি, দারুচিনি, চিত্রিত-বিগ্রহ ভূর্জপত্র, শাল, তাল, তমাল, পিয়াল, যাহা হইতে

মঞ্জুল-মঞ্জুরী রজো-রাশি নভোমার্গ
অনিশ আবরি উড়ে চন্দ্রাতপনিভ।

পীযূষ-পূরিত দ্রাক্ষা, কম সোমলতা, অদূরে শ্যামাভ নীবার ধান্যভূমি,—অশোক, কিংশুক, বকুল, কর্ণিকার প্রভৃতি নানা বৃক্ষে, নানা ফলে, নানা লতায় নানা ফুলে এই স্থান পরিশোভিত। মলয়ানিল মৃদুল বহিতেছে, পরাগরাশি উড়াইতেছে, লতাপাদপ আন্দোলিতেছে। তথায় কস্তুরী কুরঙ্গ আশ্রম-পাদপে গাত্রকণ্ডু নাশ করিতেছে—মৃগমদগন্ধে তপোবনস্থলী আমোদিত করিতেছে। মৃগযূথ অভিনবতম শস্প-প্ররোহতল্পে বিশ্রাম করিতেছে; শাবকগণ মেষশিশুর সঙ্গে খেলা করিতেছে। দূরস্থ কন্দর-শায়ী সিংহগর্জন শুনিয়া বৃষভ গবয় প্রভৃতি বসুধাতল ক্ষুরাগ্রে বিদীর্ণ করিয়া সদর্পে নাদিতেছে। অশ্বত্থ প্রভৃতি বৃক্ষচ্ছায়ায় হস্তিযূথ আষাঢ়দিগন্তব্যাপী নবমেঘের ন্যায় দাঁড়াইয়া আছে, এবং

—করেণু নিবহ
কমল-পরাগ গন্ধি সলিল ছড়ায়ে
দিতেছে প্রণয়ে স্বীয় স্বীয় প্রিয়তমে।

মন্দ নহে; কিন্তু এ সুন্দর চিত্রটি কালিদাসের, গোপালবাবুর নহে—কুমারসম্ভব হইতে অনুবাদিত।

এই তপোবনে ভগবান্ ভৃগুকুলপতি তপস্যা করিতেছেন—সারঙ্গকীর্তি-আসনে আসীন, বল্কল-পিহিত, আশীর্ষ উন্নতদেহ, অর্ধনিমীলিত স্থির লোচন-যুগলে অপূর্ব দ্যুতি, করযুগ নাভীর ঊর্ধ্বে বদ্ধ, গলে অক্ষমালা এবং যজ্ঞো-পবীত, ললাটফলকে ঊর্ধ্ব-পৌণ্ড্রকেয় লেখা। শরীর শ্বেতচন্দনচর্চিত, মৌলী উপরে জটাজাল বিনিবদ্ধ, বদনমণ্ডল শ্মশ্রুরাজি-বিশোভিত—

দেবগৃহ-স্তম্ভ গাত্রে ঝুলিযা বিরলে
যেমতি চামর-রাজ বিকাশে শুক্লিমা।

উপমাটি অতি সুন্দর এবং সম্পূর্ণরূপে বিষয়োপযোগী। আমরা পাঠকগণকে এই সর্গ পাঠ করিতে অনুরোধ করি—সময় বৃথা নষ্ট হইল বলিয়া বোধ হইবে না। যদিও ইহা কালিদাসের অনুকরণে রচিত, তবু গ্রন্থকার প্রশংসা পাইতে পারেন এমন অনেক জিনিস ইহাতে আছে।

তৃতীয় সর্গেও প্রসঙ্গাধীন কিছু নাই—আগাগোড়া কেবল প্রাতঃকালের বর্ণনা।

চতুর্থ সর্গে রাজা দশরথের পুত্র-স্বজনাদির সহিত অযোধ্যা-বর্ত্মে সোৎসব গমন। দশরথ মহা সমারোহে চলিয়াছেন, দেবগণ তাহা দেখিতে আসিয়াছেন। ইহার একস্থলে লিখিত হইয়াছে—

—নীরদ নায়ক
সম্বর্ত-আবর্ত-দ্রোণ-পুষ্কর—এ চারি,
দামিনী কামিনী, আর দীপ্ত জলধনুঃ—

বিনা বর্ষণে জলধনুর উদয় সম্ভবে না ;—মেঘ থাকিলেই যে তাহার সঙ্গে জলধনুকে থাকিতে হইবে, এমন কোন কথা নাই।

পঞ্চম সর্গে পরশুরামের আগমন। মহারাজ দশরথ দুর্নিমিত্ত ঘটিতে দেখিয়া বশিষ্ঠকে কারণ জিজ্ঞাসা করিলেন। বশিষ্ঠ বলিলেন, কোন চিন্তা নাই, যদি কোন অশিব ঘটনার সম্ভাবনা থাকে, তাহা আমি স্বস্ত্যয়নে নিবারণ করিব।

হেনকালে রুদ্রমূর্তি পরশুরাম দেখা দিলেন। সকলে স্তম্ভিত হইল। সকলেই বুঝিল যে এ অশিব স্বস্ত্যয়নে সারিবার নহে। ক্ষত্রিয়ললাটে না জানি কি আছে বলিয়া সকলেই প্রমাদ গণিল। ষষ্ঠ সর্গে পরশুরাম গালিগালাজ আরম্ভ করিলেন—রাজা দশরথকে, রামচন্দ্রকে, সৈন্যগণকে, প্রাণ ভরিয়া গালি দিলেন। লক্ষ্মণকে রাম জিজ্ঞাসা করিলেন, ভাই, এ কি? লক্ষ্মণ বলিলেন, সীতার সঙ্গে উহার বিবাহের কথা ছিল, তাহাতে বঞ্চিত হওয়ায় ব্রাহ্মণ চটিয়াছে।

সপ্তম সর্গে আবার পরশুরামের গালিগালাজ এবং আত্মশ্লাঘা। দশরথের স্তুতি, রামচন্দ্রের বিনতি—পরশুরামের কেবল কটূক্তি।

অষ্টম সর্গে লক্ষ্মণের ক্রোধ এবং ভার্গবকে ভৎ´সনা। ভার্গব অপমানিত হইয়া মহাক্রোধে লক্ষ্মণের বক্ষঃস্থল লক্ষ্য করিয়া ধনুতে শর যোজনা করিলেন। এমন সময়ে বিশ্বামিত্র আসিয়া তাঁহাকে অনেক বুঝাইয়া শান্ত করিলেন। তবু সম্পূর্ণ শান্ত হইলেন না। আর সকলকে রেয়াৎ করিলেন, কিন্তু রামের সম্বন্ধে বলিলেন যে আমার এই ধনুঃ ভঙ্গ করুক, নতুবা উহার রক্ষা নাই।

তারপর নবম সর্গে আরও কিছু কটুকাটব্যের পর পরশুরাম স্বহস্তস্থিত দুর্জয় ধনুঃ বীরদর্পে রামের হাতে দিলেন। এদিকে সীতার বড় ভয় উপস্থিত হইল—একবার ভার্গব একখানা ধনু আনিয়া দিয়াছিলেন, তাহা ভাঙ্গিয়া তাঁহার সঙ্গে রামের বিবাহ হইয়াছে ; আবার আজ ভার্গব সেইরূপ শরাসন আনিয়াছেন, বুঝি রামের আবার বিবাহ হয়, অতএব—কতই সপত্নী মম আছে পোড়া ভালে!

সীতার এই আশঙ্কাটুকু মন্দ নহে। সঙ্গত হউক, অসঙ্গত হউক, ইহাতে রস আছে।

দশম সর্গে ভার্গব-রাঘব-দ্বন্দ্ব অবলোকন করিতে ত্রিদিবতলে ত্রিদশসমূহ সভা করিয়া বসিয়াছেন। পার্বতী শঙ্করকে বলিলেন, রাম এবং ভার্গব উভয়েই আমার প্রিয়, অতএব এ দ্বন্দ্ব যাহাতে নিবারিত হয় তাহা কর। মহাদেব ভার্গবের নিকট পদ্মাকে পাঠাইলেন। বলিয়া পাঠাইলেন,

> পরাজয় অঙ্গীকারী দাশরথি কাছে
> সপ্রণয়ে প্রার্থী লহ স্বর্গমার্গরোধ।

ইতিপূর্বেই রামচন্দ্র অবলীলাক্রমে ধনুর্গ্রহণ করিয়াছিলেন। তারপর একটি শর চাহিয়া লইয়া ধনুতে যোজনা করিয়া বলিলেন—এই শরে আপনাকে বধ করিতে পারিতাম, কিন্তু ব্রাহ্মণ অবধ্য; অতএব ইহার লক্ষ্য দেখাইয়া দিন। এদিকে পদ্মা আসিয়া ভার্গবের উপর শিবের হুকুম জারি করিয়া গেল। পরশুরাম রামচন্দ্রকে বলিলেন, আমার স্বর্গমার্গ রোধ কর। তাহাই হইল।

একাদশ সর্গে উভয় রামে প্রীতিসংস্থাপন হইল। তারপর ভার্গব সাধারণ সমক্ষে ক্ষত্রবধবাসনা পরিত্যাগ করিলেন, রাঘবকে আলিঙ্গন করিলেন, ক্ষত্রবংতেজঃ সমর্পণ করিলেন, আশীর্বাদ করিলেন এবং শেষে প্রস্থান করিলেন। দশরথ আনন্দিত হইলেন; সীতা প্রফুল্লিতা হইলেন—সকলেই উল্লাসিত হইল।

দ্বাদশ সর্গে সকলের আনন্দ, বাদ্য, নৃত্য, গীত, বন্দিবৃন্দের বন্দনাসঙ্গীতিকা, দেবগণের স্বস্থানে প্রস্থান, আকাশবাণী, এবং গ্রন্থকারের মামুলি আত্মপরিচয়—কাজের কথা প্রসঙ্গাধীন কথা, নাই বলিলেই হয়।

ত্রয়োদশ সর্গে সকলের অযোধ্যা-প্রবেশ। এই সর্গে পথিপার্শ্বস্থ সৌধরাজিতে পুরন্ধ্রীবর্গের বিবিধ বিভ্রমবিচেষ্টা পাঠ করিয়া সংস্কৃতজ্ঞ পাঠকের কালিদাসকে মনে পড়িবে। বাস্তবিক এই স্থলটি কালিদাসের অনুকরণ; স্থানে স্থানে অবিকল অনুবাদ।

এইখানেই কাব্য শেষ হওয়া উচিত ছিল। ইহার পর তিন সর্গ কেবল প্রকৃতিবর্ণনা এবং অন্যান্য অপ্রাসঙ্গিক কথা। এ তিন সর্গ একেবারে ছাঁটিয়া ফেলিলেও মূল কথার কোনই ক্ষতি হয় না।

আমরা সমালোচ্য গ্রন্থের যতটুকু পরিচয় দিয়াছি তাহাতেই পাঠকবর্গ অবশ্য বুঝিয়াছেন যে গ্রন্থখানি এত বড় হইবার কোনই প্রয়োজন ছিল না। শেষ তিন সর্গ, দ্বাদশ সর্গ, তৃতীয় সর্গ, এবং প্রথম সর্গ একেবারে বাদ দেওয়া যাইতে পারে। অন্যান্য সর্গেরও অনেক অংশ ত্যাগ করা যায়; এবং প্রত্যেক সর্গেরই

শেষ ভাগ—আত্মপরিচয় এবং অনুগ্রহভিক্ষা—পরিবর্জনীয়। যে সকল উপায়ে গ্রন্থকলেবর স্ফীত হইয়াছে, তদবলম্বনের অর্থ আমরা খুঁজিয়া পাই না। নিসর্গ-বর্ণনাতেই গ্রন্থের প্রায় চতুর্থাংশ নিয়োজিত। নিসর্গবর্ণনা মন্দ নহে, কিন্তু কেবল প্রাতঃকাল বর্ণনা করা একটা সম্পূর্ণ সর্গ গ্রন্থকারের কুরুচির পরিচায়ক, পাঠকের পক্ষে বিরক্তিজনক এবং সমালোচকের পক্ষে—মারাত্মক। তবু নিসর্গ-বর্ণনা কাব্যের একটা অঙ্গ বটে, কিন্তু কাব্যসূচনা, বাগেদবতার আরাধনা, ভারতী-প্রার্থনা, কল্পনার উপাসনা, বাল্মীকির কবিজ্যেষ্ঠত্ব, কালিদাসের মহাকবিত্ব, মাইকেলের পরলোক, অকালমৃত্যুজন্য শোক, ভর্তৃহরির স্তব, জয়দেবের মহিমা-কীর্তন, ভবভূতির বন্দনা—এ সকলের দ্বারা কাব্যের যে কি উপাদেয়তা বৃদ্ধি হইতে পারে, আমরা স্বর্গমর্তরসাতল খুঁজিয়া পাই না।

প্রতি সর্গের শেষেই একবার পণ্ডিতমণ্ডলীর কাছে "সগল-বসনে মুদি যোড় কর" করা হইয়াছে। এ সম্বন্ধে আমরা এই বলিতে চাই যে, যিনি এত বড় একখানি কাব্য লিখিতে বসিয়াছেন, যিনি বাগেদবীর কাছে "কবিত্ব বিমল নভে মাধ্যন্দিন ভানুমান্" হইবার প্রার্থনা করিয়াছেন, তাঁহার একটু আত্মাদর, একটু অহঙ্কার থাকা উচিত। নম্রতা, বিনয়, এ সকল মন্দ নহে, কিন্তু কথায় কথায় কাকুতি মিনতি করা ভাল দেখায় না। যার তার হাতে পায়ে ধরিতে গেলে সম্ভ্রম থাকে না।

গ্রন্থকার আপনি স্বীকার করিয়াছেন যে তিনি মাইকেলের চেলা ; কিন্তু বাস্তবিক তাহা নহেন। প্রকৃতপক্ষে তিনি জয়দেবের চেলা ; জয়দেবের সেই ললিতলবঙ্গ-লতা-পরিশীলন-কোমল-মলয়-সমীরের ন্যায় মধুর কোমল কান্ত পদাবলী, আর গোপালবাবুর এই দাঁতভাঙ্গা শব্দবিন্যাস তুলনা করিলে আপাততঃ এ কথায় অনাস্থা হইবার সম্ভাবনা, কিন্তু একটু বুঝিয়া দেখিলেই ইহার সারবত্তা হৃদয়ঙ্গম হইবে। জয়দেবের ন্যায়, গোপালবাবু বিলক্ষণ কল্পনাশালী ব্যক্তি ; এবং জয়দেবের ন্যায় গোপালবাবুর কল্পনা মার্গৈকপ্রোহিত—যত কারিগরি বাহ্যজগৎ লইয়া ; অন্তর্জগতের উপর বড় একটা দৃষ্টি নাই। সূর্যরশ্মির প্রফুল্লতা, বসন্তপবনের মধুরতা, সায়াহ্নগগনের সৌন্দর্য, নবকুসুমিতা লতার সৌকুমার্য, এ সকল চিত্রিত করিতে গোপালবাবু বিলক্ষণ পারগ—জয়দেব অভ্রান্ত। কিন্তু প্রণয়ের উন্মত্ততা, নৈরাশ্যের কাতরতা, শৌর্যের মহত্ত্ব, অনুরাগের চাঞ্চল্য, এ সকল চিত্রিত করিতে গুরুশিষ্য কাহারও তুলি চলে না। জড়জগতের ভীম ভঙ্গী সকল চিত্রিত করিতে জয়দেব চেষ্টা করেন নাই ; গোপালবাবু চেষ্টা করিয়াছেন, কিন্তু কৃতকার্য হয়েন নাই। জয়দেব আত্মশক্তি বুঝিতেন, গোপালবাবু হয় ত বুঝেন না ;—জয়দেব গুরু, গোপালবাবু চেলা। অন্তর্জগতের উপর দৃষ্টি না

থাকিলেও বাহ্যপ্রকৃতির সঙ্গে লেখকের বিলক্ষণ সহানুভূতি আছে এবং নিসর্গ-সৌন্দর্য তিনি প্রেমিকের চক্ষে দেখেন—যে চক্ষে ওয়ার্ডস্‌ওয়ার্থ দেখিতেন সেই চক্ষে গোপালবাবু দেখেন—অনেক ভঙ্গী, যাহা অপ্রেমিকের চক্ষে পড়ে না, গোপালবাবুর চক্ষে পড়ে, এবং তিনি তাহাতে মুগ্ধ হইয়া যায়েন—শতমুখে, সহস্রমুখে তাহা ব্যক্ত করেন। সামান্য কথা লইয়া কেন এত আড়ম্বর, তাহা প্রেমিক যে সে বুঝিবে—সকলে বুঝিবে না।

অন্তর্জগতের উপর দৃষ্টি না থাকিলে যে দোষ ঘটে, তাহা এই গ্রন্থেও ঘটিয়াছে—একটা চরিত্রও উত্তমরূপে সংরক্ষিত হয় নাই। দশরথকে দেখ। যখন ভার্গব সেই দুর্জয় কার্ম্মুক রামচন্দ্রের হস্তে দিলেন, তখন রাজা দশরথ পুত্রবিয়োগাশঙ্কায় অত্যন্ত কাতর হইলেন—অনেক বিলাপ করিলেন—শেষে মূর্চ্ছা গেলেন। রাজা দশরথ স্বয়ং বীরপুরুষ, তাঁহার মূর্চ্ছা যাওয়া ভাল হয় নাই। একটু ভয়, একটু আশঙ্কা, হয় হউক, তাহাতে আমাদের বিশেষ আপত্তি নাই; কিন্তু মূর্চ্ছাটা বড় অসঙ্গত, রামায়ণের দশরথ মূর্চ্ছিত হয়েন নাই।

আবার পরশুরামকে দেখ। ভার্গববিজয়ের পরশুরামকে দেখিয়া আমাদের সেই চিরপরিচিত পরশুরাম বলিয়া চিনিতে পারিলাম না। রামায়ণের পরশুরাম,—মহাবীর, মহাতপস্বী, উন্নতচিত্ত, প্রশস্তহৃদয়। তিনি যখন ক্রোধোদ্দীপ্ত হইয়া সিংহনাদ করেন, তখন সুরাসুর কম্পিত হয়, বায়ু স্তম্ভিত হয়, চন্দ্র সূর্য গ্রহ উপগ্রহ পথহারা হইয়া দাঁড়াইয়া থাকে। আর গোপালবাবুর পরশুরাম—যদি বিশেষণপদ দ্বারা তাঁহার চিত্র আঁকিতে হয়, তবে এইরূপ লিখিতে হয়—কুভাষী, অভদ্র, মুখসর্বস্ব, দাম্ভিক, নির্লজ্জ, অসার, দুর্বিনীত এবং অব্যবস্থিত-চিত্ত। তিনি যখন আত্মবীর্য খ্যাপন করেন, আমাদের হাসি পায়, যখন দুর্বাক্য ব্যবহার করেন, পড়িতে লজ্জা হয়। বীরের মুখে, ঋষির মুখে তেমন কথা আসে না। রামচন্দ্রের প্রতি যে সকল বাক্য প্রয়োগ করিয়াছেন তাহা ভদ্র লোকের অব্যবহার্য।

> কোথা সেই নরাধম, দে শীঘ্র দেখায়ে,—
> ধূর্ত্ত জম্বুক সম ভয়ে দূরে গেল লাঙ্গুল গুটায়ে, পাপ!

রামায়ণের পরশুরামে এরূপ ইতরতা নাই। তিনি রামচন্দ্রের সঙ্গে যেরূপ সম্ভাষণ করিয়াছেন, তাহা বীরের ন্যায়, মহতের ন্যায়, পরশুরামের ন্যায়—দূরশ্রুত জলদনিনাদের ন্যায় ধীর, গম্ভীর এবং ভয়ঙ্কর—

> রাম! দাশরথে! বীর! বীর্য্যং তে শ্রূয়তেঽদ্ভুতং।

* * *

তদিদং ঘোরসঙ্কাশং জামদগ্ন্যং মহদ্ধনুঃ।
পূরয়স্ব শরেণৈব স্ববলং দর্শয়স্ব চ॥
তদহং তে বলং দৃষ্টা ধনুষোঽপ্যস্য পূরণে।
দ্বন্দ্বযুদ্ধং প্রদাস্যামি বীর্যশ্লাঘামহং ভব॥

রসাবতারণায় আমাদের কবি সকল স্থানে কৃতকার্য হইতে পারেন নাই। তাঁহার রসে সজীবতা নাই। পরশুরাম আসিয়া বীররসের কত কথাই বলিলেন, তিন সর্গ ব্যাপিয়া বীরদর্পে বীরবাক্য কতই উচ্চারিত করিলেন, কিন্তু এত বীররসের মধ্যে আমাদের একবিন্দুও শোণিত উষ্ণতর হইল না—পড়িতে পড়িতে একবারও আমাদের রোমাঞ্চ হইল না, একবারও একটু উৎসাহ অনুভব করিলাম না। আবার সীতা যখন পীরিতের ফাঁদ পাতিয়া বলিতে লাগিলেন,

জগতে তোমার সনে মিলে না তুলনা,
তোমার উপমা, দেব, তুমিই ভুবনে।
তোমার বিক্রম সাজে তোমার বিক্রমে ;
তোমার বদন যেন তোমার বদন ;
তোমার নয়ন, নাথ, তোমার নয়ন ;
রামের সুতনু সম রামের সুতনু !

তখন আমরা কোনরূপ কোমলতা অনুভব করিলাম না। কেমন বোধ হইল, যেন একথাগুলি সীতা বাড়ি হইতে কণ্ঠস্থ করিয়া আসিয়াছিলেন, এতক্ষণ সময় প্রাপ্ত হয়েন নাই বলিয়া বলা হয় নাই—বোধ হইল যেন "তোমার তুলনা তুমি প্রাণ এ মহীমণ্ডলে" এই গীতটি সীতা জানিতেন, সময় পাইয়া তাহার দ্বিতীয় সংস্করণ বাহির করিলেন। দ্বিতীয় সংস্করণ, সুতরাং হাল আইনানুসারে পরিশোধিত এবং পরিবর্ধিত।

নিসর্গবর্ণনার অবতারণাতেও স্থানে স্থানে রসভঙ্গ হইয়াছে। কোথায় উপমা-সংযোজনে বিপর্যয় ঘটিয়াছে—তৃতীয় সর্গের প্রথম পাঁচ ছত্র ইহার প্রমাণ। আমাদের কবি একই নিঃশ্বাসে সূর্যদেবকে একবার "প্রাচীদিক্ অধীশ্বরীর সীমন্ত মুকুট হৈম শিখা মণি" বলিয়াছেন, আবার "জগৎলোচন" বলিয়াছেন, পুনরায় আবার তাঁহারই গলে "সমুজ্জ্বলমালা" দোলাইয়াছেন। তবে মালার সম্বন্ধে এই এক কথা আছে যে, উহা জগৎলোচনের গলে, কি দিক্ অধীশ্বরীর গলে, তাহা ঠিক বুঝা যায় না।

কোথাও বা অলঙ্কারদোষ ঘটিয়াছে—

———"বিমণ্ডিত কুসুম স্তবক ভারে"

যাহার দ্বারা বিমণ্ডিত হওয়া যায়, তাহাকে ভার বলা ভাল হয় নাই। এক-আধ স্থলে অশ্লীলতা-দোষও ঘটিয়াছে—দৃষ্টান্ত, ১৫৯—১৭০ ছত্রদ্বয়

এবং ২৩৫—২৩৮ ছত্র চতুষ্টয়, তৃতীয় সর্গ। দ্বিতীয় দৃষ্টান্তে "শাবগণ সনে" থাকায় কিঞ্চিৎ হাস্যজনকও হইয়াছে।

স্থানে স্থানে উপযোগিতা রক্ষিত হয় নাই। তপোবনবর্ণনায় এক স্থলে লিখিত হইয়াছে,

বাজিছে বিবিধ বাদ্য সংগীত সংহতি
মুরজ মন্দিবা বীণা মুরলী রসাল ;

আবার, অন্য স্থলে, তপোবনস্থ লতা পাদপ মৃদু পবনে দুলিতেছে—কেমন ?—লাসিকা ললনা যথা লাস্য লীলা করে।

তপোবনে মুরজ মন্দিরা প্রভৃতির ধ্বনি, তপোবনবর্ণনায় উপরি উদ্ধৃত উপমার সমাবেশ বড় অসঙ্গত হইয়াছে—অশ্বমেধ যজ্ঞে যেন খেমটার নাচ হইয়াছে, দেবর্ষি নারদ যেন চাবির শিকল পরিয়াছেন! আমরা একবার যাত্রা শুনিতে গিয়াছিলাম, নকীব শ্যামাবিষয়ক গান গাইতে গাইতে 'স্বজনি লো' বলিয়া রাগিণী টানিয়াছিল, তাহা আমাদের মনে পড়িল।

গ্রন্থের ভাষার আমরা প্রশংসা করিতে পারিলাম না। যাঁহারা সংস্কৃত জানেন না তাঁহাদের পক্ষে এ গ্রন্থ বুঝা সুকঠিন। যাঁহারা অল্প সংস্কৃত জানেন তাঁহাদিগকেও পাঠকালে বোধ হয় একখানি অভিধান কাছে করিয়া বসিতে হইবে। এরূপ দুরূহ, দুর্বোধ্য ক্লেশোচ্চার্য শব্দ সন্নিবেশ করিলে গ্রন্থের সাধারণ্যে আদর হয় না। তরুণেরা কিছু শব্দাড়ম্বরপ্রিয় হইয়া থাকেন, কিন্তু এ গ্রন্থে বড় বেজায় বাড়াবাড়ি করা হইয়াছে, এবং তন্নিবন্ধন রচনার উপাদেয়তা অনেকটা নষ্ট হইয়াছে—"এনীশাবলেখাহীন হিমধামাননা" না বলিয়া যদি "অকলঙ্ক শশিমুখী" বলিতেন, আমরা পরম আপ্যায়িত হইতাম।

ভাষার এই জটিলতা কিয়ৎপরিমাণে অলঙ্কারপ্রিয়তার ফলও বটে—অনুপ্রাস এবং মালোপমার দায়ে অনেক স্থান দুরধিগম্য হইয়া পড়িয়াছে। স্থানে স্থানে অলঙ্কারাধিক্য নিবন্ধন ভাব স্ফূর্তি প্রাপ্ত হইতে পায় নাই—সোনা-রূপার ভারে সংকুচিত, জড়সড়, কাতর, অর্ধ-লুক্কায়িত, নির্জীবভাবে রহিয়াছে। গ্রন্থকারকে এই বলিতে চাই যে, পায়ের নখ হইতে মাথার চুল পর্যন্ত সোনা রূপায় ঢাকিয়া দেওয়া অপেক্ষা একখানা জড়াও গহনা ভাল—সুন্দর, সুরুচি-পরিচায়ক, মূল্যবান্ এবং সম্ভ্রান্ত। কিন্তু এ বয়সের দোষ বয়সে সারিয়া যাইবার সম্ভব।

গ্রন্থকার কল্পনাশালী ব্যক্তি বটেন। ভার্গববিজয়ের অনেক স্থলে তাহার পরিচয় আছে ; দৃষ্টান্তস্বরূপ আমরা রাঘববৈবাহ লক্ষ্মীর বর্ণনার উল্লেখ করিতে পারি—ইহা নির্দোষ না হইলেও সুন্দর বটে। গ্রন্থকারের কবিত্বও বিলক্ষণ

আছে ; তবে কিনা, যাহা বলিয়াছি তাই—একতরফা ; দৃষ্টি কেবল বাহ্য জগতের উপর, অন্তর্জগতের সঙ্গে ভাল পরিচিত নহেন। যাহাই হউক, গোপাল বাবু জয়দেবের শিষ্য বলিয়া পরিচিত হইবার যোগ্য বটেন, সন্দেহ নাই।

অমিত্রাক্ষর পদ্য রচনায় গোপালবাবুর বিলক্ষণ পারদর্শিতা আছে ; তবে দুই-এক স্থানে যে নিতান্ত গদ্যের ন্যায় হইয়া পড়িয়াছে তাহা মার্জনীয়। গ্রন্থকার যে তরুণবয়স্ক এবং ভার্গববিজয় যে তাঁহার কবিত্বতরুর প্রথম ফল তাহা যে কেহ গ্রন্থখানি পড়িবেন তিনি বুঝিতে পারিবেন। গ্রন্থকারের নবীনত্ব বিবেচনা করিলে আমরা আশাতিরিক্ত ফল পাইয়াছি বলিতে হইবে। তাঁহার রচনার গাম্ভীর্য, স্থৈর্য, এবং অবিচলিত ধীরা গতির আমরা প্রশংসা করি এবং ভরসা করি, গ্রন্থকার অনতিবিলম্বে ইহা অপেক্ষা উৎকৃষ্টতর গ্রন্থ সমালোচনার্থ আমাদের হাতে অর্পণ করিয়া আমাদিগকে সুখী করিবেন।

আশ্বিন ১২৮৫

৭ / ইতিহাস-প্রসঙ্গ

ভারতবর্ষীয় আর্যজাতির আদিম অবস্থা

উপক্রমণিকা। কোষাগার বিষয়

রাজা কাহাকেও রাজকর হইতে মুক্তি দিবেন না, এইটি সামান্য নিয়ম। বিশেষ বিশেষ নিয়ম দ্বারা বিশেষ বিশেষ স্থলে অনেকে সাক্ষাৎ সম্বন্ধে করভার হইতে মুক্ত ছিলেন। কোন কোন স্থলে কোন কোন ব্যক্তি একেবারেই করভার হইতে নির্মুক্ত ছিলেন। কোষাধ্যক্ষ মন্ত্রী-মধ্যে গণ্য।

ব্রাহ্মণগণ তপস্যাদি যে সমস্ত সৎকার্যের অনুষ্ঠান দ্বারা পুণ্য সঞ্চয় করেন রাজা উহার যষ্ঠাংশের ফলভাগী। এই কারণে বেদবিৎ ব্রাহ্মণকে রাজকর দিতে হইত না। বরং রাজা নিজে ক্লেশ পাইতেন তথাপি ব্রাহ্মণের অন্ন-সংস্থানের পক্ষে অযত্নবান্ হইতেন না। অন্ধ, জড়, মূক, কুব্জ, আতুর, সপ্ততিবর্ষীয় মনুষ্য, স্থবির ব্যক্তি, অনাথা স্ত্রী, অপোগণ্ড বালক, ভিক্ষুক ও সংসারাশ্রমত্যাগী প্রভৃতি জনগণ রাজকর হইতে মুক্ত ছিলেন। (১)

বিদ্বান্ ব্রাহ্মণ যদি কোন স্থলে মৃত্তিকাভ্যন্তরে নিহিত নিধির সন্ধান পান, উহা রাজদ্বারে বিজ্ঞাপন করিয়াই আত্মসাৎ করিতে পারেন। বিদ্বান্ ব্রাহ্মণের দৃষ্ট নিহিত নিধির বিষয়ে রাজার কিঞ্চিৎ মাত্র অধিকার দেখা যায় না। রাজা যদি স্বয়ং কোন গুপ্ত নিধির সন্ধান পাইতেন তবে তাহার অর্ধাংশ বিদ্বান্ ভূদেববর্গমধ্যে বিতরণপূর্বক অবশিষ্ট আত্মসাৎ করিতে সক্ষম ছিলেন। অর্ধেক ব্রাহ্মণসাৎ না করিলে পাপের ভাগী হইতেন।

রাজা অথবা অন্য কোন রাজপুরুষ কর্তৃক যদি কোন গুপ্ত নিধির আবিষ্কার হয় এবং পশ্চাৎ যদি কোন ব্যক্তি আসিয়া এই বস্তু আমার বলিয়া সত্যতাপূর্বক

(১) মনু।
ম্রিয়মাণোঽপ্যাদদীত ন রাজা শ্রোত্রিয়াৎ করং।
নচ ক্ষুধাঽস্য সংসীদেচ্ছোত্রিয়ো বিষয়ে বসন্ ॥ ১৩৩—অ ৭
অন্ধোজড়ঃ পীঠসর্পীসপ্তত্যা স্থবিরশ্চ যঃ।
শ্রোত্রিয়েষূপকুর্বংশ্চ ন দাপ্যাঃ কেনচিৎ করং ॥ ৩৯৪—অ ৮

প্রার্থনা করে তবে রাজা ঐ ধনের ষষ্ঠাংশ মাত্র গ্রহণ করিতে যোগ্য, অবশিষ্ট অংশ বাদসমুত্থায়ী ব্যক্তির। কিন্তু পরে যদি জানা যায়, সে ব্যক্তি মিথ্যা করিয়া লইয়াছে, তবে তাহার দণ্ডবিধানপূর্বক সমস্ত ধনই ব্রাহ্মণসাৎ করিতেন; এরূপ স্থলে রাজা ষষ্ঠাংশের অধিক পাইতেন না।

অস্বামিক ধন প্রাপ্ত হইলে ঐ ধনের প্রকৃত উত্তরাধিকারী নির্ধারণনিমিত্ত তিন বর্ষ পর্যন্ত কাল দেওয়া যাইত। ইংরেজী নিয়ম ছয় মাস, কিন্তু প্রাচীন নিয়মটিই উৎকৃষ্ট বলিয়া বোধ হয়। ঐ কালমধ্যে সর্বদা সর্বস্থলে অস্বামিক ধনের উত্তরাধিকারীর অন্বেষণ জন্য ঘোষণা প্রচার করা রীতি ছিল। তিন বর্ষমধ্যে প্রকৃত স্বামী অথবা প্রকৃত উত্তরাধিকারী উপস্থিত না হইলে তখন ঐ ধন রাজকোষপরিভুক্ত হইত। ইতিপূর্বে উহা স্থাপিত ধনের ন্যায় বিবেচ্য থাকিত। তিন বৎসর মধ্যে অস্বামিক ধনের প্রার্থীর স্থিরতা হইলে ঐ অস্বামিক ধনের প্রত্যর্পণকালে তাহার প্রমাণপ্রয়োগগ্রহণাদি দ্বারা তদীয় ধন বলিয়া প্রতীতি হইলে তাহাকে সমর্পিত হইত। প্রণষ্ট ধনের উদ্ধার-কালে প্রণষ্টাধিগত ধনস্বামী রাজাকে স্থল ও বস্তু বিবেচনায় কোথাও বা ষষ্ঠাংশ, কোথাও বা দশমাংশ, কোথাও বা দ্বাদশাংশ ঐ বস্তুর রক্ষণ-প্রত্যর্পণ ও অধিকারী নির্ণয়রূপ রাজধর্মের রাজকরস্বরূপ দিতেন। রাজা কোন সময়েই ষষ্ঠাংশের অধিক লইতেন না। প্রবঞ্চক উক্ত নিধির অষ্টমাংশ তুল্য দণ্ড ভোগ করিত। স্থলবিশেষে দ্রব্য বিবেচনায় দণ্ডের ন্যূনতা ছিল।

যে সকল ব্যক্তির ক্ষেত্রের সঙ্গে সংস্রব ছিল না অথচ অরণ্যের দ্রুম, মৃগয়া-লব্ধ মাংস, বন হইতে আহৃত মধু, গোষ্ঠোৎপন্ন ঘৃত, সর্বপ্রকার গন্ধদ্রব্য, ওষধি বৃক্ষাদির রসপত্র, শাক, মূল, পুষ্প ও তৃণ, বেণুনির্মিত পাত্র, চর্মবিনির্মিত পাত্র, মৃন্ময় পাত্র এবং সর্বপ্রকার পাষাণময় দ্রব্য বিক্রয় দ্বারা জীবিকানির্বাহ করিত তাহারাও রাজাকে কর দিত। ইহাদিগের নিকট হইতে রাজা তত্তৎদ্রব্যোৎপন্ন লাভাংশের ষষ্ঠভাগ গ্রহণ করিতেন। ইহাই প্রাচীন লাইসেন্‌স টেক্স।

যে ব্যক্তি বাণিজ্যকার্যে পটু, সর্বপ্রকার বস্তুর অর্ঘ সংস্থাপনে সমর্থ, শুল্কগ্রহণ-সময়ে অগ্রে তদীয় সহায়তায় পণ্যদ্রব্যের মূল্য নির্ধারিত হইত। সেই দ্রব্য বিক্রয় দ্বারা যে পরিমাণে লাভ-সম্ভাবনা জ্ঞান হইত, তাহারই বিংশতি ভাগের এক ভাগ শুল্কস্বরূপ রাজকর আদায় করা পদ্ধতি ছিল। মহার্ঘ বস্তুতেও কদাচ তদপেক্ষা অধিক গ্রহণ করিতেন না।

যাহারা পশুপাল অথবা মণিমাণিক্যাদি বস্তু বিক্রয় দ্বারা আত্মপরিবারের ভরণপোষণপূর্বক সংসারযাত্রা নির্বাহ করে, সে প্রকার জনগণের সমীপে

তত্তৎদ্রব্যোৎপন্ন লাভাংশের পঞ্চশত ভাগের একভাগ রাজার প্রাপ্য। তাহাই রাজকরস্বরূপ। (২)

ক্ষেত্রবিশেষে ফলবিশেষে কৃষকের পরিশ্রম বিবেচনায় ক্ষেত্রস্বামীর ব্যয় অনুসারে লভ্যের পরিমাণ বিবেচনায়, ধান্যাদি শস্যের প্রতি কোথাও লাভের ষষ্ঠাংশ, কোথায় বা দ্বাদশ ভাগের এক ভাগ রাজাকে রাজস্বস্বরূপ প্রদত্ত হইত। রাজা ষষ্ঠাংশের অধিক গ্রহণ করিতে সক্ষম ছিলেন না।

কোন গ্রামেই সমস্ত ভূমি প্রজা বিলি হইত না। যথায় কিঞ্চিন্মাত্র ভূমিও পতিত থাকিবার সম্ভাবনা থাকিত না, তথায় অগ্রে গোচারণ-নিমিত্ত উর্বর ভূমি বাদ রাখিয়া প্রজা পত্তন হইত। ঐ গোচারণভূমির চতুঃসীমায় যাহাদিগের ক্ষেত্র থাকিত তাহারা স্ব স্ব ক্ষেত্রের পার্শ্বে বৃতিসংস্থাপনপূর্বক ক্ষেত্রকার্য সম্পাদন করিত। গোচারণভূমি চতুঃসীমার প্রত্যেক সীমা শতধনুপরিমিত রাখিবার রীতি। ক্ষুদ্র গ্রাম হইলেও এতদপেক্ষা অল্প রাখিবার প্রথা ছিল না। গণ্ড-গ্রাম বা নগরের পক্ষে তিনগুণ অধিক পরিমিত ভূমিখণ্ড গোচারণ-নিমিত্ত পরিত্যক্ত হইত। চারিহস্তে এক ধনু হয়।

ব্যক্তিবিশেষের প্রতি সামান্য সম্বন্ধে কর গ্রহণ করা রীতি ছিল না বটে, কিন্তু কোন না কোনরূপে সে ব্যক্তি অবশ্য দেয় রাজস্বের নিষ্ক্রয়-স্বরূপ আত্মপরিশ্রম দ্বারা তৎসাধ্য রাজকীয় কার্য সমাধা করিত। তদ্দ্বারা রাজার সাংসারিক কার্যের ব্যয়ের অনেক লাঘব হইয়া আসিত। এ পদ্ধতি

(২) বিদ্বাংস্তু ব্রাহ্মণো দৃষ্ট্বা পূর্বোপনিহিতং নিধিং।
অশেষতোঽপ্যাদদীত সর্বস্যাধিপতির্হিসঃ॥ ৩৭—অ ৮
যন্তুপশ্যেন্নিধিং রাজা পুরাণং নিহিতং ক্ষিতৌ।
তস্মাদ্দ্বিজেভ্যোদত্বার্ধমর্ধং কোষে প্রবেশয়েৎ॥ ৩৮
আদদীতাথ ষড্‌ভাগং প্রনষ্টাধিগতন্নৃপঃ।
দশমং দ্বাদশং বাপি সতাং ধর্মমনুস্মরন্॥ ৩৩—ঐ
মমায়মিতি যোব্রুয়ান্নিধিং সত্যেন মানবঃ।
তস্যাদদীত ষড্‌ভাগং রাজা দ্বাদশমেববা॥ ৩৫—ঐ
প্রনষ্ট স্বামিকং রিক্থং রাজাত্র্যাবদং নিধাপযেৎ।
অর্বাক্‌ত্র্যব্দদ্ধরেৎ স্বামী পরেণ নৃপতির্হরেৎ॥ ৩০
আদদীতাথ ষড্‌ভাগং দ্রুমাংস মধুসর্পিষাং।
গন্ধৌষধিরসানাঞ্চ পুষ্পমূলফলস্যচ॥ ১৩১—৭
পত্রশাক তৃণানাঞ্চ বৈদলস্যচ চর্মণাম্।
মৃন্ময়ানাঞ্চ ভাণ্ডানাং সর্বস্যাশ্ময়স্যচ॥ ১৩২—ঐ
শুল্ক স্থানেষু কুশলাঃ সর্বপণ্য বিচক্ষণাঃ।
কুর্য্যুর্বর্ঘং যথাপণ্যং ততো বিংশং নৃপোহরেৎ॥ ৩৯৮—অ ৮
পঞ্চাশদ্ভাগ আদেয়ো রাজ্ঞা পশু হিবণ্যয়োঃ।
ধান্যানামষ্টমোভাগঃ ষষ্ঠো দ্বাদশ এব বা॥ ১৩০—অ ৭

অদ্যাপি অনেক স্থলে প্রচলিত আছে। সে প্রকার কার্যে কাহারা ব্রতী ছিল তাহা দেখিতে গেলে ইহাই জানা যায় যে সূপকার, কাংশ্যকার, শঙ্খকার, মালাকার, কুম্ভকার, কর্ম্মকার, সূত্রধর, চিত্রকর, স্বর্ণকার, লেখক, কারুক, তৈলিক, মোদক, নাপিত, তন্তুবায় প্রভৃতি ব্যক্তিবর্গ যাহারা শারীরিক পরিশ্রম দ্বারা অর্জন করে তাহাদিগকে রাজা প্রতিমাসে এক-এক দিন বিনাবেতনে আপন কার্যে নিযুক্ত করিবেন। উহাদিগের পরিশ্রমের মূল্যকেই রাজস্বস্বরূপ জ্ঞান করিতে হইবে।

বাস্তুবাটীর উপর বার্ষিক কর গ্রহণ করিতেন। ইঁহারা স্থলবিশেষে ব্যক্তি-বিশেষকে করভার হইতে নিষ্কৃতি দিয়াছেন বটে, কিন্তু বিবেচনা করিয়া দেখিলে পরম্পরা সম্বন্ধে কেহই করভার হইতে মুক্ত নন। ব্রাহ্মণগণ সাক্ষাৎ সম্বন্ধে রাজস্ব দিতেন না বটে কিন্তু ইঁহারা সকল কার্যের অগ্রে রাজপূজা করিতেন। ঐ রাজ-পূজাই করস্বরূপ। আরও দেখা যায়, ইঁহারা পিতৃযজ্ঞের অনুষ্ঠানকালে অগ্রে ভূস্বামীর পূজা করিয়া থাকেন। তৎপরে স্বীয় অভীষ্ট পিতৃদেবের অর্চনা করেন। (৩)

যদি কেহ বলেন, ভূস্বামীর উদ্দেশে ব্রাহ্মণগণ যে দান করেন তাহা ভূপতিকে দেওয়া হয় না। তাহার মীমাংসাস্থলে শাস্ত্রকারেরা কহিয়াছেন, বেদজ্ঞ ব্রাহ্মণে যাহা দান করা হয়, তাহাতেই রাজা পরিতুষ্ট হন। বিশেষতঃ ইহা এক প্রকার স্থির সিদ্ধান্ত যে সমুদ্রে পাদ্য অর্ঘ দেওয়া অপেক্ষা, যথায় দিলে উপকার হয় তথায় দেওয়া উচিত। সুতরাং শ্রাদ্ধের অল্পপরিমিত বস্তু রাজ-সমীপে বস্তুমধ্যে গণ্য হইতে পারে না কিন্তু নিরন্ন ব্রাহ্মণের নিকট উহা উপাদেয় বস্তুমধ্যে পরিগণিত হইতে পারে, তদ্দ্বারা তাঁহার তৃপ্তিসম্পাদন হয়। ভূপতি কেবল এই দেখিবেন প্রজাগণ তাঁহার প্রতি অনুরক্ত কি বিরক্ত। যখন পিতৃ-যজ্ঞকালেও ভূস্বামীকে স্মরণ করা রীতি, তখন অবশ্য বলিতে হইবে ইঁহারা পরম্পরা সম্বন্ধে রাজকর দিয়া আত্মনিষ্কৃতি সম্পাদন করেন।

(৩) মনু।
ধনুঃশতং পরিহারো গ্রামস্যস্যাৎ সমন্ততঃ।
শমাপাতাস্ত্রয়োবাপি ত্রিগুণো নগরস্যতু ॥ ২৩৭—অ ৮
সাংবৎসরিকমাপ্তৈশ্চ রাষ্ট্রাদাহারয়েদ্বলিং।
স্যাচ্চাম্নায় পরোলোকে বর্ত্তেত পিতৃবন্নৃষু ॥ ৮০—অ ৭
যৎকিঞ্চিদপি বর্ষস্য দাপয়েৎ করসঞ্জ্ঞিতং।
ব্যবহারেণ জীবন্তং রাজা রাষ্ট্রে পৃথক্‌জনং ॥ ১৩৭—ঐ
কারুকান্ শিল্পিনশ্চৈব শূদ্রাংশ্চাত্মোপজীবিনঃ।
একৈককং কারয়েৎকর্ম্ম মাসি মাসি মহীপতিঃ ॥ ৩৮—ঐ

রাজা জলৌকাসদৃশ ব্যবহার অবলম্বন করিয়া অল্প অল্প কর গ্রহণ করেন, কেহই অধিক করভারাক্রান্ত হইলাম মনে করেন না। রাজা যে কেবল কর-গ্রহণের অধিকারী ছিলেন, এমন নহে। তিনি প্রজার ধন, মান, প্রাণ ইত্যাদি সমুদায় বিষয় আত্মনির্ধিনির্বিশেষে রক্ষা করিয়া প্রজাবর্গের নিকট পিতার তুল্য মান্য হইতেন। আচারব্যবহারবিষয়েও তাঁহার পরামর্শ জিজ্ঞাসা করা রীতি ছিল। রাজা প্রজাকে আত্মপুত্রসদৃশ জ্ঞান করিতেন।

আপ্রাপ্তব্যবহারাশ্রম

রাজা কেবল আত্মরক্ষা করিয়াই নিষ্কৃতি পাইতেন না। তাঁহাকে মৃতপিতৃক শিশুজনের যাবদীয় বিষয়, ধন, মান, জাতি, সম্ভ্রম, আচার ব্যবহার, বিদ্যাশিক্ষা প্রভৃতি তাবদ্বিষয়ের ভারগ্রহণপূর্বক তদীয় আশৈশবকাল পর্যন্ত সমুদায় স্বচক্ষে প্রত্যক্ষ করিয়া আত্মধননির্বিশেষে রক্ষণাবেক্ষণ করিতে হইত। মৃতপিতৃক শিশু যাবৎ বয়ঃপ্রাপ্ত ও জ্ঞানবান্ না হয়, তাবৎকাল নৃপতি উক্ত শিশুকে পুত্রনির্বিশেষে বিদ্যাভ্যাস করাইবেন। মৃতপিতৃক তরুণ ব্যক্তি যে সময়ে আপন বিষয় বুঝিয়া লইতে সক্ষম হয় তখন রাজা সর্বসমক্ষে তদীয় হস্তে যাবদীয় গচ্ছিত ধন বৃদ্ধিসমেত প্রত্যর্পণ করিতেন। অতএব আধুনিক "Court of Ward" ইংরেজদিগের সৃষ্টি নহে। তবে ইংরেজেরা স্বার্থপর হইয়াই অপ্রাপ্তব্যবহার ভূস্বামীর তত্ত্বাবধারণ করেন, তাঁহাদিগের রাজস্বের ক্ষতি না হয়। ভারতবর্ষীয় রাজগণের সে উদ্দেশ্য নহে।

দ্বিজাতি সন্তানস্থলে সমাবর্তনবিধি পর্যন্ত রাজার অধীনে থাকিত। অন্য জাতির পক্ষে প্রাপ্তবয়স পর্যন্ত সীমা। বেদ-বেদাঙ্গের অভ্যাসে ফল জন্মিলে বিবাহের পূর্বে গুরুর নিকট পাঠসমাপ্তির বিদায়গ্রহণস্বরূপ যজ্ঞাঙ্গ স্নানবিধিকে সমাবর্তন কহা যায়। (৪)

অনাথ-শবণ

অনাথা স্ত্রীজনের প্রতিও রাজার দৃষ্টি ছিল। আর্য ভূপতিগণ যৎকালে ইন্দ্রিয়সুখকে তুচ্ছ জ্ঞান করিতেন, যখন প্রজারঞ্জনকে পরম পুরুষার্থ জ্ঞান করিতেন, তখন ইঁহারা আত্ম-অর্ধাঙ্গস্বরূপ সহধর্মিণীকে তুচ্ছ জ্ঞান করিয়া প্রজার সুখবৃদ্ধি এবং আপনার কুলমর্যাদা রক্ষা ও নিজের সুযশের দিকে ধাবিত ছিলেন। অনাথা স্ত্রীজাতিরাও রাজার শাসনহেতু দুশ্চরিত্র হইতে পারিত না।

(৪) মনু।
বালদায়াদিকং রিক্থং তাবদ্রাজানুপালয়েৎ
যাবৎ স স্যাৎ সমাবৃত্তো যাবচ্চাতীত শৈশবঃ॥ ২৭—অ ৮

উদ্ধত যুবা পুরুষও অনায়াসে আত্মস্ত্রী বিসর্জন দিতে সক্ষম হইত না। ইহার বিস্তার পরে প্রদর্শিত হইবে, এক্ষণে প্রক্রান্ত বিষয় আরম্ভ করা গেল।

বন্ধ্যাত্বনিবন্ধন বিরাগহেতু যে স্ত্রীর স্বামী দারান্তর পরিগ্রহ করিয়া তদীয় গ্রাসাচ্ছাদননির্বাহযোগ্য ধন দানানন্তর বন্ধ্যা বনিতাকে পৃথক করিয়া দিয়াছে সে স্ত্রী অনাথ-শরণের অধিকারভুক্ত। যে স্ত্রীলোক অনুদ্দিষ্টপতিক ও পুত্রাদি-রহিত, যে স্ত্রীজন প্রোষিতভর্তৃক, যে বিধবার পিতৃকুল, মাতৃকুল, শ্বশুরকুলে অভিভাবক নাই, অথবা যে স্ত্রী রোষাদিহেতুবশতঃ কাতরা, কিংবা সামর্থ্যবিহীনা, কিন্তু ইহার সকলেই সাধ্বী, তাহাদিগের ধন, মান, আচার-ব্যবহার ইত্যাদি যাবদীয় বিষয় ভূপতি মৃতপিতৃক বালকধনের ন্যায় রক্ষা করিবেন। ধর্মশাস্ত্রের ইহাই নির্দেশ, ইহার অন্য আচরণ করিলে রাজা মহাপাতকীর মধ্যে গণ্য।

উন্মত্ত, জড়, মূক, অন্ধ, আতুরাদি ব্যক্তিবর্গ রাজার অবশ্য পোষ্যবর্গমধ্যে পরিগণিত ছিল। সুতরাং তাহাদিগের বিষয়ে আর বিশেষ নিয়ম করিতে হয় নাই। তাহাদিগের মধ্যে যদি কাহারও ধন থাকিত, উহা মৃতপিতৃক শিশু-ধনের সদৃশ-জ্ঞানে তৎপুত্রাদি উত্তরাধিকারীর বয়ঃপ্রাপ্তিকাল পর্যন্ত রাজার অধীনে থাকিত। ইংরেজদিগের রাজত্বে এ সকল নাই। কেবল যে তাঁহাদিগের রাজস্বের দায়ী, তাহারই বিষয়ের রক্ষণাবেক্ষণ কোর্ট অব ওয়ার্ডস্ হইতে হয়। যে রাজস্বের দায়ী নহে—সে মরুক বাঁচুক, সেজন্য সরকারের কিছু আসিয়া যায় না। আর্যগণ সেরূপ ভাবিতেন না। তাঁহারা প্রজার মঙ্গলকামনায় নানাবিধ সুনিয়ম সংস্থাপন করায় রাজা শব্দটি আর্যগণের কর্ণে অতি সুমধুর হইয়া আছে। আর্যগণ উপরিকথিত নিয়মক্রমেই রাজার প্রতি ভক্তিমন্ত আছেন। ইঁহারা কদাচ কোনকালে রাজভক্তি বিস্মৃত হন নাই। অদ্যাপি ইঁহাদিগের এরূপ সংস্কার যে রাজদর্শনে পুণ্যসঞ্চয় হয়।

সত্য, ত্রেতা, দ্বাপরাদি যুগকে কালবিশেষ জ্ঞান করেন না। আর্যগণ রাজাকেই কখন সত্য যুগ, কখন ত্রেতা, কখন দ্বাপর, কখন কলিযুগ বলিয়া নির্দেশ করিয়াছেন। (৫)

রাজা যখন অলসভাবে কায়িক, বাচিক ও মানসিক বৃত্তি পরিচালনপূর্বক স্বয়ং সমস্ত বিষয় মীমাংসাপূর্বক ধর্মানুসারে স্বহস্তে রাজকার্য নির্বাহ করিতে থাকেন, তখন তাঁহাকে সাক্ষাৎ সত্যযুগ কহা যায়। সত্য, ত্রেতা, দ্বাপরাদি

(৫) মনু।
বন্ধ্যাঽপুত্রাসূচৈবংস্যাৎরক্ষণং নিষ্কুলাসুচ।
পতিব্রতাসুচ স্ত্রীষু বিধবাস্বাতুরাসুচ॥ ২৮—অ ৮
কৃতং ত্রেত যুগঞ্চৈব দ্বাপবং কলিবেব চ।
রাজ্ঞোবৃত্তানি সর্বানি রাজাহি যুগমুচ্যতে॥ ৩০১—অ ৯

যুগ আর কিছুই নহে। রাজার অবস্থা ও কার্য দ্বারা তাঁহাকে মূর্তিমান যুগ-স্বরূপ জ্ঞান করা গিয়া থাকে।

নৃপতি যখন আত্মকর্তব্যবিষয়ের পরিসমাপ্তিবিধানে অভ্যুদ্যত কিন্তু শারীরিক ব্যাপার বিরহিত, তখন তাঁহাকে ত্রেতাযুগ শব্দে অভিহিত করা যায়।

যখন কর্তব্যকর্মে ভূপতির মনোযোগ ও প্রক্রান্ত বিষয়টিও অন্তঃকরণে জাগরূক আছে সত্য, পরন্তু কায়িক ও বাচিক ব্যাপার বিষয়ে তদীয় উৎসাহের অভাব দেখা যায়, তখন ঐ অবস্থায় ভূপতিকে দ্বাপর যুগের স্বরূপ জ্ঞান করা যায়।

রাজা যখন কোন কার্য দেখেন না, নিদ্রাদি আলস্যে কালহরণ করেন, তদীয় রাজকার্য অন্যদীয় সাহায্য ব্যতীত সম্পন্ন হয় না, তখন তাঁহাকে তদবস্থায় সাক্ষাৎ কলিযুগ কহা যায়। (৬)

এই প্রথা অনুসারেই আর্যগণের মধ্যে যাঁহারা আলস্যাদিপরতন্ত্র হইতেন তাঁহাদিগকে আর্যেরা পাপাত্মা অথবা সাক্ষাৎ কলি বলিয়া নিন্দা করিয়াছেন।

সত্য, ত্রেতা, দ্বাপর ও কলিযুগ শব্দের তাৎপর্য কি? সত্যযুগে লোকসকল সত্ত্বগুণের কার্যে আসক্ত থাকিত। ধর্মকর্মের অনুষ্ঠান দ্বারা সত্ত্বগুণের লক্ষণ অনুমান করা যায়। ত্রেতাযুগে রজোগুণ প্রবেশ করিল। তখন অর্থচিন্তাজন্য ধর্ম একপাদ অন্তরে গেলেন। রজোগুণের সহায়তায় ত্রেতাযুগে লোকের অন্তঃকরণে একপাদ অধর্ম স্থান প্রাপ্ত হইলেন। দ্বাপরে তমোগুণ আসিলেন, তৎসাহায্যে লোকের মনে কামপ্রবৃত্তি জন্মিল, তখন ধর্ম দ্বিপাদ অন্তরে থাকিলেন। কলিযুগে তমোগুণের প্রাধান্যহেতু ধর্মকে ত্রিপাদ অন্তরে অপসৃত হইতে হইল। এ কারণেই রাজাকে যুগচতুষ্টয়স্বরূপ কহিয়াছেন।

আর্যগণ কোন্ জাতির পক্ষে কিরূপ কার্যকে পরম ধর্ম করিয়াছেন তাহার নির্ধারণে এই দেখা যায় যে ব্রাহ্মণের পক্ষে একমাত্র তপস্যাই শ্রেষ্ঠ ধর্ম বলিয়া নির্দেশ করিয়াছেন। রাজ্যরক্ষাই ক্ষত্রিয়ের পক্ষে পরমধর্ম। বার্তাগ্রহণই বৈশ্যের প্রধান ধর্ম। শূদ্রজাতি একমাত্র সেবা দ্বারা পরমার্থপদ প্রাপ্ত হইতে পারে। জাতিধর্ম ক্রমশঃ দেখান যাইবে। (৭)

বৈশাখ ১২৮১

(৬) মনু।

কলি প্রসুপ্তো ভবতি সজাগ্রদ্দ্বাপরং যুগং।
কর্ম্মস্বভ্যুদ্যতস্ত্রেতা বিচরংস্তুকৃতং যুগং॥ ৩০২—অ ৯
চতুষ্পাৎ সকলোধর্মঃ সত্যঞ্চৈব কৃতে যুগে।
নাধর্ম্মে নাগমঃ কশ্চিন্মনুষ্যান্ প্রতিবর্ততে॥ ৮১—অ ১
ইতরেষ্বাগমাগমাদ্ধর্মঃ পাদশস্ত্ববরোপিতঃ।

হিন্দুদিগের আগ্নেয়াস্ত্র

বৈদিক কাল হইতেই আর্যেরা পাশ, বজ্র, শিলা, চক্র, ধনু প্রভৃতি যুদ্ধাস্ত্র ব্যবহার করিতেন, তৎপরে রামায়ণ ও মহাভারতের যুদ্ধের সময় অন্যান্য নানাবিধ লৌহনির্মিত অস্ত্র ব্যবহৃত হইয়াছিল। অগ্নিপুরাণের মতে এই সকল অস্ত্র চারি শ্রেণীতে বিভক্ত। যথা—যন্ত্রমুক্ত, পাণিমুক্ত, মুক্তামুক্ত ও অমুক্ত। এ সকল অস্ত্র ভিন্ন আগ্নেয় অস্ত্রেরও উল্লেখ আছে, কিন্তু তাহা কি প্রকার অস্ত্র বা যন্ত্র, ইহার বিশেষ বিবরণ সংস্কৃত গ্রন্থে দেখিতে পাওয়া যায় না। উইলসন্ সাহেব শতঘ্নী নামক যন্ত্র আগ্নেয় যন্ত্র অনুমান করিয়াছেন। কিন্তু তাহা কি প্রকার ছিল, তাহার বিশেষ বিবরণ কিছুই লিপিবদ্ধ করেন নাই। ইহা ভিন্ন হিন্দুগণ মহাযন্ত্র নামক একপ্রকার আগ্নেয় যন্ত্র যুদ্ধকালে ব্যবহার করিতেন।

অদ্য আমরা সেই পূর্বকালের আগ্নেয় যন্ত্রের বিবরণ শুক্রনীতি নামক সংস্কৃত নীতিশাস্ত্র হইতে নিম্নে লিখিলাম। এই গ্রন্থ শুক্রাচার্য প্রণীত। ইহার উল্লেখ অগ্নিপুরাণ ও মুদ্রারাক্ষস নাটকে আছে। ইহাতে নালিক যন্ত্র ও অগ্নিচূর্ণ বিষয় যে প্রকার লিখিত আছে, তাহাতে স্পষ্ট জানা যাইতেছে যে, আমরা প্রাচীনকালে বন্দুক ও বারুদ-গোলা ব্যবহার করিতাম।

(নালিক যন্ত্র)

নালিকং দ্বিবিধং জ্ঞেয়ং বৃহৎ ক্ষুদ্র বিভেদতঃ।
তির্য্যগূর্ধ্বং ছিদ্রমূলং নালং পঞ্চ বিতস্তিকং॥

নালিক দুই প্রকার। বৃহৎ ও ক্ষুদ্র। কিঞ্চিৎ বক্র এবং ঊর্ধ্ব অর্থাৎ লম্বা ও পঞ্চ বিতস্তি পরিমাণ ও মূলস্থানে ছিদ্রযুক্ত।

মূলাগ্রয়োর্লক্ষ্যভেদি তিলবিন্দুযুতং সদা।
যন্ত্রাঘাতাগ্নিকৃৎ গ্রাবচূর্ণধৃক্ মূলকর্ণকম্॥

তাহার মূলে এবং অগ্রে লক্ষ্যভেদসূচক দুইটি তিলবিন্দু থাকিবে এবং মূলে ছিদ্রস্থানে কর্ণ অর্থাৎ কান থাকিবে; অগ্নিজনক প্রস্তর সেইস্থানে যন্ত্রাবদ্ধ থাকিবে।

চৌরিকানৃতমায়াভিধর্ম্মশ্চাপোতপাদশঃ॥ ৮২—অ ১
তমসো লক্ষণং কামো রজসস্ত্বর্থ উচ্যতে।
সত্ত্বস্য লক্ষণং ধর্ম্মঃ শ্রেষ্ঠ মেষাং যথোত্তরং॥ ১০০—অ ১২
(৭) ব্রাহ্মণস্য তপোজ্ঞানং তপঃ ক্ষত্রস্য রক্ষণং।
বৈশ্যস্যতু তপোবার্তা তপঃ শূদ্রস্য সেবনং॥ ২২৬—অ ১১

সুকাষ্ঠোপাঙ্গ বুধ্নঞ্চ মধ্যাঙ্গুলি বিলান্তরম্ ।
স্বান্তেঽগ্নিচূর্ণ সন্ধ্যাত্রী শলাকাসংযুতং দৃঢ়ম্ ॥

এই নালিকাস্ত্রটি উত্তম কাষ্ঠের উপাঙ্গে গ্রথিত এবং তাহার মূল অর্থাৎ মুষ্টি বা ধারণ করিবার স্থানও কাষ্ঠনির্মিত। মধ্যম অঙ্গুলি প্রবিষ্ট হয় এরূপ বিল অর্থাৎ মধ্যে ছিদ্র থাকিবে। তাহার গাত্রে অগ্নিচূর্ণের সংঘাতকারী শলাকা আবদ্ধ থাকিবে।

লঘু নালিকমপ্যেতৎ প্রধার্যং পত্তিসাদিভিঃ ।
যথা যথাতু ত্বক্ সারং যথাস্থূল বিলান্তরম্ ।
যথা দীর্ঘং বৃহৎ গোলং দূরভেদী তথা তথা ।

ইহার নাম লঘুনালিক। ইহা পদাতিক সৈন্য এবং অশ্বারোহী সৈন্যেরা ধারণ করিবে। এই লঘুনালিকের ত্বক্ অর্থাৎ বেধ যেমন পুরু হইয়া থাকে, ছিদ্রও তদ্রূপ লম্বা ও দূরভেদী হইয়া থাকে।

মূলকীলদ্রমাল্লক্ষ্য সম সন্ধানভাজিয়ৎ ।
বৃহন্নালিক সংজ্ঞন্তৎ কাষ্ঠবুধ্ন বিবর্জিতম্ ॥

এইরূপ নালিকাস্ত্র যদি স্থূল হয় এবং কাষ্ঠনির্মিত বুধ্ন অর্থাৎ মূল বা ধরিবার স্থান না থাকে, তাহা হইলে তাহার নাম বৃহন্নালিক।

প্রবাহ্যং শকটাদ্যৈস্তু সুযুতং বিজয়প্রদম্ ।

ইহা এত বৃহৎ হইতে পারে যে, তাহা শকটাদি দ্বারা বহন করিতে হয় এবং ইহা বিজয়প্রদ শোভন-অস্ত্র।

(অগ্নিচূর্ণ)

সুবর্চিলবণাৎ পঞ্চ পলানি গন্ধকাৎ পলম্ ।
অন্তর্ধূম বিপক্কার্কস্মুহ্যাদ্যঙ্গারতঃ পলম্ ।
শুদ্ধা সংগ্রাহ্য সঞ্চূর্ণ্য সম্মীল্য প্রপুটেদ্রসৈঃ ।
স্নহ্যর্কাণাং রসেনাস্য শোধয়ে দাতপেন চ ।
পিষ্ট্বা শর্কর বচ্চৈতদগ্নিচূর্ণং ভবেৎ খলু ॥

সুবর্চি লবণ অর্থাৎ যবক্ষার বা সোরা ৫ পল, গন্ধক ৫ পল, ধূম বদ্ধ করিয়া দগ্ধ করা অর্ক অর্থাৎ আকন্দস্নুহী অর্থাৎ সীজ প্রভৃতি কাষ্ঠের অঙ্গার ১ পল, সংশোধিত ও চূর্ণ করিয়া তাহা সীজ কি অর্করসে মর্দন করিয়া রৌদ্র শুষ্ক করিবে। পরে তাহা শর্করার ন্যায় চূর্ণ করিলে সেই চূর্ণের নাম অগ্নিচূর্ণ। ইহা নালাস্ত্রে ব্যবহার করিবে।

গোলো লৌহময়ো গর্ভ গুটিকঃ কেবলোঽপিবা ।
সীসস্য লঘুনালার্থেহ্যন্য ধাতুময়োঽপিবা ।
লৌহসারময়ং চাপি নালাস্ত্রত্বন্যধাতুজম্ ।
নিত্য সম্মার্জনস্বচ্ছ মন্ত্রং পত্তিভিরাবৃতম্ ।

লৌহময় গোল, তাহার গর্ভে অন্য ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র গুটিকা কি কেবল অর্থাৎ নিরেট ইহা বৃহন্নালাস্ত্রের ব্যবহার্য। লঘুনালের জন্য সীসনির্মিত গুটিকা কি অন্য ধাতুনির্মিত ক্ষুদ্র গুটিকা নির্মাণ করিবে। লৌহের সার অর্থাৎ খাঁটি লৌহ কি তদ্বিধ অন্য ধাতুদ্বারা নির্মিত নালাস্ত্র নিত্য মার্জন দ্বারা স্বচ্ছ রাখিবে। পদাতি ও অশ্বারোহিগণ তাহা ব্যবহার করিবে।

ক্ষিপন্তি চাগ্নি যোগাচ্চ গোলং লক্ষ্যেষু নালগম্ ।
নালাস্ত্রং শোধয়েদাদৌ দদ্যাত্তত্রাগ্নিচূর্ণকম্ ।
নিবেশয়েত দণ্ডেন নালমূলে তথা দৃঢ়ম্ ।
ততস্তু গোলকং দদ্যাৎ ততঃ কর্ণেঽগ্নিচূর্ণকম্ ।
কর্ণ চূর্ণাগ্নিদানেন গোলং লক্ষ্যে নিপাতয়েৎ ।

নালাস্ত্রগত গুলিকা অগ্নিসংযোগ দ্বারা লক্ষ্যে নিক্ষেপ করিবে। তাহার বিধান এইরূপ—প্রথমতঃ নালাস্ত্রটি শোধন করিবে, অর্থাৎ মলিনতা রহিত করিবে, পরে তন্মধ্যে অগ্নিচূর্ণ প্রদান করিবে, তাহা দণ্ডদ্বারা নালমূলে দৃঢ় প্রোথিত করিবে। তৎপরে তাহার মধ্যে গুলিকা নিক্ষেপ করিবে। কর্ণস্থানে অগ্নিচূর্ণ দিবে, সেই অগ্নিচূর্ণে অগ্নি প্রদান করিবে। এইরূপ করিয়া সেই গুলিকা লক্ষ্যে নিপাতন করিবে।

লক্ষ্যভেদী যথা বাণো ধনুর্জ্যা বিনিযোজিতঃ ।
ভবেত্তথা তু সন্ধ্যায়—

ধনুকের জ্যা দ্বারা বাণ যেমন বেগে যাইয়া লক্ষ্য ভেদ করে, ইহাও সেইমত বেগে যাইয়া লক্ষ্য ভেদ করিবে।

সমংন্যূনাধিকৈরংশৈরগ্নিচূর্ণান্য নেবাশঃ ।
কল্পয়ন্তি চ তদ্বিদ্যাশ্চন্দ্রিকাভাদিমন্তিচ ।

অগ্নিচূর্ণ প্রস্তুত করিবার পূর্বকথিত দ্রব্য এবং তদ্ভিন্ন অন্যান্য দ্রব্যের ভাগের ন্যূনাধিকবশতঃ অনেক প্রকার অগ্নিচূর্ণ হইয়া থাকে। তাহা তদ্বিদ্যাবিশারদেরা কল্পনা করিয়াছেন—তাহা চন্দ্রিকাতুল্য দীপ্তিযুক্ত।

(শুক্রনীতি ৪র্থ প্রকরণ)

এই বিবরণ পাঠ করিয়া বোধহয় ইউরোপীয়গণ বিশেষ আশ্চর্য হইবেন। কামান বন্দুক বারুদ গোলাগুলি প্রথমে ইউরোপে আবিষ্কৃত হইয়াছে বলিয়া

তথাকার অধিবাসীরা কতই আত্মগৌরব বর্ধন করেন। কিন্তু এক্ষণে তাঁহারা দেখুন, এ সকলই আমাদের ছিল। তাঁহাদের বহুকাল পূর্বে এ সকলই আমরা ব্যবহার করিয়াছি।

শুক্রনীতির এই শ্লোকগুলি সহসা আধুনিক বলিতে কেহ বোধ হয় প্রস্তুত নহেন, তবে ইহার আনুষঙ্গিক বলবৎ প্রমাণাভাবে আপাততঃ এ বিষয়ের যথাবিহিত বিচার করিতে পারিলাম না।

জ্যৈষ্ঠ ১২৮৪

ঐতিহাসিক ভ্রম

অনেকের মনে তিনটি সিদ্ধান্ত বদ্ধমূল আছে। প্রথমটি এই যে, বাঙালীরা কখনও বিদেশবিজয় করে নাই; দ্বিতীয়টি এই যে, যেদিন বখ্‌তিয়ার খিলিজি সপ্তদশ জন অশ্বারোহী সমভিব্যাহারে নবদ্বীপে প্রবেশ করিলেন, সেই দিনেই সেনবংশের রাজত্ব বিলুপ্ত, এবং সমুদায় বাঙলাদেশ মুসলমানদিগের পদানত হইল; তৃতীয়টি এই যে, মুসলমান ভূপালদিগের সময়ে ক্ষমতাসম্পন্ন জমিদারদিগের উল্লেখ দৃষ্ট হয়, তাহারা করসংগ্রাহক রাজকর্মচারী ছিল মাত্র। আমরা প্রমাণ করিব যে, এ তিনটি সিদ্ধান্তই ভ্রমাত্মক।

কিন্তু প্রমাণ প্রয়োগ করিবার পূর্বে আমাদিগের বলা আবশ্যক হইতেছে যে, বাঙলাদেশ ও বাঙালী বলিতে আমরা কি বুঝি। সর্ববাদিসম্মত কথা কহিবার উদ্দেশে আমরা মগধ, মিথিলা, উড়িষ্যা ও আসাম—এ কয়েকটিকে বাঙলা হইতে পৃথক জ্ঞান করিব। সুতরাং আমাদিগের অবলম্বিত বাঙ্গালার চতুঃসীমা এইরূপ হইতেছে: উত্তরে, সিকিম ও ভোটরাজ্য এবং গারো ও খস পাহাড়; পশ্চিমে, মহানন্দা নদী এবং রাজমহল ও ছোটনাগপুরের পাহাড়; দক্ষিণে, সুবর্ণরেখা নদী ও বঙ্গসাগর; পূর্বে, চট্টগ্রাম-লুসাই-মণিপুর পাহাড়শ্রেণী ও আসাম প্রদেশ। এই চতুঃসীমাস্থানেই বাঙ্গালা ভাষা প্রচলিত, এবং ইহার অধিবাসীদিগকে আমরা বাঙালী বলি। যদিও বাঙলা ভাষা আসামে প্রবেশ করিয়াছে এবং বাঙালীরা উড়িষ্যা, অযোধ্যা, কাশী প্রভৃতি স্থানে উপনিবেশ সংস্থাপন করিয়াছেন, তথাপি বঙ্গদেশবহিঃস্থ বাঙালীর সংখ্যা এত অল্প যে তাহা ধর্তব্য নহে।

বঙ্গদেশের আর্যরাজত্বকালের পুরাবৃত্ত নাই। সুতরাং আমাদিগকে বিদেশীয়

লেখক ও প্রাচীন অনুশাসনপত্রের সাহায্য অবলম্বন করিতে হইতেছে। কিন্তু ভাবিয়া দেখিলে, প্রতীতি হইবে যে, এগুলি লিখিত দেশীয় ইতিহাস অপেক্ষাও প্রামাণ্য।

মহাবংশ, রাজরত্নাবলী ও রাজাবলী—এ তিনখানি প্রামাণ্য গ্রন্থে সিংহলের পূর্ববিবরণ সংকলিত হইয়াছে। এই তিনখানিতেই এই মর্মের কথা আছে যে, বঙ্গদেশে সিংহবাহু নামে এক রাজা ছিলেন ; তাঁহার জ্যেষ্ঠপুত্র বিজয়সিংহ, প্রজাপীড়নদোষে নির্বাসিত হইলে, সাতশত সঙ্গী লইয়া অর্ণবপোত আরোহণ করেন এবং অনেক বিপদ উত্তীর্ণ হইয়া লঙ্কাদ্বীপে উপস্থিত হন ও তত্রত্য অধিবাসীদিকে যুদ্ধে জয় করিয়া সেখানকার রাজসিংহাসনে অধিরোহণ করেন ; অনন্তর বিজয়ের পরলোকপ্রাপ্তি হইলে তাঁহার ভ্রাতুষ্পুত্র পাণ্ডুবাস বঙ্গদেশ হইতে রাজ্যভার গ্রহণ করেন। পাণ্ডুবাসই লঙ্কার ঐতিহাসিক রাজবংশের আদিপুরুষ ; এবং সিংহবংশের রাজ্য বলিয়া উক্ত দ্বীপের নাম সিংহল হইয়াছে। যে বৎসর বুদ্ধদেবের জীবনলীলা সমাপ্ত হয়, সেই বৎসর বিজয় লঙ্কাদ্বীপে উপনীত হন। অধিকাংশ পণ্ডিতদিগের মত এই যে, বুদ্ধদেবের তিরোভাব খ্রীষ্টাব্দের ৫৪৩ বর্ষ পূর্বে ঘটে ; কেবল ভট্টমোক্ষমূলর সাহেব এই ঘটনার কাল খ্রীঃ পূঃ ৪৭৭ বৎসর বলিয়া স্থির করেন। যাহা হউক, স্বীকার করিতে হইতেছে যে, খ্রীষ্টাব্দের পূর্ববর্তী ষষ্ঠ বা পঞ্চম শতাব্দীতে বাঙালীরা, বর্তমান ইংরাজ জাতির ন্যায় সমুদ্রপথে সাহসপূর্বক যাত্রা করিয়া বিদেশ বিজয় করিয়াছিল।

বিদেশীয় লেখক পরিত্যাগ করিয়া এক্ষণে আমরা দুইখানি অনুশাসনপত্রের কথা বলিব। একখানি মুঙ্গের ও অপরখানি বুদাল নামক স্থানে পাওয়া গিয়াছে। এ দুইখানির ইংরাজী অনুবাদ এসিয়াটিক রিসার্চের প্রথম খণ্ডে আছে।[১] প্রথমখানি গৌড়াধিপতি দেবপাল দেবের প্রদত্ত। উহাতে লিখিত আছে যে তাঁহার বিজয়ীসেনা তখন মুদ্গগিরিতে অর্থাৎ মুঙ্গেরে শিবিরসন্নিবেশ করিয়া অবস্থিতি করিতেছিল, সেখানে বর্ত্ম্যজন্য নদীর উপর যে নৌসেতু নির্মিত হইয়াছিল, তাহাকে পর্বতশ্রেণী বলিয়া ভ্রান্তি জন্মিত ; সেখানে উত্তর-দেশীয় নরপতিগণ এত অশ্ব পাঠাইতেন যে, তাহাদিগের পদধূলিতে দিক অন্ধকার হইত ; সেখানে জম্বুদ্বীপের এত ক্ষমতাশালী নৃপতিগণ সম্মান প্রদর্শন করিতে আসিতেছিলেন যে, তাঁহাদিগের পরিচারকবর্গের পদভরে পৃথিবী বসিয়া যাইতেছিল।[২] বিজয়ীসেনা ও সামন্ত ভূপতিনিচয়ে পরিবেষ্টিত হইয়া রাজা দেবপাল যে অনুশাসনপত্র বাহির করিয়াছেন, তাহাতে তিনি স্পষ্টাক্ষরে লিখিতেছেন যে, গঙ্গোত্তরী হইতে সেতুবন্ধ রামেশ্বর পর্যন্ত এবং লক্ষ্মীকূল

হইতে পশ্চিমসাগর পর্যন্ত, সমুদায় স্থান তিনি জয় করিয়াছিলেন; এবং যুদ্ধার্থে তাঁহার ঘোটকসকল কাম্বোজদেশে উপস্থিত হইয়া কান্তাসন্দর্শনে আনন্দধ্বনি করিয়াছিল।

লক্ষ্মীকুল পূর্বদেশীয় লক্ষ্মীপুর, এবং কাম্বোজদেশ রঘুবংশ দৃষ্টে সিন্ধুনদের অপর পার্শ্ববর্তী বলিয়া বোধহয়। রঘু পারসীক ও হূণদিগকে পরাজিত করিয়া কম্বোজদেশীয় রাজগণকে আক্রমণ করেন; এবং উক্ত দেশে উৎকৃষ্ট অশ্বের উল্লেখও দেখা যায়।[৪] মুঙ্গেরের অনুশাসনপত্র পাঠ করিয়া বোধ হয় যে গৌড়াধিপতি দেবপাল দেব, সমুদয় ভারতভূমির রাজচক্রবর্তী হইয়াছিলেন। বুদালের প্রস্তরলেখ্য দ্বারাও এই মতের সমর্থন হয়। এটি পালরাজবংশের একজন মন্ত্রীর আদেশানুসারে প্রস্তুত; এবং ইহাতে কেদার মিশ্র নামক এক ব্যক্তির বিষয়ে লিখিত আছে যে তাঁহার বুদ্ধিবলে গৌড়েশ্বর বহুকাল নির্মূলীকৃত উৎকলকুলের ও খর্বীকৃতগর্ব হূণদিগের দেশ, মহিমাবিচ্যুত দ্রাবিড় ও গুর্জররাজের রাজ্য এবং সার্বভৌম সমুদ্র-মেখল রাজসিংহাসন উপভোগ করেন।[৫]

বাঙালীদিগের বিদেশবিজয় বিষয়ে আর-একখানি অনুশাসনপত্রের উল্লেখ করিয়া আমরা ক্ষান্ত হইব। অনেকে জানেন যে উড়িষ্যার গঙ্গাবংশীয় রাজারা অত্যন্ত পরাক্রান্ত ছিলেন; তাঁহারা একসময়ে ত্রিবেণী পর্যন্ত রাজ্যবিস্তার করিয়াছিলেন; তাঁহারাই জগদ্বিখ্যাত জগন্নাথদেবের মন্দির প্রস্তুত করান। এক্ষণে জানা যাইতেছে যে তাঁহারাও বাঙালী ছিলেন। পণ্ডিতগণাগ্রগণ্য উইল্‌সন সাহেব ম্যাকেঞ্জি সংগ্রহের প্রস্তাবনায় লিখিয়াছেন যে কল্‌ভিন্‌ সাহেব যে অনুশাসনপত্র প্রাপ্ত হন তদ্দৃষ্টে নির্ণীত হয় যে চোরঙ্গ গঙ্গাবংশের আদিপুরুষ নহেন; যিনি কলিঙ্গে প্রথম উপস্থিত হন, তাঁহার নাম অনন্তবর্মা বা কোলাহল, তিনি গঙ্গারাঢ়ীয় অর্থাৎ গঙ্গাসন্নিহিত তমোলুক ও মেদিনীপুরপ্রদেশের অধিপতি ছিলেন। এই ঘটনা খ্রীষ্টীয় একাদশ শতাব্দীর শেষভাগে ঘটে।[৬]

বাঙালীরা বিদেশ বিজয় করিয়াছিল, ইহা একপ্রকার সপ্রমাণ হইল। এক্ষণে আমরা দেখাইব যে, বখতিয়ার খিলিজির নবদ্বীপ প্রবেশের সঙ্গে সঙ্গেই সেনবংশের রাজত্ব শেষ ও বাঙালার স্বাধীনতাসূর্য অস্তমিত হয় নাই। মিনহাজ-ই সিরাজ বঙ্গদেশে আসিয়া বখ্‌তিয়ার খিলজির কোন কোন সঙ্গীর মুখে ১২০৩ খ্রীষ্টাব্দের বঙ্গবিজয়বৃত্তান্ত শ্রবণ করিয়াছিলেন; "তবকৎইনসিরী" নামক গ্রন্থে ইহা তিনি লিপিবদ্ধ করিয়াছেন। উক্ত গ্রন্থ ১২৬০ খ্রীষ্টাব্দে লিখিত; উহাতে লক্ষ্মণ সেনের পলায়ন বর্ণনা করিয়া মিনহাজ বলেন যে, "রায় লাক্ষ্মণেয় সাঙ্কনট ও বঙ্গাভিমুখে চলিনেন, সেখানে তাঁহার মৃত্যু হয়। তাঁহার পুত্রগণ অদ্যাপি বঙ্গদেশের অধিপতি আছেন।"[৭] বাস্তবিক বখ্‌তিয়ার

কেবল লক্ষ্মণাবতী বা গৌড়প্রদেশ অধিকার করেন ; পদ্মার অপর পার্শ্ববর্তী প্রকৃত বঙ্গদেশ জয় করিতে পারেন নাই।[৮] আরবী-পারসী বিদ্যাবিশারদ ব্লকম্যান সাহেব লিখিয়াছেন যে, "বখ্‌তিয়ার খিলিজি সমুদায় বাঙ্গালা জয় করিয়াছিলেন এরূপ বিশ্বাস করা অন্যায় ; তিনি কেবল মিথিলার পূর্ব-দক্ষিণাংশ, বারেন্দ্র, রাঢ়ের উত্তরাংশ, এবং বগড়ির উত্তর-পশ্চিমভাগ অধিকার করিয়াছিলেন। বিজিত প্রদেশ উহার প্রধান নগরী হইতে লক্ষ্মণাবতী নাম প্রাপ্ত হইয়াছিল।"[৯]

"তবকৎইনসিরী"তে এবং মুসলমান রাজত্বকালের প্রথম শতাব্দীর কোন মুদ্রাতে সুবর্ণগ্রামের নামোল্লেখ না থাকাতে, ১২৬০ খ্রীষ্টাব্দে বঙ্গ সেনবংশীয় রাজাদিগের হাতে ছিল, মিনহাজের এই উক্তির সমর্থন হইতেছে। "তারিখি-বরণি" নামক ইতিহাসগ্রন্থে বুলবনের রাজ্যশাসনসময়ে (১২৮০ খ্রীঃ অব্দে) সুবর্ণগ্রাম একজন স্বাধীন রাজার বাসস্থল বলিয়া প্রথম উল্লিখিত দৃষ্ট হয় ; কিন্তু তগলক সার সময়ে (১৩২৩ খ্রীঃ অব্দে) সোনারগাঁ ও সাতগাঁয় মুসলমান শাসনকর্তা প্রবেশ করিয়াছে, এবং সুবর্ণগ্রাম, সপ্তগ্রাম ও লক্ষ্মণাবতী—এই তিনটি সম্মিলিত প্রদেশের সাধারণ নাম "বাঙ্গালা" হইয়াছে।[১০]

একপ্রকার প্রদর্শিত হইল যে, যদিও ১২০৩ খ্রীঃ অব্দে মুসলমানেরা বাঙালায় উপস্থিত হয়, তথাপি সেনবংশ ধ্বংস করিতে তাহাদিগের প্রায় একশত বৎসর লাগিয়াছিল। এক্ষণে আমরা দেখাইব যে, এই ঘটনার পরেও মুসলমানদিগের প্রভুত্ব এদেশের কোন কোন স্থলে কখনও সংস্থাপিত হয় নাই, এবং কোন কোন স্থলে বহুকালান্তে বদ্ধমূল হইয়াছিল। সুবিখ্যাত ব্লকম্যান সাহেব "বাঙ্গালার ভূবৃত্তান্ত ও ইতিহাস" নামক প্রস্তাবে এতদ্দেশীয় মুসলমান রাজ্যের সীমা সম্বন্ধে যে সকল কথা লিখিয়াছেন, সেই সকলই আমাদিগের প্রধান অবলম্বন।

হণ্টর সাহেব বলেন যে বিষ্ণুপুরের রাজারা কখনও মুসলমানদিগের অধীনতা স্বীকার করে নাই।[১১] ব্লকম্যান সাহেব এখানকার মুসলমান রাজ্যের পশ্চিম সীমা সম্বন্ধে যাহা লিখিয়াছেন, তাহাতে ঐ মতের প্রতি-পোষকতা হয়। তিনি কহেন, "দৃষ্ট হইবে যে এই সীমাদ্বারা কাহালগাঁর দক্ষিণ হইতে বরাকর পর্যন্ত সমুদায় সাঁওতাল পরগণা, পাচেট, এবং বিষ্ণুপুরের রাজাদিগের রাজ্য, বর্জিত হইতেছে।"[১২]

দক্ষিণ-পশ্চিমে মেদিনীপুর ও হিজলি ১৫৭৬ খ্রীষ্টাব্দ পর্যন্ত উড়িষ্যা রাজ্যের অন্তর্গত ছিল। উক্ত বৎসর হিন্দু-সেনাপতি কালাপাহাড়ের প্রভাবে তাহা উৎকলসহ বঙ্গেশ সুলেমান সাহের হস্তগত হয়।[১৩]

দক্ষিণে আকবরের সময়েও আমরা প্রতাপশালী প্রতাপাদিত্যের নাম শুনিতে পাই। আকবরনামা দৃষ্টে জানা যায়, সুন্দরবনের সন্নিহিত প্রদেশে (১৫৭৪) খ্রীঃ অব্দে, মুকুন্দ নামে একজন পরাক্রান্ত স্বাধীন হিন্দু জমিদার ছিলেন। ফরিদপুর-সম্মুখস্থ "চর মুকুন্দিয়া" নামক দ্বীপে তাঁহার নামের চিহ্ন অদ্যাপি রহিয়াছে। তিনি দিল্লীর সম্রাটের একজন সেনানায়ককে নিহত করেন; এবং তদীয় পুত্র শত্রুজিৎ জাহাঙ্গীর সাহের প্রতিনিধি বঙ্গীয় শাসন-কর্তাদিগকে কর দিতে অস্বীকার করিয়া তাহাদিগকে অনেক কষ্ট দেন। শত্রুজিৎ কুচবেহারের রাজার সহিত যোগ করিয়াছিলেন, কিন্তু পরিশেষে শাহজাহানের রাজত্বসময়ে (১৬৩৬ খ্রী অব্দে) বন্দীকৃত ও বিনষ্ট হন।[১৪]

পূর্ববঙ্গে ত্রিপুরা, ভুলুয়া, নওয়াখালি, এবং চট্টগ্রাম বহুকাল বিবাদভূমি ছিল; খ্রীষ্টীয় সপ্তদশ শতাব্দীর পূর্বে সেগুলি প্রায় ত্রিপুরার ও আরাকানের রাজাদিগের অধিকৃত ছিল। রাজমহল হইতে রাজধানী ঢাকা নগরীতে উঠিয়া আসিবার পরে বাঙ্গালায় মুসলমান রাজ্যের সীমা ফণীনদী পর্যন্ত বিস্তৃত হইয়াছিল, এবং ঔরেঞ্জেব বাদসাহের সময়ে চট্টগ্রাম হস্তগত হয়।[১৫] শ্রীহট্টবিজয় ১৩৮৪ খ্রীষ্টাব্দে ঘটে।[১৬] ত্রিপুরা, হিরম্বা বা কাছাড়, জয়ন্তী, খস, গারো এবং কারিকরি পর্বতপ্রদেশ, এ সকল মুসলমানদিগের রাজ্যভুক্ত হয় নাই।[১৭] আইন আকবরিতে লিখিত আছে যে "ত্রিপুরা স্বাধীন; ইহার রাজার নাম বিজয়মাণিক। রাজাদিগের সকলের নামেই মাণিক আছে; এবং প্রধান বংশীয়দিগের নামে নারায়ণ আছে।"[১৮]

উত্তর বাঙালার রাজগণ এমন পরাক্রান্ত ছিলেন সে তাঁহারা একপ্রকার স্বাধীনতা সম্ভোগ করিতেন।[১৯] যে গণেশ খ্রীষ্টীয় পঞ্চদশ শতাব্দীর প্রারম্ভে বাঙালার সিংহাসনে অধিরোহণ করেন, ওয়েস্টমেক্ট সাহেবের মতে তিনি দিনাজ-পুরের রাজা গণেশ।[২০] রঙ্গপুরের উত্তরে কামতা নামে একটি রাজ্য ছিল; ১৪৯৮ খ্রীষ্টাব্দে হোসেন সাহের সময়ে উহা অধিকৃত হয়।[২১] কামতা রাজ-বংশের তিরোভাবের পরে কোচরাজবংশের প্রাদুর্ভাব হইয়া উঠে; পরিশেষে ১৬৬১ খ্রীষ্টাব্দে ঔরঙ্গজেবের সেনাপতি মিরজুম্লা উক্ত প্রদেশে অধিকার করেন।[২২]

এ পর্যন্ত যাহা যাহা লিখিত হইল, তাহাতে সপ্রমাণ হইতেছে যে বখ্‌-তিয়ার খিলিজির প্রায় একশত বৎসর পরে সেনবংশের রাজ্য ধ্বংস হয়; এবং তদনন্তরও বিষ্ণুপুর, পাচেট, ত্রিপুরা, জয়ন্তী—এ সকল স্থানের রাজগণ মুসলমান দিগের রাজত্বকালে আপনাদিগের স্বতন্ত্রতা রক্ষা করিয়াছিলেন। এতদ্ব্যতিরিক্ত দক্ষিণ, পূর্ব ও উত্তরে অনেক জমিদার বহুকাল স্বাধীন ছিলেন।

এক্ষণে আমরা জমিদারদিগের বিষয়ে কিঞ্চিৎ বলিব। বিষ্ণুপুর, পাচেট, দিনাজপুর, এই সকল স্থানের রাজারা এবং পূর্ব-দক্ষিণ প্রদেশীয় মুকুন্দ ও শত্রুজিৎ জমিদারপদবাচ্য। ইহাতেই বুঝাইতেছে যে জমিদারেরা কেবল কর-সংগ্রাহক রাজকর্মচারী মাত্র ছিলেন না। কিন্তু এ বিষয়ের আমরা অপর প্রমাণ দিতেছি। আইন আকবরিতে লিখিত আছে সে সুবা বাঙালার জমিদারেরা প্রায়ই কায়স্থ এবং তাহারা ২৩,৩৩০ অশ্বারোহী, ৮,০১,১৫৮ পদাতিক, ১৮০ গজ, ৪,২৬০ কামান এবং ৪,৪০০ নৌকা দিয়া থাকে।'[২৩] এরূপ যুদ্ধের উপকরণ যাহাদিগের ছিল, তাহাদিগের পরাক্রম নিতান্ত কম ছিল না। বাস্তবিক অনেক জমিদারের বিরুদ্ধে সৈন্য প্রেরণ না করিয়া কর আদায় করা যাইত না। সুবিখ্যাত পাদরি লং সাহেব ইংরাজ রাজ্যের প্রথম আমলের কাগজপত্রের যেসকল অংশ মুদ্রিত করিয়াছেন, তৎপাঠে জানা যায় যে তখন বর্ধমান, বীরভূম, বিষ্ণুপুর এবং মেদিনীপুরের রাজারা সৈন্য সংগ্রহ করিয়া তৎকালীন শাসনকর্তাদিগের অনেক কষ্টের কারণ হইয়াছিলেন।[২৪]

১৮২১ খ্রীষ্টাব্দে উড়িষ্যার কমিশনর স্টর্লিং সাহেব উক্ত দেশের ভূমির স্বত্ব সম্বন্ধে যে মিনিট লিখিয়া গবর্ণমেণ্টে পাঠাইয়াছিলেন, তাহাতে পূর্বকালের জমিদারেরা কি ছিলেন একপ্রকার স্পষ্ট করিয়া লেখা আছে। ঐ লেখার মর্ম নিম্নে গৃহীত হইল।

"উড়িষ্যা বন্দোবস্তের সময়ে আক্‌বরের মন্ত্রিগণ সিংহাসনচ্যুত রাজবংশের প্রধান শাখাগুলির ভরণপোষণের ব্যবস্থা করা ন্যায় এবং রাজনীতির অনুমোদিত কার্য জ্ঞান করিলেন। তজ্জন্য বাস্তবিক উত্তরাধিকারী রামচন্দ্রদেবকে, জমিদার আখ্যা দিয়া, খোড়দা এবং তথা হইতে পুরীসন্নিহিত সাগর পর্যন্ত বিস্তৃত চারিটি পরগণা জমিদারিস্বরূপ প্রদত্ত হইল, এবং এ নিমিত খোড়দার রাজাদিগকে অদ্যাপি উড়িষ্যার জমিদার বলে। পূর্বোক্ত আখ্যাসহকৃত রাজবংশের অপর এক ব্যক্তিকে কেল্লা আউলের জমিদারি দেওয়া হইল, এ ব্যক্তি তেলেঙ্গা মুকুন্দদেবের বংশীয় বলিয়া রাজ্যপ্রার্থী ছিল। কেল্লা পুটিয়া সারঙ্গগড় এবং দুই-তিন পরগণার জমিদারি তৃতীয় একজনকে প্রদত্ত হয়।

"আকবর সাহের রাজত্বের দেড়শত বৎসর পর পর্যন্ত এই রাজবংশীয় ব্যক্তি-বর্গ এবং পুরুষানুক্রমিক রাজকর্মচারিগণ ব্যতীত আর কেহই কটকে জমিদার বলিয়া রাজদ্বারে স্বীকৃত হইত না। ফেরেস্তা 'দক্ষিণের রায় ও জমীদারদিগকে' পরাক্রান্ত, সেনাবলবিশিষ্ট, এবং বহুদুর্গাধিকারী বলিয়া বর্ণনা করিয়াছেন, সেই ফেরেস্তা যে অর্থে জমিদার শব্দের প্রয়োগ করেন পূর্বোল্লিখিত জমিদারদিগের পদ তদনুরূপ ছিল। উত্তরাধিকারীদের নিয়মানুসারে তাঁহারা বিষয় সম্পত্তি

পাইতেন; আপন আপন প্রভুত্বাধীন স্থানে জীবন-মৃত্যু বিধানশক্তি ধারণ করিতেন; সাধ্যানুরূপ সৈন্য রাখিতেন; এবং যদি কিছু দিতে হইতে, অতি সামান্য করই দিতেন।"

এ পর্যন্ত যাহা কিছু লিখিত হইল, তাহাতেই প্রতিপন্ন হইতেছে যে, পূর্বকালের জমিদারদিগের মধ্যে কেহ কেহ স্বাধীন ছিলেন, এবং কেহ বা বর্তমান রাজপুতনার করদ রাজাদিগের ন্যায় ছিলেন। তাঁহাদিগের সৈন্য ছিল, গড় ছিল; এবং তাঁহারা স্বত্বাস্বত্বের বিচার করিতেন ও অপরাধের দণ্ড দিতেন। মুসলমানদিগের সময়ে বাঙালাদেশের অধিকাংশ স্থলে হিন্দু জমিদার ছিল; সুতরাং প্রায় সর্বত্রই শাস্ত্রের ব্যবস্থা ও হিন্দুসমাজ প্রচলিত রীত্যনুসারে শাসনকার্য নির্বাহিত হইত। রাজধানী-সন্নিহিত স্থান ব্যতীত কোথাও মুসলমান রাজাদিগের সহিত প্রজাদিগের সাক্ষাৎ সম্বন্ধ ছিল না।

ভাদ্র, ১২৮১

উৎকলের প্রকৃতাবস্থা

বঙ্গদেশীয় অনেকেই "উড়িয়া" অথবা "উড়িষ্যা" নাম শুনিবামাত্র ঘৃণা প্রকাশ করিয়া থাকেন, কিন্তু তাঁহারা উড়িয়াদিগের এবং উৎকল দেশের আভ্যন্তরীণ অবস্থা অবগত হইতে পারিলে তাঁহাদের কুসংস্কার অপনোদিত হইবার সম্ভাবনা। আমি উৎকল প্রদেশে অনেকদিন বসবাস করত উৎকল প্রদেশের পুরাকালিক এবং বর্তমান সাময়িক আভ্যন্তরীণ অবস্থা যাহা অবগত হইয়াছি, তাহার সংক্ষিপ্ত বিবরণ প্রকাশ করিতেছি।

উৎকলদেশের ইতিহাসলেখকেরা উৎকলবাসীদিগের জাতিনির্বাচন সম্বন্ধে অনেক স্থলে ভ্রমে পতিত হইয়াছেন, তজ্জন্য প্রথমে উৎকলের পুরাকালিক বিষয় কিঞ্চিৎ সমালোচনা করা আবশ্যক। হণ্টার সাহেব বলেন, "বর্ণভেদ হইবার পূর্বে আর্যজাতি উৎকল এবং বঙ্গদেশে বাস করিয়াছিলেন, তজ্জন্যই মনুর নির্দিষ্ট চতুর্বর্ণ এ দুই দেশে নাই।" হণ্টার বিশেষরূপে অনুসন্ধান করিতে পারেন নাই বলিয়া জাতিনির্বাচন সম্বন্ধে তাঁহার ঈদৃশ ভ্রম হইয়াছে। মনুলিখিত চতুর্বর্ণই বহু প্রাচীনকাল হইতেই উৎকলে বসবাস করিতেছেন তৎপক্ষে প্রমাণের অপ্রতুল নাই; কিন্তু মনুর পূর্বে আর্যজাতি যে উৎকলে আসিয়াছেন তাহার কোন প্রমাণ নাই। আর্যজাতিগণ যৎকালে আর্যাবর্ত, ব্রহ্মাবর্ত প্রদেশে অবস্থিতি করেন তৎকালে উৎকলপ্রদেশে "কন্দ" প্রভৃতি অসভ্য জাতিদিগের

পূর্বপুরুষগণ বসবাস করিবারই সম্ভাবনা। যে সকল আর্যসন্তানগণ গুরুতর অপরাধ করিতেন, তাঁহাদিগকে নির্বাসিত করিবার বিধি মনুতে প্রত্যক্ষ করা যায়। কদর্য স্থানই নির্বাসনভূমি নির্দিষ্ট হওয়াই চিরপ্রচলিত রাজনীতি ; * বোধ হয় এইজন্যই তৎকালে উৎকল প্রদেশই নির্বাসনভূমি অবধারিত ছিল। সকল প্রবাদবাক্যের মধ্যে আংশিক সত্য থাকা যদ্যপি স্বীকার করা যায়, তাহা হইলে প্রাচীনকালে উৎকলপ্রদেশ কেন "যমালয়" উপাধি প্রাপ্ত হইয়াছিল তাহা কতক বুঝা যায় ; উৎকল প্রদেশ যমালয় নামে প্রসিদ্ধ ছিল। "বৈতরণী নদী"ই তাহার প্রমাণস্বরূপ। "বৈতরণী" প্রেত উদ্ধারের স্থান।†

ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয়, বৈশ্য, শূদ্র, এই চতুর্বর্ণের নিয়ম সকল মনু, বিধিবদ্ধ করত পশ্চাৎ যে পতিত ক্ষত্রিয়ের উল্লেখ করিয়াছেন,‡ এক্ষণে দেখা যায়, ঐ সকল পতিত ক্ষত্রিয়বংশের মধ্যে তিন শ্রেণীর বংশ বহুকাল হইতে উৎকল প্রদেশে বসবাস করিতেছেন। "পাণ" এবং "অড়" উপাধিবিশিষ্ট যে দুটি নীচ জাতি আছে, তাহাদের মধ্যে "পাণ" জাতিটি মনুর লিখিত "পৌণ্ড্রক" বংশীয়, এবং "ওড্র" হইতে "অড়" অথবা "ওড়" শব্দ নিষ্পন্ন হইয়া থাকিবার সম্পূর্ণ সম্ভাবনা। ব্রাহ্মণগণও গুরুতর অপরাধ করিলে রাজ্য হইতে বহিষ্কৃত করিবার বিধি রহিয়াছে, বোধ হয় সেই সকল অপরাধী ব্রাহ্মণগণ, আর্যাবর্ত, ব্রহ্মাবর্ত প্রভৃতি স্থান হইতে বিতাড়িত হইলে উৎকল প্রদেশেই উপস্থিত হইয়া উপনিবাস সংস্থাপন করিতেন। উৎকল প্রদেশে "দাস" উপাধিধারী এক সম্প্রদায় ব্রাহ্মণ

* ন জাতু ব্রাহ্মণং হন্যাৎ সর্ব পাপেষপিস্থিতং
রাষ্ট্রাদেনং বহিঃ কুর্যাৎ সমগ্রধনমক্ষতং ॥
মনু ৮অ, ৩৮০ শ্লো।
বিকর্মস্থান্ শৌণ্ডিকাংশ্চ ক্ষিপ্রং নির্বাসয়েৎ পুরাৎ।
মনু ৯অ, ২২৫ শ্লো ॥

† এই জন্যই কি এ দেশীয়দিগের চিরবিশ্বাস যে দক্ষিণ দিকে যমালয় ? পল্লীগ্রাম অঞ্চলের অনেকে দেখা যায় দক্ষিণ দিকে যাও বলিলে যমালয় যাও বলা হইল বিবেচনা করেন তাহার কি এই কারণ ?—সম্পাদক

‡ ঝল্লো মল্লশ্চ রাজন্যাৎ ব্রাত্যান্নিছিবিরেবচ।
নটশ্চ করণশ্চৈব খসো দ্রবিড় এবচ ॥
মনু ১০ অ, ২২ শ্লোক।
পৌণ্ড্রকাশ্চোড্র দ্রবিড়াঃ, কাম্বোজা যবনাঃ, শকাঃ,
পারদা পহ্লবাশ্চীনাঃ, কিরাতা দরদাঃ, খশাঃ ॥
মনু ১০ অ, ৪৪ শ্লো।

আছেন ; ব্রাহ্মণবংশে "দাস" উপাধি থাকা ভারতবর্ষের কোন স্থানেই শুনা যায় না, কেবল উড়িষ্যা প্রদেশেই ব্রাহ্মণজাতি মধ্যে "দাস" উপাধি শুনা যায়। "দাস" উপাধিটি নিতান্ত ঘৃণাসূচক। ব্রাহ্মণবংশে "দাস" উপাধি প্রচলিত থাকায় স্পষ্টই অনুভব হয় যে বহু প্রাচীনকাল হইতে যে সকল পতিত ব্রাহ্মণগণ আর্যাবর্ত অথবা ব্রহ্মাবর্ত হইতে বিতাড়িত হইয়া উৎকল প্রদেশে বসবাস করিতেন আর্যা-বর্তবাসী অথবা ব্রহ্মাবর্তবাসী ব্রাহ্মণগণ ঐ সকল ব্রাহ্মণবংশীয়কে পতিত মনে করিয়া "দাস" উপাধি প্রদান করত ঘৃণা প্রকাশ করিতেন ; অথবা এমনও হইতে পারে যে যৎকালে আর্যগণ উৎকলপ্রদেশে উপস্থিত হইয়া উড়িষ্যার নানা স্থানে উপনিবাস সংস্থাপন করেন, তৎকালে যে সকল ব্রাহ্মণবংশীয়গণ আচারভ্রষ্ট, পতিত হইয়া বহু প্রাচীনকাল হইতে উড়িষ্যাপ্রদেশে নির্বাসিত ছিলেন তাঁহা-দিগকে "দাস" বলিয়া ঘৃণা করিতেন, তজ্জন্যই উড়িষ্যায় একটি শ্রেণীর ব্রাহ্মণ-বংশে "দাস" উপাধি এক্ষণ পর্যন্ত গোচর রহিয়াছে।*

উৎকলদেশে এক্ষণে অন্যান্য যে সকল ব্রাহ্মণ বসবাস করিতেছেন, তাঁহা-দিগের উপাধি শ্রবণ করিলে তাঁহারা যে অতি অল্পকাল উড়িষ্যাতে উপস্থিত হইয়া বসবাস করিতেছেন, তাহা স্পষ্টই অনুভব হয়। উড়িষ্যাতে "দোবাই" উপাধিধারী ব্রাহ্মণ আছে। সংস্কৃত "দ্বিবেদী" হইতে হিন্দি "দোবে" উৎপন্ন, "দোবে" হইতে উড়িয়া "দোবাই" হইয়াছে। উড়িয়া ব্রাহ্মণ-বংশে "তেহাড়ি" উপাধি আছে। সংস্কৃত "ত্রিবেদী" হইতে হিন্দি "তেয়ারি" উৎপন্ন, উক্ত তেয়ারির অপভ্রংশ উড়িয়া "তেহাড়ি" উপাধি হইয়াছে। সংস্কৃত পণ্ডিত হইতে হিন্দি "পাঁড়ে" এবং হিন্দি পাঁড়ে হইতে উড়িয়া "পাণ্ডা" উপাধি সমুৎপন্ন হইবারই সম্ভাবনা। উড়িষ্যায় "মিশর" উপাধি আছে। সংস্কৃত "মিশ্র" উপাধি হইতে উৎপন্ন স্পষ্টই জানা যায়। এই সকল ব্রাহ্মণবংশীয়গণ উৎকলে অল্পকাল উপস্থিত হওয়া অনুভব অসঙ্গত বোধ হয় না।

"মাহান্তি" অথবা "মাইতি" উপাধিবিশিষ্ট একটি জাতি উৎকলদেশে আছেন, তাঁহারা এক্ষণে আপনাদিগকে "করণ" বলিয়া পরিচয় প্রদান করেন। মনুর উল্লিখিত "করণ" শব্দ হইতে "মাহান্তি" অথবা "মাইতি" শব্দ কিরূপে

* এক্ষণে দেখা যায় যে, যে সকল বাঙ্গালিরা ইদানীং তিন-চারি পুরুষ অবাধে উড়িষ্যায় বাস করিতেছেন তাঁহারা "কেরা" বাঙ্গালি বলিয়া উড়িষ্যায় পরিচিত। "কেরা বাঙ্গালি" বড় সম্মানের উপাধি নহে। এই সকল ব্যক্তি বাঙ্গালায় আসিলে সমাজে বড় একটা গৃহীত হন না। পশ্চিম অঞ্চলে যাঁহারা বহু পুরুষ অবধি বাস করিতেছেন তাঁহারা গৃহীত হইয়া থাকেন। উড়িষ্যার পক্ষে এ পৃথক্ নিয়ম কেন ?—সম্পাদক

উৎপন্ন হইয়াছে, তাহার কোন প্রমাণ প্রাপ্ত হওয়া যায় না। তাঁহাদের মধ্যে কেহ কেহ বলেন, উৎকলের রাজাদিগের নিকটে তাঁহারা "মাহাতি" উপাধি প্রাপ্ত হইয়াছিলেন ; কিন্তু রাজ-উপাধি বংশগত অথবা ব্যক্তিগতই প্রচলিত, জাতিগত কোন রাজ্যেই ত প্রত্যক্ষ হয় না। অমরকোষে "অম্বষ্ঠ করণাদয়" ইত্যাদি লিখিত আছে, তদ্দ্বারা করণজাতি শম্বরজাতিমধ্যে পরিগণিত ; কিন্তু উড়িষ্যার মাহিতি জাতির অশৌচ পালনের রীতি যাহা প্রচলিত আছে (অর্থাৎ ১০ দিবস অশৌচ গ্রহণ করা) তাহা মাহিতিদের মধ্যেও প্রচলিত, কিন্তু বৈদ্য প্রভৃতির ১৫ দিবস অশৌচ গ্রহণের ব্যবস্থা প্রচলিত ; বৈদ্যদিগের স্বগোত্রে বিবাহ হয় না, কিন্তু মাহিতিদের মধ্যে স্বগোত্রে বিবাহ প্রচলিত আছে, তখন উড়িষ্যার মাহিতি জাতিটি মনুলিখিত করণ অথবা অমরসিংহের উল্লিখিত সঙ্কর-বর্ণ করণ, তাহা স্বীকার করিতে পারা যায় না। এই মাহিতিজাতি মেদিনীপুর অঞ্চলে বহুকাল হইতে বসবাস করিয়া দক্ষিণ রাঢ়ীয় কৈবর্তের মধ্যে পরিগণিত হইয়াছেন, তৎপক্ষে একটি প্রস্তাব আমাকর্তৃক লিখিত হইয়াছিল।

উৎকলদেশে "খণ্ডাইত" নামধারী একটি জাতি আছে। তাহাদের বিবাহের সময়ে উপবীত হইবার রীতি প্রচলিত আছে। এই "খণ্ডাইত" শব্দ, "ক্ষত্রিয়" অথবা "খণ্ডধারী" "খড়্গধারী" ইত্যাদি পদের অপভ্রংশ বলা যাইতে পারে। এই জাতি বহু প্রাচীনকাল হইতে উৎকলদেশে অবস্থিতি করিতেছেন। এই জাতি উপবীতধারী হইয়াও শূদ্রজাতিমধ্যে পরিগণিত, ইঁহারা মাহিতি জাতিতে কন্যা সম্প্রদান করিয়া থাকেন, এতদ্দ্বারা স্পষ্টই প্রমাণিত হয় যে, ঐ জাতিও পতিত এবং আচারভ্রষ্ট ক্ষত্রিয়জাতি হইতে উৎপন্ন হইয়াছে।

উৎকলদেশে ব্রাহ্মণ, মাহিতি, খণ্ডাইত এই তিনটিই শ্রেষ্ঠজাতি, এবং পাণ, ওড় প্রভৃতি নীচজাতি বহু প্রাচীনকাল হইতেই এই দেশে বসবাস করিতেছে ; এই সকল জাতি মনুর উল্লিখিত বর্ণভেদ হইবার পর যে উৎকলে উপস্থিত হইয়াছেন, তাহাতে স্পষ্টই প্রমাণিত হইতেছে, তবে হণ্টার সাহেব কি উপলক্ষ করিয়া বিপরীত মত প্রকাশ করিয়াছেন তাহা বলা যায় না, মনুর পূর্বে আর্যগণ উৎকলে বসবাস করিয়াছিলেন, তাহার কোন যুক্তি বা প্রমাণ প্রাপ্ত হওয়া যায় না।

"উৎকল" শব্দ "ভারবহ" হইতে উৎপন্ন হইয়া থাকিতে পারে, কিন্তু "কল" শব্দে মধুরধ্বনি বুঝায় মনে করিয়া উৎকল দেশের নাম প্রতিপন্ন করা কেবল এণ্ডাবান্ দ্বীপবাসী ভিন্ন কোন সভ্য জাতির বলিয়া বোধ হয় না। যাহা হউক বোধ হয় "ওড্র" অথবা "উড্র" জাতির বাসস্থল বলিয়া উড়িষ্যা নাম, এবং

"ওঢ্র" অথবা "উড্র" শব্দ হইতে "ওড়িয়া" কিম্বা "উড়িয়া" নাম প্রচারিত হইয়া থাকিবে।

বহু শতাব্দী পরে যখন আর্যগণ উৎকল প্রদেশে উপনিবাস সংস্থাপন করেন, তৎকালে উৎকল দেশের প্রাকৃতিক সৌন্দর্য প্রত্যক্ষ করত বিমোহিত হইয়া আর্য ঋষিগণ উৎকলপ্রদেশকে পুণ্যভূমি বলিয়া প্রচারিত করেন; এবং উৎকলপ্রদেশে পুণ্যপ্রবাহিণী নদী ও তপস্যার অনুকূল ফলপুষ্পাদি পরিপূর্ণ বলিয়া উৎকলভূমির অনেক গৌরব প্রচার করেন; বোধ হয় উৎকলপ্রদেশে উপনিবাসীর সংখ্যা বৃদ্ধি করাইবার জন্যই আর্য ঋষিগণ উৎকলপ্রদেশের ঈদৃশ অত্যুক্তিপূর্ণ বর্ণনা সকল করিয়াছিলেন। যাহা হউক পৌরাণিক কালের মধ্যাবস্থায় উৎকল প্রদেশে আর্যগণ উপনিবাস সংস্থাপন করিতে আরম্ভ করেন, এইরূপ অনুমান করা নিতান্ত অসঙ্গত বোধ হয় না। ঐ সময়েই উৎকলপ্রদেশ পঞ্চ কলিঙ্গের অন্তর্গত "কলিঙ্গ" নামে বিখ্যাত হইবার সম্পূর্ণ সম্ভাবনা; ঐ সময় হইতেই উৎকলপ্রদেশে রাজশাসন, সামাজিক শাসন, ধর্মশাসন প্রতিষ্ঠিত হইবার সূত্রপাত হইয়াছিল বলিয়া বোধ হয়। উৎকল প্রদেশে পৌরাণিক কালের মধ্যে কোনরূপ সংস্কৃত কাব্যাদি প্রকটিত হইবার নিদর্শন প্রাপ্ত হওয়া যায় না, বৌদ্ধদিগের সময়েই উড়িষ্যায় সৌভাগ্যলক্ষ্মী উদিত হয়; এবং বৌদ্ধদিগের সময় হইতেই উড়িষ্যার প্রকৃত শ্রীবৃদ্ধি হইতে আরম্ভ হয়; বৌদ্ধদিগের অভ্যুদয়ের পূর্ব সময়ে উৎকলের আভ্যন্তরীণ ব্যাপার অনুসন্ধান করিতে গিয়া কেবলমাত্র উপন্যাস ভিন্ন আর কিছু পাওয়া যায় না; অতএব যে অংশ গালগল্পের উপরে নির্ভর করে, সে অংশটি পরিত্যাগপূর্বক বৌদ্ধদিগের সময় হইতে উৎকলের আভ্যন্তরীণ বিষয়ের আলোচনা করা যাইতেছে।

মহর্ষি শাক্যসিংহের শিষ্যগণ উৎকল প্রদেশে যখন উপস্থিত হন, তখন উৎকলের আদিমবাসী অর্থাৎ যাহারা আর্যাবর্ত ব্রহ্মাবর্ত প্রভৃতি স্থান হইতে বিতাড়িত হইয়া বংশপরম্পরায় উৎকল প্রদেশে বাস করিতেছিলেন এবং উপনিবাসী আর্যসন্তানগণ কর্তৃক ঘৃণিত নিষ্পীড়িত সমাজচ্যুত অপমানিত হইয়া আসিতেছিলেন, তাঁহারা সময় পাইয়া বৌদ্ধধর্ম-প্রচারকদিগের আশ্রয় গ্রহণ করেন। নিষ্পীড়িত লোক একটুমাত্র অবলম্বনের উপায় প্রাপ্ত হইলেই শতগুণ উৎসাহের সহিত কার্যসাধনে প্রবৃত্ত হওয়া তাঁহাদের স্বভাবসিদ্ধ; তাহাতে আবার বৌদ্ধধর্মপ্রচারকগণ অত্যন্ত বিনীতস্বভাব ছিলেন; কি ক্ষুদ্র কি নীচ, কি ধনী মানী, কি রাজা প্রজা, সকলকে সমভাবে আলিঙ্গন করা, সকলের অন্ন গ্রহণ করা, সকল নর-নারীকে মুক্তির পথে আকর্ষণ করা তাঁহাদের জীবনের লক্ষ্য ছিল, অথচ আর্যদিগের ব্রহ্মচর্যের রীত্যনুসারে যোগাদি সাধন করাও তাঁহাদের

প্রধান কার্য ছিল ; এই সকল অকপট ধর্মভাব তাঁহাদের মধ্যে প্রত্যক্ষ করত উৎকলবাসী নিষ্পীড়িত নরনারী সকল আগ্রহের সহিত বৌদ্ধধর্ম গ্রহণ করেন। উৎকলবাসী যাঁহারা পতিত বলিয়া চিরকাল ধর্মের সুখলাভে চিরবঞ্চিত হইয়া পুরুষানুক্রমে হীন হইয়া আসিতেছিলেন, বৌদ্ধধর্ম-প্রচারকগণের এবং বৌদ্ধ ধর্মের উদারতা দেখিয়া তাঁহারা যেমন বৌদ্ধধর্ম গ্রহণ করিতে লাগিলেন, সেইরূপ জীবন্ত উৎসাহের সহিত বৌদ্ধধর্মের উন্নতিসাধনে প্রাণপণে যত্নবান্ হইয়াছিলেন। সেই সকল নিষ্পীড়িত লোকদিগের অন্তরে নূতন ধর্মভাব বিকসিত হইবার সঙ্গে সঙ্গে ধর্মোন্মত্ততা উপস্থিত হয়, তজ্জন্য সত্বর উৎকল দেশে বৌদ্ধধর্মের শ্রীবৃদ্ধি সংসাধিত হইয়াছিল। সেই সকল উৎকলবাসী ধর্মোন্মত্ত বৌদ্ধদিগের যে সকল প্রাচীন কীর্তি উৎকল দেশের নানাস্থানে অদ্যাপি বিদ্যমান রহিয়াছে, পৃথিবীর অপর কোন স্থানে একত্রে একাধিক প্রাচীন কীর্তি বিদ্যমান থাকার পরিচয় বড় প্রাপ্ত হওয়া যায় না। প্রাচীন উঁড়িয়াগণ কিরূপ উৎসাহী এবং ক্ষমতাশালী লোক ছিলেন তাঁহাদের প্রাচীন কীর্তিস্তম্ভগুলিই তাহার বিশেষ পরিচয় প্রদান করিতেছে।

"খণ্ডগিরি" প্রাচীন উঁড়িয়া বৌদ্ধদিগের প্রধান কীর্তি। এই খণ্ডগিরি কটক শহরের ৮।৯ ক্রোশ দূরবর্তী দক্ষিণ-পশ্চিমাংশে ভুবনেশ্বর নামক শৈবক্ষেত্রের নিকটে জঙ্গলমধ্যে দুইটি পর্বতমধ্যে সংস্থাপিত। ঐ দুইটি পর্বতের গাত্র খোদিত করত দ্বিতল ত্রিতল বাটী সকল প্রস্তুত হইয়াছে। সেই বাটী সকলের নিম্নে প্রাঙ্গণ, উপরের ঘরে উঠিবার জন্য সোপানাবলী, দরদালানের একপার্শ্ব হইতে অপর পার্শ্ব পর্যন্ত থাম সকল শ্রেণীবদ্ধ, দরদালানের পরে কুঠারী সকল শ্রেণীবদ্ধ। কুঠারীগুলি যে নিতান্ত সঙ্কীর্ণ এমত নহে, কলিকাতার অনেক বাসাড়ের ঘর অপেক্ষা তাহা লম্বাচৌড়া ; গৃহদ্বারের উপর খোদিত নানারূপ পুত্তলিকা আছে। একটি পর্বতে ঐরূপ বাটী দুইটি, অপরটিতে একটি আছে। উত্তরপার্শ্বের পর্বতটি মধ্যস্থলে সর্পের আকৃতির ন্যায় বক্রভাবে খোদা গহ্বর, লম্বা প্রায় ৩০।৪০ ফুট ; নিম্নে পর্বত, ঊর্ধ্বে পর্বতচূড়া, দূর হইতে দেখিলে বোধ হয় যেন পর্বত মুখব্যাদান করিয়া রহিয়াছে। এইটির নাম ইংরাজিতে "এস্নেক্ কেভ্" বলে। এই কেভটির পশ্চিমাংশে ব্যাঘ্রের মুখাকৃতির ন্যায় আর এক গহ্বর আছে, সেটির নাম ইংরেজিতে "টাইগার কেভ" বলে, সেইটির মধ্যে একটি কুঠারী, এবং দরদালান আছে। পশ্চিমাংশের পর্বতে একটি হস্তীর মুখাকৃতি কৃত্রিম গুহা আছে, তাহার নাম "এলিফেণ্ট কেভ" ; ঐ দুই পর্বতে আরও অনেকগুলি কেভ অর্থাৎ কৃত্রিমগুহা আছে ; দুইটি পর্বতে প্রায় ৬০।৬২টি গুহা প্রত্যক্ষ হয়। পর্বতের অন্য পার্শ্ব এক্ষণে জঙ্গলপূর্ণ, হিংস্র জন্তুর

আবাসস্থল বলিয়া গমনাগমনের নিতান্ত অসুবিধা হইয়াছে। ঐ দুইটি পর্বতের উপরে পাঁচটি চৌবাচ্ছা আছে; ঐগুলি "গঙ্গা" নামে প্রসিদ্ধ। যে সকল বৌদ্ধধর্ম-প্রচারকগণ অনেক দিন কার্য করিয়া বার্ধক্য প্রাপ্ত হইতেন, তাঁহারাই ঐ সকল গুহাতে যোগসাধনা করত জীবনাতিবাহিত করিতেন; আর ঐ চৌবাচ্ছাতে স্নানাদি করিতেন। পশ্চিমাংশের পর্বতের উপর একটি মন্দির, এবং তাহার সংলগ্ন দুইটি লাটমন্দির আছে; কিন্তু তাহা আধুনিক বলিয়া বোধ হয়। ঐ মন্দির প্রস্তরাদি দ্বারা নির্মিত। তন্মধ্যে বেদী আছে, এবং বেদীতে বুদ্ধদেবের ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র মূর্তি কয়েকটি সংস্থাপিত আছে। কয়েকটি দ্বিতল গুহা অর্ধখোদিত হইয়া অসম্পূর্ণ অবস্থায় রহিয়াছে, বোধ হয় ভুবনেশ্বরের কেশরীবংশীয় রাজাদিগের প্রাদুর্ভাবকালে যখন শৈবধর্মের উৎসাহ-অগ্নি উৎকল দেশে প্রজ্বলিত হয়, এবং শৈবগণ বৌদ্ধগণকে উৎপীড়ন আরম্ভ করেন, তাহার প্রাক্‌কালেই ঐ কয়েকটি কেভ্ খোদিত হইতেছিল, তৎপরে শৈবদিগের উৎপীড়নহেতু বৌদ্ধগণ ঐ খণ্ডগিরি পরিত্যাগ করত প্রস্থান করেন; যাহা হউক, খণ্ডগিরি অশোক রাজার সময়ে একটি সমৃদ্ধিশালী স্থান এবং পুণ্যভূমি-মধ্যে পরিগণিত ছিল। ইতিহাসলেখক হণ্টর প্রভৃতির মতে ঐ সকল কেভ প্রায় বাইশ শত বর্ষের অধিককাল হইবে নির্মাণ হইয়াছে। যাহা হউক এক্ষণে খণ্ডগিরির ব্যাপার দেখিলে প্রাচীন উৎকলবাসী বৌদ্ধদিগের ধর্মোৎসাহের চূড়ান্ত নিদর্শন প্রাপ্ত হওয়া যায়। উৎকলের ইতিহাসলেখকগণ বলেন, নানাস্থানীয় বৌদ্ধগণ সেই সময়ে উৎকলপ্রদেশে উপস্থিত হইয়া এই আশ্চর্য কীর্তি স্থাপন করিয়াছিলেন; যদিও তাহা স্বীকার করা যায় তাহা হইলেও বিদেশী বৌদ্ধগণ সংখ্যাতে কয়জনই বা আসিয়া থাকিবেন? ঐ সকল ব্যাপার সম্পন্ন করা দুই জন কি দশ জন লোকের কার্য নহে। এই কার্য উপলক্ষে বহুসংখ্যক লোক ভিন্নদেশ হইতে উৎকলপ্রদেশে যে আসিয়াছিলেন তাহার কোন বিশিষ্ট প্রমাণ যখন প্রাপ্ত হওয়া যায় না, তখন প্রাচীন উৎকলবাসীদিগের দ্বারাই যে ঐসকল কীর্তি সংস্থাপিত হইয়াছিল, তাহা মুক্তকণ্ঠে স্বীকার করা যাইতে পারে।

পুরীর জগন্নাথের মন্দিরটিও বৌদ্ধধর্মাবলম্বীদিগের একটি প্রধান কীর্তি। হণ্টারের মতে খ্রীঃ দ্বাদশ শতাব্দীতে তৃতীয় ইন্দ্রদ্যুম্ন রাজা কর্তৃক প্রসিদ্ধ মন্দিরটি নির্মিত হইয়াছে।* এই মন্দিরের বেষ্টিত ভিত্তির মধ্য দিয়া একটি

* হণ্টার তৃতীয় ইন্দ্রদ্যুম্ন কর্তৃক দ্বাদশ শতাব্দীতে ঐ মন্দির নির্মাণ হইবার কথা উল্লেখ করিয়াছেন, তাঁহাকে এ বিষয়ে ভ্রমশূন্য বলিয়া মনে করিতে পারা যায় না। হণ্টার সাহেব নিজকৃত ইতিহাসে লিখিয়াছেন—"খ্রীঃ পঞ্চম

গুপ্ত সোপান আছে ; তাহা ত্রিতল এবং তাহা সম্প্রতি প্রকাশ পাইয়াছে। ভিত্তির মধ্য দিয়া বরাবর উঠিবার সিঁড়ি প্রস্তুত করা বড় সাধারণ বুদ্ধির এবং ক্ষমতার কার্য নহে। এই মন্দিরটি প্রায় দেড়শত হস্ত অপেক্ষা উচ্চ হইবে। মন্দিরের চতুষ্পার্শ্বে বিস্তৃত প্রাঙ্গণ, তৎপার্শ্বে দেবালয় সকল সংস্থাপিত, বাটীর

শতাব্দীর কিঞ্চিৎ পূর্ব হইতেই উৎকলবাসী বৌদ্ধগণ শৈবধর্মাবলম্বী রাজগণ কর্তৃক উৎপীড়িত হইয়া ক্রমশঃ শৈবধর্মাবলম্বন করেন, এবং অনেক বৌদ্ধ উড়িয়া দেশ পরিত্যাগপূর্বক পলায়ন করেন ; ষষ্ঠ শতাব্দীতে শৈবধর্মাবলম্বী যজাতি-কেশরী রাজা কর্তৃক ভুবনেশ্বরের প্রসিদ্ধ মন্দির নির্মিত হয়।" যখন পঞ্চম শতাব্দী হইতে উৎকলের বৌদ্ধগণ উৎপীড়নের হস্তে পতিত হইয়া ক্রমশঃ দেশ পরিত্যাগ ও ধর্ম পরিত্যাগ করিয়া আসিতেছিলেন, এমত অবস্থায় অষ্টম শতাব্দী পর্যন্ত বৌদ্ধধর্মাবলম্বী উৎকলদেশে থাকা, অনুমান করা যায় না। যে যুক্তিতে, যে কারণে মহম্মদের অত্যাচার এবং উৎপীড়ন আরম্ভ হইবার ২।৩ শত বর্ষ পরে আরবরাজ্যে অন্যধর্মাবলম্বী বেশী লোক থাকা অনুমান করা যাইতে পারে না, সেই যুক্তি অবলম্বন করিয়া দেখা যায়, শৈবধর্মাবলম্বী কেশরীবংশীয় রাজাদিগের পীড়ন আরম্ভের দুই তিন শতাব্দীর পরে বৌদ্ধধর্মাবলম্বীরা উৎকলদেশ হইতে নির্মূল হইয়াছিলেন, এরূপ অনুমানও অসঙ্গত বোধ হয় না। এদিকে ডাক্তার রাজেন্দ্রলাল মিত্র পুরীর মন্দিরে বুদ্ধদেবের, এবং জগন্নাথদেবও বৌদ্ধদেবের আক্ষরিক মূর্তি প্রমাণ করিতেছেন, তাহা হইলে তৃতীয় ইন্দ্রদ্যুম্ন রাজার তিনশত বর্ষ পূর্বে, এমন কি ভুবনেশ্বরের মন্দির নির্মিত হইবার পূর্বে, পুরীর মন্দির নির্মিত হইবার সম্ভাবনা এবং তৃতীয় ইন্দ্রদ্যুম্ন রাজা বৌদ্ধধর্মাবলম্বী ছিলেন, এরূপ স্বীকার করিতে হয়, নচেৎ তৃতীয় ইন্দ্রদ্যুম্ন রাজা বৌদ্ধদেবতার ঐ মন্দিরের কেবলমাত্র সংস্কারকার্য সম্পন্ন করত, বৌদ্ধদেবতার আক্ষরিক মূর্তিকে "জগন্নাথ" নাম প্রদান করিয়া বিষ্ণুধর্মের উন্নতিসাধন করিয়াছিলেন, এই মাত্র অনুমানসিদ্ধ হইতে পারে। পুরীর মন্দিরটি খ্রীঃ দ্বাদশ শতাব্দীর বহুকাল পূর্বে নির্মিত হইবার আরও একটি যুক্তিসঙ্গত কারণ হণ্টার সাহেবের মতেই প্রকাশ হইতেছে ; হণ্টার সাহেব নিজকৃত ইতিহাসে লিখিয়াছেন, "শাক্যসিংহের মৃত্যুর পরে বৌদ্ধগণ উৎকলে শাক্যসিংহের দুইটি দণ্ড আনিয়াছিলেন ; এবং সেই দুইটি দণ্ডকে রথারোহণ করাইয়া টানা হইত, বর্ষে বর্ষে তদ্ধেতুক খুব জাঁকজমকের মেলা হইত। যখন শৈবধর্মাবলম্বিগণ বৌদ্ধদিগকে উৎপীড়ন আরম্ভ করেন, তখন একজন বৌদ্ধ ঐ দুইটি দণ্ড লইয়া সিংহলদ্বীপে পলায়ন করেন।" হণ্টার সাহেবের এই কথাই প্রমাণ করিতেছে যে, শৈবধর্মাবলম্বী কেশরীবংশীয় রাজাদিগের প্রাদুর্ভাব বৃদ্ধি হইবার পূর্বে অর্থাৎ খ্রীঃ ষষ্ঠ শতাব্দীর আরও পূর্বে পুরীর মন্দির নির্মিত, এবং দণ্ডোৎসব উপলক্ষে

চারিদিকে চারিটি গেট। জগন্নাথের বাটীর ফ্লোর উচ্চতায় ৮।৯ হস্ত হইবে। মন্দিরের সম্মুখস্থ তিনটি লাটমন্দির সংস্থাপিত আছে, উক্ত তিনটি লাটমন্দিরের কার্ণিসের চতুষ্পার্শ্বে এবং গাত্রে ঈদৃশ জঘন্য অশ্লীলভাবব্যঞ্জক মূর্তি সকল সংস্থাপিত আছে, তাহা দেখিলে ঐ মন্দির দেবমন্দির না বলিয়া "নরকধাম" বলিতে ইচ্ছা হয়।† উক্ত মন্দিরের সিংহদ্বারের সম্মুখে "অরুণস্তম্ভ" সংস্থাপিত আছে। স্তম্ভটি প্রায় ৪০ ফুট উচ্চ; ব্যাস প্রায় গড়ে আড়াই ফুট; ঐ

রথযাত্রার প্রথা প্রচলিত হওয়াই সম্ভব। যজাতিকেশরী রাজার সময়ে খ্রীঃ ষষ্ঠ শতাব্দীতে ভুবনেশ্বরের প্রসিদ্ধ শিবমন্দির নির্মিত হইয়াছিল, এরূপ স্থলে খ্রীঃ পঞ্চম শতাব্দীতে বৌদ্ধদিগের উন্নতাবস্থার সময়ে পুরীর মন্দির নির্মিত হওয়াই সম্ভব। উৎকলের "মাদলাপঞ্জিকা" প্রভৃতির দ্বারা যে সব প্রমাণ সংগ্রহ করা হইয়াছে, তাহা তত ঠিক বোধ হয় না। তাহার প্রধান কারণ, কেশরী বংশীয় রাজাদিগের সময়ে অথবা ইন্দ্রদ্যুম্ন রাজার সময়ে উড়িয়া ভাষাই অসম্পূর্ণাবস্থা ছিল, তৎকালে "মাদলাপঞ্জিকা" প্রভৃতি প্রস্তুত হওয়া কদাচই সঙ্গত বোধ হয় না; "মাদলাপঞ্জিকা" প্রভৃতি গঙ্গাপতি বংশীয়দিগের সময়ে প্রচলিত হওয়াই সম্ভব। তখন ঐ পঞ্জিকাদির দ্বারা বহু প্রাচীনকালের বিবরণ সংগ্রহ হওয়া ঠিক বলা যাইতে পারে না। বোধ হয় ইন্দ্রদ্যুম্ন রাজা পুরীর মন্দিরের লাটমন্দির সিংহদ্বার প্রভৃতি নির্মাণকার্য সম্পন্ন করিয়াছিলেন, তজ্জন্যই ঐ মন্দিরও তাঁহার কীর্তি বলিয়া প্রচারিত হইয়া থাকিবে।

† হণ্টার প্রভৃতি উৎকলের ইতিহাস-লেখকগণ ঐ জঘন্য মূর্তিসকল মন্দিরের সঙ্গে সংস্থাপিত হইয়াছে, কি অন্য কোন সময়ে সংস্থাপিত হইয়াছে, তদনুসন্ধানে ঔদাসীন্য অবলম্বন করিয়া গিয়াছেন। আমি ইহার অনুসন্ধান করিয়াছিলাম; প্রথমে দেখিলাম, প্রধান মন্দির এবং লাটমন্দির প্রস্তরনির্মিত; শ্রেষ্ঠ মন্দিরটির উত্তর পার্শ্বের গাত্রে একস্থানে একটিমাত্র ঐরূপ জঘন্যমূর্তি আছে; কিন্তু সেটি কেবলমাত্র চুনবালির জমাটে প্রস্তুত হইয়াছে; এইখানেই আমার সন্দেহ হয় যে, মন্দিরনির্মাণের সময় ঐ মূর্তিটি সংস্থাপিত হইলে, ঐ মূর্তিটি প্রস্তরখোদিত হইত এবং গাঁথুনির সঙ্গে সংযুক্ত হইত; তৎপরে সম্মুখের প্রথম লাটমন্দিরের সম্মুখের গাত্রে কৃষ্ণবর্ণ প্রস্তরের যতগুলিন জঘন্য মূর্তি সংস্থাপিত দেখিলাম, ঐ সকল মূর্তি লাটমন্দিরের গাত্র সাবধানে খোদিত হইয়া তন্মধ্যে সংস্থাপিত হইয়াছে, বড় লাটমন্দিরের চতুষ্পার্শ্বে যে সকল জঘন্যমূর্তি আছে, তাহাও চূর্ণ বালির জমাট করা প্রস্তুত; তাহাতে স্পষ্ট বোধ হইল, ঐ সকল জঘন্য মূর্তি মন্দিরনির্মাণের বহুকাল পরে সংস্থাপিত হইয়াছে। এমন কি, ঐ সকল জঘন্যমূর্তি মুসলমানদিগের রাজত্বের পরে সংস্থাপিত হইয়াছে এরূপ অনুমান অসঙ্গত বোধ হয় না। মুসলমানগণ পুরীর মন্দিরের গাত্রে

স্তম্ভটির নিম্নদেশে কৃষ্ণবর্ণ প্রস্তরের ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র হংসমালা বেষ্টিত। ঐ হংসমালা দেখিলে চমৎকৃত হইতে হয়। ঐ স্তম্ভটি কণারক নামক স্থানের সূর্যমন্দিরের সম্মুখে সংস্থাপিত থাকে, মহারাষ্ট্রীয় রাজাদিগের সময়ে ঐ স্তম্ভটিকে তিনখণ্ড করিয়া, পুরীতে আনা হয়; এবং জগন্নাথের বাটীর সম্মুখে সংস্থাপিত করা হয়। পুরীতে তিনটি প্রকাণ্ড পুষ্করিণী আছে, "ইন্দ্রদ্যুম্ন" একটির নাম, দ্বিতীয়টির নাম "মার্কণ্ড", তৃতীয়টীর নাম "নরেন্দ্র", এইটি অপেক্ষাকৃত আধুনিক।

পুরীর প্রায় দেড় ক্রোশ দূরবর্তী—"লোকনাথ" নামক একটি শিব আছেন। ঐ শিবের মস্তক হইতে জলস্রোত নির্গত হইতেছে।

ভুবনেশ্বর—এই মন্দিরের নির্মাণকার্য যজাতিকেশরী রাজার সময়ে সম্পন্ন হয়। অর্থাৎ খ্রীঃ ষষ্ঠ শতাব্দীতে প্রস্তুত হয়; প্রায় তেরশত বর্ষ অতীত হইল ঐ মন্দিরের নির্মাণ-কার্য সমাধা হইয়াছে। নির্মাণ করিতে একশত বর্ষ অতিবাহিত হইয়াছিল। উড়িয়া শৈবধর্মাবলম্বীদিগের ঐ কীর্তি দেখিলে চমৎকৃত হইতে হয়। মন্দিরটি যেমন বৃহৎ, সেইরূপ আবার প্রশস্ত। মন্দিরের গাত্রে নানাপ্রকার প্রস্তরময়ী মূর্তি সন্নিবেশিত আছে। একটি মূর্তির বুটজুতা আছে, তদ্দৃষ্টে বোধহয় তৎকালে বুটজুতার ব্যবহার প্রচলিত ছিল।* মন্দিরের মধ্যস্থলে, চতুষ্পার্শ্বে প্রাচীর এবং দেবালয় সকল সংস্থাপিত, সম্মুখে প্রকাণ্ড

যে সকল খোদিত ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র দেবমূর্তি ছিল, তৎসমুদয়ের হস্তপদ, নাসিকা, গ্রীবা প্রভৃতির কোন না কোন অংশ ভগ্ন করিতে ত্রুটি করে নাই; যদ্যপি তৎকালে ঐ সকল মূর্তি মন্দিরে সন্নিবেশিত থাকিত, তাহা হইলে, ঐ সকল মুর্তিরও অন্ততঃ কোন না কোন অঙ্গ ভাঙ্গিতে ত্রুটি করিত না, ঐ সকল মূর্তি কদাচই অক্ষত-অঙ্গ থাকিত না; ইহার দ্বারা স্পষ্টই জানা যাইতেছে, ঐ সকল মূর্তি মুসলমানদিগের শেষকালে যখন শৈব তান্ত্রিকদিগের হস্তে মন্দিরের কার্যভার পতিত হইয়াছিল, সেই সময়ে তান্ত্রিক পুরোহিতগণ "বটুক ভৈরব" নামক একটি শিবমূর্তি জগন্নাথের সম্মুখে প্রতিষ্ঠিত করেন, এবং বোধ হয় সেই সময়েই তাঁহারাই ঐ সকল জঘন্য মূর্তি লাটমন্দির প্রভৃতির গাত্রে সন্নিবেশিত করত আপনাদের পাপরুচির চিহ্ন সংস্থাপিত করেন। তৎপরে যখন তপ্ত মুদ্রাধারী বৈষ্ণবদিগের হস্তে মন্দিরের ভার পতিত হয় তখন তাঁহারা জগন্নাথের সম্মুখ হইতে বটুক ভৈরবের মূর্তি উঠাইয়া সমুদ্রে বিসর্জন করেন। এই ঘটনা বোধ হয় মহারাষ্ট্রীয়দিগের আমলদারিতে সম্পন্ন হয়।

* ইতিহাস-লেখকদিগের মতে গ্রীক্‌গণ তৎকালে উৎকল দেশে আসিয়াছিলেন, তাঁহাদের পাদুকা ঐরূপ ছিল, তদ্দৃষ্টেই মন্দিরের গাত্রে প্রস্তরময়ী মূর্তিতে বুটজুতা খোদিত হইয়াছে।

সিংহদ্বার, এবং অন্য তিনদিকে তিনটা বৃহৎ প্রবেশদ্বারও আছে ; এই মন্দির প্রাচীন উৎকলীয় লোকের সর্বোৎকৃষ্ট কীর্তি। এরূপ সুন্দর এবং সুগঠন মন্দির ভারতবর্ষের কুত্রাপিও নাই বলা অত্যুক্তি হয় না।

ভুবনেশ্বরে "মার্কণ্ডেশ্বর" নামক অপর একটি শিবালয় আছে। তাহার কার্যও অতি সুন্দর। ঐ দেবালয়টি মর্কটকেশরী রাজার সময়ে নির্মিত হইয়াছে বলিয়া ইতিহাসলেখকগণ বলেন। উক্ত দেবালয়ের মধ্যে প্রবেশদ্বারের দুই পার্শ্বে দুইখানি কৃষ্ণবর্ণ প্রস্তরফলকে উক্ত মন্দিরের বিবরণ লিখিত আছে ; আমি তাহা পড়িতে চেষ্টা করিতে গিয়া দেখিলাম, তাহার অক্ষর অনেকগুলি দেবনাগর, কতকগুলি বাঙ্গালা, আর এক্ষণে যে সকল উড়িয়া বর্ণমালা প্রচলিত, সেরূপ অক্ষরও মধ্যে মধ্যে আছে ; ঐ বিবরণ উল্লিখিত তিন প্রকার বর্ণমালাতে সম্পন্ন হইয়াছে, তদ্দৃষ্টে বেশ অনুভব হইল, মর্কটকেশরী রাজার সময়েও উড়িয়া বর্ণমালা পূর্ণাবস্থা প্রাপ্ত হয় নাই ; এবং বাঙ্গালাভাষা অথবা বাঙ্গালা বর্ণমালা তাহার বহুকাল পূর্বে পূর্ণাবস্থা প্রাপ্ত হইয়াছিল ; সংস্কৃত এবং বাঙ্গালা এই দুইভাষার বর্ণমালা হইতেই উড়িয়া বর্ণমালা প্রস্তুত হইয়াছে তাহা উপরোক্ত প্রস্তরফলকের লিখন দৃষ্টিমাত্রেই অনুভব হইবে। খ্রীঃ ষষ্ঠ শতাব্দীতে কেশরীবংশীয় রাজাদিগের সময়েও উড়িয়া বর্ণমালা সম্পূর্ণতা প্রাপ্ত হয় নাই।

ভুবনেশ্বরের নানা স্থানে প্রাচীন দেবমন্দির সকল সংস্থাপিত রহিয়াছে, ঐ সকল মন্দিরের গাঁথুনি কেবলমাত্র পাথরে পাথরে ঘর্ষণ করিয়া, পাথরের উপর পাথর সংস্থাপিত হইয়াছে ; চুন বালি শুরকি অথবা অপর কোনরূপ মসলা দ্বারা ঐ সকল মন্দিরের গাঁথুনি হয় নাই ; শত শত বর্ষাতীত হইল, তথাপি ঐ সকল মন্দির অটলভাবে অদ্যাপি বর্তমান রহিয়াছে। ভুবনেশ্বরের পূর্ব-উত্তরাংশে জঙ্গলমধ্যে একটি অত্যাশ্চর্য প্রাচীন মন্দির আছে ; ঐ মন্দিরের গাত্রে নানারূপ মূর্তিসকল খোদিত। মন্দিরমধ্যে যে মূর্তি আছে, তাহার নিম্নদেশ হইতে জলস্রোত নির্গত হইয়া একটি কুণ্ডমধ্যে পতিত হইতেছে, পুনরায় সেই কুণ্ড হইতে জল নির্গত হইয়া মাঠে পতিত হইতেছে, ঐ মন্দিরের প্রায় দুই ক্রোশ দূরে পর্বত আছে, বোধ হয় সেই পর্বত হইতে জলস্রোত নিম্নদেশ দিয়া অলক্ষিতভাবে ঐ স্থানে আসিতেছে। ঐ স্থানটি অতিশয় রমণীয়। ভুবনেশ্বরের প্রাচীন মন্দির যতগুলি আছে, সকলগুলিই উড়িয়াদিগের অসাধারণ ক্ষমতার পরিচয় প্রদান করিতেছে।

কণারক—এই স্থান কটক নগরীর পূর্ব-দক্ষিণ প্রায় ১৬।১৭ ক্রোশ দূরবর্তী সমুদ্রতীরবর্তী। এই স্থানে একটি সূর্যমন্দির প্রতিষ্ঠিত ছিল। মেঃ হণ্টারের মতে এই মন্দির খ্রীঃ দ্বাদশ শতাব্দীতে নির্মিত হইয়াছিল। যজাতিকেশরী

রাজা যে দশ সহস্র ব্রাহ্মণ যাজপুর নামক স্থানে বসবাস করাইয়াছিলেন, তাঁহাদের মধ্যে যাঁহারা সূর্যোপাসক ছিলেন, ঐ মন্দির তাঁহাদেরই কীর্তি। ঐ মন্দিরটি এক্ষণে ভাঙ্গিয়া গিয়াছে ; দূর হইতে দেখিলে বোধ হয় যেন একটি পর্বত উন্নত মস্তকে দণ্ডায়মান রহিয়াছে। ঐ মন্দিরের ১৪।১৫ ক্রোশ মধ্যে কোন পর্বতাদি প্রত্যক্ষ হয় না ; কিন্তু ঐ মন্দির প্রকাণ্ড প্রকাণ্ড প্রস্তরে নির্মিত হইয়াছিল। ঐ মন্দিরের সম্মুখদ্বারে একখানি বৃহৎ প্রস্তর সন্নিবেশিত ছিল, তাহাতে নবগ্রহের প্রতিমূর্তি খোদিত আছে ; ঐখানি আনুমানিক দুই বিঘা জমি সরাইয়া আনিতে গভর্নমেণ্টের বিস্তর অর্থ ব্যয়িত হইয়াছে, এমত স্থলে মন্দিরনির্মাণকালে ঐ প্রস্তরসকল বহু দূরদেশ হইতে কিরূপে কণারকে আনা হইয়াছিল, তাহা চিন্তা করিতে গিয়া আশ্চর্য হইতে হয়। এখন এত বিজ্ঞানের উন্নতি, এত কল, এত সুগম্য পথ, তথাচ ঐ প্রস্তরখণ্ড স্থানান্তরিত করিয়া সমুদ্রতীরে আনা দুরূহ ব্যাঁপার হইয়াছে, কিন্তু সেই প্রাচীনকালে উড়িয়াগণ অন্ততঃ ১৭।১৮ ক্রোশ দূর হইতে ঐ প্রস্তরখণ্ডকে আনিয়া মন্দিরের উপরে উঠাইয়াছিলেন, ইহাও সাধারণ ক্ষমতা এবং অধ্যবসায়ের কার্য নহে! এই মন্দিরের ভগ্নাবশেষ কার্যসকল দেখিলে প্রাচীন উৎকলীয়দিগকে ধন্যবাদ না দিয়া থাকা যায় না।

কটক—কটকের এক পার্শ্ব দিয়া মহানদী, অপর পার্শ্ব দিয়া কাঠযোড়ী নদী প্রবাহিত হইতেছে। ঐ দুই নদীর স্রোতে কটক শহর ভাঙ্গিয়া যাইতেছিল, সেই অপকার নিবারণ জন্য কাঠযোড়ী নদীর গর্ভ হইতে একটি প্রস্তরের পোস্তা গাঁথা হয় ; ঐ পোস্তা প্রায় তিন মাইল পথ ব্যাপ্ত ; কোন স্থানে ত্রিশ ফুট, কোন স্থলে ততোধিক উচ্চ ; মধ্যে মধ্যে প্রশস্ত ঘাট ; এবং প্রকাণ্ড প্রকাণ্ড স্তম্ভসকল নদীগর্ভ হইতে উত্থিত হইয়াছে, তাহার মধ্যে একটি স্তম্ভের গঠন-কৌশল দেখিলে প্রাচীন উড়িয়াগণ কতদূর ইঞ্জিনিয়ারিং বিদ্যাবিশারদ ছিলেন, তাহার চূড়ান্ত উদাহরণ প্রাপ্ত হওয়া যায়। বর্ষাকালে যখন অতিবেগে জলস্রোত প্রবাহিত হয়, তখন ঐ স্তম্ভ কটক রক্ষা করে। জলস্রোত বেগে আসিয়া শেষোক্ত স্তম্ভে আঘাত করে ; করিবামাত্রই জলস্রোত হ্রস্বতেজা হইয়া এপার ছাড়িয়া অপর পারে প্রধাবিত হইতে থাকে ;—আর কটকের পারে জলের আঘাত লাগিতে পারে না। এরূপ কৌশল অবলম্বন করা সাধারণ বুদ্ধির কার্য নহে। এই স্তম্ভ প্রায় আট শত বর্ষের অপেক্ষাও প্রাচীন হইবে ; উৎকলের ইতিহাস-লেখক স্টার্লিং সাহেব বলেন উড়িষ্যায় প্রাচীনকালে শবদাহের জন্য কর নির্ধারিত ছিল, সেই শবদাহ হইতে যে কড়ি আদায় হইত তদ্দ্বারাই ঐ পোস্তা সকল নির্মাণ হইয়াছে।

ধবলেশ্বর—মহানদীর মধ্যস্থলে একটি ক্ষুদ্র পর্বত এবং অল্পাংশ উচ্চ ভূমি আছে ; ঐ স্থানে একটি মন্দির আছে ; সেই মন্দিরের সম্মুখে কৃষ্ণবর্ণ প্রস্তরের নানাপ্রকার মূর্তিসকল পড়িয়া রহিয়াছে। তন্মধ্যে অনেক মূর্তিই ভগ্নদেহ। ঐ সকল মূর্তির গাত্রে যে সকল অলঙ্কার খোদিত দেখিয়াছি, তন্মধ্যে অনেক-গুলি অলঙ্কার এ পর্যন্ত আমাদের দেশে ব্যবহার হইয়া থাকে। কটকের কাঠ-যোড়ী নদীর এবং মহানদীর পরপারের পর্বতে বৌদ্ধদিগের খোদিত গুহাসকল আছে, কিন্তু শৈবগণ ঐ সকল গুহার উপরে চূড়া নির্মাণ করত তন্মধ্যে শিব সংস্থাপন করিয়া "শিবমন্দির" "শিবাল" নাম প্রদান করিয়াছেন।

যাজপুর—এই স্থান বৈতরণী নদীর তীরবর্তী ; এখানে প্রাচীনকালের প্রতিষ্ঠিত দুটি প্রস্তরময় স্তম্ভ আছে ; এই স্থান এক সময়ে কেশরীবংশীয় রাজা-দিগের কালে সমৃদ্ধিশালী ছিল, এখন কেবল নাম মাত্র আছে। বালেশ্বর প্রদেশে প্রাচীন কীর্তি প্রায় প্রত্যক্ষগোচর হয় না।

এই সকল প্রসিদ্ধ দেবালয় ভিন্ন অপরাপর অনেক ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র প্রাচীন দেবালয় প্রভৃতি উড়িষ্যাতে বিদ্যমান আছে ; সে সব বিষয়ের উল্লেখের তত আবশ্যক নাই, এক্ষণে উৎকলবাসীদিগের অন্যান্য বিষয়ের ক্ষমতা কতদূর, তাহারও কিছু বলা আবশ্যক হইতেছে।

সার্বভৌমিক রাজা গৌড়াধিপতি দেবল দেবের সময়ে উৎকল প্রদেশ যদিও গৌড় দেশের অধীনস্থ ছিল, পালবংশীয় রাজাদিগের সময়েও উৎকল প্রদেশ যদিচ পঞ্চগৌড়ের অন্তর্গত ছিল, এবং বঙ্গদেশীয় গঙ্গাপতি বংশীয় রাজাগণ যদিচ বহুকালাবধি উৎকল দেশে একাধিপত্য সংস্থাপন করিয়াছিলেন, কিন্তু এক সময়ে উড়িয়ারাও বঙ্গভূমির ত্রিবেণী পর্যন্ত রাজ্য বিস্তার করিয়া স্বজাতীয় বীরত্বের পরিচয় প্রদান করিতে ত্রুটি করেন নাই। তবে এইমাত্র বলা সঙ্গত, বিদেশ আক্রমণ করিতে যে সকল কৌশল অবলম্বন করা আবশ্যক, গঙ্গাপতি বংশীয় রাজাদিগের নিকটই উড়িয়াগণ তাহা শিক্ষা প্রাপ্ত হইয়াছিলেন, কারণ গঙ্গাপতি রাজাদিগের পূর্বে উড়িয়াগণ কোনকালে কখন ভিন্নদেশ আক্রমণ করিয়াছিলেন তাহার প্রমাণ প্রাপ্ত হওয়া যায় না।

উৎকল রাজ্য যেটুকু বঙ্গদেশীয় গবর্নমেণ্টের অধীনে আছে, কেবলমাত্র সেইটুকু উৎকল প্রদেশ নহে, উৎকলের অনেকাংশ মান্দ্রাজ প্রেসিডেন্সির এবং মধ্যভারতবর্ষের অন্তর্গত হইয়া রহিয়াছে ; এই বহুজনপূর্ণ প্রদেশকে উৎকল-বাসীরাই সুশাসনে রাখিয়া স্বজাতীয় প্রভুত্ব রক্ষা করিয়াছিলেন, তদ্দ্বারা তাঁহাদের বীরত্বের বিশেষ পরিচয় প্রাপ্ত হওয়া যায়। এক্ষণে বাঙ্গালা প্রেসিডেন্সিতে উৎকলে ১৮টি গড়জাত মহল আছে, এবং মান্দ্রাজ প্রেসিডেন্সি,

মধ্যভারতবর্ষের অন্তর্গত আরও কয়েকটি গড়জাত মহল আছে ; ঐ সকল প্রদেশের রাজাগণ ইংরাজ গবর্নমেণ্টকে সামান্য মাত্র কর প্রদান করেন,— তাঁহাদের রাজত্বের বিচারকার্য সকলেই তাঁহারা স্বয়ং সম্পন্ন করিয়া থাকেন, তাঁহাদের জেলখানা আছে, তিনবর্ষ মিয়াদের যোগ্য ফৌজদারি মোকর্দমা তাঁহারাই করেন, ততোধিক অপরাধী যাহারা, তাহাদের বিচার উড়িষ্যার স্থানীয় কমিশ্যনর সাহেবকে সোপর্দ করিতে হয়। এই নিয়ম অদ্যাপি প্রচলিত থাকাতে বঙ্গদেশ অপেক্ষা উড়িষ্যার অনেকটা স্বাধীনতা এ পর্যন্ত অক্ষত রহিয়াছে।

বহুকাল হইতে উড়িয়াগণ ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র জাহাজ নির্মাণকার্যে সুশিক্ষিত হইয়া আপনারা সমুদ্রপথে জাহাজ চালাইতে সক্ষম হইয়াছিল।* অদ্যাপি উড়িয়াগণ ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র জাহাজ নির্মাণ করিয়া বঙ্গোপসাগর দিয়া বাণিজ্যকার্য সম্পন্ন করিতেছেন। যদিচ চট্টগ্রামের কয়েকজন বাঙ্গালীর জাহাজ আছে সত্য, কিন্তু তাহাদের প্রধান প্রধান জাহাজে কাপ্তেন ইয়ুরোপীয়, কিন্তু উৎকলবাসীদিগের জাহাজ, উড়িয়াগণ আপনারাই চালাইয়া থাকেন, উড়িষ্যার জাহাজে কাপ্তেন, মালিম, ইঞ্জিনিয়ার এবং অপরাপর সকল কার্যকারকই উড়িয়া। জাহাজ নির্মাণ এবং সমুদ্রপথে জাহাজ পরিচালন সম্বন্ধে উড়িয়াগণ সমগ্র ভারতসন্তানের অপেক্ষা শ্রেষ্ঠ।

আশ্বিন-কার্তিক ১২৮৫

*বঙ্গবাসীদিগের নিকটেই উড়িয়াগণ জাহাজনির্মাণ শিক্ষা করিবারই সম্ভব। বঙ্গদেশের রাজা সিংহবাহুর পুত্র বিজয়সিংহ খ্রীষ্টের ৪৭৭ বর্ষ পূর্বে সিংহল অধিকার করেন ; তাঁহার সময়ে বঙ্গদেশে জাহাজ নির্মাণ হইত, তিনি সমুদ্র-পথেই পঞ্চশত পরিচারক সহিত সিংহলে গমন করেন। জাহাজ ভিন্ন সিংহলে গমন করা সম্ভব হইতে পারে না ; গঙ্গাপুত্রবংশীয় রাজাগণ যখন তমলুকে রাজত্ব করেন, তৎকালে তমলুকে জাহাজ নির্মাণ হইবার প্রমাণ প্রাপ্ত হওয়া যায় ; উড়িষ্যায় তৎকালে জাহাজ নির্মাণের কোনরূপ প্রমাণ প্রাপ্ত হওয়া যায় না, বোধ হয় যখন গঙ্গাবংশীয় রাজাগণ উৎকল অধিকার করত উৎকলে প্রভুত্ব সংস্থাপন করেন, সেই সময় হইতে উৎকলবাসীরা বঙ্গদেশীয়দিগের নিকট হইতে জাহাজ নির্মাণ শিক্ষা করেন, এবং সমুদ্রপথে গমনাগমন দ্বারা বাণিজ্য ব্যবসায় আরম্ভ করিয়াছিলেন।

৮ / দর্শন-প্রসঙ্গ

চার্বাক দর্শন

এতদ্দেশীয় পণ্ডিতদিগের মতে ভারতবর্ষীয় দর্শনশাস্ত্রসমূহ আস্তিক ও নাস্তিক—এই দুই ভাগে বিভক্ত। যে যে দর্শনে বেদের প্রমাণ অগ্রাহ্য করা হইয়াছে, সেইগুলি নাস্তিক, যথা বৌদ্ধ ও চার্বাক দর্শন; এবং যে যে দর্শনে বেদ প্রামাণ্য বলিয়া গণ্য হইয়াছে, সে সমুদায় আস্তিকপদবাচ্য, যদিও তন্মধ্যে কোন-কোনটি নিরীশ্বর, যথা কাপিল ও জৈমিনি দর্শন। যে সাংখ্যে ঈশ্বর অসিদ্ধ এবং যে পূর্বমীমাংসায় মন্ত্রাতিরিক্ত দেবতার অস্তিত্ব স্বীকৃত হয় নাই, সে সাংখ্য ও মীমাংসা আস্তিক; এবং বেদবহির্ভূত বৌদ্ধ সর্বসৃষ্টিকর্তা আদি বৌদ্ধ মানিলেও নাস্তিক। ধন্য শব্দপ্রয়োগের কৌশল! এতৎ প্রবন্ধে আমরা নাস্তিক-দর্শনান্তর্গত চার্বাক দর্শনের সমালোচনা করিব।

কয়েকটি প্রধান বিষয়ে এতদ্দেশীয় অপর সমুদায় দর্শনের সহিত চার্বাক দর্শনের বিবাদ। উত্তর ও পূর্ব মীমাংসা, ন্যায় ও বৈশেষিক, সাংখ্য, যোগ ও বৌদ্ধ, সকল দর্শনেই পরলোক স্বীকৃত হইয়াছে। কেবল চার্বাকমতাবলম্বীরাই পরলোক মানেন না। এজন্য চার্বাক দর্শনের আর-একটি নাম লোকায়ত দর্শন, কেননা ইহলোকই ইহার সর্বস্ব।

সকল দর্শনেই অনুমান প্রমাণমধ্যে পরিগণিত হইয়াছে; কেবল চার্বাক দর্শনেই প্রত্যক্ষাতিরিক্ত প্রমাণ অগ্রাহ্য। যাহা চক্ষু কর্ণ প্রভৃতি ইন্দ্রিয়ের অগোচর, চার্বাক-শিষ্যেরা তাহার অস্তিত্ব স্বীকার করেন না। এই নিমিত্তই তাঁহারা ঈশ্বর, পরলোক ও দেহাতিরিক্ত আত্মা মানেন না। সুতরাং চার্বাক দর্শনকে নাস্তিক দর্শন বলা অন্যায় নহে।

এতদ্দেশীয় অন্যান্য দর্শনকারেরা দুঃখমিশ্রিত সংসারের সুখ চাহেন না। তাঁহারা যে মোক্ষ প্রার্থনা করেন তাহাতে সুখ দুঃখ কিছুই নাই; সংসারবন্ধন-বিমোচন, প্রবৃত্তিদ্বেষের নির্বাণ, আন্তরিক স্থৈর্য, ইহাই তাঁহাদিগের কামনা। কেবল চার্বাকমতে সাংসারিক সুখই জীবনের উদ্দেশ্য।

মাধবাচার্য সর্বদর্শনসংগ্রহে চার্বাককে "বৃহস্পতিমতানুসারী নাস্তিকশিরোমণি" বলিয়া বর্ণনা করিয়াছেন। বৃহস্পতি বা চার্বাক লিখিত কোন গ্রন্থ দেখা যায় না। কেবল এইমাত্র বলিতে পারা যায় যে মাধবাচার্য পশ্চাল্লিখিত শ্লোকগুলি বৃহস্পতির উক্ত বলিয়া উদ্ধৃত করিয়াছেন—

ন স্বর্গো নাপবর্গো বা নৈবাত্মা পারলৌকিকঃ।
নৈব বর্ণাশ্রমাদীনাং ক্রিয়াশ্চ ফলদায়িকাঃ॥
অগ্নিহোত্রং ত্রয়োবেদাস্ত্রিদণ্ডং ভস্মগুণ্ঠনম্।
বুদ্ধিপৌরুষহীনানাং জীবিকা ধাতৃনির্মাতা॥
পশুশ্চেন্নিহতঃ স্বর্গং জ্যোতিষ্টোমে গমিষ্যতি।
স্বপিতা যজমানেন তত্র কস্মান্ন হিংস্যতে॥
মৃতানামপি জন্তূনাং শ্রাদ্ধং চেত্তৃপ্তিকারণম্।
গচ্ছতামিহ জন্তূনাং ব্যর্থং পাথেয়কল্পনম্॥
স্বর্গস্থিতা যদা তৃপ্তিং গচ্ছেয়ুস্তত্র দানতঃ।
প্রাসাদস্যোপরিস্থানামত্র কস্মান্ন দীয়তে॥
যাবজ্জীবেৎ সুখং জীবেদৃণং কৃত্বা ঘৃতং পিবেৎ।
ভস্মীভূতস্য দেহস্য পুনরাগমনং কুতঃ॥
যদি গচ্ছেৎ পরং লোকং দেহাদেষ বিনির্গতঃ।
কস্মাদ্ভূয়োন চায়াতি বন্ধুস্নেহসমাকুলঃ॥
ততশ্চ জীবনোপায়ো ব্রাহ্মণৈর্বিহিতস্ত্বিহ।
মৃতানাং প্রেতকার্যাণি নত্বন্যদ্বিদ্যতে কচিৎ॥
ত্রয়ো বেদস্য কর্তারো ভণ্ড ধূর্ত নিশাচরাঃ।
জর্ফরী তুর্ফরীত্যাদি পণ্ডিতানাং বচঃ শ্রুতম্॥
অশ্বস্যাত্রহি * * * পত্নীগ্রাহ্য প্রকীর্তিতম্।
ভণ্ডৈস্তদ্বৎ পরঞ্চৈব গ্রাহ্যজাতং প্রকীর্তিতম্।
মাংসানাং খাদনং তদ্বন্নিশাচর সমীরিতম্॥

"স্বর্গ, অপবর্গ বা পরলোকগামী আত্মা নাই; বর্ণাশ্রমাদির কোন ক্রিয়াও ফলদায়িনী হয় না। অগ্নিহোত্র, তিনবেদ, ত্রিদণ্ড ও ভস্মলেপন বুদ্ধি-পৌরুষহীনদিগেরই ধাতৃনির্মিত জীবিকা। যদি জ্যোতিষ্টোম যজ্ঞে নিহত পশু স্বর্গে গমন করে, তবে যজমান কেন স্ব পিতাকে বলিদান করে না? যে জন্তুগণ মরিয়াছে, শ্রাদ্ধে যদি তাহাদিগেরও তৃপ্তি জন্মে, তবে পর্যটকদিগের পাথেয় সঙ্গে রাখিবার প্রয়োজন নাই। যদি স্বর্গস্থিত লোকে ভূতলস্থ দানে তৃপ্তিপ্রাপ্ত হয়, তবে প্রাসাদোপরিস্থিত ব্যক্তিবর্গের তৃপ্তিনিমিত্ত ভূতলে

অন্ন কেন না দাও ? যতদিন জীবিত থাক, সুখে জীবনযাত্রা নির্বাহ কর ; ঋণ করিয়াও ঘৃত খাও ; ভস্মীভূত দেহের পুনরাগমন কোথায় ? যদি দেহ হইতে নির্গত হইয়া কেহ পরলোকে যায়, তবে বন্ধুস্নেহে আকুল হইয়া কেন ফিরিয়া না আইসে ? সুতরাং মৃতদিগের প্রেতকার্য বিহিত করা ব্রাহ্মণদিগের জীবনোপায় মাত্র ; অন্য কিছু নহে। তিন বেদের কর্তা ভণ্ড, ধূর্ত ও নিশাচর। জর্ফরী তুর্ফরী ইত্যাদি পাণ্ডিতদিগের বচন সকলেই শুনিয়াছে। লিখিত আছে যে অশ্বমেধে * * * রাজপত্নী ধরিবেন। ভণ্ডগণ ইত্যাকার কত কি ধরিবার কথা লিখিয়াছে। তদ্রূপ মাংসভক্ষণ নিশাচরনির্দিষ্ট।"

কোন্ সময়ে চার্বাক বা বৃহস্পতির মত প্রচারিত হয়, স্থির করা কঠিন। বিষ্ণুপুরাণে ইহার প্রতি কটাক্ষ লক্ষিত হয়, যথা—

অন্যানপ্যন্য পাষণ্ড প্রকারৈর্বহুভির্দ্বিজ।
দৈতেয়ান্ মোহয়ামাস মায়ামোহ বিমোহকৃৎ॥
স্বল্পেনৈব হি কালেন মায়ামোহেন তেঽসুরাঃ।
মোহিতাস্তত্যজুঃ সর্বাং স্ত্রয়ীমার্গাশ্রিতাং কথাং॥
কেচিদ্ হি নিন্দাং বেদানাং দেবানাং অপরে দ্বিজ।
যজ্ঞকর্মকলাপস্য তথান্যেচ দ্বিজন্মনাং॥
নৈতদ্যুক্তিসহং বাক্যং হিংসা ধর্মায় নেষ্যতে।
হবিংষ্যনলদগ্ধানি ফলায়েত্যর্ভকোদিতং॥
যজ্ঞৈরনেকৈর্দেবত্বমবাপ্যেন্দ্রেণ ভুজ্যতে।
শম্যাদি যদি চেৎ কাষ্ঠং তদ্বরং পত্রভুক্ পশুঃ॥
নিহতস্য পশোর্যজ্ঞে স্বর্গপ্রাপ্তির্যদীষ্যতে।
স্বপিতা যজমানেন কিন্নু তস্মান্ন হন্যতে॥
তৃপ্তয়ে জায়তে পুংসো ভুক্ত মন্যেন চেৎ ততঃ।
দদ্যাচ্ছ্রাদ্ধং শ্রদ্ধায়ন্নং ন বহেয়ুঃ প্রবাসিনঃ॥
জন শ্রদ্ধেয় মিত্যেতদবগম্য ততোবচঃ।
উপেক্ষ্য শ্রেয়সে বাক্যং রোচতাম্ যন্ময়েরিতং॥
ন হ্যাপ্তবাদা নভসো নিপতন্তি মহাসুরাঃ।
যুক্তিমদ্বচনং গ্রাহ্যং ময়া ন্যৈশ্চভবদ্বিধৈঃ॥
মায়ামোহেন দৈতেয়াঃ প্রকারৈর্বহুভিস্তথা।
ব্যুত্থাপিতা যথা নৈষাং ত্রয়ীং কশ্চিদরোচয়ৎ॥
ইত্থমুন্মার্গযাতেষু তেষু দৈত্যেষু তেঽমরাঃ।
উদ্যোগং পরমং কৃত্বা যুদ্ধায় সমুপস্থিতাঃ॥

ততো দেবাসুরং যুদ্ধং পুনরেবাভবদ্ দ্বিজ।
হতাশ্চতেঽসুরা দেবৈঃ সন্মার্গপরিপন্থিনঃ ॥
সধর্মকবচস্তেষাং অভূদ্যঃ প্রথমং দ্বিজ।
তেন রক্ষাভবৎ পূর্বং নেশুর্নষ্টেচতত্রতে ॥

"হে দ্বিজ, মায়ামোহ মায়াজাল বিস্তৃত করিয়া অন্যান্য বহুপ্রকারে দৈত্য-দিগকে বিমুগ্ধ করিলেন। মায়ামোহ কর্তৃক মোহিত হইয়া সেই অসুরসকল অল্পকালেই ত্রিবেদমার্গাশ্রিত কথা সমুদয় পরিত্যাগ করিল। হে দ্বিজ, কেহ বেদের নিন্দা করিতে লাগিল, কেহ বা দেবের, কেহ বা যজ্ঞকর্মকলাপের এবং কেহ বা ব্রাহ্মণের। হিংসায় ধর্ম হয় এ বাক্য যুক্তিসহ নহে, অগ্নিতে ঘৃত দগ্ধ করিলে কোন ফল আছে, ইহা বালকের উক্তি। ইন্দ্র যদি অনেক যজ্ঞ দ্বারা দেবত্ব প্রাপ্ত হইয়া শম্যাদি কাষ্ঠ ভক্ষণ করেন, পত্রভুক্ পশু তদপেক্ষা শ্রেষ্ঠ। যদি যজ্ঞে নিহত পশুর স্বর্গপ্রাপ্তি হয়, স্বপিতাকে যজমান কেন মারিয়া ফেলে না? যদি অন্যের ভুক্ত অন্নে পুরুষের তৃপ্তি হয়, তবে প্রবাসীদিগের উদ্দেশে শ্রদ্ধাপূর্বক শ্রাদ্ধ কর, তাহাদিগের আর অন্ন বহন করিতে হইবে না। তন্নিমিত্ত এই বাক্য জনশ্রদ্ধেয় ইহা বুঝিয়া শাস্ত্রের মোক্ষনির্ণায়ক বাক্য অব-হেলাপূর্বক আমি যাহা বলিতেছি তাহাতেই শ্রদ্ধা কর। হে মহাসুরগণ, আপ্তবাক্য আকাশ হইতে পড়ে না; আমার কাছে যুক্তিযুক্ত বচনই গ্রাহ্য। এইরূপ বিবিধ প্রকারে মায়ামোহ দৈত্যদিগের চিত্ত বিকৃত করিয়া দিলে, তিন বেদের প্রতি তাহাদিগের আর রুচি রহিল না। এই প্রকারে দৈত্যগণ বিপথগামী হইলে অমরগণ পরম উদ্যোগ করিয়া যুদ্ধে উপস্থিত হইলেন। অনন্তর, হে দ্বিজ, দেবাসুরে পুনরায় যুদ্ধ বাধিল; এবং দেবতাদিগের হস্তেই সন্মার্গপরিত্যাগী অসুরেরা নিহত হইল। হে দ্বিজ, প্রথমে অসুরদিগের যে ধর্ম-কবচ ছিল, তদ্দ্বারা পূর্বে তাহারা রক্ষিত হইত, এক্ষণে সেই ধর্ম-কবচ নষ্ট হওয়ায় তাহারা বিনষ্ট হইল!"

মহাভারতের শান্তিপর্বে চার্বাকের উল্লেখ দৃষ্ট হয়, যথা—

নিঃশব্দে চ স্থিতে তত্র ততো বিপ্রজনে পুনঃ।
রাজানং ব্রাহ্মণচ্ছদ্মা চার্বাকো রাক্ষসোঽব্রবীৎ ॥
তত্র দুর্যোধনসখা ভিক্ষুরূপেণ সংবৃতঃ।
সাক্ষঃ শিখী ত্রিদণ্ডীচ ধৃষ্টো বিগত সাধ্বসঃ ॥
বৃত সর্বৈস্তথা বিপ্রৈরাশীর্বাদ বিবক্ষুভিঃ।
পরং সহস্রৈ রাজেন্দ্র তপোনিয়ম সংশ্রিতৈঃ ॥

স দুষ্টঃ পাপমাশংসুঃ পাণ্ডবানাং মহাত্মনাং।
অনামন্ত্র্যৈব তান্ বিপ্রাং স্তমুবাচ মহীপতিং ॥

চার্বাক উবাচ।

ইমে প্রাহুর্দ্বিজাসর্বে সমারোপ্য বচো ময়ি।
ধিগ্ ভবন্তং কুনৃপতিং জ্ঞাতিঘাতিনমস্তু বৈ ॥
কিং তেন স্যাদ্ধি কৌন্তেয় কৃত্বেমং জ্ঞাতিসংক্ষয়ং।
ঘাতয়িত্বা গুরূংশ্চৈব মৃতং শ্রেয়ো ন জীবিতং ॥
ইতি তে বৈ দ্বিজাঃ শ্রুত্বা তস্য দুষ্টস্য রক্ষসঃ।
বিব্যথুশ্চুক্রুশুশ্চৈব তস্য বাক্য প্রধর্ষিতাঃ ॥
ততস্তে ব্রাহ্মণাঃ সর্বে সচ রাজা যুধিষ্ঠিরঃ।
ব্রীড়িতা পরমোদ্বিগ্নাস্তুষ্ণীমাসন্ বিশাম্পতে ॥

* * *

ব্রাহ্মণা উচুঃ।

"এষ দুর্য্যোধন-সখা চার্বাকো নাম রাক্ষসঃ।
পরিব্রাজকরূপেণ হিতং তস্য চিকীর্ষতি ॥
নবয়ং ব্রূম ধর্মাত্মন্ ব্যেতুতে ভয়মীদৃশং।
উপতিষ্ঠতু কল্যাণং ভবন্তং ভ্রাতৃভিঃ সহ ॥"

বৈশম্পায়ন উবাচ।

ততস্তে ব্রাহ্মণা সর্বে হুঙ্কারৈঃ ক্রোধমূর্চ্ছিতাঃ।
নির্ভৎসয়ন্তঃ শুচয়ো নিজঘ্নুঃ পাপ রাক্ষসং ॥
স পপাত বিনির্দগ্ধস্তেজসা ব্রহ্মবাদিনাং।
মাহেন্দ্রাশনি নির্দগ্ধঃ পাদপোঽঙ্কুরবানিব ॥

"অনন্তর দ্বিজগণ নিঃশব্দ হইলে ছদ্মব্রাহ্মণরূপী চার্বাক রাক্ষস রাজাকে বলিতে লাগিল। সেই অক্ষ-শিখা-ত্রিদণ্ড-সম্বলিত ভিক্ষুবেশধারী, নির্লজ্জ ও নির্ভীক দুর্যোধনসখা সহস্র সহস্র তপোনিরত আশীর্বাদ-প্রদানাভিলাষী বিপ্রবর্গে পরিবৃত হইয়া মহাত্মা পাণ্ডবদিগের অনিষ্ট কামনা করিয়া অন্য দ্বিজগণকে না জিজ্ঞাসিয়াই ভূপতিকে বলিল, "এই সমুদায় বিপ্রগণ আমার প্রতি আরোপ করিয়া বলিতেছেন, ধিক তুমি, কুনৃপতি, জ্ঞাতিঘাতী; হে কৌন্তেয়, জ্ঞাতি এবং গুরু ক্ষয় করিয়া তোমার কি লাভ হইল? তোমার পক্ষেই মৃত্যুই শ্রেয়; জীবন ধারণ নহে।" তখন সেই দুষ্ট রাক্ষসের বাক্য শুনিয়া দ্বিজগণ অত্যন্ত ব্যথিত ও ক্রুদ্ধ হইলেন এবং ব্রাহ্মণগণ ও রাজা যুধিষ্ঠির লজ্জিত ও চিন্তান্বিত হইয়া তুষ্ণীভাব অবলম্বন করিয়া রহিলেন। ব্রাহ্মণেরা

কহিলেন, "এ দুর্যোধন-সখা চার্বাকনামা রাক্ষস। পরিব্রাজকরূপে তাঁহার মঙ্গল কামনা করিতেছে। হে ধর্মাত্মন্, আমরা এ সকল বাক্য বলি নাই, আপনি ঈদৃশ জয় পরিত্যাগ করুন। ভ্রাতৃগণের সহিত আপনার কল্যাণ হউক।"

"বৈশম্পায়ন কহিলেন, অনন্তর সেই শুদ্ধাচারী ব্রাহ্মণ সকল ক্রুদ্ধ হইয়া ভর্ৎসনা করতঃ হুঙ্কার পরিত্যাগপূর্বক পাপ রাক্ষসকে বিনাশ করিলেন। বজ্র-দগ্ধ অঙ্কুরবান্ পাদপের ন্যায় ব্রহ্মবাদীদিগের তেজে দগ্ধ হইয়া সে পতিত হইল।"

রামায়ণের অযোধ্যাকাণ্ডে যখন মহর্ষি জাবালি রামচন্দ্রকে অরণ্যযাত্রা হইতে প্রতিনিবৃত্ত হইতে বলিতেছেন, তখন তাঁহার উক্তিমধ্যে চার্বাক মত লক্ষিত হয়, যথা—

অর্থধর্মপরা যে যে তাংস্তাংশ্চেচামি নেতরান্।
তেহি দুঃখমিহ পাপ্য বিনাশং প্রেত্য নেমিরে॥
অষ্টকাপিতৃদৈবত্য মিত্যয়ং প্রসৃতো জনঃ।
অন্নস্যোপদ্রবং পশ্য মৃতোহি কিমশিষ্যতি॥
যদি ভুক্তমিহান্যেন দেহমন্যস্য গচ্ছতি।
দদ্যাৎ প্রবসতাং শ্রাদ্ধং ন তৎপথ্যশনং ভবেৎ॥
দানসংবলনাহ্যেতে গ্রন্থামেধাবিভিঃ কৃতাঃ।
যজস্ব দেহি দীক্ষস্ব তপস্তপ্যস্ব সন্ত্যজ॥
স নাস্তি পরমিত্যেতৎ কুরুবুদ্ধিং মহামতে।
প্রত্যক্ষং যত্তদাতিষ্ঠ পরোক্ষং পৃষ্ঠতঃ কুরুঃ॥

"যাঁহারা শাস্ত্রার্থধর্মপরায়ণ, আমি তাঁহাদিগের জন্য ব্যাকুল হইতেছি। তাঁহারা ইহলোকে দুঃখ পাইয়া, অন্তে বিনাশ প্রাপ্ত হয়। লোকে পিতৃদেবতার উদ্দেশে অষ্টকা শ্রাদ্ধ করে; দেখ, ইহাতে কেবল অন্ন ধ্বংস হয়; মৃতব্যক্তি কি আহার করিতে পারে? যদি একের ভুক্ত অন্ন অন্যের দেহে যায় তবে প্রবাসীর উদ্দেশে শ্রাদ্ধ কর, তাহার পাথেয়ের প্রয়োজন হইবে না। যজ্ঞ কর, দান কর, দীক্ষিত হও, তপস্যা কর, বিষয়বাসনা ত্যাগ কর, এইরূপ দান-প্রবর্তক গ্রন্থ বুদ্ধিমান্ ব্যক্তিরা রচনা করিয়াছেন। ধর্ম কোন কাজের নয়, হে মহাত্মন্, তুমি এই বুদ্ধি কর। পরোক্ষ পশ্চাতে রাখিয়া, যাহা প্রত্যক্ষ তাহার অনুষ্ঠান কর।"

এ পর্যন্ত যে সকল শ্লোক উদ্ধৃত হইল সে সকল পর্যালোচনা করিলে এই-মাত্র প্রতীতি জন্মে যে বিষ্ণুপুরাণ, মহাভারত ও রামায়ণ তাহাদিগের বর্তমান আকার ধারণ করিবার অগ্রে চার্বাক দর্শন প্রচারিত হইয়াছিল। অনেকে

বিবেচনা করেন রামায়ণ ও মহাভারতের অনেকাংশ বুদ্ধদেবের আবির্ভাবের পূর্বে বিরচিত হইয়াছিল। কিন্তু এ মতটি প্রামাণ্য হইলেও আমাদিগের জানিবার উপায় নাই যে, আমাদিগের উদ্ধৃত শ্লোকগুলি সেই প্রথম রচিত ভাগের অন্তর্গত কি না। সুতরাং মহাভারতে চার্বাকের নাম এবং রামায়ণে তদীয় প্রত্যক্ষবাদ লক্ষিত হইলেও লোকায়ত দর্শন প্রচারের সময় নির্ণীত হইতেছে না। তবে এইমাত্র বলা যাইতে পারে যে, যখন শান্তিপর্বে দুর্যোধনের সমকালীন লোক বলিয়া চার্বাকের বর্ণনা দেখা যায় এবং অযোধ্যাকাণ্ডে জাবালি ঋষির মুখে লোকায়তিক উপদেশ শুনা যায়, তখন চার্বাক মত প্রাচীন মত বলিয়া বহুকাল হইতে গ্রাহ্য হইয়াছে সন্দেহ নাই। এ প্রসঙ্গে আর-একটি কথাও স্মরণ করা উচিত। যিনি এই মতের প্রবর্তক, তাঁহার নাম বৃহস্পতি। খণ্ডন-খণ্ডখাদ্যকার শ্রীহর্ষ তাঁহাকে দেবগুরু বলিয়াছেন। ইহাও তাঁহার প্রাচীনত্বের আর-একটি প্রমাণ। লোকে যাঁহার বুদ্ধির সহিত তুলনা দিয়া থাকে, তিনিই কি সেই বৃহস্পতি? ধর্মশাস্ত্রকারদিগের মধ্যে একজন বৃহস্পতি আছেন। তিনিও তর্কানুরাগী। তিনি লিখিয়াছেন

কেবলং শাস্ত্রমাশ্রিত্য ন কর্তব্যো বিনির্ণয়ঃ।
যুক্তিহীন বিচারেতু ধর্মহানিঃ প্রজায়তে ॥

অর্থাৎ "কেবল শাস্ত্র আশ্রয় করিয়া তত্ত্বনির্ণয় করা উচিত নয়, যেহেতু যুক্তিহীন বিচারে ধর্মহানি হয়।"

কিন্তু তর্কানুরাগী হইলেও ধর্মশাস্ত্রকার বৃহস্পতি বেদবিরোধী নাস্তিক বৃহস্পতি হইতে পারেন না।

যদি উপরে উপরে দেখা যায়, তাহা হইলে লোকায়ত দর্শন প্রচারের সময় সম্বন্ধে কয়েকটি কথা মনে উদিত হয়। এই দর্শনে ঈশ্বরের অস্তিত্ব স্বীকৃত হয় নাই; সুতরাং ইহা কাপিলদর্শনের পরে রচিত হইবার সম্ভাবনা। এই দর্শনে বেদ ও পশুবধের প্রতি বিদ্বেষ দৃষ্ট হয়; সুতরাং এরূপ অনুমেয় যে ইহা বেদ-বিদ্বেষী অহিংসাধর্মাবলম্বী বুদ্ধদেবের পরবর্তী কালের। কিন্তু কে বলিতে পারে যে, কপিল বা শাক্যসিংহের পূর্বে নাস্তিক মত প্রচলিত ছিল না বা প্রকাশিত হয় নাই, অথবা বৈদিক ক্রিয়াকলাপের প্রতি লোকের অশ্রদ্ধা জন্মে নাই?

এতদ্দেশীয় কোন বিষয়েরই প্রকৃত ইতিবৃত্ত পাওয়া যায় না। অনুসন্ধান করিতে গেলেই অন্ধকার দেখিতে হয়। ইউরোপের ইতিহাসে যেরূপ পর্যায়ক্রমে এক মতের পর অপর মতের আবির্ভাব লক্ষিত হয়, এ দেশের দর্শনশাস্ত্র সম্বন্ধে সেরূপ কিছুই দেখা যায় না। বোধ হয় যেন সকল দর্শনই এক সময়ে দেখা দিয়াছিল। প্রত্যেক দার্শনিক দলের মূলসূত্রগ্রন্থে অপর দর্শনসূত্রের উল্লেখ বা

মতখণ্ডন প্রাপ্ত হওয়া যায়। যথা, কাপিল সূত্রের প্রথমাধ্যায়ে ২০ হইতে ২৪ সূত্র পর্যন্ত বৈদান্তিক অবিদ্যাবাদ খণ্ডন এবং ১৫০ ও ১৫১ সূত্রে একাত্মবাদখণ্ডন আছে। উক্ত অধ্যায়ের ২৫ সূত্রে লিখিত আছে,—

ন বয়ং ষট্‌পদার্থবাদিনঃ বৈশেষিকাদিবৎ,

অর্থাৎ "আমরা বৈশেষিকাদিদিগের ন্যায় ষট্‌পদার্থবাদী নহি"। আবার ২৭ ও তৎপরবর্তী কয়েকটি সূত্রে বৌদ্ধদিগের ক্ষণিকত্ববাদখণ্ডন দৃষ্ট হয়। সুতরাং কপিলের সাংখ্যসূত্রে বেদান্ত, বৈশেষিক ও বৌদ্ধ অন্ততঃ এই তিন মতের প্রাগস্তিত্ব, সূচিত হইতেছে। এইরূপ যদি আবার বেদান্তসূত্রের দিকে দৃষ্টি কর, দেখিবে যে ২৮ ও ৩১ সূত্রে পতঞ্জলিকৃত যোগদর্শনের উল্লেখ আছে, ২ ও ৩ সূত্রে সাংখ্যমত খণ্ডন আছে, এবং অন্যান্য স্থলে কণাদের পরমাণুবাদ লইয়া বিবাদ আছে। এই নিমিত্ত কেবল সূত্রগুলি দেখিয়া স্থির করিবার উপায় নাই যে অগ্র পশ্চাৎ কোন্ দর্শনের কখন উৎপত্তি হইয়াছে। বোধ হয় যখন, সকল দর্শনেরই প্রচার হইয়া পরস্পরের খণ্ডন-চেষ্টা চলিতেছিল, সেই সময় প্রচলিত মূল দর্শনসূত্রগুলি লিপিবদ্ধ হইয়াছিল। যদি কপিল, বদরায়ণ, গৌতম প্রভৃতিকে ভিন্ন ভিন্ন দার্শনিক সম্প্রদায়ের মতপ্রবর্তক বলিয়া ধরা যায়, তাহা হইলে বলিতে হইবে যে, যে সূত্রগুলি তাঁহাদিগের নামে চলিতেছে, সেগুলি তাঁহাদিগের রচিত নহে; তাঁহাদিগের মতানুযায়ী শিষ্য প্রশিষ্যগণ কর্তৃক অনেক বাদানুবাদের পরে লিখিত। সাংখ্যকারিকাকার ঈশ্বর কৃষ্ণ কাপিল সূত্র সম্বন্ধে ইহা স্পষ্ট করিয়াই বলিয়াছেন। তিনি লিখিয়াছেন যে, "ঋষি জয় করিয়া এই প্রধান পবিত্র শাস্ত্র আসুরিকে দিয়াছিলেন, আসুরি পঞ্চশিখকে এবং পঞ্চশিখ ইহাকে বহু বিস্তীর্ণ করিয়াছেন।"[১] আবার দেখ যখন জৈমিনি সূত্রে জৈমিনির দোহাই ও বেদান্ত সূত্রে বদরায়ণের দোহাই দেখা যায়, তখন এগুলি তাঁহাদিগের লিখিত না হইয়া শিষ্য প্রশিষ্যের লিখিত হইবারই সম্ভাবনা।[2]

যদিও ভিন্ন ভিন্ন দর্শনের উৎপত্তিপর্যায় নির্ণয়পূর্বক দার্শনিক মত-প্রবর্তক ঋষিবর্গের সময় নিরূপণ করা দুঃসাধ্য, তথাপি তাঁহাদিগের প্রাদুর্ভাব-কাল সম্বন্ধে সাধারণতঃ দুই-একটি কথা বলা যাইতে পারে। সকল দর্শনই সূত্রাকারে লিখিত। সুতরাং সংস্কৃত সাহিত্যের যে কাল সূত্রপ্রধান, সেই কালেই

(১) এতৎ পবিত্রমগ্র্যং মুনিরাসুরয়েঽনুকম্পয়া প্রদদৌ
আসুরিরপি পঞ্চশিখায় তেনচ বহুধা কৃতং তন্ত্রং ॥ ৭০ ॥

(2) Vide a Lecture on "Hindu Philosophy" delivered by the present writer on the 14th of March 1867 at the Bethune Society and published in the transactions of the Society in 1870.

দর্শন সকলের আবির্ভাব। ভট্টমোক্ষমূলর সাহেবের মতে খ্রীষ্টাব্দের ৬০০ হইতে ২০০ বর্ষ পূর্ব পর্যন্ত এই কালের ব্যাপ্তি। এই সময়ের শিরোভূষণ বুদ্ধদেব। বোধ হয়, তাঁহার জন্মের কিছুকাল পূর্ব হইতে দার্শনিককালের আরম্ভ। সংসার দুঃখময়, ইহাই এতদ্দেশীয় দর্শনের মূলতত্ত্ব। শাক্যসিংহ জন্মিবার পূর্বেই ইহা এতদ্দেশবাসীরা বিলক্ষণ হৃদয়ঙ্গম করিয়াছিলেন এজন্যই কাতর হইয়া কতলোক সংসার পরিত্যাগ করিতেছিল। যখন বুদ্ধদেব সাংসারিক সুখ বিসর্জন করিয়া মোক্ষপথের পথিক হইলেন, তিনি বহুসংখ্যক লোককে তৎসদৃশদশাপন্ন দেখিতে পাইলেন। কি প্রকারে দুঃখনিবৃত্তি হইবে, তৎকালে চিন্তাশীল ব্যক্তিবর্গ এই প্রশ্ন লইয়াই ব্যস্ত ছিলেন। বৈদিক কালের কবিদিগের ন্যায় তাঁহারা সাংসারিক-সুখপ্রার্থী ছিলেন না। উচ্চপদ, বিচিত্র বেশভূষা, সুরম্য হর্ম, উপাদেয় খাদ্য, সুন্দরী নারী, বহুসংখ্যক সন্তান, শতবর্ষ বয়ঃক্রম, এ সকলে তাঁহাদিগের মনস্তুষ্টি হইত না। তাঁহারা বুঝিয়াছিলেন যে সাংসারিক সুখের আঁতে আঁতে দুঃখ। এই জন্যই তাঁহাদিগের সংসারের প্রতি বিরক্তি। এই জন্যই তাঁহাদিগের সংসার-বন্ধন-ছেদনচেষ্টা। সংসার তাঁহাদিগের পক্ষে কেন এত ক্লেশকর বোধ হইয়াছিল, সম্পূর্ণরূপে বুঝা যায় না। কিন্তু এরূপ হইবার কোন কারণ নির্দেশ করা যায় না, এমত নহে। বৈদিক সময়ে আর্যগণ হিমালয়সন্নিহিত শীতল প্রদেশে বাস করিতেছিলেন। স্বাস্থ্যকর স্থানে থাকিয়া তাঁহাদিগের কার্য করিতেও যেমন প্রবৃত্তি হইত, শরীর ও মনের তেমনই স্ফূর্তি ছিল। বিশেষতঃ তাঁহারা দস্যুদিগকে জয় করিয়া দিন দিন নূতন নূতন প্রদেশে আপনাদিগের অধিকার বিস্তার করিতেছিলেন এবং তন্নিমিত্ত অনেকেই অনন্যচিত্ত হইয়া উৎসাহ ও অনুরাগের সহিত আপনাদিগের পার্থিব সুখবর্ণনার্থেই প্রবৃত্ত ছিলেন। তৎকালে সমাজের বন্ধনও এমন শিথিল ছিল যে, লোকে ইচ্ছানুসারে চলিতে পারিত; বর্ণাশ্রম বা তন্নির্দিষ্ট ক্রিয়াকলাপের জাল এত দূর বিস্তৃত ছিল না যে, তাহাতে আবদ্ধ হইয়া কাহাকেও স্বাধীনতা ও সুখ বিসর্জন করিতে হইত। কিন্তু সৌত্রিক সময়ে উহার সম্পূর্ণ বিপর্যয় ঘটিয়াছিল। তখন আর্যগণ উষ্ণ অনুগঙ্গ প্রদেশের অধিবাসী। পরিশ্রম করিতে গেলে তাঁহাদিগের কষ্ট হয়। সুখ অপেক্ষা শান্তিই তাঁহাদিগের বাঞ্ছনীয় হইয়া উঠিয়াছে। বিশেষতঃ তাঁহাদিগের মধ্যে যে পরিমাণে সভ্যতা বৃদ্ধি হইয়াছে তাহাতে তাঁহাদিগের দুঃখানুভবশক্তির বৃদ্ধি হইয়াছে। এদিকে সামাজিক শাসনও বাড়িয়াছে। জাতিভেদ, আশ্রমবিভাগ ও কর্মকাণ্ড স্থিরীকৃত হইয়া স্বাধীন গতির পথ রুদ্ধ করিয়াছে; স্বেচ্ছানুসারে সুখান্বেষণে যেদিকে সেদিকে যাইবার উপায় নাই। জীবন ভার

বোধ হইয়াছে। সংসারের প্রতি আস্থা নাই। দুঃখের কিসে নিবারণ হইবে, ইহাই প্রধান প্রশ্ন হইয়া দাঁড়াইয়াছে। বুদ্ধদেবের পূর্বে এ প্রশ্নের উত্তর কি কেহ দেন নাই? বোধ হয় দিয়াছিলেন। বৌদ্ধেরা বলেন যে কপিলদেব শাক্যসিংহের পূর্ববর্তী বুদ্ধ। সাংখ্যদর্শন-প্রবর্তক ঋষির নামও কপিল; এবং স্থিরচিত্তে বিবেচনা করিতে গেলেও সাংখ্যদর্শনকেই বৌদ্ধধর্মের মূল বলিয়া বিশ্বাস হয়! কপিল নিরীশ্বর, বুদ্ধদেবও নিরীশ্বর। কপিল সাংসারিক দুঃখে কাতর, বুদ্ধদেবও সাংসারিক দুঃখে কাতর। কপিল বলেন, দুঃখের কারণ জন্ম, জন্মের কারণ কর্ম, কর্মের কারণ প্রবৃত্তি, প্রবৃত্তির কারণ অজ্ঞানতা; বুদ্ধদেবও সেই সকল কথা বলেন। আবার ভাবিয়া দেখ, বৌদ্ধদিগের যে ক্ষণিকত্ববাদ তাহাও সাংখ্য-মত হইতে উৎপন্ন। কপিলশিষ্যেরা বলেন যে, কার্য কারণের রূপান্তর বা পরিণাম মাত্র। বুদ্ধদেব দেখিলেন যে জগৎ প্রতিক্ষণে পরিবর্তিত হইতেছে, প্রতিক্ষণে নূতন কার্যরূপে পরিণত হইতেছে; সুতরাং ভাবিলেন, কোন পদার্থই ক্ষণাধিক স্থায়ী নহে। এই ক্ষণিকত্ববাদই সপ্রমাণ করিতেছে যে বৌদ্ধ-মত অনেক দার্শনিক আলোচনার শেষ ফল। যতদিন লোকে স্বাভাবিক অবস্থায় থাকে, ততদিন চন্দ্র, সূর্য, গ্রহ, নক্ষত্র, পর্বত, নদী, পশু, পক্ষী, মনুষ্য প্রভৃতিকে বহুকাল স্থায়ী বলিয়া বিশ্বাস করে; অনেক দার্শনিক চর্চা না হইলে কেহ বুঝিতে পারে না যে, মুহূর্তপরিবর্তনশীলতাই এই বিপুল বিশ্বের প্রধান লক্ষণ।

সাংখ্যমত-প্রবর্তক কপিল ঋষিই যে কেবল বুদ্ধদেবের পূর্ববর্তী ছিলেন এমন নহে; বোধ হয় লোকায়ত-মতপ্রবর্তক বৃহস্পতিও শাক্যসিংহের পূর্বে প্রাদুর্ভূত হইয়াছিলেন। তৈত্তিরীয় ব্রাহ্মণে লিখিত আছে যে একদা বৃহস্পতি গায়ত্রীদেবীর মস্তকে আঘাত করেন, তাহাতে মস্তক চূর্ণ হইয়া যায় এবং মস্তিষ্ক ছিন্ন বিচ্ছিন্ন হইয়া পড়ে। কিন্তু গায়ত্রীর মৃত্যু নাই; তজ্জন্য প্রতি খণ্ড মস্তিষ্ক-কণা হইতে এক একটি বষট্‌কার দেবের উৎপত্তি হইল।[৩] আমাদিগের বোধ হয় এই গল্পের মধ্যে একটি মহামূল্য তত্ত্ব নিহিত রহিয়াছে।

3. "The Taittiriya Brahmana relates an interesting anecdote regarding the origin of the word Vashat. The God presiding over Vashat is Vashatkara: The anecdote is as follows: Once upon a time Vrihaspati struck the Goddess Gayatri on the head, which was smashed into pieces and the brain split. But Gayatri is immortal, and every drop of her brain so split was alive, and became Vashatkara. The commentator adds Vashat is derived from Vasa, grease, brain matter.'

P, XXXVI, Appendix to Durgapuja by Pratapa Chandra Ghoshal, B.A.

গায়ত্রীই হিন্দুধর্মের বীজমন্ত্র। বৃহস্পতি সেই গায়ত্রীর মস্তকে আঘাত করেন। সুতরাং, ইহাতে বুঝাইতেছে যে বৃহস্পতি হিন্দুধর্মের বিনাশ চেষ্টা করিয়াছিলেন। অতএব তৈত্তিরীয় ব্রাহ্মণে যে বৃহস্পতির উল্লেখ দৃষ্ট হইতেছে, তিনি নাস্তিকমত-প্রবর্তক হইবার বিলক্ষণ সম্ভাবনা। তাহা হইলে স্বীকার করিতে হইতেছে যে লোকায়তবাদ তৈত্তিরীয় ব্রাহ্মণ সংকলিত হইবার পূর্বে প্রচারিত হইয়াছিল। তৈত্তিরীয় ব্রাহ্মণ পুরাতন কৃষ্ণ যজুর্বেদের অন্তর্গত। সুতরাং বলিতে হইতেছে যে সৌত্রিক সময়ের পূর্বে ব্রাহ্মণ-প্রধান কালে কর্মকাণ্ডের প্রথম বাড়াবাড়ির আমলে লোকায়ত মতের উৎপত্তি হয়। ভট্টমোক্ষমূলর সাহেবের মতে ব্রাহ্মণপ্রধান কাল খ্রীষ্ট জন্মিবার ৮০০ হইতে ৬০০ বর্ষ পূর্ব পর্যন্ত বিস্তৃত। অতএব এরূপ অনুমান অন্যায় নহে যে নাস্তিক মত-প্রবর্তক বৃহস্পতি খ্রীষ্টাব্দের অন্ততঃ সাত আটশত বৎসর পূর্বে প্রাদুর্ভূত হইয়াছিলেন। ছাব্বিশ সাতাইশ শত বৎসর পর্যন্ত হিন্দু সমাজে তাঁহার মত দ্বারা কত পরিবর্তন সংঘটিত হইয়াছে, কে বলিতে পারে? আমরা পূর্বেই দেখিয়াছি যে রামায়ণ, মহাভারত ও বিষ্ণুপুরাণেও তাঁহার যুক্তিসকল প্রবেশ করিয়াছে। উপনিষদ ও দর্শনসমূহে কর্মকাণ্ডের প্রতি যে অবজ্ঞা দৃষ্ট হয়, তাহাও বৃহস্পতির তর্কসম্ভূত হওয়া অসম্ভব নহে। ইন্দ্রাদি বৈদিক দেবতার প্রাধান্য বিলোপও যে তাঁহার হস্তে কতদূর ঘটিয়াছিল কে নির্ণয় করিবে? বোধহয় যেন তাঁহার নাস্তিকতাই কপিল, বুদ্ধ ও জৈমিনিকে নাস্তিক করিয়াছে, এবং তাঁহার প্রত্যক্ষবাদ বিরুদ্ধে ধর্মরক্ষার্থ তর্ক করিতে গিয়া অনুমানপদ্ধতি আবিষ্কৃত হইয়াছে।

শ্রাবণ ১২৮১

কোম্‌ৎ দর্শন

১। ওগুস্ত কোম্‌ৎ

মহাত্মা ওগুস্ত কোম্‌তের তুল্য দর্শনবিৎ অতি দুর্লভ। অনেকে তাঁহাকে অদ্বিতীয় দার্শনিক বলিয়া মান্য করেন। সে যাহা হউক, তিনি যে অসাধারণ ধীশক্তি-সম্পন্ন ছিলেন, তাহার কোন সন্দেহ নাই। পণ্ডিতপ্রসবিনী ফ্রান্সভূমিতে তাঁহার তুল্য ব্যক্তি জন্মে নাই। কোম্‌ৎ দর্শন, কাপিল সূত্রের ন্যায় নিরীশ্বর, কিন্তু নিরীশ্বর বলিয়া অনেক ঈশ্বরপরায়ণ ব্যক্তি ঐ দর্শনের কোন কোন অংশ ভ্রমাত্মক বিবেচনা করিয়াও তাহার প্রতি অশ্রদ্ধা প্রকাশ করেন না।

২। বহির্বিষয় জ্ঞান

বস্তুতত্ত্ববিষয়ে কোম্‌তের মত এক্ষণে ইউরোপ ও আমেরিকার পণ্ডিতমাত্রেই অভ্রান্ত বলিয়া স্বীকার করেন। আমরা বস্তুসকলের গুণ জানি এবং বিশেষ অবস্থায় তদীয় বিশেষ কার্য জানি। কিন্তু বস্তু সকল যে কি, তাহা আমাদের বুদ্ধি ও ইন্দ্রিয়ের অগোচর। তাহাদের মূল প্রকৃতির বিষয় আমরা কিছুই জানিতে পারি না। চম্পকপুষ্পের এই গুণ যে, তাহা হইতে অণু উত্থিত হইয়া তোমার নাসিকারন্ধ্রে প্রবেশ করিলে গন্ধ বোধ হয়। ঐ গন্ধগুণের বিষয় তুমি জানিতেছ। চম্পকের আর-এক গুণ যে তাহা হইতে জ্যোতিঃ প্রতিফলিত হইয়া তোমার চক্ষুতে লাগিলে তুমি চম্পক পীতবর্ণ দেখ। ঐ বর্ণগুণের বিষয় তুমি জানিতেছ। চম্পকের আর-এক গুণ যে তাহা স্পর্শ করিলে কোমল বোধ হয়। তুমি ইহার কোমলতাগুণ জানিতেছ। চম্পক চর্বন করিয়া তিক্তরস বোধ করিতেছ। স্পর্শেন্দ্রিয় ও দর্শনেন্দ্রিয়ের দ্বারায় চম্পকের বিস্তৃতি জানিতেছ। গন্ধ, বর্ণ, রস, কোমলতা ও বিস্তৃতি গুণ ত্যাগ করিলে, চম্পকের বিষয় কি জান? কিছুই না। মনুষ্যের প্রকৃতিমূলক সংস্কার এই যে, যে স্থলে গুণ জানিতে পারে, সে স্থলে গুণের আধার বস্তুর অস্তিত্ব স্বীকার করে।

যাঁহারা মায়াবাদীদিগকে বাতুল বলিয়া উপেক্ষা করেন, তাঁহারা নিতান্ত স্থূলদর্শী। বস্তুত মায়াবাদীরা সাধারণ লোক অপেক্ষা সূক্ষ্মদর্শী। তাঁহাদের ভ্রম এই যে তাঁহারা গুণ হইতে গুণাধার বিষয়ের সত্ত্বোপলব্ধি অমূলক বিবেচনা করেন। যদি কোন মায়াবাদী আমাদিগকে জিজ্ঞাসা করেন, "গুণ হইতে গুণাধার বিষয়ের উপলব্ধি কেন কর?" ইহার উত্তর এই দেওয়া যাইতে পারে, "এ সংস্কার আমাদের স্বভাবসিদ্ধ।" মায়াবাদীদের মতের অযৌক্তিকতা প্রতিপন্ন করিবার দ্বিতীয় উপায় নাই।

৩। কারণ জ্ঞান

কারণ শব্দ প্রয়োগ করিতে কোম্‌তের বিলক্ষণ আপত্তি আছে। তিনি বলেন, যাঁহারা তত্ত্ববিজ্ঞানের অনুশীলন করেন, তাঁহারা যাহাকে কারণ বলেন, সে কারণের বিষয় আমরা কিছুই জানিতে পারি না। কেবল প্রাকৃতিক ঘটনা নির্দিষ্ট নিয়ম অনুসারে ঘটিয়া থাকে, ইহাই আমরা জানিতে পারি।

সূর্যের তাপ জলরাশিতে পড়িলে জলরাশির কিয়দংশ বাষ্প হয়। ঐ বাষ্প জলরাশির উপরিস্থ বায়ু অপেক্ষা লঘু, এজন্য আকাশমার্গে উত্থিত হয়। ঊর্ধ্বস্থ বায়ুর শৈত্যগুণে বাষ্প সঙ্কুচিত ও দ্রবীভূত হইয়া জল হয়। এইরূপে বৃষ্টি হয়। তাপে জলাদি জড় বস্তুর যোগাকর্ষণের হ্রাস হয়, তাহাতে

উত্তপ্ত বস্তুর পরমাণুসকল বিচ্ছিন্ন হয়, এবং এইরূপে উত্তপ্ত বস্তু স্ফীত ও প্রসারিত হয়। কিন্তু তাপে কেন যোগাকর্ষণের হ্রাস হয়? কেন জল বাষ্প হয়? এ প্রশ্নের উত্তর কেহই দিতে পারে না।

শ্বেতবর্ণ পারদ ও পীতবর্ণ গন্ধক রাসায়নিক যোগে রক্তবর্ণ হিঙ্গুল উৎপন্ন; করে; কিন্তু শ্বেতবর্ণ, পীতবর্ণ অথবা অন্য বর্ণের দ্রব্য উৎপন্ন না হইয়া কেন রক্তবর্ণ দ্রব্য উৎপন্ন হয়, ইহা কেহই বলিতে পারেন না। প্রাকৃতিক ঘটনা কিরূপে হয়, আমরা জানিতেছি, কেন হয় জানি না। কোম্‌ৎ বলেন, "কেন হয়," না জানিলে কারণ শব্দ প্রয়োগ করা উচিত নহে। অমুক ঘটনা নির্দিষ্ট নিয়মে হইবে, ইহাই আমরা জানি, এ পর্যন্তই আমাদের জ্ঞানের সীমা। যাহাকে লোকে কারণকার্যসম্বন্ধের নিয়ম বলে, তাহা কোম্‌তের মতে প্রাকৃতিক ঘটনার পূর্বভাব ও উত্তরভাবের নিয়ম মাত্র।

যিনি কারণজ্ঞান মনুষ্যের সাধ্যাতীত বলেন, তিনি যে বিশ্বের আদি কারণ-জ্ঞান মনুষ্যের সাধ্যাতীত বলিবেন, ইহা বিচিত্র নহে। তাঁহার মতে বিশ্বের উৎপত্তির বিষয় মনুষ্য কখনই জানিতে সক্ষম হইবে না। সুতরাং এ বিষয়ের আলোচনা বৃথা।

৪। দৈববলে বিশ্বাস

পুরাকালে মানবজাতি সমস্ত প্রাকৃতিক ঘটনা দৈবঘটিত বলিয়া বিশ্বাস করিত। এক্ষণেও ঐরূপ বিশ্বাস ভারতবর্ষে এবং অন্যান্য দেশে আছে। বায়ু বহিতেছে; অতএব বায়ুর অধিষ্ঠাতা দেবতা আছেন। স্রোত চলিতেছে; অতএব নদীর অধিষ্ঠাত্রী দেবী আছেন। বৃষ্টি হইতেছে; অতএব মেঘ দৈববলে সৃষ্ট ও চালিত হইয়া বারিবর্ষণ করিতেছে। প্রাকৃতিক বিজ্ঞানের যত অনুশীলন হইতেছে, তত সাধারণ প্রাকৃতিক ঘটনা সম্বন্ধে এ প্রকার দৈববলে বিশ্বাসের হ্রাস হইতেছে। কোম্‌ৎ বলেন, যখন মনুষ্যেরা প্রাকৃতিক নিয়মসকল ভালরূপে বুঝিতে পারিবে, তখন দৈববলে বিশ্বাস একেবারে অন্তর্হিত হইবে। মনুষ্যেরা প্রথমতঃ জড়োপাসক হয়, পরে বহুদেবোপাসক হয়, তৎপরে একেশ্বরবাদী হয়; পরিণামে নিরীশ্বর হইবে। বিশ্বে যে নিয়ম আছে, একথা তিনি স্বীকার করেন, কিন্তু তাহা হইতে বিশ্বনিয়ন্তা উপলব্ধি করা যুক্তিসিদ্ধ বিবেচনা করেন না।

৫। কোম্‌ৎ নাস্তিক কি না?

ইহাতে অনেকেই মনে করিবেন, কোম্‌ৎ নাস্তিক, কিন্তু তাঁহাতে ও অন্যান্য নাস্তিকে অনেক প্রভেদ আছে। তাঁহার প্রণীত দর্শনশাস্ত্রে সাংখ্য দর্শনের

প্রথম অধ্যায়ের ৯২, ৯৩ অথবা ৯৪ সূত্রের ন্যায় কোন সূত্র নাই। মহর্ষি কপিলের ন্যায় তিনি কোন স্থলে "ঈশ্বরাসিদ্ধেঃ" বচন প্রয়োগ করেন নাই। বরং তিনি স্বরচিত এক গ্রন্থে কহিয়াছেন, "আমি নাস্তিক নহি ; যাহারা ঈশ্বরকে বিশ্বের সৃষ্টিকর্তা না মানিয়া প্রকৃতি হইতে বিশ্বের উৎপত্তি মানে, তাহারাই নাস্তিক।[১] তাহাদের মত হইতে ঈশ্বরবাদীদের মত অপেক্ষাকৃত যুক্তিসিদ্ধ।" কিন্তু যদিও তিনি কোন স্থলে ঈশ্বর নাই অথবা ঈশ্বরের অস্তিত্বের প্রমাণাভাব, এমন কথা বলেন নাই, তথাপি তাঁহার দর্শন আদ্যোপান্ত পাঠ করিলে, নিরীশ্বর বলিয়া প্রতীত হইবে'।

৬। কোম্‌ৎ দর্শনের দোষ

কোম্‌ৎ দর্শন নিরীশ্বরতাদোষে দূষিত না হইলে সর্বাঙ্গসুন্দর হইত, সন্দেহ নাই,—এমন কি, সর্বদর্শনশ্রেষ্ঠ বলিয়া পরিগণিত হইত। কোম্‌ৎ মনুষ্যজাতির ইতিহাস অবলম্বন করিয়া প্রতিপন্ন করিয়াছেন যে, দৈববলে বিশ্বাসের ক্রমে হ্রাস হইতেছে এবং আরও হইবে। ইহাতে তিনি অনুমান করেন যে, পরিশেষে ঐ বিশ্বাস একেবারে অন্তর্হিত হইবে।

বিশ্বনিয়ম দৃষ্টে বিশ্বনিয়ন্তা উপলব্ধি'কেন অযৌক্তিক, তাহা আমরা বুঝিতে পারি না। কোম্‌ৎ এ বিষয় সম্বন্ধে পূর্বোক্ত ঐতিহাসিক প্রমাণ ব্যতীত অন্য কোন প্রমাণ দেন নাই। কিন্তু ঐ প্রমাণ কোনক্রমেই প্রচুর বলিয়া স্বীকার করা যাইতে পারে না। এই ক্ষুদ্র প্রবন্ধে ঈশ্বরবাদীদের মতের যৌক্তিকতা প্রতিপন্ন করা অসম্ভব ; এইমাত্র বলা যাইতে পারে যে, নিয়ম হইতে নিয়ন্তা উপলব্ধি আমাদের স্বভাবসিদ্ধ। এবং আমাদের জ্ঞানের সীমা ও বিশ্বাসের সীমা সর্বতোভাবে সমান হইতে পারে না। কালের আদি আছে বা অন্ত আছে ইহা কেহই অনুভব করিতে সক্ষম নহেন ; এজন্য সকলেই বলে, কাল অনাদি ও অনন্ত। কিন্তু অনাদি ও অনন্ত বিষয় মনে ধ্যান বা ধারণা করা কাহার সাধ্য ? কাহারও সাধ্য নাই। আকাশের সীমা আছে, ইহা কেহ অনুভব করিতে পারে না ; এজন্য সকলেই বলে আকাশ অসীম। কিন্তু অসীম পদার্থ মনুষ্যের পরিমিত বুদ্ধিতে কখনই ধারণা করিতে পারে না।

অনাদি অনন্ত ও অসীম পদার্থ আমরা মনে ধারণা করিতে অক্ষম হইয়াও' বিশ্বাস করিতেছি—কাল অনাদি ও অনন্ত এবং আকাশ অসীম। এস্থলে আমাদের বিশ্বাসের সীমা জ্ঞানের সীমা অতিক্রম করিয়াছে, একথা সকলেই স্বীকার করিবেন। ঈশ্বর সম্বন্ধেও সেইরূপ। তাঁহার বিষয়ে আমাদের জ্ঞান

১। যথা ;—
প্রকৃতিবাস্তবেচ পুরুষসাধ্যাসসিদ্ধিঃ। সাংখ্যপ্রবচন, ২য় অধ্যায়, ৫ম সূত্র।

অতি অসম্পূর্ণ ও অপরিস্ফুট ; কিন্তু এ কারণে তাঁহাতে বিশ্বাসের লাঘব হওয়া উচিত নহে। মধ্যাহ্নে সূর্য ঘনাবৃত হইলেও তিনি অস্তগত হন নাই, বুঝিতেছি।

৭। কোম্‌ৎ কপিল

সাংখ্য দর্শন ও কোম্‌ৎ দর্শন নিরীশ্বর হইলেও এই দুই দর্শনে উচ্ছৃঙ্খলতার লেশমাত্র নাই। মনুষ্যদিগকে ধর্মশৃঙ্খলে বদ্ধ করাই উভয় দর্শনের উদ্দেশ্য। গত শতাব্দীর অধিকাংশ নাস্তিক চার্বাক ছিলেন ; এক্ষণেও জর্মান দেশের প্রসিদ্ধ নাস্তিক লুডউইগ ফুএয়ার্বাক্ এবং ডাক্তার বুকনেয়ারের শিষ্যেরা চার্বাক। ইঁহাদের অধিকাংশের মতে ইন্দ্রিয়সুখভোগই পরমপুরুষার্থ। কিন্তু কোম্‌ৎ ও কপিল ইন্দ্রিয়সংযমের যেরূপ নিয়ম করিয়াছেন, এরূপ কঠিন নিয়ম ঈশ্বর-পরায়ণ দার্শনিকদের গ্রন্থেও দুষ্প্রাপ্য। মহর্ষি কপিল বলিয়াছেন, "ঈশ্বর-আছেন বলিয়া কর্মফল হয়, এমন নহে, তিনি থাকিলেও হইবে, না থাকিলেও হইবে।"[১] এই বচন সাংখ্য দর্শন, কোম্‌ৎ দর্শন ও বৌদ্ধ ধর্মের মূলসূত্র বলিলে বলা যায়। এ পর্যন্ত কোম্‌তে ও কপিলে ঐক্য আছে।

৮।

কপিলের মতে তিন প্রকার দুঃখের সম্পূর্ণ নিবৃত্তিই পরম পুরুষার্থ। দৃষ্ট উপায়ে অর্থাৎ ঐশ্বর্যভোগে, ইন্দ্রিয়ভোগে বাহ্যাড়ম্বরে দুঃখনিবৃত্তি হয় না। বিষয়-বাসনা ত্যাগ করিয়া ঔদাসীন্যভাব প্রাপ্ত হইলেই অপবর্গ লাভ হয়। প্রকৃতি-পুরুষের সম্পূর্ণ বিচ্ছেদই পুরুষার্থ।[২]

পুরুষার্থ লাভের জন্য বানপ্রস্থ হইবার প্রয়োজন নাই ; আপন আশ্রমে থাকিয়া আশ্রমবিহিত কর্মানুষ্ঠান কর্তব্য। অভ্যাস ও বৈরাগ্য অবলম্বন করিলে প্রয়োজনীয় জ্ঞান লাভ হইবে।[৩] ওগুস্ত কোম্‌তের মতে আপনার সুখের প্রতি দৃষ্টি না রাখিয়া কর্তব্যানুষ্ঠানই পুরুষার্থ। "কর্তব্যানুষ্ঠানেই মানবাধিকার" ইহা তাঁহার প্রসিদ্ধ বচন। কর্তব্যসাধনে আমাদের সুখ হইতে পারে ; কিন্তু সুখ আমাদের প্রকৃত লক্ষ্য নহে।

১। নেশ্বরাধিষ্ঠিতে ফলনিষ্পত্তিঃ কর্মণা তৎসিদ্ধেঃ। ৫ম অধ্যায়, ২য় সূত্র।
২। অথ ত্রিবিধ দুঃখাত্যন্তনিবৃত্তিরত্যন্ত পুরুষার্থঃ। ১ম অধ্যায়, ১ম সূত্র।
নদৃষ্টাত্তৎসিদ্ধি নিবৃত্তেরপ্যনুবৃত্তি দর্শনাৎ। ঐ ২য় সূত্র।
দ্বয়োরেকতরস্য চৌদাসীন্যমপবর্গঃ। ৩য় অ, ৬৫ সূত্র যদ্বা তদ্বা তদুচ্ছিত্তিঃ পুরুষার্থঃ। ৬ষ্ঠ অধ্যায়, ৭০ সূত্র।
৩। স্বকর্ম স্বাশ্রমে বিহিত কর্মানুষ্ঠানম্। ৩য় অধ্যায়, ৩৫ সূত্র। বৈরাগ্যদভ্যাসাশ্চ, ঐ ৩৬ সূত্র।

৯। পরমসৎ

কোম্‌তের আর-এক বচন "পরোপকারার্থে জীবনধারণ"। সমস্ত মানব-জাতিকে সাক্ষাৎ প্রত্যক্ষ দেবতা জ্ঞান করিয়া তাহার সেবায় ব্রতী হওয়া কর্তব্য। এই দেবের নাম তিনি "পরমসৎ"[৪] রাখিয়াছেন। তিনি বলেন, কালে সকলে অন্য দেবের উপাসনা ত্যাগ করিয়া পরমসতের উপাসনা করিবে। যে পরিমাণে উপচিকীর্ষাবৃত্তি স্বার্থপরতাকে জয় করিবে, যে পরিমাণে মনুষ্য-জাতি স্বার্থবিরত ও আত্মবিস্মৃত হইয়া পরের মঙ্গলসাধনে প্রবৃত্ত হইবে, সেই পরিমাণে পরম সতের সেবা হইবে ও পুরুষার্থ লাভ হইবে। কেবল উপ-চিকীর্ষার দ্বারায় সম্যক উন্নতিলাভ করা দুঃসাধ্য। বিশুদ্ধ প্রেম ভক্তি ও স্নেহ আমাদের উন্নতির এক প্রধান সোপান। কোম্‌তের মতে ভক্তিরূপা মাতা, প্রীতি-রূপা ভার্যা, এবং স্নেহরূপা কন্যা আমাদের প্রত্যক্ষ গৃহদেবতা।

১০। প্রেম

নারীকুলের ভূষণ মাদাম দেস্টাল কহিয়াছেন, "পৃথিবীতে প্রেমের ন্যায় পদার্থ নাই।" কোম্‌ৎ এই বচনের সম্পূর্ণ অনুমোদন করেন। পূর্বে তাঁহার কেবল পরিমিত ও পরিমেয় পদার্থে বিশ্বাস ছিল ; বুদ্ধিবৃত্তির দ্বারায় যাহা কিছু বুঝিতে পারা যায়, কেবল তাহাই তিনি মানিতেন। পরে মাদাম্ ক্লোতি-লদ্ দেভো নাম্নী এক গুণবতী রমণীর প্রতি বিশুদ্ধ প্রীতি সঞ্চার হওয়ায় তাঁহার ধর্মপ্রবৃত্তি বর্ধিত ও উত্তেজিত হইয়াছিল। তখন তাঁহার এই সংস্কার জন্মিল, "বুদ্ধিবৃত্তি ধর্মপ্রবৃত্তির দাসী, কিন্তু তাহার বন্দিনী নহে।"

১১। বিবাহ

পুরুষ ৩৫ বৎসর বয়সে, নারী ২৮ বৎসর বয়সে বিবাহ করিবে ; অবস্থা-বিশেষে পুরুষের ২৮ বৎসরে, এবং নারীর ২১ বৎসরে বিবাহ হইতে পারে। জীবদ্দশায় ব্যাভিচার দূরে থাকুক, দম্পতীর একের মরণান্তেও জীবিত ব্যক্তি অন্য পতি বা পত্নী গ্রহণ করিতে পারিবে না। কোম্‌ৎ বলেন, মৃতভর্তৃকা নারী অথবা মৃতভার্য পুরুষ পুনর্বার বিবাহ করিলে বিশুদ্ধ প্রীতির এবং শ্রাদ্ধের ব্যাঘাত হয়।

১২। শ্রাদ্ধ

অনেকে অবাক হইয়া জিজ্ঞাসা করিতে পারেন, নাস্তিকের আবার শ্রাদ্ধ কি ? বস্তুতঃ কোম্‌তের মতে শ্রাদ্ধ আছে। মৃতব্যক্তির উদ্দেশ্যে যে শ্রদ্ধার কার্য করা যায়, তাহাই শ্রাদ্ধ। ঐ শ্রাদ্ধে খোলা, ডোঙ্গা বা ভুজ্যের প্রয়োজন নাই। প্রণয় ও স্নেহের পাত্রদের মৃত্যু হইলে সময়ে সময়ে তাহাদের স্মরণ করা,

৪। Grand etre পদের প্রকৃত অনুবাদ "মহাসৎ"। পাঠকবর্গ মহাসৎ পদের বিপরীত "মহাঅসৎ" করিতে পারেন ; এজন্য পরমসৎ প্রয়োগ করা গেল।

ধ্যান করা, ও উপাসনা করাই শ্রাদ্ধ। কোম্‌ৎ এইরূপে মাদাম্‌ ক্লোতিলদ্‌ দেভোর শ্রাদ্ধ করিতেন। শ্রাদ্ধে মৃত ব্যক্তির কোন উপকার নাই বটে; কিন্তু তাহাতে শ্রাদ্ধকারীর চিত্তোৎকর্ষ হয়, তাহার সন্দেহ নাই। নব্য সম্প্রদায়ের মধ্যে যাঁহারা প্রাচীন হিন্দুদের সমস্ত আচারব্যবহারের প্রতি উপহাস করেন, তাঁহাদের একবার এ বিষয় বিবেচনা করা উচিত। কেবল আপনার উপাসনা না করিয়া মধ্যে মধ্যে ভক্তিভাজন মৃত ব্যক্তির উপাসনা করিলে মন উন্নত হয়; অবনত হয় না।

১৩। বৈরাগ্য

কোম্‌তের মতে যে দ্রব্য আহার করিলে আমাদের বলাধান ও স্বাস্থ্যবর্ধন হয়, তাহাই আহার করা উচিত। যাহাতে কেবল জিহ্বা ও তালু পরিতৃপ্ত হয়, তাহা একেবারে আহার করা উচিত নহে। শরীরের বলাধানের একমাত্র উদ্দেশ্য পরমসতের সেবা। তিনি সুরাপানের দোষ দিয়া সুরাপান-প্রতিষেধকারী মহম্মদের প্রশংসা করিয়াছেন। তিনি কামরিপু সম্বন্ধে বলিয়াছেন, "এই রিপু সকল রিপু অপেক্ষা দুর্দান্ত; এবং ইহার শাসন বহুকাল পর্যন্ত চিত্তশাসনের প্রধান উপায় থাকিবে।" তিনি ভরসা করেন, ক্রমশঃ সংযত হইয়া ঐ রিপু একেবারে নির্মূল হইতে পারিবে। কাম নির্মূল হইলে মনুষ্যজাতিও নির্মূল হইবে। তাহাদের রক্ষার উপায় কি? কোম্‌ৎ বলেন, "কালে স্ত্রীজাতির পুরুষসহযোগ ব্যতীত সন্তান উৎপাদনের ক্ষমতা হওয়া অসম্ভব নহে।" আমাদের এই বক্তব্য যে, যিনি প্রাকৃতিক বিজ্ঞান ও মানবজাতির ইতিবৃত্তের উপর আপন দর্শনশাস্ত্র স্থাপিত করিয়াছেন, এ মীমাংসা তাঁহার উপযুক্ত হয় নাই। তিনি যাহা সম্ভব বলিয়াছেন, শরীরতত্ত্ব ও আয়ুস্তত্ত্ব অনুসারে তাহা অসম্ভব। "না শক্যোপদেশ বিধিরুপদিষ্টে যশ্যানুপদেশঃ।" সাংখ্যদর্শন, ১ম অধ্যায়, ৯ম সূত্র।

উপদেষ্টার পক্ষে যাহা অসম্ভব, সে উপদেশ উপদেশই নহে। কোম্‌ৎ যদি কামরিপু সংযমের উপদেশ দিয়া ক্ষান্ত থাকিতেন, তাহা হইলে ভাল হইত। যখন কামোচ্ছেদের বিধি দিয়াছেন, তখন ভারতবর্ষের দার্শনিকশ্রেষ্ঠের বচন দ্বারায় ইউরোপীয় দার্শনিকশ্রেষ্ঠের মত খণ্ডন করিতে হইল।

শ্রাবণ ১২৭৯

সংস্কৃত
৯/ সাহিত্য
প্রসঙ্গ

বাল্মীকি ও তৎসাময়িক বৃত্তান্ত

ভারত যাহার লীলাভূমি, ভারতী যাহার জননী, সংস্কৃত যাহার বাক্যালাপ, মনু যাহার পিতৃপুরুষ, বেদবিদ্যা যাহার চিত্তপ্রসূত, সেই জগদ্‌গুরু আর্যজাতির জীবনী আজি কিনা, কীর্তিবিলোপী কালকবলে নিহিত ! যে ভারত তোমার মানসকন্যা, আজি সেই ভারত পথের ভিখারিণী !

আর্যবংশের আদিবৃত্তান্তঘটিত কোন বিশেষ মীমাংসা বা বিষয়ের দোহাই দিতে হইলে, ভারতে এমন কেহ নাই যে, তাহার আশ্রয় অবলম্বন করিয়া পরিতৃপ্ত হওয়া যায়। সুতরাং যে পণ্ডিতাভিমানিগণ সহস্র যোজন দূরে সাগর-সরিৎ গিরিগহ্বরাদি ব্যবধানে বাস করিতেছেন, ভারতের মোহিনী মূর্তি যাঁহারা স্বপ্নেও কখন দর্শন করিয়াছেন কিনা সন্দেহ, সে মূর্তির মাধুরী সূর্যকরের ন্যায় বেগবতী হইলেও, যাঁহাদিগের নিকট বিলম্বে উপনীত হয়, আর্যসন্তানগণের সকল বৃত্তান্তই যাঁহাদিগের পক্ষে নূতন, তাঁহাদেরই আশ্রয় গ্রহণ করিতে হয়। যেখানে অগাধ জল, সেখানে কোন্ আশ্রয় অবলম্বনীয় ? আমাদের কালামুখ !

যে সংস্কৃত এখন মৃত, যাহা এমন সুকৌশলসম্পন্ন এবং সুন্দর, যাহা স্বর্গে দেবতাদিগের ভাষা বলিয়া সকলের বিশ্বাস, এক কালে তাহা মনুষ্যেরও ভাষা ছিল। এতদ্বিষয়ের সপ্রমাণকারী বহু পণ্ডিত আছেন, তন্মধ্যে পরিচিতনামা ম্যুর, মূলর, লাসেন এবং বেনফির নাম মাত্র উল্লেখ করিলাম। সংস্কৃত বাক্যালাপের ভাষা হইয়া কত কাল চলিতেছিল এবং কোন্ সময়ে তাহার মৃত্যু হইয়াছে, তাহা উক্ত পণ্ডিতেরা যথাসাধ্য নির্ণয় করিয়াছেন। এতদ্বিষয় প্রস্তাবের শেষভাগে আলোচ্য, আপাততঃ আবশ্যক নাই। বাল্মীকিপ্রণীত রামায়ণ যৎকালে রচিত, বা যে আকারে তাহা আমাদের হস্তে আগত হইয়াছে, ইহা যখন সেই আকারে পরিণত হয়, তখন সংস্কৃত তদ্রূপ কথনীয় ভাষা ছিল,

কি, কেবল শিক্ষণীয় ভাষায় পরিণত হইয়াছিল, তাহা আলোচনা করা যাউক।

আরণ্যকাণ্ডে বাতাপি এবং ইল্বল নামক দৈত্যদ্বয়ের উপাখ্যানস্থলে কথিত হইতেছে যে,

ধারয়ন্ ব্রাহ্মণং রূপমিল্বলঃ সংস্কৃতং বদন্।
ন্যমন্ত্রয়ত বিপ্রান্……… ॥ ৫৬।১১ সর্গ।

—ইল্বল ব্রাহ্মণরূপ গ্রহণ করিয়া, সংস্কৃত কথন দ্বারা ব্রাহ্মণদিগকে নিমন্ত্রণ করিত।—পুনশ্চ সুন্দরকাণ্ডে হনুমান্ অশোকবনে উত্তীর্ণ হইয়া, কিরূপে সীতাসম্ভাষণ করিবেন, তাহা চিন্তা করিতেছেন এবং মনে মনে বিতর্ক করিতেছেন—"যদি বাচং বদিষ্যামি দ্বিজাতিরিব সংস্কৃতং।" ১৭।২৯ সর্গ।

—যদি দ্বিজাতিগণের ন্যায় সংস্কৃত বাক্য কহি।—আবার আশঙ্কা করিতেছেন যে, বানরজাতিতে তদ্রূপ কথার অসম্ভবতাহেতু সীতা তাঁহাকে মায়া-রূপধারী রাবণ ভাবিয়া ভীত হইতে পারেন। অনেক বিবেচনার পর স্থির করিলেন, "তস্মাদ্ বক্ষ্যাম্যহং বাক্যং মনুষ্য ইব সংস্কৃতং।" ৩৩।২৯ সর্গ।

—অতএব সাধারণ প্রচলিত সংস্কৃত বাক্যে কথা কহি।

আবার অযোধ্যাকাণ্ডে রামের বিদ্যাবত্তা সম্বন্ধে কথিত হইয়াছে, "শ্রৈষ্ঠ্যং শাস্ত্রসমূহেষু প্রাপ্তোব্যামিশ্রকেষু চ।" ২৭।১ সর্গ।

—ব্যামিশ্রকেষু—প্রাকৃতাদি ভাষামিশ্রিত নাটকাদিষু।—রামানুজঃ। শ্রেষ্ঠ শাস্ত্রসমূহ তথা প্রাকৃতাদি ভাষামিশ্রিত নাটকসমূহে পারদর্শী ছিলেন।—

ইহা দ্বারা কি প্রমাণিত হইতেছে? উদ্ধৃত প্রথম তিন বাক্য অনার্যলোকের মুখ হইতে নির্গত, সংস্কৃত তাহাদের পক্ষে ভিন্ন ভাষা বলিয়া ওরূপ উক্তি সম্ভব হইতে পারে। অনার্য জাতির ভাষা আর্যভাষা হইতে স্বতন্ত্র, তাহা বাল্মীকি বহু স্থানে বলিয়াছেন, এবং মনুসংহিতার ১০ম অধ্যায়ের ৪৫ শ্লোক তাহার প্রতিপোষক। অতএব ইল্বল এবং হনুমানের মুখ হইতে নির্গত বাক্য, সংস্কৃত তৎকালিক কথনীয় কি শিক্ষণীয় ভাষা, এতৎসম্বন্ধে প্রমাণরূপে গৃহীত না হইতে পারিত; এবং ইহাও বিবেচনা করা যাইতে পারিত যে, বাল্মীকি ইচ্ছাপূর্বকই উক্ত বাক্য উহাদের মুখে যোজনা করিয়াছেন; পুনশ্চ "বাচং দ্বিজাতিরিব সংস্কৃতং" এতদ্বাক্য কেবল ব্রাহ্মণজাতিতে আরোপিত না হইয়া, শূদ্রব্যতীত ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয় ও বৈশ্য এই বিভাগত্রয়ের দ্বিজাতিত্বহেতু, উহা কিছুই ভিন্নভাববোধক নহে বলিয়া বিবেচিত হইতে পারিত; কিন্তু তাহারই পার্শ্বে "মনুষ্য ইব সংস্কৃতং" এই বাক্যের অবস্থানহেতু উক্ত সন্দেহ খণ্ডন হইতেছে, এবং উহা দ্বারা পূর্ব পূর্ব বাক্যের অসারত্ব প্রমাণস্থলে প্রতিপাদিত না হইয়া বরং সারবত্তা দ্বিগুণতর দৃঢ়ীভূত হইতেছে। অতএব "মনুষ্য ইব সংস্কৃতং"

ইহার পূর্ব বাক্যের সহিত সম্বন্ধে, এই প্রতীত হয় যে, সংস্কৃত তখন সবৎসা, স্বয়ং-শিক্ষণীয় ভাষা এবং দ্বিজাতিগণের বরণীয়া, এবং ইহার দুহিতা সাধারণের সম্পত্তি। এই দুহিতা বা দুহিতৃগণই কালে পালি, প্রাকৃত প্রভৃতি নামে খ্যাত হইয়াছে। এই সময়ে যে ইহারা সদ্যোজাতা, এমতও নহে। যদি রামানুজের ব্যাখ্যা অভ্রান্ত হয়, তবে গ্রন্থাবলীতেও জননীসহ একত্রে আসন গ্রহণ করিতে শিখিয়াছে। ফলতঃ, তখন অস্তাচলশিখরোন্মুখ সূর্যের ন্যায় কথিত সংস্কৃতের শেষ দশা।

ভারতের যে প্রাচীন বিদ্যা লইয়া আমরা এত গৌরব করিয়া থাকি, সে প্রাচীন বিদ্যা তাহার উন্নতির শেষ সীমায় এই সময়ে অধিরোহণ করিয়াছিল। ধর্ম ও বৈজ্ঞানিক গ্রন্থের, বিশেষ ধর্মগ্রন্থের এই প্লাবনকাল। বেদচতুষ্টয় শিরোরত্নরূপে সর্বোপরি পরিশোভিত, আর সকল ভিন্ন স্বভাবের হইলেও তৎ-পথানুসারী, আবার যে সকল শাস্ত্র ভিন্নপথাবলম্বী, তাহারাও সম্ভ্রমরক্ষার্থে বেদবিহিত পথে ভক্তিযুক্ত। ১।১৪।৪০—ব্রাহ্মণ (২) এবং কল্পসূত্র (৩) ক্রিয়া-কলাপের বিধিপ্রদায়ক ও পবিত্র ইতিহাসাদির কথক, ১।৬।১৫—ষড়্‌বেদাঙ্গ (৪) অধ্যয়নের প্রধান অঙ্গ। বেদাঙ্গ ব্যতীত বেদবিদ্যা অধ্যয়ন সম্যক্ প্রকারে সম্পন্ন হইত না। ভরতের আতিথ্য করিবার সময়ে ভরদ্বাজ ঋষি, দ্রব্যাদি আয়োজন এবং সঙ্কুলানের নিমিত্ত, ২।৯১।২২—'শিক্ষাস্বর সমাযুক্ত সূক্ত পাঠ-দ্বারা বিশ্বকর্মাকে আহ্বান করিয়াছিলেন। ফলতঃ এই সময়ে উক্ত সমস্ত বিদ্যার বহুল চর্চা লক্ষিত হয়।'

অতি পূর্বকালে ভিন্ন ভিন্ন বেদশাখা অধ্যয়নের এবং অধ্যাপনের নিমিত্ত বহুসংখ্যক ব্যক্তি একত্র সমবেত হইয়া দলবিশেষে থাকিতেন। ঐ দলকে চরণ (৬) বলিত এবং চরণস্থ ব্যক্তিগণকে চারণ বলিত। বাল্মীকির সময়ে চরণ আর সেই চরণ নহে, চারণগণ দেব গন্ধর্ব ইত্যাদি নামের সহ তাঁহাদের নামযোজনমর্যাদা প্রাপ্ত হইয়াছেন। ইঁহারা এখন লোকালয় পরিত্যাগ করিয়া হিমাদ্রিশিখরে আশ্রয় লইয়াছেন। বোধ হয় মহাপ্রস্থানপথে অগ্রসর হইবার জন্য। অযোধ্যাকাণ্ডের দ্বাত্রিংশ সর্গে রাম বনগমনের পূর্বাহ্নে তৈত্তিরীয় এবং কণ্ঠ শাখার অধ্যাপকদিগকে ধনদান করিতেছেন। উক্ত সর্গপাঠে যতদূর অনুভব করিতে পারা যায়, তাহাতে ঐ অধ্যাপকদিগের বৃত্তি বর্তমান টোলের গুরুদিগের বৃত্তি হইতে ভিন্ন নহে। সেই প্রাচীন কালে বাল্মীকির সময়ে, দেখা যায় যে, আধুনিক ব্রাহ্মণ পণ্ডিতগণের ন্যায়, তখনকার ব্রাহ্মণ পণ্ডিতগণও বিশিষ্ট স্থানে অর্থলালসায় পরস্পরের প্রতি জিগীষাপরবশ হইয়া সভায় বাদানুবাদ করিতেন—

...তদা বিপ্রান্ হেতুবাদান্ বহূনপি।
প্রাহুঃ সুবাগ্মিনো ধীরাঃ পরস্পর জিগীষয়া ॥ ১৯।১।১৪

১।৬।৬ এবং আরও বহু স্থানে সূত অর্থাৎ পৌরাণিক মাগধ বংশাবলী কথক এবং বন্দিগণের রাজসভা এবং অন্যান্য বিশিষ্ট স্থানে অবস্থান দেখিতে পাওয়া যায়।

বেদপ্রতিপাদ্য ও বেদবিরোধী তর্ক ও দর্শনের অস্তিত্ব দৃষ্ট হয়। ২।১।১৭। রামের বহুগুণমধ্যে ইহাও একটি গুণ বলিয়া বর্ণিত হইয়াছে যে, কোন বিষয়ক প্রস্তাব উপস্থিত হইলে তিনি সুরগুরু বৃহস্পতির ন্যায় উত্তরোত্তর যুক্তি প্রদর্শন করিতে পারিতেন। ইহা দ্বারা তৎকালে দর্শনাদির অধ্যয়নবহুলতা সূচিত হইতেছে। বৈষয়িক বিদ্যার কত দূর উন্নতি হইয়াছিল তাহা সমাজের গঠন ও ক্রিয়াকলাপ দৃষ্টে পরে পরিচিত হইবে। সাহিত্যাদির সম্পর্কে নাটক (২।৬৯।৪) প্রভৃতির প্রচার ছিল এবং রামায়ণ যে সময়ের কাব্য তখন তৎসম্বন্ধে অধিক বক্তব্য আর কি আছে ?

২।৪—দশরথ, রবি মঙ্গল ও রাহু তাঁহার জন্মনক্ষত্র আক্রমণ করিয়াছে দেখিয়া আসন্ন বিপদজ্ঞানে ভীত হইতেছেন।—২।৪১ কথিত হইয়াছে, মঙ্গল বুধ বৃহস্পতি প্রভৃতি গ্রহ সোমে সংক্রান্ত হইয়া অতি অমঙ্গলসূচক হইয়া উঠিল। পুনশ্চ রামের জন্মনক্ষত্র—

ততশ্চ দ্বাদশে মাসে চৈত্রে নাবমিকে তিথৌ ॥৮॥
নক্ষত্রেঽদিতিদৈবত্যে স্বোচ্চসংস্থেষু পঞ্চসু
গ্রহেষু কর্কটে লগ্নে বাক্‌পতাবিন্দুনা সহ ॥৯॥১।১৮

ব্যাখ্যা—"অদিতি দৈবত্যে পুনর্বসৌ পঞ্চসু রবি ভৌম শনি গুরু শুক্রেষু উচ্চসংস্থেষু (৭) মেষ মকর তুলা কর্কট মীনস্থেষু সচন্দ্র গুরৌ কর্কটে লগ্নে স্থিতে সতি"—রামানুজঃ। ভরতাদির জন্মনক্ষত্র সম্বন্ধে—"পুষ্যে জাতস্তু ভরতো মীনলগ্নে প্রসন্নধীঃ। সার্পে জাতৌ তু সৌমিত্রী কুলীরেঽভ্যুদিতে রবৌ ॥" ১৫।১।১৮।

সার্প—অশ্লেষা, কুলীর—কর্কট।

ইহা দ্বারা[৮] এক দৃশ্যতেই প্রদর্শিত হইতেছে যে আর্যেরা বাল্মীকির সময়ে জ্যোতিষতত্ত্ব সম্বন্ধে আপনাদের দর্শন কতদূর বৃদ্ধি করিয়াছিলেন এবং তাহা আপনাদের শুভাশুভ কিরূপভাবে নিয়োজন করিয়াছিলেন। স্থানান্তরে যুদ্ধ-কালীন ঘোর অমঙ্গলের চিহ্নস্বরূপ কথিত হইয়াছে যে,

শ্যামং রুধিরপর্যন্তং বভূব পরিবেষণম্।
অলাতচক্রপ্রতিমং প্রতিগৃহ্য দিবাকরম্ ॥ ৩।৩।২৩ ॥

"রুধিরবর্ণ উপান্তভাগবিশিষ্ট অলাতচক্রপ্রতিম একটি শ্যামবর্ণ মণ্ডল সূর্যকে

আবরিত করিল।” সম্ভবত এরূপ অদ্ভুত দৃশ্য বাল্মীকির সময়ে বা পূর্বে কখন দৃষ্ট হইয়াছিল। উহার অদ্ভুততাই উহাকে অমঙ্গলের চিহ্নপদে আরোপিত করিবার হেতু। উহা কি জ্যোতিষজ্ঞ পাঠকেরা মীমাংসা করিয়া লইবেন ? (৯) ২।২৫।১৪—“বায়ুশ্চ সচরাচরঃ” স্থির এবং অস্থির বায়ুর তত্ত্বও ইহা দ্বারা বোধ হয় তৎকালে নিরূপিত হইয়াছিল।

দেহস্পন্দন স্বপ্নদর্শনে কুমঙ্গল বা সুমঙ্গলের চিহ্ন এবং তাহাতে ভীত বা আশাযুক্ত হওয়া এবং দৈবে বিশ্বাস অতি প্রবল।

ভারতের দেবতারা এখনও বেদোক্ত দেবতানিচয়, কিন্তু বড় ছলগ্রাহী, কথায় কথায় রাগ করেন, কথায় কথায় খুশী হয়েন ; ঋষিরাও তদ্রূপ,—দেবতার সংখ্যা কিছু বাড়িয়াছে বটে, কিন্তু সে ঋগ্বেদের সহ তুলনায়, প্রধানতঃ নির্ভর তেত্রিশটির (১০) উপরেই, ২।১১।১৩—“ত্রয়স্ত্রিংশদ্দেবা ইত্যাদি।” রাম-জননী কৌশল্যা পুত্রের বনগমনের পূর্বাহ্ণে তাহার মঙ্গল কামনায় (এবং শুধু তাহাতে পরিতৃপ্ত না হইয়া) খেচর ভূচর প্রভৃতিরও নাম গ্রহণ করিয়াছেন। এমন স্থলেই যখন প্রোক্ত দেবতাগণ সকলেই বৈদিক, কেহ নূতন সৃষ্ট নহে, তখন সহজেই প্রতিপন্ন হয় যে, বৈদিক দেবতাদিগের অদ্যাপি তেজোহানি হয় নাই। তবে স্থানান্তর আলোচনায় দেখা যায়, কেবল তেজোহানি হইতে আরম্ভ হইয়াছে মাত্র এবং যাঁহারা নূতন তাঁহারা জন্মগ্রহণ করিয়াছেন—কিন্তু অতি সামান্য সংখ্যক এবং সমৃদ্ধিসংস্থাপক কেবল আরম্ভ করিয়াছেন। ভারতের আধুনিক পুরাণ ও তন্ত্রপ্রভাবে পতঙ্গপালের ন্যায় যে দেবতামালা নিয়ত একাধিপত্য করিতেছেন, বাল্মীকির সময়ে তাঁহাদের অনেককে কেহ চিনিত না।

দেবতাগণ বৈদিক হইলেও এ সময়ে অনেকের অনেক মূর্তির ভাবান্তর হইয়াছে। ঋগ্বেদে রুদ্র বায়ুর অধিষ্ঠাত্রী দেবতা, মরুদ্‌গণ তাঁহার পুত্র এবং পৃশ্নি তাঁহার ভার্যা ; অথবা ঋগ্বেদের ৫-৫৬-৮ সায়নাচার্যের ভাষ্য অনুসারে “রোদসী রুদ্রস্য পত্নী মরুতাং মাতা। যদ্বা রুদ্রো বায়ুঃ তৎপত্নী মাধ্যমিকা দেবী।” বাল্মীকির সময়ে ইঁহার মরুদ্‌গণের সহ সম্বন্ধ সূচিত আছে বটে—

…স্থাণুং…
কৃতোদ্বাহস্তু দেবেশং গচ্ছন্তু সমরুদ্‌গণম্।

কিন্তু এক্ষণে ইঁনি ভিন্নমূর্তিধর, ভিন্ন ভিন্ন নাম প্রাপ্ত হইয়াছেন। ভার্যা হিমবদ্দুহিতা গৌরী, পুত্র স্কন্দ। সম্প্রদায়বিশেষের একমাত্র মুখ্য উপাস্য দেবতা। এবং প্রভাব এত প্রবল যে সেই সেই সম্প্রদায় ইঁহার নামানুসারে শৈব বলিয়া বিখ্যাত হইয়াছে।

বিষ্ণু বেদে সাধারণ পদবীর দেবতা, ইন্দ্রসহ সখ্যতায় পূজিত। ঐতরেয় ব্রাহ্মণেও নিম্নপদবীস্থ,—"অগ্নির্বৈদেবানামবমো বিষ্ণু পরমস্তদন্তরেণ সর্বা অন্যা দেবতাঃ।"—অগ্নি দেবতাদিমধ্যে প্রধান, বিষ্ণু সর্বকনিষ্ঠ। আর সমস্ত দেবতা এতদুভয়ের মধ্যস্থানাধিকারী।—ইনিও রামায়ণের সময়ে রুদ্রের ন্যায় ভিন্নমূর্তি-ধর সম্প্রদায়বিশেষের উপাস্য দেবতা। রামায়ণের প্রথম কাণ্ডে ৭৫ কাণ্ডে ভৃগুরাম পুরাকালীয় বিষ্ণু ও রুদ্রে সংগ্রাম বর্ণন করিয়াছেন, তাহাতে বিষ্ণুপক্ষে জয় সূচিত হইয়াছে। ইহা দ্বারা কালপ্রভাবে ক্রমান্বয়ে ভারতে বরুণ, তৎপরে ইন্দ্রদেবের যেমন প্রাধান্য লাভ হইয়াছিল, সেইরূপ তাহার পরে রুদ্র; আবার তাঁহাকে অতীত করিয়া, এক্ষণে বিষ্ণুর প্রাধান্য অনুমিত হইতেছে। ঐ কাণ্ডে ২৯ সর্গে বামনাশ্রম বর্ণনে বিষ্ণুর প্রাধান্য বর্ণিত হইয়াছে। শ্লোকদ্বয় মাত্র জ্ঞাপনার্থে আপাততঃ উঠান গেল।

তপোময়ং তপোরাশিং তপোমূর্তিং তপাত্মকং।
তপসা ত্বাং সুতপ্তেন পশ্যামি পুরুষোত্তমং ॥১২॥
শরীরে তব পশ্যামি জগৎ সর্বমিদং প্রভো।
ত্বমনাদিরনির্দেশ্যস্ত্বমহং শরণং গতঃ ॥১৩॥

তুমি তপোময়, তপোরাশি, তপোমূর্তি এবং তপঃস্বরূপ। হে পুরুষোত্তম! তপের দ্বারাই তোমার দর্শন পাইয়াছি। হে প্রভো! সমস্ত জগৎ তোমার শরীরে দর্শন করিতেছি তুমি অনাদি এবং নির্দেশরহিত, আমি তোমার শরণাগত হইলাম।

যদি আর সর্বত্রে কার্য দ্বারা এই প্রাধান্য প্রদর্শিত না হইত, তবে এগুলি ভক্তির আধিক্যজনিত অত্যুক্তি বলিয়া গৃহীত হইতে পারিত।

বাল্মীকিও রামকে বিষ্ণুর অবতার বলিয়া নির্দেশ করিয়াছেন। রাম নামে কোন নৃপতির অস্তিত্ব স্বীকৃত হইলে, বাল্মীকির সময়েতেই যে নরদেবতার উপাসনার সূত্রপাত হইয়াছে, তাহা প্রতীত হয়। কিন্তু নরদেব সম্বন্ধে মনুষ্য-প্রকৃতির মহত্ত্বে তখনও এতদূর বিশ্বাস ছিল যে বাল্মীকি সেই নরদেবের নিকট মনুষ্যপ্রকৃতের হেয়ত্ব এবং নীচত্ব প্রতিপাদন করিতে সাহস পায়েন নাই অথবা তাঁহার মনে সে ভাব উদয়ই হয় নাই। এই বিষয় পরবর্তী শাস্ত্রগ্রন্থের সহ তুলনা করিয়া দেখা যাউক; কত প্রভেদ দেখা যাইবে। অহল্যা ইন্দ্রসংস্রবে পতিত হইলে ঋষি গৌতম তাঁহাকে অভিশাপ প্রদান করিতেছেন—

বাতভক্ষ্যা নিরাহারা তপ্যন্তী ভস্মশায়িনী।
যদৈতচ্চ বনং ঘোরং রামো দশরথাত্মজঃ ॥

আগমিষ্যতি দুর্ধর্ষস্তদা পূতা ভবিষ্যসি ॥
তস্যাতিথ্যেন দুর্বৃত্তে !.........

নির্জনবাসিনী অনুতপ্তা অহল্যা রামের তপোবনে আগমন জ্ঞাত হওয়া মাত্রেই—

শাপস্যান্তমুপাগম্য তেষাং দর্শনমাগতা।
রাঘবৌ তু তদা তস্যাঃ পাদৌ জগৃহতুর্মুদা ॥ ১।৪৯

পুরাণানুসারে পাষাণময়ী অহল্যা পুনর্জীবন প্রাপ্ত হইলেন—

গচ্ছতস্তস্য রামস্য পাদস্পর্শান্মহাশিলা ॥—পদ্মপুরাণ

রাম এই অদ্ভুত দর্শনে বিস্ময়াবিষ্ট হইয়া, ব্যাপারটা কি, তাহা বিশ্বামিত্রকে জিজ্ঞাসা করিলে, বিশ্বামিত্র কহিতেছেন—

ত্বদঙ্ঘ্রি স্পর্শনাৎ তস্যৈ শাপান্তং প্রাহ গৌতমঃ।
তস্মাদিয়ং তে পাদাব্জস্পর্শাৎ শুদ্ধাভবৎ প্রভো ॥—পদ্মপুরাণ।

রামায়ণে গৌতম শাপ দিলেন যে অহল্যা বাতভক্ষ্যা, নিরাহার এবং ভস্মশায়িনী হইয়া রামের সেই বনে আগমন পর্যন্ত অনুতাপ করিবেন। এখানে রামের আগমন যেন অনুতাপ করণের কালনির্ণায়কস্বরূপ। তৎপরে রামকে বনে আগত জানিয়া অনুতাপের কাল পূর্ণ বিবেচনা করিলেন এবং রামের আতিথ্য করিবার নিমিত্ত 'দর্শনমাগতা'। রাম অহল্যাকে দর্শনমাত্রে পূজনীয় জ্ঞানে তাঁহার পাদগ্রহণ করিলেন। পদ্মপুরাণে গৌতম অহল্যাকে পাষাণময়ী করিলেন এবং মুক্তির যে উপায় কহিয়াছিলেন তদনুসারে রামের পাদস্পর্শে পাষাণময়ী অহল্যা পূর্বমূর্তি ধারণ করিলেন। এই প্রভেদ যে পূর্বে যিনি ভক্তিতে যাহার পদগ্রহণ করিতেন, এক্ষণে তিনিই আপন উচ্চতানুসারে তাহাকে শুধু পদ দেন না, আবার পদ দিয়া মানুষ করেন !

একের বিলয়ে অপরের আবির্ভাব যেরূপ হইয়া থাকে,—একজন ক্রমে চিত্ত অধিকার করিতেছেন, চ্যুতাধিকার আর-একজন মায়াবশতঃ ক্ষণে তথায় দেখা দিতেছেন ; বাল্মীকির সময়ে কথিত নূতনত্ব প্রচলন সত্ত্বেও সেইরূপ। এখনও বৈদিক ইন্দ্রের প্রাধান্য "সহস্রাক্ষে সর্বদেবেন সৎকৃতে"—২।২৫, স্মৃতিপথে উদয় হয়। যাগযজ্ঞাদি কল্পসূত্র এবং ব্রাহ্মণোক্ত বিধান অনুসারে হইয়া থাকে। উন্নতির মধ্যে শুধু পশু নহে, পক্ষী পর্যন্ত বলি প্রদত্ত হইয়া থাকে, এবং তাহা অধিকসংখ্যক (১।১৪)। যজ্ঞকর্তা মুখ্য পুরোহিত চারি প্রকার, হোতা, উদ্‌গাতা, অধ্বর্যু এবং ব্রহ্মা। ১-১৪-১৮—ইহাদের সহকারী লইয়া ষোড়শ জন। (১১) অগ্নিষ্টোম, জ্যোতিষ্টোম, অতিরাত্র প্রভৃতি বহুবিধ বৈদিক ক্রিয়াকলাপের উল্লেখ আছে। সমগ্র আলোচনা করিলে বৈদিক

হিন্দুধর্মরূপ প্রবলা নদীর বেগ ক্রমশ মন্দ হইয়া আসিতেছে এবং আধুনিক হিন্দুধর্মরূপ শাখা, যাহা এখন জননী অপেক্ষা পুষ্ট, তখন জন্মগ্রহণ করিয়া স্বীয় বেগ চালিবার নিমিত্ত পয়ঃপ্রণালী অনুসন্ধান করিতে প্রবৃত্ত হইয়াছে মাত্র।

ধর্মোপার্জিত লব্ধফল লইয়া গৃহে আগত ব্যক্তির সহ কৌতুকাবহ সম্ভাষণ দেখিতে পাওয়া যায়। ৩।৫—রাম শরভঙ্গের আশ্রমে উপস্থিত হইলে, শরভঙ্গ কহিতেছেন যে আমি তপোবলে যত লোক অধিকার করিয়াছি, তাহা তুমি প্রতিগ্রহ করিয়া সেই সমস্ত লোক স্বচ্ছন্দে ভোগ কর। রাম তদুত্তরে প্রতিগ্রহ না করিয়া কহিলেন, আমি স্বয়ং ঐ সকল লোক আহরণ করিব। পুনশ্চ ৩।৭—মহর্ষি সুতীক্ষ্ণকর্তৃক তথাবিধ সম্ভাষণপ্রথা মহাভারতেও দেখিতে পাওয়া যায়।

পরলোক সম্বন্ধে পুরস্কার এবং তিরস্কার অর্থাৎ স্বর্গ এবং নরক এতদুভয়েই দৃঢ় বিশ্বাস। পুরস্কার অর্থাৎ স্বর্গবাস পুণ্যকর্মের তারতম্য অনুসারে ভিন্ন ভিন্ন রূপ, তজ্জন্য ভিন্ন ভিন্ন লোকসকল প্রতিষ্ঠিত। লোকাবশেষে মানুষিক অর্থাৎ ইন্দ্রিয়ায়ত্ত এবং অমানুষিক অর্থাৎ চিত্তায়ত্ত সুখ। যাগযজ্ঞাদি কেবল কর্মদ্বারা অপেক্ষাকৃত নিকৃষ্ট লোক অধিকৃত হয়, তথায় পার্থিব সুখের প্রাচুর্য মাত্র, কর্মফল শেষ হইলেই পুনর্বার ভূমণ্ডলে জন্মগ্রহণ করিতে হয়। যোগ তপঃ প্রভৃতি সাধনে ব্রহ্মানন্দ লাভ হয়। স্বর্গের ভাব ভারতে কোন্ সময়ে কত দূর চিন্তায়ত্ত হইয়াছিল, নিম্নলিখিত বাক্যাবলী হইতে তৎসাময়িক তদ্বিষক অপর বাক্যাবলীর সম্বন্ধ বিচ্ছেদ করিয়া, তাহার আলোচনা করা যাউক। ঐতরেয় ব্রাহ্মণে "সহস্রাশ্বিনে বৈ ইতঃ স্বর্গলোকঃ", সহজ কথায় পৃথিবী হইতে স্বর্গ এক হাজার ঘোড়ার ডাক। তৈত্তিরীয় ব্রাহ্মণে "দেবগৃহাঃ বৈ নক্ষত্রাণি। য এবং বেদ গৃহী ভবতি"—নক্ষত্রনিচয় দেবতার নিবাস, যে ইহা জ্ঞাত সে গৃহযুক্ত হয়।—বাল্মীকির সময়ের সারাংশ উপরে কথিত হইয়াছে। বিষ্ণুপুরাণে—

মনঃপ্রীতিকরঃ স্বর্গোনরকস্তদ্ বিপর্যয়ঃ।
নরকস্বর্গসংজ্ঞেবৈ পাপপুণ্যে দ্বিজোত্তম॥ ২।৬।৪০

হে দ্বিজোত্তম! যাহা মনের প্রীতিকর তাহাই স্বর্গ এবং তদ্বিপর্যয় নরক। অতএব নরক পাপপুণ্যের নামান্তর মাত্র।

যম (১২) পাপের দণ্ডদাতা। পিতৃলোকের অধিপতি। পুণ্যবন্তদিগের সহিত সম্পর্ক নাই। এই দুই কথাই পরস্পরবিরোধী। রামায়ণ-মতে পিতৃলোক,

মৃত পূর্বপুরুষগণের আত্মা, আবার তাঁহারা পুণ্যবান এবং বহু সুখে সুখী। ঐতরেয় ব্রাহ্মণমতে পিতৃলোক পৃথক্ সৃষ্ট। এক গ্রন্থেই এরূপ উক্তিভেদ এবং ভিন্ন গ্রন্থের সহিত মতবিরোধ, ভারতবর্ষীয় সাধারণ মতের চিরানৈক্যের প্রমাণ-স্বরূপ এবং কালে যে কল্প মন্বন্তর প্রভৃতি কল্পিত হইয়াছে, ঐ সকল বিরোধী মতের সামঞ্জস্য সম্পাদন করা তাহার এক প্রধান উদ্দেশ্য। যমের পুরে পাপানুসারে নরকভোগ হয়, তাহার দণ্ডবিধান কায়িক ক্লেশ দান। আবার বিষয় বিরোধ! পরলোকে এতদ্রূপ কায়িক এবং মানসিক সুখদুঃখ বিধানের একত্র অবস্থান অতি আশ্চর্য বিষয়। অবিনাশী ব্রহ্মলোকের পার্শ্বেই আবার গন্ধর্বাপ্সরঃশোভিত স্বর্গ, তৎপার্শ্বে মলপরিপূরিত নরককুণ্ড। একদিকে আত্মা অশরীরী, অন্যদিকে শরীরময়। যে চিত্তে পরলোক বিষয়ে সর্বোচ্চ ভাবের আবিষ্কার, সেই চিত্তেই আবার ঐ বিষয়ক হেয় ভাবের অবস্থান। এ দোষ কেবল রামায়ণের নহে। তৈত্তিরীয় উপনিষদের ব্রহ্মানন্দবল্লীতে কথিত হইয়াছে যে আত্মা সাধারণ পুণ্যকর্মাদিতে লোকবিশেষে (যথাকার সুখ পার্থিব সুখের আধিক্য ব্যতীত আর কিছুই নহে) সুখ ভোগ করে, কর্মফল শেষ হইলেই পুনর্বার পৃথিবীতে জন্ম লয়, পরে উচ্চতম কর্ম দ্বারা—ব্রহ্মানন্দ লাভ করিয়া থাকে। এই উপনিষদের-সৃষ্টিকালে ভারতের চিন্তাশক্তি এই উচ্চতম সোপানে উঠিয়াছিল, উপনিষদ পাঠেই এমন বোধ হয়, কিন্তু তখনও পূর্ববর্ণিত ভাবের প্রাচুর্য। ইহার কারণ নানারূপ হইতে পারে। ঋগ্বেদের ১০ম মণ্ডলস্থ ১২৯ সূক্তের আলোচনায়, তৎকালিক চিন্তাশক্তি বহুদূরগামিনী বলিয়া যদিও গৃহীত হইতে পারে, কিন্তু স্বর্গ সম্বন্ধে পার্থিব সুখের আধিক্য ব্যতীত উচ্চতর ভাবের সর্বত্র অভাব। তদ্রূপ অন্য বেদ। যেমন শুনিতে পাই, বেদ আর্যগণের সমস্ত ধর্মতত্ত্বের শিরোভূষণ। সুতরাং মানবমনে পরে যে কিছু চিন্তাতরঙ্গ উঠিত তাহা হয় বেদানুসারী হইত, নতুবা ভিন্নপথগামী হইলেও বেদবিহিত তত্ত্বের বশ্যতা অস্বীকারে নানা কারণে সমর্থ হইত না।

মৃতব্যক্তির অগ্নিদাহ দ্বারা অন্ত্যেষ্টিক্রিয়া সমাপন করিয়া তর্পণ করা বিধি। ২।৭৭—ভরত পিতৃবিয়োগ হইলে দশাহ (১৪) অন্তে কৃতশোচ হইয়া, দ্বাদশাহে শ্রাদ্ধকর্ম সমাপন করত, ত্রয়োদশ চিতা উত্তোলনপূর্বক স্থলশুদ্ধি করিলেন। ইহা দ্বারা তৎকালে হিন্দু প্রেতকার্য কিরূপে সাধিত হইত তাহা অনুমিত হইতেছে। কিন্তু রাক্ষস অর্থাৎ অনার্যগণের স্বতন্ত্র প্রথা লক্ষিত হয়। ৩।৪। ২২—বিরাধ নামে রাক্ষস রামশরে আহত হইয়া, আসন্ন মরণ দেখিয়া রাম কর্তৃক তাহার দেহ যাহাতে ভূগর্ভে নিহিত হয়, তদ্বিষয়ে প্রার্থনা করিয়া

কহিতেছে যে ভূগর্ভে নিহিত হওয়াই রাক্ষসদিগের সনাতন ধর্ম এবং স্বর্গ-লাভের উপায়।

২।১০৮—মহর্ষি জাবালি রামের প্রবোধার্থে যে সমস্ত মত কহিয়াছিলেন তাহা আর্যধর্মবিরোধী। এতদ্দ্বারা ইহা প্রতিপন্ন যে তৎকালে ঐরূপ মত উদ্ভাসিত এবং প্রকাশ্য বা অপ্রকাশ্য রূপে ঘোষিত হইতে আরম্ভ হইয়াছে। আবার সুযোগমতে রাজারাও প্রচারকদিগকে দণ্ড দিতে পারিলে ছাড়িতেন না। রাম জাবালির কথায় তাঁহাকে কহিতেছেন,

যথা হি চোরঃ স তথা হি বুদ্ধস্তথাগতং নাস্তিকমত্র বিধি।

এই সময়ে সামাজিক শাসন অতি কঠিন এবং ধর্মতত্ত্বের প্লাবন, এরূপ মত প্রবর্তিত হওয়ার আবশ্যক।

চৈত্র ১২৮০

(১) বাল্মীকির পূর্বগত ভগবান যাস্কের নিরুক্ত গ্রন্থে "অথাপি ভাষিকেভ্যো ধাতুভ্যো নৈগমাঃ কৃত ভাষ্যন্তে দমূনাঃ ক্ষেত্রসাধা ইতি।" ২।২—নৈগম অর্থাৎ বৈদিক অনেক শব্দ, যথা 'দমূনাঃ' 'ক্ষেত্রসাধা' প্রভৃতি ভাষায় ব্যবহৃত ধাতু হইতে সাধিত ইহারা দৃষ্ট হয়।—এখানে বৈদিক সংস্কৃত হইতে যাস্কের সংস্কৃতের প্রভেদ দৃষ্ট হইল বটে কিন্তু ঐ সংস্কৃত ভাষা বলিয়া উল্লিখিত হইয়াছে। আবার রামায়ণের তথাবিধ আকৃতি ধারণের কিছু পরে রচিত মৃচ্ছকটিক নাটকে দৃষ্ট হয়, "মম দাব দুবেহিং জ্জেব হস্মং জাঅদি ইথিয়াএ সক্কদং পটন্তীয়ে" ইত্যাদি—এই দুই বিষয়ে আমার অত্যন্ত হাসি পায়, এক স্ত্রীলোকের মুখে সংস্কৃত পাঠ শ্রবণ, আবার—এখানে সংস্কৃত একেবারে অন্তর্হিত। এই প্রমাণাবলী বিনানুসন্ধানে উদ্ধৃত হইল, সামান্য অনুসন্ধানে অপর্যাপ্ত পাওয়া যায়।

(২) ব্রাহ্মণ গ্রন্থসমূহ অষ্টাদশ পুরাণ সৃষ্টির পূর্বে পুরাণ বলিয়াও আখ্যাত হইত। উহা সমুদ্রবিশেষ বলিলে হয়। এত ভিন্ন ভিন্ন বিষয়ক প্রস্তাবে পরিপূর্ণ যে ব্রাহ্মণ কি? ইহা বলিতে গেলে কোন্ বিষয়ের প্রাধান্য ধরিতে হইবে, তাহা লইয়াই কত মতভেদ আছে। সে বিচারে কাজ নাই, এখানে ইহাই বলা যথেষ্ট যে সাধারণের পক্ষে বেদ দুরভিগম্য হইলেও তাহার অর্থবাদ এবং সাধারণে প্রচলিত প্রবাদ ও রীত্যাদি অবলম্বন করিয়া কর্মকাণ্ড প্রভৃতির আকৃতিগঠন এবং ঐতিহাসিক মীমাংসা ইহাই প্রধানতঃ ব্রাহ্মণ গ্রন্থসমূহের উদ্দেশ্য।

(৩) যে গ্রন্থাবলীর দ্বারা বেদ এবং ব্রাহ্মণোক্ত ক্রিয়াপদ্ধতি মীমাংসা ও জ্ঞাপিত হয় এবং গার্হস্থ্য ও সামাজিক কর্মের বিধি প্রদত্ত হয় তাহাদের সাধারণ কল্পসূত্র। ইহা ষড়্ বেদাঙ্গের এক অঙ্গ। (৪) "শিক্ষাকল্পো ব্যাকরণং নিরুক্তং ছন্দজ্যোতিষং।" শিক্ষা। বেদবিদ্যার বর্ণ (Letters), বল (Organs of Pronunciation), মাত্রা (Quantity), স্বর (Accent), সাম (Delivery), সন্তান (Euphonic Laws) যদ্দ্বারা শিক্ষা প্রদত্ত হয়।

কল্প। ৩ টীকা দেখ।

ব্যাকরণ। বেদবিদ্যা এবং ভাষার ব্যুৎপত্তি সাধন ব্যাকরণ। পাণিনির প্রণীত ব্যাকরণ সচরাচর বেদাঙ্গের পুস্তক বিশেষ বলিয়া খ্যাত।

নিরুক্ত। বেদবিদ্যার ধাতু ও শব্দজ্ঞান প্রভৃতি শিক্ষা দিয়া থাকে। যাস্কপ্রণীত নিরুক্তই উক্ত নামধেয় বেদাঙ্গের পুস্তকবিশেষ বলিয়া খ্যাত।

"বর্ণাগমো বর্ণবিপর্য্যয়শ্চ দ্বৌ চাপরৌ বর্ণ বিকারণশৌ।
ধাতোস্তদর্থাতিশয়েন যোগস্তদুচ্যতে পঞ্চবিধং নিরুক্তং ॥ শব্দকল্পদ্রুমঃ।

ছন্দঃ। যাহা দ্বারা বেদ ব্যবহৃত ছন্দঃসমূহের বিষয় শিক্ষা প্রদত্ত হয়।

জ্যোতিষ। নক্ষত্রবিদ্যা। মূল প্রস্তাবে দেখ। ঋগ্বেদের সময়েও আর্যজাতিরা মলমাসতত্ত্ব এবং গ্রহনক্ষত্রের গতি সুন্দররূপে নিরূপণ করিয়াছিলেন।

(৫) অতি কৌতুকের বিষয়। চিরবিশ্বাস যে রাম ত্রেতাযুগের এবং বাল্মীকি তাঁহার ষাইট হাজার বৎসর পূর্বে অনাগত রামচরিত রচনা করেন। বেদবিভাগকর্তা সত্যবতীসুত কৃষ্ণ দ্বৈপায়ন ব্যাস দ্বাপরে জন্মগ্রহণ করেন বলিয়া কথিত। বেদবিভাগ সম্বন্ধে নিরুক্তের ব্যাখ্যাকার দুর্গাচার্য বলিতেছেন, "বেদং তাবদেকং সন্তমতি মহাত্ত্বাদ্ দুরধ্যেয়মনেকশাখাভেদেন সমাম্নাসিষুঃ। সুখগ্রহণায় ব্যাসেন সমাম্নাতবন্তঃ।"—ব্যাসের পূর্বে বেদ অবিভক্ত থাকায় অধ্যয়নের পক্ষে অতি কষ্টকর হওয়ায়, তাহা সাধারণের নিকট সুগম করিবার নিমিত্ত ব্যাস কর্তৃক বেদ ভিন্ন শাখায় বিভক্ত হয়। রামায়ণে (যেমন প্রদর্শিত হইতেছে) এই বেদশাখা-সমূহের বহুল উল্লেখ আছে।

(৬) "চরণশব্দঃ শাখা বিশেষাধ্যয়ন পরৈকতাপন্নজনসঙ্ঘ বাচী।" জগদ্ধরবাক্য। চারণগণ চরণস্থ সকলের সম্মতি অনুসারে কোন বিশেষ বিধি বদ্ধ করিয়া তদনুসারে চলিতেন। তদ্ভিন্ন এক চরণ হইতে অন্য চরণের ভিন্নভাবত্বপ্রতিপাদক বহুতর বিষয় ছিল। (৭) এই গণনা সম্বন্ধে যিনি কৌতূহলাবিষ্ট তিনি বেন্টলি সাহেবের হিন্দু জ্যোতিষতত্ত্ব অবলোকন করিবেন।

(৮) এই গ্রহনক্ষত্রাদির গতি সম্বন্ধে পরবর্তী হিন্দুজ্যোতিষের কতদূর সম্বন্ধ ইহা যাঁহার দেখিতে ইচ্ছা হইবে এবং সঙ্কেত সহ ঘনিষ্ঠতা পরীক্ষা করিতে কৌতূহল জন্মিবে, তিনি সূর্য-সিদ্ধান্তের স্ফুটগতি নামক দ্বিতীয় অধ্যায় দেখিবেন।

(৯) গ্রীসীয় পুরাবৃত্তে কথিত আছে যে খ্রীষ্টের সপ্তম শতাব্দী পূর্বে প্রায় সমগ্র সূর্যগ্রহণ হওয়ায় উহা অমঙ্গলসূচক জ্ঞানে লিডীয় এবং মীড জাতির মধ্যে প্রস্তাবিত যুদ্ধ হয় নাই। ইহাও আকৃতিতে বাল্মীকির বর্ণনার প্রায় অনুরূপ। এরূপ গ্রহণ অতি অদ্ভুত ও কদাচিৎ সম্ভব। পরে গণনা দ্বারা নিরূপিত হইয়াছে যে এই গ্রহণ খ্রীষ্টের ৬১০ বৎসর পূর্বে ৩০শে সেপ্টেম্বর দিবসে হইয়াছিল। এই গ্রহণের ঘটনার বিষয়ে Herodotus, Book. I Chap. 103. দেখ।

(১০) ঋগ্বেদ ১-১৩৯-১১, ৮-৩০-২, ৮-২৮-১ ইত্যাদি। আবার ঋগ্বেদের স্থানান্তরে (৩-৯-৯) দেবতার সংখ্যা বৃদ্ধি দেখা যায়, যথা "ত্রীণিশতা ত্রীসহস্রাণি অগ্নিং ত্রিংশচ্চ দেবাঃ নব চ অসপর্যান্।" তিনশত তিন সহস্র একোণ চত্বারিংশ দেবতা অগ্নির পূজা করিয়াছিলেন। এই ৩৩ জন দেবতা কাহাকে কাহাকে লইয়া, তদ্বিষয়ে ভিন্ন ভিন্ন গ্রন্থে ভিন্ন রূপ কথিত হইয়াছে। শতপথ ব্রাহ্মণে ৪।৫।৭ "অষ্টৌ বসবঃ একাদশরুদ্রাঃ দ্বাদশ-আদিত্যা ইমে এব দ্যাবা পৃথিবী ত্রয়স্ত্রিংশৌ।"

(১১) হোতা এবং সহকারী মৈত্রাবরুণ অচ্ছাবাক, গ্রাবস্তুৎ। উদ্গাতা এবং সহকারী প্রস্তোতা, অগ্নীধ্র, পোতা। অধ্বর্যু এবং সহকারী প্রতিস্তোতা, নেষ্টা উন্নেতা। ব্রহ্মা এবং সহকারী ব্রাহ্মণচ্ছংসি, প্রতিহর্তা, সুব্রহ্মণ্য। ইঁহাদের দক্ষিণাভাগ সম্বন্ধে মনু ৮।২১০ ব্যাখ্যায় কুল্লুক ভট্ট লিখিয়াছেন যে মুখ্য ঋত্বিক অর্থাৎ হোতা, উদ্গাতা অধ্বর্যু এবং ব্রহ্মা ইঁহারা সমান সমান ভাগ পাইয়া থাকেন। মৈত্রাবরুণ, প্রতিস্তোতা, ব্রাহ্মাণচ্ছংসি এবং প্রস্তোতা ইঁহারা মুখ্য ঋত্বিকের অর্ধেক। অচ্ছাবাক, নেষ্টা, যোগ যজ্ঞ তপ প্রভৃতি অগ্নীধ্র এবং প্রতিহর্তা মুখ্য ঋত্বিকের তৃতীয়াংশ। গ্রাবস্তুৎ, উন্নেতা, পোতা এবং সুব্রহ্মণ্য মুখ্য ঋত্বিকের চতুর্থাংশ পাইয়া থাকেন।

(১২) আদি পর্ব যযাতি উপাখ্যানে ৯৩ অধ্যায়।

(১৩) ঋগ্বেদ মতে যম ত্বষ্টৃ দুহিতা সরণ্যু এবং বিবস্বতের পুত্র, যমীর সহ যমজ হইয়া জন্মগ্রহণ করেন। এবং পরলোকের পথ মনুষ্যদিগকে প্রথম প্রদর্শন করান। তাঁহার পুত্র প্রহরী শ্যামা ও শবলা নামে চতুশ্চক্ষু বিশিষ্টা কুক্কুরীদ্বয়। দূত দুইজন অসুতৃপ ও উদুম্বল। অধ্যাপক মক্ষমূলরের মতে বিবস্বত অর্থে আকাশ। সরণ্যু অর্থে প্রাতঃকাল। যম অর্থে দিবা। যমী অর্থে রাত্রি।—Science of Language, Vol. II, page 481 & 508.

(১৪) মনু ৫।৮৩, ক্ষত্রিয়েরা দ্বাদশ দিবসে কৃতাশৌচ হয়।

কালিদাস

মহাকবি কালিদাসের নাম ভুবনবিখ্যাত। তাঁহাকে ভারতীয় কালিদাস বলিলে অপমান করা হয়। শেক্ষপিয়র যেরূপ সুমধুর কবিতার নির্মল প্রস্রবণে জাগতিক মানবগণের মন সিক্ত করিয়াছেন, কালিদাসের কবিতাও তদ্রূপ সর্কলের হৃদয়কন্দরে প্রেমবারি সিঞ্চন করিয়াছে। কি স্বদেশীয়, কি বিদেশীয়, যিনি একবার কালিদাসের মধুমাখা অমূল্য কবিতাকলাপ পাঠ করিয়াছেন, তিনি মুক্ত-কণ্ঠে জাতিভেদ ভুলিয়া তাঁহাকে "আমাদিগের কবি কালিদাস" বলিয়া তাঁহার প্রতি প্রীতি প্রকাশ করিতে ত্রুটি করেন নাই! তাঁহার কাব্যসমূহ অত্যল্পকালের মধ্যে ইংরাজী, জর্মন, ফ্রাসীশ, দেন এবং ইতালীয় ভাষায় অনুবাদিত হইয়াছে। এই সকল অনুবাদ সাদরে সহস্র সহস্র ব্যক্তি পাঠ করিয়া রচয়িতার অসামান্য ক্ষমতার ভূরি ভূরি প্রশংসা করিয়া থাকেন এবং অনুবাদকগণ আমাদিগের চতুষ্পাঠীর ভট্টাচার্যগণ অপেক্ষাও কালিদাসের কবিতার বিমল রসাস্বাদনে আপনাদিগকে চরিতার্থ বোধ করেন। ভাষাতত্ত্ববিৎ জোন্স, উইলসন, লাসেন, উইলিয়মস্, ঈএটস্, ফসি, ফোকক্স্, সেজি এবং অদ্বিতীয় জর্মন কবি পণ্ডিত গেটে ও বহুবিদ্যাবিশারদ শ্লেগল এবং হম্‌বোল্ট কালিদাসকে কবিশ্রেষ্ঠ পদ প্রদান করিয়া ইউরোপখণ্ডে তাঁহার খ্যাতি বিস্তার করিয়াছেন। গেটে— জর্মনদেশীয় একজন সুপ্রসিদ্ধ কবি। জর্মনদেশে ত কথাই নাই, ইংলণ্ডে কারলাইলের ন্যায় লেখকচূড়ামণি তাঁহার গ্রন্থপাঠে মোহিত হইয়াছেন, এমন কি তাঁহার মতে সেক্ষপিয়রের "হ্যামলেট" অপেক্ষা গেটের "ফস্ট" একখানি উৎকৃষ্ট নাটক। বায়রন তাহার ছায়ামাত্র লইয়া "ম্যানফ্রেড" রচনা করিয়াছেন; সুতরাং গেটে একজন সাধারণ কবি নহেন। তাঁহার মত প্রধান কবি, কালিদাসের কবিত্বশক্তির প্রশংসা করিলে সে কথা গুরুতর বোধ করিতে হয়। তিনি উইলিয়ম জোন্স-কৃত ইংরাজী অনুবাদের জর্মন অনুবাদ পাঠে পুলকিত হইয়া লিখিয়াছেন, "যদি কেহ বসন্তের পুষ্প ও শরদের ফল লাভের অভিলাষ করে, যদি কেহ চিত্তের আকর্ষণ ও বশীকরণকারী বস্তুর অভিলাষ করে, যদি

* মেঘদূতম মহাকবি কালিদাস বিবচিতম্। মল্লিনাথ সূরি বিরচিত সঞ্জীবনী টীকা সমেতম্। বহুল গ্রন্থ সঙ্কলিত সদৃশ ব্যাখ্যা সহিতম পাঠান্তরৈশ্চ কাশ্মীরীয় দ্বিজ শ্রীপ্রাণনাথ পণ্ডিতেন প্রকাশিতম ভাষান্তরিতঞ্চ। কলিকাতা।

* কুমারসম্ভবম্। সপ্তমসর্গান্তম্। মহাকবি কালিদাস কৃতম্। শ্রীমল্লিনাথ সূরি বিরচিতয়া সঞ্জীবনী সমাখ্যয়া ব্যাখ্যয়া গবর্ণমেন্ট সংস্কৃত পাঠশালাধ্যাপক শ্রীতারানাথ তর্কবাচস্পতি ভট্টাচার্যকৃত তট্টীকাধৃত ব্যাকরণসূত্র বিবরণোদ্ভাসিতয়ান্বিতম্ তেনৈব সংস্কৃতম। কলিকাতা।

কেহ প্রীতিজনক ও প্রফুল্লকর বস্তুর অভিলাষ করে, যদি কেহ স্বর্গ ও বস্তুর, এই দুই এক নামে সমাবেশিত করিবার অভিলাষ করে, তাহা হইলে, হে অভিজ্ঞান শকুন্তল ! আমি তোমার নাম নির্দেশ করি এবং তাহা হইলেই সকল বলা হইল।"* একজন বিদেশীয় কবি শকুন্তলার এতাদৃশ প্রশংসা করিয়াছেন, কিন্তু আমাদিগের ভট্টাচার্য মহাশয়েরা যথার্থ কবিত্বরস পানে এককালে বিমূঢ়—তাঁহারা নস্য লইয়া গম্ভীরস্বরে কহিবেন, "মাঘ উৎকৃষ্ট কাব্য।"† তাঁহারা চতুষ্পাঠীতে ছাত্রগণকে কালিদাসকৃত কোন কাব্য পাঠ করিতে না দিয়া ব্যাকরণের সঙ্গে "ভট্টি" ও "নৈষধ" পড়িতে উপদেশ দিয়া থাকেন। এক্ষণে সংস্কৃত কালেজের ছাত্রগণ ভিন্ন কালিদাসের গ্রন্থের ব্রাহ্মণ পণ্ডিতগণ তাদৃগ্ আদর করেন না—এমন কি, এক ব্যক্তি মেঘদূত অপেক্ষা জীব গোস্বামীর "গোপালচম্পূ" নামক আধুনিক অপকৃষ্ট কাব্যের প্রশংসা করিলেন। কিন্তু এ-সকল বঙ্গদেশীয়গণের কথা—পশ্চিমপ্রদেশীয় পণ্ডিতগণ ভারতবর্ষীয় কবিগণের মধ্যে কালিদাসকে সর্বোচ্চাসন প্রদান করেন। বোম্বাই-প্রদেশস্থ সুপ্রসিদ্ধ পণ্ডিত ভাওদাজী কালিদাসের শুদ্ধ কবিতাপাঠে ক্ষান্ত না হইয়া, বহু পরিশ্রম ও বহুবায়াস স্বীকার করত প্রাচীন সংস্কৃত গ্রন্থ ও তাম্রশাসনপত্র হইতে তাঁহার জীবনচরিত সম্বন্ধে অনেক বিবরণ সংগ্রহ করিয়াছেন। আমরা তাঁহার প্রস্তাব প্রামাণিক বোধ করিয়া কোন কোন অংশ গ্রহণ করিলাম।

কালিদাস বিখ্যাতনামা মহারাজ বিক্রমাদিত্যের নবরত্নের অন্তর্বর্তী ছিলেন; ইহা ভিন্ন তাঁহার প্রামাণিক জীবনবৃত্তান্ত সংক্রান্ত অন্য কোন বিবরণ সাধারণ লোকে অবগত নহে। বঙ্গদেশীয় পণ্ডিতাভিমানী কতিপয় ব্যক্তি তাঁহাকে লম্পট স্থির করিয়া উলঙ্গ আদিরসঘটিত কবিতাবলী তাঁহার নামে প্রচার করিয়া থাকেন। চতুষ্পাঠীর ব্রাহ্মণ যুবকেরা মুগ্ধবোধ ব্যাকরণের কিয়দংশ পাঠ করিয়াই এ সকল উদ্ভট শ্লোক অভ্যাস করিয়া ধনিগণের মনোরঞ্জন করতঃ বার্ষিকী গ্রহণ করেন। ফলে এ সকল উদ্ভট কবিতা কালিদাসের কৃত নহে, আধুনিক কবিরচিত। "প্রফুল্লজ্ঞান নেত্র" নামক একখানি বাঙ্গালা পদ্যময় বটতলার মুদ্রিত পুস্তকে কালিদাসের জীবন-চরিত্রমধ্যে প্রচলিত রসিকতাজনক কাল্পনিক গল্প প্রকাশ করিয়া, গ্রন্থকার স্বীয় কলুষিত উদ্ভাবনাশক্তির পরিচয় দিয়াছেন। সম্প্রতি ইংরাজী ভূমিকা সহ যে একখানি "রঘুবংশ" সটীক মুদ্রিত

* সংস্কৃত ভাষা ও সংস্কৃত সাহিত্যবিষয়ক প্রস্তাব।

† উপমা কালিদাসস্য ভারবেরর্থগৌরবম্।
নৈষধে পদলালিত্যং মাঘে সন্তি ত্রয়োগুণাঃ

হইয়াছে, তাহাতেও এই সকল কাল্পনিক গল্প সংকলিত হইয়াছে, দেখিয়া দুঃখিত হইলাম।

কালিদাস কোন গ্রন্থেই আপন পরিচয় কিছুই প্রকাশ করেন নাই। লিখিত আছে যে ;—

ধন্বন্তরিঃ ক্ষপণকোমরসিংহ শংকু-
র্বেতালভট্টঘটখর্পরকালিদাসাঃ
খ্যাত বরাহমিহিরো নৃপতেঃ সভায়াং
রতনানিবৈ বররুচির্নববিক্রমস্য।

এইমাত্র নবরত্নের পরিচয়ে তাঁহার পরিচয়। "অভিজ্ঞান শকুন্তল" গ্রন্থকর্তার এই পরিচয়ে কখনই সন্তুষ্ট থাকিতে পারি না! সুতরাং অন্যান্য সংস্কৃত গ্রন্থে তাহার বিষয় অনুসন্ধান করা আবশ্যক।

প্রায় পাঁচশত বৎসর বিগত হইল, কোলাচল মল্লিনাথ সূরি কালিদাসের কাব্যসমূহের টীকা রচনা করেন ; তাঁহার টীকা দক্ষিণাবর নাথের টীকা দৃষ্টে রচিত হয়। কিন্তু তাহা অত্যন্ত দুষ্প্রাপ্য।

ভাষাতত্ত্ববিৎ লাসেন কহেন, কালিদাস দ্বিতীয় খ্রীষ্টাব্দে সমুদ্রগুপ্তের সভায় বর্তমান ছিলেন। লাসেন লাট প্রস্তরফলকে সমুদ্রগুপ্তের "কবিবন্ধু কাব্যপ্রিয়" প্রভৃতি প্রশংসাবাদ দৃষ্টে কবিশ্রেষ্ঠ কালিদাসকে তাঁহার সভাসদ্ বিবেচনা করিয়াছেন।

বেণ্টলি, মসূর পাডির "জর্নেল এসিয়াটীক" নামক পত্রিকায় "ভোজপ্রবন্ধের" ফরাসীশ অনুবাদ ও "আইন আকবরী" দৃষ্টে লিখিয়াছেন, ভোজরাজার ৮০০ বৎসর পরে বিক্রমাদিত্যের সভায় কালিদাস বর্তমান ছিলেন। একথা সম্পূর্ণ অশ্রদ্ধেয়। বেণ্টলি স্বীয় গ্রন্থে এরূপ অনেক প্রলাপবাক্য লিখিয়াছেন, তদ্দৃষ্টে তাঁহাকে হিন্দুদিগের ইতিহাস বিষয়ে সম্পূর্ণ মূঢ় বিবেচনা হয়। কর্নেল উইলফোর্ড, প্রিন্সেপ ও এলফিনস্টন লিখিয়াছেন, কালিদাস প্রায় ১৪০০ শত বৎসর পূর্বে বর্তমান ছিলেন।

ভোজপ্রবন্ধের প্রমাণানুসারে গুজরাট, মালয়া এবং দক্ষিণের পণ্ডিতগণ কহেন কালিদাস ১১০০ খ্রীষ্টাব্দে মুঞ্জের ভ্রাতুষ্পুত্র উজ্জয়িনীনিবাসী ভোজ-রাজের সভাসদ্ ছিলেন। উজ্জয়িনীর রাজপাটে কতিপয় বিক্রমাদিত্য ও ভোজ আসীন হইয়াছিলেন ; তাহার মধ্যে শেষ ভোজ নৃপতির রাজ্যকাল ১১০০ স্থির হইয়াছে, এবং ইহাতে বোধহয়, শেষ বিক্রমাদিত্যকে ভোজ বলিত, ও তাঁহার নবরত্নের সভা ছিল। আমরা স্বয়ং "ভোজপ্রবন্ধ" পাঠ করিয়া দেখিয়াছি।

তাহাতে লিখিত আছে, মালব-দেশান্তর্গত ধারানগরাধিপ ভোজ, সিন্ধুলের পুত্র এবং মুঞ্জের ভ্রাতুষ্পুত্র। শৈশবাবস্থায় পিতৃবিয়োগ হওয়াতে তাঁহার পিতৃব্য মুঞ্জ রাজপদে প্রতিষ্ঠিত হয়েন এবং ভোজ তাঁহার কর্তৃত্বাধীনে থাকিয়া বহু বিদ্যা অর্জন করেন। ভোজ ক্রমে বিখ্যাত হওয়াতে তাঁহার খুল্লতাত তদ্দ্বারা সিংহাসনচ্যুত হইবার আশঙ্কা করিতে লাগিলেন, এবং কি প্রকারে তাঁহার প্রাণ বিনাশ করিবেন, এই ভয়ানক চিন্তা তাঁহার হৃদয়কন্দরে ক্রমে বদ্ধমূল হইতে লাগিল। স্বীয় করদ নৃপতি বৎসরাজকে আহ্বান করিয়া আনাইয়া আপন দুষ্ট অভিসন্ধি জ্ঞাপন করত ভোজকে অচিরে অরণ্যমধ্যে বিনাশ করিতে অনুরোধ করিলেন। কিন্তু তিনি ভোজকে গোপন রাখিয়া পশুশোণিতে লোহিতবর্ণ অসি মুঞ্জ-ভূপকে উপহার দিলেন। তদ্দৃষ্টে তিনি সানন্দচিত্তে জিজ্ঞাসা করিলেন, ভোজ মানবলীলা সম্বরণ করিয়াছে? বৎসরাজ তচ্ছ্রবণে একটি পত্রোপরি লিখিয়া দিলেন, "মান্ধাতা, যিনি কৃতযুগে নৃপকুলের শিরোমণিস্বরূপ ছিলেন, তাঁহার মৃত্যু হইয়াছে। রাবণারি রামচন্দ্র, যিনি সমুদ্রে সেতুনির্মাণ করেন, তিনি কোথায়? এবং অন্যান্য মহোদয়গণ রাজা এবং রাজা যুধিষ্ঠির স্বর্গারোহণ করিয়াছেন কিন্তু পৃথিবী কাহার সহিত গমন করেন নাই, এবারে তিনি আপনার সহিত রসাতলগামিনী হইবেন।" ইহা পাঠ করিবামাত্র মুঞ্জের শরীর রোমাঞ্চিত হইল, এবং ভোজের নিমিত্ত অত্যন্ত ব্যাকুল হইলেন। তৎপরে তিনি জীবিত আছেন শুনিয়া বৎসরাজ দ্বারা তাঁহাকে আনাইয়া, ধারা-রাজ্য প্রদান করণান্তর, ঈশ্বরারাধনা নিমিত্ত অরণ্যে প্রবেশ করিলেন। ভোজ পিতৃ-সিংহাসন পুনঃপ্রাপ্ত হইয়া অসংখ্য পণ্ডিতগণকে আহ্বান করিয়া আনাইয়া-ছিলেন। আমরা ভোজপ্রবন্ধে কালিদাসের নাম সহ নিম্নলিখিত পণ্ডিতগণের নাম প্রাপ্ত হইয়াছি ;—

কর্পূর, কলিঙ্গ, কামদেব, কোকিল, শ্রীদচন্দ্র, গোপালদেব, জয়দেব, তারেন্দ্র, দামোদর, সোমনাথ, ধনপাল, বাণ, ভবভূতি, ভাস্কর, ময়ূর, মল্লিনাথ, মহেশ্বর, মাঘ, মুচকুন্দ, রামচন্দ্র, রামেশ্বরভক্ত, হরিবংশ বিদ্যাবিনোদ, বিশ্ববসু, বিষ্ণুকবি শঙ্কর, সম্বদেব, শুক, সীতা, সীমন্ত, সুবন্ধু ইত্যাদি।

পণ্ডিত শেষগিরি শাস্ত্রী লিখিয়াছেন, বল্লালসেন, ভোজপ্রবন্ধ ১২০ খ্রীষ্টাব্দে রচনা করেন, ইহাতে বোধ হয়, তিনি, ভোজরাজ বিদ্যোৎসাহী ছিলেন বিবেচনায়, তাঁহার সম্মানবৃদ্ধির জন্য কালিদাস, ভবভূতি প্রভৃতি কবিগণকে কেবল অনুমান করিয়াই ভোজের সভাসদ্ স্থির করিয়াছেন। ভোজচরিতে এই সকল কবির নাম পাওয়া যায়, সুতরাং ভোজপ্রবন্ধ প্রামাণিক গ্রন্থ কি প্রকারে বলিব? এই ভোজরাজ চম্পূ, রামায়ণ, কণ্ঠাভরণ, অমরটীকা, রাজবার্তিক,

পাতঞ্জলিটীকা, এবং চারুকার্য রচনা করেন। এই গ্রন্থের একখানির মধ্যেও তিনি কালিদাস, ভবভূতি প্রভৃতির নামোল্লেখ করেন নাই।

বিশ্বগুণাদর্শগ্রন্থকার বেদান্তাচার্য কালিদাস, শ্রীহর্ষ এবং ভবভূতি এক সময়ে ভোজরাজের সভায় বর্তমান ছিলেন লিখিয়াছেন ;—

মাঘশ্চোরো ময়ূরো মুরারিপুরপরো ভারবিঃসারবিদ্যঃ
শ্রীহর্ষ কালিদাসঃ কবিরথ ভবভূত্যাদয়ো ভোজরাজঃ।

কিন্তু ইহাতে তিনিও ভোজপ্রবন্ধপ্রণেতা বল্লালের ন্যায় মহাভ্রমে পতিত হইয়াছেন, কেননা শ্রীহর্ষ, কালিদাস এবং ভবভূতি এককালে বর্তমান ছিলেন ; এ বিষয়ের ভূরি ভূরি প্রমাণ দেওয়া যাইতে পারে।

ভারতবর্ষীয় অনেক নৃপতির নাম বিক্রমাদিত্য ছিল। উজ্জয়িনীর অধীশ্বর বিক্রমাদিত্য যে ৫৭ খ্রীঃ পূঃ শকদিগকে সমরে পরাজিত করিয়া সম্বৎ স্থাপিত করেন, তাঁহার রাজসভা কালিদাস উজ্জ্বল করিয়াছিলেন কিনা, দেখিতে হইবে। হম্‌বোল্ট বলেন, কবিবর হোরেশ এবং বর্জিল কালিদাসের সমকালিক ছিলেন ; এ কথা অনেক ইউরোপীয় পণ্ডিতে স্বীকার করেন। কর্নেল টড রাজস্থানের ইতিহাসমধ্যে লিখিয়াছেন, "যত দিবস হিন্দু সাহিত্য বর্তমান থাকিবে, তত-কাল ভোজপ্রমর ও তাঁহার নবরত্নের কখন লোপ হইবেক না।" কিন্তু বহুগুণ-মণ্ডিত তিনজন ভোজরাজের মধ্যে কাহার নবরত্নসভা ছিল, এ কথা বলা দুরূহ। কর্নেল টড তিনজন ভোজরাজের সম্বৎ ৬৩১, ৭২১ এবং ১১০০, এই তিন পৃথক পৃথক কাল নিরূপণ করিয়াছেন।

"সিংহাসন দ্বাত্রিংশতি", "বেতাল পঞ্চবিংশতি" ও "বিক্রমচরিত" মহা-রাজ বিক্রমাদিত্যের বহুবিধ অলৌকিক গল্পে পরিপূর্ণ। তন্মধ্যে ঐতিহাসিক কোন সত্য প্রাপ্য হওয়া দুর্লভ। মেরুতুঙ্গকৃত "প্রবন্ধচিন্তামণি" এবং রাজ-শেখরকৃত "চতুর্বিংশতি প্রবন্ধ" মধ্যে বিক্রমাদিত্যকে শৌর্যবীর্যশালী মহাবল পরাক্রান্ত নৃপতি বলিয়া বর্ণন করা হইয়াছে, কিন্তু তাহার মধ্যে নবরত্নের ও কালিদাসের বিশেষ বিবরণ কিছুই নাই।

জৈনগ্রন্থমধ্যে দৃষ্ট হয় যে জনৈক সিদ্ধসেন সূরি নামক জৈন পুরোহিত বিক্রমাদিত্যের উপদেষ্টা ছিলেন। একথা কতদূর সঙ্গত, আমরা বলিতে পারি না। অন্য একজন জৈন লেখক কহেন, ৭২৩ সম্বতে ভোজরাজের সময়ে উজ্জয়িনী নগরে বহুসংখ্যক লোক বসতি করে। ইনি এবং বৃদ্ধ ভোজ উভয়ে বৌদ্ধ ছিলেন। এ সকল জৈনগ্রন্থ হইতে সংকলন করা হইল। সংস্কৃত অন্যান্য গ্রন্থে এ সকল প্রমাণ দৃষ্ট হয় না। বৃদ্ধ ভোজ মনাতুঙ্গ সূরির শিষ্য ছিলেন। মনাতুঙ্গ,—বাণ ও ময়ূরভট্টের সমকালীন জৈনাচার্য ছিলেন। বাণকৃত হর্ষচরিত

পাঠে অবগত হওয়া যায়, তিনি সপ্তশত খ্রীষ্টীয় অব্দে শ্রীকণ্ঠাধিপতি হর্ষবর্ধনের সহিত সাক্ষাৎ করেন। ইনিই কান্যকুব্জাধিপতি হর্ষবর্ধন শিলাদিত্য এবং ইঁহার নিকট চৈনিক পরিব্রাজক হিয়াঙ সিয়াঙ আহূত হইয়াছিলেন। কবি বাণ, হিয়াঙ সিয়াঙকৃত গ্রন্থ পাঠে স্বীয় গ্রন্থ রচনা করেন। হর্ষবর্ধনের সহিত চৈনিকাচার্যের সাক্ষাৎ "যবনপ্রোক্ত পুরাণ" হইতে হর্ষচরিতে সংগৃহীত হইয়াছে।

"কথাসরিৎসাগরের" ১৮ অধ্যায়ে মহর্ষি কণ্ব নরবাহন দত্তকে বিক্রমাদিত্যের উপন্যাস বলিয়াছেন। তাহাতে লিখিত আছে, বিক্রমাদিত্য পাঁচশত খ্রীষ্টীয় অব্দে নরবাহন দত্তের পূর্বে উজ্জয়িনীর অধীশ্বর ছিলেন। নরবাহন দত্ত জৈনগ্রন্থ, কথাসরিৎসাগর ও মৎস্যপুরাণের মতানুসারে শতানিকের পৌত্র।

নাসিক প্রস্তরফলকে বিক্রমাদিত্যের নাম পাওয়া গিয়াছে। তাহাতে ইঁহাকে নভাগ নহুষ, জনমেজয়, যযাতি এবং বলরামের ন্যায় বীর বলিয়া বর্ণনা করা হইয়াছে। পাঠকবর্গ দেখুন, বিক্রমাদিত্যকে লইয়া কিরূপ গোলযোগ উপস্থিত। লোকে একজন বিক্রমাদিত্য জানিত, এক্ষণে ভারতবর্ষের ইতিহাসমধ্যে কতজন বিক্রমাদিত্যের নাম প্রাপ্ত হওয়া গেল! আমাদিগের শকপ্রমর্দক বিক্রমাদিত্যের বিবরণ জ্ঞাত হওয়া আবশ্যক এবং তাঁহার সহিত নবরত্নের অমূল্যরত্ন কবিচক্রচূড়ামণি কালিদাসের কোন সম্বন্ধ আছে কি না, জানিতে হইবে; সেটি বড় সহজ ব্যাপার নহে, কাজে কাজে ঐতিহাসিক অন্যান্য কথা উত্তমরূপ সামঞ্জস্য করিয়া লিখিতে হইতেছে।

শ্রীদেবকৃত বিক্রমচরিতে লিখিত আছে, বিক্রমাদিত্য শেষ তীর্থঙ্কর বর্ধমানের নির্বাণের ৪৭০ বৎসর পরে উজ্জয়িনীর অধিপতি ছিলেন। ইনিই শকাব্দা স্থাপন করেন। এ গ্রন্থে কালিদাসের উল্লেখমাত্র নাই।

পণ্ডিত তারানাথ তর্কবাচস্পতি কহেন, "জ্যোতির্বিদাভরণ" নামক কাল জ্ঞানশাস্ত্র মহাকবি কালিদাস, রঘুবংশ, কুমারসম্ভব এবং মেঘদূত রচনার পরে, ৩০৬৮ কলি গতাব্দে লিখেন। এ বিষয়টি মেঘদূত-প্রকাশক বাবু প্রাণনাথ পণ্ডিত মহাশয়ও ইংরাজী ভূমিকায় লিখিয়াছেন। কিন্তু জ্যোতির্বিদাভরণ যে রঘুকার কালিদাস-প্রণীত, এ বিষয় অন্য কোন গ্রন্থে দেখিতে পাই না। তর্কবাচস্পতি মহাশয়ের মত পরিপোষক, জ্যোতির্বিদাভরণের কতিপয় শ্লোক হইতে কালিদাসের বিবরণ নিম্নে অনুবাদ করিয়া দিতেছি ;—

"আমি এই গ্রন্থ শ্রুতি স্মৃতি অধ্যয়নে প্রফুল্লকর এবং ১৮০ নগরী সমন্বিত ভারতবর্ষের অন্তর্গত মালব প্রদেশে বিক্রমাদিত্যের রাজ্যকালে রচনা করিয়াছি।

শঙ্কু, বররুচি, মণি, অংশুদত্ত, জিষ্ণু, ত্রিলোচন, হরি, ঘটকর্পর, অমর সিংহ, এবং অন্যান্য কবিগণ তাঁহার সভার শোভাবর্ধন করিয়াছিলেন।

সত্য, বরাহমিহির, শ্রীত সেন, শ্রীবাদ রায়ণী, মণিথ, কুমার সিংহ এবং আমি ও অপর কএক ব্যক্তি জ্যোতিষশাস্ত্রের অধ্যাপক ছিলাম। ৯।

ধন্বন্তরি, ক্ষণক, অমর সিংহ, শঙ্কু, বেতাল ভট্ট, ঘটকর্পর, কালিদাস, ও সুবিখ্যাত বরাহমিহির এবং বররুচি বিক্রমের নবরত্নের অন্তর্বর্তী। ১০।

বিক্রমের সভায় ৮০০ শত মাণ্ডলিক অর্থাৎ ক্ষুদ্র রাজা আগমন করিতেন এবং তাঁহার মহাসভায় ১৬ জন বাগ্মী, ১০ জন জ্যোতির্বেত্তা, ৬ ব্যক্তি চিকিৎসক, এবং ১৬ ব্যক্তি বেদপারগ পণ্ডিত উপস্থিত থাকিতেন। ১১।

তাঁহার সৈন্য অষ্টাদশ যোজন ব্যাপক স্থলে বাস করিত। তন্মধ্যে তিন কোটি পদাতিক এবং দশ কোটি অশ্বারোহী ছিল; এবং ২৪৩০০ হস্তী এবং ৪০০০০০ নৌকা সর্বদা প্রস্তুত থাকিত। তাঁহার সহিত অন্য কোন ভূপতির তুলনা করা অসম্ভব। ১২।

তিনি ৯৫ শক নৃপতির সংহার করিয়া পৃথ্বীতলে বিখ্যাত হইয়া, কলিযুগে আপন অব্দ স্থাপন করেন। এবং তিনি প্রত্যহ মণি, মুক্তা, সুবর্ণ, গো, অশ্ব, এবং হস্তী দান করিয়া ধর্মের মুখোজ্জ্বল করিতেন। ১৩।

তিনি দ্রাবিড়, লতা, এবং গৌড়দেশীয় রাজাকে পরাজিত, গুর্জর দেশ জয়, ধারানগরীর সমুন্নতি এবং কাম্বোজাধিপতির আনন্দ বর্ধন করিয়াছিলেন। ১৪।

তাঁহার ক্ষমতা ও গুণাবলী ইন্দ্র, অম্বুধি, অমরদ্রু, সর এবং মেরুর ন্যায় ছিল। তিনি প্রজাগণের প্রীতিপ্রদ ভূপতি ছিলেন ও শত্রুগণ জয় করিয়া দুর্গ পুনঃপ্রদান করত তাহাদিগকে বাধ্য করিতেন। ১৫।

প্রজাবর্গের সুখকরী, ও মহাকালের অধিষ্ঠানে সুবিখ্যাতা, উজ্জয়িনী নগরী তিনি রক্ষা করেন। ১৬।

তিনি মহাসমরে রুমাধিপতি শকনৃপতিকে পরাজয় করণান্তর বন্দীরূপে উজ্জয়িনী নগরীতে আনয়ন করত পরে স্বাধীন করেন। ১৭।

এইরূপ বিক্রমাদিত্যের অবন্তীশাসনসময়ে প্রজাবর্গ সুখ স্বচ্ছন্দে বৈদিক নিয়মানুসারে কাল অতিবাহিত করিত। ১৮।

শঙ্কু ও অন্যান্য পণ্ডিত এবং কবিগণ তথা বরাহমিহির প্রভৃতি জ্যোতির্বিদগণ তাঁহার রাজসভা উজ্জ্বল করিয়াছিলেন। তাঁহারা সকলেই আমার পাণ্ডিত্যের সম্মান করিতেন এবং রাজাও আমাকে যথেষ্ট স্নেহ করিতেন। ১৯।

আমি প্রথমে রঘু প্রভৃতি তিনখানি কাব্য রচনা করিয়া বৈদিক "শ্রুতি-কর্মবাদ" প্রভৃতি বিবিধ গ্রন্থ রচনা করত, এই "জ্যোতির্বিদাভরণ" প্রস্তুত করিলাম। ২০।

আমি ৩০৬৮ কলি গতাব্দে, বৈশাখ মাসে এই গ্রন্থ রচনারম্ভ করিয়া

কার্তিক মাসে সমাপন করি। বহুবিধ জ্যোতির্বিবরণ উত্তমরূপে পরিদর্শনান্তর আমি এই গ্রন্থ জ্যোতির্বিদ্‌গণের মনোরঞ্জনার্থে সংকলন করিলাম। ২১।

পুনরায় গ্রন্থকার ২০ অধ্যায়ের ৪৬ শ্লোকে লিখিয়াছেন "এ পর্যন্ত কাম্বোজ, গৌড়, অঙ্গ, মালব ও সৌরাষ্ট্র দেশীয়গণ, বিখ্যাত দাতা বিক্রমের গুণগান করিয়া থাকেন।"

জ্যোতির্বিদাভরণ গ্রন্থে বিক্রমাদিত্য ও নবরত্নের যে উল্লেখ আছে, তাহা এ স্থলে উদ্ধৃত করা গেল। এই গ্রন্থ ১৪৪ শ্লোকে সম্পূর্ণ। তর্কবাচস্পতি মহাশয় এই গ্রন্থের প্রমাণ গ্রাহ্য করিয়াছেন, এবং তৎদৃষ্টে বাবু প্রাণনাথ পণ্ডিত লিখিয়াছেন, বিক্রমাদিত্য ৫৬ খ্রীঃ পূঃ বর্তমান ছিলেন, ও কালিদাস স্বীয় তিনখানি কাব্য ৩২ খ্রীঃ পূঃ কিছু দিবস অগ্রে এবং জ্যোতির্বিদাভরণ ১২ খ্রীঃ পূঃ ও নাটকসমূহ তৎপরে রচনা করেন। আমরা যে ১০ সংখ্যক শ্লোক জ্যোতির্বিদাভরণ হইতে অবিকল কালিদাসের লেখনীনিসৃত বলিয়া উদ্ধৃত করিয়াছি, সেই শ্লোক এতদ্দেশীয় আপামর সাধারণ সকলেই আবৃত্তি করিয়া থাকেন, কিন্তু তাহা যে কোন্ গ্রন্থের শ্লোক, এ বিষয়ে অতি অল্প লোক জানেন। জ্যোতির্বিদাভরণ ভিন্ন অন্য কোন গ্রন্থে বিক্রমাদিত্য ও নবরত্নের বিশেষ কোন বিবরণ পাওয়া যায় না। এক্ষণে পাঠকগণ বলিতে পারেন, কালিদাসপ্রণীত গ্রন্থে যখন জ্ঞাতব্য সকল বিবরণ অবগত হওয়া যাইতেছে, তখন অন্য গ্রন্থ দেখিবার প্রয়োজন কি? একথা সত্য; কিন্তু এ খানি কি মহাকবি কালিদাস প্রণীত!—কখনই নহে। কেহ কেহ বলিতে পারেন, আমরা তর্কবাচস্পতি মহাশয় অপেক্ষা কি অধিক পণ্ডিত যে, তাঁহার প্রমাণ অগ্রাহ্য করি—এ স্পর্ধা আমাদিগের নাই। আমরা তর্কবাচস্পতি মহাশয়কে বিনীতভাবে অনুরোধ করিতেছি, একবার রঘু-কুমার রচনার সহিত জ্যোতির্বিদাভরণ রচনা-প্রণালীর তারতম্য বিশেষ বিবেচনা করিয়া দেখিবেন, তাহা হইলে জানিতে পারিবেন—মহাকবি কালিদাসের লেখনী এ গ্রন্থে কখনই প্রসব করে নাই। উহা অপর কোন কালিদাস কৃত। তিনি আপন গুণ-গরিমা বৃদ্ধির জন্য গ্রন্থের অবতরণিকায় আপনাকে "নবরত্নের" অন্তর্বর্তী বলিয়া পরিচয় দিয়াছেন। ভাওদাজী কহেন, এই দ্বিতীয় কালিদাস বিক্রমাদিত্যের ৭০০ বৎসর পরে বর্তমান ছিলেন; এবং বহু প্রমাণ দ্বারা স্থির হইয়াছে যে, ইনি জৈনধর্মাবলম্বী। পুনশ্চ জিষ্ণু (ব্রহ্মগুপ্তের পিতা) বিক্রমাদিত্যের "নবরত্নের" সঙ্গে একত্রে বর্তমান ছিলেন। ইহাতে প্রতীয়মান হয়, জ্যোতির্বিদাভরণ গ্রন্থকার উজ্জয়িনী নগরীতে ৬০০ শত খ্রীঃ যে হর্ষ বিক্রমাদিত্য রাজ্য করিয়াছিলেন, তাঁহাকে ভ্রমক্রমে সম্বৎকর্তা বিক্রমাদিত্য স্থির করিয়াছেন এবং

ঘটকর্পূর যে একজন কবি ছিলেন প্রকাশ আছে, তাহাতে বোম্বাই প্রদেশীয় পণ্ডিতগণ কহিয়া থাকেন, ঘটকর্পর নামে, কোন কবি ছিলেন না। এবং ঘটকর্পর নামে যে ক্ষুদ্র কাব্য বর্তমান আছে, তাহা কালিদাসকৃত। এক্ষণে দেখা যাইতেছে যে, জ্যোতির্বিদাভরণ-গ্রন্থকার কালিদাসের, মহাকবি কালিদাসের শকপ্রমর্দক বিক্রমাদিত্যের পরিচয়ের সহিত পরস্পর অনৈক্য এবং কাল-নিরূপণও ঠিক হইতেছে না। সুতরাং এ কালিদাস, আমাদিগের আলোচ্য কবি কালিদাস নহেন। আর-একজন কালিদাস পাইয়াছি, তিনি "শত্রুপরাভব" নামক জ্যোতিষশাস্ত্রপ্রণেতা। ইঁহার গণক উপাধি ছিল।

কর্নেল উইলফোর্ড বিক্রমাদিত্য সম্বন্ধে "শত্রুঞ্জয়মাহাত্ম্য" হইতে একটি প্রমাণ উদ্ধৃত করিয়া যে প্রবন্ধ লিখিয়াছেন, তাহাতে কোন প্রামাণিক বিষয় নাই। শত্রুঞ্জয়মাহাত্ম্য জৈন গ্রন্থ। এই গ্রন্থে ধনেশ্বর সূরি বল্লভীরাজ শিলাদিত্য নৃপতির অনুমত্যনুসারে শত্রুঞ্জয় পর্বতের মাহাত্ম্য বর্ণনা করিয়াছেন। তাহাতে লিখিত আছে, "আমার (মহাবীর) তিন বৎসর পাঁচ মাস এবং পঞ্চদশ দিবসে নির্বাণের পরে ইন্দ্র নামক একজন ধর্মবিরোধী জন্মগ্রহণ করিবে। তাঁহার পঞ্চমমর খ্যাতি হইবে। তাহার ৪৪৬ বৎসর ৪৫ দিবস পরে বিক্রমার্ক রাজ জন্মগ্রহণ করিয়া জিনের ন্যায় সিদ্ধসেন সূরির উপদেশ গ্রহণ করত, পৃথিবীর ভার হরণ করিবেন এবং তৎকর্তৃক চলিত অব্দ স্থগিত হইয়া নব অব্দ স্থাপিত হইবেক।" ইহাতে সপ্রমাণ হইতেছে, বর্ধমান বা মহাবীরের ৪৭০ বৎসর পরে সম্বৎ স্থাপিত হয়। এই প্রমাণ শ্বেতাম্বর জৈনেরা গ্রাহ্য করিয়া থাকেন। কর্নেল উইলফোর্ড ও তাঁহার পণ্ডিতগণ বীর বা বীরবিক্রমকে বিক্রমাদিত্য স্থির করিয়াছিলেন। তাহাতে ৪৭০ বৎসরের ভ্রম হইয়া উঠিয়াছে। শত্রুঞ্জয়মাহাত্ম্যের মতানুসারে বল্লভীরাজ শিলাদিত্য বিক্রমের ৪৪৭ বৎসর পরে (৪২০ খ্রীঃ অঃ) সৌরাষ্ট্র হইতে বৌদ্ধদিগকে বহিষ্কৃত করিয়া শত্রুঞ্জয় এবং অন্যান্য তীর্থস্থান পুনর্গ্রহণ করতঃ জৈন মন্দির-সমূহ সংস্থাপিত করেন। আজি কালি, উইলফোর্ডের কথায় কেহ বিশ্বাস করেন না। তাঁহার সকল কথা এক্ষণকার ভাষাতত্ত্ববিৎ পণ্ডিতেরা খণ্ডন করিয়াছেন।

রাজতরঙ্গিণীতে লিখিত আছে, খ্রীষ্টীয় পাঁচ শতাব্দীতে বিক্রমাদিত্য উজ্জয়িনীতে রাজ্য করেন। এবং তিনি মাতৃগুপ্ত নামক জনৈক ব্রাহ্মণকে কাশ্মীরের শাসনকর্তার পদ প্রদান করেন। এই গ্রন্থে লিখিত আছে, বিক্রমাদিত্য এক বৎসর রাজ্য করিয়া ৫৪১ খ্রীঃ অব্দে পরলোকগত হয়েন।

উইলসন সাহেব হর্ষ বিক্রমাদিত্য সম্বন্ধে "আশীয়াটিক রিসার্চেস" পুস্তকে লিখিয়াছেন, শকারি বিক্রমাদিত্যের পূর্বে এই নামধেয় আর-একজন ভূপালের

নাম পাওয়া গিয়াছে। তিনি তাঁহার বিশেষ বিবরণ কিছুই লেখেন নাই। মুসলমান লেখকগণ বিক্রমাদিত্যের পুনঃ পুনঃ নামোল্লেখ করিয়াছেন, কিন্তু অন্য কোন বিষয় জ্ঞাত ছিলেন না।

কহ্লণ পণ্ডিত রাজতরঙ্গিনীর তৃতীয় তরঙ্গে যে বিক্রমের উল্লেখ করিয়াছেন, তিনি শকাব্দা স্থাপনের পরে বর্তমান ছিলেন। ইঁহাকে কবিবন্ধু ও বিবিধ-গুণমণ্ডিত বলা হইয়াছে। তাঁহার মাতৃগুপ্ত, বেতালমেন্থ এবং ভর্তৃমেন্থ সভাসদ্ ছিলেন। "মেন্থ" নিঃসন্দেহ ভট্টশব্দবাচক, তাহা হইলে বেতালমেন্থ এবং ভর্তৃমেন্থ, বেতালভট্ট ও ভর্তৃভট্ট। কোন কোন জৈনগ্রন্থে "মেন্থশব্দ" মেন্ত্র লিখিত আছে। বিশ্বকোষ অনুসারে সংস্কৃত ভাষায় মেন্ধ অর্থ প্রধান। বেতালভট্ট বিক্রমের নবরত্নের অন্তর্বর্তী এবং ভর্তৃহরি নীতি বৈরাগ্য ও শৃঙ্গার শতক গ্রন্থকার। ইনি বিক্রমাদিত্যের ভ্রাতা বলিয়া প্রসিদ্ধ, কিন্তু মাতৃগুপ্ত কে? রাজতরঙ্গিণীর তৃতীয় তরঙ্গ ১০২ হইতে ২৪২ শ্লোক মধ্যে বিক্রমাদিত্যের বিবরণে মাতৃগুপ্তের বিষয় লিখিত আছে। তিনি সুপ্রসিদ্ধ কবি এবং কাশ্মীরের শাসনকর্তা। মাতৃগুপ্ত কালিদাসের অপর একটি নাম। কিন্তু পুরুষোত্তমকৃত ত্রিকাণ্ড শেষ মধ্যে কালিদাসের—রঘুকার, কালিদাস, মেধারুদ্র এবং কোটিজিত এই ৪টি মাত্র নাম লিখিত আছে। মাতৃগুপ্ত কৃত কোন গ্রন্থ বর্তমান নাই, অথচ তাঁহাকে কহ্লণ প্রধান কবি বলিয়াছেন। রাঘবভট্ট শকুন্তলার টীকা মধ্যে মাতৃগুপ্তাচার্যের কতিপয় অলঙ্কারের শ্লোক উদ্ধৃত করিয়াছেন। তৎপাঠে বোধ হয়, সেগুলি প্রধান কবি রচিত এবং কালিদাসের লেখনীকৃত হইলেও শোভা পায়। রাজা প্রবরসেনের আজ্ঞানুসারে কালিদাস সেতুকাব্য নামক প্রাকৃত কাব্য সংস্কৃত টীকা সহ রচনা করেন। সুন্দরকৃত বারাণসীদর্পণ টীকাকার রামাশ্রম কালিদাসকে সেতুকাব্য রচক বলিয়াছেন; বৈদ্যনাথকৃত প্রতাপরুদ্র, দণ্ডীপ্রণীত কাব্যাদর্শ এবং সাহিত্যদর্পণ গ্রন্থে সেতুকাব্যের শ্লোক উদ্ধৃত হইয়াছে। সেতুকাব্য বিতস্তা নদীর উপরে প্রবরসেন নৃপতি যে নৌসেতু নির্মাণ করিয়া-ছিলেন তাহার বর্ণনায় পরিপূর্ণ। ইনি "অভিনব" বা দ্বিতীয় প্রবরসেন। ইঁহার পিতামহ শ্রেষ্ঠসেন রাজতরঙ্গিণীর মতে, "প্রথম প্রবরসেন" নামে বিখ্যাত। প্রিন্সেপ এই দুইজন ভিন্ন অন্য কোন প্রবরসেনের নাম লেখেন নাই। দ্বিতীয় প্রবরসেন মাতৃগুপ্তের পরে কাশ্মীর শাসন করিয়াছিলেন। কান্যকুব্জের প্রবল প্রতাপান্বিত নৃপতি হর্ষবর্ধন বা শিলাদিত্যের সভাসদ্ কবি বাণ হর্ষচরিতে প্রবরসেনের ও সেতুকাব্যপ্রণেতা কালিদাসের এইরূপ প্রশংসা করিয়াছেন যথা ;—

কীর্ত্তিঃ প্রবরসেনস্য প্রয়াতা কুমুদোজ্জ্বলা
সাগরস্য পরং পারং কোপিসেনেবসেতুনা।
নির্গতাসূন বাকস্য কালিদাস্য সূক্তিষু
প্রীতির্মধুরসার্দ্রা সুমঞ্জরীষ্বিবজায়তে ॥

এই কালিদাস যদি প্রবরসেনের সমকালিক হয়েন, তাহা হইলে তিনি খ্রীষ্টীয় ষষ্ঠ শতাব্দীতে বর্তমান ছিলেন। ইনি এবং মাতৃগুপ্ত এক ব্যক্তি, তাহা রাজতরঙ্গিণীর প্রমাণে ঠিক হইতেছে, এবং মহাকবি কালিদাসও—একথা ভাওদাজী লিখিয়াছেন, তদ্দৃষ্টে আমাদিগের মহাসংশয় উপস্থিত হইল। এক্ষণে কালিদাসকে লইয়া মহাপ্রমাদ উপস্থিত। বিক্রমাদিত্যও অনেকগুলি—তাহার মধ্যে উপরের লিখিত বহুবিধ সংস্কৃত গ্রন্থের প্রমাণে শকারি বিক্রমাদিত্য, একজন পৃথক ব্যক্তি। কথিত আছে, মগধেশ্বর চন্দ্রগুপ্ত বিক্রমাদিত্য সুলতানের নিকটস্থ কারার নামক স্থানে শকগণকে পরাজিত করতঃ "শকাব্দা" স্থাপন করিয়াছেন। আমরা বাল্যকালে জানিতাম, বিক্রমাদিত্য শকদিগকে দমন করিয়া অব্দ স্থাপন করেন ও তাঁহার নবরত্নের সভায় কালিদাস ৫৭ খ্রীঃ পূঃ বর্তমান ছিলেন, কিন্তু এক্ষণে সে বিষয় খণ্ডন হইতেছে এবং কালিদাসকে আধুনিক স্থির করিবার চেষ্টা পাওয়াতে অনেকেই আমাদিগের উপর বিরক্ত হইবেন, কিন্তু আমরা বিচারমল্ল হইয়া বিবাদ করিবার জন্য সাহিত্যরঙ্গভূমিতে দণ্ডায়মান হইতেছি না। আমরা যেখানে যে প্রমাণ পাইলাম, তাহাই উদ্ধৃত করিয়া পাঠকবর্গকে উপহার দিতেছি, তাঁহারা দেখুন কালিদাসের বিষয়ে কিরূপ সংশয় হয়। এরূপ প্রবাদ আছে, বিক্রমাদিত্য কবি কালিদাসের উপর অতীব সন্তুষ্ট হইয়া তাঁহাকে অর্ধরাজ্য প্রদান করিয়াছিলেন। "রাজতরঙ্গিণী"র মতে হর্ষ বিক্রমাদিত্য মাতৃগুপ্তকে কাশ্মীররাজ্য প্রদান করেন ; তাহা হইলে মাতৃগুপ্ত আমাদিগের কালিদাস এবং উল্লিখিত জনশ্রুতিও সম্পূর্ণ সত্য। মাতৃগুপ্ত কাশ্মীরদেশে ৪ বৎসর ৯ মাস ১ দিবস রাজ্য করিয়া, বিক্রমাদিত্য পরলোকগত হইলে, উক্ত রাজ্যের যথার্থ উত্তরাধিকারী প্রবরসেনকে উহা প্রত্যর্পণ করত যতিধর্ম গ্রহণ করিয়া বারাণসীতে আগমন করেন। এবং প্রবরসেনের সঙ্গে বন্ধুত্বসূত্রে আবদ্ধ হইয়া সেতুকাব্যে তাঁহার গুণকীর্তন করিয়াছেন। মাতৃগুপ্ত স্ত্রীর বিরহে কাতর হইয়াছিলেন, এটি মেঘদূতের ঘটনার সহিত ঐক্য হইলে কবির স্বীয় বিবরণ বলিলেও হয়। তিনি আপন শোক যক্ষমুখে ব্যক্ত করিয়াছেন, এবং রামগিরির শৃঙ্গে বসিয়া আষাঢ়ের একখানি নবীন মেঘকে স্বীয় প্রেয়সীর নিকট বার্তা লইয়া যাইতে বলিয়াছেন। কবি প্রিয়াবিরহ মেঘদূতে বিন্যস্ত করিয়াছেন, এজন্য স্বভাবত তাঁহার মন যেরূপ বিচলিত হইয়াছিল, তাহা উত্তমরূপে ব্যক্ত

হইয়াছে। তাঁহার স্ত্রীর নাম কমলা ছিল। কালিদাস যেরূপ কাশ্মীরের ও হিমালয়ের সুন্দর বর্ণনা করিয়াছেন, তাহা স্বচক্ষে না দেখিলে কখনই এতাদৃশ উৎকৃষ্ট হইত না ; ইহাতে বোধ হয়, তিনি কাশ্মীরপ্রদেশে অনেক কাল বাস করিয়াছিলেন।

উপসংহারকালে এইমাত্র বক্তব্য, যদি মাতৃগুপ্ত আমাদিগের মহাকবি কালিদাসের নামান্তর হয়, তাহা হইলে তিনি খ্রীষ্টীয় ষষ্ঠ শতাব্দীতে বর্তমান ছিলেন। আমরা এই প্রমাণ সংস্কৃত একমাত্র পুরাবৃত্ত "রাজতরঙ্গিণী" হইতে গ্রহণ করিলাম।

মল্লিনাথ সূরি মেঘদূতের চতুর্দশ সংখ্যক শ্লোকের টীকায় লিখিয়াছেন, কালিদাস দিঙ্‌নাগাচার্য এবং নিচুলের সমকালিক ছিলেন। দিঙ্‌নাগাচার্য কালিদাসের সহাধ্যায়ী এবং প্রিয়বন্ধু ও ন্যায়সূত্রবৃত্তিকার। কালিদাস রঘুবংশ, কুমারসম্ভব, মেঘদূত, ঋতুসংহার, অভিজ্ঞান শকুন্তল নাটক, বিক্রমোর্বশী নাটক, মালবিকাগ্নিমিত্র নাটক, নলোদয়, শৃঙ্গারতিলক, শ্রুতবোধ এবং সেতুকাব্য প্রণয়ন করিয়াছেন। তাহার মধ্যে রঘুবংশ, কুমারসম্ভব, মেঘদূত, ঋতুসংহার, শকুন্তলা, বিক্রমোর্বশী, মালবিকাগ্নিমিত্র এবং শ্রুতবোধ, বঙ্গভাষায় অনুবাদিত হইয়াছে।

পুষ্পেষু জাতী নগরেষু কাঞ্চী, নারীষু রম্ভা, পুরুষেষু বিষ্ণু।
নদীষু গঙ্গা, নৃপতৌ চ রামঃ কাব্যেষু মাঘঃ কবি কালিদাসঃ !

অগ্রহায়ণ ১২৭৯

কালিদাস

বঙ্গদর্শনে, প্রয়াসসঙ্কলিত বিচিত্রসূত্রগ্রথিত যে দুশ্ছেদ্য সংশয়জালে কালিদাস আবৃত হইয়াছেন, তাহার কিয়দংশমাত্র উত্তোলন করিয়া কবির মুখ নিরীক্ষণে প্রয়াস পাইয়াছি।

দক্ষিণাবর নাথকৃত রঘুবংশের প্রথম সর্গের টীকা আমি দেখিয়াছি। তিনি উহাতে রামায়ণ, মনু, পরাশর, ভগবদ্গীতা, দণ্ডী, অমরকোষ, ধরণি, শাশ্বত, হলায়ুধ, সংসারাবর্ত, কামন্দক, মাঘ, ভট্টি প্রভৃতি গ্রন্থ ও গ্রন্থকারের উল্লেখ করিয়াছেন, এবং টীকার শেষভাগে লিখিয়াছেন ;—

টীকাম্ অবক্রাং রঘুবংশকাব্যে
শ্রীনাথকো যান কৃতবান্ বিমৃষ্য।
তস্যাম্ অগাচ্ চারুরূয়ং সমগ্রঃ
সর্গঃ প্রসিদ্ধঃ প্রথমঃ পৃথিব্যাং ॥

রূপাদি সন্দেহতমো বিহন্তুং
কাব্যার্ণবং চাদ্ভুত মুত্তরীতুং।
একৈব কার্যেদ্বয়সন্নিধাত্রী
টীকা বুধানাং তরণীষতাং মে ॥'

কিন্তু শেষ পৃষ্ঠায় লেখক মহাশয় লিখিয়াছেন, ইতি "শ্রীমন্মহোপাধ্যায় কোলাচল মল্লিনাথ সূরিবিরচিতায়াং রঘুবংশ টীকায়াং বশিষ্ঠাশ্রমাভিগমনো নাম প্রথমসর্গঃ ॥ ১ ॥"

অজ্ঞ লেখকেরা প্রায়ই এইরূপ ভ্রমে পতিত হন। আচার্য গোল্‌ড্‌স্ট্‌কার লিখিয়াছেন যে, ইস্ট ইণ্ডিয়া হাউস গ্রন্থালয়ে তিনি কুমারিল্ল ভাষ্যসমেত মানব-কল্পসূত্র প্রাপ্ত হন। ঐ গ্রন্থের উপরিভাগে "ঋগ্বেদ কুমারেলভাষ্য সং" লেখা থাকায় উহার অস্তিত্ব বহুকাল অপ্রকাশিত ছিল। "জয় জয় হে মহিষাসুরমর্দিনী" ইত্যাদি ধ্রুবাত্মক একটি সুন্দর ভবানীস্তোত্র আছে। কাশ্মীর ও কাশীদেশস্থ, হস্তাক্ষরগ্রন্থে উহা শঙ্করাচার্যকৃত বলিয়া নির্দিষ্ট; কিন্তু সম্প্রতি একটি গ্রন্থ পাইয়াছি, যাহাতে স্তোত্ররচয়িতা আপনাকে শ্রীপতির পুত্র রামকৃষ্ণ বলিয়া পরিচয় দিতেছেন।

মল্লিনাথ স্বীয় টীকায় মাধববৃত্তির উল্লেখ করিয়াছেন। মাধবাচার্য ১৪০০ খ্রীষ্টাব্দে প্রাদুর্ভূত হন। অতএব মল্লিনাথ তদপেক্ষা প্রাচীনতর নহেন।

লাসেন মতে কালিদাস ২ খ্রীষ্টাব্দে সমুদ্রগুপ্তের সভায় বর্তমান ছিলেন। কালিদাস ৩২ খ্রীঃ পূর্বাব্দে বর্তমান ছিলেন, স্বীকার করিলে এ নির্ণয় তাদৃশ অসঙ্গত নহে। কিন্তু "কবিবন্ধু", "কাব্যপ্রিয়" প্রভৃতি উপাধিমাত্র অবলম্বন করিয়া একজন নির্দিষ্ট কবি তাঁহার সভায় ছিলেন, এরূপ সিদ্ধান্ত কখনই যুক্তিসঙ্গত নহে।

বেণ্টলি যে বিক্রমাদিত্যকে ভোজের পরকালবর্তী করিয়াছেন, তাহা অবশ্যই সম্পূর্ণ অশ্রদ্ধেয়। ভোজপ্রবন্ধের মধ্যেই একাধিকবার বিক্রমাদিত্যের উল্লেখ আছে। অতএব "শেষ বিক্রমাদিত্যকে ভোজ বলিত," এরূপ সিদ্ধান্ত অমূলক। উক্ত প্রবন্ধে ভট্টিকাব্যের উল্লেখ আছে, যথা,—

"ভট্টির্নষ্টোভারবীয়োঽপিনষ্টঃ" ইত্যাদি।

পণ্ডিত শেষগিরি শাস্ত্রীর মতে ভোজপ্রবন্ধ ১২০০ খ্রীষ্টাব্দে রচিত। তাহা হইলে বল্লালকে ভবিষ্যজ্ঞ ও অতএব অপ্রামাণিক বলিয়া, স্বীকার করিতে হইবে। রাজতরঙ্গিণীর মতানুসারে ভবভূতি ৭০৫ খ্রীষ্টাব্দে প্রাদুর্ভূত হন, কিন্তু তাহার ৬০০ বৎসর পূর্বে বিরচিত গ্রন্থে তাহার উল্লেখ!

শব্দকল্পদ্রুম সঙ্কলনকর্তৃগণের মতে সিংহাসন দ্বাত্রিংশতি প্রামাণিক গ্রন্থ।

তাঁহারা বিক্রমাদিত্যের বিবরণ উক্ত পুস্তকে অনুসন্ধেয় বলিয়া ক্ষান্ত হইয়াছেন। গল্পমাত্রের ঐতিহাসিক বিষয়ে অপ্রামাণ্যতা স্বীকার করা বিচক্ষণ বটে কিন্তু সেই রীতি অনুসারে কথাসরিৎসাগরের অপ্রামাণ্যতা স্বীকার করা কর্তব্য। যাঁহারা কথাসরিৎসাগরের প্রমাণানুসারে কাত্যায়নকে পাণিনির সমকালবর্তী বলেন, তাঁহাদের প্রতি আচার্যের প্রত্যুত্তর কি বিস্মৃত হইয়াছেন ?

মহাত্মা কোলব্রূক লিখিয়াছেন যে, কিংবদন্তী আছে, শেষ তীর্থঙ্কর বর্ধমান ২৪০০ বৎসর পূর্বে নির্বাণপ্রাপ্ত হন। এরূপ দীর্ঘকালের কিংবদন্তী যে একবারে ভ্রমশূন্য হইবে, তাহা নিতান্ত অসম্ভব। বর্তমান বৎসর হইতে গণনা করিলে খ্রীঃ পূঃ ৫২৮ লব্ধ হইল। অতএব শ্রীদেবকৃত বিক্রমচরিত মতে তাহার ৪৭০ বৎসর পরে অর্থাৎ ৫৮ খ্রীঃ পূর্বাব্দে বিক্রমাদিত্য বর্তমান ছিলেন। এ নির্ণয় কি অত্যন্ত অসঙ্গত ?

জ্যোতির্বিদাভরণের ২০ নং শ্লোকে যে "কিয়দ্দ্রুতিকর্মবাদঃ" আছে, তাহা তর্কবাচস্পতি মহাশয়ের মতে উৎকলদেশ প্রচলিত স্মৃতিচন্দ্রিকাভিধ বেদোক্ত কর্ম প্রতিপাদক গ্রন্থ।

ঘটকর্পর নামে কোন কবি ছিলেন না, এ কথা আপাততঃ সঙ্গত বোধ হয় না। যমককাব্য ব্যতীত নীতিসার নামক ২১ শ্লোকাত্মক কাব্য আছে। কালিদাস কুমারসম্ভবের প্রথম সর্গের তৃতীয় শ্লোকে হিমালয়ের হিমের বিষয় লিখিয়াছেন যে, "একোহি দোষো গুণসন্নিপাতে, নিমজ্জতীন্দোঃ কিরণেষ্বিবাঙ্কঃ।" এই উপমা লক্ষ্য করিয়া ঘটকর্পর নীতিসারে কহিয়াছেন, "একোহি দোষ গুণসন্নিপাতে নিমজ্জতীন্দোরিতি যো বভাষে। নূনং ন দৃষ্টং কবিনাপি তেন, দারিদ্র্য দোষোগুণরাশিনাশি।" যমককাব্যের শেষেতেও "তস্মৈ বহের মুদকং ঘটকর্পরেণ" বলিয়া শ্লেষতঃ আত্মপরিচয় প্রদান করিয়াছেন। এতদ্ব্যতীত নবরত্নশ্লোকোল্লিখিত অন্য কতিপয় ব্যক্তির ও গ্রন্থ প্রচলিত রহিয়াছে। ধন্বন্তরিকৃত আয়ুর্বেদ, অমরসিংহরচিত অমরকোষ, বেতালভট্ট প্রণীত নীতিপ্রদীপ, বরাহমিহিরকৃত লঘুজাতকাদি জ্যোঃতিশাস্ত্র, বররুচি প্রণীত প্রাকৃতপ্রকাশ ও নীতিরত্ন এ বিষয়ে প্রমাণ। অমরসিংহ বৌদ্ধ ছিলেন বলিয়া শঙ্করাচার্যের আজ্ঞানুসারে তাঁহার অন্যান্য কাব্য ধ্বংসিত হয়। ক্ষপণকের নাম দেখিয়া অনুমান হয় যে, তিনিও বৌদ্ধ।

কিন্তু সম্প্রতি দুইটি হস্তলিখিত যমককাব্য প্রাপ্ত হইয়াছে ; একটি মূল মাত্র, দ্বিতীয়টি সটীক। উভয়েতেই উহা কালিদাসরচিত বলিয়া নির্দিষ্ট। বিস্তৃত বিবরণ ভবিষ্যতে প্রকাশ করিবার ইচ্ছা রহিল।

মাঘ ১২৭৯

কালিদাস ও শেক্ষপীয়র

পাঠকেরা তুলনায় সমালোচনা বড় ভালবাসেন। সেইজন্য অদ্য আমরা কালিদাস ও শেক্ষপীয়র, এই দুইজন বড় বড় কবিকে তুলনায় সমালোচনা করিব স্থির করিয়াছি। ছোটখাট বটতলার ও গ্রব স্ট্রীটের বহুসংখ্যক কবি থাকিতে এত বড় দুইজন কবির উপর হস্তক্ষেপ করা কেন? একথা যদি কেহ জিজ্ঞাসা করেন তাহা হইলে বলিব, "মারি ত হাতি লুটি ত ভাণ্ডার", এঁদের দুজনের একজনেরও ভাল করিয়া শ্রাদ্ধ করিতে পারিলে সেই সঙ্গে আমারও কিছু হইতে পারে, এই এক ভরসা। আমরা কালিদাস ও শেক্ষপীয়র মধ্যে কে কেমন লিখিয়াছেন দেখাইতে চেষ্টা করিব। কোন একটা বিষয় লইয়া দেখিব, কে জিতিয়াছেন, কে হারিয়াছেন। কিন্তু ইঁহাদের দুজনের মধ্যে কে বড় কে ছোট, কাহার কবিত্বশক্তি অধিক, কাহার অল্প, তাহা নির্ণয় করা বড় শক্ত; বিশেষতঃ আমার মত ক্ষুদ্রজীবী লোকের পক্ষে। যাঁহাদের বিদ্যা-বুদ্ধির পার নাই তাঁহারাই হঠাৎ বলিতে পারেন শেক্ষপীয়র—ছ্যা—কালিদাসের ছাঁইচ পর্যন্ত মাড়াইতে পারে না।

কালিদাস একজন সুনিপুণ চিত্রকর। রঙ ফলাইতে অদ্বিতীয়। শেড দিবার ক্ষমতাও খুব আছে। সকলের অপেক্ষা তাঁহার বাহাদুরি সাজানোতে আর বাছিয়া লওয়াতে। কোন্ কোন্ জিনিস বাছিয়া লইতে হইবে আর কেমন করিয়া বসাইলে সে সবগুলি ভাল করিয়া খুলিবে, এই দুটি বুঝিতে তাঁহার মত ওস্তাদ মিলিয়া উঠা ভার। তিনি চিত্রকরের চক্ষে জগৎ দেখিতেন ও কবির কলমে লিখিতেন। প্রকৃতিতে যা কিছু আছে সবই সুন্দর অথবা লিপিচাতুর্যে সব সুন্দর করিয়া তুলিব, এ ভাব তাঁহার মনে কখন উদয় হয় নাই। তিনি স্বভাবশোভা কাহাকে বলে জানিতেন, চিনিতেন, এবং সেগুলি বাছিয়া লইতে ও সাজাইতে খুব মজবুদ ছিলেন।

শেক্ষপীয়রের পক্ষে বাছিয়া লইবার কিছু দরকার ছিল না। তাঁহার দুই চক্ষে যাহাই পড়িত, তাহাই লইতেন, কিন্তু কাজের সময় সেগুলিকে ছাঁটিয়া পরিষ্কার করিয়া নিজ ব্যবহারের উপযোগী করিয়া তুলিতেন। সৌন্দর্য বাছিয়া লইবার তাঁহার দরকার ছিল না, যেহেতু অসুন্দরকে সুন্দর করিবার ক্ষমতা তাঁহার যথেষ্ট ছিল। পরের লেখা ছাই ভস্ম পরিষ্কার করিয়া তিনি শিক্ষানবিশি সাঙ্গ করেন, সুতরাং পরের জিনিস কিরূপে আপন করিতে হয়, সেটুকু তাঁহার খুব অভ্যস্ত ছিল। অসুন্দর বস্তুর উপর কালিদাসের এমনি

বিতৃষ্ণা যে তাঁহার সমস্ত গ্রন্থমধ্যে কোথাও পাপের বর্ণনা বা কোন বীভৎস রসের বর্ণনা নাই। কিন্তু শেক্ষপীয়রের পাপের ছবিই সর্বাপেক্ষা সমধিক উজ্জ্বল বর্ণে রঞ্জিত। আমরা কালিদাসে শ্মশানবর্ণনা পাই না, নরকবর্ণনা পাই না, ম্যাক্‌বেথ পাই না, ইয়াগোও পাই না। কিন্তু শেক্ষপীয়রে অদ্ভুত পাপ সৃষ্টি কালিবান্‌কে প্রশংসা না করিয়া আমরা থাকিতে পারি না। কালিদাস হিমালয় বর্ণনা করিতে গিয়া কোথায় হিমালয়ের প্রকাণ্ডতা দেখাইবেন, প্রকাণ্ড বস্তুর বর্ণনে পাঠকের শরীর কণ্টকিত করিবেন, তাহা না করিয়া হিমালয়ে অপ্সরাগণের মতিভ্রম দেখাইতে বসিলেন ; সূর্যকিরণ বক্র করিয়া পুষ্করিণীর পদ্ম ফুটাইতে বসিলেন ; আরো কত সুন্দর বস্তু দেখাইয়া হিমালয়কে বিলাসকাননবৎ করিয়া তুলিলেন। কালিদাসের এইরূপ উৎকট সৌন্দর্যপ্রিয়তাহেতুই তাঁহার পুস্তকাবলীতে এত রমণীয় বর্ণনা দৃষ্ট হয়, এই জন্যই তিনি কটমট ছন্দঃসূত্র লিখিতে গিয়াও সেগুলিকে প্রিয়া বিশেষণপদ প্রয়োগে ললিত করিয়া তুলিয়াছেন।

পৃথিবীতে বর্ণনীয় জিনিস দুই—অন্তর্জগৎ—মনুষ্যের মন ; আর বাহ্য-জগৎ। নির্মল আকাশ, সুদূরবিস্তৃত অরণ্যশ্রেণী, মেঘমালাবৎ প্রতীয়মান পর্বতশ্রেণী ইত্যাদি। কালিদাসের বই পড়িলে বোধ হয় এই দুইএর মধ্যে যাহা কিছু সুন্দর সব তাঁহার একচেটে। মনুষ্যজাতির মধ্যে সুন্দর রমণীগণ ; রমণীহৃদয়ে পবিত্র প্রণয়, পরম সুন্দর। কালিদাস সেই প্রণয়ই নানাপ্রকারে দেখাইতে প্রয়াস পাইয়াছেন। হৃদয়ের অন্যান্য প্রবৃত্তির মধ্যে যেগুলিতে লোকের মন আকর্ষণ করে, সেগুলি সব তাঁহার পুস্তকে আছে। বাপ ছেলেকে কোলে লইয়া চুম্বন করিতেছে, বাপ বনে যাবেন শুনিয়া ছেলে কাঁদিয়া আকুল হইতেছে, মেয়ে শ্বশুরবাড়ি যাইবে—বুড়া বাপ কাঁদিতেছে, প্রিয়তমার অকাল-মৃত্যুতে পতি শোকে অভিভূত হইয়াছে, স্বামীর অকালমৃত্যুতে নববিধবা মোহ-পরায়ণ হইয়া পড়িয়া আছে, প্রিয়ার হঠাৎ বিরহে প্রিয় উন্মত্ত হইয়া ভ্রমণ করিতেছে আর যাহাকে পাইতেছে প্রিয়ার সংবাদ জিজ্ঞাসা করিতেছে ; কোথাও লতা কোথাও ময়ূরকে প্রিয়াবোধে আলিঙ্গন করিতেছে—এ সব মনুষ্যহৃদয়ের মোহিনীময় ভাব। এ ভাবের প্রকৃত ওস্তাদ কালিদাস। কিন্তু যেখানে দশ-পনরটি পরস্পরবিরোধী ভাব যুগপৎ উদয় হইয়া অন্তরাকাশকে অন্ধকার করে, যেখানে হৃদয়ক্ষেত্রে যুদ্ধ উপস্থিত, যেখানে ভাবসন্ধি ভাবশবল হইবার কথা, সেখানে কালিদাস আসিবেন না, সেখানে শেক্ষপীয়র ভিন্ন গতি নাই। একদিকে দুর্জয় দুরাকাঙ্ক্ষা রাশি রাশি পাপকার্যে রত হইতে বলিতেছে, আর একদিকে স্নেহ দয়া কৃতজ্ঞতা বাধা দিতেছে ; একদিকে পাপের স্মৃতি

অনুতাপের ভরে হৃদয় ভারাক্রান্ত করিতেছে, আর তখনই সেই পাপ ঢাকিবার জন্য চেষ্টা করিতে হইতেছে, তখন সে ভাব গোপনের জন্য কার্যান্তরে ব্যাপৃত হইয়া যেন সে নয়, এইরূপ দেখাইতে হইতেছে ;—এ সব হৃদ্‌বৃত্তির জটিলতা, মনুষ্যস্বভাবের অস্থিরতা, পরস্পরবিরোধী ভাবসমূহের যুগপৎ বিকাশ, শেক্ষপীয়র ভিন্ন আর কেহ পরিষ্কার করিয়া দেখাইতে পারেন নাই, পারিবেনও না। শেক্ষপীয়র মানুষ সৃষ্টি করিতে পারেন। তুমি যেমন মানুষ চাও, শেক্ষপীয়র তেমনি মানুষ তোমায় দিবেন। তুমি শকুন্তলার মত সরলা মুগ্ধহৃদয়া সামাজিককুটিলতানভিজ্ঞা বালিকা চাও মিরন্দা দেশদিমোনা লও। পাকা গিন্নী ঘরকন্নায় মজপুত, ভাঙ্গে না, মোচকায় না, এমন মেয়ে চাও, আচ্ছা তোমার জন্য ডেম কুইকলি আছে। পতিপরায়ণা পতিরতা যুবতী চাও পোর্সিয়া আছে, জগৎ মোহিত করিবার জন্য মায়াজাল ছড়াইয়া বসিয়া আছেন, যে জালে পা দিতেছে তাহারই সর্বনাশ করিতেছেন, এমন দুর্বুদ্ধিশালিনী ভুবনমোহিনী চাও, ক্লিওপেট্রা আছে। দুরাকাঙ্ক্ষায় জর্জরিতহৃদয়া, লোকের উপর আধিপত্য করিবার ইচ্ছায় পাষাণবৎ দৃঢ়সংকল্পা, পুরুষকে পাপে প্রেরণ করিবার জন্য শয়তানরূপিণী পাপিষ্ঠা দেখিতে চাও, লেডি ম্যাকবেথ আছে। দেখিবে এগুলি সব মানুষ। অমন যে পাষাণহৃদয়া ম্যাকবেথপত্নী, যে রাজ্যলোভে ক্রোড়স্থিত স্তন্যপায়ী আপন শিশুকে আছড়াইয়া মারিতে ক্ষুব্ধ হয় না, সেও স্ত্রীলোক। রাজার মুখ আপন পিতার মুখের মত বোধ হওয়াতে স্বহস্তে রাজহত্যা করিতে পারিল না।

কালিদাস এরূপ মনুষ্য সৃষ্টি করিতে অক্ষম, তিনি মনুষ্যহৃদয়ের সুন্দর অংশ দেখাইতে পারেন। উদাহরণ—তিনি কণ্বমুনিকে শকুন্তলার ঠিক যাত্রার সময় বাহির করিলেন। যেহেতু কন্যাপ্রেরণের সময়, পিতার কান্না বড়ই সুন্দর। সেটি দেখানো হইল, অমনি কণ্বমুনি ডিস্‌মিস্। কালিদাস তাঁহাকে একেবারে লুকাইয়া ফেলিলেন, আর বাহির করিলেন না। শকুন্তলার চিত্রটি পরম সুন্দর, এই জন্য আগা গোড়া শকুন্তলা চরিত্র আমরা পড়িতে পাই। ওরূপ মুগ্ধ বালিকার প্রথম প্রণয় সুন্দর। সেই প্রণয়ের অনুরোধে দারুণ কষ্ট হইলেও পিতা মাতা সমদুঃখসুখসখী চিরলালিত হরিণশিশু চিরবর্ধিত নব-মালিকা লতা ত্যাগ করিয়া যাওয়া সুন্দর। রাজা প্রত্যাখ্যান করিলে তাঁহাকে হাবা মেয়ের মত লুকাইবার চেষ্টা সুন্দর। সে সময়ে একটু রাগ (এ রাগে বাহানা নাই) সুন্দর। এত অপমানের পর নিশ্চয় মিলনের আশা সুন্দর, কশ্যপ-তপোবনে দেখিবামাত্র সকল অপরাধ মার্জনা করিয়া একেবারে পামর প্রণয়ীর হস্তে আত্মসমর্পণও সুন্দর। কালিদাস বড় কবি, এত সৌন্দর্য কে

দেখাইতে পারে! আবার একটি সুন্দর মনুষ্যের চিত্র দেখিবে? বিক্রমোর্বশী খোল। রাজার স্বভাবটি কেমন সুন্দর; রাজা সূর্যদেবের অর্চনা করিয়া সূর্যলোক হইতে ফিরিয়া আসিতেছেন, হঠাৎ অপ্সরাদিগের আর্তনাদ শ্রুতিগোচর হইল। রাজা শুনিলেন, দৈত্যকেশরী অপ্সরা চুরি করিয়া লইয়া যাইতেছে। তিনি কেশরীহস্ত হইতে ঊর্বশীর উদ্ধার করিলেন। বীরত্বে যেমন মেয়েদের চিত্ত সহসা আকর্ষণ করে, এমন আর কিছুতেই নয়। রাজার বীরত্বে ঊর্বশীর তাঁহার প্রতি অনুরাগ জন্মিল। ওরূপ অনুরাগ সুন্দর নয়? সুন্দরী অপ্সরা বিদ্যাধরীর অনুরাগ প্রায় নিষ্ফল হয় না। রাজার মনও কেমন হইয়া উঠিল, তিনি ক্রমে ধারিণীর প্রতি বীততৃষ্ণ হইলেন। কিন্তু ধারিণী তাঁহাকে অপমানের শেষ করিলেও তিনি ধারিণীকে একটি উচ্চ বাক্যও বলেন নাই। শেষ ধারিণী প্রিয়সাধন ব্রত করিয়া চন্দ্র সূর্য দেবতা সাক্ষী করিয়া বলিল যে, যে অদ্যাবধি আমার স্বামীর প্রণয়াকাঙ্ক্ষী হইবে, আমি তাহাকে ভগিনীর মত দেখিব। কেমন, এটি সুন্দর নয়?

ঊর্বশীর সহিত রাজার মিলনের কিছু দিন পরে হিমালয় পর্বতের রম্যস্থান সকলে বিহার করিবার জন্য উভয়ে প্রস্থান করিলেন। সেখানে বসন্তসময়ে পুষ্পবনমধ্যে নির্জন প্রদেশে নির্ঝরিণীতটে সান্ধ্যসমীরে শিলাপট্টে পরস্পরের সহবাসে পরম সুখে কালযাপন করেন। একদিন ঊর্বশী কার্তিকের বাগানে উপস্থিত। কার্তিক চিরকুমার, তাঁহার বাগানে স্ত্রীলোক গেলে পাছে দেব-কার্যের ব্যাঘাত ঘটে, এইজন্য শাপ ছিল স্ত্রীলোক সেখানে গেলেই লতা হইয়া যাইবে। ঊর্বশী লতা হইয়া রহিলেন, রাজা তাঁহার বিরহে উন্মত্ত। মেঘ দেখিয়া ভাবিলেন বুঝি দৈত্য আবার উহাকে চুরি করিয়াছে। মেঘকে কতক-গুলা গালাগালি দিলেন। মেঘ তাঁহার মাথার উপর জলধারা বর্ষণ করিল। রাজা বলিলেন, রে পাপ দৈত্য, আমারই সর্বনাশ করিয়াছিস, আবার আমারই উপর বাণ বর্ষণ। সে ভয়ে থামিল। একটা গাছের উপর ময়ূর গলা বাড়াইয়া কি দেখিতেছে, রাজা বলিলেন অনেক দূর দেখিতেছ, আমার প্রিয়াকে দেখিতেছ কি? ময়ূর বলিল কক্ কক্। রাজার মহা রাগ, আমি মহারাজ পুরূরবা, আমায় চেন না? বল কি না "কঃ কঃ", বলিয়াই ঢিল, ময়ূরও উড়িয়া যাক। রাজা অনেক কষ্টের পর গৌরীপাদভ্রষ্ট অলক্তমণিসংযোগে ঊর্বশীর উদ্ধারসাধন করিলেন। ঊর্বশী বলিলেন তুমি মেঘ হও, ঊর্বশী মেঘ হইলেন, রাজা তদুপরি আরোহণ করিয়া মুহূর্তমধ্যে প্রয়াগে উপস্থিত। ইহা অপেক্ষা চিত্তবিনোদন আর কি আছে? যে কেহ কালিদাসের গ্রন্থ পড়িয়া রাজার সহিত কার্তিকের প্রমোদকাননে ভ্রমণ করে নাই তাহার সংস্কৃত পড়াই অসিদ্ধ।

আমরা এতক্ষণ নাটকের কথাই কহিতেছিলাম, আরও কিছুক্ষণ কহিব। নাটক মনুষ্যহৃদয়ের চিত্র লইয়াই ব্যস্ত। সে চিত্রে অনেক সৌন্দর্য কালিদাস দেখাইয়াছেন কিন্তু আরও অনেক বাকী আছে। সেগুলি কালিদাসে মিলিবে না, তাহার জন্য শেক্ষপীয়রের শরণ লইতে হইবে। কালিদাসগ্রথিত সৌন্দর্য শেক্ষপীয়রেরও আছে। কালিদাসের পুরূরবা, কালিদাসের শকুন্তলা অন্যত্র মিলিলেও মিলিতে পারে। কিন্তু শেক্ষপীয়রের প্রস্‌পেরো আর কোথায় পাওয়া যাইবে? প্রস্‌পেরোর স্বভাব মনুষ্যহৃদয়গত সৌন্দর্যের পরাকাষ্ঠা। যে শত্রু তাঁহাকে জীর্ণ শীর্ণ ডিঙ্গিমাত্রে চড়াইয়া অগাধসমুদ্রে নিক্ষেপ করিয়াছে, যাহার জন্য বার বৎসর রাজ্য হারাইয়া একাকী জনশূন্য দ্বীপে বাস করিতে হইয়াছিল তাহাদের ক্ষমা করা সামান্য ঔদার্যের কথা নহে। প্রস্‌পেরোর গুণে সকলেই বাধ্য। কন্যা পিতার একান্ত বশংবদ। নেপল্‌সের রাজা উঁহার রাজ্য ফিরাইয়া দিলেন। ফর্দিনান্দ উঁহাকে দেবতা মনে করে। প্রস্‌পেরো সংসারের কার্যে কেমন দক্ষ সমস্ত নাটকে তাহার দৃষ্টান্ত আছে। প্রস্‌পেরো মূর্তিমান্ শান্তি, পরোপকার ক্ষমা তাঁহার আভরণ। কলিবানকে শত অপরাধ সত্ত্বেও তিনি স্বাধীনতা দিলেন, যেহেতু সে তাহাই চায়। এরিএলের সময় পূর্ণ হইবার পূর্বেই তাহাকে ছাড়িয়া দিলেন। অন্তোনিওর দোষ প্রমাণ করিয়া দিলে তাহার প্রাণদণ্ড হয়, তিনি কেবল একবার ভয় দেখাইয়াই ক্ষান্ত হইলেন। তিনটি মাতাল তাঁহার ঘর লুঠ করিতে আসিয়াছিল, তাহারাও ক্ষমা পাইল। প্রস্‌পেরো ক্ষমা করিলেন, কিন্তু সকলকেই এক-একবার জব্দ করিবার পর। প্রস্‌পেরোর চরিত্র পাঠ করিলেই তাঁহাকে ভক্তি করিতে ও ভালবাসিতে ইচ্ছা করে। এ একরকম সৌন্দর্য। আবার যখন ধর্মবুদ্ধি ও পাপবুদ্ধিতে বিবাদ হয়, সে সময়ের বর্ণনা কি সুন্দর নয়? ব্রুটস এণ্টনি হ্যামলেট এমন কি ম্যাক্‌বেথ এই বিবাদহেতু কোন কাজই করিতে পারিতেছে না, একবার এদিকে একবার ওদিকে করিয়া দোলাচল-চিত্তবৃত্তি হইয়া রহিয়াছে, ইহা কি সুন্দর নয়? উহাদের জন্য কি আমাদের ক্ষুদ্রজীবী মনুষ্যের সহানুভূতি হয় না? ওরূপ সৌন্দর্য কালিদাসের কোথায়?

তাহার পর আর-এক কথা। শুদ্ধ সৌন্দর্য হইলেই কি কাব্যের চরম হইল? সৌন্দর্য ছাড়া আরও অনেক জিনিসে কাব্য হয়। তাহার মধ্যে প্রধান দুইটি; পণ্ডিতেরা বলেন তিন পদার্থে কল্পনাজনিত আনন্দের উৎপত্তি হয়,—প্রকাণ্ড বস্তু দেখিলে, নূতন বস্তু দেখিলে, আর সুন্দর বস্তু দেখিলে। এই কথাটি যেমন বাহ্যজগতে খাটে, তেমনি অন্তর্জগতে। অন্তর্জগতে যখন আমরা কাহাকেও লোকাতীত ক্ষমতাশালী দেখিতে পাই, যখন দেখিতে পাই যে

জিনদেব ব্যাঘ্রীজন্য স্বদেহ অর্পণ করিলেন, যখন দেখি যে রামচন্দ্র পিতৃসত্য পালনার্থ বনগমন করিলেন, তখনই আমরা প্রকাণ্ড বস্তু দেখি। তখনই আমাদের মনে বিস্ময়ের আবির্ভাব হয় এবং সেই বিস্ময়মিশ্রিত এক অপূর্ব আনন্দ ও ভক্তির উদয় হয়। কালিদাস এরূপ পুরুষপ্রকাণ্ডের চিত্র দেখাইতে পারেন নাই। রঘু রাজা যখন বিশ্বজিৎ যজ্ঞে "মৃৎপাত্র শেষামকরোৎ বিভূতিম্", পার্বতী যখন মদন-দহনের পর কঠোর তপস্যায় তনু অঙ্গে তাপ দিতে লাগিলেন, তখন যেন এইরূপ প্রকাণ্ড চিত্র দেখাইবার চেষ্টা হইয়াছে বোধ হয়, কিন্তু এক পার্বতীর তপস্যা ভিন্ন আর কোথাও বিস্ময় উদয়করণে তিনি সমর্থ হয়েন নাই। শেক্ষপীয়রের এরূপ বিস্ময়-উৎপাদক মনুষ্যহৃদয়ের চিত্র অসংখ্য। এরূপ উজ্জ্বল চিত্রের সংখ্যা নাই। সর্বপ্রধান লেডি ম্যাক্‌বেথ, একবার অনুতাপ নাই বরং প্রতিজ্ঞা, একবার যখন নামিয়াছি, দেখা যাক পাতাল কত দূর। একবার হৃদয়দৌর্বিল্য প্রকাশ নাই, কেমন প্রত্যুৎপন্নমতিত্ব! যখন সভামধ্যে ব্যাঙ্কোর প্রেতমূর্তি আসিয়া ম্যাক্‌বেথকে বিহ্বল করিয়া তুলিল, যখন ম্যাক্‌বেথ ভয়ে অনুতাপে জড়ীভূত হইয়া অতি গোপনীয় কথা সকল প্রকাশ করিতে লাগিলেন, তখন লেডি ম্যাক্‌বেথের কেমন ক্ষমতা! অন্য মেয়ে হইলে, "ওগো আমার কি হোলো" বলিয়া কাঁদিয়াই অস্থির হয়। লেডি ম্যাক্‌বেথ সভাশুদ্ধ লোককে বুঝাইয়া দিলেন যে, রাজার ঐরূপ মূর্ছা মাঝে মাঝে হয়, এ সময়ে কাছে কেহ আসিলে তিনি বিরক্ত হন। এই বলিয়া নিজে ম্যাক্‌বেথের কাছে বসিয়া তাঁহার দুর্বল মনের দৃঢ়তা সম্পাদন করিতে লাগিলেন। এরূপ চরিত্র পাঠ করিলে কাহার মনে বিস্ময়ের উদয় না হয়?

কল্পনাজনিত আনন্দের আর-এক কারণ নূতনতা, অর্থাৎ আজগবি জিনিস বর্ণনা করা। আরব্য উপন্যাসে ইহার ভূরি ভূরি উদাহরণ পাওয়া যায়। এরূপ নূতন জিনিস কালিদাস বা শেক্ষপীয়র কাহারই নাই। তবে শেক্ষপীয়রের স্পিরিট ওয়ারল্ড বা পরীস্থান; সেটি যেমন নূতন তেমনি সুন্দর। সবই মনুষ্যের মত কিন্তু কেমন পবিত্র আনন্দময়, কোনরূপ শোক দুঃখ নাই। শোক দুঃখ যে বৃত্তি দ্বারা অনুভব হয়, সে বৃত্তিও তাহাদের নাই। অথচ মানুষের কষ্ট দেখিলে মনটা কেমন কেমন হয়।

Ariel. Your charm so strongly works them
That if you now behold them your affection
Would become tender.
Pros. Dost thou think so, spirit?
Ari. Mine would sir, were I human.

যদি আরিয়াল মানুষ হইত, তবে লোকের দুঃখ দেখিয়া তাহার চিত্ত দ্রবীভূত হইত। ওবেরনের অধীন দেবযোনিগণ মনুষ্যের অদৃষ্ট লইয়া ক্রীড়া করিতেছে, মানুষের কানে একপ্রকার পাতার রস ঢালিয়া দিয়া এর প্রাণটি ওর ঘাড়ে, ওর পিয়ারের লোক তার ঘাড়ে দিয়া কেমন আমোদ করিতেছে ; পড়িলে নূতন জগৎ, নূতন আমোদ, নূতন পরিবর্ত বলিয়া বোধ হয়, পাঠক নিজেও যেন পরীগণমধ্যে বিলীন হইয়া যান। কালিদাসের চিত্রলেখা, সহজন্যা, মিশ্রকেশী, এমন কি ঊর্বশী শেক্ষপীয়রের পরীস্থানে স্থান পান না।

শেক্ষপীয়রের হাস্যরসাকর চরিত্র বর্ণনা এক আশ্চর্য জিনিস। এ স্থলে তাহার উল্লেখ না করিয়া থাকা যায় না। ফলস্টাফ কতবার অপ্রস্তুত হইল, কিন্তু সে অপ্রস্তুত হইবার পাত্র নহে। যতবার তাহার বিদ্যাবুদ্ধি প্রকাশ হইয়া পড়ে, ততবারই সে নূতন নূতন চালাকি বাহির করে, ঠকিবার পাত্র ফলস্টাফ একেবারেই নহে। প্যারোলস ফলস্টাফের সঙ্গে তুলনা করিলে কালিদাসের বিদূষকগুলি কোন কর্মেরই নহে। জীবনশূন্য প্রভাশূন্য খোসামুদে বামুন মাত্র।

এতদূরে আমরা কালিদাস ও শেক্ষপীয়রের তুলনার এক অংশ কথঞ্চিৎ শেষ করিলাম। বিষয় এত বিস্তৃত, সমালোচনায় এত আমোদ যে, সংক্ষেপ করিতে গেলেই কষ্ট হয়। যে অংশ সমালোচিত হইল, ইহাতে হৃদয়ের প্রবৃত্তি বর্ণনায় কাহার কত বাহাদুরি দেখাইবার চেষ্টা করা হইয়াছে। কল্পনাজনিত সুখ তিন কারণে জন্মে, প্রকাণ্ডতা—সৌন্দর্য ও নূতনতা। প্রকাণ্ডতা—বিস্ময়কর হৃদয়ভাবের ঔজ্জ্বল্য—বর্ণনায় শেক্ষপীয়রের অনুকরণেও কেহ সমর্থ নয়। অতি নৈসর্গিক পদার্থ সৃষ্টিতে শেক্ষপীয়র অতীব মনোহর, হাস্যরসের বর্ণনায় তাঁহার বড়ই ওস্তাদি। সৌন্দর্যবর্ণনা ও যেখানে হৃদয়বৃত্তির জটিলতা, গভীরতা সেখানে কালিদাস শেক্ষপীয়র হইতে অনেক ন্যূন। যে চরিত্রপাঠে মনের ঔদার্য জন্মে, যে চরিত্র অনুকরণ করিয়া শিক্ষা করিতে ইচ্ছা করে, তাহার গন্ধও কালিদাসের নাটকে নাই। তবে যেখানে সহজ অবিমিশ্র হৃদয়ভাবের বর্ণনা আবশ্যক, সেখানে কালিদাসের বড়ই বাহাদুরি। কালিদাসের নাটক পড়িলে গেটের সঙ্গে বলিতে ইচ্ছা করে, "যদি কেহ বসন্তের কুসুম, শরতের ফল, স্বর্গ ও পৃথিবী একত্র দেখিতে চায়, তবে শকুন্তলে তোমায় দেখাইয়া দিব!"

এতক্ষণ পর্যন্ত যাহা দেখা গেল তাহাতে কালিদাস শেক্ষপীয়র হইতে ন্যূন বলিয়া বোধ হইবে। কালিদাসের আর-এক মূর্তি আছে, সে মূর্তিতে তাঁহার সমকক্ষ কেহ নাই। বাইরন জাঁক করিয়া বলিয়াছেন Description is my forte, কিন্তু সেই বাহ্য জগদ্বর্ণনায় কালিদাস অদ্বিতীয়। শেক্ষপীয়র

বাহ্যজগদ্বর্ণনায় হাত দেন নাই, বাহ্যজগৎ বড় গ্রাহ্যও করিতেন না। মনুষ্যের হৃদয়ের উপর, তাঁহার আধিপত্য সর্বতোমুখ। তাঁহার যেমন অন্তর্জগতের উপর, কালিদাসের তেমনি বাহ্যজগতের উপর সর্বতোমুখী প্রভুতা। যখন স্বয়ম্বরস্থলে ইন্দুমতী উপস্থিত হন, তখন কালিদাস দুই-চারি কথায় কেমন জমজমাট করিয়া দিলেন। একেবারে কল্পনানেত্র উন্মীলিত হইল। দেখিলাম প্রকাণ্ড উঠান, বহুসংখ্যক মঞ্চ, অর্থাৎ কথকঠাকুরদিগের মত বেদী, নানা কারুকার্যখচিত মহার্ঘ বস্ত্রাস্তরণোপপন্ন, তদুপরি পৃথিবীর রাজগণ বিচিত্র বেশভূষা করিয়া স্বীয় সঙ্গিগণ সমভিব্যাহারে বসিয়া আছেন।

তাসু শ্রিয়া রাজপরম্পরাসু প্রভাবিশেষোদয়দুর্নিরীক্ষ্যঃ।
সহস্রধাত্মা ব্যরুচদ্বিভক্তঃ পয়োমুচাং পঙ্ক্তিষু বিদ্যুতেব ॥

যেমন মেঘমালায় একটি বিদ্যুৎ হইলে সমস্ত মেঘ উদ্দীপ্ত হয় এবং সেই নিবিড় নীলনীরদমালার মধ্যে সেই বিদ্যুৎ যেমন গাঢ়োজ্জ্বল দীপ্তি বিকাশ করে, তেমনি রাজারা সব মঞ্চোপরি আসীন হইলে রাজসভার কেমন এক গভীরতা-মিশ্রিত লোকাতীত শোভা হইল। সব জমজম করিতে লাগিল। এমন সময়ে বন্দিরা স্তুতিপাঠ আরম্ভ করিল—রাজাদের বংশাবলীবর্ণনা সমাপন হইল।

অথ স্তুতে বন্দিভিরন্বয়জ্ঞৈঃ সোমার্কবংশে নরদেবলোকে।
প্রসারিতে চাগুরুসারযোনৌ ধূপে সমুৎসর্পতি বৈজয়ন্তীঃ ॥
পুরোপকণ্ঠোপবনাশ্রয়াণাং কলাপিনামুদ্ধতনৃত্যহেতৌ।
প্রধ্মাত শঙ্খে পরিতোদিগন্তান তূর্যস্বনে মূর্ছতি মঙ্গলার্থে ॥
মনুষ্যবাহ্যং চতুরস্রযান মধ্যাস্য কন্যা পরিবারশোভি।
বিবেশ মঞ্চান্তর রাজমার্গং পতিম্বরাক্লৃপ্ত বিবাহবেশা ॥*

কালিদাস রাজসভার কবি, তিনি নিজেও হয়ত একজন প্রধান রাজকর্মচারী ছিলেন। তিনি পুস্তক লিখেন সভাস্থ ওমরাহদিগের তৃপ্তির জন্য, তাঁহার নিকট আমরা রাজসভা, বিবাহ সভা, দরবার প্রভৃতি বড়মানুষি জিনিসের উৎকৃষ্ট বর্ণনা পাইব, ইহা এক প্রকার প্রত্যাশা করা যাইতে পারে। কিন্তু স্বভাববর্ণনায়ও

* চন্দ্র ও সূর্যবংশীয় রাজগণের বংশাবলী পাঠ হইলে পর উৎকৃষ্ট অগুরুচন্দনের ধূম চারিদিকে প্রসারিত হইল। সে ধূম ক্রমশঃ অত্যুচ্চ পতাকা আক্রমণ করিতে লাগিল। মঙ্গল-সূচক তূর্যধ্বনি সবলে ধ্বনিত হইল। তাহার সঙ্গে শঙ্খপ্রধ্মাত হইয়া শব্দ আবর্ত ঘন গাঢ় হইয়া দিগন্ত পরিপূর্ণ করিল। নগরের প্রান্তবর্তী যে ময়ূরেরা ছিল তাহারা মেঘগম্ভীর তূর্য-মিশ্রিত শঙ্খধ্বনি শ্রবণ করিয়া উন্মত্ত হইয়া নৃত্য করিতে লাগিল। এমন সময়ে স্বয়ম্বরা রাজকন্যা বিবাহবেশ ধারণ করতঃ মনুষ্যবাহ্য চতুষ্কোণ যান আরোহণ করিয়া সভামধ্যে প্রবেশ করিলেন।

তাঁহার সমান্তরাল কেহ নাই। বাহ্যজগৎ বর্ণনায় তিনি যে শুদ্ধ সৌন্দর্য মাত্র বর্ণন করিয়াছেন এমন নহে, হিমালয়বর্ণনস্থলে যাহাই করুন, তাঁহার অনেক বর্ণনা এত গভীর যে ভাবিতে গেলে হৃদয় কম্পিত হয়। কিন্তু তাঁহার স্বভাব-সৌন্দর্যবর্ণনাই আমরা বড় ভালবাসি এবং তাহাই অধিক।

কালিদাসের আরও একটি নিসর্গবর্ণনা এখানে দেখাইতে হইল। এটি কালিদাসের রঘুর ত্রয়োদশ সর্গ হইতে। রাবণবধ ও বিভীষণের অভিষেক সম্পন্ন হইয়াছে। রাম-সীতায় অনেক হাঙ্গামের পর পুনর্মিলন হইয়াছে। পুষ্পকরথ প্রস্তুত। সকলে আরোহণ করিল। পুষ্পকরথ আকাশপথে উড্ডীন হইল। রাম সীতাকে দেখাইতে লাগিলেন। প্রথমেই সমুদ্র।

> বৈদেহি পশ্যামলয়াদ্বিভক্তং মৎসেতুনা ফেনিলমম্বুরাশিং।
> ছায়াপথেনেব শরৎ প্রসন্নমাকাশমাবিষ্কৃতচারুতারম্॥
> তান্তামবস্থাং প্রতিপদ্যমানং স্থিতং দশ ব্যাপ্যাদিশোমহিম্না।
> বিষ্ণোরিবাস্যা নবধারণীয়মীদৃক্তয়ারূপমীয়ত্তয়া বা॥*

সমুদ্রে প্রকাণ্ড তিমি মৎস্যসমূহ রহিয়াছে।

> সসত্ত্বমাদায় নদীমুখাম্ভঃ সম্মীলয়ন্তো বিবৃতাননত্বাৎ
> অমী শিরোভিঃ তিময়ঃ সরন্ধ্রৈঃ ঊর্ধ্বং বিতন্বন্তি জলপ্রবাহান্।†

প্রকাণ্ড অজগরগণ সমুদ্রতীরে জলতরঙ্গের সঙ্গে একাকার হইয়া শয়ন করিয়া আছে।

> বেলানিলায় প্রসৃতাঃ ভুজঙ্গাঃ মহোর্মি বিস্ফূর্জথুনির্বিশেষাঃ
> সূর্যাংশু সম্পর্ক সমৃদ্ধরাগৈঃ ব্যজ্যন্ত এতে মণিভিঃ ফণস্থৈঃ।‡

দেখিতে দেখিতে সমুদ্রের কূল দেখা গেল।

* বৈদেহি, আমার সেতুতে বিভক্ত অনন্ত ফেনিল নীল সমুদ্রেব প্রতি দৃষ্টিনিক্ষেপ কর। যেন শরৎকালের অগণ্য তারকাঘটিত নির্মেঘ গগনতল হরিতালীতে দ্বিখণ্ডিত হইয়া রহিয়াছে।
ঐ দেখ অনন্ত সমুদ্র দশদিক্ ব্যাপিযা পড়িয়া আছে। প্রতিক্ষণেই উহার আকার পরিবর্তন হইতেছে। সমুদ্রের রূপ বিষ্ণুর ন্যায়, কিরূপ ও কত বড় কেহই স্থির করিয়া উঠিতে পাবে না।

† তিমি মৎস্য সকল বিকট হাঁ করিয়া নদীমুখের জল মুখে পুরিতেছে। শেষ মাথার ছিদ্র দিয়া সে জল বাহির করিয়া দিয়া নদী হইতে আগত সমস্ত জীবজন্তু ভক্ষণ করিতেছে।

‡ বৃহৎ বৃহৎ অজগর সকল সমুদ্রতীরবায়ু সেবন করিবার জন্য লম্বা হইয়া পড়িয়া আছে। সমুদ্রতরঙ্গের সহিত তাহাদের ভেদনিরূপণ অতীব কষ্টকর। যদি সূর্যরশ্মি পড়িয়া উহাদের মাথার মণি দ্বিগুণ দীপ্তি না করিত কাহার সাধ্য চিনিয়া উঠে কোনটা সাপ আর কোনটা নয়।

দূরাদয়শ্চক্রনিভস্য তন্বী তমালতালীবনরাজিনীলা।
আভাতি বেলা লবণাম্বুরাশের্ধারানিবদ্ধেব কলঙ্করেখা।*

রথ রামের যেমন অভিলাষ তেমনি চলিতেছে। মুহূর্তমাত্রে সমুদ্রতীরে উপস্থিত। রাম দেখাইলেন, সীতে দেখ—

এতে বয়ং সৈকতভিন্নশুক্তি পর্যস্তমুক্তাপটলং পয়োধেঃ
প্রাপ্তা মুহূর্তেন বিমানবেগাৎ কূলং ফলাবর্জিতপূগমালম্।†

আকাশ নীরধির স্বৈরগামী প্রমোদ নৌকার ন্যায় রামের পুষ্পকরথ জনস্থান, মাল্যবান, পঞ্চবটী, পম্পা, শরভঙ্গাশ্রম প্রভৃতি পার হইয়া প্রয়াগে গঙ্গাযমুনাসংগমস্থলে উপস্থিত। এখানে নির্মল শ্বেতকান্তি গঙ্গাপ্রবাহ কৃষ্ণকান্তি যমুনাপ্রবাহের সঙ্গে মিশ্রিত হইয়া কি অপূর্ব শোভাই ধারণ করিয়াছে।

ক্বচিৎ প্রভালেপিভিরিন্দ্রনীলৈঃ মুক্তাময়ী যষ্টিরিবানুবিদ্ধা।
অন্যত্র মালা সিতপঙ্কজনামিন্দীবরৈরুৎ খচিতান্তরেব॥
ক্বচিৎ খগানাং প্রিয়মানসানাং কাদম্ব সংসর্গবতীব পংক্তিঃ।
অন্যত্র কালাগুরুদত্তপত্রা ভক্তির্ভুবশ্চন্দনকল্পিতেব॥
ক্বচিৎ প্রভা চান্দ্রমসী তমোভিঃ ছায়াবিলীনৈঃ শবলীকৃতেব।
অন্যত্র শুভ্রা শরদভ্রলেখা রন্ধ্রেষ্বিবা লক্ষ্যনভঃপ্রদেশা॥
ক্বচিচ্চ কৃষ্ণোরগভূষণেব ভস্মাঙ্গরাগা তনুরীশ্বরস্য।
পশ্যানবদ্যাঙ্গি বিভাতি গঙ্গা ভিন্নপ্রবাহা যমুনাতরঙ্গৈঃ॥‡

* দূর হইতে সমুদ্রের বেলা দেখা যাইতেছে। বেলা কেমন? তমাল ও তালবনে নীলবর্ণ। বোধ হয় যেন একখানি প্রকাণ্ড লৌহচক্রের কানায় সরু কলঙ্কের রেখা দেখা যাইতেছে।

† এই ত আমরা রথবেগহেতু মুহূর্তমধ্যে সমুদ্রের তীরভূমিতে উপস্থিত হইলাম। এই তীরভূমিতে অসংখ্য শুপারিবৃক্ষ ফলভরে অবনত এবং বালুকার উপরে শুক্তিবিভক্ত হওয়ায় চারিদিকে মুক্তা ছড়ান রহিয়াছে।

‡ হে সর্বাঙ্গসুন্দরি! গঙ্গা যমুনা তরঙ্গের সহিত মিশ্রিত হইয়া কেমন শোভা হইয়াছে দেখ। কোথাও বোধ হয় মুক্তার হারের মাঝে মাঝে নীলমণি থাকিয়া আপনার প্রভা যেন মুক্তায় লেপন করিয়া দিতেছে। আর এক জায়গায় শাদা পদ্মের মালায় যেন মাঝে মাঝে নীলপদ্ম বসান রহিয়াছে। কোনস্থানে যেন হংসশ্রেণী মানস সরোবরে যাইতেছে, তাহাদের মধ্যে মধ্যে কাদম্ব হংসও দুই পাঁচটা আছে। আবার কোথাও যেন পৃথিবী সার চন্দনের টিপ কাটিয়া মধ্যে মধ্যে কালাগুরু দিয়া তাহার শোভা সম্পাদন করিতেছে। কোথাও বোধ হয় পূর্ণিমার জ্যোৎস্না, কেবল মাঝে মাঝে ছায়ার অন্ধকার লুকাইয়া আছে। কোথাও যেন শরৎকালের নির্জল মেঘ, মধ্যে মধ্যে ফাঁক দিয়া নীল আকাশ উকি মারিতেছে। আবার একস্থান দেখিতে হঠাৎ বিভূতিভূষিত শিব অঙ্গে কৃষ্ণসর্প বিহার করিতেছে বোধ হইবে।

এত মিষ্ট, এত সুন্দর, এমন হৃদয়োন্মাদকর বর্ণনা, প্রকৃতির এত সুনিপুণ অনুকরণ, কল্পনার এমন স্নিগ্ধ দীপ্তি আর কোথায় মিলিবে? আমার ইচ্ছা ছিল আরও উৎকৃষ্ট বর্ণনা উদ্ধার করি, কিন্তু বঙ্গদর্শনের স্থান বড় অল্প ; সবই যদি ভাল জিনিসে পুরাইয়া দিই ত আর সব ছাইভস্ম কোথায় যাইবে ?

যখন নাটক ছাড়িয়া মহাকাব্যে উপস্থিত হইয়াছি, তখন কালিদাসের হইয়া আর-একটি কথা না বলিয়া থাকা যায় না। নাটকে কালিদাস মনুষ্যহৃদয়ের যেমন একই রকম চিত্র দেখাইয়াছেন, মহাকাব্যে সেরূপ নহে। মহাকাব্যে মনুষ্যচরিত্রবর্ণনায় তিনি অপেক্ষাকৃত অধিক কারুকরী প্রকাশ করিয়াছেন। কিন্তু তথাপি মনুষ্যহৃদয়ের উদারতা, বিশালতা, জটিলতা, অহম্মুখতা, চিন্তাপ্রিয়তা প্রভৃতি বর্ণনে তিনি শেক্ষপীয়রের ছাত্রানুছাত্রবৎ। তাঁহার কেবল একটি মনুষ্যচিত্র অনুকরণের অতীত। সেটি কুমারসম্ভবের পার্বতী। কেন ? ভারত-মহিলাপ্রস্তাবে লিখিত আছে, পাঠক মহাশয়ের ইচ্ছা হয় একবার খুলিয়া দেখিবেন ; আমাদের আর স্থান নাই।

শেক্ষপীয়র মহাকাব্য লিখিতে গিয়া যেরূপ বিষম সঙ্কটে পড়িয়াছেন, কালিদাসকে সেরূপ হইতে হয় নাই। প্রত্যুত তাঁহার মহাকাব্যই তাঁহার মহাকবি খ্যাতিলাভের মূল কারণ। এ সকলের উপর তাঁহার মেঘদূত। সমস্ত সাহিত্য-সংসারে মেঘদূতের মত সারবান্ কাব্য অতি বিরল। আডিশন পোপের রেপ অব্ দি লক্‌কে "Merumsal or the delicious little thing" বলিয়াছেন। তিনি যদি মেঘদূত দেখিতেন তবে Merumsal-এ নাম রেপ অব্ দি লকের দুষ্প্রাপ্য হইত। মেঘদূতের সঙ্গে তুলনায় অন্য কাব্য আতরের তুলনায় গোলাবজলের মত। একটি উৎকৃষ্ট পদার্থের সার অংশের উৎকৃষ্টভাগ সংগ্রহ, আর-একটি গন্ধকরা জল মাত্র।

এতক্ষণ আমরা কাব্যের বিষয় লইয়া কালিদাস ও শেক্ষপীয়রের তুলনা করিতেছিলাম। তাহাতে এই দাঁড়াইল যে, কালিদাসের বাহ্য জগতে যেরূপ অসীম আধিপত্য, শেক্ষপীয়রের অন্তর্জগতে তেমনি। অন্তর্জগতেরও এক অংশে কালিদাস শেক্ষপীয়র হইতে ন্যূন নহেন। যেখানে হৃদয়ের সুন্দর ও কোমল ভাবগুলি বর্ণনা করিতে হইবে সেখানে বোধ হয় কালিদাস অনেক অধিক মিষ্ট লাগে। কিন্তু অন্য সর্বত্র শেক্ষপীয়র উপমা-বিরহিত।

বিষয়ের কথা শেষ হইল, এখন কাব্যের আকার লইয়া তর্ক হইতে পারে। এ তর্কেও কাহার কি দাঁড়ায়, দেখা উচিত। কাব্য তিন প্রকার: শ্রব্য, দৃশ্য, আর গীতিকাব্য। ইহার মধ্যে গীতিকাব্যে দুজনেই সমান। কেহই গীতিকাব্য লিখেন নাই, কিন্তু শেক্ষপীয়র তাঁহার নাটকমধ্যে যে সমস্ত গান

দিয়াছেন তাহাতে তাঁহাকে উৎকৃষ্ট গীতিলেখক বলা যাইতে পারে। কালিদাসও কয়েকটি গান দিয়াছেন। বিক্রমোর্বশীর পাহাড়িয়া ভাষায় গানগুলি বড় মিষ্ট। তাহার উপর কালিদাসের মেঘদূত। মেঘদূতকে দেশীয় আলঙ্কারিকেরা খণ্ডকাব্য বলেন। খণ্ডকাব্য বলিয়া কাব্য ভেদ করা তাঁহাদের গায়ের জোর মাত্র। মেঘদূত সার ধরিতে গেলে একখানি গীতিকাব্য, এবং উৎকৃষ্ট গীতিকাব্য। ইয়ুরোপীয় পণ্ডিতেরা অনেকে উহাকে গীতিকাব্যই বলিয়া থাকেন। যখন হৃদয়ে আনন্দ বা শোক ধরে না, তখন তাহাকে কাব্যাকারে বাহির করিয়া দেওয়াই গীতিকাব্য। তবে মেঘদূত গীতিকাব্য কেন না হইবে ?

শেক্ষপীয়রের শ্রব্যকাব্য প্রায় লোকে পড়ে না। কালিদাসের শ্রব্যকাব্যগুলি —রঘু কুমার ঋতুসংহার—সকলই পণ্ডিতসমাজে বিশেষ আদরের বস্তু।

দৃশ্যকাব্য নানারূপ। তন্মধ্যে নাটক প্রধান! সংস্কৃত অলঙ্কারে নাটকের আকার লইয়াই বাঁধাবাঁধি—পাঁচ অঙ্ক নয় সাত অঙ্ক হইবে, রাজা নায়ক হইবে, মন্ত্রী হইলে হইবে না। নাটকের যেটুকু নহিলে নয় সেটুকুর উপর তত নজর নাই। কথাচ্ছলে বিচ্ছিত্তিপূর্বক হৃদয়ের ভাব প্রকাশ ও সেই ভাব দ্বারা পরহৃদয়ের ভাব আকর্ষণ—এই দুইটি নাটকের সার। নাটকের প্রধান উদ্দেশ্য কোন উন্নত নীতির শিক্ষা। আমাদের কবিদের এ দুটিতে নজর বড় নাই। এমন কি যে বীজ লইয়া নাটক, অনেক সময় বাজে কথায় ৬ অঙ্ক কাটাইয়া ৭ম অঙ্কে সেই বীজের অবতারণা করা হয়। অভিজ্ঞান শকুন্তলায় ১ম ২য় অঙ্ক না থাকিলে নাটকের কোন হানিই ছিল না; নাটকের বীজ তৃতীয় অঙ্কে। চতুর্থ অঙ্কেও নাটকের কোন উপকার নাই। নাটকের জন্য দরকার রাজার প্রণয়, প্রত্যাখ্যান, অভিজ্ঞান ও মিলন। কিন্তু কালিদাস ত নাটক লিখিতে যান নাই, তাঁহার উদ্দেশ্য এই আদরার উপর এই কাটামতে তাঁহার কাব্য-গালারি হইতে কতকগুলি উৎকৃষ্ট চিত্র দেখান। তাহা তিনি খুব দেখাইয়াছেন। একটা দৃষ্টান্ত দেখাই। শকুন্তলার মত বালিকার প্রথম প্রণয়ে আড়নয়নে চাহনি বড় সুন্দর! না ? কালিদাস সেইটি দেখাইবেন। অনেক চেষ্টা হইল, এক অঙ্ক পূরিয়া গেল, সেটা আর দেখান হয় না, ক্রমে একঘেয়ে রকম হইয়া দাঁড়াইল। কালিদাস বিনা প্রয়োজনে একটা হাতী হাতী বলিয়া গোল (নেপথ্যে) তুলিয়া দিলেন। রাজার গল্প ভাঙ্গিবার উপায় হইল, শকুন্তলারও আড়ে আড়ে দেখিবার সুবিধা হইল, সে হাতী কালিদাসের উপকার করিল বটে, কিন্তু নাটকের কিছুই করিল না। শেক্ষপীয়র কিন্তু একটি সিন, একটি উক্তিও বিনা প্রয়োজনে সন্নিবেশিত করেন নাই। অনেক অবুঝ লোক মনে করিত যে ম্যাক্‌বেথে ঐ যে দরজায় ঘা-মারা আছে ওটা কেবল সকাল হইয়াছে, জানাইবার জন্য, সুতরাং

উহাতে নাটকের কোন উপকার নাই। কিন্তু ডিকুইনসি দেখাইয়া দিলেন যে ঐ দ্বারে আঘাতে অনেক উপকার হইয়াছে। পাপিষ্ঠ দম্পতী হত্যাকাণ্ড সম্পাদন করিয়া পাপচিন্তায় বাহ্যজ্ঞানশূন্য হইয়াছিল ; তাহাদের মন তাহাদের ছিল না, তাহারা আপন পার্থিব অস্তিত্ব বিস্মৃত হইয়াছিল। দ্বারে আঘাত হইবামাত্র তাহাদের বজ্রধ্বনিবৎ বোধ হইল, তাহাদের মন আকাশভ্রমণ হইতে ফিরিয়া আবার দেহপিঞ্জরে প্রবেশ করিল। অন্য কবিরা বারবার বজ্রধ্বনি করিয়া সে গাম্ভীর্য উৎপাদনে অক্ষম, শেক্ষপীয়র সময়মত বার কত দরজায় ঘা মারিয়া তাহার দশগুণ করিলেন। যে বুঝিল তাহার পর্যন্ত হৃৎকম্প হইল।

এক্ষণে কালিদাস ও শেক্ষপীয়র এই উভয়ের তুলনায় সমালোচনা শেষ হইল। শেক্ষপীয়র Prince of the Dramatists একথা সত্য বলিয়া প্রতিপন্ন হইল। কিন্তু কালিদাস সকল প্রকার কাব্যই লিখিয়াছেন এবং বোধ হয় নাটক ভিন্ন সর্বত্র কৃতকার্য হইয়াছেন। মহাকাব্যে তিনি বাল্মীকির সমান নহেন সত্য, কিন্তু তিনি ফেলা যান না। নাটকেও তিনি যে ভারতবর্ষের কোন কবি অপেক্ষা হীন, এমত বলিতে পারি না। কালিদাস সংস্কৃত ভাষায় সর্বোৎকৃষ্ট নাটক, সর্বোৎকৃষ্ট মহাকাব্য, সর্বোৎকৃষ্ট খণ্ডকাব্য এবং সর্বোৎকৃষ্ট বর্ণনাময় কাব্য ঋতুসংহার লিখিয়াছেন এ কথা বলিলে "ভারতের কালিদাস জগতের তুমি" এই যে অতি অন্যায় সমালোচনা প্রচলিত আছে, তাহারই সপক্ষতা করা হয়। শেক্ষপীয়রও যেমন জগতের, কালিদাসও তেমনি জগতের। জগতের সর্বত্রই তাঁহার কবিতার সমান সমাদর। তবে তিনি ভারত ছাড়া কোন কথা লিখেন নাই। ভারতের কথাই তাঁহার কাব্য।

আমাদের উপসংহারকালে বক্তব্য এই যে, শেক্ষপীয়র মেনকা হইতে পারেন —বাল্মীকি ঊর্বশী হইতে পারেন, হোমার রম্ভা হইতে পারেন, কিন্তু কালিদাস স্বর্লোকদুর্লভা তিলোত্তমা। সকলেরই উৎকৃষ্টাংশ তাহাতে আছে—কিছু অল্পপরিমাণে। প্রবন্ধ শেষ করিবার সময় ঈশ্বরের নিকট প্রার্থনা করি—

কালিদাসকবিতা নবং বয়ঃ মাহিষং দধি শশর্করং পয়ঃ।
এনমাংসমবলাচ কোমলা সম্ভবন্তু 'মম' জন্ম জন্মনি ॥*

সেই সঙ্গে পাঠকমহাশয়দেরও যেন ফাঁক না যায়।

বৈশাখ ১২৮৫

* কালিদাসের কবিতা, যৌবন বয়স, মহিষের দধি, দুধে চিনি, হরিণের মাংস, কোমলা অবলা এই কয়টি যেন আমার জন্ম জন্ম হয়।

অভিজ্ঞান শকুন্তল

শকুন্তলা,—নাটকের চরিত্র

আমরা দেখিয়াছি যে দুষ্মন্ত অসীম বলের অধিকারী। তাঁহার বাহুবল দেবতাদিগের কাছেও পরিচিত। কি মনুষ্যের শত্রু, কি দেবতার শত্রু, তিনি সকলেরই দমনকারী—সকলেরই বিজেতা। আমরা আরও দেখিয়াছি যে, দুষ্মন্ত আলস্যবিদ্বেষী, শ্রমপ্রিয়, কষ্টসহিষ্ণু। তিনি দিবারাত্রি রাজকার্য করিয়া ক্লান্তি অনুভব করেন না—মধ্যাহ্নরবির বিশ্বদগ্ধকারী কিরণরাশি তাঁহার কাছে তেজোহীন—অসীম শ্রমসাধ্য কার্য হইলেও তিনি তাহা সম্পন্ন করিতে পরাঙ্মুখ নন—তাঁহার অতুল দেহস্তম্ভ গিরিচর হস্তীর ন্যায় প্রভূত বলব্যঞ্জক। দুষ্মন্ত পুরুষপ্রধান—তাঁহার যে কয়টি গুণের উল্লেখ করিলাম, সে কয়টি পুরুষ-জাতির গুণ। রমণীরত্ন শকুন্তলা সে রকমের নন। সখীদ্বয়ের সহিত শকুন্তলা সেই পবিত্রসলিলা মালিনীনদী-তীরস্থ পরম রমণীয় শান্তিরসপরিপ্লুত তপস্যা-শ্রমের তরুতলায় জলসেচন করিতে আসিতেছেন। তিনটি বালিকা দেখিতে প্রায় একরকম—বয়সে প্রায় একরকম—একত্রে প্রতিপালিতা—এক-মন, এক-প্রাণ, এক-আত্মা। একটি সখী শকুন্তলাকে বলিতেছেন—

হলা শউন্তলে তত্তোবি তাতকণস্স অস্সমরূক্‌খআ পিঅদরা ত্তি তক্কেমি, জেণ ণোমালিআ-কুসুম-পরিপেলবাবি তুমং এদাণং আলবাল পরিঊরণে নিউত্তা।

নবপ্রস্ফুটিত মল্লিকাফুল আর নবপ্রস্ফুটিত শকুন্তলা-ফুল একই বস্তু। এটিও যেমন সুন্দর, ওটিও তেমনি সুন্দর। এটিও যেমন কোমল, ওটিও তেমনি কোমল। এটিও যেমন নরম, ওটিও তেমনি নরম। এটিও মধুরতাময়, ওটিও তেমনি মধুরতাময়। এটিও যেমন ক্ষুদ্র, ওটিও তেমনি ক্ষুদ্র। রমণী-পুষ্প অনেক রকম আছে; কোনটি গোলাপ, কোনটি চাঁপা, কোনটি টগর, কোনটি জবা, কোনটি ভায়লেট, কোনটি পদ্ম, কোনটি কর্ণিকার। এগুলির মধ্যে কোনটি ভাল কোনটি মন্দ। কিন্তু সকলেরই একটি সাধারণ গুণ আছে—সকলেই পুষ্পজাতীয় কোমলতার অধিকারী। সকলেই যে বৃক্ষকাষ্ঠ বা লতা-রজ্জু অবলম্বন করিয়া থাকে, সেই কাষ্ঠ এবং রজ্জু অপেক্ষা কোমল। নব-প্রস্ফুটিত মল্লিকাপুষ্প সেই কোমলতার প্রাণস্বরূপ। কেননা ইহা যেমন কোমল তেমনি ক্ষুদ্র, তেমনি পাতলা এবং তেমনি ফুট্‌ফুটে। তাই অনসূয়া বলিতেছেন যে, মহর্ষি কণ্ব আশ্রমের তরুলতাগুলিকে শকুন্তলা অপেক্ষা ভালবাসেন। কেন না, শকুন্তলার দেহখানি যে রকম কোমল, তাহাতে সেই তরুলতাগুলিতে

জল দিয়া বেড়াইতে হইলে, তাহা অবশ্যই শ্রমক্লিষ্ট হইয়া পড়িবে। আর হইলও তাই। দুই-তিনটি মাত্র বৃক্ষে জলসেচন করিয়াই শকুন্তলা যেন একেবারে আলুথালু হইয়া পড়িলেন এবং হাঁপাইয়া উঠিলেন।

স্রস্তাংসা বতিমাত্রলোহিততলৌ বহূ ঘটোৎক্ষেপণা।
দদ্যাপি স্তনপেবেথুং জনয়তি শ্বাসঃ প্রমার্ণাধিকঃ ॥
বদ্ধং কর্ণশিরীষরোধি বদনে ঘর্মাম্ভসা জালকং।
বন্ধে স্রংসিনি চৈকহস্তযমিতাঃ পর্যাকুলা মূর্ধজাঃ ॥

ক্ষুদ্র কলসের ভারে শকুন্তলার ক্ষুদ্র বাহুলতা এলাইয়া পড়িল ; শ্রমাধিক্য-বশতঃ তাঁহার ধমনীপ্রবাহিত শোণিতস্রোত খরতর হইয়া তাঁহার ক্ষুদ্র লোহিত-বর্ণ করপদ্মটিকে অধিকতর লোহিতবর্ণ করিয়া তুলিল ; তাঁহার নিঃশ্বাস ঘন ঘন পড়িতে লাগিল, নবযৌবনোন্নত বক্ষ ঝটিকাবিক্ষিপ্ত স্রোতস্বিনীর ন্যায় তরঙ্গিত হইয়া উঠিল ; তাঁহার সুকোমল মুখখানি স্বেদবিন্দুতে পরিপূর্ণ হইল, এবং সেই স্বেদবিন্দুতে তাঁহার কর্ণের শিরীষপুষ্পগুলি অতি সুকোমলভাবে জড়াইয়া পড়িল ; তাঁহার অলকাগুলি তাঁহার হস্তের অবরোধ না মানিয়া ভাঙ্গিয়া গেল ; তাঁহার কেশগুচ্ছ খসিয়া ভাঙ্গিয়া পড়িতে লাগিল। সামান্য শ্রমে শকুন্তলা-পুষ্পটি কেন বৃন্তস্খলিত হইয়া পড়িল ! কেন ক্ষুদ্র লজ্জাবতী লতাটি অঙ্গুলিস্পর্শানুভব করিতে না করিতেই সঙ্কুচিত হইয়া গেল ! এইজন্যই দুষ্মন্ত বলিয়াছিলেন যে শকুন্তলাকে তপশ্চর্যায় নিযুক্ত করিয়া মহর্ষি কণ্ব সুকোমল নীলোৎপল পত্রের কোমলতম ধারের দ্বারা কঠিনতম শমীবৃক্ষচ্ছেদনরূপ অসাধ্য-সাধনের প্রয়াস পাইতেছেন।

ইদং কিলাব্যাজমনোহরং বপুঃস্তপঃক্রমং সাধয়িতুং য ইচ্ছতি।
ধ্রুবং স নীলোৎপল পত্রধারয়া শমীলতাং ছেত্তুমৃষির্ব্যবস্যতি ॥

আমরা সকলেই পদ্মের পাতা দেখিয়াছি—নীলজলে বড় বড় পদ্মপত্র ভাসিতে দেখিয়াছি। জল সে পাতার প্রাণ—সে পাতা যে কি রকম জলীয় শক্তিতে বাহির হইয়া পড়িয়াছে। যেন কি রকমে জল একটু ঘন হইয়া পাতা হইয়া গিয়াছে। সে পাতা কি কোমল ! কোমলতাময়ী শকুন্তলা নখদ্বারা সেই পাতাতেই অক্ষর কাটিয়াছিলেন। সে পাতায় নখের আঘাত সহ্য হয় না। নখস্পর্শে সে পাতা যেন গলিয়া যায়। আবার সেই বড় পাতাটিকে আস্তে আস্তে মৃণাল হইতে ছিঁড়িয়া তোল, পাতাটি অমনি যেন ভাঙ্গিয়া পড়িবে। সে পাতার আবার ধার কি গা ? যদি কোমলতার ধার থাকে তবে সে পাতার ধার সেই ধার। যদি কোমলতার কোমলতা থাকে, তবে সে

কোমলতার নাম 'নীলোৎপলপত্রের ধার'। শকুন্তলার কোমলতা সেই রকম কোমলতা। যদি সে কোমলতার অপেক্ষা বেশী কোমলতা জগতে থাকে, তবে তাহা মনুষ্যের কল্পনাতীত। এখন সেই কোমলতার সহিত দুষ্মন্তের বলিষ্ঠতার তুলনা করিয়া দেখিলে যথার্থই বোধ হইবে যে দুষ্মন্ত যে কঠিন শমীবৃক্ষ এবং কোমল নীলোৎপলের কথা বলিয়াছেন, স্বয়ং দুষ্মন্তই সেই শমীবৃক্ষ এবং তাঁহার শকুন্তলাই সেই নীলোৎপলপত্র। জগতে শারীরিক গঠন এবং শারীরিক বল সম্বন্ধে পুরুষ এবং স্ত্রীজাতির মধ্যে যথার্থই এত প্রভেদ। কর্মের মূল শারীরিক বল এবং সেইজন্য জগতের কর্মক্ষেত্র পুরুষের—রমণীর নয়। সামান্য জলসেচনশ্রমকাতরা শকুন্তলাকে দেখিয়া কে বলিবে যে ইনি পৃথিবীর ভয়ঙ্কর কর্মক্ষেত্রে স্থান পাইবার যোগ্যা ?

কিন্তু বলহীনা হইয়াও শকুন্তলা বলিষ্ঠা ; কোমল হইয়াও শকুন্তলা কঠিনা ; শ্রমকাতরা হইয়াও শকুন্তলা কষ্টসহিষ্ণু। আমরা দেখিয়াছি যে, একটি ক্ষুদ্র কলস বহন করিতে হইলে শকুন্তলা ভারাক্রান্ত বোধ করেন ; আমরা দেখিয়াছি যে, একটি ক্ষুদ্র কলস হইতে দুইটি কি চারিটি বৃক্ষমূলে জলসেচন করিয়া বেড়াইলেই শকুন্তলা আলুথালু হইয়া পড়েন। কিন্তু কোমলহৃদয়ে বিষম দুঃখভার ধারণ করিয়াও শকুন্তলা সুদীর্ঘ পথ হাঁটিতে শ্রান্তি অনুভব করেন না। হিমালয় পর্বতের উপত্যকাস্থিত মহর্ষি কণ্বের আশ্রম হইতে হস্তিনাপুর বড় কম দূর নয়। সেই দূরপথ অরণ্যে পরিপূর্ণ। অরণ্যপথে গমনাগমন করা বিষম কষ্টসাধ্য। যেখানে অরণ্য নাই, সেখানে প্রচণ্ড রবি। ভারতের উত্তর-পশ্চিম প্রদেশে রবিকিরণ নিতান্তই অসহনীয়। আশ্রম হইতে যাত্রাকালে শকুন্তলার বিলম্ব দেখিয়া শার্ঙ্গরব কণ্বকে বলিতেছেন—

ভগবন্ দূরমধিরূঢ়ঃ সবিতা তত্বরয়াত্র ভবতীম্।

সেই প্রিয় আশ্রমপদ পরিত্যাগ করিয়া শোকবিহ্বলা শকুন্তলা সেই প্রচণ্ড রবিকিরণে হস্তিনাপুরাভিমুখে যাত্রা করিলেন। পথিমধ্যে কতই কষ্ট সহ্য করিলেন ; করিয়া মধ্যাহ্নকালে দুষ্মন্তের রাজভবনে উপস্থিত হইলেন। উপস্থিত হইয়াই দুষ্মন্তের বাক্যবাণ হৃদয়ে ধারণ করিতে লাগিলেন। কিন্তু তাঁহার দেহে ক্লান্তির চিহ্নমাত্র নাই—পথশ্রমের শ্রান্তিবিহ্বলতা নাই—আতপতাপিতার আরক্তিমতা নাই—দূরপথগমনের স্বেদবিন্দুমাত্র নাই। তখন তাঁহাকে দেখিয়া দুষ্মন্ত কেবল এইমাত্র বলিলেন—

কেয়মবগুণ্ঠনবতী নাতিপরিস্ফুটশরীরলাবণ্যা।
মধ্যে তপোধনানাং কিসলয়মিব পাণ্ডুপত্রাণাম্॥

আবার শকুন্তলা তখন মাতৃপদে আরোহণাদ্যোতা! রমণি! তুমি কোমলতমা হইয়াও কঠিনতমা; তুমি বলহীনা হইয়াও বলিষ্ঠা; তুমি শ্রমকাতরা হইয়াও বিষম কষ্টসহিষ্ণু! তুমিই সৃষ্টির প্রকৃত রহস্য! একদিন জনকনন্দিনীও এই অদ্ভুত রহস্য দেখাইয়াছিলেন। নির্বাসনাজ্ঞা প্রাপ্ত হইয়া রাম সীতার নিকট গিয়া বলিলেন—"প্রিয়ে! অরণ্যে বিস্তর ক্লেশ সহ্য করিতে হয়। তথায় গিরিকন্দরবিহারী সিংহ নিরন্তর গর্জন করিতেছে, উহা নির্ঝর-জলের পতনশব্দ মিশ্রিত হইয়া কর্ণকুহর বধির করিয়া তুলে। দুর্দান্ত হিংস্র জন্তুসকল উন্মত্ত হইয়া নির্ভয়ে সর্বত্র বিচরণ করিতেছে, তাহারা সেই জনশূন্য প্রদেশে আমাদিগকে দেখিলেই বিনাশ করিতে আসিবে। নদীসকল নক্রকুম্ভীরসংকুল, নিতান্ত পঙ্কিল, উন্মত্ত মাতঙ্গেরাও সহজে পার হইতে পারে না। গমনপথে অনবরত কুক্কুটরব শ্রুতিগোচর হয় এবং উহা কণ্টকাকীর্ণ ও লতাজালে আচ্ছন্ন হইয়া আছে, পানীয় জলও সর্বত্র সুলভ নহে। সমস্ত দিন পর্য্যটনের পর রাত্রিতে বৃক্ষের গলিতপত্রে শয্যা প্রস্তুত করিয়া ক্লান্তদেহে শয়ন এবং মিতাহারী হইয়া ভোজনকালে স্বয়ং-পতিত ফলে ক্ষুধাশান্তি করিতে হয়। তথায় বায়ু সততই প্রবলবেগে বহিতেছে, কুশ ও কাশ আন্দোলিত এবং কণ্টকবৃক্ষের শাখাসকল কম্পিত হইতেছে। রজনীতে ঘোরতর অন্ধকার, ক্ষুধার উদ্রেক সর্বক্ষণ হয়, আশঙ্কাও বিস্তর। তন্মধ্যে বিবিধাকার বহুসংখ্যক সরীসৃপ আছে, তাহারা পথে সদর্পে ভ্রমণ করিতেছে। স্রোতের ন্যায় বক্রগতি নদীগর্ভস্থ উরগেরা গমনপথ অবরোধ করিয়া রহিয়াছে। বৃশ্চিক কীট এবং পতঙ্গ দংশ মশকের যন্ত্রণা সর্বদাই ভোগ করিতে হয়, কায়ক্লেশও বিস্তর, এই কারণেই কহিতেছি অরণ্য সুখের নহে। নিবারণ করি, তুমি তথায় যাইও না। বনবাস তোমায় সাজিবে না।" কিন্তু বনবাস তাঁহাকে সাজিয়াছিল কিনা তাহা সকলেই জানেন। ইতিহাসেও আমরা এই রহস্য দেখিয়া থাকি। বিপদ্‌গ্রস্ত শিশুসন্তানদের প্রাণ বাঁচাইবার জন্য জননী অনেক সময় পর্বতাদি উল্লঙ্ঘন করিয়াছেন, অগ্নিরাশি তুচ্ছ করিয়াছেন, জলরাশি ভেদ করিয়াছেন। ভারতে রমণীবীরত্ব সর্বদাই দেখিতে পাওয়া যায়। অসূর্য্যম্পশ্যা কোমলাঙ্গী বীরদর্পে পুরুষোত্তম যাইতেছেন, গয়া-কাশী যাইতেছেন, কামরূপ-বৈদ্যনাথ যাইতেছেন। এ রহস্যের অর্থ কি? আমাদের বোধ হয় ইহার অর্থ এই—পুরুষ শরীরের বলে বলিষ্ঠ; রমণী হৃদয়ের বলে বলিষ্ঠা। পুরুষ সর্বদাই কর্মক্ষম; রমণী কেবল হৃদয়ের বেগে বেগবতী হইলেই কর্মক্ষম। পুরুষ সর্বক্ষণই জগতের কর্মক্ষেত্রে বিচরণ করেন; রমণী কদাচিৎ কখন জগতের সর্বক্ষেত্রে দেখা দেন।

কর্মশীলতা পুরুষের স্বাভাবিক ধর্ম, রমণীর অবস্থাসাপেক্ষ ধর্ম। কিন্তু রমণী যখন সেই অবস্থায় পতিত হন, তখন তাঁহাতে এবং পুরুষেতে কোন প্রভেদ থাকে না—তখন কোমলতম নীলোৎপলপত্র কঠিনতম শমীবৃক্ষ হইয়া উঠে। স্ত্রীজাতি এই আশ্চর্য বৈপরীত্যের আধার বলিয়া জগতের প্রধান রহস্যমধ্যে পরিগণিত।

যে হৃদয়ের গুণে শকুন্তলা বলিষ্ঠা, আবার সেই হৃদয়ের গুণেই শকুন্তলা বলহীনা। যে হৃদয়ের গুণে শকুন্তলা কার্য করিতে সক্ষম, আবার সেই হৃদয়ের গুণেই শকুন্তলা কার্য করিতে অক্ষম। রমণীহৃদয়ের এই আশ্চর্য রহস্য মহাকবি কালিদাস যে প্রকারে দেখাইয়াছেন, জগতের আর কোন কবি সে প্রকারে দেখান নাই। দুষ্মন্ত রাজধানীতে প্রত্যাগমন করিয়াছেন। করিয়া তাঁহার স্বাভাবিক রীত্যনুসারে রাজকার্যে মনোনিবেশ করিয়াছেন। কিন্তু শকুন্তলা সকল কর্ম ভুলিয়া—প্রিয়তমা প্রিয়ংবদাকে ভুলিয়া—প্রিয়তমা অনসূয়াকে ভুলিয়া—আশ্রমের লতামৃগগুলিকে ভুলিয়া—কেবল দুষ্মন্তকে ভাবিতেছেন। ক্ষুদ্র পর্ণকুটীরের ভিতর বামকরতলে গণ্ডদেশ স্থাপন করিয়া প্রস্তরনির্মিত প্রতিমূর্তির ন্যায় নিস্পন্দভাবে দুষ্মন্তকে ভাবিতেছেন। এমন সময়ে প্রজ্বলিত হুতাশনপ্রতিম মহর্ষি দুর্বাসা আসিয়া ভয়ঙ্কর স্বরে 'অয়মহং ভো' বলিয়া সেই ক্ষুদ্রকুটীরস্থিতা ক্ষুদ্র বালিকার সম্মুখে আতিথ্যপ্রার্থী হইয়া দাঁড়াইলেন। সেই ভয়ঙ্কর স্বরে সমস্ত আশ্রমারণ্য যেন কাঁপিয়া উঠিল। অদূরে প্রিয়ম্বদা এবং অনসূয়া শকুন্তলার ইষ্টদেবতার পূজার নিমিত্ত পুষ্পচয়ন করিতেছিলেন, তাঁহারা যেন শিহরিয়া উঠিলেন। কিন্তু দুষ্মন্তনিমগ্না প্রস্তরমূর্তিবৎ নিস্পন্দা শকুন্তলা নিস্পন্দভাবেই রহিলেন। তখন তিনি তাঁহাতে নাই; তখন তাঁহার কাছে বাহ্যজগৎ প্রলয়-নিমগ্ন; মানবাত্মা যেমন পরমাত্মায় লীন হয়, তেমনি হৃদয়সর্বস্ব শকুন্তলা তখন দুষ্মন্তহৃদয়ে লীন। তখন যদি এই পৃথিবী-গ্রহ-নক্ষত্রময় ব্রহ্মাণ্ড ঘোররবে ছিন্ন-ভিন্ন হইয়া মহাপ্রলয়ে নিমগ্ন হইত, তাহা হইলে দুষ্মন্তময়ী শকুন্তলা সেই সঙ্গে সঙ্গে মহাপ্রলয়ে মিলাইয়া যাইতেন, জানিতেও পারিতেন না যে কি হইল! বজ্রগম্ভীর স্বরে দুর্বাসা শাপ দিলেন—

আঃ কথমতিথিং মাং পরিভবসি।
বিচিন্তয়ন্তী যমনন্যমানসা
তপোনিধিং বেৎসি ন মামুপস্থিতম্।
স্মরিষ্যতি ত্বাং ন স বোধিতোঽপি সন্
কথাং প্রমত্তঃ প্রথমং কৃতামিব॥

এখনও সংজ্ঞা নাই! জীবিতা শকুন্তলা এখনও জীবনহীন! তাঁহার

জীবন, জ্ঞান, দেহ, দৈহিক শক্তি—সকলই এখন তাঁহার অতলস্পর্শ হৃদয়ে বিলুপ্ত। সে হৃদয় যথার্থই অতলস্পর্শ। প্রেমানলসন্তাপিতা শকুন্তলা যখন প্রথম দুষ্মন্তের কথা বলেন, তখন প্রিয়ম্বদা বলিয়াছিলেন যে বেগবতী স্রোতস্বিনী মহাসাগরাভিমুখেই ছুটিয়া থাকে—সুকোমল মাধবীলতা চূতবৃক্ষকেই জড়াইয়া উঠে। দুষ্মন্ত নানাগুণে গুণবান্—তাঁহার চরিত্রের বিস্তার অনন্ত সমুদ্রের ন্যায় অসীম বলিলেই হয়। শকুন্তলাচরিত্রের বিস্তার নাই। তাঁহাতে দুষ্মন্তের বাহুবল নাই, শাস্ত্রনৈপুণ্য নাই, মৃগয়াদক্ষতা নাই, পাণ্ডিত্য নাই, উচ্চ বিচারশক্তি নাই, অপরিমেয় কর্মশীলতা নাই, অপরিমেয় শ্রমশীলতা নাই, অপরিমেয় কার্যদক্ষতা নাই। তাঁহার থাকিবার মধ্যে এক হৃদয় আছে। কিন্তু সে হৃদয়ের গভীরতা এবং অনন্ত সমুদ্রের গভীরতা সমান। পুরুষ, চরিত্রবিস্তারে সমুদ্রবৎ—রমণী হৃদয়গভীরতায় সমুদ্রবৎ। পুরুষ ভালবাসার সামগ্রীকে রমণীর মত তত আত্মগত করিতে পারে না—তত আপনাতে মিশাইয়া লইতে পারে না—তত আত্মবিস্মৃত হইয়া তত জগদ্বিস্মৃত হইয়া ভাবিতে পারে না। পুরুষ-হৃদয়ের গভীরতা কম। সেই জন্য পুরুষ বিরহে অস্থির হইয়া পড়ে। রমণীহৃদয়ের গভীরতা অপরিমেয়। সেই জন্য রমণী বিরহে হৃদয়সর্বস্ব, হৃদয়ময়ী হইয়া থাকে। দুষ্মন্তকে ভাবিতে ভাবিতে শকুন্তলা একেবারে জীবনহীন প্রস্তরমূর্তির ন্যায় স্পন্দহীনা। কিন্তু অঙ্গুরীয় পুনর্দর্শনান্তর শকুন্তলাকে ভাবিতে ভাবিতে দুষ্মন্ত অধীর, অস্থির, অনেকটা গাম্ভীর্যভ্রষ্ট, উন্মত্তের ন্যায় প্রগল্ভ। শকুন্তলার হৃদয় অনন্তধারা—যতই কেন দুঃখ হউক না, সে হৃদয়কে ছাপাইয়া উঠিয়া দেহ বা জ্ঞানকে সংক্ষুব্ধ করিতে পারে না, কারণ হৃদয়ের তুলনায় শকুন্তলার দেহ এবং জ্ঞান নাই বলিলেই হয়। দুষ্মন্তের হৃদয় পরিমিতাধার,—ভাবনা একটু বেশী হইলেই সে হৃদয়কে ছাড়াইয়া উঠিয়া শরীরকে অস্থির করিয়া তুলে, জ্ঞানকে বিহ্বল করিয়া ফেলে। শকুন্তলা সেই 'অয়মহং ভো' শুনিতে পাইলেন না—সেই ভয়ঙ্কর শাপ শুনিতে পাইলেন না। কিন্তু দুষ্মন্ত বিহ্বল-হৃদয়, বিহ্বল-জ্ঞান, এবং মূর্ছিতপ্রায় হইয়াও বিপন্নের ভয়ার্তরব শ্রবণমাত্র বীরবিক্রমে উঠিয়া দাঁড়াইলেন। দুষ্মন্তকে শোকবিহ্বল দেখিয়া তাঁহাকে উত্তেজিত করিবার নিমিত্ত মাতলি মাধব্যকে ভয়প্রদর্শন করিয়াছিলেন। দুষ্মন্ত মাতলিকে জিজ্ঞাসা করিলেন—'মাধব্যং প্রতি ভবতা কিমেবং প্রযুক্তম্।' মাতলি উত্তর করিলেন—তদপি কথ্যতে কিঞ্চিন্নিমিত্তাদপি মনঃসন্তাপাদায়ুষ্মান্ ময়া বিক্লবো দৃষ্টঃ পশ্চাৎ কোপয়িতুমায়ুষ্মন্তং তথা কৃতবানস্মি।'

মাতলি সিদ্ধকাম হইলেন। শোকবিহ্বল দুষ্মন্তের কাছে বাহ্যজগৎ প্রবল হইল। নিমেষমধ্যে দুষ্মন্তের শোকবিহ্বলতা কর্মশীলতায় পরিণত হইল। কিন্তু হৃদয়মুগ্ধা শকুন্তলা ভয়ঙ্কর দুর্বাসা সত্ত্বেও হৃদয়মুগ্ধাই রহিলেন। বিলুপ্ত বাহ্য-জগৎ বিলুপ্তই রহিল। হৃদয়মগ্নার নিশ্চেষ্টতা নিশ্চেষ্টতাই রহিল। যে হৃদয়ের গুণে রমণী চেষ্টাশীলা, সেই হৃদয়ের গুণেই রমণী নিশ্চেষ্টা। হৃদয়ই রমণী-চরিত্রের প্রধান ভিত্তি এবং প্রধান উপাদান। হৃদয়ের গুণেই স্ত্রীজাতি পুরুষ-জাতি হইতে ভিন্ন। কালিদাসের শকুন্তলা সেই রমণীহৃদয়রহস্যের উজ্জ্বলতম প্রতিমা। এবং সেই প্রতিমা পুরুষচরিত্রের তুলনায় উজ্জ্বলতম অপেক্ষা উজ্জ্বল। এমন তুলনামূলক নারীহৃদয়প্রতিমা জগতের আর কোন নাটকে নাই।

এখন জিজ্ঞাস্য এই, প্রিয়বস্তুর বিরহ রমণীহৃদয়ে এত লাগে কেন, পুরুষ-হৃদয়ে এত লাগে না কেন? দুষ্মন্ত ত শকুন্তলাকে রাখিয়া রাজধানীতে গিয়া রাজকার্য করিতে লাগিলেন। কিন্তু দুষ্মন্তকে ছাড়িয়া শকুন্তলা এমন হইলেন কেন? আমাদের বোধ হয় ইহার কারণ এই,—পুরুষ প্রিয়বস্তুকে শুধু হৃদয়ে রাখিয়াই অনেক পরিমাণে সন্তুষ্ট; রমণী তা নয়। রমণী প্রিয়বস্তুকে চোখে চোখে রাখিতে চায়। পুরুষ প্রিয়বস্তুর কল্পনাতে সন্তুষ্ট; রমণী খোদ প্রিয়-বস্তু ব্যতিরেকে সন্তুষ্ট নন। ১৮৭৯ সালের সেপ্টেম্বর মাসের Ninenteen-th Century-তে অধ্যাপক মেলক A Dialogue on Human Happiness নামক একটি প্রবন্ধ লেখেন। একটি পুরুষ আর একটি রমণী কথোপকথন করিতেছেন। রমণী সতেজে বলিতেছেন—"Heavens! Do you know so little as to think that were a man in love really, he could endure to be absent, without necessity, a day from the woman he was in love with? No: he is never happy when away from her." সম্ভাষিত পুরুষ ইহার অর্থ বুঝিতে পারিলেন না, এবং বলিলেন যে ইহাকে যদি প্রণয় বলে তবে যেন প্রণয়ের সহিত আমার কোন সম্বন্ধ না থাকে। রমণীহৃদয় শুধু হৃদয়ে ভর করিয়া থাকিতে পারে না। রমণী হৃদয়ের বস্তুকে সর্বদাই চোখের উপর রাখিতে চাহেন। সেই নিমিত্ত যখন হৃদয়ের বস্তু চোখের অন্তরালে থাকে, তখন রমণী আপন হৃদয়ের ভিতর লুকাইয়া কল্পনার বলে অপ্রত্যক্ষকে প্রত্যক্ষ করিয়া তুলেন, এবং সেই কল্পনা-সম্ভূত বস্তুকে প্রকৃত বস্তু বোধে মিশাইয়া থাকেন। রমণী বাহ্য অবলম্বন ব্যতিরেকে থাকিতে পারে না। পুরুষের মন অনেক পরিমাণে সেই মনসাপেক্ষ; কিন্তু রমণীহৃদয় বাহ্যজগৎসাপেক্ষ। এবং সেই নিমিত্তই বাহ্যজগতের অভাবে

রমণী তাঁহার আশ্চর্য হৃদয়াভ্যন্তরে আশ্চর্যতম বাহ্যজগতের সৃষ্টি করিয়া থাকেন। সেই আশ্চর্য বাহ্যজগতের কাছে প্রকৃত বাহ্যজগৎ অস্তিত্বহীন। পুরুষজাতির মধ্যে উচ্চশ্রেণীর কবি ভিন্ন আর কেহ সে রকম আশ্চর্য বাহ্যজগৎ সৃষ্টি করিতে পারে না। রমণীমণ্ডলে সকলেই উচ্চশ্রেণীর কবি। দার্শনিকেরা বলিয়া থাকেন এবং ইতিহাসেও দেখা যায় যে যেখানে হৃদয়ে প্রত্যক্ষ জগৎ, সেখানে বাহ্যজগৎ বিলুপ্ত। যে যোগীর মনে পরমাত্মা প্রত্যক্ষ, সে যোগীর নয়নে বাহ্যজগৎ অপ্রত্যক্ষ—অস্তিত্বহীন। যে শকুন্তলার চক্ষে সম্মুখস্থ বাহ্যজগৎ অপ্রত্যক্ষ, সেই শকুন্তলার হৃদয়ে দূরবর্তী দুষ্মন্ত প্রত্যক্ষ। রমণী প্রত্যক্ষপ্রিয়, প্রত্যক্ষানুরাগী, প্রত্যক্ষাপেক্ষী এবং সেই জন্য শোকে এবং বিরহে রমণী এত অন্তর্লীনতাপ্রিয়। কালিদাস ভিন্ন আর কোন কবি এই নিগূঢ়তত্ত্ব বুঝান নাই। পর্ণকুটীরে দুষ্মন্তনিমগ্না শকুন্তলা,—এটি উৎকৃষ্ট কবিপ্রতিভার অক্ষয় অনন্তমহিমাপূর্ণ, উৎকৃষ্টতম কীর্তি। এ কবি যাহাদের, তাহারা যথার্থই জগতে স্পর্ধাক্ষম।

আমরা শকুন্তলার যে মূর্তিটি দেখিলাম সেটি স্ত্রীজাতির অন্তর্লীন মূর্তি। সে মূর্তিতে স্ত্রীজাতির অস্তিত্ব সম্পূর্ণরূপে অন্তর্নিহিত। সে মূর্তি দেখিলে স্তম্ভিত হইতে হয়, বিস্মিত হইতে হয়, ভীত হইতে হয়। এই আশ্চর্য অন্তর্লীনতা ভাবপ্রখরতার ফল। এত ভাবপ্রখরতা (intensity of feeling) আমরা বুঝিয়া উঠিতে পারি না। এত ভাবপ্রখরতাপূর্ণ অস্তিত্ব আমাদিগের প্রহেলিকা বলিয়া বোধ হয়। আমাদের বোধ হয় যে, যে মুহূর্তকালের জন্য বাহ্যজগৎ দেখিয়াছে এবং বাহ্যজগতে বাস করিয়াছে সে কখন এত অন্তর্নিমগ্ন হইতে পারে না, এত অন্তর্লীনতাপ্রাপ্ত হয় না। এই ভাবপ্রখরতাপূর্ণ অন্তর্লীনতা দেখিয়া আমরা ভীত হই। আমাদের বোধ হয় যে যাহার এত ভাবপ্রখরতা সে যদি শকুন্তলার ন্যায় ভাল হয়, তবে তাহার অপেক্ষা ভাল জিনিস আর কিছুই হইতে পারে না, কিন্তু যদি শেক্সপীয়রচিত্রিত মেকবেথপত্নীর ন্যায় মন্দ হয়, তবে পৃথিবীতে তাহার অপেক্ষা মন্দ জিনিস আর কিছুই হইতে পারে না। এবং জগতের ইতিহাসেও দেখা যায় যে, পুরুষ যতই ভাল হউক না, ভাল স্ত্রীর মতন ভাল হইতে পারে না—এবং যতই মন্দ হউক না, মন্দ স্ত্রীর মতন মন্দ হইতে পারে না। এই ভাবপ্রখরতাপূর্ণ অন্তর্লীনতা দেখিয়া আমরা বিস্মিতও হই। আমাদের বোধ হয় যেন একখানা প্রকাণ্ড হিমশিলাখণ্ড অনন্তকাল গিরিকন্দরাবদ্ধ রহিয়াছে—কখন গলে নাই, কখন গলিতে পারিবেও না। কিন্তু রমণীহৃদয় রহস্যময়। আবদ্ধ হিমশিলাখণ্ড যেমন গলে আবদ্ধ রমণীহৃদয়ও তেমনি গলে। এবং হিমশিলা গলিয়া যেমন তরু, লতা, প্রস্তর সকলই ভাসাইয়া লইয়া যায়, রমণীহৃদয় গলিলেও তেমনি স্ত্রী পুরুষ, বালক, বৃদ্ধ, কোমলহৃদয়,

কঠিনহৃদয় সকলকেই ভাসাইয়া লইয়া যায়। কথাটি সত্য কি না, অভিজ্ঞান শকুন্তলের বিদায়দৃশ্যটি পড়িলে বুঝিতে পারা যায়। সে দৃশ্যের ন্যায় কোমল, হৃদয়াপহারী, কবিতাময়, মানবপ্রকৃতিপ্রকাশক জিনিস আমরা আর কোথাও দেখি নাই। কিয়দংশ অনুবাদ করিয়া দিলাম :—

গৌতমী। বৎসে! স্বজনবৎ স্নেহপূর্ণ তপোবনদেবতারা তোমায় গমনে অনুমতি করিতেছেন। ইঁহাদিগকে প্রণাম কর।

শকুন্তলা। (প্রণামপূর্বক কয়েকপদ গিয়া জনান্তিকে) সখি প্রিয়ম্বদে, আমি যদিও আর্যপুত্রকে দেখিবার নিমিত্ত উৎকণ্ঠিত হইয়াছি, তথাপি আশ্রম-পরিত্যাগে আমার পা উঠিতেছে না।

প্রিয়ম্বদা। তুমিই যে কেবল তপোবন-পরিত্যাগে কাতর হইয়াছ তাহা নহে, তপোবনও তোমার বিরহকাল উপস্থিত দেখিয়া কাতর হইতেছে। মৃগদিগের মুখের কুশগ্রাস পড়িয়া যাইতেছে, ময়ূরেরা নৃত্য পরিত্যাগ করিয়াছে এবং লতাসকল পাণ্ডুপত্রমোচনচ্ছলে যেন অশ্রুপাত করিতেছে।

শকু। (স্মরণ করিয়া) পিতঃ! লতাভগিনী বনজ্যোৎস্নাকে সম্ভাষণ করি।

কণ্ব। জানি সেই লতার উপর তোমার সোদরস্নেহ আছে। এই সে দক্ষিণ-পার্শ্বে আছে।

শকু। বনজ্যোৎস্নে! তুমি সহকারের সহিত সমাগত হইলেও দূরপ্রসারিত শাখাবাহু দ্বারা আমাকে প্রত্যালিঙ্গন কর। আমি আজ অবধি তোমাকে ছাড়িয়া যাইতেছি।

ক। আমি তোমার জন্য অগ্রে যেরূপ ইচ্ছা করিয়াছিলাম তুমি স্বগুণে সেই আত্মসদৃশ স্বামী পাইয়াছ। আর এই নবমল্লিকা সহকারবৃক্ষের সহিত মিলিয়াছে। এক্ষণে তোমার ও ইহার জন্য আমার দুর্ভাবনা দূর হইয়াছে। এই স্থান দিয়া চল।

শকু। (সখীদ্বয়ের প্রতি) সখি, আমি এই লতাটিকে তোমাদের দুজনের হাতে সঁপিয়া দিলাম।

সখী। আমাদিগকে কাহার হাতে সঁপিলে?

ক। অনসূয়ে, কাঁদিও না, তোমরাই ত এখন শকুন্তলাকে প্রবোধ দিবে।

(সকলেই যাইতেছে)

শকু। এই উটজচারিণী গর্ভমন্থরা মৃগী যখন ভালয় ভালয় প্রসব হইবে তখন তোমরা আমার নিকট লোক পাঠাইও। সে গিয়া আমাকে এই প্রিয়সম্বাদ দিবে।

ক। না, আমরা ইহা ভুলিব না।

শকু। (গতিব্যাঘাত দেখিয়া) কে আমার বস্ত্র আটকাইতেছে? (দেখিবার নিমিত্ত মুখ ফিরাইল)

ক। বৎসে! যাহার মুখ কুশাগ্রদ্বারা বিদ্ধ হইলে তুমি ক্ষতশোষক ইঙ্গুদীতৈলসেক করিতে, তুমি যাহাকে শ্যামাকধান্যমুষ্টি দিয়া পোষণ করিয়াছ, সেই তোমার কৃতকপুত্র মৃগ তোমার অনুসরণ করিতেছে।

শকু। বৎস! আমি তোমাদিগকে ছাড়িয়া যাইতেছি, তুমি কেন আমার অনুসরণ কর। তোমার জননী তোমায় প্রসব করিয়াই মরিয়া যায়, তুমি সেই জননীব্যতীত আমার যত্নে এত বড়টি হইয়াছ। এখন আমি আবার চলিলাম। এখন পিতাই তোমার ভাবনা ভাবিবেন। যাও, ফের। (রোদন করিতে করিতে প্রস্থান)

ক। বাষ্প তোমার উন্নতপক্ষ্মযুক্ত নেত্রদ্বয়ের দর্শনব্যাপার নিরোধ করিতেছে। এই ভূমিভাগ উন্নতানত। বাষ্পাবরোধহেতু ইহা সম্যক্ লক্ষিত না হওয়াতে তোমার পদস্খলন হইতেছে।

শার্ঙ্গরব। ভগবন্, শুনা যায় যে নদী বা সরোবর পর্যন্ত স্নিগ্ধব্যক্তিকে অনুগমন করা কর্তব্য। এই অদূরে সরোবরতীর। যা বলিবার থাকে এখানে বলিয়া ফিরুন।

ক। ভাল, আইস আমরা এই ক্ষীরবৃক্ষচ্ছায়ায় আশ্রয় লই।

(সকলের উপবেশন)

ক। বহুমানাস্পদ দুষ্মন্তের নিকট বলিতে পারা যায় এমন কি কথা বলিয়া দিব। (চিন্তা)

শকু। সখি, দেখ, চক্রবাক্ নলিনীপত্রের অন্তরালে আছে। চক্রবাকী তাহাকে দেখিতে না পাইয়া সকাতরে চীৎকার করিতেছে। কিন্তু আমি এতাবৎকাল আর্যপুত্রকে না দেখিয়া আছি। আমি দুষ্কর কার্য করিতেছি।

অনসূয়া। সখি, এমন কথা বলিও না। এই চক্রবাকীও প্রিয়ব্যতীত দীর্ঘতরা রজনীযাপন করিয়া থাকে। আশা অতি গুরুতর বিরহদুঃখও সহনীয় করিয়া দেয়।

ক। শার্ঙ্গরব, তুমি শকুন্তলাকে সম্মুখে রাখিয়া আমার বাক্যক্রমে সেই রাজাকে এইরূপ বলিবে।

শার্ঙ্গ। মহাশয় আজ্ঞা করুন।

ক। আমরা তপোধন, আমাদিগকে চিন্তা করিয়া, তোমার উচ্চবংশকে চিন্তা করিয়া, আর সুহৃদস্বজনেরা যাহা কোনরূপে ঘটাইয়া দেয় নাই, শকুন্তলার সেই

স্নেহপ্রবৃত্তি চিন্তা করিয়া তুমি ভার্যাগণের মধ্যে সমান আদরে ইঁহাকে দেখিবে। ভাগ্যে থাকে ইহা অপেক্ষা অধিক হইবে, বন্ধুগণের তাহা বলা উচিত হয় না।

শার্ঙ্গ। মহাশয়ের কথা গ্রহণ করিলাম।

ক। বৎসে! এখন তোমাকে কিছু উপদেশ দেওয়া আবশ্যক। আমরা বনবাসী হইলেও লৌকিক ব্যাপার বুঝিয়া থাকি।

শার্ঙ্গ। বুদ্ধিমান্ লোকের কিছুই অজ্ঞাত থাকিতে পারে না।

ক। তুমি এ স্থান হইতে ভর্তৃকুলে গিয়া গুরুজনদিগের শুশ্রূষা করিও, সপত্নীদিগের প্রতি প্রিয়সখীবৎ ব্যবহার করিও, অপমানিত হইলেও পতির প্রতিকূলচারিণী হইও না, পরিচারকদিগের উপর অধিক অনুকূল হইও, এবং সৌভাগ্যকালে গর্বিত হইও না। যুবতীরা এইরূপেই গৃহিণীপদ পায়। আর যাহারা ইহার বিপরীতাচরণ করে, তাহারা পতিকুলের যাতনাস্বরূপ হইয়া থাকে। এ বিষয়ে গৌতমীই বা কি বলেন?

গৌ। বধূর প্রতি এইই উপদেশ। বাছা, এইসকল মনে রাখিও।

ক। বৎসে! তুমি আমাকে ও সখীদিগকে আলিঙ্গন কর।

শকু। পিতঃ! প্রিয়ম্বদা প্রভৃতি সখীরা কি এ স্থান হইতে ফিরিয়া যাইবে?

ক। বৎসে! প্রিয়ম্বদা ও অনসূয়ার বিবাহ দিতে হইবে। তথায় যাওয়া ইহাদের উচিত হয় না। গৌতমী তোমার সহিত যাইবেন।

শকু। (পিতাকে আলিঙ্গন করিয়া) আমি এখন তোমার অঙ্কচ্যুত হইয়া কিরূপে চন্দনবৃক্ষচ্ছিন্ন চন্দনশাখার ন্যায় বাঁচিয়া থাকিব?

ক। বৎসে! তুমি কেন এইরূপ কাতর হইতেছ? তুমি মহাকুলোৎপন্ন পতির স্পৃহণীয় গৃহিণীপদে প্রতিষ্ঠিত হইয়া, তাঁহার ঐশ্বর্যসম্ভারে দুর্বহগৃহকার্যে প্রতিক্ষণ ব্যস্ত থাকিবে এবং পূর্বদিক যেমন সূর্যকে প্রসব করে সেইরূপ অচিরাৎ এক পবিত্র পুত্র প্রসব করিয়া আমার বিরহজনিত শোক অনুভব করিতে পারিবে না।

শকু। (পিতৃচরণে প্রণাম করিলেন)

ক। আমার যাহা সঙ্কল্প তোমার তাহাই হউক।

শকু। (সখীদিগের সন্নিহিত হইয়া) সখি, তোমরা দুজনে এককালেই আমায় আলিঙ্গন কর।

সখীদ্বয়। (আলিঙ্গন করিয়া) সখি, যদি সেই রাজা তোমায় চিনিতে না পারেন, তাহা হইলে তুমি তাঁহাকে এই তাঁহারই নামাঙ্কিত অঙ্গুরীয়টি দেখাইও।

শকু। আমি তোমাদের এই কথায় ভীত হইলাম।

সখীদ্বয়। ভয় পাইও না, স্নেহ অনিষ্ট আশঙ্কা করে।

শার্ঙ্গ। বেলা দ্বিতীয় প্রহর, তোমরা সত্বর হও।

শকু। (আশ্রমাভিমুখী হইয়া) পিতঃ, কবে আবার তপোবন দেখিব ?

ক। শুন, তুমি বহুকাল যাবৎ এই সসাগরা পৃথিবীপতির মহিষী হইয়া পুত্রকে নিষ্কণ্টকে সিংহাসনে প্রতিষ্ঠিত করিয়া পুত্রন্যস্তপ্রজারক্ষণভার ভর্তার সহিত এই শান্ত আশ্রমে পুনর্বার বাস করিবে।

গৌ। বাছা, গমনকাল অতীত হইতেছে, পিতাকে ফিরাইয়া দাও। অথবা শকুন্তলা অনেকক্ষণ ধরিয়া পুনঃ পুন: এইরূপ বলিবে, তুমিই ফিরিয়া যাও।

ক। বৎসে ! তপোনুষ্ঠানের ব্যাঘাত হইতেছে।

শকু। (পুনরায় পিতাকে আলিঙ্গন করিয়া) তোমার শরীর তপশ্চর্যায় পীড়িত, অতএব আমার জন্য আর অতিমাত্র উৎকণ্ঠিত হইও না।

ক। (দীর্ঘনিশ্বাস পরিত্যাগপূর্বক) বৎসে ! তুমি পর্ণশালার দ্বারদেশে যে পুঁড়িধান্যের পূজোপহার দিয়াছিলে, তাহা হইতে এখন অঙ্কুর বাহির হইয়াছে। আমি যখন তা দেখ্‌ব তখন কিরূপে আমার শোকসংবরণ হইবে !

(শকুন্তলা সহযাত্রিগণের সহিত নিষ্ক্রান্ত হইলেন)

আশ্রমপালিতা আশ্রমপ্রিয়া তাপসবালা চিরকালের জন্য আশ্রমত্যাগ করিয়া যাইতেছেন। শকুন্তলা সেই পবিত্র আশ্রমের প্রাণস্বরূপ। তাঁহাকে গমনোদ্যতা দেখিয়া শকুন্তলাপালিতা আশ্রমটি যেন শোকবিহ্বল হইয়া উঠিল। "মৃগদিগের মুখের কুশগ্রাস পড়িয়া যাইতেছে, ময়ূরেরা নৃত্য পরিত্যাগ করিয়াছে এবং লতা-সকল পাণ্ডুপত্রমোচনচ্ছলে যেন অশ্রুপাত করিতেছে।" যাহাকে বাসস্থান হইতে বিদায় দিতে হইলে, সমস্ত বাসস্থানটি বিরহকাতর বলিয়া অনুভব হয়, সে যথার্থই সেই বাসস্থানের প্রাণ ! আজ প্রিয়ম্বদা প্রভৃতির বোধ হইতেছে যে, পশু পক্ষী প্রভৃতি নানাবিধ প্রাণীর শান্তিময় আশ্রয়স্থল এই পবিত্র আশ্রমটি প্রাণহীন হইয়া পড়িতেছে। আশ্রমপ্রাণা শকুন্তলাও যেন প্রাণহীন হইয়া পড়িতেছেন। তিনি যেদিকে চাহিতেছেন, সেইদিকেই তাঁহার স্বহস্তপ্রতিপালিত, তাঁহার সুমধুর স্নেহপরিপুষ্ট তরু, লতা, মৃগ, মৃগীসকল বিমর্ষভাব ধারণ করিয়া রহিয়াছে ! কয়েক পদ গমন করিয়া তিনি আর থাকিতে পারিলেন না। ব্যাকুলিতান্তঃ-করণে বলিয়া উঠিলেন—পিতঃ ! লতাভগিনী বনজ্যোৎস্নাকে সম্ভাষণ করি। পিতা জানিতেন যে তাঁহার আশ্রমের সকল পদার্থই শকুন্তলার প্রাণ এবং তাঁহার শকুন্তলা তাঁহার আশ্রমের সকল পদার্থের প্রাণ। তিনি বলিলেন—'জানি, সেই লতার উপর তোমার সোদরস্নেহ রহিয়াছে।' অমনি শকুন্তলা বিদীর্ণহৃদয়ে

বলিলেন—'বনজ্যোৎস্নে ! তুমি সহকারের সহিত সমাগত হইলেও দূরপ্রসারিত শাখাবাহুদ্বারা আমাকে প্রত্যালিঙ্গন কর, আমি আজ অবধি তোমায় ছাড়িয়া যাইতেছি !' পাঠক জানেন যে নবমল্লিকাটিকে শকুন্তলা বড়ই ভালবাসিতেন। জলসেচনকালে নবমল্লিকাটিকে দেখিয়াই তিনি কল্পনাপূর্ণ স্নেহোচ্ছ্বসিত হৃদয়ে বলিয়াছিলেন—

হলা রমণীআে কৃখু কালো ইমস্স পাদবমিহুণস্স রদিঅয়ো সম্বুত্তো জেণ ণব কুসুমজোব্বনা নোমালিআ অঅং পি বহুফলদাএ উ অভোঅ কৃখম্মো সহআরো ॥

তাই আজ শকুন্তলা তাহাকে শুধু সম্ভাষণ করিয়া থাকিতে পারিলেন না। রমণীরত্ন রমণীরত্নের ন্যায় সখীদ্বয়কে বলিলেন—'সখি ! আমি এই লতাটিকে তোমাদের দুজনের হাতে সঁপিয়া দিলাম !' সখীদ্বয় আকুলিতপ্রাণে বলিয়া ফেলিলেন—'আমাদিগকে কাহার হাতে সঁপিলে ?' আমরাও যদি তখন সেখানে থাকিতাম তাহা হইলে প্রিয়ম্বদা এবং অনসূয়ার ন্যায় বিগলিত হৃদয়ে অশ্রুপূর্ণ নয়নে তাহাকে বলিয়া ফেলিতাম—'আমাদিগকে কাহার হাতে সঁপিলে ?' তারপর সকলে অগ্রসর হইলেন। শকুন্তলার প্রাণ আরো ব্যাকুলিত হইতে লাগিল। তাঁহার গর্ভমন্থরা মৃগীটিকে দেখিতে পাইলেন। পাইয়া স্নেহপূর্ণা বিগলিতপ্রাণা জননীর ন্যায় বলিলেন—'এই উটজচারিণী গর্ভমন্থরা মৃগী যখন ভালয় ভালয় প্রসব হইবে, তখন তোমরা আমার নিকট লোক পাঠাইও, সে গিয়া আমাকে এই প্রিয়সংবাদটি দিবে।' আহা ! ক্ষুদ্র বালিকার হৃদয় কতই ভালবাসিতে পারে, কত ভাবনাই ভাবিতে পারে ! সে হৃদয় আজ কত যাতনাই সহ্য করিতেছে ! পরক্ষণেই আবার কি যেন তাঁহার পশ্চাদ্ভাগ হইতে গতিরোধ করিতে লাগিল। মুখ ফিরাইয়া দেখিলেন যে, যে মৃগটির মুখ কুশাগ্রদ্বারা বিদ্ধ হইলে তিনি সযত্নে ক্ষতশোধক ইঙ্গুদী-তৈলসেক করিতেন এবং যাহাকে শ্যামাকধান্যমুষ্টি দিয়া পোষণ করিয়াছেন, সেই পুত্রাধিকপ্রিয় মৃগটি মুখাগ্র দ্বারা তাঁহার অঞ্চল ধরিয়া টানিতেছে ! স্নেহময়ী কাঁদিয়া ফেলিলেন। বনপশু যাহার স্নেহে মুগ্ধ, যাহার বিরহে আকুলিত-প্রাণ, তাহার ক্রন্দন দেখিলে সমস্ত বিশ্বহৃদয় কাঁদিয়া উঠে—ফাটিয়া যায়—গলিয়া বেগবতী স্রোতস্বিনীর ন্যায় প্রবাহিত হইতে থাকে ! কাঁদিয়া কাঁদিয়া যাইয়াও যাওয়া হইতেছে না দেখিয়া শার্ঙ্গরব বলিলেন—'ভগবন্, শুনা যায় যে নদী বা সরোবর পর্যন্ত স্নিগ্ধব্যক্তিকে অনুগমন করা কর্তব্য। এই অদূরে সরোবরতীর, যা বলিবার থাকে এখানে বলিয়া ফিরুন।' তখন সকলে বট-বৃক্ষচ্ছায়ায় উপবেশন করিলেন। উপবেশন করিলে পর মহর্ষি কণ্ব দুষ্মন্তকে

যাহা বলিবার তাহা শার্ঙ্গরবকে বলিয়া দিলেন, শকুন্তলাকে যাহা বলিবার তাহা শকুন্তলাকে বলিলেন। বলিয়া শকুন্তলাকে বলিলেন—'বৎসে! তুমি আমাকে এবং সখীদিগকে আলিঙ্গন কর।' শকুন্তলা জানিতেন যে কণ্ব তাঁহার সমভিব্যাহারী হইবেন না। কিন্তু প্রিয়ম্বদা ও অনসূয়াকে ফেলিয়া যাইতে হইবে, তাহা তিনি মনেও ভাবেন নাই। এখন সহসা বুঝিলেন যে তাও তাঁহাকে করিতে হইবে। বুঝিয়া কাতরতম অপেক্ষা কাতরস্বরে জিজ্ঞাসা করিলেন—'পিতঃ! প্রিয়ম্বদা প্রভৃতি সখীরা কি এস্থান হইতে ফিরিয়া যাইবে?' উত্তর প্রতিকূল হইল। কিন্তু সুশীলতমা শকুন্তলা বর্ধিত যন্ত্রণা চাপিয়া রাখিয়া দ্বিরুক্তি না করিয়া বিহ্বলহৃদয়ে পিতাকে আলিঙ্গন করিলেন। করিয়া সখীদ্বয়ের কাছে গিয়া বলিলেন, সখি! তোমরা দুজনে এককালেই আমাকে আলিঙ্গন কর! তিন হৃদয়ে একহৃদয়, একটির পর আর একটি ভাল লাগিবে কেন? তিনটি সন্তপ্ত হৃদয় এক হইয়া গেল! তাই দেখিয়া সমস্ত বিশ্বহৃদয় সেই আশ্চর্য হৃদয়কুণ্ডে গলিয়া পড়িল! সমস্ত বিশ্বমণ্ডল হৃদয়ময় হইয়া সংক্ষুব্ধ মহাসাগরের ন্যায় উদ্বেলিত হইতে লাগিল! হৃদয়ময়ি শকুন্তলে, যেখানে তুমি, সেখানে হৃদয় ভিন্ন আর কিছুই থাকিতে পারে না। তোমার কাছে বিশ্বব্রহ্মাণ্ড মন্ত্রমুগ্ধ! যাওয়া ত আর হয় না। শার্ঙ্গরব বলিয়া দিলেন যে প্রখর রবি মধ্যগগনে উঠিয়াছেন। তখন যেন চেতনাপ্রাপ্ত হইয়া, একান্তই যাইতে হইবে বুঝিয়া, আশ্রমের দিকে শেষদৃষ্টি নিক্ষেপ করিয়া, সমস্ত পূর্বস্মৃতিপরিমিত যন্ত্রণাকাতরস্বরে শকুন্তলা জিজ্ঞাসা করিলেন—'পিতঃ, কবে আবার তপোবন দেখিব!' কাতর হৃদয়ের শেষ নিশ্বাস—সংসারত্যাগীর শেষ মায়ার ক্রন্দন—জলমগ্নপ্রায় দুর্ভাগার শেষ চীৎকার—সংসারে ইহার অপেক্ষা যন্ত্রণা আর নাই। এ যন্ত্রণা দেখিলে বুক ফাটিয়া যায়, জীবাত্মা শিহরিয়া উঠে। কথাটি কণ্বের হৃদয়ে বাজিল। তিনি অনেক কথা কহিতে আরম্ভ করিলেন। তখন গৌতমী ব্যাঘাত বুঝিয়া বলিলেন—'বাছা! গমনকাল অতীত হইতেছে, পিতাকে ফিরাইয়া দাও! অথবা শকুন্তলা অনেকক্ষণ ধরিয়া পুনঃ পুনঃ এইরূপ বলিবে, তুমিই ফিরিয়া যাও।' জ্ঞানময় তাপসপ্রধান হতজ্ঞান হইয়াছিলেন। সহসা যেন জ্ঞানপ্রাপ্ত হইয়া শকুন্তলাকে কহিলেন—'বৎসে! তপোনুষ্ঠানের ব্যাঘাত হইতেছে।' ধর্মানুরাগিণী তাপসবালা পিতার তপোনুষ্ঠানের ব্যাঘাত হইতেছে শুনিয়া আপনার সকল যন্ত্রণা ভুলিয়া গেলেন। তাঁহার কোমলহৃদয় বলিষ্ঠ হইয়া উঠিল। তিনি পুনরায় পিতাকে আলিঙ্গন করিয়া বলিলেন—'তোমার শরীর তপশ্চর্যায় পীড়িত; অতএব আমার জন্য আর অতিমাত্র উৎকণ্ঠিত হইও না।' তাপসপ্রধান দীর্ঘনিশ্বাস

পরিত্যাগ করিয়া উত্তর করিলেন—'বৎসে ! তুমি পর্ণশালার দ্বারদেশে যে পুঁড়িধানের পূজোপহার দিয়াছিলে তাহা হইতে এখন অঙ্কুর বাহির হইয়াছে। আমি যখন তা দেখ্‌ব তখন কিরূপে শোকসংবরণ হইবে।' বিগলিতহৃদয়া ক্ষুদ্রবালিকা এখন দৃঢ়মনা হইয়া সান্ত্বনাবাক্যপ্রয়োগ করিতেছেন ; দৃঢ়মনা পুরুষবর এখন বিগলিতহৃদয়া ক্ষুদ্র বালিকা হইয়া দাঁড়াইয়াছেন। ধন্য রমণী-হৃদয় ! সে হৃদয়ের কাছে জগতের ইন্দ্রতুল্য পুরুষও অবনত; জগতের তাপস-কুলাচার্যও বিজিত ! সে হৃদয় অতিমাত্র কোমল হইয়াও অতিমাত্র দৃঢ় ! এ রহস্য কে বুঝাইবে ! তারপর সহযাত্রিগণের সহিত শকুন্তলা নিষ্ক্রান্ত হইলেন। কাশ্যপাশ্রম প্রাণহীন হইল ! হিমালয় প্রদেশের বনজ্যোৎস্না ডুবিল ! যে কৌশলে মহাকবি এই চমৎকার বিদায়দৃশ্যের করুণরসোদ্দীপকতা উত্তরোত্তর বৃদ্ধি করিয়াছেন, তাহা মহাকবি শেক্সপীয়র-প্রদর্শিত এণ্টনীর বক্তৃতা-রচনাকৌশল অপেক্ষা কোন অংশে কম নয়।

শকুন্তলা স্নেহময়ী। কিন্তু স্নেহের একটি প্রণালী আছে। পুরুষের স্নেহ সে প্রণালীর অনুগামী নয়। কণ্ব আশ্রমের তরুলতা মৃগ প্রভৃতি সকলকেই ভালবাসেন। আমরা অনসূয়ার মুখে শুনিয়াছি যে তিনিই শকুন্তলাকে জলসেচনকার্যে নিযুক্ত করিয়াছেন। দুষ্মন্ত তাঁহার সমস্ত সাম্রাজ্যের প্রজাদিগকে ভালবাসেন। মৃতবণিকের উত্তরাধিকারত্ব নিরূপণোপলক্ষে তিনি এই আজ্ঞা প্রচার করিলেন—

যেন যেন বিযুজ্যন্তে প্রজাঃ স্নিগ্ধেন বন্ধুনা।
স স পাপাদৃতে তাসাং দুষ্মন্ত ইতি ঘুষ্যতাম্‌॥

কে কোথায় কবে বন্ধুহীন হইবে, তাহার ঠিকানা নাই। কিন্তু যেই যখন বন্ধুহীন হইবে, দুষ্মন্ত তাহার বন্ধুস্থানীয় হইবেন। এ স্নেহের পাত্রবিশেষ দেখিবার প্রয়োজন নাই, পাত্রবিশেষ নিকটে রাখিবার প্রয়োজন নাই। এ স্নেহ শ্রেণীগত, পাত্রবিশেষনিহিত নয়। কষ্ট না দেখিতে পাইলেও এ স্নেহের বিকাশ আছে। আর এ স্নেহ পরের দ্বারা কার্য করিয়াই পরিতুষ্ট হয়। কিন্তু স্ত্রীজাতিপ্রতিম শকুন্তলার স্নেহ এ জাতীয় নয়। সে স্নেহের পাত্র কল্পনায় থাকে না, নয়নপথের বহির্ভূত থাকে না। সে স্নেহের পাত্র কে ? সে স্নেহের পাত্র শকুন্তলা যে আশ্রমে বাস করেন সেই আশ্রমের তরুলতা, সেই আশ্রমের মৃগপক্ষী, সেই আশ্রমের স্ত্রীপুরুষ। সে স্নেহের অবয়ব কিরূপ? বলিতে গেলে সে স্নেহ সাকার। শকুন্তলার কাছে আশ্রমের তরুলতাগুলি ভাই-ভগিনী, মৃগ-মৃগীগুলি পুত্রকন্যা, পুষ্পগুলি চন্দ্রসূর্য। তিনি কোন লতাটিতে বন-জ্যোৎস্না বলিয়া ডাকেন, কোন লতাটিকে না জানি আর কি বলিয়া ডাকেন। পুরুষের

স্নেহ এ পদ্ধতির নয়। বলিতে গেলে সে স্নেহ নিরাকার। আর শকুন্তলা যাহাকে স্নেহ করেন, তাহাকে কি রকমে স্নেহ করেন? তাঁহার নিজের মুখে শুনিয়াছি যে তাঁহার আশ্রমের একটি মৃগী একটি বৎস প্রসব করিয়াই মরিয়া যায়। কিন্তু সেই মৃগশাবকটির জননীস্বরূপ হইয়া তাহাকে ক্ষুধাতে ধান্য খাওয়াইয়া, তৃষ্ণায় জলপান করাইয়া, রোগে শুশ্রূষা করিয়া বড় করিয়াছিলেন। তিনি যখন জলসেচন করিতে যান, তখন তাঁহার বোধ হয় যে আতপতাপিতা তরুলতাগুলি তাঁহাকে আহ্বান করিতেছে। মহর্ষি কণ্ব বলেন—

পাতুং ন প্রথমং ব্যবস্যতি জল যুষ্মাস্বসিক্তেষু যা
নাদত্তে প্রিয়মণ্ডনাপি ভবতাং স্নেহেন যা পল্লবম্।
আদৌ বঃ কুসুমপ্রবৃত্তিসময়ে যস্যা ভবত্যুৎসবঃ
সেয়ং যাতি শকুন্তলা পতিগৃহং সর্বৈরনুজ্ঞায়তাম্॥

এখানে স্ত্রীজাতির আর একরকম কষ্টসহিষ্ণুতা দেখা যাইতেছে। পুরুষের শারীরিক ক্লেশ দেখিতে পাওয়া যায়; রমণীর শারীরিক ক্লেশ দেখিতে পাওয়া যায় না। দূরপথগমন, রৌদ্রে ভ্রমণ, অবিশ্রান্ত হস্তপদসঞ্চালন প্রভৃতি ইন্দ্রিয়-প্রত্যক্ষ কার্যে পুরুষের শারীরিক কষ্টসহিষ্ণুতার প্রকাশ। ক্ষুধায় উপবাস, তৃষ্ণায় পিপাসাক্লেশভোগ প্রভৃতি ইন্দ্রিয়ের অপ্রত্যক্ষ অবস্থায় রমণীর কষ্ট-সহিষ্ণুতা। দুইপ্রকার কষ্টসহিষ্ণুতার মধ্যে রমণীর কষ্টসহিষ্ণুতাই গুরুতর। উত্তমরূপে পানাহার না করিয়া কষ্টসাধ্য কার্য করা অধিক ক্লেশকর, কিন্তু পুরুষাপেক্ষা কষ্টসহিষ্ণু হইয়াও রমণীর কষ্ট অপ্রকাশ। যে কষ্টে জগৎ রক্ষিত হয়, সে কষ্ট জগৎ দেখিতে পায় না। রমণীর প্রকৃত বীরত্ব, রমণীর প্রকৃত মহত্ত্ব, নিভৃতে নিস্তব্ধভাবে জগতের মহৎ কার্যসাধনে নিয়ত নিযুক্ত। কিন্তু খুঁজিয়া পাতিয়া না দেখিলে জগৎ সে মহত্ত্ব দেখিতে পায় না। সে মহত্ত্ব যেন অনন্তকাল খুঁজিয়া-পাতিয়াই লইতে হয়। রমণীরত্ন যেন অনন্তকাল নিভৃতই থাকে! সে রত্ন জগতের কর্মক্ষেত্রে আনিলে নিস্তেজ, নিষ্প্রভ, নিষ্ফল, 'খেলো' হইয়া পড়িবে। জন স্টুয়ার্ট মিলের মত অবলম্বন করিয়া কেহ যেন পৃথিবীকে মায়াশূন্য, হৃদয়শূন্য, ধাত্রীশূন্য, জননীশূন্য না করেন।

একবার একটি মৃগশাবক তাহার জননীকে দেখিতে না পাইয়া কাতর হইয়া এদিক ওদিক করিয়া বেড়াইতেছিল। দেখিয়া প্রিয়ম্বদা অনসূয়াকে বলিলেন—

অণসূএ জহ এসো ইদো দিস্সদিট্টা উস্সুও মিঅপদও মাদরং অস্সেসদি এহি সংজোএম ণং।

এই বলিয়া সেই মৃগশাবকটিকে তাহার মার কাছে দিতে গেলেন। শকুন্তলাও এইরূপ করেন।

এখন বুঝা যাইতেছে যে রমণীর অন্তর্লীনতাও যেমন প্রগাঢ়, বাহ্যবিলীনতাও তেমনি প্রগাঢ়। রমণী যেমন বাহ্যজগৎ ভুলিয়া আপনাতে মিশিতে পারেন, তেমনি আপনাকে ভুলিয়া বাহ্যজগতেও মিশিতে পারেন। স্নেহময়ী রমণী স্নেহের বস্তু পাইলে স্বয়ং তাহার শুশ্রূষা করেন, স্বয়ং তাহাকে লালনপালন করেন, স্বয়ং তাহাতে মিশিয়া যান। পুরুষের স্নেহ বস্তুবিশেষন্যস্ত নয়; পুরুষ রমণীর ন্যায় স্নেহের বস্তুকে 'কোলে পিঠে' করিয়া রাখেন না; স্নেহের বস্তুর জন্য নিজের ক্ষুধাতৃষ্ণা ভুলিয়া যান না, রাত্রিকে দিবা করেন না; স্নেহের বস্তুতে লীন হন না। পুরুষের স্নেহ মনে মনে থাকে; রমণীর স্নেহ বস্তুতে থাকে। পুরুষের স্নেহ abstract-নিহিত; রমণীর স্নেহ concrete-নিহিত। পুরুষের স্নেহ অন্তর্জগৎনিবদ্ধ; রমণীর স্নেহ বাহ্যজগৎলিপ্ত। এই নিমিত্তই রমণীকে জগদ্ধাত্রী বলে। এই নিমিত্তই রমণী শিশুর ধাত্রী, রোগীর চিকিৎসক, আতুরের বন্ধু, জগতের পালয়িত্রী। এই নিমিত্তই ফ্লরেন্স নাইটিঙ্গেল (Florence Nightingale), এই নিমিত্তই কৃপাময়ী ভগিনীসম্প্রদায় (sisters of mercy)। পূর্বেও দেখিয়াছি, এখনও দেখিতেছি, রমণীহৃদয় সাকারপ্রিয়, জড়ানুরক্ত। সেইজন্য রমণীমণ্ডলে পৌত্তলিকধর্ম সর্বত্র প্রবল। সেইজন্য ১৭৯৩ সালের ফরাসী বিপ্লবে ফরাসী দার্শনিকেরা মাদাম রোলেনের শিষ্য হইয়া বিপ্লবের পদ্ধতি শিক্ষা করিয়াছিলেন। হৃদয়ের অতি উৎকৃষ্ট ভাবসকল স্ত্রীজাতির মনে শুধু ভাবরূপে থাকে না; বস্তুবিশেষের সহিত সংযুক্ত হইয়া অবস্থান করে। রমণীর আধ্যাত্মিকতা জড়জগৎজড়িত এবং জড়জগৎসাপেক্ষ। এই নিমিত্ত রমণীর স্নেহ সর্বদাই কার্যে পরিণত হয়। জগতে 'সেণ্টিমেণ্টাল' রমণী নাই বলিলেই হয়।

কালিদাসের শকুন্তলা শেক্সপীয়রের পোর্শিয়া, রোজালিন্দ কি ইসাবেলার ন্যায় প্রখরবুদ্ধি নন। তাঁহাকে দেখিলে বোধ হয় তিনি সামান্য হিসাবে বুদ্ধিমতী। তিনি পোর্শিয়ার ন্যায় নৈয়ায়িক নন, ইসাবেলার ন্যায় নীতিশাস্ত্রবেত্তাও নন। আমাদের বোধ হয় যে তাঁহার বয়সে এবং তাঁহার অবস্থাতে সে রকম হইতে হইলে ভালও হইত না। আমাদের আরও বোধ হয় যে কালিদাস শকুন্তলাকে সাধারণ স্ত্রীজাতির আদর্শরূপে চিত্রিত করিবার অভিপ্রায়ে তাঁহাকে হৃদয়প্রধান করিয়াছেন। স্ত্রীজাতির মধ্যে দুই-চারিটি জ্ঞানপ্রধান থাকে বটে কিন্তু সে দুই-চারিটি স্ত্রীপ্রকৃতির নিয়মবহির্ভূত। জ্ঞানপ্রধান হইতে হইলে রমণীকে প্রায়ই রমণীপদ এবং রমণীধর্ম পরিত্যাগ

করিতে হয়। মিস মার্টিনো তাঁহার স্বরচিত জীবনীতে বলিয়াছেন যে, রমণী যদি পণ্ডিতা হইতে চান তবে তিনি যেন সংসারাশ্রম প্রবেশ না করিয়া পণ্ডিতা হইবার উদ্দেশে যাবজ্জীবন শাস্ত্রচর্চা করেন, সেখানেও রমণীকে বড় একটা পূর্ণমনোরথ দেখা যায় না।*

কিন্তু শকুন্তলার স্ত্রীরত্নোপযোগী বুদ্ধি যাহা আছে তাহা ঠিক পুরুষের বুদ্ধির মতন নয়। পুরুষের বুদ্ধি বিচারশক্তিমূলক। শকুন্তলার বুদ্ধি সেরকমের নয়। আশ্রমের নিভৃতপ্রদেশে দুষ্মন্ত যখন তাঁহার হস্ত ধরিবার উপক্রম করেন তখন তিনি বারংবার তাঁহাকে এই বলিয়া নিষেধ করেন যে, স্বজন এবং গুরুজনের সম্মতি ব্যতীত আমি আত্মসমর্পণে অক্ষম। জ্ঞানপ্রধান দুষ্মন্ত যুক্তিদ্বারা তাঁহাকে বুঝাইবার চেষ্টা পাইলেন যে, গুরুজনকে না জানাইয়াও তিনি আত্মসমর্পণ করিতে পারেন। ক্ষুদ্রবুদ্ধি শকুন্তলা সে যুক্তি খণ্ডন করিতে পারিলেন না, খণ্ডন করিবার চেষ্টাও করিলেন না, তথাপি গুরুজনের নাম করিয়া নিষেধ করিতে লাগিলেন। যিনি অভিজ্ঞান শকুন্তল পড়িয়াছেন তিনি জানেন যে, জ্ঞানপ্রধান দুষ্মন্ত ঠিক মীমাংসা করেন নাই; ক্ষুদ্রবুদ্ধি শকুন্তলা ঠিক মীমাংসা করিয়াছিলেন। এ রহস্যের অর্থ কি? ইহার অর্থ এই;—দুষ্মন্ত বিচারশক্তি-সহকারে ঐতিহাসিক প্রথা ধরিয়া মীমাংসা করিয়াছিলেন; শকুন্তলা উন্নতমনা ধর্মানুরাগিণী রমণীরত্নের নৈসর্গিক সৎপ্রবৃত্তির বলে মীমাংসা করিয়াছিলেন। দুষ্মন্তের মীমাংসা বিচারশক্তিমূলক; শকুন্তলার মীমাংসা উন্নতহৃদয়ের অভিব্যক্তি মাত্র। অনেক প্রধান প্রধান য়ুরোপীয় দার্শনিক এখন বলিয়া থাকেন যে, পুরুষের জ্ঞান বিচারমূলক; রমণীর জ্ঞান রমণীহৃদয়ের অভিব্যক্তি মাত্র। জন স্টুয়ার্ট মিলের 'লিবার্টি' নামক প্রবন্ধের ভূমিকায় এই কথা একরকম স্পষ্টাক্ষরে লেখা আছে। কালিদাসের শকুন্তলা এই কথার একটি প্রমাণ।

শকুন্তলাচরিত্রের সমালোচনায় আমরা যাহা যাহা পাইলাম তাহার সংক্ষিপ্ত বিবরণ এই:—

১। পুরুষের শরীর বলিষ্ঠ; রমণীর শরীর কোমল—রমণীর শরীর নাই বলিলেই হয়।

২। পুরুষ শারীরিক বলে কষ্টসহিষ্ণু; রমণী হৃদয়ের বলে কষ্টসহিষ্ণু। কষ্টসহিষ্ণুতায় রমণী পুরুষের অপেক্ষা শ্রেষ্ঠ।

৩। কর্মশীলতা পুরুষের স্বাভাবিক ধর্ম, রমণীর হৃদয়ের অবস্থাসাপেক্ষ ধর্ম।

* অহিফেনসেবক শ্রীল শ্রীযুক্ত কমলাকান্ত চক্রবর্তী মহাশয় অহিফেনের নেশায় স্ত্রীজাতির বুদ্ধিকে নারিকেলের মালার সহিত তুলনা করিয়া বলিয়াছেন যে তিনি সে মালা কখন আধখানার বেশী দেখেন নাই।

৪। পুরুষ জ্ঞানে এবং শারীরিক বলে রমণীর অপেক্ষা শ্রেষ্ঠ; রমণী হৃদয়ের বলে পুরুষের অপেক্ষা শ্রেষ্ঠ। পুরুষচরিত্র বিস্তারগুণবিশিষ্ট, রমণীচরিত্র গভীরতাগুণবিশিষ্ট। পুরুষের অন্তর্লীনতা এবং বাহ্যবিলীনতা কম; রমণীর অন্তর্লীনতা এবং বাহ্যবিলীনতা অপরিমেয়।

৫। রমণীর আধ্যাত্মিকতা পুরুষের আধ্যাত্মিকতা অপেক্ষা অনেক অধিক। কিন্তু পুরুষের আধ্যাত্মিকতা অনেকটা স্বাধীন; রমণীর আধ্যাত্মিকতা সম্পূর্ণরূপে জড়জগৎসাপেক্ষ।

৬। পুরুষের বুদ্ধি বিচারশক্তির ফল; রমণীর বুদ্ধি হৃদয়ের অভিব্যক্তি মাত্র।

৭। রমণী বৈপরীত্যের আধার—কোমল হইয়াও কঠিন, দুর্বল হইয়াও বলিষ্ঠা, শ্রমকাতর হইয়াও কষ্টসহিষ্ণু, নরম হইয়াও দৃঢ়, বুদ্ধিমতী হইয়াও বিচারশক্তিহীন; আধ্যাত্মিক হইয়াও জড়জগৎসাপেক্ষ। জগতে রমণীর ন্যায় রহস্য আর নাই।

স্ত্রীপ্রকৃতির এত উজ্জ্বল, প্রশস্ত এবং প্রগাঢ় চিত্র কালিদাসের অভিজ্ঞান-শকুন্তল ভিন্ন আর কোন নাটকে নাই। একটি সামান্য ঘটনা অবলম্বন করিয়া এত বড় ছবিও অন্য কোন কবি তুলিতে পারেন নাই। জগতের নাট্যকার-দিগের মধ্যে কালিদাস অদ্বিতীয় শিল্পী। শিল্পপ্রতিভায় শেক্সপীয়রও তাঁহার সমকক্ষ নন।

ভাদ্র ১২৮৭

শ্রীহর্ষ

সংস্কৃত চিত্রশালিকার দুইখানি মহামূল্য চিত্র শ্রীহর্ষনামাঙ্কিত, রত্নাবলী ও নৈষধ। রত্নাবলী অবলা, সরলা, কোমলাঙ্গী অঙ্গনা; অলঙ্কারবাহুল্য বিনাও দেখিতে সুন্দরী। নৈষধ তেজস্বী, চিন্তাশীল, দৃঢ়কায় বীরপুরুষ; দেবোপম স্বাভাবিক সৌন্দর্য সত্ত্বেও বিবিধ অলৌকিক সজ্জায় সজ্জিত। দেখিলে কোন-ক্রমেই দুইটি একহস্তের চিত্রিত বলিয়া বোধ হয় না। লোকেরও বিশ্বাস এই প্রকার যে, দুখানি দুজন চিত্রকরের রচিত। তাঁহারা কে, এবং কোন্ সময়ে কোথায় প্রাদুর্ভূত হইয়াছিলেন, এই সকল কথা লইয়া তত্ত্বজিজ্ঞাসু সমাজে অনেক বাদানুবাদ হইয়া গিয়াছে।

পণ্ডিতবর শ্রীযুক্ত বাবু রামদাস সেন একবার বঙ্গদর্শনে এতৎ প্রস্তাবের অবতারণা করিয়াছিলেন। তাঁহার মতে, কাশ্মীরাধিপতি শ্রীহর্ষ রত্নাবলীর রচয়িতা; এবং আদিশূর কান্যকুব্জ হইতে বঙ্গদেশে সে পঞ্চব্রাহ্মণ আনয়ন করেন, তন্মধ্যে যিনি চট্টোপাধ্যায়দিগের পূর্বপুরুষ তিনিই নৈষধকার। আমার ক্ষুদ্র বুদ্ধিতে যতদূর আইসে, তাহাতে বোধ হয় যে এই দুইটি সিদ্ধান্তেই ভ্রম আছে, এবং কোনটির পক্ষেই কোন প্রবল যুক্তি প্রদর্শিত হয় নাই। এজন্য যাহা কিছু আমার বক্তব্য আছে, সত্যানুরোধে বলিতে প্রবৃত্ত হইলাম। হয়ত আমারও ভুল হইবে; কিন্তু বারংবার কোন বিষয়ের আলোচনা করিলে, সত্যের পথ যে পরিষ্কার হয়, তাহার সন্দেহ নাই।

এতদ্দেশীয় ঐতিহাসিক তত্ত্ব নির্ণয় করিতে গিয়া যে আমাদিগের পদস্খলন হইবে, বিচিত্র নহে। ভারতবর্ষের পুরাবৃত্ত নিবিড়তিমিরাচ্ছন্ন। অন্ধকারে অনুমানরূপ লোষ্ট্রনিক্ষেপপূর্বক পদার্থ-পরিচয় করিয়া আমাদিগকে অগ্রসর হইতে হয়। ইতিহাস ও জীবনচরিত পাওয়া যায় না বলিলেই চলে। বোধ হয় যেন, আমাদিগের পূর্বপুরুষেরা এতদ্বিষয়ক গ্রন্থ লিখিতে ভালবাসিতেন না। হয়ত প্রকৃতিপুস্তকপাঠে এবং ঐশ্বরিক চিন্তায় তাঁহারা এমন নিমগ্নচিত্ত ছিলেন যে, নশ্বর মানবজীবনের বৃত্তান্ত বর্ণনা করিতে তাঁহাদিগের প্রায়ই প্রবৃত্তি হইত না। যেখানে বৌদ্ধদেবের প্রভাবে হিন্দুধর্মের বন্ধন শিথিল হইয়া মনুষ্যের গৌরব বর্ধিত হইয়াছিল, সেই পর্বতপরিবৃত কাশ্মীর ও সাগরবেষ্টিত সিংহলের ইতিহাস আছে; তৎসাহায্যে, এবং প্রাচীন মুদ্রা, অনুশাসনপত্র, ক্ষোদিত প্রস্তর বা সাহিত্যদর্শনাদি গ্রন্থান্তর্গত উল্লেখ দেখিয়া আমাদিগকে তত্ত্ব নিরূপণ করিতে হয়।

কাশ্মীরাধিপতি শ্রীহর্ষ রত্নাবলীর রচয়িতা, এই মত অধ্যাপকশ্রেষ্ঠ উইলসন্ সাহেব উদ্ভাবন করেন। রাজতরঙ্গিণীতে হর্ষনামক নৃপতির বৃত্তান্ত আছে; কিন্তু তিনি যে রত্নাবলীকার, একথার বিন্দুবিসর্গও নাই। কেবল এই-মাত্র লিখিত আছে যে "তিনি অশেষদেশভাষাজ্ঞ, সর্বভাষায় সৎকবি, সর্ববিদ্যা-নিধি বলিয়া দেশান্তরেও খ্যাতি প্রাপ্ত হইয়াছিলেন।"

সোঽশেষদেশভাষাজ্ঞঃ সর্বভাষাসু সৎকবিঃ।
কৃৎস্ন বিদ্যানিধিঃ প্রাপ খ্যাতিং দেশান্তরেষ্বপি ॥

৬১১ শ্লোক। ৭ম তরঙ্গ। রাজতরঙ্গিণী।

কেবল এই শ্লোকের উপর নির্ভর করিয়া কাশ্মীরাধিপতি হর্ষদেবকে

রত্নাবলী-রচয়িতা বলা কতদূর সঙ্গত, পাঠকবর্গ বিবেচনা করিবেন। কিন্তু তিনি যে রত্নাবলীকার নহেন, ইহার অপর প্রমাণ দেওয়া যাইতেছে।

ইহা সর্ববাদিসম্মত যে "সরস্বতীকণ্ঠাভরণ" নামক গ্রন্থ মালবাধিরাজ ভোজদেবের কৃত। উক্ত গ্রন্থে রত্নাবলী উদ্ধৃত হইয়াছে। রাজতরঙ্গিণী দৃষ্টে বোধ হয় যে ভোজরাজ হর্ষদেবের পিতামহ অনন্তদেবের সময়ে বর্তমান ছিলেন। সপ্তম তরঙ্গের ১৯০ শ্লোকে অনন্তদেবের ইতিবৃত্ত বর্ণনাবসরে লিখিত হইয়াছে যে—

মালবাধিপতির্ভোজঃ প্রহিতৈঃ রত্নসঞ্চয়ৈঃ.।
অকারয়ৎ যেন কুণ্ড যোজনং কটকেশ্বরে ॥

যে গ্রন্থ পিতামহের সমকালীন লোকে উদ্ধৃত করিয়াছে, সে গ্রন্থ পৌত্রের লিখিত হওয়া অতীব অসম্ভব।[১]

আবার দেখা যাইতেছে যে ধনিকাপর নামা ধনঞ্জয় দশরূপ নিবন্ধে রত্নাবলী হইতে অনেক রত্ন উদ্ধৃত করিয়াছেন। ধনঞ্জয় মুঞ্জরাজের সভাসদ্ ছিলেন।

বিষ্ণোঃ সুতেনাপি ধনঞ্জয়েন
বিদ্বন্মনোরাগ নিবন্ধহেতুঃ।
আবিষ্কৃতং মুঞ্জমহীশ গোষ্ঠী
বৈদগ্ধ্য-ভাজা দশরূপমেতৎ ॥

মুঞ্জ ভোজদেবের পূর্বে মালবাধিপতি ছিলেন। উজ্জয়িনীর জ্যোতির্বেত্তৃগণের গণনানুসারে ভোজদেব খ্রীষ্টীয় ১০৪২ অব্দে প্রাদুর্ভূত হইয়াছিলেন।[২] একখানি অনুশাসনপত্রের লিখনানুসারে নির্ণীত হয় যে ভোজরাজের পৌত্র এবং উদয়াদিত্যের পুত্র লক্ষ্মীধর ১১০৪ খ্রীষ্টাব্দে রাজত্ব করিতেছিলেন।[৩] সুতরাং ভোজের প্রাদুর্ভাবকাল সম্বন্ধে কোন সন্দেহ থাকিতে পারে না। অতএব বোধ হয়, এ কথা নির্বিবাদে বলা যায় যে ১৩৪২ খ্রীষ্টাব্দের পূর্বে রত্নাবলী রচিত হইয়াছিল। রামদাসবাবু লিখিয়াছেন, "মহামহোপাধ্যায় উইলসন সাহেব কহেন, শ্রীহর্ষদেব ১১১৩ হইতে ১১২৫ খ্রীষ্টাব্দের মধ্যে কাশ্মীর রাজ্য শাসন করেন।" হর্ষদেব যদি ভোজরাজের পৌত্রদিগের সমকালীন লোক হন, তাঁহার রাজত্বকাল ঐরূপ সময়ে হইবারই সম্ভাবনা এবং তিনি কোনক্রমেই রত্নাবলী-রচয়িতা হইতে পারেন না।[৪]

এক্ষণে দেখা যাউক অন্য কোন শ্রীহর্ষের প্রতি রত্নাবলী আরোপ করা যায় কি না। "রত্নাবলী" ও "নাগানন্দ" এই দুইখানি সংস্কৃত নাটক রাজা শ্রীহর্ষদেবের রচিত বলিয়া উভয় গ্রন্থের প্রস্তাবনায় উল্লিখিত হইয়াছে। নান্দ্যন্তে সূত্রধারের উক্তি উভয় গ্রন্থের প্রায় একই প্রকার; নান্দীতে দেখা যায়

যে রত্নাবলীতে হরপার্বতীকে এবং নাগানন্দে বৌদ্ধদেবকে নমস্কার করা হইয়াছে। ইহাতে জানা যাইতেছে যে, যে রাজার নামে গ্রন্থদ্বয় পরিচিত, তিনি একসময়ে হিন্দু ও অপর সময়ে বৌদ্ধমতাবলম্বী ছিলেন। কান্যকুব্জাধিপতি শ্রীহর্ষদেব বা হর্ষবর্ধন, যিনি একটি অব্দ সংস্থাপন করেন, তাঁহার সম্বন্ধে এরূপ কথা বলা যাইতে পারে। যখন কাদম্বরীকার বাণভট্ট "হর্ষচরিত" নামে তদীয় জীবনচরিত রচনা করেন, তখন বোধহয় হিন্দু ছিলেন; নতুবা হিন্দু গ্রন্থকার তাঁহাকে বাড়াইতে যাইবে কেন? যখন চীনদেশীয় পর্যটক হুয়েন্থ সাঙ্ এতদ্দেশ ভ্রমণে আগমন করিয়া তাঁহাকে সমুদয় আর্যাবর্তের সম্রাট পদে প্রতিষ্ঠিত দেখেন, তখন তিনি বৌদ্ধমতাবলম্বী। আমাদিগের অনুমান যদি সমূলক হয়, তাহা হইলে অনায়াসেই বুঝা যায় যে কেন, "হর্ষচরিতের" পঞ্চমাধ্যায়ের অন্তর্গত একটি শ্লোকের সহিত রত্নাবলীর সূত্রধারমুখবিনির্গত একটি শ্লোকের কথায় কথায় মিল আছে।[৫] মধুসূদন "ভাববোধিনী" নাম্নী ময়ূরাষ্টকের টীকায় লিখিয়াছেন যে, বাণভট্ট যে শ্রীহর্ষের সভাপণ্ডিত ছিলেন, সেই শ্রীহর্ষই রত্নাবলীর রচয়িতা। মধুসূদনের গ্রন্থ সংবৎ ১৭১১ অর্থাৎ ১৬৫৪ খ্রীষ্টাব্দে লিখিত। সুতরাং আমরা যে মতের সমর্থন-চেষ্টা পাইতেছি, তাহা অন্ততঃ দুইশত বৎসরের পূর্বে এতদ্দেশের পণ্ডিতসমাজে গ্রাহ্য ছিল, এরূপ বোধ হয়।

শ্রীহর্ষ একজন দিগ্বিজয়ী রাজা। তিনি নাটকাদি লিখিবেন, ইহা সম্ভবপর নহে। কিন্তু রাজ্যবিস্তার দ্বারা তিনি যদ্রূপ যশোলাভ করিয়াছিলেন তদ্রূপ স্বনামে গ্রন্থপ্রচার দ্বারা যশস্বী হইতে চেষ্টা পাইবেন, এবং তজ্জন্য লেখকদিগকে প্রচুর অর্থ দ্বারা সন্তুষ্ট করিবেন, ইহা বিচিত্র নহে। কাব্যপ্রকাশকার লিখিয়াছেন,

শ্রীহর্ষাদের্ধাবকাদীনামিব ধনম্।

শ্রীহর্ষাদির নিকট হইতে ধাবক প্রভৃতির ধনপ্রাপ্তি হইয়াছিল। প্রকাশাদর্শে মহেশ্বর বলেন, "শ্রীহর্ষো রাজা, ধাবকেন রত্নাবলীং নাটিকাং তন্নাম্না কৃত্বা বহু ধনং লব্ধং।"

কাব্যপ্রকাশের টীকায় বৈদ্যনাথ লিখিয়াছেন, "শ্রীহর্ষাখ্যস্য রাজ্ঞোনাম্না রত্নাবলীনাটিকাং কৃত্বা ধাবকাখ্য কবির্বহুধনং লভেদিতি প্রসিদ্ধং।"

অন্যান্য সংস্কৃত লেখকও এইরূপ কথা কহিয়াছেন। ঈদৃশ চিরাগত প্রবাদ মিথ্যা বলিয়া বোধ হয় না।

কালিদাসের বলিয়া প্রচলিত "মালবিকাগ্নিমিত্র" নামক নাটকের প্রস্তাবনায়

লিখিত আছে, "প্রথিতযশসাং ধাবক সৌমিল্ল কবি পুত্রাদীনাং প্রবন্ধানতিক্রম্য বর্তমান কবেঃ কালিদাসস্য কৃতৌ কিং কৃতো বহুমানঃ।"

প্রথিতযশা ধাবক সৌমিল্ল কবিপুত্রাদির প্রবন্ধ অতিক্রম করিয়া বর্তমান কবি কালিদাসের কৃত গ্রন্থের কেন বহুমান করিতেছে।

ইহা হইতে জানা যাইতেছে যে ধাবক একজন প্রসিদ্ধ নাটক-লেখক। কিন্তু তাঁহার কৃত কোন নাটক পাওয়া যায় না, কেবল এইমাত্র প্রবাদ আছে যে, তিনি রত্নাবলীরচক। বোধ হয়, মালবিকাগ্নিমিত্রকার এই প্রবাদের প্রতি লক্ষ্য করিয়াই উপরি-উদ্ধৃত শ্লোক লিখিয়াছিলেন। কিন্তু কেহ কেহ আপত্তি করিতে পারেন যে, ধাবক যখন কালিদাসের পূর্ববর্তী কবি, তখন তিনি কি প্রকারে কান্যকুব্জাধিপতি শ্রীহর্ষের সমকালীন হইবেন? কালিদাস হয়ত খ্রীষ্ট জন্মিবার পূর্বে বর্তমান ছিলেন, নতুবা তিনি মাতৃগুপ্ত হইলেও খ্রীষ্টীয় ষষ্ঠ শতাব্দীর লোক; কিন্তু চীন পর্যটক বর্ণিত শ্রীহর্ষ খ্রীষ্টীয় সপ্তম শতাব্দীর রাজা। ইহার উত্তর নিম্নে দেওয়া যাইতেছে।

"ভোজপ্রবন্ধ" পাঠে জানা যায় যে ভোজরাজের সভায় একজন কবি কালিদাস ছিলেন। আমার বিবেচনায় তিনিই "মালবিকাগ্নিমিত্র"-লেখক। রচনাপ্রণালী ও কবিত্বের বিচার করিয়া দেখিলে এমন বোধ হয় না যে, যে রসময়ী লেখনী হইতে শকুন্তলা, বিক্রমোর্বশী, মেঘদূত, রঘুবংশ ও কুমারসম্ভব বিনিগত হইয়াছে, সেই লেখনীই আবার মালবিকাগ্নিমিত্রের প্রসূতি। ভাষা ও কল্পনা সম্বন্ধে যেমন, তেমনই আন্তরিক মহত্ত্ব সম্বন্ধেও মালবিকাগ্নিমিত্রকার রঘুবংশকার অপেক্ষা অনেক নিকৃষ্ট। মালবিকাগ্নিমিত্রকার অহংকারের অবতার, রঘুবংশকার মূর্তিমান বিনয়। যে কালিদাস মহাকাব্যশিরোভূষণ রঘুবংশ লিখিতে গিয়া প্রাচীন কবিগণের গুণে মোহিত হইয়া লিখিয়াছেন,

ক্ব সূর্যপ্রভবো বংশঃ ক্বচাল্প বিষয়া মতিঃ।
তিতীর্ষুর্দুস্তরং মোহাদুডুপেনাস্মি সাগরং।
মন্দঃ কবিযশঃপ্রার্থী গমিষ্যাম্যুপহাস্যতাং।
প্রাংশুলভ্যে ফলে লোভাদুদ্বাহুরিব বামনঃ॥
অথবা কৃত বাগ্‌দ্বারে বংশেঽস্মিন্‌ পূর্বসূরিভিঃ।
মণৌ বজ্রসমুৎকীর্ণে সূত্রস্যেবাস্তি মে গতিঃ॥[৬]

সেই কালিদাস কি ধাবক সৌমিল্ল প্রভৃতি প্রাচীন কবিদিগের প্রবন্ধের উল্লেখ করিয়া মালবিকাগ্নিমিত্রের ন্যায় সামান্য গ্রন্থ লিখিতে গিয়া বলিতে পারেন,

পুরাণমিত্যেব ন সাধু সর্বং,
ন চাপি কাব্যং নবমিত্যবদ্যম্ ।
সন্তঃ পরীক্ষ্যান্যতরদ্ভজন্তে,
মূঢ়াপরপ্রত্যয়নেয়বুদ্ধিঃ ॥[৭]

যদি মালবিকাগ্নিমিত্রকার কালিদাস ভোজরাজের সভাসদ্ হন তাহা হইলে তিনি যে রত্নাবলীকার ধাবককে প্রাচীন কবি বলিয়া উল্লেখ করিবেন, ইহা বিচিত্র নহে। আমরা পূর্বেই বলিয়াছি যে ভোজরাজ স্বয়ং "সরস্বতীকণ্ঠা-ভরণে" রত্নাবলী উদ্ধৃত করিয়াছেন এবং তিনি খ্রীষ্টীয় একাদশ শতাব্দীতে প্রাদুর্ভূত হন। হর্ষদেব খ্রীষ্টীয় সপ্তম শতাব্দীর লোক। চীনদেশীয় পর্যটক হুয়েন্থসাঙ ও প্রাচীন মুদ্রা প্রভৃতি হইতে অবগত হওয়া যায় যে খ্রীষ্টীয় ৬০৮ হইতে ৬৮৪ অব্দ পর্যন্ত তিনি কান্যকুব্জের অধিপতি ছিলেন। ধাবক শ্রীহর্ষের সময়ে, সুতরাং মালবিকাগ্নিমিত্রকাব্যের চারিশত বৎসর পূর্বে, বিদ্যমান ছিলেন।

রত্নাবলীকার শ্রীহর্ষের বিষয়ে যাহা যাহা আমার বক্তব্য ছিল, একপ্রকার বলা হইল। এক্ষণে নৈষধকার শ্রীহর্ষ সম্বন্ধে কিঞ্চিৎ লেখা যাইতেছে।

নৈষধচরিতে শ্রীহর্ষ* আপনার পরিচয় দিয়াছেন। ইহাতে জানা যায়, তাঁহার পিতার নাম শ্রীহরি, মাতার নাম মামল্লদেবী; তিনি কান্যকুব্জেশ্বরের নিকট হইতে তাম্বূলদ্বয় ও আসন প্রাপ্ত হইয়াছিলেন;[৮] এবং তিনি "গৌড়োর্বী-শকুলপ্রশস্তি" অর্থাৎ গৌড়ীয় রাজবংশের বৃত্তান্ত লিখিয়াছিলেন।[৯] এতদ্ব্য-তিরিক্ত তিনি "অর্ণববর্ণনকাব্য" "খণ্ডনখণ্ডখাদ্য", "নবসাহসাঙ্কচরিত" প্রভৃতি অন্যান্য গ্রন্থও লিখিয়াছিলেন।[১০] সুতরাং এরূপ অনুমান করা অন্যায় নহে যে তিনি কান্যকুব্জ নগরে প্রতিষ্ঠা লাভ করিয়া গৌড়দেশে আসিয়াছিলেন ও মহাতীর্থ গঙ্গাসাগর দর্শন করিয়াছিলেন; নতুবা কান্যকুব্জে বসিয়া গৌড়ীয় রাজবংশের বৃত্তান্ত বা সমুদ্রবর্ণনা লিখিতে তাঁহার প্রবৃত্তি হইবে কেন? আদিশূর কান্যকুব্জ হইতে বঙ্গদেশে যে পঞ্চজন ব্রাহ্মণ আনয়ন করেন, তন্মধ্যে একজনের নাম শ্রীহর্ষ ছিল। কুলাচার্যেরা বলেন,

ভট্টনারায়ণোদক্ষোবেদগর্ভোহথ ছান্দড়ঃ।
অথ শ্রীহর্ষনামাচ কান্যকুব্জাৎ সমাগতাঃ ॥
শাণ্ডিল্যগোত্রজ শ্রেষ্ঠো ভট্টনারায়ণঃ কবিঃ।
দক্ষোঽথ কাশ্যপশ্রেষ্ঠো বাৎস্য শ্রেষ্ঠোঽথ ছান্দড়ঃ ॥
ভরদ্বাজ কুলশ্রেষ্ঠঃ শ্রীহর্ষো হর্ষবর্ধনঃ।
বেদগর্ভোঽথ সাবর্ণো যথাবেদ ইনি স্মৃতঃ ॥

—বিদ্যাসাগরোদ্ধৃত কুলাচার্যবচন। বহুবিবাহবিষয়ক প্রথম পুস্তক। ১৬ পৃষ্ঠা

সুতরাং শ্রীহর্ষ কাশ্যপ চট্টোপাধ্যায় কুলের পূর্বপুরুষ নহেন, ভরদ্বাজ গোত্রীয় মুখোপাধ্যায়দিগের পূর্বপুরুষ।[১১] যে পঞ্চজন ব্রাহ্মণকে আদিশূর এদেশে আনিয়াছিলেন, তাহারা সকলেই সুপণ্ডিত ; এবং তন্মধ্যে ভট্টনারায়ণ বেণী-সংহার নামক বীররসপ্রধান নাটকের রচয়িতা। হর্ষবর্ধন শ্রীহর্ষও যে নৈষধকার হইবেন, আশ্চর্য নহে। তিনি একজন প্রধান পণ্ডিত বলিয়া কান্যকুব্জে খ্যাতি লাভ করিয়াছিলেন! তিনি তদনন্তর গৌড়ে অবস্থিতি করিয়াছিলেন। এবং বঙ্গদেশে আসিয়া গঙ্গাসাগরসঙ্গমসন্দর্শনে গমন করিয়াছিলেন, ইহা সম্ভব। সুতরাং নৈষধ-লেখকের কয়েকটি পরিচায়ক লক্ষণ বঙ্গীয় ভরদ্বাজকুলপিতা শ্রীহর্ষে আছে।

শ্রীহর্ষ যে বঙ্গদেশের কবি, এরূপ প্রবন্ধ অনেক কাল হইতে এদেশে প্রচলিত আছে। বাঙ্গালার আদিকবি বিদ্যাপতি সংস্কৃত ভাষায় যে পুরুষ-পরীক্ষা গ্রন্থ লিখেন,[১২] তাহার বাঙ্গালা অনুবাদে লিখিত আছে, "গৌড়দেশে শ্রীহর্ষনামা এক পণ্ডিত, তিনি অতিশয় কবি ছিলেন। এক সময়ে নলচরিত্র নামে কাব্য রচনা করিয়া বিবেচনা করিলেন যে রসযুক্ত ও মনোরম এবং গুণালঙ্কারযুক্ত এই প্রকার যে কাব্য সে কবিদিগের যশের নিমিত্ত হয়। তদ্ভিন্ন যে কাব্য সে উপহাসের নিমিত্ত হয়। অপর অগ্নিতে স্বর্ণের পরীক্ষা করিবেক এবং সভার মধ্যে কবিতাবেত্তাদিগের নিকটে কাব্যের পরীক্ষা করিবে। যে কাব্য পণ্ডিতেরা গ্রহণ না করেন সে কাব্যেতে কবির কি ফল? পশ্চাৎ শ্রীহর্ষ সেই কাব্য লইয়া পণ্ডিতসমাজের উদ্দেশ্যে বারাণসী গেলেন। সেখানে গিয়া কঙ্কোক নামা পণ্ডিতকে স্বাভিপ্রায় নিবেদন করিলেন।"—মেধাবী কথা, পুরুষপরীক্ষা।

চৈতন্যচরিতামৃত পাঠে জানা যায় যে জয়দেব, বিদ্যাপতি ও চণ্ডীদাসের কবিতা পড়িতে চৈতন্যদেব ভালবাসিতেন। সুতরাং বিদ্যাপতি চৈতন্যের পূর্বে প্রাদুর্ভূত হইয়াছিলেন, এবং তিনি চারিশত বৎসরের পূর্বের লোক। অতএব শ্রীহর্ষ যে বঙ্গদেশের কবি, একথা বহুকাল হইতে প্রচলিত আছে, তাহার সন্দেহ নাই।

এক্ষণে দেখা যাউক যে শ্রীহর্ষকে আদিশূরের সমকালীন লেখক বলিলে কোন প্রকার অসঙ্গতিদোষ ঘটে কি না। বাখরগঞ্জে একখানি তাম্রফলক পাওয়া গিয়াছে, তদ্দৃষ্টে জানা যায় যে, মাধব সেন ও কেশব সেন লক্ষ্মণ সেনের পুত্র ; লক্ষ্মণ সেনের পিতা বল্লাল সেন, বল্লাল সেনের পিতা বিজয় সেন, এবং সেন-রাজবংশের আদিপুরুষ বীরসেন। মালদহের নিকটস্থ দেপাড়ায় প্রাপ্ত একখণ্ড খোদিত প্রস্তরফলক পাঠে অবগত হওয়া যায় যে, বিজয় সেনের পিতা হেমন্ত সেন, হেমন্ত সেনের পিতা সামন্ত সেন, এবং

সামন্ত সেনের পিতা বীর সেন। বঙ্গবিজয়ের অত্যল্পকাল পরে মিনহাজুদ্দিন নামক মুসলমান ইতিহাস-লেখক লিখেন যে, বঙ্গের শেষ রাজা লাক্ষ্মণেয় ভূমিষ্ঠ হইয়া পর্যন্তই রাজা এবং আশী বৎসর রাজত্ব করিয়াছিলেন। মুসলমান-দিগের কর্তৃক বঙ্গবিজয় ১২০৩ খ্রীষ্টাব্দে ঘটে। সুতরাং লাক্ষ্মণেয়ের রাজ্যারম্ভ ১২০৩ খ্রীষ্টাব্দে ঘটিয়াছিল। লাক্ষ্মণেয় যদি লক্ষ্মণ সেনের পৌত্র হন, এবং বীরসেনের অপর নাম বংশের আদি বলিয়া যদি আদিবীর বা আদিশূর হয়, তাহা হইলে লাক্ষ্মণেয়ের পূর্বে সেনবংশের আটজন রাজা হইয়াছিলেন। ইঁহাদিগের প্রত্যেকের রাজত্বকাল ভারতবর্ষ সম্পর্কীয় ভূয়োদর্শনানুরূপ গণনানুসারে গড়ে ষোল বৎসর করিয়া ধরিলে আদিশূরের রাজ্যারম্ভ ৯৯৫ খ্রীষ্টাব্দে ঘটে। সুতরাং নৈষধচরিত রচয়িত-শ্রীহর্ষ, আদিশূরের সমকালীন লোক হইলে ১০০০ খ্রীষ্টাব্দে বর্তমান ছিলেন, বলা যাইতে পারে।[১৩]

ভোজরাজকৃত সরস্বতীকণ্ঠাভরণে নৈষধ উদ্ধৃত হইয়াছে। আমরা পূর্বেই বলিয়াছি যে ভোজরাজের সময় ১০৪২ খ্রীষ্টাব্দ। সুতরাং তৎপূর্বে নৈষধচরিত হইয়াছে, জানা যাইতেছে। ইহাতে শ্রীহর্ষের প্রাদুর্ভাবকাল সম্বন্ধে আমাদিগের মতেরই সমর্থন হইতেছে।

পূর্বে আমরা লিখিয়াছি, শ্রীহর্ষের লিখিত একখানি গ্রন্থের নাম "নব-সাহসাঙ্কচরিত," অর্থাৎ নতুন সাহসাঙ্ক রাজার জীবনচরিত। চীন পর্যটক হুয়েন্থ সঙের লেখায় এক সাহসাঙ্ক রাজার উল্লেখ দেখা যায়; তিনি সপ্তম শতাব্দীতে বর্তমান ছিলেন। বোধ হয় সেই প্রাচীন সাহসাঙ্ক হইতে প্রভেদ দেখাইবার জন্য গ্রন্থকার স্বীয় গ্রন্থের নাম নবসাহসাঙ্কচরিত করিয়াছিলেন। মহেশ্বরকৃত "বিশ্বপ্রকাশ" পাঠে অবগত হওয়া যায় যে খ্রীষ্টীয় দশম শতাব্দীর মধ্য বা শেষ ভাগে সাহসাঙ্ক নামক একজন রাজা গাধিপুরে অর্থাৎ কান্যকুব্জে রাজত্ব করিয়াছিলেন। বিশ্বপ্রকাশ ১০৩৩ শকাব্দে অর্থাৎ ১১১১ খ্রীষ্টাব্দে রচিত হয়। গ্রন্থের প্রস্তাবনায় গ্রন্থকার আপনার পরিচয়সূত্রে লিখিয়াছেন যে গাধি-পুরস্থ সাহসাঙ্ক রাজার সভাবৈদ্য হইতে তিনি ছয় পুরুষ অন্তর।[১৪] যদি সাহসাঙ্ক দশম শতাব্দীর কান্যকুব্জের রাজা হন, তদীয় চরিত বঙ্গীয় শ্রীহর্ষ লিখিবেন, ইহা বিচিত্র নহে।

দুঃখের বিষয় এই যে শ্রীহর্ষ "গৌড়োর্বীশকুলপ্রশস্তি", "নবসাহসাঙ্ক-চরিত" প্রভৃতি যে সকল ঐতিহাসিক গ্রন্থ লিখিয়াছিলেন, তাহাদিগের মধ্যে কোনটিই পাওয়া যায় নাই। বোধ হয়, সর্বসাধারণে এইরূপ গ্রন্থের বিশেষ আদর করিত না। যে রাজবংশের গুণবর্ণনা এ সকল গ্রন্থে থাকিত, সেই রাজারাই আগ্রহ করিয়া গ্রন্থগুলি রাখিতেন। পরে যখন মুসলমানেরা আসিয়া

রাজ্যগুলি ধ্বংস করিয়াছে, তখন উক্ত পুস্তকগুলি নষ্ট হইয়া গিয়াছে। অনুমান হয় যে যাহাকিছু ইতিহাসগ্রন্থ আমাদিগের ছিল, এইরূপেই বিলুপ্ত হইয়াছে। যদি অনেক লোকের ঐতিহাসিক রচনার প্রতি অনুরাগ থাকিত, বা যদি কেহ মিথ্যাকল্পনাশূন্য সর্বলোকহৃদয়রঞ্জন ইতিহাস লিখিতে পারিত, তাহা হইলে ঈদৃশ দুর্দশা ঘটিত না। কিন্তু দেশীয় লোকের অননুরাগ বা উপেক্ষায় এবং বিদেশীয় বিজেতৃগণের বিদ্বেষে আমাদিগের পুরাবৃত্ত প্রায় অদৃশ্য হইয়া গিয়াছে।

চাঁদ কবি নৈষধকার শ্রীহর্ষের উল্লেখ করিয়াছেন। চারিজন প্রাচীন কবির নাম করিয়া পরে লিখিয়াছেন,

নর রূপং পচস্ম শ্রীহর্ষসারং
নলৈরায়কণ্ঠ দিলৈ হৃদ্যাহারং।

পঞ্চম, নরের প্রধান, সার কবি শ্রীহর্ষ, যিনি নলরাজার কণ্ঠে হৃদ্যহার দিয়াছেন।

চাঁদ কবি পৃথ্বিরাজের সময়ে প্রাদুর্ভূত হইয়াছিলেন। ১১৯২ খ্রীষ্টাব্দে মহম্মদ ঘোরীর সঙ্গে যুদ্ধে পৃথ্বিরাজের মৃত্যু হয়। সুতরাং চাঁদ খ্রীষ্টীয় দ্বাদশ শতাব্দীর শেষ ভাগের লোক। তিনি যে শ্রীহর্ষের উল্লেখ করিবেন, আশ্চর্য নহে।

রামদাসবাবু লিখিয়াছেন, "সুবিখ্যাত জৈন লেখক রাজশেখর ১৩৪৮ খ্রীষ্টাব্দে 'প্রবন্ধকোষ' রচনা করেন। এই গ্রন্থে তিনি লিখিয়াছেন, শ্রীহীর পুত্র শ্রীহর্ষদেব বারাণসীতে জন্মগ্রহণ করিয়া তথাকার নৃপতি গোবিন্দচন্দ্রের তনয় মহারাজ জয়ন্তচন্দ্রের আজ্ঞায় নৈষধচরিত কাব্য রচনা করিয়াছিলেন। রাজশেখর জয়ন্তচন্দ্র সম্বন্ধে অনেক বিবরণ লিপিবদ্ধ করিয়াছেন। জয়ন্তচন্দ্র, পঙ্গুল নামে বিখ্যাত এবং অনিহীল বারা পত্তনের অধীশ্বর কুমারপালের সমকালবর্তী। মুসলমান নৃপতিগণ ইঁহার বংশ এককালে ধ্বংস করিয়াছিলেন। সংস্কৃতবিদ্যাবিশারদ ডাক্তার বুলর সাহেব কহেন, এই জয়ন্তচন্দ্র কাষ্ঠকূট ক্ষত্রিয় নৃপতি এবং ইনিই জয়চন্দ্র নামে খ্যাত। জয়চন্দ্র ১১৬৮ এবং ১১৯৪ খ্রীষ্টাব্দের মধ্যে কান্যকুব্জ ও বারাণসীর অধীশ্বর ছিলেন। রাজশেখরের বিবরণ প্রামাণিক বোধ হইতেছে, কেননা, তাঁহার সহিত শ্রীহর্ষের নিজ পরিচয়ের ঐক্য আছে।"

আমাদিগের বিবেচনায় রামদাসবাবু এস্থলে ভ্রমে পতিত হইয়াছেন। আমরা পূর্বেই বলিয়াছি যে নৈষধ "সরস্বতীকণ্ঠাভরণে" উদ্ধৃত হইয়াছে, সুতরাং উহা ১০৪২ খ্রীষ্টাব্দের পূর্বে লিখিত। রাজা জয়চন্দ্র ঐ সময়ের শতাধিক বৎসর পরে প্রাদুর্ভূত হন। তিন-চারিশত বৎসর পরে যদি কেহ কল্পনা

অবলম্বন করিয়া কোন গ্রন্থকারের জীবনচরিত লিখিতে যায়, সে গ্রন্থোক্ত পরিচয়গুলি ঠিক রাখিলেই প্রামাণিক বিবরণ লিখিয়াছে, বলা যাইতে পারে না। এতৎ সম্বন্ধে অন্যরূপ প্রমাণ চাই। বিশেষতঃ রামদাস বাবু যখন শ্রীহর্ষকে আদিশূরের আহূত পঞ্চ-ব্রাহ্মণের একজন বলিয়া গণ্য করিয়াছেন, তখন তাঁহাকে জয়চন্দ্রের সমকালবর্তী কি প্রকারে বলিতে পারেন? জয়চন্দ্রের সময় ১১৬৮ খ্রীষ্টাব্দ। মুসলমানদিগের কর্তৃক বঙ্গবিজয় ১২০৩ খ্রীষ্টাব্দ। ৩৫ বৎসরের মধ্যে কি সমুদায় সেনবংশের রাজত্ব শেষ হইল? প্রামাণিক মুসলমান ইতিহাসকারদিগের মতে তখন ত বঙ্গে লাক্ষ্মণেয়ই রাজত্ব করিতেছিলেন।

আমরা পূর্বে বলিয়াছি যে নৈষধকার শ্রীহর্ষ "খণ্ডনখণ্ডখাদ্য" নামক এক-খানি গ্রন্থ রচনা করিয়াছেন। এই গ্রন্থে তিনি নৈয়ায়িক মত খণ্ডন করিয়াছেন, এবং ইহা অদ্যাপি বর্তমান আছে। ইহাতে বৃহস্পতিকৃত লোকায়ত সূত্র, বৌদ্ধদিগের মাধ্যমিক মত, এবং শঙ্করাচার্যকৃত বাদরায়ণীয় সূত্রের ভাষ্যের উল্লেখ আছে; যথা "সোঽয়ং অপূর্বঃ প্রমাণাদি সত্ত্বানভ্যুপগমাত্মা বাক্‌স্তম্ভন মন্ত্রো ভবতাভ্যুহিতো নূনং যস্য প্রভাবাৎ ভগবতা সুরগুরুণা লোকায়ত সূত্রাণি-ন প্রণীতানি তথাগতেন বা মধ্যমাগমা নোপদিষ্টা ভগবৎপাদেন চ বাদরায়ণীয়েষু সূত্রেষু ভাষ্যং ন ভাষে।"

কোন্ সময়ে লোকায়ত সূত্র লিখিত বা মাধ্যমিকমত প্রচারিত হয়, বলা যায় না। বাণকৃত হর্ষচরিতে লোকায়তিক সম্প্রদায়ের নাম দৃষ্ট হয়। বাণ খ্রীষ্টীয় সপ্তম শতাব্দীর লোক। কিন্তু, রামায়ণের অযোধ্যাকাণ্ডে ও মহাভারতের শান্তি-পর্বে লোকায়তবাদ লক্ষিত হয়। সুতরাং লোকায়ত মতের উল্লেখ দেখিয়া খণ্ডনলেখকের প্রাদুর্ভাবকাল সম্বন্ধে কোনরূপ অনুমান করা যায় না। খ্রীষ্টীয় পঞ্চম শতাব্দীর প্রারম্ভে চীনদেশীয় পর্যটক ফাহিয়েন এতদ্দেশে ছিলেন। তিনি মাধ্যমিক মতের উল্লেখ করিয়াছেন। কিন্তু ঐ মতের উৎপত্তি কোন্ সময়ে হইয়াছিল, তাহা নির্ণয় করা যায় না। অতএব ইহা হইতেও শ্রীহর্ষের কালনিরূপণচেষ্টা বিফল হইতেছে!

সুবিখ্যাত কোলব্রুক সাহেব অনুমান করেন যে শঙ্করাচার্য খ্রীষ্টীয় অষ্টম শতাব্দীর বা শেষে নবম শতাব্দীর প্রারম্ভে প্রাদুর্ভূত হন।[১৮] সুতরাং যে খণ্ডন-কার তৎকৃত ভাষ্যের উল্লেখ করিয়াছেন, তিনি পরবর্তী দশম শতাব্দীর শেষ-ভাগের একাদশ শতাব্দীর প্রারম্ভের লোক হইবেন, ইহা বিচিত্র নহে। যাহা হউক, তিনি যে নবম শতাব্দীর পূর্বের লোক নহেন, ইহা একপ্রকার প্রতিপন্ন হইতেছে!

খণ্ডনখণ্ডখাদ্যের অন্য এক স্থান লইয়া শ্রীহর্ষের প্রাদুর্ভাবকাল সম্বন্ধে আরও কিছু বলা যাইতে পারে।

তস্মাদস্মাভিরপ্যাস্মিন্নর্থে ন খলু দুস্পটা।
ত্বদ্গা থৈবান্যথাকারমক্ষরাণি কিয়ন্ত্যপি ॥

অর্থাৎ "এ নিমিত্ত কয়েকটি অক্ষরের অন্যথা করিয়া এই অর্থে তোমারই গাথা অবলম্বন করা আমার অসাধ্য নহে" এই বলিয়া খণ্ডনকার নিম্নোদ্ধৃত শ্লোকটি লিখিয়াছেন,

ব্যাঘাতো যদি শঙ্কাস্তি নচেচ্ছঙ্কা ততস্তরাং।
ব্যাঘাতাবধিরাশঙ্কাতর্ক শঙ্কাবধিঃ কুতঃ ॥

উদয়নাচার্যকৃত কুসুমাঞ্জলিকারিকায় ইহার প্রতিরূপ একটি শ্লোক দেখা যায়, যথা—

শঙ্কাচেৎ অনুমাহস্ত্যেব নচেৎ শঙ্কাততস্ততরং
ব্যাঘাতাবধিরাশঙ্কাতর্কঃ শঙ্কাবধির্মতঃ ॥

এতদ্দেশে পণ্ডিতদিগের মধ্যে অনেক শ্লোক লিপিবদ্ধ না হইয়া বহুকাল মুখে মুখে চলিয়া আইসে। সুতরাং একথা বলা যাইতে পারে না যে কুসুমাঞ্জলিকারিকার এই শ্লোকটি উদয়নের পূর্বে প্রচলিত ছিল না। যাহা হউক, যদি ইহা সম্পূর্ণরূপেই উদয়নাচার্যের রচিত হয়, তাহা হইলে এইমাত্র জানা যাইতেছে যে শ্রীহর্ষ উদয়নের পরবর্তী। কিন্তু উদয়ন কোন্ সময়ে প্রাদুর্ভূত হইয়াছিলেন, নির্ণয় করা কঠিন।

মহোদয় কাওয়েল সাহেব স্বকৃত কুসুমাঞ্জলির প্রস্তাবনায় লিখিয়াছেন যে বাচস্পতি মিশ্র শাঙ্কর ভাষ্যের "ভামতি" নাম্নী টীকা লিখেন উদয়ন বাচস্পতি মিশ্রকৃত "ন্যায়বার্তিক তাৎপর্য টীকার"[১৬] পরিশুদ্ধি জন্য "ন্যায়বার্তিক তাৎপর্য পরিশুদ্ধি" রচনা করেন, এবং মাধবাচার্য সর্বদর্শনসংগ্রহে বারংবার উদয়নের কুসুমাঞ্জলি উদ্ধৃত করিয়াছেন। শঙ্করাচার্য খ্রীষ্টীয় নবম শতাব্দীর প্রারম্ভের লোক, মাধবাচার্য চতুর্দশ শতাব্দীর প্রথমার্ধের। সুতরাং কাওয়েল সাহেব বলেন, আমরা অনেক ভ্রমের আশঙ্কা না করিয়া স্থির করিতে পারি যে বাচস্পতি মিশ্র খ্রীঃ দশম শতাব্দীতে, উদয়নাচার্য দ্বাদশ শতাব্দীতে প্রাদুর্ভূত হইয়াছিলেন। এ বিষয়ে কিছু আমাদিগের বক্তব্য আছে। প্রথমতঃ আমরা এমন কোন প্রমাণ দেখি নাই যে "কুসুমাঞ্জলি" যে উদয়নের লিখিত, "ন্যায় বার্তিক তাৎপর্য পরিশুদ্ধি"ও সেই উদয়নের রচিত। দ্বিতীয়তঃ যদি "ন্যায় বার্তিক তাৎপর্য পরিশুদ্ধি" কুসুমাঞ্জলিকার কর্তৃক বাচস্পতি মিশ্র কৃত "ন্যায়

বার্তিক তাৎপর্য টীকার” পরে লিখিত হইয়া থাকে, তাহা হইলে ইহাও অসম্ভব নহে যে উভয়ে শঙ্করাচার্যের পরে নবম ও দশম শতাব্দীতে প্রাদুর্ভূত হইয়াছিলেন। তৃতীয়তঃ আমরা কলিকাতা সংস্কৃত কলেজের পুস্তকালয়ে হস্তলিখিত গ্রন্থের মধ্যে বাচস্পতি মিশ্রকৃত “খণ্ডনোদ্ধার” নামক একখানি পুস্তক দেখিয়াছি। ইহাতে শ্রীহর্ষের খণ্ডনখণ্ডনখাদ্যের আপত্তি মীমাংসা চেষ্টা আছে। যদি এই বাচস্পতি মিশ্র “ভামতি”-কার হন, তিনি উদয়নের পরবর্তী হইবারই সম্ভাবনা ; কিন্তু তিনি “ভামতি”-কার কিনা, তাহার প্রমাণ নাই। চতুর্থতঃ মাধবাচার্য স্বকৃত “শঙ্কর দিগ্বিজয়” নামক গ্রন্থে শঙ্করাচার্য, উদয়নাচার্য ও শ্রীহর্ষকে সমসাময়িক লোক বলিয়া বর্ণনা করিয়াছেন। উক্ত গ্রন্থে লিখিত আছে যে খণ্ডনকার শ্রীহর্ষ ও তৎপরাজয়াসমর্থ উদয়ন শঙ্কর কর্তৃক পরাভূত হন ;[১৭] গ্রন্থের অপর স্থলে সুরেশ্বরাচার্যকে শঙ্কর বলিতেছেন,

বাচস্পতিত্বমধিগম্য বসুন্ধরায়াং
ভাব্য বিধাস্যাসিতমাং মমভাষ্য টীকাং।”[১৮]

অর্থাৎ “বাচস্পতিত্ব প্রাপ্ত হইয়া তুমি বসুন্ধরায় জন্মগ্রহণ করিবে এবং আমার ভাষ্যের টীকা বিধান করিবে।”

এই সকল বিবেচনা করিয়া দেখিলে বোধ হয় যে মাধবাচার্য উদয়ন ও শ্রীহর্ষকে শঙ্করের ন্যায় প্রাচীন লেখক ভাবিতেন এবং বাচস্পতি মিশ্রকে তৎপরবর্তী জ্ঞান করিতেন। পঞ্চমতঃ, যখন সরস্বতীকাণ্ঠাভরণে নৈষধ উদ্ধৃত হইয়াছে, তখন জানা যাইতেছে যে ভোজরাজের পূর্বে শ্রীহর্ষ বর্তমান ছিলেন ; সুতরাং যদি কুসুমাঞ্জলিকার শ্রীহর্ষের পূর্ববর্তী হন, তাহা হইলেএ ইরূপ অনুমান যুক্তিযুক্ত হইতেছে যে খ্রীষ্টীয় একাদশ শতাব্দীর পূর্বে উদয়াচার্য প্রাদুভূত হইয়াছিলেন। নতুবা কল্পনা অবলম্বন করিয়া, উদয়নকে দ্বাদশ শতাব্দীর লেখক বলিয়া, শ্রীহর্ষকে তৎপরবর্তী সাময়িক বলা বিবেচনাসিদ্ধ বোধ হয় না। ষষ্ঠতঃ, যদি এমন কোন অকাট্য প্রমাণই পাওয়া যায় যে উদয়াচার্য বাস্তবিক দ্বাদশ শতাব্দীতে বর্তমান ছিলেন, তাহা হইলে সরস্বতীকণ্ঠাভরণের বলে বলিতে হইবে যে শ্রীহর্ষ উদয়নের পূর্ববর্তী, আর কুসুমাঞ্জলি কারিকার যে শ্লোকের সহিত খণ্ডন খণ্ডখাদ্যোদ্ধৃত শ্লোকের সাদৃশ্য আছে, সে শ্লোক কারিকা লিখনের পূর্বে নৈয়ায়িকদিগের মধ্যে প্রচলিত ছিল।

বৈশাখ ১২৮১

১ See the Preface to Kavya Prakasa by Pandit Mahes Chandra Nyayaratna
২ See Colebrook's Miscellaneous Essays, Vol. 11. p. 462-3
৩ Ibid, p. 303

৪ হর্ষচরিত পাঠে অবগত হওয়া যায় যে হর্ষদেব যে বংশে জন্মগ্রহণ করেন, সেই বংশের আদিপুরুষ পুষ্পভূতি শৈব ছিলেন। শ্রীহর্ষের পিতা প্রভাকর বর্ধন বা প্রতাপশীল সৌর মতাবলম্বী ছিলেন। শ্রীহর্ষ ও তদীয় জ্যেষ্ঠ ভ্রাতা রাজ্যবর্ধন ভণ্ডী নামক এক ব্যক্তির নিকট দীক্ষিত হয়েন। রাজ্যশ্রী নাম্নী ভগিনীর উদ্দেশ্যে বিন্ধ্য প্রদেশে প্রবেশ করিয়া হর্ষদেব দিবাকর মিত্র নামক একজন বৌদ্ধমতাবলম্বী সন্ন্যাসীর সাক্ষাৎকার লাভ করেন। দিবাকর মিত্র প্রথমে হিন্দু ছিলেন।

৫ খ্রীঃ ৬৩৮ অব্দ।

৬ শ্লোকটি এই—দ্বীপাদন্যস্মাদপি মধ্যাদপি জলনিধের্দিশোঽপ্যন্তাৎ।
আনীয় ঝটিতি ঘটয়তি বিধিরভিমতমভিমুখীভূতঃ॥
হয়ত সভাপণ্ডিত বাণভট এই শ্লোকটি রচনা করিয়া দিয়াছিলেন।

৭ কোথায় বা সূর্যপ্রভব বংশ ও অল্প বিষয়মতি আমিই বা কোথায়। আমি মোহবশতঃ ভেলায় চড়িয়া দুস্তর সাগর পার হইতে যাইতেছি। উন্নতকায় ব্যক্তিসুলভ ফল বাসনায় বামনের ন্যায় মূঢ়তাবশতঃ কবিযশঃপ্রার্থী হইয়া আমি উপহাসাস্পদ হইব। আমি বজ্রকৃত ছিদ্রপথে মণিমধ্যে যেমন সূত্র প্রবেশ করে, তদ্রূপ পূর্ব পণ্ডিতগণ কৃত বাক্যদ্বার দিয়া আমি এই বংশে প্রবেশ করিব।

৮ পুরাতন সকলই ভাল নয়, নূতন কাব্য সকলই নিন্দনীয় নয়; সাধুগণ পরীক্ষা করিয়াই দুইটির মধ্যে একটির প্রতি ভক্তি দেখান; মূঢ়েরাই পরের বুদ্ধি দ্বারা নীত হয়।

৯ "তাম্বুলদ্বয়মাসনঞ্চ লভতে যঃ কান্যকুব্জেশ্বরাৎ। ২২শ সর্গ।

১০ শ্রীহর্ষং কবিরাজ রাজি মুকুটালঙ্কার হীরঃ সুতং
শ্রীহীরঃ সুষুবেজিতেন্দ্রিয় চয়ং মামল্লাদেবী চ যং।
গৌড়োর্বীশকুল প্রশস্তি ভণিতি ভ্রাতর্যয়ং তন্মহা
কাব্যে চারুণিনৈষধীয় চরিতে সর্গোঽগমৎ সপ্তমঃ॥

১১ সংদৃব্ধার্ণববর্ণনস্য নবমস্তস্য ব্যরং সীন্মহা
কাব্যে চারুণিনৈষধীয় চরিতে সর্গোনিসর্গোজ্জ্বলঃ। ৯ম।
দ্বাবিংশো নবসাহসাঙ্ক চরিতে চম্পূকৃতোঽয়ং মহা
কাব্যে তস্য কৃতৌনলীয় চরিতে সর্গোনিসর্গোজ্জ্বলঃ। ২২শ।
ষষ্ঠঃ খণ্ডন খণ্ডতোঽপি সহজাৎ ক্ষোদ ক্ষমেতন্মহা
কাব্যেঽয়ং ব্যগলন্নসন্য চরিতে সর্গোনিসর্গোজ্জ্বলঃ। ৬ঃ।

১২ আমরা জানি এ ভুল রামদাসবাবুর দোষে ঘটে নাই। তিনি কোন বন্ধুবাক্যে নির্ভর করিয়া এ ভ্রমে পতিত হইয়াছিলেন। বং সম্পাদক।

১৩ বাসবদত্তার প্রস্তাবনায় ডাক্তার হল্ সাহেব বিদ্যাপতি ঠাকুর কৃত পুরুষপরীক্ষান্তর্গত দানবীর বড়াহের উপাখ্যান হইতে নিম্নলিখিত সংস্কৃত শ্লোক উদ্ধৃত করিয়াছেন :—

"বিপ্রৈঃ সন্তুষ্টচিত্তৈঃ প্রমুদিত হৃদয়ৈর্বন্দিভির্লব্ধকামৈ
র্ভৃত্যৈঃ সিদ্ধাভিলাষৈর্দিগবনিপতিভির্বশ্যতামাশ্রয়দ্ভিঃ।
বিদ্বৎ সার্থৈঃ প্রহৃষ্টৈর্দিশিদিশি সুভটৈঃ কাঞ্চনাভ্যর্চ্যমানৈ
নিত্যং সংস্তূয়মান সজয়তি নৃপতির্দান বীরো বড়াহঃ॥"

বাঙলা পুরুষপরীক্ষায় এই শ্লোকের পশ্চাদুদ্ধৃত অনুবাদ দৃষ্ট হয় : —"সন্তুষ্টচিত্ত ব্রাহ্মণসমূহ এবং প্রফুল্লচিত্ত বন্দিগণ আর অভিলষিত বস্তু প্রাপ্ত দাসবর্গও স্ববশীভূত চতুর্দ্দিগন্থ মহীপাল সকল এবং ধনপ্রাপ্ত পণ্ডিতবর্গ আর উত্তম ভটগণ এই সকল মনুষ্য কর্তৃক স্তুয়মান সে দানবীর রাজা বড়াহ তিনি জয়যুক্ত হউন।

বাঙলা পুরুষপরীক্ষা শ্রীহরপ্রসাদ রায় কর্তৃক ফোর্ট উইলিয়ম কালেজের অধ্যক্ষগণের নিয়োগানুসারে প্রণীত হইয়া ১৮১৫ সালে প্রচারিত হয় (Vide p. 189 Vol XIII. Calcutta Review.)

১৪ নৈষধকার শ্রীহর্ষ যে আদিশূরের আনীত পঞ্চ ব্রাহ্মণের মধ্যে একজন, বাবু রাজেন্দ্র লাল মিত্র সেই মতের উদ্ভাবন করেন। See Babu Rajendralal's Paper on Mahendra Pala in the Journal of the Asiatic Society of Bengal.

১৫ "A Prince named Sahasanka must have occupied the throne [of Kanouj] about the middle of the 10th century as Maheswara, the author of Viswaprakasha in the year 1111, makes himself sixth in descent from the physician of that monarch." P. 463, Vol. XV. Asiatic Researches.

১৬ See Colebrooke's Essays, Vol. I. p. 332. Also Colebrooke's Preface to his translation of the Dayabhaga, উইলসন্ সাহেবেরও এই মত।

See Wilson's Preface to his Sanscrit Dictionary, P. XVII, and his Essays on the Religion of the Hindoos. Vol. I. P. 201.

১৭ "ভামতি" ও "ন্যায় বার্ত্তিক তাৎপর্য টীকা" উভয়ই সে বাচস্পতি মিশ্রের লিখিত, ইহা তৎকৃত স্বরচিত গ্রন্থের উল্লেখ দৃষ্টে জানা যায়; See Dr. Hall's Catalogue. P. 87,

১৮ ১৫শ "শঙ্কর দিগ্বিজয়", ১৫৭। শ্লো

১৯ ১৩শ "শঙ্কর দিগ্বিজয়", ৭৩। শ্লো

১০ / বিবিধ প্রসঙ্গ

বঙ্গীয় যুবক ও তিন কবি

ইস্কুল ছাড়িয়া কালেজে ঢুকিবামাত্র ইংরেজী বাঙ্গালা ও সংস্কৃত তিন ভাষার রাশি রাশি সাহিত্য বঙ্গীয় যুবকের সম্মুখে বিস্তারিত হইল। চসার, স্পেনসার, শেক্সপীয়র, মিল্টন, ড্রাইডেন, পোপ, শেলি, বায়রন, ওয়ার্ডসওয়ার্থ, টেনিসন ; কালিদাস, ভবভূতি, ভারবি, মাঘ, নৈষধ, ভট্টী, বাল্মীকি, বেদব্যাস, দেবপুরাণ, কাশীদাস, কৃত্তিবাস, ভারতচন্দ্র, মাইকেল, হেমচন্দ্র, প্রভৃতি কবি ; এডিসন, গোল্‌ডস্মিথ, স্কট, লিটন, ডিকুইন্সি, থাকারি ; দণ্ডী, বাণভট্ট, বিষ্ণুশর্মা ; হুতোম, দীনবন্ধু, বঙ্কিম ; প্রভৃতি প্রসিদ্ধ লেখকের গ্রন্থে তাঁহার প্রবেশ-অধিকার হইল। দিনকত তিনি এই অগাধ সাহিত্যকাননে যদৃচ্ছ পরিভ্রমণ করিতে লাগিলেন। কিন্তু যতই যান কাননের শেষ নাই, সকল বৃক্ষই সুমিষ্ট, সকলেই আনন্দিত। যুবকহৃদয়—সংসারের ভাবনা নাই। জগতের সৌন্দর্যমাত্র তাঁহার দৃষ্টিপথে পতিত। হৃদয়ের বৃত্তিসকল এখনও বিকৃত হয় নাই। এখনও পাকিয়া শক্ত হয় নাই। তিনি ক্রমে সকল প্রকার সাহিত্যেরই আস্বাদ গ্রহণ করিলেন কিন্তু এই অগাধ সমুদ্রমধ্যে তিনজন লোকই তাঁহার অধিকতর প্রিয় হইল। এই তিন-জনই তাঁহার চরিত্রনির্মাণে, নীতিশিক্ষাদানে তাঁহার সহায়তা করিল। ধর্ম-প্রচারকের রাশি রাশি বক্তৃতা, শিক্ষকের ভূয়োভূয়ঃ উপদেশ, পিতামাতার লালন পালন ও তাড়ন—এই সমস্ত একত্র হইয়া যাহা না করিতে পারিয়াছে, তিনজন লোক (যাহাদের সঙ্গে সাক্ষাৎ হইবার কোন উপায় নাই) সেই নীতিশিক্ষাদান-কার্য সম্পন্ন করিল। তাঁহাদের গ্রন্থাবলী পাঠ করিয়া তাঁহার মন ফিরিল, তাঁহার চিত্ত মথিত হইল, তিনি মনুষ্যের জন্য ভাবিতে, দুঃখ করিতে, সহানুভূতি করিতে শিখিলেন ; কালেজের চারি-পাঁচ বৎসরে এই তিন মহাত্মার স্পিরিট তাঁহাকে যেরূপ গড়িয়া পিটিয়া দিল, জীবনের শেষ দিন পর্যন্ত তিনি তাহাই থাকিবেন। সংসারে কত যন্ত্রণা পাইতে হইবে, কত কষ্টে পড়িতে হইবে, তাঁহার কত পরিবর্তন হইবে, কিন্তু আদত তিনি যাহা ছিলেন তাহাই থাকিবেন।

ভারতবর্ষে ইংরেজী বিদ্যাশিক্ষা আরম্ভ হইবার পূর্বে, বঙ্গসাহিত্যের বর্তমান উন্নতি হইবার আগে, রামায়ণ ও মহাভারত যুবকদিগের চরিত্র নির্মাণ করিয়া দিত। কথকের মুখ হইতে, গুরুমহাশয়ের পাঠশালা হইতে, কৃত্তিবাসের রামায়ণ হইতে, বঙ্গীয় যুবক যে উপদেশ পাইতেন তাহা তাঁহার অস্থিমজ্জায় বিঁধিয়া থাকিত। আমরণ তিনি রাম বা যুধিষ্ঠিরকে দেবতা বলিয়া মনে মনে উপাসনা করিতেন ও উঁহাদিগেরই চরিত্র অনুকরণ করিতে চেষ্টা করিতেন। বৃদ্ধ বয়সে পুত্র-পৌত্রদিগকে নিজ উপাস্য দেবতার মন্ত্রে দীক্ষিত করিয়া দিয়া যাইতেন। রামায়ণ ও মহাভারত হইতে তিনি দেবতা-ব্রাহ্মণকে ভক্তি করিতে, পিতামাতাকে শ্রদ্ধা করিতে, ভাইকে ভালবাসিতে, প্রচলিত ধর্ম যে পথে চালায় সেই পথে চলিতে শিখিতেন। ঐ দুই অগাধ সাহিত্যসমুদ্র মন্থন করিয়া আপনার কার্য-প্রণালী নিরূপণ করিতেন। আজিকার বঙ্গীয় যুবক রামায়ণ ও মহাভারত পড়েন না। যদিও পড়েন, রাম বা যুধিষ্ঠিরকে তাঁহাদের উপর সম্পূর্ণ আধিপত্য করিতে দেন না। যাঁহারা তাঁহাদের হৃদয়ে একাধিপত্য করেন তাঁহাদের নাম বায়রন, কালিদাস ও বাবু বঙ্কিমচন্দ্র। তিনজনই যুবকদিগের চিত্ত আকর্ষণে মাধ্যাকর্ষণশক্তিবিশেষ ; তাঁহাদের গ্রন্থাবলী পাঠকালে যুবকহৃদয় এমনি গলিয়া যায় যে শেষে তাঁহারা যে পথে উঁহাদিগকে লইয়া যাইবার জন্য ইচ্ছা করেন সেই পথেই উহা ধাবিত হয়।

রামায়ণ ও মহাভারত যে সময়ে লিখিত হইয়াছিল তখন পারিবারিক বন্ধন অত্যন্ত প্রবল। এইজন্য রামায়ণ ও মহাভারতের প্রধান উপদেশ সৌভ্রাত্র ও পারিবারিক প্রেম। রামায়ণ ও মহাভারতের রচনাকালে মনুষ্য দৌরাত্ম্যময় অসভ্যাবস্থা হইতে সবেমাত্র স্থির সামাজিক অবস্থায় উপস্থিত হইতেছে। সুতরাং তৎকালীন সমাজের উপর বিশ্বাস ও ভক্তি উক্ত গ্রন্থদ্বয়ের দ্বিতীয় উপদেশ, তৎসমাজের বিঘ্নকারীদিগের প্রতি বিদ্বেষভাব তৃতীয়। মনুষ্যগণের দুর্দমনীয় ইন্দ্রিয়গণের দমন করিয়া শান্তিভাব ধারণ করানোই উক্ত কাব্যরত্নদ্বয়ের মূলমন্ত্র। বাল্মীকি ও বেদব্যাস অথবা তাঁহাদের অনুবাদক কাশীদাস ও কৃত্তিবাস আপন আপন উদ্দেশ্য সাধনে এতদূর কৃতকার্য হইয়াছিলেন যে বঙ্গীয় যুবক প্রায় ৪০ বৎসর পূর্ব পর্যন্ত তাঁহাদের একান্ত ভক্ত ও নিতান্ত অনুগত ছিলেন। অসভ্যতা পশ্বাচার তাঁহার হৃদয় হইতে দূরীভূত হইয়াছিল। তাঁহারা তিন-চারি পুরুষ পর্যন্ত একান্নবর্তী থাকিতে ভালবাসিতেন। দেবতা-ব্রাহ্মণের তাঁহারা গোলাম হইয়াছিলেন, পরধর্মাবলম্বীর প্রতি তাঁহার বিদ্বেষভাব ভয়ানক প্রবল ছিল। পরধর্মের লোক তাঁহার শান্তিময় সমাজের যত কেন উপকারী হউক না, তিনি তাহাকে অন্তরের সহিত ঘৃণা করিতেন। কিন্তু পশ্বাচার ও অসভ্যতা

কমিতে কমিতে তাঁহাদের শক্তিরও হ্রাস হইয়া আসিয়াছিল। যাহা দমন করিবার জন্য বাল্মীকি বেদব্যাস হৃদয়বিদ্রাবিণী উন্মাদিনী কবিতাবলী রচনা করিয়াছিলেন, সেই পদার্থ সেই শক্তি লোপ হইয়াছিল। দৌরাত্ম্যপ্রিয় উৎপাতপ্রিয় তেজস্বী আর্য যুবক কবিতার মোহিনী বলে মেষশাবকবৎ নিরীহ হইয়াছিলেন। বঙ্গদেশের শক্তি স্বাধীনতা তেজ গিয়া উহা কারখানার একটি-একটি কলের মত হইয়াছিল। যেমন বাষ্পীয় বলপ্রভাবে সহস্র সহস্র নলী একই ভাবে সকালে ছয়টা হইতে সায়াহ্নে ছয়টা পর্যন্ত চলে, তেমনি বঙ্গীয় সহস্র সহস্র লোক জন্ম হইতে মৃত্যু পর্যন্ত একই ভাবে চলিত। চালাইত কে? কোন্ বাষ্পীয় যন্ত্রের এরূপ অসীম শক্তি? হিন্দু সমাজের দমনশক্তি। যেমন মধুর সঙ্গীতে বনের মত্তহস্তী পোষ মানিয়া চালকের বশে চলে, তেমনি বাল্মীকি ও বেদব্যাসের মনোমোহিনী বীণার বশ হইয়া দুরন্ত শূরজ-বংশীয়েরাও দমন হইয়াছিল; বাঙ্গালী ত কোন্ ছার। আদিম অবস্থার সমাজশাসনের প্রধান বিঘ্ন এই যে, মনুষ্য কেহ তাহার অধীন হইতে চাহে না এবং সকলেই যাহা খুসী তাই করিতে চায়, সমাজবন্ধন করিতে গেলে obedience প্রথম প্রয়োজন। এই জন্য যাঁহারা প্রথম সমাজবন্ধন করিয়াছিলেন তাঁহারা ঐটি শিক্ষা দিবার জন্য চেষ্টা করেন। এক পুরুষে সকল উদ্ধতস্বভাব লোককে শাসনাধীন করা যায় না, এই জন্য ১০।১৫ পুরুষ পর্যন্ত এক নিয়মে থাকিয়া সমাজমধ্যবর্তী সমস্ত লোককে বশ্যতা স্বীকার করান চাহি। রামায়ণ ও মহাভারত এই উদ্দেশ্য সাধনের জন্য নির্মিত। বহুকাল অবধিই হিন্দুরা রাম ও যুধিষ্ঠিরের চরিত্রানুকরণ করতঃ সমাজ-শাসনের অধীন হইয়াছেন। সমাজও উত্তমরূপে দৃঢ়বদ্ধ হইয়াছে। কিন্তু শুদ্ধ সমাজবন্ধনই ত মনুষ্যের উদ্দেশ্য নহে, সমাজবন্ধন পথ। এই পথে মনুষ্য সভ্যতাসোপানে আরোহণ করিবে; ক্রমে জড়জগতের উপর আধিপত্য করিবে, আপন জাতির সুখস্বাচ্ছন্দ্য বৃদ্ধি করিবে। প্রথম আপন জাতির, ক্রমে আপন দেশের, তাহার পর মনুষ্যের, তাহার পর সমস্ত জীবলোক ও জড়ের সহায়তায় দীর্ঘকাল আনন্দ অনুভব করিয়া বিনা ক্লেশে দেহ ত্যাগ করিতে পারে তাহার চেষ্টা করিবে, তবে ত সার্থক হইবে, নচেৎ বনমধ্যে পথ কাটিয়া রাখিলে তাহাতে লাভ কি?

সমাজবদ্ধ হইল কিন্তু সমাজের উদ্দেশ্য কিছু রহিল না। যেমন রাম লক্ষ্মণ ভরত শত্রুঘ্ন দেখিয়া মনুষ্য শান্ত হইল, সেইরূপ শান্ত হইয়া কি করিবে বুঝিতে পারিল না। তাহাতে এই হইল যে কতক লোক ভোগে আসক্ত হইল আর কতক এ জন্মের ভোগ ত্যাগ করতঃ পরলোকের ভোগের জন্য ব্যস্ত হইল। কতক সুন্দরী-রমণীসহবাসে বিচিত্রসুরাপানে রত হইয়া শীতে উষ্ণ

গৃহমধ্যে, গ্রীষ্মে প্রমোদকাননে নির্ঝরগৃহে, জ্যোৎস্নায় ছাদোপরি, রৌদ্রে পুষ্করিণীমধ্যে বিহার করাই জীবনের উদ্দেশ্য মনে করিল। আবার অনেকে অগ্নিকুণ্ডোপরি ঊর্ধ্বপদে অধোশিরে তপঃ করতঃ পরলোকে নন্দন কাননে ঊর্বশী-মেনকাপরিবৃত হইয়া ইন্দ্রিয়সুখে অনন্তকাল কাটানোই মনুষ্য হওয়ার মুখ ভাবিলেন। কেহ দানে স্বর্গ, কেহ স্নানে স্বর্গ মনে করিলেন। ইন্দ্রিয়সুখই সকলের উদ্দেশ্য হইল—কাহারও ইহলোকে, কাহারও পরলোকে। কেহই এ কথা বুঝাইয়া দিল না যে, মনুষ্যসমাজের প্রধান উদ্দেশ্য জড়জগতের উপর মনুষ্যজাতীয় আধিপত্য বিস্তার, তুমি আমি এমন কি আমার সমসাময়িক যে কোন ব্যক্তি হউন, সমাজ ছাড়িয়া ধরিলে কেহ কিছুই নহেন। যেমন আমরা আমাদের এক পুরুষ আগেকার লোকে যাহা রাখিয়া গিয়াছেন তাহা ভোগ করিতেছি, এইরূপ আমাদের পরে যাহারা আসিবে তাহাদের জন্য আমাদের পূর্বাপেক্ষা কিছু বেশী রাখিয়া যাওয়া অর্থাৎ জড়জগতে কিছু আধিপত্য বিস্তার করিয়া যাওয়া কর্তব্য। মনুষ্যসমাজ বৃক্ষের পত্র। যেমন পত্র আকাশস্থ বায়ু আকর্ষণ করিয়া বৃক্ষের আয়তন বৃদ্ধি করে, পরে আপনার সময় আসিলে পড়িয়া যায় এবং পরবর্তী পত্রসকল যাহাতে একটু উচ্চ ও পুষ্ট হয় তাহা করিয়া যায় সেইরূপ মনুষ্যসমাজ বিস্তার করিয়া সমাজপরিবর্ত ও সমাজসংস্কার করিয়া নূতন আবিষ্ক্রিয়া করিয়া দেহত্যাগ করে। তাহাদের সন্তানেরা এই সকলের ফল ভোগ করতঃ আরও অধিকতর ক্ষমতা প্রকাশ করে।

এ কথা আমাদের পূর্বপুরুষদিগকে কেহ বুঝাইয়া দেন নাই, সুতরাং সেই শান্তভাবে, সেই রামায়ণ ও মহাভারতের উদ্দেশ্য সাধন হইয়া গিয়াছিল। কিন্তু উহাদের পরিবর্তে গ্রহণ করা যায় এমন কোন গ্রন্থ হয় নাই, এইজন্য উহারাই জাতীয় কাব্য বলিয়া পরিগণিত ছিল।

চল্লিশ বৎসর পূর্বে যখন ইংরেজী বিদ্যার চর্চা আরম্ভ হইল, তখন অবধি রামায়ণ ও মহাভারতের নীতিশিক্ষা সেকেলে বলিয়া পরিত্যক্ত। সমালোচকেরা বাল্মীকির অদ্বিতীয় কবিত্বশক্তির প্রশংসা করুন, প্রত্নতত্ত্ববিদেরা রামায়ণ হইতে তৎসাময়িক বৃত্তান্ত রচনা করুন, রামায়ণ পাঠ করিয়া শত শত লোক আনন্দ-সাগরে মগ্ন হউক, কিন্তু রামের চরিত্র আর কেহ অনুকরণ করিতে যাইবে না। যুধিষ্ঠিরের ত কথাই নাই। পূর্বে লোকে রামায়ণ ও মহাভারত হইতে যে শিক্ষা পাইত এখন শিক্ষিত যুবকগণ কতক পরজাতীয় দৃষ্টান্ত দেখিয়া, কতক ইতিহাস পড়িয়া, কতক নানা পুস্তক ও ঘটনাবলী পর্যালোচনা করিয়া সেই শিক্ষা লাভ করেন। সুতরাং এরূপ সভ্য অবস্থায় একজন লোকের বা একখানি পুস্তকের যুবকচরিত্রনির্মাণে সর্বতোমুখী প্রভুতা হইতে পারে না। তথাপি কোমলহৃদয়

যুবকের মনে যে পুস্তক ভাল লাগে তাহা হইতেই তিনি কিছু না কিছু ভাল জিনিস চিরকাল মনে করিয়া রাখেন। যে কিছু জিনিস চিরকাল মনে থাকে তাহা অনেক সময় কার্যে প্রকাশ পায়, তাহাই তাঁহার চরিত্রনির্মাণে সহায়তা করে।

বঙ্গীয় যুবক সে সমস্ত রাশি রাশি গ্রন্থ পাঠ করেন তাহার মধ্যে শেক্সপীয়র সর্বপ্রধান। কিন্তু বোধ হয় তাঁহার চরিত্রনির্মাণে শেক্সপীয়রের কোন হাত নাই। কারণ শেক্সপীয়রের উদ্দেশ্য কেবল "to please"; তাঁহার সৎলোকও যেমন সুন্দর, অসৎও তেমনি সুন্দর। এই দুই প্রকার চরিত্র পাঠ করিয়া যে সকল ভাবের উদয় হয় তাহা পরস্পরকে কেন্‌সেল (cancel) করিয়া দেয়। মিল্টনে puritanic spirit এত অধিক যে উহা কোন কালে লোকে অনুকরণ করিতে সাহস করিবে না। অনেকে বরং শয়তান হইতে চাহিবে ত যীশুখ্রীষ্ট বা সামসন হইতে চাহিবে না। ড্রাইডেন ও পোপে অনুকরণীয় কিছু নাই। Essay on Criticism প্রভৃতি পুস্তক হইতে যে জ্ঞান লাভ করা যায় তাহা উপদেশ মাত্র। স্কুল মাষ্টারের উপদেশ যেমন এক কান দিয়ে ঢুকে ও ওকান দিয়া বাহির হইয়া যায় ঠিক সেইরূপ। চসার ও স্পেন্সারের বানান এত উল্টা রকম যে কাহারো সাহস হয় না যে পড়ে, যদিও কেহ পড়ে ত চসারের সেকেলে গল্প একেলে লোকের ভালই লাগে না। যাহারা বৃদ্ধ তাহাদের বরং ভাল লাগিতে পারে, যুবকের কখনই ভাল লাগিবে না। স্পেন্‌সারের যে Ideal, তাহাও ইউরোপের অজ্ঞানতিমিরাচ্ছন্ন মধ্যসময়ের, এখনকার লোকে তাহা ভালবাসে না। বিশেষ রূপকের দ্বারা যে শিক্ষালাভ হয় সে শিক্ষা সভ্যসময়ের নয়। শেলি চমৎকার কিন্তু শেলির লেখা এত জটিল ও উঁহার লেখার idealism এত উচ্চ যে তাহা অনুকরণের অতীত। টেনিসনের উদ্দেশ্য পুরান জিনিস ভাল করিয়া দেখানো, সুতরাং তাহাতে চরিত্র-নির্মাণের সহায়তা করে না। ওয়ার্ডস্‌ওয়ার্থ ভালই হোক আর মন্দই হোক, নিঙ্গড়িয়া তিত করিয়া দেন। এই ফুল যদি তিনি ধরিলেন ত তাহার প্রতি পাপড়ির বর্ণনা হবে, তার কেশরের বর্ণনা হবে, তাহার রেণুর বর্ণনা হবে, তবে ছাড়িবেন। বাকী বায়রন, তিনি পীড়িতের বন্ধু, পীড়কের শত্রু, প্রণয়ের আধার, যৌবন মূর্তিমান্, মহা তেজস্বী, সর্বদা চঞ্চল, আলস্যের জনসমাজের অত্যাচারে একান্ত চটা। যৌবনের মন আকর্ষণে যা কিছু চাই, বায়রনের সব আছে। সুতরাং ইংরেজী সাহিত্যে এক বায়রনই বঙ্গীয় যুবকের চরিত্রনির্মাণে অংশী।

সংস্কৃত কাব্যের মধ্যে রামায়ণ মহাভারত ত সেকেলে। বেদপুরাণের চর্চা নাই;

থাকিলেও এখন আর কেহ গর্গ বিশ্বামিত্র অগস্ত্য হইতে চাহিবে না। এ এক-প্রকার ঠিক। সে সমাজ নাই, সে কালও নাই। কালেজের ছাত্র দূরে থাক্, ভট্টাচার্যদিগের টোলের ছাত্রেরা আর বশিষ্ঠ বিশ্বামিত্র বেদব্যাস হইতে চাহে না। ভারবির অর্জ্জুন, মাঘের কৃষ্ণ, নৈষধের নল, বাণভট্টের তারাপীড় শ্রীহর্ষ সব সেকেলে, একটিও আমাদের মনের মত নয়। ভারবি মাঘ নৈষধ প্রভৃতি গ্রন্থের বর্ণনাপ্রণালী সমালোচকেরা ভাল বলিতে পারেন, স্থানে স্থানে ভালও আছে, কিন্তু সব সেকেলে। আমরা ক্ষুদ্রবুদ্ধি, উহাদের রস বোধ করিয়া উঠিতে পারি না। করিতে পারিলেও আমাদের চরিত্র পরিবর্তন বা শোধন ভারবি পড়িয়া হয় না। বঙ্গীয় যুবক ভবভূতিকে ভালবাসেন। ভবভূতি তাঁহাদের ভালও লাগে, উহা তাঁহার চরিত্রেও কতক প্রকাশ পায়, কিন্তু তাহা নিতান্ত অল্প বিষয়ে, কাজেই এ স্থলে গৃহীত হইল না। দশকুমারচরিতের মধ্যে অপহারবর্মার চরিত্র সুন্দর, বড় চমৎকার, কিন্তু তিনি চোর ডাকাত ইত্যাদি। যদি অপহারবর্মার চরিত্র হইতে বঙ্গীয় যুবক নিজে কিছু লইয়া থাকেন তাহা তিনি মানের খাতিরে লুকাইয়া রাখিবেন, কখন প্রকাশ করিবেন না। বাকী কালিদাস, কালিদাসের লেখা এমনি মধুর যে পড়িবামাত্র মন আকৃষ্ট হয়। তার পর কালিদাসের অনেকগুলি পাত্র (character) লোকে এত ভালবাসে যে খানিকটা সেইরকম হইয়া যায়। সুতরাং আমাদের যুবকগণের উপর কালিদাসের ক্ষমতাও অনেক অধিক।

বাঙ্গালা সাহিত্যের অনেক গ্রন্থকারেরই কিছু কিছু অংশ আমরা পাইয়া থাকি। তন্মধ্যে সর্বপ্রধান বঙ্কিমবাবু। বঙ্কিমবাবুর পুস্তকাবলী এত লোকে পাঠ করে ও এত আদরের সহিত পাঠ করে যে তাঁহার সকল পুস্তক হইতেই কিছু না কিছু লোকের অস্থিমজ্জায় প্রবেশ করে। লোকে দীনবন্ধুর ইয়ারকি মুখস্থ করে, হুতুমের গানগুলি কণ্ঠস্থ করে, মাইকেলের কতক কতক অনুকরণ করে। কিন্তু অধিকাংশ আজগবি কথা লইয়া ভিরকুটি করে। হেমচন্দ্রের ভারতসঙ্গীত সকলের কণ্ঠস্থ আছে—বৃত্রসংহারপাঠে চরিত্রপরিবর্তন কতদূর হইবে আজি জানিবার উপায় নাই। ভারতচন্দ্রের অনুকরণ দূরে থাকুক, এক্ষণে অনেকে লজ্জায় তাহা পড়িতেই পারে না। আরও অনেক গ্রন্থকার আছেন, কিন্তু তাঁহাদের ক্ষমতা অতি সামান্য।

এখন দেখিতে হইবে, এই তিনজন কবির কে কতদূর ও কিরূপ শিক্ষা দিয়া থাকেন। আমরা গ্রন্থকারদিগের দোষগুণ পর্যালোচনা করিতেছি না, কেবল শিক্ষিত যুবকদিগের চরিত্রনির্মাণে ইঁহারা কে কি প্রকার ও কি পরিমাণে মাল

মসলা দিয়া থাকেন তাহাই দেখিব। ইঁহারা একজন ইংলণ্ডের, একজন মালবের, আর একজন বঙ্গের। এই তিনজনের মধ্যে একজন ফরাসী বিপ্লবের সময় শিক্ষিত, একজন হিন্দুদিগের গৌরবসময়ের ব্যক্তি, আর একজন ভারতবর্ষে ইংরেজ রাজ্যকালীন ইংরেজীরূপে শিক্ষিত। একজন সমাজ ভাঙ্গিতে, সমাজের অত্যাচারী নিয়মাবলী পরিবর্তন করিতে শিক্ষা দেন, সমাজ ছাড়িয়া গেলে কিরূপ সুখ হয় তাহাই দেখান। একজন সমাজে থাকিয়া কতদূর সুখ ভোগ করা যাইতে পারে তাহাই দেখান, আর-একজন সমাজের সহায়তা ও উহার বিরোধে কিরূপ আনন্দ অনুভব করা যায় দেখাইয়া শেষ করেন।

তিনজনই প্রণয়ের কবি, প্রণয়গত অবশ্য তারতম্য আছে, তাহা আমাদের এখানে বলার প্রয়োজন নাই। তিনজনই স্বভাবের সৌন্দর্য অনুভব করিতে শিক্ষা দেন। তিনজনই নিজে স্বভাবের সৌন্দর্যে মুগ্ধ এবং তিনজনেই লোককে আপন আপন মুগ্ধতায় অংশী করিতে পারেন। বাঙ্গালায় পর্বত নাই, পাহাড় নাই, কেবল এক হরিদ্বর্ণ শস্যপূর্ণ ক্ষেত্র আর মাঝে মাঝে বিশালনিতম্বা স্রোতস্বিনী আর নির্মেঘ ও সমেঘ আকাশ। হঠাৎ মনে হইতে পারে বাঙ্গালায় স্বভাবসৌন্দর্য নাই, কিন্তু বঙ্কিমবাবুর প্রতিছত্রে বাঙ্গালার সেই সৌন্দর্য প্রকটিত। বাঙ্গালার সৌন্দর্য তিনিই সর্বপ্রথম কবির চক্ষে দেখিয়াছেন ও আমাদের সৌভাগ্য ছিল বলিয়া আমরাও তাঁহার হৃদয়দর্পণে প্রতিফলিত সেই অপূর্ব সৌন্দর্য আরও সুন্দর বলিয়া দেখিতে পাইয়াছি। সেকালে স্বভাবের শোভানুভবের নাম দেবতার আরাধনা ছিল। প্রসন্ন পুণ্যসলিলা গঙ্গা দেবতা, আকাশ ঋষি পূর্ণ, চন্দ্র দেবতা, সূর্য দেবতা ; বঙ্কিমবাবু দেবতাদিগকে অন্তরিত করিয়া শুদ্ধ সৌন্দর্য মাত্র দেখাইয়াছেন ও দেখিতে বলিয়াছেন। বাঙ্গালার যে কিছু সৌন্দর্য তাহার প্রায় কিছুই বঙ্কিমবাবু দেখাইতে ছাড়েন নাই। হীরার বাড়ির দেয়ালে পাখি আঁকা হইতে সূর্যমুখীর বিচিত্র চিত্রবর্ধিত গৃহ পর্যন্ত সবই দেখাইয়াছেন। তাঁহার চিত্রে অপরিষ্কার কিছুই নাই। সব পরিষ্কার ঝরঝরে।

কালিদাসের বর্ণনা ভারতময়। সিংহলদ্বীপ হইতে আরম্ভ করিয়া কৈলাস পর্বত পর্যন্ত সব কালিদাস বর্ণনা করিয়াছেন। তাঁহার বর্ণনা শুদ্ধ পরিষ্কার নয়, বড় উজ্জ্বল ও চাকচিক্যময়, যেন ইলেকট্রিক আলোকে (electric light) প্রতিফলিত। স্বাভাবিক সৌন্দর্যে ভারতবর্ষ জগতের অনুকৃতি, আর কালিদাস এই সমস্ত ঘুঁটিয়া ফেলিয়াছেন। তন্ন তন্ন করিয়া দেখান তাঁহার কর্ম নয় সেজন্য ওয়ার্ডসওয়ার্থ চাই। তাঁহার দেখানো বাছিয়া বাছিয়া, ভাল ভাল বস্তুগুলি। তাঁহার বর্ণনায় শুদ্ধ সৌন্দর্য নয়, কিছু না কিছু অলৌকিক উহার সঙ্গে মিশ্রিত আছে। যথা রামের পুষ্পক রথ, মেঘের দৌত্য। তাঁহার ঋতুসংহারে স্বভাবের

বিশুদ্ধ সৌন্দর্য অতি উজ্জ্বল বর্ণে চিত্রিত আছে। এখানকার বর্ণনায় অলৌকিকতা নাই এবং পরিষ্কার অপরিষ্কার জ্ঞানও বড় বেশী নাই। কিন্তু বর্ণনীয় বস্তু পরিষ্কারই হউক আর অপরিষ্কারই হউক, বর্ণনায় হৃদয়গ্রাহিতা সমানই আছে।

বায়রনের বর্ণনীয় ইউরোপ। সমস্ত ইউরোপে যা কিছু বর্ণনযোগ্য—আল্পসের চূড়া, রাইনের বিশাল জলপ্রবাহ, গ্রীসের দ্বীপমালা, মাইকেল এঞ্জেলোর চিত্র, ভিনিস ও রোমের ভগ্নাবশেষ—শিল্পে ও স্বভাবে যে কিছু মহান ও মনোহর সকলই তাঁহার গ্রন্থমধ্যে স্থান পাইয়াছে। তাঁহার বর্ণনামধ্যে এক জিনিস আছে যাহা আর প্রায় কাহারো নাই। ঐতিহাসিক দৃশ্য বর্ণনে বায়রনের অসাধারণ ক্ষমতা, ওয়াটারলুর যুদ্ধ, ব্রুসের নিবাসস্থান, বল্ডেরের গির্জা বর্ণনায় বায়রন তাঁহার বিশাল হৃদয়ের পূর্ণ প্রতিকৃতি প্রদান করিয়াছেন। এই সকল বর্ণনার পর তাঁহার উপদেশগুলি যুবকমণ্ডলীর অন্তঃকরণে এরূপ অঙ্কিত হয় যে তাহা আর অপনীত হইবার নহে।

পাঠক জিজ্ঞাসা করিতে পারেন যে, যুবকদিগের চরিত্রনির্মাণের কথায় স্বভাবের বর্ণনা আসিল কেন? এ ধান ভানিতে শিবের গীত কেন? তাহার উত্তর এই, স্বভাববর্ণনায়ও নীতিশিক্ষা আছে, আর সেটি দেখানোও বড় সহজ। এই জন্য আগে স্বভাবের শোভা বর্ণিত দেখিয়া কি শিক্ষা পাই দেখাই, তাহার পর অন্যপ্রকার শিক্ষা যথাশক্তি দেখাইতে চেষ্টা করিব।

প্রথম কালিদাসের বর্ণনায় সব শান্তিময় সব সুখময়, পড়িলে মনে শান্তিময় ভাব জন্মে। যখন ভট্টাচার্য মহাশয়েরা, পাদরি সাহেবেরা ও ব্রাহ্ম মিশনরিগণ দিনরাত জগৎ দুঃখময় পাপের ভরে ডুবলো ডুবলো বলিতেছেন, তখন ওরূপ পুস্তক পড়িলে বাস্তবিকই জগৎ দুঃখময় নহে বলিয়া বোধ হয়। এ বড় সামান্য শিক্ষা নহে। বঙ্কিমবাবুর স্বভাববর্ণনায় শুদ্ধ শান্তি নয়, তাহার উপর যেন একটু কিছু আছে, যেন যে আনন্দ যৌবনের বড় প্রিয় সেইরূপ আনন্দ যেন বেশী আছে। বায়রনের বর্ণনায় শান্তি নাই, কেবল পরিবর্তন হইতেছে—অসংখ্য পরিবর্তন, এটা ছেড়ে ওটা, ওটা ছেড়ে সেটা, যেন তৃপ্তি হইতেছে না। যেন একটু চটা-চটা ভাব উদয় হইতেছে, যেন যাহার অন্বেষণে স্বভাবের শোভা দেখিতে আসিয়াছি, সে সুখটুকু পাইতেছি না, কেবল কৌতূহলতৃষ্ণায় কাতর হইয়া যাহা কিছু সুন্দর দেখিতেছি দেখিতে যাইতেছি, দেখিতেছি, তৃপ্তি হইতেছে, কিন্তু সে তৃপ্তি বেশীক্ষণ থাকিতেছে না।

সংক্ষেপে তিনজনের বর্ণনায় তিনরূপ উদ্দেশ্য আর-এক প্রকারে দেখানো যায়। কালিদাস উপরে বসিয়া বিশুদ্ধ আনন্দের সহিত নীচেকার শোভা

দেখিতেছেন আর দেখাইতেছেন। নিজে মনুষ্যের উপর উঠিয়া বসিয়া মনুষ্যের কার্য আচার ব্যবহার নৃত্যগীত দেখিতেছেন। পাহাড় পর্বত কেমন ছোট ছোট দেখাইতেছে, নদীটি একছড়া হারের মত কেমন পড়িয়া আছে তাই দেখিতেছেন আর কাছে কোন ভালবাসার জিনিস আছে তাহাকে দেখাইতেছেন। যেন সাঙ্খ্যমতে পুরুষ নির্লিপ্ত বসিয়া প্রকৃতির রঙ্গ দেখিতেছেন। কালিদাস বলিতেছেন, আগে মানুষের চেয়ে উচ্চ জীব হও, তাহার পর স্বভাবের শোভা দেখিও, কত আনন্দ পাইবে। তাঁহার আশা বড় উচ্চ। বঙ্কিমবাবুর স্বভাব-শোভার কেন্দ্র মনুষ্য, নগেন্দ্রনাথই হউন, আর অমরনাথই হউন, আর গোবিন্দ-লালই হউন বা স্বয়ং বঙ্কিমবাবুই হউন, তাঁহারও নির্লিপ্ত দেখা, স্বভাবশোভা-মধ্যে বসিয়া স্বভাবের শোভা দেখ আর কাছে যদি কেহ থাকে দেখাও কেমন সুন্দর কেমন গভীর। পৃথিবী ও আকাশ দেখিয়া ঈশ্বরের প্রেমে শরীর পুলকিত হউক। বায়রনের তা নয়। স্বভাবের শোভা দেখিতে চাও ঘরদোর ছাড়িয়া বাহির হও, যা তোমার সম্মুখে পড়িবে তাই দেখিয়া বসিয়া থাকিবে? তা নয়। চল যেখানে সুন্দর বস্তু সেইখানে যাইতে হইবে। তুমি নির্লিপ্ত থাকিলে সব দেখিতে পাইবে কেন? ঘরে বসিয়া দুনিয়ার কারচুপি দেখিয়া শান্তিসুখ ভোগ করিবে কেন? মনুষ্যের জীবন অল্প, ইহাতে সব দেখিয়া শুনিয়া লও, যত দেখিবে ততই জ্ঞান বাড়িবে, আনন্দ অধিক হইবে, এই আনন্দই আনন্দ, আর সব কেবল দুঃখ আর অত্যাচার, সমাজ অত্যাচার, প্রণয় অত্যাচার, মানুষ মানুষের উপর অত্যাচার করিতে ভালবাসে। সবই কষ্ট, কেবল স্বভাবের আনন্দই পরমানন্দ।

একজন উপর হইতে স্বভাব দেখিতেছেন। একজন মধ্য হইতে দেখিতেছেন আর একজন মাতিয়া বেড়াইতেছেন। একজনের মতে মনুষ্যজীবন অপেক্ষা অন্য জীবনে সুখ অধিক। আর-একজনের মতে এ জগতেও যথেষ্ট আনন্দ। তৃতীয়ের সবই এই জগতে।

বায়রনের জন্ম ১৯ শতাব্দীর প্রজাবিপ্লবে। সুতরাং বর্তমান সমাজের উপর তাঁহার শ্রদ্ধা নাই। তাঁহার দৃঢ় বিশ্বাস এই যে বর্তমান সমাজে অত্যাচার ভিন্ন আর কিছুই নাই। তাঁহার উৎকৃষ্ট মনুষ্যচিত্রগুলি সমাজের বাহিরে। সেগুলি সকলেই সমাজের উপর চটা। কেহ কেহ আবার সমাজের শত্রু; হয় দস্যু না হয় মনুষ্যবিদ্বেষী (misanthrope) সমাজের যতগুলি নিয়ম আছে সব-গুলিই তাঁহার চক্ষুঃশূল। কনরাড, লারা, ডনজুয়ান প্রভৃতি পাত্রগণের বাক্যেও অপার্থে এই সমাজবিদ্বেষভাব প্রতি মুহূর্তে প্রকাশিত হইতেছে।

কালিদাসের সমাজ মনুর সময় হইতে একভাবে চলিয়া আসিতেছে। চুলমাত্র ব্যতিক্রম হয় নাই। তাঁহার মত এই—এরূপ সমাজে সকলই সুখ।

বঙ্কিমবাবুর সমাজ শিক্ষিত বঙ্গীয় যুবকদিগের সমাজ। তিনি দেখাইয়াছেন—সমাজের বিরোধী কাজ করিয়া কেহ সুখী হইতে পারেন না। এবং করিলেই শেষ আত্মদুষ্কৃতের জন্য সকলকেই অনুতাপ করিতে হয়। নগেন্দ্রনাথের অবৈধ প্রণয়ের ফল তাঁহার ঘোর আধ্যাত্মিক বিকার; শৈবলিনীর অবৈধ অনুরাগের ফল পর্বতগুহায় ঘোর প্রায়শ্চিত্ত। গোবিন্দলালের ও রোহিণীর যেরূপ অন্ত হইল তাহাতেও ঐ কথা দৃঢ়তররূপে প্রতিপন্ন করিতেছে।

বায়রনেরও একটি মানুষ সুখী নহে, তাহাদের মধ্যে মধ্যে অলৌকিক অতিমানুষিক হৃদয়প্রমাদক আনন্দ আছে বটে, কিন্তু দুঃখই সকলের স্বভাবসিদ্ধ। কিন্তু তাহারা ঠিক জানে যে যতদিন বর্তমান সমাজ এইভাবে চলিবে তাহাদের দুঃখের অবসান হইবে না। সুতরাং তাহারা অনুতাপ করিয়া ফিরিয়া আসিতে চাহে না। তাহাদের আমোদ সমাজের উপর অত্যাচারে। কেহ দিবারাত্র লুঠ পাঠ করিতেছে, কেহ নির্জন কারাগৃহমধ্যে উচ্চ রোদন করিয়া সমাজধ্বংসের জন্য শাপ দিতেছে, কেহ সামাজিক নিয়ম লঙ্ঘনের জন্য দিনরাত্রি ফিরিতেছে। তাহারা দুঃখী বটে কিন্তু দুঃখে কাতর নহে, তাহাদের দুঃখের কারণ মনুষ্যসমাজ, সুতরাং মনুষ্যসমাজ ও যাহারা সেই সমাজ চালায় তাহাদের উপর দাদ তোলা চাই। বায়রনের মানুষ মনুষ্যসমাজের উপর চটা। কিন্তু মনুষ্যের প্রতি, দুর্বলের প্রতি, স্ত্রীলোকের প্রতি, তাহাদের সহানুভূতি বিলক্ষণ আছে। তাহারা মানুষ ভালবাসিতে চায় কিন্তু সমাজের অত্যাচারী নিয়ম আপনার মনের মত করিয়া ভালবাসিতে দেয় না; সুখে তাহারা ঘোর চটা। কালিদাসের মানুষ মানুষ হইতে কিছু উচ্চ। সব দেবতার অংশ, কেহ দেবতার অবতার, কেহ দেবতা স্বয়ং, কেহ অপ্সরা, কেহ অপ্সরার কন্যা, কেহ ঋষি, কেহ রাজা! ঋষি ও রাজা মানুষ, কিন্তু বায়রনের মানুষ অপেক্ষা তাহাদের অতিমানুষিক ক্ষমতা অধিক। এই স্বর্গে যাইতেছে, মুহূর্তে প্রত্যাবৃত্ত হইতেছে, সমস্ত পৃথিবী মুহূর্তে পরিভ্রমণ করিতেছে, দেবতার সঙ্গে যুদ্ধবিগ্রহ করিতেছে, অপ্সরার সহিত প্রণয়পাশে আবদ্ধ হইতেছে। কিন্তু সকলেই সেই মনুপ্রণীত সমাজের নিয়ম যত্নপূর্বক প্রতিপালন করিতেছে। মানুষের অসীম ক্ষমতা, কিন্তু যথেষ্টাচার নাই।

জ্ঞানে মৌনং ক্ষমা শক্তৌ, ত্যাগে শ্লাঘা বিপর্যয়ঃ। এই শ্লোকে তাঁহাদের চরিত্রের কতকটা আদর্শ পাওয়া যায়। তাঁহাদের যেমন ক্ষমতার পার নাই মনের জোরও তেমনিই অধিক। সেই ক্ষমতা তাঁহারা সৎপথে চালাইতে জানেন,

সুতরাং তাঁহাদের জীবনে কষ্ট নাই দুঃখ নাই। ইচ্ছার স্বাধীনতা নাই, যেমন স্বভাবের নিয়ম অলঙ্ঘনীয় তেমনি তাঁহাদের মতে সমাজের নিয়মও অলঙ্ঘনীয়। লঙ্ঘনের চেষ্টাও নাই, পীড়াও নাই, অনুতাপও নাই।

বঙ্কিমবাবুর লোক সব সমাজের লোক, শিক্ষিত বঙ্গীয় যুবক। শিক্ষিত যুবকের জীবন কেবল অনন্ত বিবাদসঙ্কুল। তিনি দুই প্রকার শিক্ষা পান। একপ্রকার বাড়িতে, আর একপ্রকার স্কুলে। উভয় প্রকার শিক্ষা সময়ে সময়ে পরস্পর বিলক্ষণ বিরোধী। এইজন্য শিক্ষিত যুবকের চরিত্রে সময়ে সময়ে বিলক্ষণ অসামঞ্জস্য দেখিতে পাওয়া যায়। বঙ্কিমবাবুর পাত্রগুলিতেও এই বিরোধী ভাব কতক কতক প্রকটিত আছে কিন্তু সম্পূর্ণ নহে। যেখানে আছে সেখানে অতি মনোহর। বঙ্কিমবাবুর মানুষগুলি দেশী বাঙ্গালী, নিরীহ ভাল মানুষ। বাঙ্গালীরা যে স্বভাব ভালবাসে তাহারা সকলেই ঠিক সেই স্বভাবের লোক। বুদ্ধিমান চতুর দয়ালু সামাজিক ও গুণগ্রাহী, তাঁহাদের হৃদয়ের ভাব গভীর। এরূপ লোকের হৃদয়বৃত্তির সূক্ষ্মানুসূক্ষ্ম সন্ধান অত্যন্ত প্রীতিপ্রদ, তাহা হইতে আমাদের অনেক জ্ঞান লাভ হয়। বঙ্কিমবাবু ইহাদিগের সেইরূপে দেখাইয়াছেন।

রামায়ণ-মহাভারতাদি প্রাচীন পুস্তকাবলীর প্রথম শিক্ষা এই যে পিতা-মাতার বশ হইবে, ভাইকে স্নেহ করিবে, জ্ঞাতিদিগের সহিত সদ্ব্যবহার করিবে, কিন্তু আমাদের হৃদয়ক্ষেত্রে যে কবিত্রয় আধিপত্য করেন তাঁহাদের পিতামাতার সঙ্গে খোঁজ নাই। বঙ্কিমবাবু একবার গোবিন্দলালের মাকে বাহির করিলেন, কিন্তু পাছে কোনরূপ গোল ঘটে, চটপট উদ্যোগ করিয়া তাঁহাকে কাশী পাঠাইয়া দিলেন। বঙ্কিমবাবুর কোন নায়ক বা নায়িকার ভাই নাই। দুই-একটি ভগিনী আছে। গোবিন্দলালের পিতৃব্যপুত্র হরলাল সেও কলিকাতায় থাকে। বায়রনেরও বাপ মা ভাইএর সঙ্গে বড় সম্পর্ক নাই। ডনজুয়ানের মুখে ডপাইনেজের নামও শুনিতে পাওয়া যায় না। আজো পারিসিনার কথার উল্লেখই আর প্রয়োজন নাই। কালিদাসের পুস্তকেও পিতামাতা বড়ই অল্প কিন্তু অপর-দ্বয়ের ন্যায় লোপাপত্তি নাই। অনেকে অন্যান্য বিষয়ের মধ্যে মধ্যে দুই একবার বিশুদ্ধ সৌভ্রাত্র পিতৃভক্তি প্রভৃতিও দেখিতে পাওয়া যায়, কিন্তু বড় অল্প।

এই সকল পারিবারিক অনুরাগের পরিবর্তে আমাদের কবিরা প্রতিনিধি দেন দাম্পত্য প্রণয়। দাম্পত্যই বা কেন বলি ? বায়রন ত দাম্পত্যের কোন ধারই ধারেন না। শুধু প্রণয় বলি। সুতরাং বায়রনে পারিবারিক অনুরাগের কিছুই নাই। বঙ্কিমবাবুর পুস্তকে পারিবারিক অনুরাগের মধ্যে শুদ্ধ দাম্পত্য প্রণয় আছে। অন্যান্য অনুরাগের পরিবর্তে বঙ্কিমবাবুর স্বদেশানুরাগ, বায়রনের

মানবজাতির প্রতি অনুরাগ, একজন অত্যাচারপীড়িত স্বদেশের জন্য কাঁদিতে শিখাইয়াছেন আর একজন অত্যাচারপীড়িত মনুষ্যজাতির উদ্ধারের জন্য অস্ত্র ধারণ করিতে শিখাইয়াছেন। যাহার ক্ষমতাবলে অত্যাচারের হস্ত হইতে মুক্তি পায় তাহাদিগকে বাহবা দিতে শিখাইয়াছেন।

কালিদাসের সমাজ ঠিক মনু হইতে এক আকারে চলিয়া আসিতেছে। তাঁহার যাহা কিছু আছে সকলই শাস্ত্রসঙ্গত যুক্তিসঙ্গত, অণুমাত্র তফাত নাই। সুতরাং তাঁহার গ্রন্থে প্রলোভন নাই। পাপপুণ্যের মধ্যে পাপ বড় কম, সবই পুণ্য। ইচ্ছার স্বাধীনতা নাই। সুতরাং তাঁহার গ্রন্থ কেবল সুখের ছবি, নিরবচ্ছিন্ন বিশুদ্ধ আধ্যাত্মিক আমোদের ছবি। বায়রন পাপ পুণ্য বলিয়া দুইটি পদার্থ স্বীকার করিতে চান না। সুতরাং লোকে যাহাকে প্রলোভন বলে সে বস্তু তিনি স্বীকার করেন না। তাঁহার মতে মনুষ্য আপন ইচ্ছায় যাহা করে তাহাই ঠিক, আপন ইচ্ছায় যাহাকে ভালবাসে সেই প্রণয়ের পাত্র। সুতরাং মনুষ্য আপনার সুখের জন্য আত্মইচ্ছার উপর নির্ভর করে, কখন কৃতকার্য হয়, কখন অকৃতকার্য হয়। পরের কথায় কিছুই করিতে চাহে না, সমাজের যে সকল নিয়ম আছে মানিতে চাহে না, বর্তমান সমাজের যেরূপ গঠন তাহাতে সমাজ এরূপ স্বেচ্ছাচারীদিগের দমন করিতে চায়, সুতরাং উহারা সমাজের শত্রু হইয়া দাঁড়ায়। যে সমাজে ইচ্ছার প্রতিরোধ না থাকে, তাহারা সেইরূপ নূতন সমাজ চাহে। তাহা পায় না বলিয়া ঘোরতর সমাজদ্বেষী হইয়া পড়ে।

বঙ্কিমবাবুর একহাতে কালিদাস আর একহাতে বায়রন, কিন্তু কালিদাসের আধিপত্য তাঁহার উপর অধিক। তিনি সমাজ সেই প্রাচীন রীতিতে চালাইতে যান। সেই জিতেন্দ্রিয়ভাব সেই সুখ সেই শান্তি, কিন্তু ইচ্ছাশক্তি এক-এক সময়ে দুর্দম হইয়া উঠে। এইটি বায়রনের। তিনি লাগাম ছাড়িয়া দিয়া দেখান যে ইন্দ্রিয়বশ করিতে না পারিলে লোকের পদে পদে বিপদ ঘটে। তিনি একবার প্রলোভন লোকের সম্মুখে উপস্থিত করিয়া দেন, দেখান সকলেই প্রলোভনে ভুলে, কিন্তু কেহ অন্তরের ভাব অন্তরেই রাখে, দমন করে। ইহারাই জিতেন্দ্রিয়, যথা প্রতাপ। কেহ বা রাখিতে পারে না, দমন করিতে পারে না, যথা শৈবলিনী ও নগেন্দ্রনাথ। যেই জিতেন্দ্রিয় সেই সুখী, সাহসী সর্বত্র প্রশংসাপাত্র। যে অজিতেন্দ্রিয় সেই দুঃখী, সাহসশূন্য, এবং আত্মগ্লানিপূর্ণ।

কালিদাসের প্রলোভন নাই। বায়রনের সবই প্রলোভন, কিন্তু তাহা হইতে উঠিবার ইচ্ছা নাই। বঙ্কিমবাবুর প্রলোভন আছে, তাহার দুঃখ আছে ও তাহা হইতে উদ্ধার হইলে সুখও আছে। সুতরাং আধুনিক সমাজে আমরা বঙ্কিমবাবুর গ্রন্থ হইতে উচ্চতর নীতিশিক্ষা প্রাপ্ত হইয়া থাকি।

বায়রন হইতে আমরা মানবজাতির প্রতি অনুরাগ করিতে শিখি বটে কিন্তু তিনি স্পষ্ট শিক্ষা কোথাও দেন নাই। তিনি বর্তমান সমাজের অনেক নিন্দা করিয়াছেন। অত্যাচারপীড়িতদিগের প্রতি সহানুভূতি প্রকাশ করিয়াছেন। তাহাতেই তাঁহার মতলব টের পাওয়া যায়। কিন্তু বঙ্কিমবাবুর গ্রন্থ হইতে আমরা যে স্বদেশানুরাগের উপদেশ পাই সে আর-একরূপ। তাঁহার গ্রন্থাবলীর মধ্যে কতকগুলি মূর্তিমান স্বদেশানুরাগ আছে। যথা রমানন্দ স্বামীর। এই সকল লোকের কি আশ্চর্য গঠন। তাঁহারা যে ব্রতে জীবন উৎসর্গ করিয়াছেন তাহার নাম **পরহিতব্রত**। পীড়িত যে ধর্মাবলম্বী হউক না কেন, মুসলমান হউক, হিন্দু হউক, খ্রীষ্টিয়ান হউক, তাহার উপকারের জন্য সর্বদাই উদ্ব্যস্ত। ইঁহারা নিজ জীবন পরের উপকারের জন্য তৃণবৎ ত্যাগ করিতে কাতর হন না। নৈতিক উন্নতির বোধ হয় রমানন্দ স্বামীই পরাকাষ্ঠা। কালিদাস হইতে আমরা আর একপ্রকার অনুরাগের উপদেশ পাই। তাহার নাম সর্বভূতানুরাগ। এ অনুরাগ বুদ্ধধর্মের ফল। কালিদাসের সময়ে যদিও উক্ত ধর্মের লোপাপত্তি হইয়াছিল তথাপি উহা অনেক অংশে হিন্দুদিগের মনে দৃঢ়বদ্ধ হইয়াছিল। কিন্তু অস্মদ্দেশীয় মাংসাশী যুবকবৃন্দ সর্বভূতে দয়ার বড় একটা সম্পর্ক রাখেন না। তাঁহাদের মতে মানবজাতির প্রতি অনুরাগই মুখ্য ধর্ম।

কালিদাসের শকুন্তলার লতা পাতা হরিণ মৃগ প্রভৃতি সোদরস্নেহ। আমরাও ফুলগাছ পুঁতি, গোরু বাছুর পুষি, কিন্তু তাহাদের সোদরস্নেহ হয় না। কিন্তু কালিদাসের হৃদয় পশুদিগের জন্যও কাঁদিত, আমাদের কাঁদে না। বঙ্কিমবাবুর নগেন্দ্রনাথ প্রজাদিগকে সন্তানের ন্যায় স্নেহ করেন। আমাদের স্নেহ বড় ঐ পর্যন্তই নামে। বায়রন সকল মানুষেরই প্রতি স্নেহ করেন। তাহার সাক্ষী তাঁহার গ্রন্থে দুর্দশাপন্ন গ্রীকদিগের জন্য গভীর রোদন ও তাহাদের দুর্গতিনাশের জন্য প্রাণপণে চেষ্টা করিতে লোকের মন আকৃষ্ট করা।

আর-একটি কথা। ইঁহাদের শিক্ষা দিবার প্রণালী কি একরূপ? সংস্কৃত আলঙ্কারিকেরা বলেন যে, বেদ হইতে যে উপদেশ পাই তাহা আজ্ঞা, পুরাণ হইতে যে উপদেশ পাই তাহা বন্ধুর উপদেশের ন্যায় সুপরামর্শ, কিন্তু কাব্য হইতে যে উপদেশ পাই তাহা কান্তার উপদেশের ন্যায়। কান্তা যেমন নানাপ্রকার গল্প গুজব করিয়া মনটি লওয়াইয়া শেষ উপদেশটি বাহির করেন, যেটি বাহির করেন সেটি কিন্তু অমোঘ। কবি রাম-রাবণের যুদ্ধ বর্ণন করিলেন ; নানারূপ বিচিত্র পদার্থ দেখাইলেন, কখন হাসাইলেন কখন কাঁদাইলেন, শেষ একটি উপদেশ দিলেন যে ইন্দ্রিয় অশ্বের লাগাম ছাড়িয়া দিলে অনেক নাতানে পড়িতে হয় শেষ

রাবণের ন্যায় সপুরীবিনাশও হইতে পারে। ইহাদের তিনজনেরও শিক্ষাপ্রণালী মূলত তাই, কেবল কিছু তারতম্য মাত্র আছে।

কালিদাসের উপদেশপ্রদানপ্রণালী ঠিকই এইরূপ। তিনি কোথাও preach করেন না। তাঁহার কাব্যের মুখে যাহা পড়ে তাহাই বলিয়া যান, কখনও উপদেশ দিব বলিয়া দোকান খুলিয়া বসেন না। বায়রনের প্রত্যেক চিত্রেই কিছু না কিছু উপদেশ আছে। তাঁহার যেখানে একটি সুন্দর বর্ণনা তাহার নীচেই দুটি বর্তমান সমাজের অত্যাচারের নিন্দা। সেখানে যাও দু-পাঁচটি ব্যঙ্গাত্মক উপদেশ নিশ্চয়ই পাইবে। যেমন কোন গোরস্থানে ভ্রমণকালে গোর-স্তম্ভ দেখিতে দেখিতে তাহার নীচে যে সকল খোদা অক্ষর দেখিলে তাহা অনেক দিন মনে থাকে, সেই রূপ বায়রনের খোদা কথা অন্তরের সঙ্গে গাঁথা থাকে। রাইনের ধারে রাইনের শোভা দেখিতে দেখিতে বা আল্পসের চূড়ায় আল্পসের শোভা দেখিতে দেখিতে, অথবা হাএদী ও জুয়ানের নিশীথ প্রণয় দেখিতে দেখিতে, বায়রন যে সকল গভীর নৈতিক তত্ত্বের আবিষ্কার করিয়া গিয়াছেন তাহা পাঠকহৃদয়ে অঙ্কিত থাকিবে। বায়রনের মাঝে মাঝে preachingও আছে। কিন্তু বঙ্কিমবাবুর preaching বড় উচ্চ। তাঁহার কমলাকান্তের দপ্তর একটি preaching-এর খনি। কত নীতিশিক্ষা উহা হইতে লাভ করা যায় তাহা বলা যায় না। তাঁহার preach করার লোকও আছে, তাঁহার সন্ন্যাসীগুলি সব নীতিশিক্ষার প্রচারক। তাঁহার নগেন্দ্রনাথ প্রভৃতির স্বগত বাণীগুলিও প্রচারক ভিন্ন কিছুই নহে। হরদেব ঘোষালের পত্র অনেক মনোবিজ্ঞানতত্ত্বের গূঢ়তত্ত্ব, সত্য আবিষ্কার করিয়াছেন।

লোকে মনে করেন যে বায়রন হইতে আবার কি নীতিশিক্ষা, বায়রন অতি অশ্লীল কবি। যাঁহারা এরূপ মনে করেন তাঁহাদের বায়রন নীতিশিক্ষা দেন না। তাঁহাদের নীতি সেকেলে, বায়রন একেলে নীতি শিক্ষা দেন। তিনি রুসোর স্কুলে তৈয়ারী হইয়াছেন। মানুষ সব সমান। সমাজবন্ধন শুদ্ধ দু-পাঁচ জন লোকের হাতে, অত্যাচারের ও যথেষ্টাচারের ক্ষমতা দিয়া তাহারা অবশিষ্ট মানবমণ্ডলীকে নির্বীর্য ও নিস্তেজ করে। এ অবস্থায় পরিবর্তন প্রয়োজন। তাঁহার কাব্যেও এই ভাব নিরন্তর প্রকাশিত। তাঁহার নিজের ও তৎকল্পিত মানবগণ যদিও দেখিতে মনুষ্যবিদ্বেষী যদিও তাঁহার গ্রন্থ পাঠ করিয়া যুবক ও অনেকে এই ভাবই বিলক্ষণ প্রাপ্ত হয় তথাপি একটু প্রণিধান করিয়া দেখিলে দেখিতে পাওয়া যাইবে যে এটি বাহিরে মাত্র, তাঁহার বিদ্বেষ শুদ্ধ বর্তমান সমাজের উপর কিন্তু উহার নীচে মনুষ্যের জন্য সহানুভূতি পরিপূর্ণ।

বঙ্কিমবাবুর পুস্তকের পরহিতব্রত যদিও বায়রনের পরহিতব্রত অপেক্ষা

কোন অংশে ন্যূন কিন্তু উহা তাঁহার পুস্তকে অধিকাংশ স্থলেই শুদ্ধ স্বদেশানুরাগেই পর্যবসিত। এইজন্য আমরা তাঁহার পুস্তকের উদ্দেশ্য স্বদেশানুরাগই বলিলাম।

উপসংহারকালে সংক্ষেপে বলি, বঙ্কিমবাবুর উদ্দেশ্য স্বদেশানুরাগ ও সামাজিক সুখ, কালিদাসের ভূতানুরাগ ও সামাজিক সুখ, বায়রনের মনুষ্যানুরাগ (humanitarianism) ও সামাজিক নিয়ম লঙ্ঘনের সুখ।

পৌষ ১২৮৫

জটাধারীর রোজনামচা

প্রথম পরিচ্ছেদ/রোজনামচা লিখিবার অভ্যাস

বিদ্যাপতি ঠাকুর পদাবলিমধ্যে লিখিয়াছেন—

সবহু মতঙ্গজে মোতি নাহি মানি
সকল কণ্ঠে নহে কোকিলবাণী ॥
সকল সময়ে নহে ঋতু বসন্ত
সকল পুরুষ নারী নহে গুণবন্ত ॥

পাঠক !

জটাধারীর চরিতাবলীতেই ইহার অনেক প্রমাণ দেখিতে পাইবে। হঠাৎ অবতার হওয়া সকলের ভাগ্যে বিধি লিখেন নাই। শিশুর পালের মধ্যে সকলে সেণ্টপল হন না, সকল ঋষি দেবর্ষি হন না, সকল শিরোমণি রঘুনাথ শিরোমণি নহেন, কলেজের সকল ছাত্র "দর্শনের" সম্পাদক হইতে সক্ষম নহেন। স্বর্গারোহণের পথে কেহ ছাত্রবৃত্তি প্রবেশিকা, কেহ প্রথম আর্টে, কেহ বি এ-র পথে, কেহ মৃতদেহ চিরে চিরে, কেহ রসায়নের অগ্নিপার্শ্বে পটকে যান। যদিও আশা সকলের সমান, বুদ্ধি বা প্রতিভা সকলের সমান নহে, কেবল বুদ্ধি নহে, অবস্থার হীনতাও কখন কখন বিদ্যাহীনতার প্রধান কারণ। কিন্তু গঙ্গাধর শর্মা কেবল অবস্থার অধীন ছিলেন না, সময় দেখিয়া স্বীয় চেষ্টার উপর সতত নির্ভর করিতেন।

আমি যখন বিদ্যারম্ভ করি তখন সেকাল আর একালের প্রসঙ্গ ছিল না। রামখড়িতে ভূমিতে লিখিতে হইত, পেন্সিলের নামও ছিল না ; তালপত্রে লিখিয়া রৌদ্রে কালি শুকাইতে হইত, কলাপাতে লিখিয়া ধূলা ছড়াইতে হইত ;

তখন "ইরেজার" বিনিময়ে চা-খড়ি, ব্লটিং বিনিময়ে চুনের থলি, "গম-আরেবিক" বিনিময়ে আল্কাতরাবিনিন্দিত কাল গঁদের ভাণ্ড, স্বর্ণনির্মিত চিরকাল পটু পেটেণ্ট-পেনের বদলে বাতার কলম, মরক্ক লেদর আবৃত ইসক্রুটপ মস্যাধার বিনিময়ে চালচুয়ানি ও ভূষাজড়িত মৃত্তিকাপাত্র, তখন থেকার স্পিঙ্ক এবং কোং, পুরাতন সংস্কৃত যন্ত্র, নূতন সংস্কৃত যন্ত্র, বন্দ্যোপাধ্যায় ভ্রাতা, মুখরজি পুত্র বা চাটুর্য্যা কোম্পানির কোন প্রসঙ্গ ছিল না।

শৈশবাস্থায় "আগডুম বাগডুম" খেলায় বড় আমোদ ছিল, তখন "হাডু-ডুডু" প্রণয়সম্ভাষণ-বাক্য নূতন হইয়াছিল। নামটি কোথা হইতে আসিল বলিতে পারি না, বোধ হয় ইংরেজদিগের How do you do? হাউডু ইউডু কথা হইতে জন্মিয়াছিল। হাউডু অর্থাৎ কেমন আছ, এই সম্ভাষণ করিতে গিয়া তখন যুদ্ধ বাঁধিত। যাহা হউক মুসলমান বাদশাদিগের অনুকরণে মোগল পাঠান খেলা সৃষ্টি হইয়াছিল। ইংরেজ অনুকরণে এই খেলা হইয়া থাকিবে। এটি ঘোর যুদ্ধময় খেলার নাম ছিল—যাহা হউক, সে খেলার সর্দার গঙ্গাধর শর্ম্মাই ছিলেন। তদ্ভিন্ন দৌড়াদৌড়ির, সাঁতারশিক্ষার ও গুলিদণ্ড-ক্ষেপণের একটি প্রধান "গ্রেজুয়েট" ছিলাম। পাঠশালার পাঠ কতক্ষণে শেষ হয়, কেবল তাই সময়ে সময়ে ভাবিতাম; কিন্তু পাঠেও একেবারে অনাস্থা ছিল না, দুষ্টু ছিলাম কিন্তু ধরাছুঁয়া দিতাম না, এই জন্যই গুরুমহাশয় কখন কখন ক্রুদ্ধ হইয়া "ভিজে বিড়ালটা" বলিয়া উঠিতেন, তাহাতে আমি উত্তর করিতাম না, কারণ নিজের গুণ নিজে বিলক্ষণ জানিতাম; গুরুমহাশয়ও তাহা সম্প্রীতি বা ভয়বশতঃ মুক্তকণ্ঠে স্বীকার করিতেন। আনাগনা ঘ, গাঁড়র শিঙ্গে ম, হাড়গোড় ভাঙ্গা দ, কান্দে বাড়ি ধ, তিনপুটুলি শ, মিষ্ট সুরসহ লিখিতাম। তখন মূর্ধন্য ষ, মূর্ধন্য ণয়ের নামও ছিল না, কয়ে ষ যোগ করিলে যে ক্ষ হয় তাহা গুরু-মহাশয়ও জানিতেন না। এই কথার বর্ণপরিচয়ে পরিচয় পাইয়া গুরুমহাশয় একদিন ব্যঙ্গ করিয়া কহিলেন, "বিদ্যাসাগর বিদ্যাপচার করিয়াছেন, বাপ পিতা-মহের অপেক্ষা তাঁর অনেক বিদ্যা।"

আমাদের স্বগ্রাম শ্রীনগর, প্রকৃত শ্রীমন্ত লোকের বাস, অতি প্রসিদ্ধ পল্লী; এখানে পাঠশালা, মক্তব, চতুষ্পাঠী সকলই উজ্জ্বল ছিল। গুরুমহাশয় আখাঁদ্ধ মল্লা সাহেব, নবদ্বীপের ফেরত "লদের পণ্ডিত" আখ্যাধারী অধ্যাপক তর্কা-লঙ্কার মহাশয় ভাগাভাগি করিয়া ছাত্রবর্গমধ্যে রাজত্ব করিতেন। তখন বর্ণপরিচয়, বোধোদয়, উপক্রমণিকার নামও ছিল না, অল্পেই শিক্ষা শেষ হইত। কিন্তু "লাউসেন দত্ত" মহাশয়ের বেত্রাঘাত আরও কষ্টকর ছিল। কয়েক বৎসর পাঠশাল্যার পিটনি সহ্য করিয়া পাঠ সাঙ্গ করি। পরে

পিতৃব্যগণের অনুজ্ঞায় আখন্ধি মিয়ার বুলের আঘাত ও তৎপরে অবসরমতে চতুষ্পাঠীতে সংক্ষিপ্তসার ব্যাকরণসূত্র মুখস্থ করিতে বাধ্য হই। লতান লাউ-লতা স্বরূপ লম্বাকৃতি লাউসেন দত্ত গুরুমহাশয়, রক্তচক্ষু বেত্রপাণি, "দেড়ে" আখন্ধি মিয়ার দয়া ও সুপক্ব বেলবিনিন্দিত চাক্‌চিক্যমান বৃহৎ মুণ্ডধারী তর্কালঙ্কার মহাশয়ের গুণানুবাদ ক্রমে কীর্তিত হইবে, ইহাদের মধ্যে কাহার গুণ বেশী, কাহার তাড়না সর্বাপেক্ষা ক্লেশজনক, তাহা দুই-এক কথায় হঠাৎ মীমাংসা করা দুঃসাধ্য। আপাততঃ রোজনামচা বা দৈনিক বৃত্তান্ত লিখনারম্ভ নির্দেশ করাই এই পরিচ্ছেদের উদ্দেশ্য।

আমাদের গ্রামে দীঘির নিকট পুরান থানাঘর ছিল, যদিও থানা স্থানান্তরিত হইয়াছে, তথাপি ঐ পথে গমন করিলে বোধ হয় যেন এখনও সেই বৃহৎ হাতার মধ্যে বৃহৎশ্মশ্রুধারী গোলাম সরদার দারগা সাহেব পঞ্চ অঙ্গুলিতে গণ্ডতলস্থ কেশরাশি আঁচড়াইতে আঁচড়াইতে ইতস্ততঃ পদচালনা করিতেছেন। দারগার নামে সকলে কঁাপিত কিন্তু আমি ত সময় পাইলেই তাঁহার চৌকির পাশে যাইয়া বসিতাম। বলিতে পারি না কেন, তিনিও আমায় ভালবাসিতেন ও কহিতেন, "লেড়কা বড়া হুঁশিয়ার"। যে সময়ে দারগা সাহেবের কাচারি গরম হইত, বিরু বরকন্দাজ চোরেদের সম্মুখে সের খাঁ, সমসের খাঁ, রামচাঁদ শ্যামচাঁদনামা মুষ্টিপ্রমাণ পুষ্ট যষ্টি সারি সারি ধরিয়া রাখিত, চামড়ে হাতকড়ি কসে বাঁধিত, তখন থানাপ্রাঙ্গণের শতপদমধ্যেও যাইতাম না! রবিবারে চৌকিদার হাজিরির সময় শিষ্ট বালকের মত যাইতাম। হাজিরি লিখিতে প্রতি চৌকিদার মুন্সিজির তামাক ক্রয়জন্য এক-একটি পয়সা দিত ও মুন্সিজি রোজনামচা পুস্তকে দিন-দিনের ঘটনা লিখিতেন, আমি তাহাই দেখিতাম। লেখা সাঙ্গ হইলে দুই-একটি মিষ্টি কথা কহিতেন, হয়ত কোন দিন দুই-চারিটি পয়সা দিয়া নিকটস্থ দোকান হইতে মিষ্টান্ন খৈচুর আনাইয়া দিতেন ও দারগা সাহেব কহিতেন, "বাবা, থানায় যা দেখ তাহা বাহিরে কাহাকেও কহিতে নাই, যদি কেহ বলে, শ্যামচাঁদের প্রহারলাভ হয়।" আমি থানার ঘটনা ভয়ে কাহাকেও বলিতাম না, দারগা সাহেব আমার উপর আরও সন্তুষ্ট থাকিতেন। আমিও ভাবিতাম রোজনামচা লেখা ভাল কর্ম, তাহাতে কাঁচা পয়সা আমদানি হয় ও অনেক খৈচুর খাওয়া যাইতে পারে। এইসময় আমাদের গ্রামে নববিদ্যালয় বিভাগের একজন তত্ত্বাবধায়ক আসিয়া একদিন অবস্থিতি করিলেন—তাঁহাকে কেহ "ইনষ্টপিষ্টি" কেহ "ষ্টুপিড" কেহ "পেক্‌টরবাবু" কহিতে আরম্ভ করিল। তিনিও আবার একটি দৈনিক বিবরণ সহিত আত্মস্বাস্থ্য সম্বন্ধে দুই-একটি কথা লিখিলেন। তিনি লিখিলেন,

"বাবুর বাটীর বৃহৎ আরসিতে অদ্য নিজ মুখ দেখিয়া জানিলাম যে, ক্রমাগত পরিভ্রমণে মুখশ্রী শুষ্ক হইয়াছে এবার স্বস্থানে পৌঁছিয়া প্রতিদিন অজামাংস ভক্ষণ করিয়া পুষ্টিলাভ করিব।" কেহ রোজনামচা লিখে থৈচুর, কেহ প্রতি-দিন অজামাংস আহরণে সক্ষম হন। এত ভাল রোজনামচা, ইহা লেখা কর্তব্য-বোধে আমিও সময়ে সময়ে ইঁহাদের অনুকরণ করিতাম। প্রাত্যহিক ঘটনা একটি পুস্তকে লিখিতে চেষ্টা করিতাম। সেই অবধি আমার রোজনামচা লিখিবার হাতেখড়ি হয়—আজও লিখি, এমন কি এখন একটি অভ্যাসের কর্ম হইয়া উঠিয়াছে। সেই বৃহৎ পুস্তক হইতে একটি আখ্যান উদ্ধৃত করিতে প্রবৃত্ত হইলাম, বোধ হয় কোন স্থূল পাঠকগণের হৃদয়রঞ্জক হইলেও হইতে পারে।

দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ/আত্মপরিচয়

শরৎকাল, সন্ধ্যার প্রাক্‌কাল—সে আশ্বিন পঞ্চমী, শারদীয় পূজার উৎসব আরম্ভ হইয়াছে। গ্রামের পশ্চিমপ্রান্তে নিবিড় আম্রতলে খেলিতে খেলিতে সুদূরে পশ্চিমাকাশে কি দেখিয়া খেলা ছাড়িয়া দিলাম। দেখিলাম সূর্যদেব রক্তকলেবর, বৃহৎকায়, ধীরে ধীরে রাশি রাশি শুভ্র তুলাসদৃশ মেঘমধ্যে প্রবেশ করিতেছেন। যেন সোনার চক্‌চকে মোহর, সাটিনের থলিতে কোন অদৃশ্য অঙ্গুলি দ্বারা প্রবিষ্ট হইতেছে। সুবর্ণ-থালাটি ডুবিতে ডুবিতে মেঘদল রোহিত হইল, যেন ছায়াবাজিতে কত মুরতি আকাশপটে শ্রেণীবদ্ধ হইল—ঐ আকাশ-বুড়ি মাথা হেঁট করিয়া বসিয়া আছে—ঐ শিপাই তরবাল হস্তে দণ্ডায়মান—ঐ বাঘ পশ্চাৎ পা কুঞ্চিত করিয়া থাবা উত্তোলন করিয়া লম্ফ দিবার মনন করিতেছে—ঐ কুমীর পাটিযুগল বিস্তার করিয়া রহিয়াছে; আবার আরও দূরে নৌকা পতাকা সুরঙ্গে রঞ্জিত, তার উপর বালশশিরেখা শ্বেত ফোঁটার মত আকাশললাটে ভাসিতেছে। আমি দাঁড়াইয়া নীরবে দেখিতেছি, আর কি ভাবিতেছি, এমন সময়ে সুদূর গ্রামে বাবুর বাটীতে একটি বন্দুকের শব্দ হইল, তাহার পরেই নৌবতের বাদ্য সানায়ের স্বরসহিত বাজিয়া উঠিল, বন্দুকের শব্দ হওয়া মাত্র শস্যক্ষেত্র হইতে শত শত বকদল উড়িয়া ইণ্ডীয় রবরের ন্যায় ক্ষণেক লম্বা ক্ষণেক ক্ষুদ্র শ্বেত মালা গাঁথিল, গ্রামের বৃক্ষরাজি লক্ষ্য করিয়া উড়িয়া চলিল—আমরাও পশ্চাতে পশ্চাতে—

বকমামা বকমামা ফুল দিয়ে যাও
যতগুলি কড়ি আছে সব লয়ে যাও

কহিতে কহিতে কোলাহলে দলে দলে দৌড়িলাম। মনে হইল আজ আমোদের কেবল আরম্ভ নহে। নৌবতখানা ও বড় দেওড়ির চক পার হইয়া, সিংহদ্বার

অতিক্রম করিয়া পূজার বাটীর প্রশস্ত প্রাঙ্গণে উপস্থিত হইলাম। এখানে পূজার বাজনা জলদ বাজিতেছে, কত কত কারিকর প্রতিমাকে নানা সাজে সজ্জিত করিতেছে, কোথাও ঝাড়ে বেলোয়াড়ি মালা গাঁথা হইতেছে, কোথাও কেহ সারি সারি সেজে বাতি, লণ্ঠনশ্রেণীতে নারিকেল তৈল সম্প্রদান করিতেছে। কেহ কহিতেছে এই ছবিটি নিম্ন হইল, সঙ্গের শিষ্ট হারাধনের ক্ষিপ্তবৎ হাত নিক্ষেপেই ভাঙ্গিবে, কেহ কহিতেছেন মাঝের ঝাড়ের ঝালর বাসুদেবের মাথায় ঠেকিবে, কেহ কহিতেছেন সাদা গোলক লণ্ঠনের মধ্যে মধ্যে রাঙ্গা বেল-লণ্ঠন দাও, কেহ পরামর্শ দিতেছেন আল্‌তা গুলিয়া গেলাসে রঙ্গ দিলে বড় বাহারই হয়, আবার কেহ সুনির্মিত সোলার কান্দি কান্দি কলা, আঁসাঙ্কিত মৎস্য, নবরঙ্গ রঞ্জিত ফুল-ঝারা, তরবালহস্ত তালপেতে সিপাহীশ্রেণী, নাট্যশালার চন্দ্রাতপের চতুষ্পার্শ্বে আলম্বিত করিতেছে। পূজার বাড়ি যেন প্রফুল্লমুখী কনের মত বড় সেজেছে। যথা প্রতিমার চালচিত্র ও কারিকরগণের তুলিকা চলিতেছে তথা হইতে যেখানে লণ্ঠন গেলাসে উড়কিপ্রমাণ তৈল বণ্টন হইতেছে, সকল দেখিলাম। এ আমার কি অভ্যাস ছিল বলিতে পারি না, কিন্তু প্রতিমানির্মাতা মিস্ত্রি-জ্যেঠা কহিতেন যেকালে খড়ের বন্ধন আরম্ভ হইত তদবধি বিসর্জনের দিন পর্যন্ত আমি সুস্থির থাকিতাম না, কখন মিস্ত্রির অসাক্ষাতে গড়িতে যাইয়া ভাঙ্গিয়া রাখিতাম ; কখন আমার তুলিতে চালচিত্রগুলি বিলুপ্ত হইয়া থাকিত, চিত্রকরের কাজ বাড়াইয়া দিতাম ; কখন বৃদ্ধ মিস্ত্রি, গুরুমহাশয়ের দুষ্টতানিবারণী ক্ষমতা স্মরণ করিতে বাধ্য হইতেন ও যখন আমাদের উপদ্রবে তাঁহার তুলিকাচালনার নিতান্ত ব্যাঘাত দেখিতেন "দত্তজা মহাশয়, রক্ষা কর রক্ষা কর" বলিয়া চীৎকার করিতেন। আমাদের প্রত্যেক উদ্যোগ, প্রতিমাগঠন ও রঙ্গফলান হইতে যাত্রাদলের বাসায় যাইয়া পূর্বাহ্নে সঙ্গের সংবাদ মনোযোগপূর্বক সংগ্রহ করা এক বিশেষ কার্য ছিল, সতত ব্যস্তসমস্ত থাকিতাম ও প্রতিমা বিসর্জনের সঙ্গে সঙ্গে আমাদের একটি মর্মান্তিক আক্ষেপ উপস্থিত হইত ; মনে হইত কাল না হয় পরশ্ব অবশ্যই আবার গুরুমহাশয় লাউসেন দত্তের লম্বা বেত দর্শন করিতে হইবেক। কিন্তু পাঠশালা, গুরুমহাশয়, হাতছড়ি, এ সকল অকথা-কুকথার এখন সময় নহে।

সমারোহে অনেকেই অনেক কথা কহিতেছেন, তন্মধ্যে বাবুদ্বয়ের আদেশই প্রবল, সকলে তাঁহাদের আজ্ঞানুবর্তী হইতেই শশব্যস্ত—ইহাদের মধ্যে অমরেন্দ্রনাথ বড়বাবু আর একজন নরেন্দ্রনাথ ছোটবাবু মহাশয়। উভয়ের আকার প্রকার, কথাবার্তা, বেশভূষার সাদৃশ্য দেখিয়া বোধ হয় যেন যমজ সোদর। যে সময়ের কথা আমরা বলিতেছি তখন বাবরি এবালিস্ হয় নাই,

আলবার্ট ফেসনের নামও নাই, উভয়বাবুর দশ-আনি ছয়-আনি বাটওয়ারার টেরি কাটা হইয়া উজ্জ্বল কাল কেশরাশি উভয় কর্ণের উপর সাপখেলান হইয়া দুলিতেছে, "গুয়া-থুপি" কেশগুচ্ছ বোধ হয় অনেক যত্নে প্রস্তুত হইয়াছে। গোঁফযুগলও অনেক হেফাজতের ধন, গৌরবর্ণ মুখের উপর ক্রমান্বয়ে সূক্ষ্মতর সূক্ষ্মতম এক-একটি বক্র মিহিরেখাতে শেষ হইয়াছে, ভাল করিয়া দেখিলে বোধ হয় বেল-আঁটা বা মম সংযুক্ত হইয়া ঘড়ির তারের মত, স্বতন্ত্র রহিয়াছে। উভয়েরই যোড়া ভ্রূ, ভ্রূযুগলমধ্যে পূজার শ্বেত-চন্দনের ফোঁটা, গলায় মিহি তুলসীমালা, তাহার মধ্যে একটি ক্ষুদ্র রুদ্রাক্ষ, একটি রক্তবর্ণ পলা ও দুইটি সোনার দানা গ্রন্থিত। চাদরখানি কুঞ্চিত, যেরূপ আলনাতে থাকে সেইরূপই বামস্কন্ধে দুলিতেছে। পূজার বাজার,—চৌড়া কাল কিনারা শোভিত মিহি ঢাকাই ধুতি উভয়ের অঙ্গলাবণ্য সংবর্ধন করিতেছে, কোঁচার দিকটি ময়ূরপুচ্ছের মত গিলা-কুঞ্চিত, কাছাটি রেশমি ডোরের মত পাকান কিন্তু অপেক্ষাকৃত লম্বা; উভয়বাবুই খালি ভূমে রুমাল পাড়িয়া বসিয়া আছেন, নিকটে এক-একটি আঁকাবাঁকা কাল কাষ্ঠনির্মিত যষ্টি রহিয়াছে, যষ্টির শিরোভাগে রৌপ্যনির্মিত বাঘমুখের অনুকরণ, সেই মুখে আবার হরিৎ প্রস্তর-খচিত আঁখিদ্বয় জ্বলিতেছে। উভয়বাবুরই এক-একটি পুঁতির নল সংযুক্ত ও রজতনির্মিত কলিকা শিরাবরণভূষিত গুড়গুড়ি মকমলের জিরন্দাজে দাঁড়াইয়া রহিয়াছে ও মুহুর্মুহু খাম্বিরা তামাক পরিবর্তিত হইয়া ভুড় ভুড় শব্দ করিতেছে। জ্যেষ্ঠবাবু মহাশয় যেখানে বসিয়া আছেন সেইখানেই ধূমপুঞ্জ উড়াইতেছেন, তাঁহার কাছে কাহারও কোন বিষয়ে কলিকা পাইবার যো নাই। কনিষ্ঠবাবু মহাশয় মধ্যে মধ্যে স্থানান্তরে স্তম্ভপার্শ্বে যাইয়া ফরসির নল ধারণ করিয়া জ্যেষ্ঠ ভ্রাতার সম্ভ্রম সংবৃদ্ধি করিতেছেন, অন্তরালে থাকিয়াও রকম বরকম কমটান সটান শব্দে জ্যেষ্ঠ সোদরের কর্ণসুখ সম্পাদন করিতেছেন। অমরেন্দ্রনাথ অতি উদার, কনিষ্ঠ ভ্রাতাকে ইঙ্গিত করিয়া কহিলেন, "ইহার অপেক্ষা সম্মুখে হইলে ভাল হয়, কনিষ্ঠভ্রাতাদের চক্ষুলজ্জা উৎপত্তি হয়, নচেৎ সময়ে সময়ে অন্তরালে নির্ভয়ে এরূপ টান টানেন যে আমাদের জন্য কিছুই থাকে না।" পারিষদের সহিত বাবুগণ এইরূপ মিষ্টালাপ করিতেছেন, ও উৎসবের উদ্যোগের সহায়তা করিতেছেন। ভৃত্য, অনুচর যে আসিতেছে ভূমিষ্ঠ প্রণাম করিয়া যোড়হস্তে দাঁড়াইতেছে ও "বৈঠকখানায় জেও, পার্বণী প্রস্তুত আছে" শুনিয়া সানন্দহৃদয়ে বিদায় হইতেছে। উভয় বাবুই উদার, সকলের সমদুঃখগ্রাহী, লোকপালক, প্রিয়-বাদী, ধনী, শ্রীমন্তের সন্তান তাহাতেই এত আদর। আমি বাবুগণের ভাবভঙ্গি দেখিয়া নিকটস্থ হইলাম। আমার বেশভূষা তাদৃশ পরিষ্কার ছিল না, যষ্ঠীর

দিন পার্বণী বস্ত্র বাহির করিয়া আমিও বাবু সাজিবার আশয়ে সুখী ছিলাম। আমাকে দেখিবামাত্র অমরেন্দ্রনাথ কহিলেন, "ওরে সেই জটা এত বড় হয়েছে, আয়রে ভাই" কহিয়া হস্ত ধরিয়া নিকটে লইলেন। "শ্যামবর্ণের উপর জটার কেমন শ্রী দেখ, তুই বড়লোক হবি কিন্তু তোর পিতা তোরে ভালবাসেন না, তা হলে ভাল কাপড় দিতেন," এই কথা কহিতে কহিতে যেন চমকিয়া উঠিয়া ভৃত্যের প্রতি দৃষ্টিপাত করিয়া কহিলেন, "ওরে হুঁকা লয়ে যা, কর্তামহাশয় আসিতেছেন।" এই কর্তা মহাশয় কে ? কর্তা শব্দ উচ্চারিত হইবামাত্র সকল মুখ হইতে লঘুতা অন্তরিত হইল, বৃথা কথা থামিল, সব ঘর স্তব্ধ হইল, সকলে তটস্থ ও দণ্ডায়মান। বাবু আশুতোষ রায় কর্তাবাবু মহাশয়ের পূজার বাটীতে আবির্ভাব, যেমন গৌরকান্তি, তেমনি গম্ভীরভাব, তাঁহার স্বর শুনিবামত্র আমরা এককোণে প্রস্থান করিয়া সুস্থিরভাবে দণ্ডায়মান হইলাম ও ভাবিতে লাগিলাম, আমি ইঁহার মত বাবু হইতে পারিব না।

পাঠক ! হেস না, আজকাল বাবু হওয়া অতি সহজ কর্ম ; বোধ হয় তদপেক্ষা আর সহজ কর্ম নাই ; চুলে তেল দাও, তিন আনা মূল্যের কাঁকুয়ে টেরি কাট ও দশ আনা গজের কাল অল্পাকার চাপকান ঝুলাও। বাজারে সাইডস্প্রিং সংযুক্ত চক্‌চকে পাদুকার অভাব কি ? চীনেবাজারে দ্বাদশ আনা মূল্যের ফুলদার টুপি ক্রয় করা অভাব কি ? আবার বাবু হইবারই বা ভাবনা কি ? এখনও শ্যামলা কিনিতে পার না, সোনার চেনের বাহার দিতে পার না ? নাই পারিবে ? বড়বাবু নাই বা হলে, কেরাণিবাবু হও, কনেষ্টেবলবাবু হও, না হও —পাচকঠাকুরবাবু হও,—না হয় রেলওয়ে কোম্পানির আশ্রয় গ্রহণ কর, "টিকেটবাবু" "ডাকবাবু" "তারবাবু" "টোলবাবু" "পাইণ্টমেনবাবু" "ঘণ্টাবাবু" হও; নিতান্ত তা না হও কণ্ট্রাক্‌ট বা ঠিকার কার্য গ্রহণ কর, তাহাতে "শিলিপটবাবু", "ইটবাবু", না হয় "ঘুটিংবাবু"ও ত হইবেই হইবে ?

কিন্তু গঙ্গাধর শর্মা যে বাবু হইতে আকাঙ্ক্ষী সে বাবু এরূপ নহে—তখন বাবুর অন্য অর্থ ছিল। পাঠক ! একবার চতুরঙ্গ বা শতরঞ্চ খেলা সজ্জার কাষ্ঠনির্মিত রাজা ও তৎপ্রতিরূপ দুর্ভিক্ষের ফেমিনী রাজা, রঙ্গের গোলামবিনিন্দিত বড় দরবারের শস্ত্রভীত কানায়ে নাইট, বাহাদুরিহীন রায়বাহাদুর, ভূমি-শূন্য রাজা, রাজশূন্য মহারাজা, এক পলের জন্য ভুল, বোধ হয় চিরকালের জন্য ভুলিলেও বিশেষ ক্ষতি নাই। জটাধারী যে বাবু হইতে চাহিয়াছিলেন, সে ভদ্রের দৃষ্টান্তস্থল, এখন বিরল, সেই বাবুসকল কেবল বেতনতালিকার গেজেটের বাবু নহেন, এক-এক বৃহৎ দেশ সেই পূর্বতন বাবুবংশের রাজ্য ছিল। সেই বাবুদের অন্তঃপুরের মহিলাগণ কেবল হীরার খেলনা, বা অলঙ্কারের

বা বারাণসী শাটীর গর্বে গর্বিত হইতেন না, তাঁহারা ধর্মকর্মে, ব্রতদানে, দেবালয়, জলাশয়, জাঙ্গাল প্রতিষ্ঠা উদ্দেশ্যে পাগলিনীপ্রায়। আবার সেই বাবুগণ কেবল শ্বেতবস্ত্রে ও শুভ্র লম্বা কোঁচায় ধনের পরিচয় দিতেন না, তাঁহাদের একদিকে প্রভুত্ব আর দিকে বহুজনপ্রতিপালনই প্রধান ধর্ম জানিতেন; যাহাদের দানধ্যান, ক্রিয়াকলাপের কথা এখন উপকথা হইয়া উঠিয়াছে, যাহাদের সুনাম, দানের যশ ও সুখ্যাতির স্রোত সহস্র সহস্র দরিদ্র ও অতিথের মুখে মুখে বৃন্দাবন হইতে পুরীর মন্দিরের দ্বার পর্যন্ত প্রবাহিত হইত, সেইরূপ একটি বাবু দেখিয়াই গঙ্গাধরের কিশোরমন বিচলিত হইয়াছিল—সেইরূপ রাজ্যধর ও রাজ্যপালনসক্ষম বাবুর কুল এখন লুপ্তপ্রায়।

ফাল্গুন ১২৮৪

ফুলের ভাষা

আকাশে নক্ষত্র ফোটে; পৃথিবীতে ফুল ফোটে। নক্ষত্র অন্ধকারের ভিতর দিয়া ফুল দেখিয়া বলে, তুই ফুটিস্ বলিয়া আমি ফুটি; ফুল অন্ধকারের ভিতর দিয়া নক্ষত্র দেখিয়া বলে, তুই ফুটিস্ বলিয়া আমি ফুটি। আকাশ বিশ্বের আধখানা; পৃথিবী বিশ্বের আর আধখানা। তাই বলি, যখন আকাশে নক্ষত্র ফোটে আর পৃথিবীতে ফুল ফোটে, তখন আর আধাআধি ভাব থাকে না। তখন বিশ্বের উপরার্ধ এবং বিশ্বের নিম্নার্ধ মিশিয়া এক হইয়া যায়। ফুলের ডোরে উপর নীচে বাঁধা।

আবার ফুলের ডোরে নীচে সব বাঁধা। এখানেও ফুল আর নক্ষত্র একই বস্তু, কেননা নক্ষত্রের কিরণডোরেও নীচে সব বাঁধা। একটু ভাবিয়া দেখ। মনুষ্যের ইতিহাসের যুগযুগান্তরের পিছনে গিয়া দাঁড়াও। ইংলণ্ড, ফ্রান্স, জর্মনি ভুলিয়া যাও; গ্রীস, রোম, পারস্য ভুলিয়া যাও; তাজমহল, পার্থিনন, ভুবনেশ্বর, কনারক ভুলিয়া যাও। সব ভুলিয়া সভ্যতাবিহীন, শাস্ত্রবিহীন, ইতিহাসবিহীন, অন্নবস্ত্রবিহীন কাল্দীয় মেষপালকদিগের মধ্যে গিয়া দেখ তাহারা কি করিতেছে। দেখিবে তাহারা দিনে ভেড়া চরাইতেছে, রাত্রে নক্ষত্র ভাবিতেছে। অথবা গো-মহিষসম্বল ভারতীয় আদিম আর্যগণের মধ্যে গিয়া দেখ, তাহারা কি করিতেছে! দেখিবে তাহারা দিনে গোধন বাড়াইবার জন্য

কত গব্য-কাষ্ঠ জ্বালাইতেছে, রাত্রে আকাশে সপ্তর্ষি দেখিয়া সাধের গোধন পর্যন্ত ভুলিয়া যাইতেছে। তারপর সেই আদিম কাল হইতে ক্রমে ক্রমে অগ্রসর হও। হইয়া ঊনবিংশ শতাব্দীতে প্রবেশ কর। বরাবর দেখিবে, মানুষের এক চক্ষু পৃথিবীর জিনিসে আর এক চক্ষু আকাশের নক্ষত্রে। নক্ষত্র মনুষ্যের চিরন্তন চিন্তা, আবহমান আকাঙ্ক্ষা, গূঢ়নিহিত কৌতূহল! আবার পিছাইয়া যাও— সোনা, রূপা, মণি, মুক্তা, বস্ত্র, অলঙ্কার, গৃহ, অট্টালিকা, অর্ণবযান, বাষ্পীয়যান প্রভৃতি সমস্ত বাহ্য সম্পদ এবং সভ্যতাসূচক বস্তু ভুলিয়া, আদিম মহারণ্যে প্রবেশ করিয়া আদিম মনুষ্যকে দেখ। দেখিবে, তোমার যাহা আছে তাহার সে সব কিছুই নাই। কেবল তোমার যে ফুলটি আছে তাহারও সেই ফুলটি আছে। তার পর ক্রমে অগ্রসর হইয়া ঊনবিংশ শতাব্দীর জেলার মধ্যে প্রবেশ কর। বরাবর দেখিবে মানুষ সব পরিবর্তন করিতেছে, কিন্তু যে ফুল প্রথমে তুলিয়া পরিয়াছে এখনও সেই ফুল তুলিয়া পরিতেছে। ফুল মানুষের চিরন্তন সাধ, আবহমান অনুরাগ, গূঢ়নিহিত ভাব! তাই বলি যে, আকাশের নীচে ফুলের ডোরে আর নক্ষত্রের কিরণডোরে সব বাঁধা। সেই জন্যই বুঝি ঐ দুইটি ডোর মিশিয়া স্বর্গ মর্ত্য বাঁধিয়া ফেলিয়াছে। ফুল! তুমি কি কঠিন! তোমার কল্পনাতীত কমনীয় কান্তিতে বিশ্বব্রহ্মাণ্ড বাঁধা! তবে বুঝি বাঁধিতে হইলে কমনীয়তা দ্বারা বাঁধিতে হয়?

ফুল, তুমি মানব-গুরু! মানুষে মানুষ আছে আর পশু আছে। মানুষের আকাঙ্ক্ষা, পশুত্বটুকু নষ্ট করিয়া মনুষ্যত্বটুকু প্রবল করে। সেই নিমিত্ত মানুষ পৃথিবীতে উদ্ভূত হওয়া অবধি আজ পর্যন্ত কত চেষ্টা করিয়াছে। কত ধর্মের সৃষ্টি করিয়াছে, কত দর্শনের সৃষ্টি করিয়াছে, কত স্কুল, কালেজ, টোল করিয়াছে, কত দেশ ভ্রমণ করিয়াছে। কিন্তু এই প্রভূত চেষ্টার প্রথম কার্য—ফুল তোলা। যে দিন আদিম মনুষ্য আদিম পশুর ন্যায় ক্ষুধার জ্বালায় মহারণ্যে বিচরণ করিয়া পশুবধ করত মধ্যাহ্নে বৃক্ষমূলে বসিয়া কাঁচা মাংস চিবাইয়া খাইয়া সহচর সিংহ-ব্যাঘ্রের ন্যায় নিদ্রার দ্বারা ক্লান্ত দেহের শান্তি সম্পাদন করিয়া অপরাহ্নে অস্তাচলগামী সূর্যের মৃদুমধুর সুবর্ণজ্যোতিঃ দেখিয়া, কি জানি কেন, বিলম্বিত লতা হইতে একটি সুবর্ণজ্যোতিঃ পুষ্প ছিঁড়িয়া মাথার চুলে গুঁজিল, সেই দিন মনুষ্যের বিশাল ইতিহাসের সূত্রপাত হইল। সেইদিন জানা গেল যে, মহারণ্যনিবাসী সহচর সিংহব্যাঘ্র অনন্তকাল মহারণ্যেই বাস করিবে, কিন্তু তাহাদের আদিমসহচর মনুষ্য মহারণ্য বিনষ্ট করিয়া মহাসম্পদসৃষ্টি করিবে। সেইদিন জানা গেল যে সহচর সিংহ-ব্যাঘ্রে কেবল পৃথিবী আছে, কিন্তু মনুষ্যে পৃথিবী এবং স্বর্গ দুইই আছে। সেইদিন জানা গেল যে সহচর সিংহ ব্যাঘ্র

চিরকাল নতশিরে পৃথিবীতে বিচরণ করিবে, কিন্তু মনুষ্য অনন্ত আকাশ ভেদ করিয়া বিশ্বের ঊর্ধ্বতম প্রদেশে উঠিবে। সেইদিন মনুষ্যের অনন্ত শিক্ষার, অনন্ত উন্নতির সূত্রপাত হইল। সে শিক্ষা, সে উন্নতির মূলে—ক্ষুদ্র, কোমল, কমনীয় ফুল! কেন না ঊর্ধ্বতম স্বর্গ, অনন্ত নক্ষত্ররূপী ব্রহ্মাণ্ড পৃথিবীর আর কিছুর সহিত বাঁধা নাই, কেবল ফুল-ডোরে বাঁধা। অতএব যদি স্বর্গাভিমুখী হইতে হয়, যদি অনন্ত উন্নতির পথে চলিতে হয়, তবে আদিগুরু ফুল ভুলিও না। আদি ছাড়া অন্ত নাই। ফুলের কোমলতা, ফুলের কমনীয়তা, ফুলের গগন-স্পর্ধী নির্মলতা হারাইলে উন্নতির পথে কাঁটা পড়িবে, স্বর্গযাত্রা অকালে বন্ধ হইবে। অতএব ভাইসকল, আমাদের মহারণ্যবাসী আদিপুরুষ যেমন মাথায় ফুল রাখিতেন, তেমনি করিয়া মাথায় ফুল রাখিয়া অগ্রসর হও।

ফুল, তুমি জগতের গূঢ় রহস্য!

ফুল সর্বত্রই ফোটে। মরুভূমিতেও ফোটে, উদ্যানপ্রদেশেও ফোটে, পৃথিবীর উত্তপ্ত কটিদেশেও ফোটে, মনুষ্যের বাসস্থানেও ফোটে, মনুষ্যের অগম্য প্রদেশেও ফোটে। ফুল সর্বব্যাপী।

আমি এখানে, ওখানে কি আছে জানি না। তুমি ওখানে, এখানে কি আছে জান না। ভারতে ইংলণ্ড নাই, ইংলণ্ডে ভারত নাই। ফ্রান্সে আমেরিকা নাই, আমেরিকায় ফ্রান্স নাই। এ স্থান মৃত্তিকাময়, এখানে সমুদ্র নাই। ও স্থান অগাধ সমুদ্র, ওখানে মৃত্তিকা নাই। তুমি সব জান না, আমি সব জানি না, ভারত ইংলণ্ড জানে না, ইংলণ্ড ভারত জানে না, মৃত্তিকা সমুদ্র জানে না, সমুদ্র মৃত্তিকা জানে না। ফুল সর্বত্র ফোটে। ফুল সব জানে। ফুল সর্বজ্ঞ।

ভারতবর্ষ, পারস্যদেশ, আরবদেশ, আফরিক মহাদেশ—এইসকল স্থান প্রখর রবির প্রখর রঙ্গভূমি। এই সকল স্থানে প্রখর রবিকিরণে সকলই জ্বলিয়া যায়, পুড়িয়া ছাই হইয়া যায়, জল শুকাইয়া বাষ্প হইয়া যায়, জলাধার নদীগর্ভ ফাটিয়া বিকটাকার ধারণ করে। কিন্তু এ সকল স্থানে ফুল ফোটে। আবার লাপ্‌লাণ্ড, গ্রীনল্যাণ্ড, নোভাজেম্‌লা প্রভৃতি স্থানে হিমের পরিমাণ নাই। উপরে হিম, নীচে হিম, চতুষ্পার্শ্বে হিম—যেন হিমাংশুর হিমঋতুর হিমশয্যা—হিম-দেহ, হিমপ্রাণ, হিম-আত্মা! সে হিমে কিছুই হয় না, কিছুই বাঁচে না, মানুষ জমাট হইয়া যায়, জল জমাট হইয়া যায়, জগৎ জমাট হইয়া যায়। কিন্তু সে হিমে ফুল ফোটে। ফুল সর্বশক্তিমান। ফুলের কোমলতা শক্তির প্রাণ।

সুগন্ধিনিশ্বাস বিবৃদ্ধ তৃষ্ণং বিম্বাধরাসন্নচরং দ্বিরেফম্।
প্রতিক্ষণং সম্ভ্রমলোলদৃষ্টির্লীলারবিন্দেন নিবারয়ন্তী॥

এখন বুঝিতেছি ফুল সর্বত্রই ফোটে কেন—একজন কবিনামখ্যাত ইংরেজ বলিয়াছেন :—

Full many a flower is born to blush unseen
And waste its sweetness in the desert air.

মরুভূমিতে ফুল ফুটিয়া অপচয় হয় মাত্র ! মিথ্যা কথা। অসার কথা। অগভীর আত্মার কথা। প্রশস্ত মরুভূমি—জীবশূন্য, তৃণশূন্য, বারিশূন্য—জ্বালা-ময়, অগ্নিময়—প্রকৃতির রুদ্র, বিকট, ভয়ঙ্কর মূর্তি ! যেমন করিয়া দেখ, সে মূর্তি হইতে কেবল অগ্নিশিখা নির্গত হইতেছে ; রুদ্রভাব ফাটিয়া বাহির হইতেছে ; কঠোরতা, কঠিনতা, নিষ্ঠুরতা প্রশ্বাসিত হইতেছে। কিন্তু ঐ দেখ ঐ ভয়ঙ্কর মরুভূমিতে একটি ফুল ফুটিয়াছে—ঐ কঠোর, কঠিন, নিষ্ঠুর, রুদ্র-মূর্তিতে একটি অনির্বচনীয় কোমলতা অঙ্কিত রহিয়াছে ! প্রকৃতি ঐ কোমলতায় অনুপ্রাণিত। ঐ কোমলতা লইয়া প্রকৃতি পূর্ণতাপ্রাপ্ত হইয়াছে, প্রকৃতি আপনাকে সার্থক মনে করিতেছে। তুমি দেখ আর নাই দেখ, তুমি বুঝ আর নাই বুঝ, প্রকৃতি ঐ কোমলতার গুণে পূর্ণতার ভাবে ভোর হইয়া রহিয়াছে, সজীবতা অনুভব করিতেছে, আপনার প্রাণবায়ু আপনি প্রত্যক্ষ করিতেছে। ফুল, তুমি মরুভূমিতে ফুটিও, নহিলে মরুভূমি প্রাণশূন্য হইবে এবং মহাশক্তি শক্তিহীন হইবে ! বিশ্বনিন্দিত পৌরাণিক কবি ইহা বুঝিতেন। বুঝিয়া বিকটদশনা, ভীমনয়না, খড়্গধারিণী, অসুরঘাতিনী, রক্তাক্তকলেবরা রণরঙ্গিণীকে কোমলতম নীলোৎপলসদৃশ অপরাজিতায় সুশোভিত করিয়াছেন। মরুভূমিতে ফুল না ফুটিলে মরুভূমি কি পৃথিবীতে থাকিত ? না মহাশক্তির প্রকৃত শক্তি বুঝা যাইত ? মরুভূমিতে ফুল না ফুটিলে আকাশের নক্ষত্র কেমন করিয়া মরুভূমিকে পৃথিবী বলিয়া চিনিত ? তুমি মরুভূমি দেখ আর নাই দেখ, কিন্তু মরুভূমিকে ত নক্ষত্রের কাছে পরিচিত হইতে হইবে। তাই মরুভূমিতে ফুল ফোটে। ফুলডোর ব্যতীত পৃথিবীকে আকাশের সহিত বাঁধা যায় না।

মহারণ্যে মহান্ধকার। কোথায় কিছু দেখিতে পাওয়া যায় না—যেন কোথাও কিছু নাই। সেই ভীষণ অন্ধকারের মধ্যে একটি ফুল ফুটিল। আর্যকবি গাহিলেন :—

জবাকুসুমসঙ্কাশং কাশ্যপেয়ং মহাদ্যুতিং ইত্যাদি।

সেই অবধি আর্যভক্ত মহাশক্তির পদে জবাপুষ্পের অঞ্জলি দিতেছেন।

আর্যকবিগণ বুঝিয়াছিলেন যে ফুল জগতের গূঢ়রহস্য। তাঁহাদের মতন ফুলের ভাষা আর কোথাও কেহ বুঝিতে পারে নাই। গ্রীক্ কবিগণ ফুলে যত মানসিক সৌন্দর্য দেখিতেন, তদপেক্ষা শারীরিক সৌন্দর্য দেখিতেন। তাঁহারা

বেশী ফুল কোরিনথিয়ান্ স্তম্ভের শিরোপরি চাপাইতেন। রণপ্রিয় রোমানেরা রাজপথে ফুলের মালা ঝুলাইয়া জয়োল্লাস প্রকাশ করিতেন। ইংলণ্ডে শেক্সপীয়র ফুলের ভিতর প্রবেশ করিয়া অনেক কথা বাহির করিয়া আনিয়াছিলেন। কিন্তু সে সকল কথাই পৃথিবী সম্বন্ধীয়। Midsummer Night's Dream-এও তদপেক্ষা বেশী নাই। কেবল ভারত ফুলে পৃথিবী ও স্বর্গ দুইই দেখিয়াছে। বাল্মীকি, কালিদাস, ভবভূতি ফুলে পৃথিবীর যাহা কিছু দেখিবার তাহা দেখিয়াছেন; পৌরাণিক কবিগণ ফুলে স্বর্গের অথবা বিশ্বরহস্যের সম্পূর্ণ চিত্র দেখিয়াছেন।

ফুল জগতের গূঢ়রহস্য। ফুল জগতের প্রাণ। ফুল-ডোরে স্বর্গ এবং মর্ত্য বাঁধা। ফুল ছাড়া গতি নাই, ফুল ছাড়িলে স্বর্গের দ্বার খোলা যায় না। অতএব ভারতসন্তানগণ, তোমাদের পূর্বপুরুষগণের ন্যায় ফুল মাথায় করিয়া অগ্রসর হও! কিন্তু ফুলকে শুধু ফুল বলিয়া জানিলে চলিবে না। আরাধ্য পিতৃপুরুষদিগের ন্যায় জগতের গূঢ়রহস্য, মহাশক্তির শক্তি, প্রকৃতির প্রাণ, স্বর্গদ্বারের চাবি বলিয়া না জানিলে তোমাদের যুগযুগান্তরের ফুলে—মেল ভাঙ্গিয়া যাইবে—তোমরা পৃথিবীর হাড়ী হইয়া পড়িবে।

ভাদ্র ১২৮৮

কালেজি শিক্ষা

আমরা কালেজে যে শিক্ষা পাই সে শিক্ষা কোন কাজেরই নহে। উহা না একমুখী শিক্ষা, না সর্বতোমুখী শিক্ষা। উহা যে একমুখী শিক্ষা নহে, তাহা প্রমাণ করিবার প্রয়োজন নাই। কারণ উহাতে আমাদের কোন বিষয়েই সম্পূর্ণ শিক্ষা দেয় না। উহা সর্বতোমুখী শিক্ষাও নহে। কারণ উহাতে শারীরিক শিক্ষার নামও নাই, যাহাতে হৃদয়বৃত্তির উন্নতি হয়, উহাতে তাহার কিছুই নাই, যাহাতে ইচ্ছাশক্তি বা কর্মক্ষমতা বৃদ্ধি হয়, তাহাও উহাতে নাই। উহাতে আছে শুদ্ধ কয়েকটি বুদ্ধিবৃত্তির পরিচালনা, তাহাও উচ্চতর বৃত্তিসমূহের নহে। প্রধানতঃ কেবল স্মরণশক্তির উন্নতির দিকেই অধিক দৃষ্টি।

সত্য বটে, এক্ষণে সর্বত্র জিম্নাসিয়ম হইয়াছে, কিন্তু তাহার উন্নতি নাই। কর্তৃপক্ষের তাহাতে দৃষ্টি নাই। সত্য বটে, স্কুলে কাব্যপাঠ হয়, কিন্তু তাহা হৃদয়বৃত্তিসমূহের পরিচালনার জন্য নহে, শুদ্ধ ভাষাশিক্ষার জন্য। আর বই

পড়িয়া যে হৃদয়বৃত্তির পরিচালনা, সেও বিড়ম্বনা মাত্র। ইচ্ছা বা কর্মক্ষমতার মধ্যে আমাদের থাকে পাশকরা, সুতরাং তাহা ভিন্ন অন্য বিষয়ে আমাদের কর্মক্ষমতা বড় একটা নাই।

যাহা একটু আমরা কালেজে শিখি তাহাও শিখিবার উপায়ও ভাল নহে। আমরা সব শিখি বই পড়িয়া। বিধাতা যেন আমাদের চক্ষুনামক একমাত্র জ্ঞানেন্দ্রিয় প্রদান করিয়াছেন, অপর ইন্দ্রিয় যেন কোন কাজেই আসে না। যে সকল জিনিস ঘরের দ্বারে আছে তাহাও আমরা কেতাব পড়িয়া শিখিতে যাই। দেখিয়া ও শুনিয়া আমরা কিছুই শিখি না। যে জিনিস একবার দেখিলে তৎক্ষণাৎ শিখিব এবং জন্মে ভুলিতে পারিব না, সেই জিনিস আমাদের কেতাবে পড়িয়া তিনমাসে বুঝিতে হইবে ও মুখস্থ করিয়া পরীক্ষা পর্যন্ত মনে রাখিতে হইবে। শিখিতে আমোদ হয়, এমন করিয়া কোন শাস্ত্র বা কোন বিষয়ই শিখানো হয় না। তাহার উপর যদি আবার মাষ্টারে যত্ন করিয়া বুঝাইয়া দেন তাহা হইলেও হয়। তাহা না হইয়া মাষ্টারগণ (একে ত ডাওনিসিয়সের বংশ) তাহাতে আবার ইংরেজী পড়িয়া রুক্ষমেজাজ হইয়াছে। সাহেব প্রোফেসরদিগের ত কথাই নাই। অনেকে বলেন, তুমি বুঝ আর নাই বুঝ, আমার নাম বাহির হইয়া গিয়াছে, আমার মাসিক বেতন বাড়িবে বই কমিবে না।

যদি নিজ ভাষায় শিক্ষা দেওয়া হয়, তাহা হইলে অনেকটা সহজ হয়। তাহা না হইয়া এক অতি কঠিন, অতি দূরবর্তী জাতির ভাষায় আমরা শিক্ষা পাই। শুদ্ধ সেই ভাষাটি মোটামুটি শিখিতে রোজ চারি ঘণ্টা করিয়া অন্ততঃ আট-দশ বৎসর লাগে। ভাষাশিক্ষাটি অথচ কিছুই নহে, ভাষাশিক্ষা কেবল অন্য ভাল জিনিস শিখিবার উপায়—উহাতে শিখিবার পথ পরিষ্কার হয় মাত্র —সেই পথ পরিষ্কার হইতে এত সময়ব্যয় ও এত পরিশ্রম। তবুও কি সে ভাষা বুঝা যায় ? তাহার যো কি ! বাঙ্গালা হইলে এই কেতাবী জিনিস আমরা কত অধিক পরিমাণে শিখিতাম। ইংরেজীতে আমরা কখন কথা কহি না। এখন আমরা ইংরেজীতে চিঠিপত্রও বড় লিখি না, অথচ আমাদের জ্ঞান-উপার্জনের একমাত্র দ্বার ইংরেজী। ইংরেজী আমাদের রাজভাষা। যাঁহারা ইংরেজের সংসর্গে আসিবেন তাঁহাদের ইংরেজী শিক্ষার প্রয়োজন। তাই বলিয়া ছয় কোটি ছেষট্টি লক্ষ লোক ইংরেজী পড়িয়া মরিবে কেন ? বলিবে, ইংরেজ যখন রাজা, সকলেই কোন না কোন সময়ে ইংরেজের সংসর্গে আসিবেন। স্বীকার। ইংরেজী ভাষা শিক্ষা কর, ভাল করিয়াই শিক্ষা কর। ইংরেজীতে অঙ্ক কসিতে হইবে, ইতিহাস পড়িতে হইবে, বিজ্ঞান শিখিতে হইবে—ইহার অর্থ কি ? বাঙ্গালা দিয়া ইংরেজী শিখ না কেন ? ইংরেজী দিয়া শাস্ত্র শিখিতে

যাও কেন ? আরও অধিক দুঃখের কথা এই যে, আমাদের সংস্কৃত শিখিতে হইলেও ইংরেজীমুখে শিখিতে হয়।

যেরূপ চলিতেছে ইহাতে জ্ঞান অল্প হয়, ইংরেজী শিক্ষা অল্প হয়, আর পরিশ্রম অনন্ত করিতে হয়। আর শিক্ষিতদিগের সহিত অশিক্ষিতের মনোমিল থাকে না ; শিক্ষিতগণ যেন একটি নূতন জাতি হইয়া দাঁড়ান। অত্যন্ত অধিক পরিমাণে শ্রম করিয়া অতি অল্প জ্ঞান লাভ হয়।

যাও বা শিখি তাহাও শিখিবার জন্য শিখি না ; জ্ঞান অর্জনের জন্য শিখি না। শিখি একজামিন পাশ করিবার জন্য। আচ্ছা করিয়া পড়ি ; যেমন প্রশ্ন দিক, ঠকাইতে পারিবে না—এজন্য পড়ি না, কেমন প্রশ্ন দিবে, বাছিয়া বাছিয়া তাহাই পড়ি, অনেক সময়ে মাষ্টারমহাশয়েরাও তাহাই পড়ান। ইহার এক ফল এই যে যখন এক্‌জামিন নাই তখন পড়ি না, এক্‌জামিনের সময় রাতদিন পড়ি। লাভ এই হয়, কতকগুলো গুরুপাক জিনিস উদরস্থ হয়, সব হজম হয় না। রাত জেগে যাহা পাঠ করা গেল, তাহা মাসখানেকের মধ্যে ভুলিয়া যাই।

অতএব লেখাপড়ার যে উদ্দেশ্য—মনোবৃত্তিনিচয়ের সম্যক স্ফূর্তি—তাহা একেবারেই হয় না। যে চিন্তাশক্তিবলে শিক্ষিতদিগের দ্বারা সমাজের উপকার হইবে, তাহা হয় না। চিন্তা করিবার শক্তি নাই অথচ আমি বড় বুঝি জ্ঞান, ইহার অনেক দোষ, কালেজি শিক্ষায় সে দোষগুলি সমুদয়ই ঘটে। যদিও চিন্তাশক্তি দুই-চারিজনের জন্মে তাহাও শূন্যের উপরে। যদি এরূপ হইত, তবে এইরূপ ফল হইত। কিন্তু চিন্তা abstract-এর উপর। যাহা আছে তাহার উপর নহে। যাহাই হউক, তবুও চিন্তাস্রোতঃ প্রবাহিত হইলেই সেটি বাঞ্ছনীয়। কিন্তু তাহা ত হয় না।

অতএব কালেজি শিক্ষায় চিন্তাশক্তি উত্তেজিত হয় না, উহা শুদ্ধ পরীক্ষা উত্তীর্ণ হইবার জন্য, এজন্য উহাতে জ্ঞান অর্জন হয় না। জ্ঞান অর্জন একটু আধটু হলেও ইংরেজীমুখে অর্জন করিতে হয় বলিয়া সেই একটুকুতেই অনেক শ্রম লাগে, যাহা শিখি তাহাতে বুদ্ধিবৃত্তিও দুই-পাঁচটির মাত্র চালনা হয়, হৃদয়-বৃত্তি ও ইচ্ছাশক্তির কিছুই হয় না। কোন একটি বিষয়ও সম্পর্ণরূপ শিক্ষা হয় না। কোন একটি বিষয়েও সম্পূর্ণরূপ শিক্ষা হয় না ; অতএব উহা দ্বারা পরিণামে যে করিয়া খাইবে তাহাও হয় না। কালেজে না একমুখী শিক্ষা হয়, না সর্বতোমুখী শিক্ষা হয়।

কালেজের ছেলেরা প্রায় পিতামাতা স্বজন প্রভৃতি হইতে বিচ্ছিন্ন ও সমাজ হইতে বিচ্ছিন্ন হইয়া বাসায় অথবা হিন্দু-হস্টেলে বাস করে, সুতরাং সমাজে থাকিলে ও বাড়িতে থাকিলে যে সকল মনোবৃত্তি পুষ্ট হয়, তাহার কিছুই হয়

না ; স্নেহ, মমতা, বিশেষ ভক্তি একেবারেই থাকে না। বাড়ি বা সমাজে যে সকল অভিজ্ঞতা লাভ হয়, ইহাদের তাহার কিছুই হয় না। অন্য লোকে কিসে মনে ব্যথা পাইবে, তাহা একেবারেই জ্ঞান থাকে না ; অর্থাৎ হৃদয়বৃত্তিসমূহের কিছুমাত্র স্ফূর্তি হয় না। শুদ্ধ যদি বাপ মা বা গুরুজনের চোকে চোকে থাকিত, তাহা হইলেই এ সকল লাভগুলি অবশ্যই হইত। সংসারে প্রবেশ করিয়া তাহা-দিগকে অনেক কষ্টে এই সকলগুলি শিখিতে হয়। অনেকে হয়ত অনেক জিনিস একেবারেই শিখিতে পারে না। অশিক্ষিতের সহিত সমবেদনা প্রায়ই থাকে না। ইত্যাদি ইত্যাদি।

অতএব কালেজি শিক্ষা সম্পূর্ণ শিক্ষা নহে। প্রথম, কালেজে যাহা শিক্ষা হওয়া উচিত, তাহাই আমাদের কালেজে অল্প শিক্ষা হয়। সকল শাস্ত্রের কিছু কিছু পড়ানো একেবারেই হয় না। কর্তার ইচ্ছা কর্ম হয়। একজন কর্তার খেয়াল হইল, জরীপবিদ্যা পড়ানো আরম্ভ হইল, কিন্তু ভূগোলবিদ্যা উঠিয়া গেল। ভূগোল পড়িলে দেশীয় কুসংস্কার যত শীঘ্র অপনীত হয় এত আর কিছুতেই হয় না। সেই ভূগোল উঠিয়া গেল। আর একজন বলিলেন, ছয় বিষয়ে পরীক্ষা ছেলেরা পারিবে কেন ? পাঁচ কর। আর একজন বলিলেন, পাঁচেও বেশী হয়, তিন কর। সুতরাং সমস্ত বুদ্ধিবৃত্তির পরিচালনা হয় না। শুদ্ধ কেতাব পড়িয়া শিখিতে হইলে ছয়টা বিষয় শিখা কঠিন হয় বটে, কিন্তু যদি এক-এক বিষয়ে উৎকৃষ্ট অধ্যাপকের নিকট সেই সেই বিষয় শিক্ষা হয় ও কতক দেখিয়া শুনিয়া শিখিতে পারে, তবে অনেক জিনিস অল্পে শিক্ষা হইতে পারে।

কালেজি শিক্ষা সম্পূর্ণ করিতে হইলে, উহার সঙ্গে সঙ্গে গার্হস্থ্য শিক্ষা চাই, সামাজিক শিক্ষা চাই। প্রাক্‌টিকল শিক্ষা চাই, হাতে-হাতিয়ারে অনেক কাজ করা চাই, ঠেকিয়া শিখা চাই, প্রোফেশন শিক্ষা চাই।

আমাদের দেশে ইংরেজী শিক্ষা প্রবর্তনের পূর্বে আমাদের দেশীয় ভদ্রসন্তান-গণ যে শিক্ষা পাইত, সে শিক্ষা সম্পূর্ণ শিক্ষা। কালেজি শিক্ষার সহিত তুলনা করিলে কেতাবী জিনিস তাহারা কিছুই শিখিত না। তাহারা না ভূগোল শিখিত, না ইতিহাস জানিত, না বিজ্ঞান জানিত, না গণিত জানিত। কেতাবী বিষয়ে তাহাদের শিক্ষা অল্প থাকিলেও তাহারা অন্যান্য সকল বিষয়ে অল্প পরিশ্রমে আমাদের অপেক্ষা অনেক অধিক শিখিত। কেমন করিয়া নম্র বিনীত হইতে হয়, গুরুজনের প্রতি ভক্তি করিতে হয়, কেমন করিয়া অল্প সময়, শ্রম ও অর্থব্যয়ে সুন্দররূপে সংসার চালাইতে হয়, গৃহস্থালি করিতে হয়, তাহা সুন্দররূপে শিখিত। পিতার সহিত সে সর্বত্র ফিরিত, সকল

জিনিস দেখিত, সকল সমাজে যাইত, সে জন্মিয়া অবধি মানুষ হইবার জন্য এপ্রেণ্টিস্ বা শিক্ষানবীশ থাকিত। এখনকার মত সংসার হইতে, সমাজ হইতে বিচ্ছিন্ন হইয়া অরণ্যবাস করিতে হইত না। যদিও কেতাবী শিক্ষা অল্প হইত, সর্বপ্রকার শিক্ষিত লোকের সংসর্গে আসিয়া সে অনেক প্রয়োজনীয় বিষয় আপনা আপনি শিখিত। মোটামুটি সে অনেক বিষয় জানিত। সেকালে জ্ঞানের উন্নতি ছিল না। জ্ঞানসীমা এত বর্ধিত হয় নাই, সুতরাং প্রাচীনকালে অর্থাৎ সমাজের প্রথম অবস্থায় যেমন মোটামুটি বিদ্যা ছিল, তখনও ঠিক তেমনি ছিল ; আর সেই মোটামুটি জিনিস অধিকাংশ ভদ্রসন্তান জানিত ও শিখিত। এখনকার ছেলে যদি লেখাপড়া করিতে গেল অমনি বাপ মা বলিয়া বসেন, "রাম আমার সংসারের কোন কাজই করিবে না, এ কর্ম আমার রামকে করিতে দিও না, রামের সময় নষ্ট হবে।" রাম শুদ্ধ লেখাপড়া করিয়াই সময় কাটাইলেন। যখন কালেজ হইতে বাহির হইলেন, একটি গাছবানর বাহির হইলেন। যদি ভাল চাকরি পাইলেন কি মেলা টাকা রোজগার করিলেন, একরকম চলিয়া গেল, নহিলে দাঁড়িয়ে সর্বনাশ। সমাজে গেলেন যদি, যেখানে দশজন লোকজন আছে সেখানে গেলেন যদি, একপাশে বসিয়া রহিলেন। জানেন না কেমন করিয়া লোকের সঙ্গে মিশিতে হয়, মিশিতে পারিলেন না। লোকে জানিল রামাটা লেখাপড়া শিখিলে কি হয়, বড় অহঙ্কারী, নরলোকের সঙ্গে কথাই কহেন না। আমরা রামকে বেশ জানি, রামের অহঙ্কারের লেশমাত্র নাই, শুদ্ধ শিক্ষার দোষে বেচারার নিন্দা হইল।

কালেজি শিক্ষার দোষপ্রদর্শন অনেক করা গেল। কালেজি শিক্ষার অনেক উৎকৃষ্ট গুণ আছে বলিয়াই আমরা উহার দোষপ্রদর্শনে এত যত্নবান্ হইয়াছি। আমাদের দেশীয় কালেজি শিক্ষার প্রধান গুণ এই যে উহাতে স্বাধীনচিন্তাশক্তি উদ্রেকের যেমন সুবিধা, এমন আর কিছুতেই নাই। সামাজিক অত্যাচারে, সাংসারিক (পিতৃমাতৃকৃত) অত্যাচারে, শিক্ষকদিগের অত্যাচারে চিন্তাশক্তির শ্রীবৃদ্ধি হইতে পারে না ; আমাদের কালেজে এ তিনের একটিও নাই। আমাদের কালেজের ছেলেদের কুসংস্কার যত অল্প, এত আর বোধ হয় কোথাও নাই। কিন্তু কালেজি শিক্ষার গুণকীর্তন আমাদের আবশ্যক নাই, উহার শত দোষ সত্ত্বেও আমরা উহাকে ভালবাসি ও আমরা এরূপ শিক্ষা পাইয়াছি বলিয়া আপনাদিগকে কৃতার্থ মনে করি। এবং এইরূপ মনে করি বলিয়াই অদ্য উহার দোষকীর্তনে প্রবৃত্ত হইয়াছি। যাহা হউক আমাদের সংস্কার এই যে, আর দুই সময়ে দুই জাতির অতি উৎকৃষ্ট শিক্ষা হইয়াছিল, সেই দুইটির সম্যক্ বর্ণনা করিয়া তাহাদের দোষগুণ নির্বাচন করিব। পাঠকগণ দেখিবেন, কালেজি

শিক্ষার কত উন্নতি উহা সম্পূর্ণ শিক্ষা বলিয়া গণ্য হইতে পারিবে। কালেজি শিক্ষার যদি দোষসকল অন্তর্হিত হয় তবে ইহাই পৃথিবীর সকলজাতীয় শিক্ষা অপেক্ষা উৎকৃষ্ট শিক্ষা বলিয়া পরিগণিত হইতে পারিবে।

আমরা যে দুইটি শিক্ষার কথা বলিতেছিলাম তাহার একটি ভারতবর্ষের, আর-একটি গ্রীসের। একটি ব্রাহ্মণদিগের, আর একটি এথিনীয়দিগের। একটিতে ব্রাহ্মণ তৈয়ারি হইত, আর একটিতে সিটিজেন তৈয়ারি হইত। একটির ফল সংস্কৃত সাহিত্য ও ভারতে ব্রাহ্মণজাতির চিরপ্রাধান্য, আর-একটির ফল গ্রীক আর্টস, গ্রীক সাহিত্য, গ্রীক চিন্তার চিরপ্রভুত্ব। দুই জাতিই জগতের প্রথম ও প্রধান শিক্ষক, উভয়ের শিক্ষা হইতেই অমৃতময় ফল উৎপন্ন হইয়াছে।

ব্রাহ্মণগণ হয় ১৮ না হয় ২৭ না হয় ৩৬ বৎসর পর্যন্ত গুরুকুলে বাস করিতেন। তৎকালে প্রচলিত যাবতীয় শাস্ত্রই তাঁহারা অধ্যয়ন করিতেন। বেদ বেদান্ত দর্শন সাহিত্য ব্যাকরণ চিকিৎসা—তাঁহারা এ সমস্তই কেতাব হইতে শিখিতেন। গুরু তাঁহাদিগকে শিখাইতেন, গুরু ও শিষ্যে পিতাপুত্রসম্বন্ধ। একজন ভালবাসিয়া শিখাইবার জন্য যত্ন করিত। শিক্ষা উত্তম হইত। শিষ্য গৃহস্থালিতে গুরুর সহায়তা করিতেন, সুতরাং পিতামাতা হইতে বিচ্ছিন্ন হইয়া পড়িলে যে শিক্ষা হওয়া অসম্ভব, সে শিক্ষা অতি সহজেই হইত। গুরু তাঁহাদিগকে লোকের সহিত কিরূপে ব্যবহার করিতে হয়, কিরূপে সংসারকার্য করিতে হয়, তাহা দেখাইয়া দিতেন। স্নেহ মমতা তাঁহারা গুরুকুলে অনেক শিখিতেন। গুরু তাঁহাদিগকে সমাজে যাইতে শিখাইতেন, গুরু যেখানে যাইতেন শিষ্য তাঁহার সঙ্গে থাকিতই থাকিত। শিষ্যকে অনেক শারীরিক পরিশ্রম করিতে হইত। কিন্তু শিষ্যের গৃহস্থজীবনে যা কিছু আবশ্যক হইত গুরু সমস্ত শিখাইতেন, কেমন করিয়া নিত্যনৈমিত্তিক কার্য করিতে হয়, যাগযজ্ঞ করিতে হয়, বিচার করিতে হয়, মোকর্দমার নিষ্পত্তি করিতে হয়, ব্যবস্থা দিতে হয়, এই ৩৬ বৎসর মধ্যে তাহারা সব শিখিত। তাহারা প্রাক্‌টিকেল ও থিয়োরিটিকেল দুই রকমই শিখিত। বাহির হইয়া যখন এরূপ একটি শিক্ষিত ব্রাহ্মণ সংসারক্ষেত্রে অবতীর্ণ হইলেন, তিনি সমাজের মূর্তিমান্ শক্তিস্বরূপ হইলেন। বড় বড় রাজারা তাঁহার তোষামোদ করিতে লাগিলেন। যিনি তাঁহাকে আপন রাজ্যে স্থাপন করিতে পারিলেন তিনিই মনে করিলেন আমার রাজ্য ধন্য হইল। তাঁহাকে সকলে অগ্নির সহিত তুলনা করিত, কারণ অগ্নির যেমন তেজঃ তাঁহারও তেমনি। অগ্নি যেমন সর্বভুক্ তিনিও তেমনি সর্বব্যাপিনী বিদ্যার আধার, অনন্ত শক্তির আধার। আমরা এখান হইতে বেশ দেখিতে পাইতেছি—তাঁহার শিক্ষার অনেক দোষ ছিল। তাঁহার শিক্ষা অনেকটা

প্রফেশনাল, তিনি ব্রাহ্মণের যাহা দরকার তাহাই শিখিতেন। মানুষের যাহা দরকার তাহা ত শিখিতেন না, ধর্মসম্বন্ধীয় অনেক কুসংস্কার তাঁহার থাকিয়াই যাইত। ব্রাহ্মণের শিক্ষার মধ্যে পুরোহিতের শিক্ষা অনেক থাকিত। পুরোহিত-শিক্ষায় কলাশিক্ষা একেবারে হইত না, সুরুচি (টেস্ট) বলিয়া যে জিনিস, তাহার তাঁহারা সম্পূর্ণ বিরোধী ছিলেন। ব্রাহ্মণ নৃত্য-গীতাদি শিখিলে পতিত হইতেন। তাঁহার শিক্ষার এত দোষ সত্ত্বেও তাঁহার ব্রাহ্মণের শিক্ষা সম্পূর্ণই হইত। আগে সর্বতোমুখী শিক্ষা, তাহার পর একমুখী শিক্ষা না হইয়া একমুখী শিক্ষার জন্য যতদূর প্রয়োজন, সর্বতোমুখী শিক্ষা ততদূর পাইত।

গ্রীকেরা কেতাব পড়িয়া অতি অল্প শিখিত। কথাবার্তা, নাট্যশালা, সভাগৃহ প্রভৃতি হইতে তাহাদের শিক্ষা হইত। হৃদয়বৃত্তির পরিচালনা তাহাদের সম্পূর্ণরূপ হইত। তাহাদের মত উৎকৃষ্ট রুচি আর কোন জাতির আছে কি ? তাহাদের নাটক, তাহাদের কাব্য, তাহাদের ভাস্করকার্য, তাহাদের রুচিশিক্ষার উৎকৃষ্ট পরিচয় দিতেছে। শারীরিক শিক্ষা তাহাদের মত আর কাহারও হইত না, তাহাদের মেলায় পারিতোষিক দেওয়া হইত, সেই পারিতোষিক পাইত বলিয়া সকলেই ব্যায়াম করিত, শরীরের সর্বাঙ্গীণ পুষ্টি গ্রীকদিগের যেমন হইত, এমন কি আর কখন কোন জাতির হইয়াছে ? তাহাদের মধ্যে শারীরিক দোষবিশিষ্ট অন্ধ, কুব্জ, খঞ্জ অতি অল্প ছিল। সৌন্দর্য তাহাদের প্রায়-সকলেরই ছিল। বিশ্রীলোক, কানা, খোঁড়া, কুৎসিত তাহাদের দেশে হইতেই পারিত না।

তাহারা সকল প্রকার শিক্ষার জন্য প্রাইজ দিত ; হেরোডোটস্ ইতিহাস লিখিয়া পড়িলেন, পারিতোষিক পাইলেন, যে, যে কোন কাজই করুক না কেন যদি তাহাতে সাধারণ লোকের সন্তোষ হইল, অমনি প্রাইজ। এত উৎসাহে গ্রীকদিগের যে সর্বাঙ্গীণ সুন্দর শিক্ষা হইবে আশ্চর্য কি ! বুদ্ধিবৃত্তির পরিচালনা গ্রীসে যত হইয়াছিল, এত আর কোন জাতির হয় নাই ; সাহিত্য বিজ্ঞান দর্শনের যে শুদ্ধ সূত্রপাত হইয়াছিল এমন নহে, অনেক উন্নতিও গ্রীসে হইয়াছিল। কর্মক্ষমতা গ্রীকদিগের মত আর কাহার ছিল ? দুই-পাঁচজন লোকের প্রতিজ্ঞায় যেখানে পারস্যরাজ্যের অক্ষৌহিণী সূর্যকরস্পৃষ্ট নীহারবৎ দ্রবীভূত হইয়া গেল, তাহাদের মত কার্যক্ষমতা দৃঢ় প্রতিজ্ঞা কাহার ? বাস্তবিক গ্রীকবিশেষ এথিনীয়দিগেব মত সর্বাঙ্গীণ শিক্ষা আর কোন জাতির কখন হয় নাই।

কিন্তু এত উৎকৃষ্ট শিক্ষা তাহারা বিনা পরিশ্রমে লাভ করিত। শুদ্ধ বিনা পরিশ্রমেই বলি কেন, তাহারা আমোদ করিয়া শিখিত। ইশ্চাইনিস সফোক্লিস

তাহাদের শিক্ষা দিত। তাহারা শুদ্ধ আমোদের জন্য থিয়েটারে আসিত, অথচ কিছু না কিছু শিখিয়া যাইত।

আবার নাগরিকদিগকে রাজ্যের সমস্ত কার্য করিতে হইত, তাহাতে তাহাদের প্রাক্টিকাল শিক্ষাও অনেক হইত। নাগরিকগণ বিচার করিতে শিখিত, মন্ত্রিসভায় পরামর্শ দিতে শিখিত, অথচ কাজ করিতেছি বলিয়া কাহারও গায়ে লাগিত না।

ব্রাহ্মণদিগের শিক্ষা ধর্মপ্রধান, গ্রীকদিগের সৌন্দর্যপ্রধান। সুতরাং গ্রীকদিগের শিক্ষা ক্রমে ছড়াইয়া সমস্ত নাগরিকগণমধ্যে পরিব্যাপ্ত হইয়াছিল; ব্রাহ্মণদিগের উচ্চতর শিক্ষা গুটাইয়া ক্রমে অল্পসংখ্যকমাত্র লোকে ন্যস্ত হইয়াছিল। গ্রীকেরা ইচ্ছা না থাকিলেও আপনি শিখিতে বাধ্য হইত, ব্রাহ্মণেরা অনেক যত্ন ও শ্রম করিয়া শিখিত।

আমাদের কালেজি শিক্ষা এ দুইয়ের কোনটিরই মত নহে। কিন্তু দোষ সংশোধন করিয়া লইলে ইহা হইতে গ্রীকদিগের অপেক্ষাও উচ্চতর শিক্ষা হইতে পারে। কারণ আমাদের শিক্ষায় স্বাধীন চিন্তার বড় শ্রীবৃদ্ধি হইবার সম্ভাবনা। গ্রীকদিগের কুসংস্কারাপন্ন নাগরিকগণের দোষে তাহা কখনই হইতে পারিত না। যেখানে সক্রেতিসকে নাস্তিক ও দেবদ্বেষী বলিয়া বধ করিল, তাহাদের চিন্তাশক্তি আধুনিক বাঙ্গালি শিক্ষিত যুবকদিগের মত উন্নতরূপিণী ছিল কেমন করিয়া বলিতে পারি।

ভাদ্র ১২৮৭

জাত ভিক্ষুক

এক শ্রেণীর নিন্দকেরা আমাদের ভিক্ষুক বলিয়া উপহাস করেন। তাঁহারা বলেন যে বাঙ্গালিরা ভিক্ষা করেন, কিন্তু তাহা অভাবহেতু নহে, স্বভাবহেতু।

তাঁহারা বলেন যে আমরা নামফের করিয়া ভিক্ষা করি! ভিক্ষাও করি অথচ ভিক্ষাকে ভিক্ষা বলি না। আমাদের পদ ও প্রয়োজন অনুসারে ভিক্ষার নানাপ্রকার নাম দিই। যথা, রাজারাজড়ার ভিক্ষার নাম নজর। জমিদারের ভিক্ষার নাম মাগন। কুটুম্বের ভিক্ষার নাম বিদায়। সমতুল্যের ভিক্ষার নাম মর্যাদা। পূজ্যের ভিক্ষার নাম প্রণামী। স্নেহপাত্রের ভিক্ষার নাম আশীর্বাদী।

বিবাহ উপলক্ষে বরের ভিক্ষার নাম পণ। বরযাত্রীর ভিক্ষার নাম গণ। কন্যা-যাত্রীর ভিক্ষার নাম ডেলাভাঙ্গানী। যুবতীর ভিক্ষার নাম শয্যাতোলানী। কেবল পোড়া দরিদ্র ব্যক্তির ভিক্ষার নাম ভিক্ষাই রহিয়াছে।

নিন্দকেরা আরও বলেন যে এখানে সকলই বিপরীত। ধনবান্ জমিদারগণ দরিদ্র প্রজার নিকট ভিক্ষা করেন। দাম্ভিক কুলীন উপায়হীনা পত্নীর নিকট ভিক্ষা করেন।

এই নিন্দকেরা বিবেচনা করেন যে আমাদিগের যৎকিঞ্চিৎ কেহ দান করিলেই আমরা সম্মানিত বোধ করি। এইজন্য আত্মীয়ের বাটীতে বিদায় লই, বরযাত্রে গণ লই, সামান্য লোকের বাটীতে আহার করিয়া কখনও মর্যাদা বলিয়া, কখন বা দক্ষিণা বলিয়া কিঞ্চিৎ কিঞ্চিৎ লই।

নিন্দকেরা আরও বলেন যে আমরা আজন্মমরণ কেবল ভিক্ষাই করি। একবার ভূমিষ্ঠ হইবামাত্রেই যৌতুক লই, আবার অন্নপ্রাশনে লই। পুনরায় উপনয়নে ভিক্ষা করি। সেই সময় মাতা মাতুলানী প্রভৃতি সকলের নিকট ভিক্ষা করি। তখন প্রকৃত প্রস্তাবে ঝুলি স্কন্ধে করিয়া ভিক্ষা করি। লক্ষপতি হইলেও সেই সময় আমাদের ভিক্ষা করিতেই হইবে। ভিক্ষা যে আমাদের জীবনের উদ্দেশ্য, চিরকালের আশা ভরসা, তাহা এই সময়ে শিখিতে হইবে। অন্নপ্রাশনে যাহাই হউক, উপনয়ন অবধি আমাদের ভিক্ষা আরম্ভ হয়, পরে রাজাই হই আর প্রজাই হই, ভিক্ষা আমাদের অত্যাজ্য। তখন জমিদার হইয়া ভিক্ষা করি, সরকারি কার্য করিয়া ভিক্ষা করি, বেদিতে বসিয়া ভিক্ষা করি। টোল বাঁধিয়া ভিক্ষা করি। দেবতা পুষিয়া ভিক্ষা করি। কন্যার বয়স বাড়াইয়া ভিক্ষা করি। লোকের বিবাহে ভিক্ষা করি। লোকের শ্রাদ্ধে ভিক্ষা করি। আবার আপনার শ্রাদ্ধেও ভিক্ষা করি। কিন্তু এই শেষ ভিক্ষাটি—মারফতে শ্রাদ্ধাধিকারী।

বাঙ্গালির ব্রাহ্মণীও বড় মন্দ নন! তিনি গৃহে পদার্পণ মাত্রই মুখ দেখাইয়া কিছু কিছু ভিক্ষা করিয়া দেন।

এইরূপে, নিন্দকেরা বলেন যে আবালবৃদ্ধবনিতা আমরা সকলেই ভিক্ষা করি। আমাদের ধর্মে ভিক্ষা, কর্মে ভিক্ষা, শোকে ভিক্ষা, তাপে ভিক্ষা, হর্ষে ভিক্ষা, সকল উপলক্ষেই ভিক্ষা। ভিক্ষা আমাদের হাড়ে হাড়ে প্রবেশ করিয়াছে। অধিক কি, আমরা যে দেবাদিদেব মহাদেব কল্পনা করিয়াছি, তাঁহাকেও ভিক্ষুক সাজাইয়া তাঁহার স্কন্ধে ঝুলি ঝুলাইয়া দিয়াছি। তাঁহারে ভিক্ষুক ভাবিয়া পূজা করি। আমাদের উপযুক্ত দেবতা বটে!

নিন্দকেরা অল্পে ছাড়েন না। তাঁহারা বলেন যে গুরু শব্দে বাটীর বাঁধা

ভিক্ষুক বুঝায়। গুরু, পুত্রপৌত্রাদিক্রমে ভিক্ষা করিবেন। আমরা কিংবা আমাদের ওয়ারীশান কেহ কস্মিনকালে কোন ওজর আপত্তি করিতে পারিবে না। যদি করি কি করে তবে সে বাতিল ও নামঞ্জুর।

এদেশের ভিক্ষুকগণ দয়া উদ্দীপন করিয়া ভিক্ষা করে না, বল দ্বারা করে, অতএব না পাইলে সহজে ফেরে না। কেহ দণ্ড করেন, কেহ ভ্রূভঙ্গী করেন, আবার কোন ভিখারী 'কেন দিবিনে' বলিয়া ফিরিয়া দাঁড়ান। জমিদারকে ভিক্ষা না দিলে তিনি জরিমানা করেন ; ঘর দরওয়াজা ভাঙ্গিয়া দেন। ব্রাহ্মণকে না দিলে তিনি অভিসম্পাত করেন, নির্বংশ করিবেন ইচ্ছায় পৈতা ছেঁড়েন। শ্রাদ্ধের ভিখারীরা মনের মত না পাইলে স্বর্গীয় ব্যক্তির নরক দেখান। পশ্চিমে ভিখারীরা মনস্তুষ্টি না হইলে ধরনা দেন। এইরূপ অনেক প্রকার শাসন দ্বারা এদেশের ভিখারীরা ভিক্ষা করেন। অপর কি, তীর্থস্থানে লোক ঝাঁটা মারিয়া ভিক্ষা করে।

ভিক্ষার আবার আসবাব আছে। কাহারো আসবাব ভস্ম, কাহারো আসবাব মালাচন্দন। কাহারো আসবাব কাঁথাঝুলি, কাহারো আসবাব হাতিঘোড়া। কাহারো আসবাব জটাশ্মশ্রু, কাহারো আসবাব মস্তকমুণ্ডন। কাহারো আসবাব দন্তে তৃণ, কাহারো আসবাব গলায় কুড়ালি। কাহারো কেবল ভরসা সরু তিলক কাহারো ভরসা দীর্ঘ ফোঁটা। কেহ উলঙ্গ, কেহ পট্টবস্ত্র পরিধান। কাহারো আসবাব কেবল যজ্ঞোপবীত, কাহারো আসবাব গলায় দড়ি। কাহারো দাবি কুলীন সন্তান বলিয়া, কাহারো দাবি গৃহে কুমারী কন্যা বলিয়া। কাহারো দাবি বাহু ঊর্ধ্ব রাখিয়াছেন এই বলিয়া, কাহারো দাবি কোন অঙ্গ ইচ্ছাপূর্বক নষ্ট করিয়াছেন, এই বলিয়া। এইরূপ নানাপ্রকার আছে।

এই সকল আসবাব অনুসারে আবার সম্মান ও স্বভাবেরও বিভিন্নতা হইয়া থাকে। সরু তিলক অপেক্ষা মোটা ফোঁটার মান বেশি। যিনি ইচ্ছাপূর্বক কোন অঙ্গ নষ্ট করিয়াছেন তাঁহার সর্বাপেক্ষা দাবি বেশি। যিনি মাথায় কাল্পনিক জটা জড়াইয়াছেন তাঁহার সকল অপেক্ষা রাগ বেশি।

বৈশাখ ১২৮০

তৈল

তৈল যে কি পদার্থ, তাহা সংস্কৃত কবিরা কতক বুঝিয়াছিলেন, তাঁহাদের মতে তৈলের অপর নাম স্নেহ। বাস্তবিকও স্নেহ ও তৈল একই পদার্থ; আমি তোমায় স্নেহ করি, তুমি আমায় স্নেহ কর, অর্থাৎ আমরা পরস্পরকে তৈল দিয়া থাকি। স্নেহ কি? যাহা স্নিগ্ধ বা ঠাণ্ডা করে তাহার নাম স্নেহ। তৈলের ন্যায় ঠাণ্ডা করিতে আর কিসে পারে।

সংস্কৃত কবিরা ঠিক বুঝিয়াছিলেন! সেহেতু তাঁহারা সকল মনুষ্যকেই সমানরূপ স্নেহ করিতে বা তৈলপ্রদান করিতে উপদেশ দিয়াছেন!

বাস্তবিকই তৈল সর্বশক্তিমান্, যাহা বলের অসাধ্য, যাহা বিদ্যার অসাধ্য, যাহা ধনের অসাধ্য, যাহা কৌশলের অসাধ্য, তাহা কেবল একমাত্র তৈল দ্বারা সিদ্ধ হইতে পারে।

যে সর্বশক্তিময় তৈল ব্যবহার করিতে জানে সে সর্বশক্তিমান্। তাহার কাছে জগতের সকল কাজই সোজা, তাহার চাকরির জন্য ভাবিতে হয় না— উকিলিতে পসার করিবার জন্য সময় নষ্ট করিতে হয় না—বিনা কাজে বসিয়া থাকিতে হয় না, কোন কাজেই শিক্ষানবিশ থাকিতে হয় না।

যে তৈল দিতে পারিবে তাহার বিদ্যা না থাকিলেও সে প্রফেসার হইতে পারে, আহাম্মুক হইলেও ম্যাজিস্ট্রেট হইতে পারে, সাহস না থাকিলেও সেনাপতি হইতে পারে এবং দুর্লভরাম হইয়াও উড়িষ্যার গভর্নর হইতে পারে।

তৈলের মহিমা অতি অপরূপ, তৈল নহিলে জগতের কোন কার্য সিদ্ধ হয় না। তৈল নহিলে কল চলে না, প্রদীপ জ্বলে না, ব্যঞ্জন সুস্বাদু হয় না, চেহারা খোলে না, হাজার গুণ থাকুক তাহার পরিচয় পাওয়া যায় না। তৈল থাকিলে তাহার কিছুরই অভাব থাকে না।

সর্বশক্তিময় তৈল নানারূপে সমস্ত পৃথিবী ব্যাপ্ত করিয়া আছেন। তৈলের যে মূর্তিতে আমরা গুরুজনকে স্নিগ্ধ করি তাহার নাম ভক্তি, যাহাতে গৃহিণীকে স্নিগ্ধ করি তাহার নাম প্রণয়, যাহাতে প্রতিবেশীকে স্নিগ্ধ করি তাহার নাম মৈত্রী, যাহা দ্বারা সমস্ত জগৎকে স্নিগ্ধ করি তাহার নাম শিষ্টাচার ও সৌজন্য "ফিলনথ্রপি"; যাহা দ্বারা সাহেবকে স্নিগ্ধ করি তাহার নাম লয়েলটি, যাহা দ্বারা বড়লোককে স্নিগ্ধ করি তাহার নাম নম্রতা বা মডেস্টি। চাকর-বাকর প্রভৃতিকেও আমরা তৈল দিয়া থাকি, তাহার পরিবর্তে ভক্তি বা যত্ন পাই। অনেকের নিকট তৈল দিয়া তৈল বাহির করি।

পরস্পর ঘর্ষিত হইলে সকল বস্তুতেই অগ্ন্যুদ্গম হয়, সেই অগ্ন্যুদ্গম নিবারণের একমাত্র উপায় তৈল। এই জন্যই রেলের চাকায় তৈলের অনুকল্প চর্বি দিয়া থাকে। এই জন্যই যখন দুইজনে ঘোরতর বিবাদে লঙ্কাকাণ্ড উপস্থিত হয়, তখন রফা নামক তৈল আসিয়া উভয়কে ঠাণ্ডা করিয়া দেয়। তৈলের যদি অগ্নিনিবারণী শক্তি না থাকিত তবে গৃহে গৃহে গ্রামে গ্রামে পিতা-পুত্রে, স্বামী-স্ত্রীতে, রাজায়-প্রজায় বিবাদ বিসংবাদে নিরন্তর অগ্নিস্ফুলিঙ্গ নির্গত হইত।

পূর্বেই বলা গিয়াছে, যে তৈল দিতে পারে সে সর্বশক্তিমান। কিন্তু তৈল দিলেই হয় না। দিবার পাত্র আছে, সময় আছে, কৌশল আছে।

তৈল দ্বারা অগ্নি পর্যন্ত বশতাপন্ন হয়। অগ্নিতে অল্প তৈল দিয়া সমস্ত রাত্রি ঘরে আবদ্ধ রাখা যায়। কিন্তু সে তৈল মূর্তিমান্।

কে যে তৈল দিবার পাত্র নয়, তাহা বলা যায় না। পুঁটে তেলি হইতে লাটসাহেব পর্যন্ত সকলেই তৈল দিবার পাত্র। তৈল এমন জিনিস নয় যে নষ্ট হয়। একবার দিয়া রাখিলে নিশ্চয়ই কোন না কোন ফল ফলিবে। কিন্তু তথাপি যাহার নিকট উপস্থিত কাজ আদায় করিতে হইবে সেই তৈলনিষেকের প্রধান পাত্র।

সময়—যে সময়েই হউক তৈল দিয়া রাখিলেই কাজ হইবে। কিন্তু উপযুক্ত সময়ে অল্প তৈলে অধিক কাজ হয়।

কৌশল—পূর্বেই উল্লেখ করা গিয়াছে যেরূপেই হউক তৈল দিলে কিছু না কিছু উপকার হইবে। যেহেতু তৈল নষ্ট হয় না তথাপি দিবার কৌশল আছে। তাহার প্রমাণ ভট্টাচার্যেরা সমস্ত দিন বকিয়াও যাহার নিকট ১।০ পাঁচ সিকা বই আদায় করিতে পারিল না—একজন ইংরেজীওয়ালা তাহার নিকট অনায়াসে ৫০ টাকা বাহির করিয়া লইয়া গেল। কৌশল করিয়া একবিন্দু দিলে যত কার্য হয় বিনা কৌশলে কলস কলস ঢালিলেও তত হয় না।

ব্যক্তিবিশেষে তৈলের গুণতারতম্য অনেক আছে। নিষ্কৃত্রিম তৈল পাওয়া অতি দুর্লভ। কিন্তু তৈলের এমনি একটি আশ্চর্য সম্মিলনীশক্তি আছে যে তাহাতে যে উহা অন্য সকল পদার্থের গুণই আত্মসাৎ করিতে পারে। যাহার বিদ্যা আছে তাহার তৈল আমার তৈল অপেক্ষা মূল্যবান। বিদ্যার উপর যাহার বুদ্ধি আছে তাহার আরও মূল্যবান। তাহার উপর যদি ধন থাকে তবে তাহার প্রতিবিন্দুর মূল্য লক্ষ টাকা। কিন্তু তৈল না থাকিলে তাহার বুদ্ধি থাকুক, হাজার বিদ্যা থাকুক, হাজার ধন থাকুক, কেহই টের পায় না।

তৈল দিবার প্রবৃত্তি স্বাভাবিক। এ প্রবৃত্তি সকলেরই আছে এবং সুবিধা

মতে আপন গৃহে ও আপন দলে সকলেই ইহা প্রয়োগ করিয়া থাকে, কিন্তু অনেকে এত অধিক স্বার্থপর যে বাহিরের লোককে তৈল দিতে পারে না। তৈলদানপ্রবৃত্তি স্বাভাবিক হইলেও উহাতে কৃতকার্য হওয়া অদৃষ্টসাপেক্ষ।

আজকাল বিজ্ঞান, শিল্প প্রভৃতি শিখাইবার জন্য নানাবিধ চেষ্টা হইতেছে। যাহাতে বঙ্গের লোক প্রাক্টিক্যাল অর্থাৎ কাজের লোক হইতে পারে তজ্জন্য সকলেই সচেষ্ট, কিন্তু কাজের লোক হইতে হইলে তৈলদান সকলের আগে দরকার—অতএব তৈলদানের একটি স্কুলের নিতান্ত প্রয়োজন। অতএব আমরা প্রস্তাব করি, বাছিয়া বাছিয়া কোন রায়বাহাদুর অথবা খাঁ বাহাদুরকে প্রিন্সিপ্যাল করিয়া শীঘ্র একটি স্নেহনিষেকের কালেজ খোলা হয়। অন্ততঃ উকিলি শিক্ষার নিমিত্ত লা কালেজে একজন তৈল অধ্যাপক নিযুক্ত করা আবশ্যক। কালেজ খুলিতে পারিলে ভালই হয়।

কিন্তু এরূপ কালেজ খুলিতে হইলে প্রথমতই গোলযোগ উপস্থিত হয়। তৈল সবাই দিয়া থাকেন—কিন্তু কেহই স্বীকার করেন না যে আমি দিই। সুতরাং এ বিদ্যার অধ্যাপক জোটা ভার, এ বিদ্যা শিখিতে হইলে দেখিয়া শুনিয়া শিখিতে হয়। রীতিমত লেকচার পাওয়া যায় না। যদিও কোন রীতিমত কালেজ নাই তথাপি যাঁহার নিকট চাকরির বা প্রোমোশনের সুপারিশ মিলে তাদৃশ লোকের বাড়ি সদাসর্বদা গেলে উত্তমরূপ শিক্ষালাভ করা যাইতে পারে। বাঙ্গালির বল নাই, বিক্রম নাই, বিদ্যাও নাই, বুদ্ধিও নাই। সুতরাং বাঙ্গালির একমাত্র ভরসা তৈল—বাঙ্গালায় যে কেহ কিছু করিয়াছেন সকলই তৈলের জোরে। বাঙ্গালিদিগের তৈলের মূল্য অধিক নয়। এবং কি কৌশলে সেই তৈল বিধাতৃপুরুষদিগের সুখসেব্য হয়, তাহাও অতি অল্প লোক জানে। যাঁহারা জানেন তাঁহাদিগকে আমরা ধন্যবাদ দিই। তাঁহারাই আমাদের দেশের বড় লোক, তাঁহারাই আমাদের দেশের মুখ উজ্জ্বল করিয়া আছেন।

তৈলবিধাতৃপুরুষদিগের সুখসেব্য হইবে ইচ্ছা করিলে সে শিক্ষা এদেশে হওয়া কঠিন। তজ্জন্য বিলাত যাওয়ার আবশ্যক। তত্রত্য রমণীরা এ বিষয়ের প্রধান অধ্যাপক, তাহাদের প্র, হইলে তৈল শীঘ্র কাজে আইসে।

শেষ মনে রাখা উচিত এক তৈলে চাকা ঘোরে আর তৈলে মত ফেরে।

চৈত্র ১২৮৫

পরিশিষ্ট । ১

'কোম্‌ৎ দর্শন' প্রবন্ধের শেষে এই পাদটীকাটি সংযোজিত হবে :

(১) কোম্‌ৎ যে এমন কথা বলিয়াছেন, পাঠকবর্গের মধ্যে অনেকেই বিশ্বাস করিবেন না। পজিটিভ পলিটিক গ্রন্থের ইংরেজি অনুবাদ সমাপ্ত হইয়াছে ; কিন্তু ঐ অনুবাদ অদ্যাপি প্রচারিত হয় নাই। অতএব আমরা মূল গ্রন্থ হইতে তাঁহার রচনা উদ্ধৃত করিতে বাধিত হইলাম ;—

"Si 'appareil masculin ne contribute a notre generation qued' apres une simple excitation derivée de sa destination organique, on Concoit la possibilité de remplacer ce stimulant par un o U· plusieuy antres, dont la femme disposerait librement, L' absence d'une tilie faculté chez les espéces voisines re saurit suffire pour l' interdire a´ la race la plus éminente at la plus modifiable. be privilcége s'y brouvait en harmonie once d' antres parcularités relatives a la memejunction ou la menstruation Constitute without surtont une amélioration décesive, éleanchée chez les principaux animaux, mais developpée pur notre civilisation." Comte's Systéme de Politique Positive, Tome IV, p. 68.

পরিশিষ্ট । ২

॥ লেখকপরিচিতি ॥

অক্ষয়চন্দ্র সরকার । (১৮৪৬—১৯১৭)

শিক্ষা-দীক্ষা ও রুচিগঠনে পিতা গঙ্গাচরণ দ্বারা প্রভাবিত। এন্‌ট্রান্স পরীক্ষায় প্রথম (১৮৬৩), বিবাহ (১৮৬৪), এল. এ (১৮৬৫), বি. এ. (১৮৬৭), বি. এল (১৮৬৮) ও সঙ্গে সঙ্গে বহরমপুরে ওকালতি শুরু। মাতৃসেবার জন্য ১৮৭৩ সালে কর্মত্যাগ ও সেই থেকে চুঁচুড়ায় স্থায়ী বসবাস। সাপ্তাহিক সাধারণীর প্রথম প্রকাশ ২৬।১০।৭৩। ২৬শে জুলাই ১৮৭৬ ইণ্ডিয়ান অ্যাসোসিয়েশন প্রতিষ্ঠা—সম্পাদক আনন্দমোহন বসু ও সহসম্পাদক অক্ষয়চন্দ্র। অমর চতুষ্পাঠী ও সাধারণী এইচ. ই. স্কুল প্রতিষ্ঠা। ব্রহ্মবান্ধব উপাধ্যায়ের সঙ্গে সংযোগ। সাংবাদিক পাঁচকড়ি বন্দ্যোপাধ্যায়, বিপিনচন্দ্র পাল, ক্ষীরোদপ্রসাদ বিদ্যাবিনোদ, সুরেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় তাঁকে গুরুরূপে স্বীকৃতি জানিয়েছেন।

চন্দ্রশেখর মুখোপাধ্যায় । (১৮৪৯—১৯২২)

মুর্শিদাবাদ ঠাকুরদাস বিদ্যারত্নের টোলে শিক্ষারম্ভ, পরে রামনারায়ণ বিদ্যারত্নের কাছে সংস্কৃত শিক্ষা। ১৮৬৬ সালে এন্‌ট্রান্স, ১৮৬৯ এফ. এ., বি. এ. ১৮-৭২। বিবাহ ছাত্রজীবনে, প্রথমা স্ত্রীবিয়োগ ১৮৭৩। 'জ্ঞানাঙ্কুর'-সম্পাদক শ্রীকৃষ্ণ দাস তাঁর সতীর্থ ছিলেন ; তাঁর সম্পাদিত পত্রে প্রকাশিত 'বিদ্যা-বিড়ম্বনা' (বৈশাখ ১২৮০) সুধীসমাজের দৃষ্টি আকর্ষণ করে। প্রথমে

বহরমপুরে, পরে ১৮৯০ থেকে কলকাতায় আইন-ব্যবসায়ী। মনের মতো চাকরি পান মহারাজা মণীন্দ্রচন্দ্র নন্দীর কাশিমবাজার এস্টেটে। নামে ম্যানেজার কিন্তু সাহিত্যচর্চা এবং 'উপাসনা'-সম্পাদনাই তাঁর কাজ ছিল। 'শ্মশানে ভ্রমণ' (আশ্বিন ১২৮২) বঙ্গদর্শনে প্রকাশিত তাঁর প্রথম রচনা—উদ্‌ভ্রান্ত প্রেমের অংশবিশেষ। 'মসলা-বাঁধা কাগজ' প্রথম প্রকাশিত গ্রন্থ। জ্ঞানাঙ্কুরে ১২৮০-৮১ সালের মধ্যে প্রথম ধারাবাহিক প্রকাশিত। কমলাকান্তী রচনারীতি অনুসৃত। বঙ্গদর্শন, বান্ধব, জ্ঞানাঙ্কুর এবং মাসিক সমালোচকের কয়েকটি প্রবন্ধ নিয়ে 'সারস্বত কুঞ্জ' (১২৯২) গ্রথিত। 'বঙ্গে ধর্মভাব' প্রবন্ধটি রাজনারায়ণ [illegible] 'হিন্দু ধর্মে শ্রেষ্ঠতা' গ্রন্থের সমালোচনাক্রমে লিখিত। এতে তিনি কোম্‌ৎ, মিল, হার্বাট স্পেনসার ও হক্সলির মতের আলোচনা করেছেন। তাঁর নিজের ধারণা 'সমাজের হিতের জন্য, মানবের মঙ্গলের জন্য ধর্মভাবের আবশ্যকতা আছে।' 'কুঞ্জলতার মনের কথা' ৩৭ পৃষ্ঠার একটি ছোট পুস্তিকা নানা কারণে উল্লেখযোগ্য। এঁর রচনাভঙ্গি সরস, উপন্যাসধর্মী, শ্লেষমধুর। জটাধারী ওরফে চন্দ্রশেখর বন্দ্যোপাধ্যায়ের একটি রচনার সঙ্গে হুবহু মিলও কৌতূহলোদ্দীপক।

চন্দ্রশেখর বন্দ্যোপাধ্যায়। (?—১৮৮৫)
বঙ্গদর্শন প্রথম সংখ্যায় কিংবা 'বঙ্গদর্শনের বিদায়' প্রবন্ধে চন্দ্রশেখরের নাম নেই। ১৮৮৩-৮৪ সালে সরকারী কাজে কটক বাসের সময় বঙ্কিমের সঙ্গে তাঁর পরিচয়। অবশ্য তার পূর্বেই ক্যালকাটা রিভিউ এবং রয়েল এশিয়াটিক সোসাইটি জার্নালে তাঁর প্রবন্ধ বের হয়। জটাধারী শর্মা এবং C. S. B. নামেও তিনি লিখতেন। 'প্রবন্ধরত্ন' নামে তাঁর একটি প্রবন্ধসংকলন আছে। তাঁর কয়েকটি কাব্য-নাটকও আছে। সবচেয়ে উল্লেখ্য রচনা 'জটাধারীর রোজনামচা' বঙ্গদর্শনে (১২৮৪ বৈশাখ থেকে ফাল্গুন) প্রকাশিত হয়!

রাজকৃষ্ণ মুখোপাধ্যায়। (১৮৪৫—১৮৮৬)
১৮৬৬ সালে দর্শনে অনার্সসহ প্রথম শ্রেণীতে প্রথম, ১৮৬৭ সালে এম. এ, প্রথম শ্রেণী। বহরমপুরে ওকালতি, আইন অধ্যাপনা, দর্শন অধ্যাপনা করেন। 'নানা প্রবন্ধ' বহুকাল পর্যন্ত পাঠ্য ছিল। 'বাঙ্গালার ইতিহাস' তাঁর শ্রেষ্ঠ রচনা। বঙ্কিমের মতে 'মুষ্টিভিক্ষা, কিন্তু ইহা স্বর্ণমুষ্টি'। বঙ্গদর্শনের পূর্বে তিনি প্রবন্ধ লেখেননি। সম্পাদনার কাজে তিনি এত অন্তরঙ্গভাবে জড়িত ছিলেন যে তাঁর মৃত্যুর পর প্রেসিডেন্সি কলেজ রেজিস্টারে তাঁকে বঙ্গদর্শনের সহ-সম্পাদক রূপে চিহ্নিত করা হয়। যৌবনোদ্যান, মিত্রবিলাপ এবং রাজবালা উপন্যাসও সেকালে জনপ্রিয় ছিল। তিনি মেঘদূতের অনুবাদ করেন।

মৃত্যুতে রচিত গিরীন্দ্রমোহিনী দাসীর কবিতা ব্যক্তিজীবনের দিক থেকে উল্লেখযোগ্য।

লালমোহন বিদ্যানিধি। (১৮৪৫—১৯১৬)
মহানন্দ সরকারের পাঠশালায় শিক্ষারম্ভ। শিবচন্দ্র তর্কভূষণ, জ্যেষ্ঠতাত কৃষ্ণানন্দ ও হরিশচন্দ্র বিদ্যালঙ্কারের কাছে সংস্কৃত শিক্ষা। অবৈতনিক ছাত্ররূপে সংস্কৃত কলেজে প্রবেশ (১৮৫৮)। প্রথম রচনা 'কাব্যনির্ণয়' (১৮৬২)। ১৮৬৭ সালে 'বিদ্যানিধি' উপাধি লাভ। কটকে অধ্যাপনা শুরু (১৮৬৮), সরকারী শিক্ষাবিভাগে নানা কাজের পর প্রথম সেন্সাসে রিজলে সাহেবের সহযোগী। দেবনাগরী অক্ষরে সটীক 'মেঘদূতম্' প্রকাশ, শ্রেষ্ঠ গ্রন্থ 'সমন্ধ-নির্ণয়' (১৮৭৪) প্রকাশ। নব্য ভারত, আশ্বিন ১৩১২ সংখ্যায় লেখা হয়, 'রাজেন্দ্রলাল মিত্র, রামদাস বাবু ও প্রফুল্লচন্দ্র সকলেই ইতিহাস রচনায় ইউরো-পীয় পন্থা অবলম্বন করিয়াছিলেন, কিন্তু সম্বন্ধনির্ণয়-প্রণেতা পণ্ডিত লালমোহন বিদ্যানিধি মহাশয় যে প্রণালী অবলম্বন করিয়াছিলেন তাহা সম্পূর্ণ দেশীয়।'

হরপ্রসাদ শাস্ত্রী। (১৮৫৬—১৯৩১)
প্রতিকূল অবস্থার সঙ্গে সংগ্রাম করে চতুষ্পাঠী থেকে এম. এ. পরীক্ষা—প্রথম শ্রেণীর প্রথম ও শাস্ত্রী উপাধি লাভ (১৮৭৭)। বরাবর মেধাবী ও কৃতী ছাত্র ছিলেন। বাল্যকাল থেকে বিদ্যাসাগরের সহযোগিতা পেয়েছিলেন। তাঁরই বিনা-খরচের ছাত্রাবাসের আবাসিক। রাজকৃষ্ণ মুখোপাধ্যায়ের মাধ্যমে বঙ্কিমের সঙ্গে আলাপ। হোলকার পুরস্কারপ্রাপ্ত 'ভারত মহিলা' বঙ্গদর্শনে প্রকাশিত প্রথম প্রবন্ধ। সরকারী হিন্দু স্কুল ও সংস্কৃত কলেজে অধ্যাপনা, বাংলা দেশে সংস্কৃত উপাধি পরীক্ষার রেজিস্ট্রার হন। এশিয়াটিক সোসাইটির পক্ষে তিনি প্রচুর পুঁথি সংগ্রহ এবং তালিকাবদ্ধ করেন। তাঁর দশখণ্ড শ্রেণীবদ্ধ তালিকা ও মুখবন্ধ সম্বন্ধে ড. সুশীলকুমার দের উক্তি—'একটি জীবনের পক্ষে এই বৃহৎ প্রচেষ্টাই পর্যাপ্ত।' সন্ধ্যাকর নন্দীর 'রামচরিত', অশ্বঘোষের 'সৌন্দরানন্দ' কাব্যের প্রতি তিনিই শিক্ষিত সমাজের দৃষ্টি আকর্ষণ করেন। বঙ্গদর্শনে তাঁর প্রায় ত্রিশটি প্রবন্ধ বেরিয়েছিল।

তারাপ্রসাদ চট্টোপাধ্যায়। (১৮৪১—১৮৮৯)
পিতা ঠাকুরদাস চট্টোপাধ্যায়, মাতা লক্ষ্মীপ্রিয়া দেবী। দুই বিবাহ—প্রথমা স্ত্রী ভূদেব মুখোপাধ্যায়েয় কন্যা কমলা দেবী, দ্বিতীয়া স্ত্রী শরৎকুমারী। বঙ্কিম প্রথম বর্ষের, তারাপ্রসাদ দ্বিতীয় বর্ষের স্নাতক। তিন বিষয়ে অনার্স। পেশায় ডেপুটি ম্যাজিস্ট্রেট। তাঁর মৃত্যুতে হেমচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায় লেখেন

'প্রিয় বয়স্যের মৃত্যু'। বঙ্গদর্শন, নবজীবন, আর্যদর্শন, বেঙ্গল ম্যাগাজিন, ক্যালকাটা রিভিউ প্রভৃতি পত্রে তাঁর বহু প্রবন্ধ প্রকাশিত হয়। বেথুন সোসাইটিতে পঠিত প্রবন্ধ Chaitanya (১৮৬১) ও The Ruins of Gaur (১৮৬২) উল্লেখ্য। 'তারাপ্রসাদ বাবুর ন্যায় পড়াশুনায় একাগ্রচিত্ত বিরল। তিনি ফরাসী ভাষা উত্তমরূপে শিখিয়াছিলেন। এনসাইক্লোপিডিয়া ব্রিটানিকা পড়ার উপলক্ষ্যে বিবিধ বিজ্ঞান ও দর্শনের সম্যক আলোচনা করিয়াছিলেন ; তাঁহার ইংরাজী লেখার সুখ্যাতি যথেষ্ট ছিল।' তিনি T.P.C. নামেও লিখতেন।

পূর্ণচন্দ্র বসু। (১৮৪৪—)
পিতা রামচন্দ্র বসু, ওরিয়েণ্টাল সেমিনারি ও হিন্দু স্কুলে শিক্ষা, প্রবেশিকা পরীক্ষা (১৮৬০)। প্রেসিডেন্সি কলেজে পাঠকালে বামাবোধিনী প্রকাশ (ভাদ্র ১২৭০)। যখন চতুর্থ বর্ষের ছাত্র তখন সাংসারিক দুর্বিপাক, শিক্ষকতা শুরু। হেডমাস্টার, পরে স্কুল ইনস্পেক্টর, কিছুকাল পরে পদে ইস্তফা, তারপর জেনারেল পোস্ট অফিসে কেরানী।
'কাব্যসুন্দরী' বঙ্কিমসৃষ্ট নারীচরিত্রের রসাত্মক পর্যালোচন। সূর্যমুখী, কুন্দ, কপালকুণ্ডলা, মতিবিবি, শৈবলিনী, শ্যামা। 'গুপ্ত মহাশয় পূর্ণ বাবুকে বড় ভালবাসিতেন এবং বাঙ্গালা পদ্য রচনা করিতে উৎসাহ দিতেন। তাঁহারই উৎসাহে পূর্ণ বাবুর কতিপয় পদ্য রচনা প্রভাকরে প্রকাশিত হয়।'
অবিনাশ গুহ শাস্ত্রী নব্য ভারতে 'সাহিত্যে খুন' প্রবন্ধের প্রতিবাদ করেছিলেন। রক্ষণশীল মানুষ হিসেবে ক্রমশঃ সাহিত্য থেকে ধর্মব্যাখ্যায় নিমগ্ন হন। 'কাব্যসুন্দরী' রক্ষণশীলতা-মুক্ত।

যোগেন্দ্রচন্দ্র ঘোষ। (১৮৪২-১৯০২)
পিতা মোহনচাঁদ ঘোষ, জ্যাঠামহাশয় তারাচাঁদ ঘোষ। উভয় সূত্রেই অগ্রজ শ্রীশচন্দ্র ও যোগেন্দ্রচন্দ্র বিত্তশালী হন। ১৮৬০ সালে শ্রীশচন্দ্র যখন আত্মহত্যা করেন, তখন যোগেন্দ্রচন্দ্রের বয়স আঠারো, তিনি প্রেসিডেন্সি কলেজের ছাত্র। ইংরাজী শিক্ষার ওপর বিরূপ হয়েই গুরুজনেরা তাঁর কলেজে পড়া বন্ধ করেন। তাতে পড়াশুনার একাগ্রতা আরো বেড়ে যায়। তিনি রাজকৃষ্ণের মতই ফরাসী ভাষা ভালো জানতেন। কোম্‌ৎকে জানার আগ্রহ থেকেই হয়ত তাঁর ফরাসী ভাষায় অনুরাগ। আচার্য কৃষ্ণকমল ভট্টাচার্য, বিচারপতি দ্বারকানাথ মিত্র, কবি হেমচন্দ্র, অক্ষয়চন্দ্র সরকার তাঁর অন্তরঙ্গ বন্ধু ছিলেন। যোগেন্দ্রচন্দ্রের আগ্রহেই তালতলার মদনমোহন কুমারের বাড়িতে Society for the Study of

Positive Religion in India প্রতিষ্ঠিত হয়। বঙ্কিমের Letters on Hinduism গ্রন্থে যোগেন্দ্রচন্দ্রের উল্লেখ আছে। বঙ্গদর্শন ছাড়া 'নবজীবন', 'প্রচার' এবং 'ক্যালকাটা রিভিউ' পত্রিকায় তিনি নিয়মিত লিখতেন।

রামদাস সেন। (১৮৪৫—১৮৮৭)
বঙ্গদর্শন প্রকাশের মূলে গ্রাণ্ট হল ক্লাব ও মুর্শিদাবাদ হিতৈষী সভা নামক যে দুটি প্রতিষ্ঠান, সে-দুটিরই প্রাণপুরুষ ছিলেন রামদাস সেন। অক্ষয়কুমার দত্তের পর তাঁকেই যথার্থ স্বশিক্ষিত মনস্বী লেখক বলা যায়। গৌরসুন্দর মাস্টার, বেণী সরকার, দীনবন্ধু সান্যাল এবং ভোলানাথ পাল নানা সময়ে তাঁর শিক্ষক ছিলেন। ১৮৫৩ সালে প্রস্তাবিত নতুন বহরমপুর কলেজের জন্য তিনি ৫০০ টাকা দান করেন। ১৮৬৩ সালে কলেজের অর্থকৃচ্ছ্রতার দিনে আবার ১০০ টাকা দিয়েছিলেন। তিনি ঐ কলেজের ট্রাস্টী বোর্ডেরও সদস্য ছিলেন। রামগতি ন্যায়রত্ন 'বাঙ্গালা ভাষা ও সাহিত্য-বিষয়ক প্রস্তাব' গ্রন্থের ভূমিকায় রামদাসের সমৃদ্ধ গ্রন্থাগারের কথা বলেছেন। তাঁর মর্মরমূর্তি প্রতিষ্ঠা উপলক্ষে প্রচারিত পুস্তিকায় ঐতিহাসিক নিখিলনাথ রায় লিখেছেন : 'বাল্যকাল হইতে তাঁহার ইংরাজী ও বাঙ্গালা পুস্তক সংগ্রহ করিবার ইচ্ছা ছিল। বাঙ্গালা পুস্তক বা সংবাদপত্র ভালই হউক বা মন্দই হউক, বটতলার বাজে পুস্তক এবং খৃস্টানদের বাঙ্গালা পুস্তক পর্যন্ত তাঁহার পুস্তকাগারে স্থান পাইত।' বহু লেখকও দুঃসময়ে তাঁর কাছে সাহায্য পেয়েছেন। তাঁর অর্থানুকূল্য প্রার্থনা করে লেখা মধুসূদনের একটি চিঠি নিখিলনাথের পুস্তিকায় ছাপা হয়েছে। ফ্লোরেন্সের এশিয়াটিক সোসাইটি প্রাচ্যবিদ্যাচর্চার জন্য তাঁকে ডক্টরেট উপাধি দেন।

SOCIETA ASIATICA ITALIANA
SOHO L'AL to Patronato
DI
Sua Maesta II Re D' Italia
Diploma di Socio...ONORARIO...
Conferitto a l Ramdas Sena...
Firenze, 1 Luglio, 1887

॥ Segretario Generale Societa Asiatica Italiana ॥

Presidente.

Sd/illigible Sd/DE Gybernatics.

NANC ORIENS
Ultime Nosterevis

তাঁর অকালপ্রয়াণে সব পত্র-পত্রিকাই দুঃখ প্রকাশ করে। ঢাকার সারস্বত সভার পক্ষে পণ্ডিত জগদ্বন্ধু তর্কবাগীশের মন্দাক্রান্তায় স্মৃতিতর্পণ উল্লেখ্য :

ভূমিশো রামদাসো বহুবিদিতগিরাং প্রত্নতত্ত্বৈঃ প্রযত্নাৎ
কৃত্বা রম্যং প্রবন্ধং কৃতিগণগণিতঃ খ্যাতনামাল্পজীবী।
অত্রস্থৈস্তদগুণজ্ঞৈঃ কৃতিভিরভিমতা স্থাপিতা শৈলমূর্তি—
মানার্হেহভূচ্চ রাজপ্রতিনিধিপিহিতোন্মচনাৎ স্বর্গতোহপি।

বঙ্গদর্শন, বেঙ্গল ম্যাগাজিন, চারুবার্তা, নবজীবন, প্রচার, Antiquary প্রভৃতি পত্রে তিনি নিয়মিত লিখতেন। রাজেন্দ্রলালের শিষ্যরূপে 'রহস্য' কথাটি তিনি পছন্দ করতেন। তার প্রমাণ পাই গ্রন্থনামে—ঐতিহাসিক রহস্য, ভারতরহস্য, রত্নরহস্য, সংস্কাররহস্য।

শ্রীশচন্দ্র মজুমদার। (১৮৬০—১৯০৮)
পৈত্রিক কর্মসূত্রে পুঁটিয়ার রাজপরিবারের সঙ্গে হৃদ্যতা—সাহিত্যপ্রীতি অনুকূল পৃষ্ঠপোষকতা লাভ করে। নব পর্যায় বঙ্গদর্শনের সম্পাদকীয় প্রবন্ধে লেখা হয় : 'পুরাতন বঙ্গদর্শনের শেষ পরিচালক এবং নবপর্যায় বঙ্গদর্শনের প্রবর্তক ও প্রধান সহায় শ্রীশচন্দ্র মজুমদার আর ইহলোকে নাই।' রবীন্দ্রনাথের সঙ্গে সম্পাদনা করেন বৈষ্ণবপদসংগ্রহ 'পদরত্নাবলী' (১৮৮৫)। তাঁর উল্লেখ্য রচনা বর্তমান বঙ্গসমাজ ও চারিজন সংস্কারক, মিরন্দা এবং কপালকুণ্ডলা, মেঘনাদ সম্বন্ধে কয়টি কথা, বাংলার বসন্তোৎসব প্রভৃতি। 'ফুলজানি' ও 'বিশ্বনাথ' তাঁর প্রসিদ্ধ উপন্যাস।

চন্দ্রনাথ বসু। (১৮৪৪—১৯১০)
'ধর্মনিষ্ঠ ক্রিয়াবান হিন্দু বলিয়া সে অঞ্চলে আমার পিতামহের বড় প্রসিদ্ধি ছিল, পিতৃদেবকে পিতামহের পদাঙ্কানুসরণ করিতে দেখিয়াছি।' চন্দ্রনাথ নিজেও পিতা-পিতামহের পন্থানুসারী। স্কটিশচার্চ স্কুল ও ওরিয়েণ্টাল সেমিনারিতে বিদ্যাশিক্ষা, পরে প্রেসিডেন্সি কলেজে। বি. এ (১৮৬৫) পরীক্ষায় প্রথম হন। এম. এ. (১৮৬৬), বি. এল (১৮৬৭)। প্রথমে ওকালতি, পরে শিক্ষাবিভাগের অধ্যক্ষের সহযোগিতায় কটক কলেজে অধ্যাপনা ও জয়পুর কলেজে অধ্যক্ষতা। ১৮৭১ থেকে বেঙ্গল লাইব্রেরির লাইব্রেরিয়ান পদে বৃত হন। ওরিয়েণ্টাল সেমিনারির ছাত্রদের দ্বারা পরিচালিত ওরিয়েণ্টাল ডিবেটিং ক্লাবেই সাহিত্যচর্চার হাতে-খড়ি। যৌবনে কেশবচন্দ্র সেনের অনুরাগী ছিলেন।

Reid, Hamilton, Kant, Victor Cousin এবং Comte-র ভাবধারার সঙ্গেও পরিচিত হন। প্রথমে জাতিভেদের নিন্দা করলেও চন্দ্রনাথ কোঁতের রচনায় মনুর সমর্থন পেয়ে সিদ্ধান্ত বদল করেন। পুরাণ-স্মৃতি মন্থন করে তিনি 'হিন্দুত্ব' প্রতিপন্ন করেন। রচনায় ধর্ম ও লোকাচারের প্রভাব বেশী। কিন্তু শকুন্তলাতত্ত্ব, ত্রিধারা, ফুল ও ফল রসজ্ঞতা ও বিশ্লেষণী নৈপুণ্যের পরিচায়ক। তিনি মনেপ্রাণে ভূদেবের ভাবশিষ্য ছিলেন। গার্হস্থ্যপাঠ (১৮৮৬), গার্হস্থ্যবিধি (১৮৮৭), সংযম শিক্ষা (১৯০৪) প্রভৃতি পাঠ্যপুস্তকে তার প্রমাণ স্পষ্ট। ন্যাশনাল লাইব্রেরির লাইব্রেরিয়ান রূপে তিনি যে 'রিটার্ন' দাখিল করেন, তার মধ্যে সমালোচক চন্দ্রনাথের তীক্ষ্ণ বিচারশক্তির নিদর্শন আছে। চন্দ্রনাথ বঙ্গদর্শন প্রচার নবজীবন প্রভৃতি পত্রিকায় নিয়মিত লিখতেন। বঙ্কিমের সঙ্গে তাঁর চিরকাল সৌহার্দ্য ছিল, তবে 'পশুপতি-সংবাদ' বঙ্গদর্শনে ধারাবাহিক প্রকাশের সময় সেই সৌহার্দ্য কিছু ক্ষুণ্ন হয়েছিল। তাই বঙ্কিম শ্রীশচন্দ্রকে পত্র লিখে 'বঙ্গদর্শন'-প্রচার বন্ধ করেন। 'পৃথিবীর সুখদুঃখ' গ্রন্থে চন্দ্রনাথের আত্মজীবনী আছে।

পরিশিষ্ট। ৩

প্রথম নয় খণ্ডের সম্পূর্ণ সূচী

প্রথম বর্ষ। ১২৭৯

ভাদ্র ॥ উত্তরচরিত বঙ্কিমচন্দ্র। স্বস্বভাবানুবর্তিতা (?)। বিষবৃক্ষ বঙ্কিমচন্দ্র। ভারতবর্ষের পুরাবৃত্ত রামদাস সেন। দেবনিদ্রা (ক) অসম্পূর্ণ, হেমচন্দ্র। বঙ্গদেশের কৃষক বঙ্কিমচন্দ্র। ভারতবর্ষীয় বিজ্ঞানসভা, অনুষ্ঠান-পত্র বঙ্কিমচন্দ্র।

আশ্বিন ॥ বিষবৃক্ষ বঙ্কিমচন্দ্র। উত্তরচরিত বঙ্কিমচন্দ্র। একান্নবর্তী পরিবার যোগেন্দ্রচন্দ্র ঘোষ। আচার্য গোল্‌ড্‌স্ট্‌কর কৃত পাণিনিবিচার [রচনাটি গোল্‌ড্‌স্ট্‌কারের মৃত্যুতে শ্রদ্ধাঞ্জলি নিবেদন। সম্পাদক বঙ্কিমচন্দ্রই রচয়িতা হওয়া স্বাভাবিক]। বাঙ্গালা ভাষা বঙ্কিমচন্দ্র *। জ্ঞান ও নীতি রাজকৃষ্ণ মুখোপাধ্যায়।

কার্তিক ॥ বিষবৃক্ষ বঙ্কিমচন্দ্র। স্বাভাবিক ও অভ্যস্ত পুণ্যকর্ম (?)। যমালয়ে জীয়ন্ত মানুষ দীনবন্ধু মিত্র। বঙ্গদেশের কৃষক বঙ্কিমচন্দ্র। বায়ু (ক) বঙ্কিমচন্দ্র। বাঙ্গালা ভাষা বঙ্কিমচন্দ্র *। নূতন গ্রন্থের সংক্ষিপ্ত সমালোচন : ধ্রুবচরিত্র নিমাইচাঁদ শীল। নটনন্দিনী হরিশচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়। বিজ্ঞান বিষয়ক প্রবন্ধ তারকনাথ চক্রবর্তী। মেঘদূতম্ প্রাণনাথ পণ্ডিত। প্রথমশিক্ষা বীজগণিত রাজকৃষ্ণ মুখোপাধ্যায়। ইউরোপে তিন বৎসর—মুখুয্যার মাগেজিন—বেঙ্গাল মাগেজিন—সঙ্গীতলহরী কুমার মহেন্দ্রলাল খাঁন।

অগ্রহায়ণ ॥ আকাশে কত তারা আছে বঙ্কিমচন্দ্র। বাঙ্গালা ভাষা বঙ্কিমচন্দ্র *। বিষবৃক্ষ বঙ্কিমচন্দ্র। কালিদাস রামদাস সেন। ইংরাজস্তোত্র বঙ্কিমচন্দ্র। সাবিত্রী (ক) বঙ্কিমচন্দ্র। ধর্মনীতি (?) প্রাপ্ত পুস্তকের সংক্ষিপ্ত সমালোচন : কাব্যমালা প্রকাশক বেণীমাধব দে এণ্ড কোং।

পৌষ ॥ বিষবৃক্ষ বঙ্কিমচন্দ্র। বঙ্গদেশের কৃষক বঙ্কিমচন্দ্র। যাত্রা সঞ্জীবচন্দ্র। সাংখ্যদর্শন বঙ্কিমচন্দ্র। রামায়ণের সমালোচন বঙ্কিমচন্দ্র। ইন্দ্রালয়ে সরস্বতী পূজা (ক) হেমচন্দ্র। প্রাপ্ত গ্রন্থের সংক্ষিপ্ত সমালোচন : স্বাস্থ্যকৌমুদী ভারতচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়। ললিত কবিতাবলী—কাব্যমালার রচয়িতৃপ্রণীত—কাব্যমঞ্জরী বলদেব পালিত। আর্যপ্রবর পত্র—অবলাবিলাপ শ্রীমতী অন্নদাসুন্দরী দাসী। পরিত্যক্ত পল্লী অম্বিকাচরণ গুপ্ত। প্রবন্ধ কুসুমাবলী ঈশানচন্দ্র দত্ত। ভর্তৃহরি কাব্য বলদেব পালিত। জ্ঞানাঙ্কুর পত্র—বীরাঙ্গনা উপাখ্যান চন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়। সঙ্গীত রত্নাকর নবীনচন্দ্র দত্ত। হরিবংশ কৃষ্ণধন বিদ্যারত্ন অনূদিত।

মাঘ ॥ বিষবৃক্ষ বঙ্কিমচন্দ্র। সাংখ্যদর্শন বঙ্কিমচন্দ্র। কালিদাস প্রাণনাথ পণ্ডিত। পরশমণি (ক) হেমচন্দ্র। বররুচি রামদাস সেন। ঐক্য (?)। প্রাপ্ত গ্রন্থের সংক্ষিপ্ত সমালোচন : পদ্যময় কালীময় ঘটক। পদ্যমালা উপেন্দ্রনাথ রায়চৌধুরী। কবিতাকুসুম ১ম তিনকড়ি মুখোপাধ্যায়। সদ্ভাবকুসুম শ্রীনাথ চন্দ। প্রথম চরিতাষ্টক কালীময় ঘটক।

ফাল্গুন ॥ বিষবৃক্ষ বঙ্কিমচন্দ্র। বঙ্গদেশের কৃষক বঙ্কিমচন্দ্র। ধূলা বঙ্কিমচন্দ্র। Three Years in Europe : সমালোচনা—সাংখ্যদর্শন বঙ্কিমচন্দ্র। একদিন (ক) নবীনচন্দ্র সেন। শ্রীহর্ষ রামদাস সেন। বানরচরিত বঙ্কিমচন্দ্র ?। বিরহিনীর দশদশা (ক) বঙ্কিমচন্দ্র। প্রাপ্ত গ্রন্থের সংক্ষিপ্ত সমালোচন : ঐতিহাসিক নবন্যাস গজপতি রায়। জ্ঞানকুসুম তিনকড়ি চট্টোপাধ্যায়। শিশুপাঠ বাঙ্গালার ইতিহাস ক্ষেত্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়। সৌদামিনী উপাখ্যান উমেশচন্দ্র চক্রবর্তী। গান্ধারীবিলাপকাব্য ভুবনমোহন ঘোষ। প্রমীলাবিলাস মহিমাচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়। নলদময়ন্তী কাব্য কিশোরীলাল রায়।

চৈত্র ॥ ভাষার উৎপত্তি রাজকৃষ্ণ। বাঙ্গালা ভগ্নাংশ (?)। ইন্দিরা বঙ্কিমচন্দ্র। বঙ্গদেশের লোকসংখ্যা সঞ্জীবচন্দ্র ?। প্রাপ্ত গ্রন্থের সংক্ষিপ্ত সমালোচন : হিন্দু-ধর্মের শ্রেষ্ঠতা রাজনারায়ণ বসু—কিঞ্চিৎ জলযোগ।

দ্বিতীয় বর্ষ। ১২৮০

বৈশাখ ॥ অবকাশরঞ্জিনী : সমালোচনা বঙ্কিমচন্দ্র। সাংখ্যদর্শন বঙ্কিমচন্দ্র। নয়শো রূপেয়া : সমালোচনা। বসন্ত এবং বিরহ বঙ্কিমচন্দ্র। যুগালাঙ্গুরীয় বঙ্কিমচন্দ্র। তুলনায় সমালোচন অক্ষয়চন্দ্র সরকার। জাতিভিক্ষুক বঙ্কিমচন্দ্র। আদর (ক) বঙ্কিমচন্দ্র। প্রাপ্ত গ্রন্থের সংক্ষিপ্ত সমালোচন : মানসরঞ্জন কৈলাস-চন্দ্র দে। কাব্যকদম্ব গঙ্গানারায়ণ প্রধান। কাশীশ্বর মিত্রের বক্তৃতা। উৎকলদর্শন পত্রিকা। হিন্দু আচার ব্যবহার ১ম মনোমোহন বসু।

জ্যৈষ্ঠ ॥ দুর্গা বঙ্কিমচন্দ্র। হেমচন্দ্র রামদাস সেন। সাম্য বঙ্কিমচন্দ্র। মধুমতী পূর্ণচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়। অন্নদার শিবপূজা (ক) হেমচন্দ্র। নৈসর্গিক নিয়মের অন্যথা হওয়া সম্ভব কিনা (?)। দানবদলনকাব্য : সমালোচনা বঙ্কিমচন্দ্র। ঘোর অদৃষ্টবাদিত্ব, অসম্পূর্ণ (?)। প্রাপ্ত গ্রন্থের সংক্ষিপ্ত সমালোচন : ঋতু-বিহার ১ম ঈশানচন্দ্র ভট্টাচার্য। ধর্মস্য সূক্ষ্মা গতি অম্বিকাচরণ গুপ্ত। হিন্দু ধর্মনীতি—বাংলা মুদ্রাঙ্কনের ইতিবৃত্ত ও সমালোচনা যোগেন্দ্রনাথ ঘোষ। হিন্দু জাতি—হিন্দু সমাজের বর্তমান অবস্থা ঈশ্বরচন্দ্র বসু। কবিতাহার জনৈক হিন্দু মহিলা। সর্বার্থসংগ্রহ মাসিক পুস্তক।

আষাঢ় ॥ বহুবিবাহ বঙ্কিমচন্দ্র। সাংখ্যদর্শন বঙ্কিমচন্দ্র। সাম্য বঙ্কিমচন্দ্র। দাম্পত্য দণ্ডবিধির আইন বঙ্কিমচন্দ্র। প্রতিভা রাজকৃষ্ণ মুখোপাধ্যায়। জুমিয়া জীবন (ক) নবীনচন্দ্র। প্রাপ্ত গ্রন্থের সংক্ষিপ্ত সমালোচন। সেতার শিক্ষা কৃষ্ণধন বন্দ্যোপাধ্যায়। বক্তৃতামালা মনোমোহন বসু। বিরহবিলাপ। বিক্টো-রিয়া পঞ্জিকা। কবিতাবলী ২য় রাধানাথ রায়। বিশ্বদর্শন পাক্ষিক পত্র সাহিত্য

সংগ্রহ ; ১৩শ সংখ্যা। স্বীয় মনের প্রতি উপদেশ কোন বঙ্গমহিলা। বঙ্গমিহির। মাসিক পত্র।

শ্রাবণ ॥ জন স্টুয়ার্ট মিল বঙ্কিমচন্দ্র। হিন্দুদিগের নাট্যাভিনয় রামদাস সেন। জাতিভেদ যোগেন্দ্রচন্দ্র ঘোষ। চন্দ্রশেখর বঙ্কিমচন্দ্র। স্বপ্নপ্রয়াণ, ১ম সর্গ দ্বিজেন্দ্রনাথ ঠাকুর। গর্দভ বঙ্কিমচন্দ্র। প্রাপ্ত গ্রন্থের সংক্ষিপ্ত সমালোচন : নন্দবংশোচ্ছেদ লক্ষ্মীনারায়ণ চক্রবর্তী। বঙ্গশ্রুত বোধ। কৃষ্ণ ভক্তিসার উমানাথ রায়।

ভাদ্র ॥ চঞ্চল জগৎ বঙ্কিমচন্দ্র। চন্দ্রশেখর বঙ্কিমচন্দ্র। কমলাকান্তের দপ্তর : একা, কে গায় ঐ বঙ্কিমচন্দ্র। মৃত মাইকেল মধুসূদন দত্ত, গদ্যাংশ বঙ্কিমচন্দ্র। স্বর্গারোহণ (ক) নবীনচন্দ্র ও হেমচন্দ্র। অতলস্পর্শ (?)। অশোকবনে সীতা (ক) নবীনচন্দ্র। প্রাচীন ও আধুনিক ভারতবর্ষ, স্বাধীনতা বঙ্কিমচন্দ্র। বঙ্গে ব্রাহ্মণাধিকার বঙ্কিমচন্দ্র। মেঘ বঙ্কিমচন্দ্র। প্রাপ্ত গ্রন্থের সংক্ষিপ্ত সমালোচন : সরোজিনী নাটক রাধানাথ বর্ধন। জমিদার-দর্পণ মীর মশাররফ হোসেন। গ্রেট বারাবারাস ড্রামা। নাপিতেশ্বর নাটক। জমিদার ও প্রজা নীলকমল মুখোপাধ্যায়। ভূতত্ত্ববিচার দ্বারকানাথ বিদ্যারত্ন। বাঙ্গালা ভাষা ও বাঙ্গালা সাহিত্য, দ্বিতীয় ভাগ রামগতি ন্যায়রত্ন।

আশ্বিন ॥ প্রাচীন এবং আধুনিক ভারতবর্ষ, রাজনীতি বঙ্কিমচন্দ্র। কমলাকান্তের দপ্তর : মনুষ্যফল বঙ্কিমচন্দ্র। দশমহাবিদ্যা অক্ষয়চন্দ্র। হিমাচল (ক) নিরঞ্জন চট্টোপাধ্যায়। বঙ্গভূমি শস্যশালিনী বলিয়া কি বাঙালীর দুর্ভাগ্য (?)। ভাষা সমালোচন (?)। চন্দ্রশেখর বঙ্কিমচন্দ্র। দুর্গোৎসব (ক) হেমচন্দ্র।

কার্তিক ॥ কমলাকান্তের দপ্তর : ইউটিলিটি বঙ্কিমচন্দ্র। বাঙ্গালীর বিষপান নবীনচন্দ্র। গৌড়ীয় বৈষ্ণবাচার্যবৃন্দের গ্রন্থাবলীর বিবরণ রামদাস সেন। জৈবনিক বঙ্কিমচন্দ্র। চন্দ্রশেখর বঙ্কিমচন্দ্র। যাত্রা সঞ্জীবচন্দ্র। মন এবং সুখ (ক) বঙ্কিমচন্দ্র। নিশিতে বংশীধ্বনি (ক) (?)। প্রাপ্ত গ্রন্থের সমালোচন : কুলকালিমা কাব্যানুবাদ ; প্রথম ভাগ। জয়দেবচরিত রজনীকান্ত গুপ্ত। বিজ্ঞানসার বীরেশ্বর পাঁড়ে। লীলাবতী বীরেশ্বর পাঁড়ে। বৈদিকী হিংসা হিংসা ন ভবতি। (প্রহসন চার অঙ্কোমে)।

অগ্রহায়ণ ॥ জাতিভেদ, ২য় যোগেন্দ্রচন্দ্র ঘোষ। বেদপ্রচার রামদাস সেন। চন্দ্রশেখর বঙ্কিমচন্দ্র। পাখী (ক) গোপালকৃষ্ণ ঘোষ। কমলাকান্তের দপ্তর পতঙ্গ বঙ্কিমচন্দ্র। কে তুমি (ক) নবীনচন্দ্র। কালিদাস প্রাণনাথ পণ্ডিত। সংক্ষিপ্ত সমালোচন : তমোলুক পত্রিকা মাসিক।

পৌষ ॥ গগনপর্যটন বঙ্কিমচন্দ্র। ধনবৃদ্ধি বঙ্কিমচন্দ্র ?। মানস বিকাশ :

সমালোচনা বঙ্কিমচন্দ্র। চন্দ্রশেখর বঙ্কিমচন্দ্র। অশ্লীলতা বঙ্কিমচন্দ্র*। গৌড়ীয় বৈষ্ণবাচার্যবৃন্দের গ্রন্থাবলীর বিবরণ রামদাস সেন। প্রাপ্ত গ্রন্থের সংক্ষিপ্ত সমালোচন : মাসিক প্রকাশিকা রাজকৃষ্ণ ভট্টাচার্য। গোরাই ব্রিজ অথবা গৌরী সেতু মীর মশার্‌রফ হোসেন। হিন্দুধর্ম মর্ম লোকনাথ বসু। পূর্ববাণী, মাসিক-পত্র। লক্ষ্মণবিবাসন শ্যামাচরণ মজুমদার। ভারতমাতা কিরণচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়।

মাঘ ॥ কার্যকারণ সম্বন্ধ রাজকৃষ্ণ মুখোপাধ্যায়। জ্ঞানদাস (?)। বাল্মীকি ও তৎসাময়িক বৃত্তান্ত প্রফুল্লচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়। ভারতভূমি (ক) ২৪শ বর্ষীয় বালক। চন্দ্রশেখর বঙ্কিমচন্দ্র। অনন্ত দুঃখ (ক) নবীনচন্দ্র। কমলাকান্তের দপ্তর : আমার মন বঙ্কিমচন্দ্র। প্রাপ্ত গ্রন্থের সংক্ষিপ্ত সমালোচন : হেমলতা নাটক হরলাল রায়। অবকাশতোষিণী পত্রিকা। অমরনাথ নাটক কৃষ্ণচন্দ্র রায়চৌধুরী।

ফাল্গুন। ভারতবর্ষের সঙ্গীতশাস্ত্র রামদাস সেন। বাল্মীকি ও তৎসাময়িক বৃত্তান্ত প্রফুল্লচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়। ভারতবর্ষীয়দিগের আদিম অবস্থা, অসম্পূর্ণ লালমোহন বিদ্যানিধি। কতকাল মনুষ্য বঙ্কিমচন্দ্র। চন্দ্রশেখর বঙ্কিমচন্দ্র। কমলাকান্তের দপ্তর বঙ্কিমচন্দ্র। প্রাপ্ত গ্রন্থের সংক্ষিপ্ত সমালোচন : চোরা না শুনে ধর্মের কাহিনী দক্ষিণারঞ্জন চট্টোপাধ্যায়। বঙ্গভাষার ইতিহাস, ১ম মহেন্দ্রনাথ চট্টোপাধ্যায়।

চৈত্র ॥ বাল্মীকি ও তৎসাময়িক বৃত্তান্ত প্রফুল্লচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়। বলরাম দাস (?)। চন্দ্রশেখর, সুবর্ণ গোলক বঙ্কিমচন্দ্র। জ্ঞানদাসের পদানুসরণ (ক) রজ। কমলাকান্তের দপ্তর : বসন্তের কোকিল বঙ্কিমচন্দ্র। পরিমাণরহস্য বঙ্কিমচন্দ্র। ভারতে কালের ভেরী বাজিল আবার (ক) হেমচন্দ্র। প্রাপ্ত গ্রন্থের সংক্ষিপ্ত সমালোচন : ব্যায়াম শিক্ষা হরিশচন্দ্র শর্ম্মা। হরবোলা ভাঁড় পত্র। ইউরোপে তিন বৎসর। তীর্থমহিমা নাটক নিমাইচাঁদ শীল। সাহিত্যমঞ্জরী নবীনচন্দ্র দত্ত। শিক্ষামঞ্জরী নগেন্দ্রনাথ দত্ত।

তৃতীয় বর্ষ। ১২৮১

বৈশাখ ১২৮১। ভাষা সমালোচন রাজকৃষ্ণ মুখোপাধ্যায়। ভারতবর্ষীয় আর্য-জাতির আদিম অবস্থা লালমোহন বিদ্যানিধি। প্রাচীনা এবং নবীনা বঙ্কিমচন্দ্র। প্রাপ্ত গ্রন্থের সংক্ষিপ্ত সমালোচন : নিদান উদয়চাঁদ দত্ত। প্রমোদিনী ১ম খণ্ড, সাময়িক পত্র।

জ্যৈষ্ঠ ॥ ভারতবর্ষীয় আর্যজাতির আদিম অবস্থা লালমোহন বিদ্যানিধি।

কমলাকান্তের দপ্তর : স্ত্রীলোকের রূপ রাজকৃষ্ণ মুখোপাধ্যায়। চন্দ্রশেখর বঙ্কিমচন্দ্র। চিহ্নিতসুহৃদ (ক) নবীনচন্দ্র। সর্ উইলিয়াম গ্রে ও সর্ জর্জ কাম্বেল বঙ্কিম চন্দ্র। শ্রীহর্ষ রামদাস। পূর্বরাগ (ক) রজ। প্রাপ্ত গ্রন্থের সংক্ষিপ্ত সমালোচন : রসকাদম্বিনী, অমরুশতক কাব্যের অনুবাদ। কবিতাকুসুমমালিকা। নব রসাঙ্কুর রসিকচন্দ্র রায়। পল্লীগ্রাম দর্পণ প্রসন্নচন্দ্র মুখোপাধ্যায়। হেমলতা পত্রিকা। উদাসিনী কাব্য। মৃদঙ্গমঞ্জরী সৌরীন্দ্রমোহন ঠাকুর। চিত্তকানন কানাইলাল মিত্র। কাব্যপেটিকা মহেশচন্দ্র তর্কচূড়ামণি। অর্থনীতি ও ব্যবহার নৃসিংহচন্দ্র মুখোপাধ্যায়। ঐতিহাসিক রহস্য ১ম রামদাস সেন।

আষাঢ় ॥ চন্দ্রনাথ উপন্যাস সমালোচনা। বাল্মীকি ও তৎসাময়িক বৃত্তান্ত প্রফুল্লচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়। কমলাকান্তের দপ্তর : বিবাহ বঙ্কিমচন্দ্র। ভারতবর্ষীয় আর্যজাতির আদিম অবস্থা লালমোহন বিদ্যানিধি। কমল বিলাসী (ক) হেমচন্দ্র। চন্দ্রশেখর বঙ্কিমচন্দ্র। তিন রকম বঙ্কিমচন্দ্র। প্রাপ্ত গ্রন্থের সংক্ষিপ্ত সমালোচন : রিপুবিহার মহিমাচন্দ্র চক্রবর্তী। বেহুলা লখিন্দর ভগবচ্চন্দ্র বিশারদ।

শ্রাবণ ॥ বাঙ্গালীর বাহুবল বঙ্কিমচন্দ্র। চার্বাক দর্শন রাজকৃষ্ণ মুখোপাধ্যায়। ভারতবর্ষীয় আর্যজাতির আদিম অবস্থা লালমোহন। চন্দ্রশেখর বঙ্কিমচন্দ্র। জৈন ধর্ম রামদাস সেন। পাগলিনী (ক) নবীনচন্দ্র। প্রাপ্ত গ্রন্থের সংক্ষিপ্ত সমালোচন : আর্যদর্শন, ১২৮১। বান্ধব। কাব্যকৌমুদী শ্রীনাথ চন্দ। ললিতা সুন্দরী অধরলাল সেন। স্বর্ণলতা নাটক দেবেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়। তত্ত্বকুসুম দ্বারকানাথ ঘোষ। মহাগুরু নিপাতের পর অশৌচাবস্থায় কর্তব্যাকর্তব্যের বিচার। ঋতুবিলাস মহিমাচন্দ্র চক্রবর্তী বীরাঙ্গনা পত্রোত্তর কাব্য রামকুমার নন্দী। বৈদেহীবৈধব্য কাব্য অনাথবন্ধু রায়। সুশ্রুত অনুবাদ অম্বিকাচরণ বন্দ্যোপাধ্যায়। রামোদ্বাহ নাটক সুরেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়।

ভাদ্র ॥ ভারতবর্ষীয় আর্যজাতির আদিম অবস্থা লালমোহন বিদ্যানিধি। জৈন ধর্ম রামদাস সেন। চন্দ্রশেখর বঙ্কিমচন্দ্র। .আর্যজাতির সূক্ষ্ম শিল্প বঙ্কিমচন্দ্র। ঐতিহাসিক ভ্রম রাজকৃষ্ণ মুখোপাধ্যায়। প্রাপ্ত গ্রন্থের সংক্ষিপ্ত সমালোচন : পুরুবিক্রম নাটক—কুলীনকন্যা অথবা কমলিনী লক্ষ্মীনারায়ণ চক্রবর্তী।

আশ্বিন ॥ বাল্মীকি ও তৎসাময়িক বৃত্তান্ত প্রফুল্লচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়। বাণভট্ট রামদাস সেন। রজনী বঙ্কিমচন্দ্র। দেবতত্ত্ব রাজকৃষ্ণ। এই কি আমার সেই জীবনতোষিণী (ক) হেমচন্দ্র। কমলাকান্তের দপ্তর : বড়বাজার বঙ্কিমচন্দ্র। প্রাপ্ত গ্রন্থের সংক্ষিপ্ত সমালোচন: শিক্ষানবিশের পদ্য অক্ষয়চন্দ্র সরকার।

দুঃখমালা কোন হিন্দু মহিলা। তারাবাঈ নাটক গঙ্গাধর চট্টোপাধ্যায়। বিবাহ ও পুত্রত্ব সম্বন্ধে মনুর মত।

কার্তিক ॥ চার্বাক দর্শন রাজকৃষ্ণ। জাতিভেদ শ্রীযঃ। ভারতবর্ষীয় আর্যজাতির আদিম অবস্থা লালমোহন বিদ্যানিধি। রজনী বঙ্কিমচন্দ্র। প্রাপ্ত গ্রন্থের সংক্ষিপ্ত সমালোচন : গৌড়েশ্বর নাটক রমেশচন্দ্র লাহিড়ী। প্রমোদকাহিনী কাব্য আশুতোষ মুখোপাধ্যায়। হিতাবলী ২য় প্রসন্নচন্দ্র গুহ। The Music and Musical Notations of Various Countries Loknath Ghose। জীবন মরীচিকা গীতহার গঙ্গাধর চট্টোপাধ্যায়। পদ্যমুকুল রামলাল চক্রবর্তী। নবমালিকা দুর্গাচরণ বন্দ্যোপাধ্যায়। বিলাপতরঙ্গ—শ্রীমন্মহীধর-কৃত বেদ্দীপনামা সংহিতা উদত্তাদি স্বরচিহ্ন সমন্বিতা শ্রীশুক্লযজুর্বেদঃ বাজসনেয়ি সংহিতা মাধ্যন্দিনী শাখা।

অগ্রহায়ণ ॥ ভারতবর্ষীয় আর্যজাতির আদিম অবস্থা লালমোহন বিদ্যানিধি। জাতিভেদ শ্রীযঃ। বাল্মীকি ও তৎসাময়িক বৃত্তান্ত প্রফুল্লচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়। রজনী বঙ্কিমচন্দ্র। ভালবাসার অত্যাচার বঙ্কিমচন্দ্র। অধঃপতন সঙ্গীত (ক) বঙ্কিমচন্দ্র। প্রাপ্ত গ্রন্থের সংক্ষিপ্ত সমালোচন : চিত্তবিনোদ কাব্য ঈশানচন্দ্র বসু।

পৌষ ॥ কোমৎ দর্শন বাজকৃষ্ণ। সেকাল আর একাল : সমালোচনা বঙ্কিমচন্দ্র। ঐ, দ্বিতীয় প্রবন্ধ, প্রতিবাদ পত্র—জাতিভেদ শ্রীযঃ। কল্পতরু সমালোচনা—রজনী বঙ্কিমচন্দ্র। প্রাপ্ত গ্রন্থের সংক্ষিপ্ত সমালোচন : ভারতে যবন কিরণচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়। বাংলা বোধিনী মধুসূদন সেন। ভূগোলসার নগেন্দ্রনাথ কোঙর। গদ্য পাঠাবলী লোকনাথ গুহ।

মাঘ ॥ খাদ্য (?)। আমার সঙ্গীত (ক) নবীনচন্দ্র। ভারতবর্ষীয় আর্যজাতির আদিম অবস্থা লালমোহন বিদ্যানিধি। বাঙ্গালার ইতিহাস বঙ্কিমচন্দ্র। কালেজ রি-ইউনিয়ন (ক) শ্রীকৃষ্ণ। রজনী বঙ্কিমচন্দ্র। প্রাপ্ত গ্রন্থের সংক্ষিপ্ত সমালোচন : বঙ্কের বিজ্ঞপ্তি।

ফাল্গুন ॥ কমলাকান্তের দপ্তর : একটি গীত বঙ্কিমচন্দ্র। জ্ঞান সম্বন্ধে দার্শনিক মত বঙ্কিমচন্দ্র। সমাজ বিজ্ঞান রাজকৃষ্ণ। বৃত্রসংহার সমালোচনা—খাদ্য (?)। পূর্বরাগ (ক) রজ। রজনী বঙ্কিমচন্দ্র। নানা কথা। সংক্ষিপ্ত আলোচনার পরিবর্তে।

চৈত্র ॥ ভারতবর্ষীয় আর্যজাতির আদিম অবস্থা লালমোহন বিধ্যানিধি। রজনী বঙ্কিমচন্দ্র। কৃষ্ণচরিত্র বঙ্কিমচন্দ্র। প্রাচীন কাব্যসংগ্রহ, সমালোচনা বঙ্কিমচন্দ্র। বিষধর (?)। ভাই ভাই (ক) বঙ্কিমচন্দ্র। কমলাকান্তের দপ্তর :

বিড়াল বঙ্কিমচন্দ্র। মহিষমর্দিনী (ক) (?)। সঙ্গীত সমালোচনা কৃষ্ণধন বন্দ্যোপাধ্যায়। নানা কথা (?)।

চতুর্থ বর্ষ। ১২৮২

বৈশাখ ॥ শকুন্তলা মিরন্দা ও দেস্‌দিমোনা বঙ্কিমচন্দ্র। কমকান্তের দপ্তর : মশক বঙ্কিমচন্দ্র। রজনী বঙ্কিমচন্দ্র। ঋতুবর্ণন সমালোচনা গঙ্গাচরণ সরকার। মিল ডার্বিন ও হিন্দুধর্ম বঙ্কিমচন্দ্র। সুখচর (ক) গোপালকৃষ্ণ ঘোষ। দেবতত্ত্ব ২য় রাজকৃষ্ণ।

জ্যৈষ্ঠ ॥ বৌদ্ধধর্ম রামদাস সেন। বাল্মীকি ও তৎসাময়িক বৃত্তান্ত প্রফুল্লচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়। বিদ্যাপতি রাজকৃষ্ণ। নিদ্রিত প্রণয় অক্ষয়চন্দ্র সরকার।

আষাঢ় ॥ বাল্মীকি ও তৎসাময়িক বৃত্তান্ত প্রফুল্লচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়। বংশরক্ষা (?)। মনুষ্য ও বাহ্যজগৎ রাজকৃষ্ণ। শৈশব সহচরী পূর্ণচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়। ক্লিওপেট্রা (ক) নবীনচন্দ্র।

শ্রাবণ ॥ হরিহরবাবু (?)। সাহসাঙ্ক চরিত রামদাস সেন। ক্লিওপেট্রা (ক) নবীনচন্দ্র। শৈশব সহচরী পূর্ণচন্দ্র। বাল্মীকি ও তৎসাময়িক বৃত্তান্ত প্রফুল্লচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়। নাটক পরিচ্ছেদ (?)। বাঙ্গালার পূর্বকথা, অসমাপ্ত (?)। দরিদ্র যুবক ভুবনমোহিনী দাসী।

ভাদ্র ॥ দেবীবর ঘটক ও যোগেশ্বর পণ্ডিত, মেলবন্ধন, তাহার সময় নিরূপণ, আনুষঙ্গিক তৎকালিক সামাজিক অবস্থা লালমোহন শর্মা। উত্তর (ক) নবীনচন্দ্র। আদিম মনুষ্য (?)। কুঞ্জবনে কমলিনী (ক) রাজকৃষ্ণ মুখোপাধ্যায়। রজনী বঙ্কিমচন্দ্র। শিবাজি (?)। শৈশব সহচরী পূর্ণচন্দ্র। পদ্য, সংস্কৃত হইতে অনুবাদিত (?)। দ্রৌপদী বঙ্কিমচন্দ্র।

আশ্বিন ॥ চৈতন্য শ্রীকৃষ্ণ দাস। ভাবী বসুমতী (?)। সূর্যমণ্ডল (?)। আত্মাভিমান (?)। শশ্মানে ভ্রমণ চন্দ্রশেখর মুখোপাধ্যায়। ভারতভূমির অভ্যর্থনা (ক) রঙ্গলাল বন্দ্যোপাধ্যায়। নৃত্য সঞ্জীবচন্দ্র। রজনী বঙ্কিমচন্দ্র।

কার্তিক ॥ রজনী বঙ্কিমচন্দ্র। লজ্জা কেন করি (?)। বনস্থলীর প্রতি মিস ইডেনের উক্তি (ক) (?)। সাম্য বঙ্কিমচন্দ্র। কোন স্পেশিয়ালের পত্র বঙ্কিমচন্দ্র। উড়িষ্যার পথে প্রভাত (ক) (?)। পলাশির যুদ্ধ : সমালোচনা বঙ্কিমচন্দ্র। রাধারানী বঙ্কিমচন্দ্র।

অগ্রহায়ণ ॥ রাধারানী বঙ্কিমচন্দ্র। চৈতন্য শ্রীকৃষ্ণ দাস! বঙ্গে ব্রাহ্মণাধিকার বঙ্কিমচন্দ্র। রজনী বঙ্কিমচন্দ্র। শৈশব সহচরী পূর্ণচন্দ্র। সুহৃৎ সঙ্গম (ক) হেমচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়। বর্ষ সমালোচন বঙ্কিমচন্দ্র।

পৌষ ॥ জ্যোতিষিক সংক্ষিপ্ত ইতিবৃত্ত শ্রীনীঃ। বাঙ্গালি কবি কেন, অসম্পূর্ণ (?)। চৈতন্য শ্রীকৃষ্ণ দাস। নীতিকুসুমাঞ্জলি (ক) রঙ্গলাল বন্দ্যোপাধ্যায়। কৃষ্ণকান্তের উইল বঙ্কিমচন্দ্র। শৈশব সহচরী পূর্ণচন্দ্র।

মাঘ ॥ পালিভাষা ও তৎসমালোচন রামদাস সেন। নীতিকুসুমাঞ্জলি (ক) রঙ্গলাল। জ্যোতিষিক সংক্ষিপ্ত ইতিবৃত্ত শ্রীনীঃ। কৃষ্ণকান্তের উইল বঙ্কিমচন্দ্র। চৈতন্য শ্রীকৃষ্ণ দাস। ধাত্রীশিক্ষা : সমালোচনা—কালিদাসের উপমা (?)। ভারত মহিলা হরপ্রসাদ শাস্ত্রী।

ফাল্গুন ॥ ভারত মহিলা হরপ্রসাদ শাস্ত্রী। বৌদ্ধমত ও তৎসমালোচন রামদাস সেন। প্রেমনিমজ্জন (ক) গোপালকৃষ্ণ ঘোষ। নীতিকুসুমাঞ্জলি (ক) রঙ্গলাল। চৈতন্য শ্রীকৃষ্ণ দাস। কৃষ্ণকান্তের উইল বঙ্কিমচন্দ্র। বেদ রামদাস সেন। কালিদাসের উপমা (?)।

চৈত্র ॥ বেদ রামদাস সেন। গঙ্গাস্তব (ক) (?)। ভারত মহিলা হরপ্রসাদ শাস্ত্রী। নীতিকুসুমাঞ্জলি (ক) রঙ্গলাল। বঙ্গদর্শনের বিদায়গ্রহণ বঙ্কিমচন্দ্র।

[১২৮৩ বঙ্গাব্দে বঙ্গদর্শনের কোন সংখ্যা প্রকাশিত হয় নি]

পঞ্চম বর্ষ। ১২৮৪

বৈশাখ ॥ বঙ্গদর্শন বঙ্কিমচন্দ্র। কৃষ্ণকান্তের উইল বঙ্কিমচন্দ্র। রাষ্ট্রবিপ্লব (?)। জৈন মত সমালোচন রামদাস সেন। বুড়ো বয়সের কথা বঙ্কিমচন্দ্র। কেন ভালবাসি (ক) নবীনচন্দ্র। আমাদের গৌরবের দুই সময় হরপ্রসাদ শাস্ত্রী। শৈশব সহচরী পূর্ণচন্দ্র। প্রাপ্ত গ্রন্থের সংক্ষিপ্ত সমালোচন : রায় দীনবন্ধু মিত্র প্রণীত গ্রন্থাবলী।

জ্যৈষ্ঠ ॥ ভারতে একতা নগেন্দ্রনাথ চট্টোপাধ্যায়। হিন্দুদিগের আগ্নেয়াস্ত্র রামদাস সেন। স্বপ্ন উন্মত্ততা (ক) নবীনচন্দ্র। কৃষ্ণকান্তের উইল বঙ্কিমচন্দ্র। আমাদের গৌরবের দুই সময় হরপ্রসাদ শাস্ত্রী। শৈশব সহচরী পূর্ণচন্দ্র। বাহুবল ও বাক্যবল বঙ্কিমচন্দ্র। খদ্যোত বঙ্কিমচন্দ্র। প্রাপ্ত গ্রন্থের সংক্ষিপ্ত সমালোচন : হরিহর নন্দী—মাধবিকা নাটক—বাঙ্গালা শিক্ষা—অপরিচিত গ্রন্থ—পুরাতন গ্রন্থ—সভ্যতার ইতিহাস শ্রীকৃষ্ণ দাস। সুধীরঞ্জন দ্বারকানাথ অধিকারী।

আষাঢ় ॥ সতীদাহ চন্দ্রশেখর মুখোপাধ্যায়। বেদবিভাগ রামদাস সেন। ভুলো না ও কুহুস্বর ভুলো না আমায় (ক) হেমচন্দ্র। সভ্যতা রাজকৃষ্ণ। বোম্বাই ও বাঙ্গালা নগেন্দ্রনাথ চট্টোপাধ্যায়। কৃষ্ণকান্তের উইল বঙ্কিমচন্দ্র। আমার মালা গাঁথা কৃ।

শ্রাবণ ॥ ব্রাহ্মণ ও শ্রমণ হরপ্রসাদ শাস্ত্রী। বঙ্গে ধর্মভাব চন্দ্রশেখর মুখোপাধ্যায়

শান্তিধর্ম ও সাহস শিক্ষা চন্দ্রশেখর বন্দ্যোপাধ্যায়। কৃষ্ণকান্তের উইল বঙ্কিমচন্দ্র। শৈশব সহচরী পূর্ণচন্দ্র। বাঙ্গালার সাহিত্য (?)।

ভাদ্র ॥ সর্পবিষ চিকিৎসা (?)। বোম্বাই ও বাঙ্গালা নগেন্দ্রনাথ চট্টোপাধ্যায়। কৃষ্ণকান্তের উইল বঙ্কিমচন্দ্র। বঙ্গে উন্নতি (?)। শৈশব সহচরী পূর্ণচন্দ্র। বাহুবল ও বাক্যবল বঙ্কিমচন্দ্র।

আশ্বিন ॥ শঙ্করাচার্য কি ছিলেন হরপ্রসাদ শাস্ত্রী। শৈশব সহচরী পূর্ণচন্দ্র। নববার্ষিকী গ্রন্থের লিখিত বাঙ্গালার খ্যাতিমান ব্যক্তিগণ : সমালোচন—পাঞ্জাব ও শিখ সম্প্রদায় নগেন্দ্রনাথ চট্টোপাধ্যায়। তর্কসংগ্রহ (?) কৃষ্ণকান্তের উইল বঙ্কিমচন্দ্র। জন্ স্টুয়ার্ট মিলের জীবনবৃত্তের সমালোচনা বঙ্কিমচন্দ্র।

কার্তিক ॥ কালিদাস-প্রণীত গ্রন্থের ভৌগোলিকতত্ত্ব (?)। সতীদাহ নগেন্দ্রনাথ চট্টোপাধ্যায়। আর্যগণের আচার ব্যবহার রামদাস সেন। কৃষ্ণকান্তের উইল বঙ্কিমচন্দ্র। ডাহির সেনাপতি : নাটক সমালোচনা।

অগ্রহায়ণ ॥ বৈজিকতত্ত্ব সঞ্জীবচন্দ্র। শৈশব সহচরী পূর্ণচন্দ্র। তর্কসংগ্রহ—কালিদাস-প্রণীত গ্রন্থের ভৌগোলিক তত্ত্ব (?)। কৃষ্ণকান্তের উইল বঙ্কিমচন্দ্র।

পৌষ ॥ কমলাকান্তের পত্র বঙ্কিমচন্দ্র। জন্ স্টুয়ার্ট মিলের জীবনবৃত্তের সমালোচনা বঙ্কিমচন্দ্র। কৃষ্ণকান্তের উইল বঙ্কিমচন্দ্র। বেদ ও বেদব্যাখ্যা হরপ্রসাদ শাস্ত্রী। বৈজিকতত্ত্ব সঞ্জীবচন্দ্র। প্রাপ্ত গ্রন্থের সংক্ষিপ্ত সমালোচন : চিকিৎসাতত্ত্ব ও চিকিৎসাপ্রকরণ গঙ্গাপ্রসাদ মুখোপাধ্যায়। উপন্যাসমালা রায় শশিচন্দ্র দত্ত বাহাদুর ভারত উদ্ধার অথবা ভবিষ্য ইতিহাসের একপৃষ্ঠা রামদাস শর্মা।

মাঘ ॥ মানব ও যৌন নির্বাচন চন্দ্রশেখর মুখোপাধ্যায়। মণিপুরের বিবরণ কৈলাসচন্দ্র সিংহ। বৃত্রসংহার দ্বিতীয় খণ্ড : সমালোচনা। ইউরোপে শাক্য-সিংহের পূজা (?)। তর্কতত্ত্ব (?)। কৃষ্ণকান্তের উইল বঙ্কিমচন্দ্র। শৈশব সহচরী পূর্ণচন্দ্র।

ফাল্গুন ॥ জটাধারীর রোজনামচা চন্দ্রশেখর বন্দ্যোপাধ্যায়। পাঞ্জাব ও শিখ সম্প্রদায় নগেন্দ্রনাথ চট্টোপাধ্যায়। শঙ্করাচার্যের সংক্ষিপ্ত জীবনী (?)। শৈশব সহচরী পূর্ণচন্দ্র। কমলাকান্তের পত্র : পলিটিক্স্ বঙ্কিমচন্দ্র। বৃত্রসংহার : দ্বিতীয় সমালোচনা। কালবৃক্ষ (ক) গোপালকৃষ্ণ ঘোষ।

চৈত্র ॥ সংযুক্তা (ক) বঙ্কিমচন্দ্র। জটাধারীর রোজনামচা চন্দ্রশেখর বন্দ্যো-পাধ্যায়। বৃত্রসংহার সমালোচনা—তর্কসংগ্রহ বৈজিকতত্ত্ব সঞ্জীবচন্দ্র। রাজসিংহ বঙ্কিমচন্দ্র।

ষষ্ঠ বর্ষ। ১২৮৫

বৈশাখ ॥ রাজসিংহ বঙ্কিমচন্দ্র। আকবর সাহেব খোসরোজ (ক) বঙ্কিমচন্দ্র। বৈজ্ঞিকতত্ত্ব সঞ্জীবচন্দ্র। জটাধারীর রোজনামচা চন্দ্রশেখর বন্দ্যোপাধ্যায়। কালিদাস ও শেক্ষপীয়র হরপ্রসাদ শাস্ত্রী। তর্কসংগ্রহ। প্রাপ্ত গ্রন্থের সংক্ষিপ্ত সমালোচন : হেলেনা কাব্য আনন্দচন্দ্র মিত্র। বীণা মাসিক পত্রিকা।

জ্যৈষ্ঠ ॥ রাজসিংহ বঙ্কিমচন্দ্র। তর্কসংগ্রহ। জটাধারীর রোজনামচা চন্দ্রশেখর বন্দ্যোপাধ্যায়। কুন্দনন্দিনী : সমালোচনা পূর্ণচন্দ্র বসু। বাঙ্গালা ভাষা বঙ্কিমচন্দ্র। রাগনির্ণয় রামদাস সেন। প্রাপ্ত গ্রন্থের সংক্ষিপ্ত সমালোচন : সুশিক্ষিত চরিত। নলিনী অধরলাল সেন। টক্সিকোলজিকাল চার্ট।

আষাঢ় ॥ রাজসিংহ বঙ্কিমচন্দ্র। তর্কসংগ্রহ। নানক রজনীকান্ত গুপ্ত। জটাধারীর রোজনামচা চন্দ্রশেখর বন্দ্যোপাধ্যায়। সমাজের পরিবর্ত কয় রূপ হরপ্রসাদ শাস্ত্রী। রাগনির্ণয় রামদাস সেন। বক্তৃতা (ক) নবীনচন্দ্র। একজন বাঙ্গালি গভর্ণরের অদ্ভুত বীরত্ব হরপ্রসাদ শাস্ত্রী। প্রাপ্ত গ্রন্থের সংক্ষিপ্ত সমালোচন : নিশীথচিন্তা রাজকৃষ্ণ রায়। মানসকুসুম পরিচারিকা মাসিক পত্র। হঠাৎ বাবু। প্রাইমারী গ্রামার (ক) যাদবেন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়। সুরবালা। কুমারী কার্পেণ্টারের সংক্ষিপ্ত জীবনী। ইণ্ডিয়ান পিলগ্রিম।

শ্রাবণ ॥ রাজসিংহ বঙ্কিমচন্দ্র। তর্কসংগ্রহ। বৈজ্ঞিকতত্ত্ব সঞ্জীবচন্দ্র। জটাধারীর রোজনামচা চন্দ্রশেখর বন্দ্যোপাধ্যায়। প্রাচীন ভারতবর্ষ রাজকৃষ্ণ মুখোপাধ্যায়। কমলাকান্তের পত্র : বাঙ্গালির মনুষ্যত্ব বঙ্কিমচন্দ্র। প্রাপ্ত গ্রন্থের সংক্ষিপ্ত সমালোচন : সারসংগ্রহ। ভগিনীবিলাপ। তত্ত্বদর্শন পূর্ণচন্দ্র।

ভাদ্র ॥ জটাধারীর রোজনামচা চন্দ্রশেখর বন্দ্যোপাধ্যায়। দুর্গোৎসব (ক) বঙ্কিমচন্দ্র। বাঙ্গালীর বীরত্ব রজনীকান্ত গুপ্ত। রাগনির্ণয় রামদাস সেন। জুরীর বিচার (?)। রাজসিংহ বঙ্কিমচন্দ্র।

আশ্বিন ॥ কারণবাদ ও অদৃষ্টবাদ নগেন্দ্রনাথ চট্টোপাধ্যায়। জটাধারীর রোজনামচা চন্দ্রশেখর বন্দ্যোপাধ্যায়। মণিপুরের বিবরণ কৈলাসচন্দ্র সিংহ। ভার্গববিজয় সমালোচনা চন্দ্রশেখর মুখোপাধ্যায়। ইয়াং বাঙ্গালির সামাজিক বুদ্ধি (?)। উৎকলের প্রকৃতাবস্থা দীননাথ বন্দ্যোপাধ্যায়।

কার্তিক ॥ সমাজসংস্কার নগেন্দ্রনাথ চট্টোপাধায়। বাঙ্গালির জন্য নূতন ধর্ম চন্দ্রশেখর মুখোপাধ্যায়। উৎকলের প্রকৃতাবস্থা দীননাথ বন্দ্যোপাধ্যায়। জটাধারীর রোজনামচা চন্দ্রশেখর বন্দ্যোপাধ্যায়। ভারতবর্ষে লোকবৃদ্ধির ফল বঙ্কিমচন্দ্র ?। মাধবীলতা সঞ্জীবচন্দ্র।

অগ্রহায়ণ ॥ রত্নরহস্য রামদাস সেন। উৎকলের প্রকৃতাবস্থা দীননাথ বন্দ্যোপাধ্যায়। জটাধারীর রোজনামচা চন্দ্রশেখর বন্দ্যোপাধ্যায়। অশনি (ক) মনোরঞ্জন গুহ। মাধবীলতা সঞ্জীবচন্দ্র। চিত্তমুকুর : সমালোচনা : লোকশিক্ষা বঙ্কিমচন্দ্র। প্রাপ্ত গ্রন্থের সংক্ষিপ্ত সমালোচন : শরীরপালন। জাতীয় উদ্দীপনা। প্রকৃতিতত্ত্ব। দুঃখিনী। ভুবনমোহিনী প্রতিভা। কবিতানিকর। কুসুমবিকাশ।

পৌষ ॥ মন্দর পর্বত (?)। রত্নরহস্য রামদাস সেন। বঙ্গীয় যুবক ও তিন কবি হরপ্রসাদ শাস্ত্রী। তবু বুঝিল না মন (ক) ঈশানচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়। বাঙ্গালা বর্ণমালা সংস্কার (?)। জটাধারীর রোজনামচা চন্দ্রশেখর বন্দ্যোপাধ্যায়।

মাঘ ॥ গুরুগোবিন্দ (?)। জটাধারীর রোজনামচা চন্দ্রশেখর বন্দ্যোপাধ্যায়। বাঙ্গালা বর্ণমালা সংস্কার—মনুষ্যজাতির উন্নতি (?)। মাধবীলতা সঞ্জীবচন্দ্র। জেন্দ অবস্থা (?)।

ফাল্গুন ॥ বঙ্গোন্নয়ন তারাপ্রসাদ চট্টোপাধ্যায়। জটাধারীর রোজনামচা চন্দ্রশেখর বন্দ্যোপাধ্যায়। বাঙ্গালা বর্ণমালা সংস্কার। অশোক রজনীকান্ত গুপ্ত। প্রত্যাখ্যান (ক) নবীনচন্দ্র। মাধবীলতা সঞ্জীবচন্দ্র। মনুষ্যজীবনের উদ্দেশ্য হরপ্রসাদ শাস্ত্রী। প্রাপ্ত গ্রন্থের সংক্ষিপ্ত সমালোচন : বাল্য উদরাময়। মানব সংস্কারক।

চৈত্র ॥ জটাধারীর রোজনামচা চন্দ্রশেখর বন্দ্যোপাধ্যায়। এক্সচেঞ্জ হরপ্রসাদ শাস্ত্রী। তৈল হরপ্রসাদ শাস্ত্রী। চন্দ্রের বৃত্তান্ত (?)। বিবেক ও নৈরাশ (ক) ঈশানচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়। বঙ্গোন্নয়ন তারাপ্রসাদ চট্টোপাধ্যায়। পদোন্নতির পন্থা (?)।

[১২৮৬ বঙ্গাব্দে বঙ্গদর্শনের কোন সংখ্যা প্রকাশিত হয় নি।]

সপ্তম বর্ষ। ১২৮৭

বৈশাখ ॥ ভবিষ্যৎ হিন্দুধর্ম (?)। সমাজগঠনতত্ত্ব রামদাস সেন। নবেল বা কথাগ্রন্থের উদ্দেশ্য পূর্ণচন্দ্র বসু। স্বাধীন বাণিজ্য ও রক্ষাকর হরপ্রসাদ শাস্ত্রী। নৈষধ সমালোচন বঙ্কিমচন্দ্র।

জ্যৈষ্ঠ ॥ বঙ্গোন্নয়ন তারাপ্রসাদ চট্টোপাধ্যায়। তর্কপ্রণালী (?)। খাজনা কেন দিই হরপ্রসাদ শাস্ত্রী। অভিজ্ঞান শকুন্তল চন্দ্রনাথ বসু। এত কাঁদি তবু

কেন না জুড়ায় প্রাণ রে (ক) ঈশানচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়। দ্বিতীয়বার বিবাহ (?)। প্রাপ্ত গ্রন্থের সংক্ষিপ্ত সমালোচন : হিন্দী ব্যাকরণ হৃষীকেশ শাস্ত্রী।

আষাঢ় ॥ বঙ্গীয় শঙ্করাচার্যের নালিশ শঙ্করাচার্য বঙ্গদেশী। স্মৃতি কিম্বা হৃদপিণ্ড কর উৎপাটন (ক) (?)। বঙ্গ বৈজ্ঞানিক যোগেন্দ্রচন্দ্র ঘোষ। অভিজ্ঞান শকুন্তল চন্দ্রনাথ বসু। শিক্ষা হরপ্রসাদ শাস্ত্রী। বাঙ্গালার জ্বর। সমালোচনা মাধবীলতা সঞ্জীবচন্দ্র।

শ্রাবণ ॥ মিরন্দা ও শকুন্তলা শ্রীশচন্দ্র মজুমদার। মৎস্যদেশ হৃষীকেশ ভট্টাচার্য। শঙ্করাচার্য বঙ্গদেশী। ভূতের জাতি বঙ্কিমচন্দ্র। মাধবীলতা সঞ্জীবচন্দ্র। উপাসনা বিষয়ক তুলনা যোগেন্দ্রচন্দ্র ঘোষ। হৃদয় উদাস হরপ্রসাদ শাস্ত্রী। প্রাপ্ত গ্রন্থের সংক্ষিপ্ত সমালোচন : দেশীয় মুদ্রাযন্ত্র বিষয়ক প্রস্তাব রজনীকান্ত গুপ্ত। চিকিৎসক শ্রীশচন্দ্র রায়।

ভাদ্র ॥ অভিজ্ঞান শকুন্তল চন্দ্রনাথ বসু। কালেজি শিক্ষা হরপ্রসাদ শাস্ত্রী। শশধর (ক) ঈশানচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়। মাধবীলতা সঞ্জীবচন্দ্র। মালাচন্দন (?)।

আশ্বিন ॥ মুচিরাম গুড়ের জীবনচরিত : দর্পনারায়ণ পতিতুণ্ড (বঙ্কিমচন্দ্র)। অভিজ্ঞান শকুন্তল চন্দ্রনাথ বসু। রত্নতত্ত্ব রামদাস সেন। পশ্চিমদেশে বাঙ্গালার জ্বর (?)।

কার্তিক ॥ নূতন খাজনার আইন সম্বন্ধে কলিকাতা রিবিউ-এর মত হরপ্রসাদ শাস্ত্রী। অভিজ্ঞান শকুন্তল চন্দ্রনাথ বসু। চন্দ্রগুপ্তের সংক্ষিপ্ত জীবনী রামদাস সেন। মাধবীলতা সঞ্জীবচন্দ্র।

অগ্রহায়ণ ॥ জোসেফ ম্যাটসিনি পূর্ণচন্দ্র বসু। মাধবীলতা সঞ্জীবচন্দ্র। বাঙ্গালার ইতিহাস সম্পর্কে কয়েকটি কথা বঙ্কিমচন্দ্র। ভট্টাচার্য বিদায়প্রণালী (?)। ঢাকা ও পূর্ববাঙ্গালা (?)।

পৌষ ॥ বঙ্গোন্নয়ন তারাপ্রসাদ চট্টোপাধ্যায়। চাকুরীর পরীক্ষা (?)। অভিজ্ঞান শকুন্তল চন্দ্রনাথ বসু। পালামৌ প্র. না. ব (সঞ্জীবচন্দ্র)। বাঙ্গালির উৎপত্তি বঙ্কিমচন্দ্র। বাল্মীকির জয় হরপ্রসাদ শাস্ত্রী। যার কাজ সেই করুক হরপ্রসাদ শাস্ত্রী।

মাঘ ॥ বাঙ্গালার পাঠকপড়ান ব্রত (?)। রত্নরহস্য রামদাস সেন। মাধবীলতা সঞ্জীবচন্দ্র। বাল্মীকির জয় হরপ্রসাদ শাস্ত্রী। বাঙ্গালির উৎপত্তি বঙ্কিমচন্দ্র। জল (?)।

ফাল্গুন ॥ বাঙ্গালির উৎপত্তি বঙ্কিমচন্দ্র। বাঙ্গালার সাহিত্য হরপ্রসাদ শাস্ত্রী। পালামৌ, মাধবীলতা সঞ্জীবচন্দ্র।

চৈত্র ॥ বাঙ্গালির উৎপত্তি, আনন্দমঠ বঙ্কিমচন্দ্র। গৃহসন্ন্যাস (?)। বাল্মীকির জয় হরপ্রসাদ শাস্ত্রী। আমার পরাণ (ক) ঈশানচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়। প্রাপ্ত গ্রন্থের সংক্ষিপ্ত সমালোচন : শম্ভুবংশচরিত। ভারত মহিলা হরপ্রসাদ শাস্ত্রী। কৃষি-শিক্ষা। কুসুমারিন্দম উপন্যাস। সদানন্দ বিদ্রূপ পত্র।

অষ্টম বর্ষ। ১২৮৮

বৈশাখ ॥ আনন্দমঠ, বাঙ্গালির উৎপত্তি বঙ্কিমচন্দ্র। অলংকার শাস্ত্র (?)। মাধবীলতা সঞ্জীবচন্দ্র। যোগেশ কাব্য সমালোচনা।

জ্যৈষ্ঠ ॥ আনন্দমঠ, বাঙ্গালির উৎপত্তি বঙ্কিমচন্দ্র। বঙ্গোন্নয়ন তারাপ্রসাদ চট্টোপাধ্যায়। নূতন কথা গড়া হরপ্রসাদ শাস্ত্রী। মহাত্মা রাজা রামমোহন রায় : গ্রন্থ সমালোচনা পূর্ণচন্দ্র বসু। প্রলয়ের জলোদ্ভাবন (?)। কল্পনা মাসিক পত্রিকা সমালোচনা।

আষাঢ়। অভিজ্ঞান শকুন্তল পূর্ণচন্দ্র বসু। আনন্দমঠ বঙ্কিমচন্দ্র। ভূমিষ্ঠ শিশুর প্রতি (ক) (?)। সাবেক মনুষ্যত্ব ও হালের সাইন করা হরপ্রসাদ শাস্ত্রী। রত্নরহস্য রামদাস সেন। পালামৌ সঞ্জীবচন্দ্র। বাঙ্গালার কলের কাপড় (?)।

শ্রাবণ ॥ আনন্দমঠ বঙ্কিমচন্দ্র। রঙ্গমতী কাব্য সমালোচনা। পালামৌ সঞ্জীব-চন্দ্র। রস (?)। বাঙ্গালা ভাষা হরপ্রসাদ শাস্ত্রী। রত্নরহস্য রামদাস সেন।

ভাদ্র ॥ বহুপতিত্ব (?)। ফুলের ভাষা চন্দ্রনাথ বসু। যুক্তিসিদ্ধ সন্দেহবাদ অক্ষয়চন্দ্র সরকার। আনন্দমঠ বঙ্কিমচন্দ্র। বঙ্গদেশের পরাধীনতা (?)। আহার Vs বিবাহ বঙ্কিমচন্দ্র। কমলাকান্তের জবানবন্দী বঙ্কিমচন্দ্র। কৃষিতত্ত্ব মাসিক পত্রিকা সমালোচনা।

আশ্বিন ॥ আনন্দমঠ বঙ্কিমচন্দ্র। মেঘনাদবধ কাব্য সম্বন্ধে কয়েকটি কথা শ্রীশচন্দ্র মজুমদার। ফুলের ভাষা চন্দ্রনাথ বসু। বাল্মীকির জয় হরপ্রসাদ শাস্ত্রী। স্বভাবে কি অর্থ নাই (ক) ঈশানচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়। পালামৌ সঞ্জীব-চন্দ্র। যোগবল (?)।

[১২৮৮ বঙ্গাব্দে কার্তিক থেকে চৈত্র বঙ্গদর্শনের কোন সংখ্যা প্রকাশিত হয় নি]

নবম বর্ষ। ১২৮৯

বৈশাখ ॥ রত্নরহস্য রামদাস সেন। আনন্দমঠ বঙ্কিমচন্দ্র। কোজাগর পূর্ণিমা (ক)। সম্ভ্রান্ত পরিবারস্থ স্ত্রীলোক। অবিশ্রান্ত বৈরাগ্য যোগেন্দ্রচন্দ্র ঘোষ।

ফুলের ভাষা চন্দ্রনাথ বসু। ঢেঁকি বঙ্কিমচন্দ্র। সংক্ষিপ্ত সমালোচন : সামুয়েল হানিমানের জীবন। প্রায়শ্চিত্ত।

জ্যৈষ্ঠ ॥ অবিশ্রান্ত বৈরাগ্য যোগেন্দ্রচন্দ্র ঘোষ। আনন্দমঠ বঙ্কিমচন্দ্র। একটি প্রিয় জলাশয় (ক) হেমচন্দ্র! বাঙ্গালা ইতিহাসের ভগ্নাংশ বঙ্কিমচন্দ্র। বহু-পত্নীত্ব (?)। প্রকৃতি শ্রীশচন্দ্র মজুমদার। সংক্ষিপ্ত সমালোচন : সভার কার্যনির্বাহক বিষয়ক বিধি। বনপ্রসূন মোক্ষদায়িনী মুখোপাধ্যায়। দুই শিকারী (?)

আষাঢ় ॥ বাঙ্গালীদিগের পৌরুষ তারাপ্রসাদ চট্টোপাধ্যায়। বিষ্ণুপুর মহারাষ্ট্র-দিগের প্রস্থান (প্রাচীন ক)। অবিশ্রান্ত বৈরাগ্য যোগেশচন্দ্র ঘোষ। মহারাজা নন্দকুমার (?)। কাঞ্চনমালা হরপ্রসাদ শাস্ত্রী। সেইদিন (ক) মোহিনী-মোহন দত্ত। সংক্ষিপ্ত সমালোচন : মেঘেতে বিজলী বা হরিশ্চন্দ্র। দি বেঙ্গল মিশেলনী মাসিক। প্রবাহ মাসিক। রাজউদাসিনী। যাবনিক পরাক্রম উপন্যাস।

শ্রাবণ ॥ কাঞ্চনমালা হরপ্রসাদ শাস্ত্রী। জাল প্রতাপচাঁদ সঞ্জীবচন্দ্র। অদৃষ্ট চন্দ্রনাথ বসু। ক্ষুদ্র উপন্যাস সমালোচন।

ভাদ্র ॥ কাঞ্চনমালা হরপ্রসাদ শাস্ত্রী। অবিশ্রান্ত বৈরাগ্য যোগেন্দ্রচন্দ্র ঘোষ। কোকিল চন্দ্রনাথ বসু। জাল প্রতাপচাঁদ সঞ্জীবচন্দ্র।

আশ্বিন ॥ মুসলমান কর্তৃক বাঙ্গালা জয় বঙ্কিমচন্দ্র। কাঞ্চনমালা হরপ্রসাদ শাস্ত্রী। জাল প্রতাপচাঁদ সঞ্জীবচন্দ্র।

কার্তিক ॥ অবিশ্রান্ত বৈরাগ্য যোগেন্দ্রচন্দ্র ঘোষ। কাঞ্চনমালা হরপ্রসাদ শাস্ত্রী। কাকাতুয়া বঙ্কিমচন্দ্র। জাল প্রতাপচাঁদ সঞ্জীবচন্দ্র। বঙ্গে বিজ্ঞান (?)।

অগ্রহায়ণ ॥ রজনীর মৃত্যু (ক) অক্ষয়কুমার বড়াল। অবিশ্রান্ত বৈরাগ্য যোগেন্দ্রচন্দ্র ঘোষ। রত্নরহস্য রামদাস সেন। জগৎশেঠ রজনীকান্ত গুপ্ত। কাঞ্চনমালা হরপ্রসাদ শাস্ত্রী। ইহলোক ও পরলোক চন্দ্রনাথ বসু। মেঘদূত হরপ্রসাদ শাস্ত্রী। সংক্ষিপ্ত সমালোচন : ঊষাহরণ। মায়াবতী। সতীবাসনা। বসন্তোপহার।

পৌষ ॥ জীয়ন্ত মানুষের ভূত (?)। কাঞ্চনমালা হরপ্রসাদ শাস্ত্রী। জীবন ও পরলোক চন্দ্রনাথ বসু। রাজা সিতাব রায় (?)। মেঘদূত হরপ্রসাদ শাস্ত্রী। পঞ্চভূত বঙ্কিমচন্দ্র। দেবী চৌধুরাণী বঙ্কিমচন্দ্র।

মাঘ ॥ দেবী চৌধুরাণী বঙ্কিমচন্দ্র। কাঞ্চনমালা হরপ্রসাদ শাস্ত্রী। হিন্দুপত্নী চন্দ্রনাথ বসু। হনুমদ্বাবুসংবাদ বঙ্কিমচন্দ্র। সংক্ষিপ্ত সমালোচন : শরীররক্ষণ।

কুসুমকানন। হৃদয় প্রতিধ্বনি। তৃণপুঞ্জ। পদ্য ব্যাকরণ। কবিতাকল্পলতিকা। ফুলের সাজি।

ফাল্গুন॥ দেবী চৌধুরাণী বঙ্কিমচন্দ্র। কোথা রাখি প্রাণ (ক) ঈশানচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়। মেঘদূত হরপ্রসাদ শাস্ত্রী। Bransonism বঙ্কিমচন্দ্র। যাত্রার ইতিবৃত্ত সঞ্জীবচন্দ্র। পালামৌ সঞ্জীবচন্দ্র। পরলোক কোথায় চন্দ্রনাথ বসু। প্রাপ্ত গ্রন্থের সংক্ষিপ্ত সমালোচন : বিনোদমালা। বনফুল। যাদবনন্দিনী কাব্য। সুখধামনিবাস। পদ্যকুসুমাবলী। দুখসঙ্গিনী।

চৈত্র॥ রত্নালঙ্কার রামদাস সেন। দেবী চৌধুরাণী বঙ্কিমচন্দ্র। সিরাজ-উদ্দৌলা (?)। বিবাহের বয়স এবং উদ্দেশ্য চন্দ্রনাথ বসু। সংক্ষিপ্ত সমালোচন টডের রাজস্থান অনুবাদ। রাজকৃষ্ণ রায় গ্রন্থাবলী। ইউরোপে তিন বৎসর।